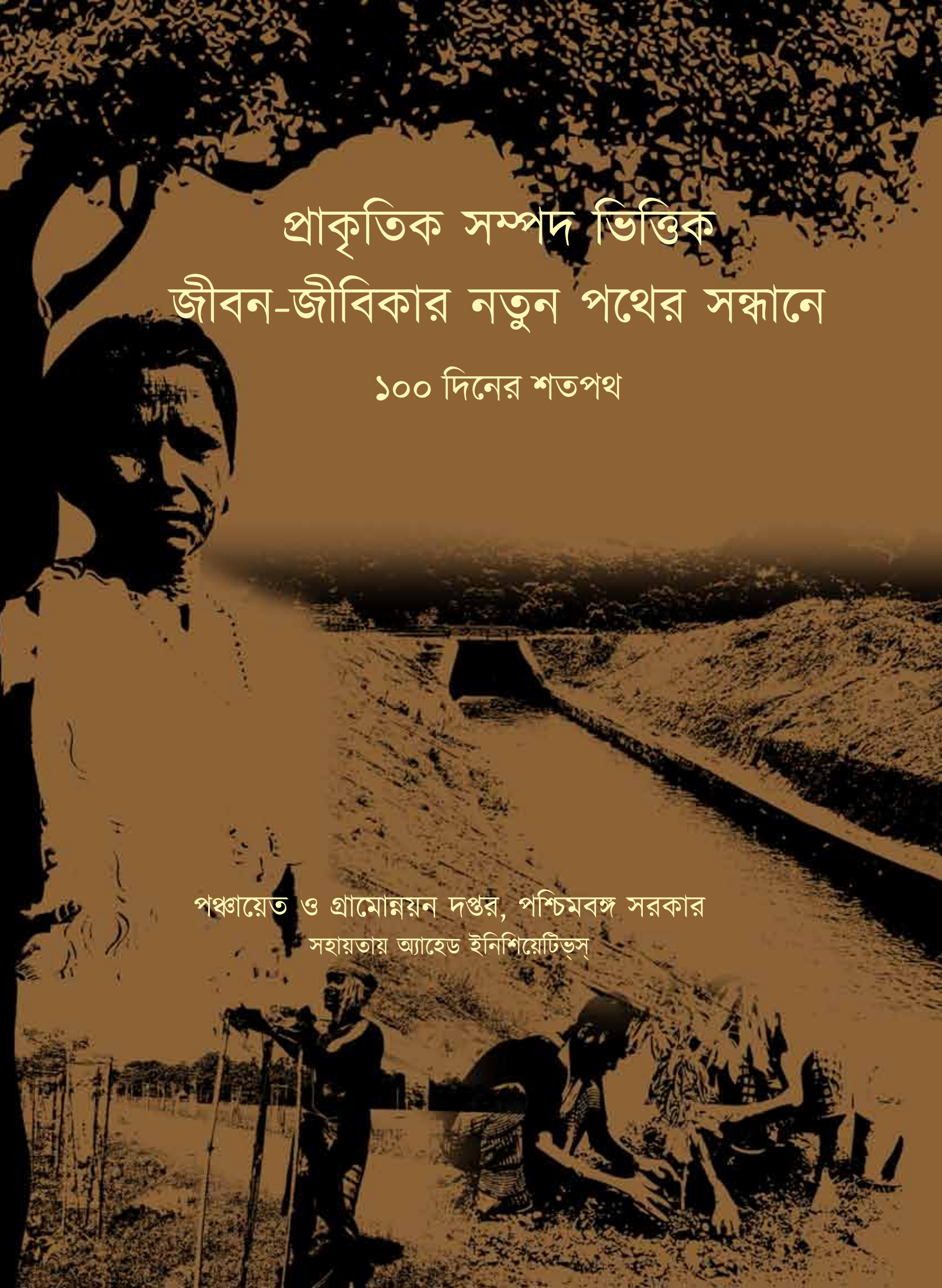


প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক জীবন-জীবিকার নতুন পথের সন্ধানে

১০০ দিনের শতপথ

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
সহায়তায় অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌

প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক
জীবন-জীবিকার নতুন পথের সন্ধানে



পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সহায়তায় অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্

প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক জীবন-জীবিকার নতুন পথের সন্ধানে

(Prakritk Sampad Vittik Jibon-Jibikar Natun Pather Sandhane)

প্রকাশক : পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রকাশনা সহায়তা : অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌

৩২/৬, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১

প্রকাশ : ১৫ জুলাই, ২০১৭

কার্যনির্বাহী সম্পাদক : সুজয় গুপ্ত

তথ্য সংগ্রাহক : কানাইলাল মাইতি

অলংকরণ : মানবেন্দ্র পাল

প্রচ্ছদ : অদ্রীশ দাস

মূল্য : ২০০ টাকা

সম্পাদকীয়

বিগত শতাব্দীর সংক্ষুব্ধ সময় পেরিয়ে আমরা যখন আমাদের জটিল এবং বহুমাত্রিক সংস্কৃতির চিহ্ন নিয়ে নয়ের দশকে এসে পৌঁছেছিলাম, তখনই স্বাধীনতা পরবর্তী উন্নয়নের ভাবনায় বাজার-কেন্দ্রিক পণ্য সংস্কৃতির নতুন নতুন বিন্যাস ও চিন্তনের ঝড় এসে লেগেছিল। যা সমস্ত ভিতর-বাহির কাঁপিয়ে বয়ে নিয়ে আসে জটিলতার এক নতুন আবহ। প্রথম থেকেই এদেশের উন্নয়ন-দর্শনে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনার যে গুরুত্ব ছিল তাও ক্রমে ক্রমে শিথিল হতে শুরু করে গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে। শুরু হয় গ্রামীণ জীবন-জীবিকা নিয়ে স্থানীয় প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনীতি নির্মাণের প্রতি দেশের নীতি প্রণয়নকারীদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া, যা জটিল বাজার–অর্থনীতির প্রেক্ষিতে দরিদ্র প্রান্তিক মানুষের নিজস্ব ক্ষমতা–দক্ষতার প্রতি প্রকৃত সম্মান দিয়ে তাদের জীবিকার ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা দেয়। অনাবিল প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক জীবিকা আমাদের দেশের মানুষের চিরকালীন ভরসার আধার হয়ে থেকেছে। মহেঞ্জোদারোর গম–বিপ্লব অথবা হরপ্পার শস্য–সংরক্ষণ ব্যবস্থার মেধাবী নৈপুণ্য বা অতি সাম্প্রতিক সময়ে চেতনায় ঝড় তোলা প্রাকৃতিক সম্পদের নিপুণ, সুচারু ব্যবহার-বিধিকে কাজে লাগিয়ে সারা দেশজুড়ে গড়ে ওঠা অসংখ্য জীবিকা-সমবায়গুলি আমাদের সে কথাই মনে করিয়ে দেয়। যে কারণে আজ এই ভাঙন-বিহ্বল সময়েও দরিদ্র মানুষের সৃজন-উদ্ভাবন আমাদের বিস্ময়ে আবিষ্ট করে। নতুন করে আমরা ভাবতে পারছি, চৌকাঠ পেরোলেই যে অপার সম্পদ তা আমাদের জ্ঞান-দক্ষতার সাহচর্যে কখনও গুণগত, কখনও পরিমাণগত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে কীভাবে পরিণত হয় নতুন জীবন মহাকাব্যে। সেজন্য আলাপুঝ্লার মাছ চাষী, কোদাইকানালের কফি বাগিচার শ্রমিক, কোরাপুটের কৃষি ঐতিহ্য অঞ্চলের লোকধান্য প্রজাতি বংশপরম্পরায় রক্ষা করে চলা শান্ত তরুণ কৃষক, ময়ূরভঞ্জের গহন অরণ্যের অ-কাঠ বনজ সম্পদ সৃজন-আহরণ করে চলা সভ্যতার উষা মানবেরা সকলে প্রতিদিন জীবন-জীবিকার এক নতুন নক্‌শী কাঁথা রচনা করে চলেছেন। আর সেই প্রতিদিনের সৃজন-নির্মাণ উদ্ভাবনের শব্দরাশি সংস্থাপিত করেই তৈরি হয় অন্য দিশার অনুচ্ছেদ, যা সম্ভ্রান্ত সারস্বত প্রতিষ্ঠানের সৌম্য মেধাকেও প্রশ্নের সামনে ফেলে দেয়। আমাদের কাছে প্রতিটি প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক জীবন-জীবিকা তাই স্বতন্ত্র মহাকাব্য। জাতিকে চেনা যায় তার বিশ্বাসে, তার প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের প্রণালীতে এবং সেই প্রণালী যখন সংগঠিত হয় লোক উৎসবের আদলে, তখন মিথ ও প্রকৃতি মিলেমিশে সৃষ্টি হয় নতুন এক অভিজ্ঞানের। আমাদের কাছে গাছ-মাটি-জলের সাহচর্যে গড়ে ওঠা জীবিকা শুধুমাত্র অর্থনীতির নির্ণয়বিন্দু দিয়ে আলোচিত হতে পারে না। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার প্রণালীর মধ্য দিয়ে আমরা মনে করি, এখনও সারা দেশজুড়ে অর্থনীতির মজবুত কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব এবং শুধুমাত্র রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে নয়, আমাদের ভাবনায় থাকতে হবে সমাজের জটিল আবর্তগুলি, তাই এখনও মানুষ গাছের ওপরে আরোপ করে বিশ্বাস আর গাছকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে জীবিকা ভাবনার নতুন তাত্ত্বিক-প্রায়োগিক প্রেক্ষাপট। এর পাশাপাশি জল ও মাটির সাহচর্য নিয়েও গড়ে ওঠে জীবিকার সংস্থান যেখানে জল কথা বলে শস্যের সাথে, মাটির গহনে লুকিয়ে থাকা ভৌমজলের আশ্রয়ে যে অনাবিল শস্য ফলনের ঠিকানা লেগে থাকে তা আমাদের সুস্থায়ী আগামী দিনের জন্য আরও দায়বদ্ধ হতে শেখায়। আমরা প্রতিদিন নতুন করে ভাবতে শুরু করি সুস্থায়ী অর্থনীতি গড়ে ওঠে প্রাকৃতিক সম্পদের সুচারু ব্যবহারের মধ্য দিয়েই। ভাবনা একদিন বিশ্বাসে পরিবর্তিত হয়, আর প্রতিটি গাছ, মৃত্তিকা এবং জলবিন্দু হয়ে ওঠে মানুষের নিরন্তর সহযাত্রী। এই বইয়ে তাই যতদূর সম্ভব সুবোধ্য ভাষায় জল-গাছ-মাটির সুচারু, সুনিপুন, সুচিন্তিত, সুশিক্ষিত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কীভাবে সৃষ্টি হতে পারে সুস্থায়ী জীবিকা-সম্ভাবনা, যা গ্রাম ভারতের উন্নয়নে সংযুক্ত করতে পারে নতুন দিশা তা তুলে ধরা হয়েছে। আমরা নিশ্চিত, এই মৌষলকালে যখন প্রতিটি গ্রাম স্থানীয় পরিপ্রেক্ষিতে জীবিকার নতুন দিশা খুঁজে নিতে উদ্যত এই বই তাদের কাছে হয়ে উঠবে এক বিশ্বাসযোগ্য হাতিয়ার।

(আবীর চক্রবর্তী)
এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান, অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্

(সুদীপ্ত পোড়েল)
উপসচিব, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রস্তাবনা

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা আইন রূপায়ণে যে প্রকল্প তার উদ্দেশ্য যেমন গ্রামীণ পরিবারে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেওয়া, তেমনই গ্রামোন্নয়নের কর্মকান্ডের মাধ্যমে উৎপাদনশীল সম্পদ সৃষ্টি করা। ভারতবর্ষের গ্রামগুলিতে এখনও উৎপাদনশীলতা আবর্তিত হয় মূলত জল, মাটি, গাছকে কেন্দ্র করে। এজন্য গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের সূচিমুখ জল-মাটি-গাছ। এখন যদিও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জীবিকা অর্জনের অন্যান্য নানান উদ্যোগ, তবুও গ্রামের মানুষের জীবিকা অর্জনের মূল ভিত্তি আজও জমির উৎপাদনশীলতা। সেকারণেই বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের সিংহভাগ এখনও কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রয়াস।

প্রতি বছর এই প্রকল্পে শ্রমদিবস সৃষ্টি হয় বহুল পরিমাণে। অর্থ ব্যয় হয় বিপুল। তা সত্ত্বেও একটা প্রশ্ন কিন্তু আমাদের সদাসর্বদাই বিব্রত করে। যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হল তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সম্পদ তৈরী হল কি ? যে কাজগুলি রূপায়িত হল তার ফলশ্রুতিতে গ্রামীণ অর্থনীতিতে, গ্রামের দরিদ্র পরিবারের উপার্জন ক্ষমতায় কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন এল কি ? কাজ হয়েছে অসংখ্য। সম্পদও তৈরি হয়েছে তদোনুরূপ। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসেনি গ্রামীণ অর্থনীতিতে। আসলে কাজগুলো যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্ন। ফুল তোলা হয়েছে অসংখ্য। কিন্তু মালা গাঁথা হয়নি।

আমাদের পরিকল্পনায়, পরিকল্পনা রূপায়ণের এই ঘাটতিকে বুঝতে হবে। আর সেই ঘাটতি দূর করতে চাই সমগ্র এলাকার জন্য সুসংহত পরিকল্পনা। বিচ্ছিন্নভাবে এর জমিতে সেচ পুকুর, ওর জমিতে সীমানা বাঁধ, তার জমিতে সমন্বিত রেখাবিশিষ্ট গর্ত খোঁড়া নয়। উঁচু ঢালের জমি, মধ্য ঢালের জমি ও সমতলের জমি – পুরুলিয়া-বাঁকুড়ার ভাষায় টাঁড়-বাইদ-কানালি নিয়ে যে ভূখন্ড তাকে তার সবটাকে বুঝে যেখানে যেমন প্রয়োজন, সেখানে তেমন কাজ হাতে নিতে হবে। এখানে কার জমিতে কাজ করছি তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোন জমিখন্ডে কাজ করছি। যেখানে সেখানে পুকুর খুঁড়লে হবে না, হবে না সেখানে বাঁধ বেঁধে দিলে। জল ধরে রাখতে হবে, ধরে রাখতে হবে মাটি। সেই সঙ্গে জলকে আরও বেশি করে পৌঁছে দিতে হবে মাটির নিচে যাতে করে জলছুটের ভূমিতে জলের আর পালানোর জায়গা না থাকে, যাতে করে জলে জল মিশে মরা নদীর সোঁতায় নতুন করে জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয়।

কোন জমিতে খোঁড়ার কোন কাজ করা যাবে, কিভাবে সেই কাজ করা সম্ভব – এসব কথা সহজভাবে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে সহজ বাংলায় লেখা এই বইটিতে।

জল মাটি নিয়ে কাজ যেমন গুরুত্বপূর্ণ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে তেমনই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুচ্ছ রূপায়িত হয় – বৃক্ষরাজিকে কেন্দ্র করে। বহু বছর ধরে এই প্রকল্পে গাছ লাগানো হয়ে থাকে। প্রচলিত ধারণা, গাছ লাগালে তা পরিবেশে সদর্থক প্রভাব ফেলবে। তাই গাছ লাগানো। পরিবেশ নিয়ে ভাবনা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ বিষয়ে উদ্বেগ কতটা ছড়িয়েছে ? সরকার পরিবেশ রক্ষায় গাছ লাগাবে, তাতে সাধারণ মানুষের কি যায় আসে ? গাছ লাগালে মজুরী পাওয়া যায়। বেশ! লাগানো হবে গাছ ! তারপর ? গাছ বাঁচানোর দায় কার ? পঞ্চায়েতের ? সরকারের ? সাধারণ মানুষের ? বোধহয় তেমনভাবে কারও নয়। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর এই ঘাটতির কথা মাথায় রেখে চালু হল বৃক্ষপাট্টা। সরকারী বা খাস জমিতে, স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের জমিতে গাছ লাগানোর দায়িত্ব যে সমস্ত জবকার্ডধারীদের, তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে বেছে নিয়ে তাঁদের দিয়ে দেওয়া হল গাছের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব। গাছে প্রয়োজন অনুযায়ী জল দিতে হবে; সময়ে সময়ে মাটি পাল্টাপাল্টি করে দিতে হবে; প্রয়োজনমাফিক সার দিতে হবে- এসব করে গাছগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। যাকে বৃক্ষপাট্টা দেওয়া হল তার দায়িত্ব গাছের রক্ষণাবেক্ষণের। এজন্য তিনি মজুরী তো পাবেনই। সেইসঙ্গে গাছ থেকে যখন ফসল আসবে তখন তাতে বারো আনা অধিকার। গাছও বাঁচলো। গাছের ফল ও কাঠের ভাগিদারীও নির্দিষ্ট হল।

এর পরেও একটা প্রশ্ন কিন্তু অমীমাংসিত থেকে গেল ! কোন গাছ লাগানো হবে ? যে গাছ সহজলভ্য ও লাগানো সহজ সেই গাছ ? নাকি যে গাছ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে ভাল লাভ দিতে পারে এমন গাছ ? কার লাভ ? অবশ্যই গাছের বারো আনা সত্ত্ব যার, তার। সেজন্যই সবাইকে জানানো দরকার কোন জায়গায় কোন গাছ লাগালে লাভ বেশি হবে। কোন জায়গায় কোন গাছ লাগালে সামগ্রিকভাবে এলাকার উপকার হবে। সুন্দরবন অঞ্চলে তো আর বেদানা বা কমলালেবুর চাষ হবে না। সেখানে তো ম্যানগ্রোভ গাছের চাষই করতে হবে। গাছকে কেন্দ্র করে যে জীবিকা সমৃদ্ধির পরিকল্পনা তার মধ্যে তাই প্রথমেই বুঝে নেওয়া দরকার কত ধরনের গাছ লাগানো যেতে পারে। কোথায় কোন ধরনের গাছ লাগানো যায়। ফলের গাছ। আসবাব তৈরির কাঠের গাছ। জ্বালানী কাঠের গাছ। ঔষধি বৃক্ষের গাছ। নদীবাঁধ শক্তিশালী করার গাছ। গরু-ছগলের খাদ্য হতে পারে এমন ঘাসগুল্ম। মশলা গাছ।

শিল্পে ব্যবহার্য গাছ। দীর্ঘমেয়াদী সবজির গাছ। এসবই একশো দিনের প্রকল্পে বৃক্ষরোপণের সর্বাঙ্গিন কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় একটি। একবারের বিনিয়োগ ও তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হল তার মাধ্যমে বহু বছর ধরে ব্যবহার্য কোনও সম্পদ তৈরি হল কি ? জমি তৈরি হল একশো দিনের প্রকল্পে। তৈরি হল 'গ্রীন হাউস'। সবজি চাষের ব্যবস্থা হল, হয় অন্য কোনও প্রকল্পের অর্থে বা কৃষকের ব্যক্তিগত বিনিয়োগে। তাতেও আপত্তি নেই যদি সেই জমিতে যে বিনিয়োগ প্রকল্পের অর্থে করা হল, সেই জমিটি বেশ কয়েক বছর ধরে ঐ কাজের উপযোগী থাকে। সজনে, পেঁপে, জলপাই, তেঁতুল, ডুমুর, চালতা, লেবু এসব সবজির চাষ তো হতেই পারে। বেশ কিছু ফুলের চাষও সম্ভব এই প্রকল্পে। অবশ্যই সেইসব ফুল, যার গাছ একবার লাগালে কয়েক বছর ধরে সেই গাছে ফুল আসবে। এই সব বৃক্ষরোপণের কৃৎকৌশল নিয়ে আলোচনা এই বইয়ে থাকছে।

এই সঙ্গে সহজ ভাষায় আলোচনায় থাকছে পার্বত্য অঞ্চলে ঝর্ণাধারার পুনরুজ্জীবনের কাজ, সার তৈরির পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ, মাছ চাষ সম্পর্কিত কাজ, উপকূলবর্তী এলাকায় জীবিকা নির্বাহের জন্য বিশেষ প্রকল্পগুচ্ছ, গ্রামীণ পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান সম্পর্কিত কাজ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কাজ।

সব মিলিয়ে এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লক্ষ্য ১০০ দিনের প্রকল্প ব্যবহার করে এবং প্রয়োজনে অন্যান্য বিভিন্ন বিভাগের কাজের সঙ্গে সমন্বয়সাধন করে গ্রামের কয়েক লক্ষ পরিবারের জন্য একই সঙ্গে একাধিক জীবিকা উন্নয়নের প্রকল্প রূপায়ণের ব্যবস্থা করা, যাতে করে আজকের মজুরী আগামীর জীবিকা উন্নয়নের পথ তৈরি করতে পারে।

এই বইটি তৈরি করেছে 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্' নামক এক সুশীল সমাজ সংগঠনের কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীদল। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে এই ক্ষেত্রগুলিতে তাঁদের কাজ করার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সেই সঙ্গে কিছুটা হলেও সাহায্য নেওয়া হয়েছে ২০১২ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত পঞ্চায়েতী রাজ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার। সাহায্য নেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার প্রকাশিত এই ধরনের কাজকর্ম সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি প্রকাশনার। সাহায্য করেছেন অন্য কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। সর্বপরি এই দফতরের উপসচিব শ্রী সুদীপ্ত পোড়েল অত্যন্ত একাগ্রতার সঙ্গে একাজে বিশেষ সহায়কের ভূমিকা পালন করেছেন। আশা করি এই প্রকাশনা মাঠকর্মীদের কাজের ক্ষেত্রে সহজবোধ্য প্রদর্শকের কাজ করবে।

(দিব্যেন্দু সরকার)
মহাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সূচিপত্র

জলবিভাজিকা সংক্রান্ত কাজ

১) সমন্বিত রেখা বিশিষ্ট ট্রেঞ্চ ১

২) সমন্বিত রেখা বিশিষ্ট বাঁধ ১

৩) বোল্ডার চেক ১

৪) ফার্ম বাঁধ ২

৫) গ্যাবিওন ষ্ট্রাকচারস্ ২

৬) ভূ-গর্ভস্থ বাঁধ ৩

৭) মাটির বাঁধ ৩

৮) ডি ও পি ৩

৯) স্টপ ড্যাম ৪

পার্বত্য অঞ্চলে জলবিভাজিকা সংক্রান্ত কাজ

১) স্প্রিংশেড ডেভেলপমেন্ট ৪

কৃষি সম্পর্কিত কাজ

১) নাডিপ কম্পোষ্ট ৫

২) ভার্মি কম্পোষ্ট ৫

৩) তরল জৈব সার বা সঞ্জীবক ৬

প্রাণীসম্পদ বিষয়ক কাজ

১) মুরগী খামার ৬

২) ছাগল প্রতিপালনের ঘর ৭

৩) গৃহপালিত পশুদের জন্য পাকা মেঝে, মূত্র ট্যাঙ্ক ও খাদ্যপাত্র নির্মাণ .. ৭

৪) অ্যাজোলা – একটি বিকল্প গৃহপালিত পশুখাদ্য ৮

মৎস্যচাষ সম্পর্কিত কাজ

১) সরকারি পুকুরে মাছ চাষ ৮

উপকূলবর্তী এলাকার কাজ

১) মাছ শুকানোর স্থান ৯

২) বেল্ট ভেজিটেশন ৯
৩) উপকূলবর্তী অঞ্চলের সুরক্ষার জন্য নিষ্কাশনী ব্যবস্থাপনা ৯

গ্রামীণ পানীয় জল সংক্রান্ত কাজ

১) সোকপিট ১০
২) রিচার্জ পিট বা জলভরণ গর্ত ১০

গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান সম্পর্কিত কাজ

১) পরিবারভিত্তিক শৌচালয় ১০
২) বিদ্যালয় শৌচালয় ১১
৩) অঙ্গনওয়াড়ি শৌচাগার ১১
৪) কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনা ১১

বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধীয় কাজ

১) বন্যা নিয়ন্ত্রণের নালা গভীর করা ও সংস্কার করা ১১
২) চর এলাকার নব রূপদান ১২

সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ

১) ক্ষুদ্র মাঝারি নালার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ১২
২) ৩০ X ৪০ মডেল ১২
৩) ৫% মডেল ১৩
৪) ডাইভারশন্ চ্যানেল ১৪

বিবিধ সম্ভাব্য উদ্যোগ

১) সুসংহত চাষ ১৫
২) মুক্তো চাষ ১৭

গ্রামীণ জীবন-জীবিকায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু গাছ

ফলের গাছ

১) পেয়ারা ২৫
২) আম ২৯
৩) কাঁঠাল ৩৩
৪) সবেদা ৩৬

৫) বেদানা ৩৯
৬) লিচু ৪২
৭) আতা ৪৬
৮) নোনা ৪৯
৯) খেজুর ৫২
১০) তাল ৫৬
১১) নারকেল ৫৯
১২) কাজু বাদাম ৬২
১৩) কমলালেবু ৬৫
১৪) মলটা ৬৮
১৫) বাতাবী লেবু ৭১
১৬) মুসাম্বি ৭৩
১৭) কলা ৭৭
১৮) জাম ৮০
১৯) কুল ও আপেল কুল ৮৩
২০) ডুমুর ৮৭
২১) আমড়া ৮৯
২২) বিলাতি আমড়া ৯১
২৩) আনারস ৯৩
২৪) জামরুল ৯৭
২৫) কামরাঙা ৯৯
২৬) করমচা ১০১
২৭) বেল ১০৩
২৮) কতবেল ১০৬
২৯) স্ট্রবেরী ১০৮
৩০) ব্লুবেরী ১১০
৩১) ড্রাগন ফল ১১২
৩২) কিউই ১১৪

৩৩) আঙুর ১১৭
৩৪) আপেল ১১৯
৩৫) কাঠ বাদাম ১২১
৩৬) সুন্দরবনের কেওড়া ১২৪
৩৭) ফলসা ১২৬
৩৮) বনটেপারি ১২৬
৩৯) গাব ১২৭
৪০) গোলাব জাম ১২৮
৪১) লটকন ১২৯

সবজি হিসাবে ব্যবহৃত ফলের গাছ

১) সজনে ১৩০
২) পেঁপে ১৩২
৩) কাঁচকলা ১৩৫
৪) কাগজি বা পাতি লেবু ১৩৬
৫) তেঁতুল ১৩৯
৬) দেশি জলপাই ১৪১
৭) চালতা ১৪৩
৮) ব্রেডফ্রুট ১৪৪

মশলা উৎপাদনকারী গাছ

১) গোলমরিচ ১৪৭
২) তেজপাতা ১৪৯
৩) দারচিনি ১৫১
৪) ছোট এলাচ ও বড় এলাচ ১৫৪
৫) লবঙ্গ ১৫৭
৬) ভ্যানিলা ১৬০
৭) জায়ফল ও জয়িত্রী ১৬২

ঔষধি গুণসম্পন্ন গাছ

১) আমলকি ১৬৪

২) নিম ১৬৬
৩) হরিতকী ১৬৮
৪) বহেড়া ১৭১
৫) অ্যালোভেরা ১৭৪
৬) কালমেঘ ১৭৭
৭) চন্দন ১৭৯

কাঠের গাছ

১) শাল ১৮২
২) সেগুন ১৮৪
৩) গামার ১৮৭
৪) মেহগনি ১৮৯
৫) শিশু ১৯২
৬) আকাশমণি ১৯৫
৭) লম্বু ১৯৮
৮) বাবলা ২০১

তেল উৎপাদনকারী গাছ

১) করঞ্জ ২০৪
২) মহুয়া ২০৭
৩) বিলাতি জলপাই ২১০
৪) কোকুম (ভেরেন্ডা) ২১৩

শিল্পের সহায়ক গাছ

১) লেমন গ্রাস ২১৫
২) সিট্রোনেলা ২১৭
৩) বাঁশ ২১৯
৪) চা ২২২
৫) কফি ২২৪
৬) কোকো ২২৭
৭) কেওড়া ২২৯

৮) শিউলি ২৩১
৯) নীল ২৩২
১০) আগর ২৩৩
১১) শিমূল ২৩৬
১২) কুসুম ২৩৯
১৩) অর্জুন ২৪২
১৪) শীতল পাটি ২৪৫
১৫) বেত ২৪৭
১৬) রবার ২৫০
১৭) লটকা ২৫৩

সবুজ পশুখাদ্য ও জ্বালানির গাছ

১) সুবাবুল ২৫৪
২) বকফুল ২৫৬
৩) নেপিয়ার ২৫৮
৪) Co-5 ..... ২৬০
৫) ভেটিভার ২৬১
৬) গিনি ঘাস ২৬৩
৭) প্যারা ঘাস ২৬৫
৮) স্টাইলো ২৬৭
৯) ডেসমেন্থাস ২৭০

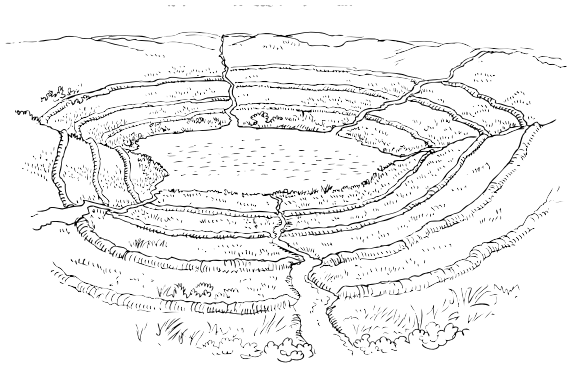
ফুলের গাছ

১) গোলাপ ২৭২
২) রজনীগন্ধা ২৭৪
৩) পদ্ম ২৭৬
৪) জবা ২৭৭

আনেক্সার

আনেক্সার - ক (কোথায় কী গাছ লাগাবেন) ২৭৯
আনেক্সার - খ (কৃষি জমির আইলে বৃক্ষ রোপণ) ২৮১

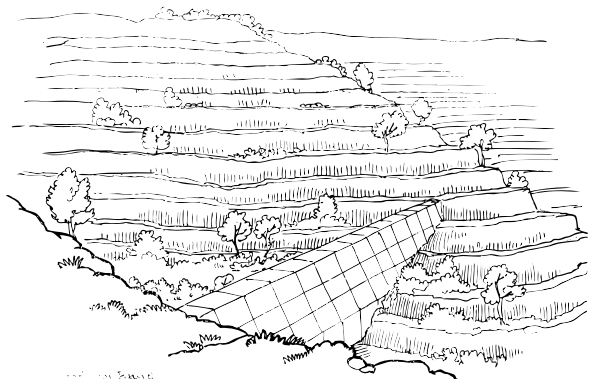
জলবিভাজিকা সংক্রান্ত কাজ (Watershed oriented works)



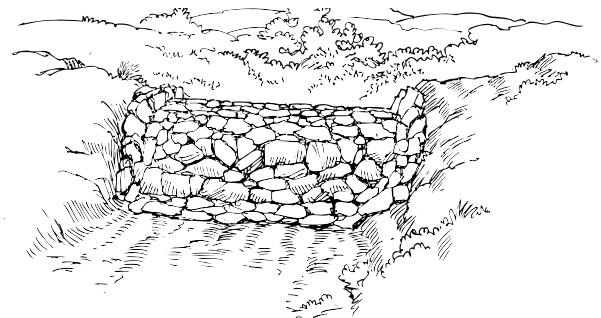
১) সমন্বিত রেখা বিশিষ্ট ট্রেঞ্চ (Contour Trench)

জলবিভাজিকার দুইটি ঢালের মিলিত প্রান্তরেখায় (Ridge Area) সমন্বিত রেখা বিশিষ্ট ট্রেঞ্চ (Contour Trench) খননের মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে ভূমিক্ষয় রোধ (Soil Erosion) ও ভূমির ঢাল (Slowing Down) সঠিকভাবে বজায় রাখা সহজেই সম্ভব। রিজ-লাইন বা জলবিভাজন রেখা হল সন্নিহিত দু'টি জলবিভাজিকার বিভাজন রেখা। কন্টুর লাইন হল কতকগুলি কাল্পনিক রেখা বা কোনও একটি বিশেষ তল থেকে একই উচ্চতাসম্পন্ন বিন্দুগুলি যোগ করলে যে রেখা পাওয়া যায় তাকে কন্টুর বা সমন্বিত লাইন বলা হয়। সমন্বিত রেখা হল এমন একটি কাল্পনিক রেখা যা একই উচ্চতায় মিলিত হয়। যেহেতু এই ট্রেঞ্চ একই উচ্চতার রেখা অনুযায়ী খনন করা হয় সেহেতু ট্রেঞ্চের জলধারণ ক্ষমতা সব সময়ের জন্য সুনিশ্চিত হয়। যদি ট্রেঞ্চ সমন্বিত রেখা অনুযায়ী খনন না করা হয় তাহলে ভূমিক্ষয়ের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। যে সকল এলাকার জমি চাষের অনুপোযুক্ত এবং সেখানে জমির ঢাল ১০% থেকে ১৫% সেখানে এই প্রকারের ট্রেঞ্চ করা যেতে পারে। এই প্রকারের ট্রেঞ্চ তৈরির ক্ষেত্রে ইউনিট বা একক প্রতি ব্যয় (০.৫ মিটার X ০.৫ মিটার মাপের) প্রতি হেক্টরে ১১,০০০ টাকা হতে পারে। Running দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে Running মিটারে ১৭ টাকা ব্যয় হতে পারে। এক্ষেত্রে সমগ্র ব্যয়ের ১০০% অদক্ষ শ্রমিক খাতে ব্যয় করা যাবে।

২) সমন্বিত রেখা বিশিষ্ট বাঁধ (Contour Bund)



অত্যন্ত স্বল্প ব্যয়ে জলবিভাজিকার দুইটি ঢালের মিলিত প্রান্তরেখায় ভূমিক্ষয় রোধ করার জন্য সমন্বিত রেখা বিশিষ্ট বাঁধ নির্মাণ। যেহেতু সমন্বিত রেখা হল এমন একটি কাল্পনিক রেখা যা একই উচ্চতায় মিলিত হয়, সেহেতু কন্টুর বাঁধ ভূমিক্ষয় রোধ করতে এবং জল ধরে রাখতে বিশেষ উপযোগী ভূমিকা পালন করে। কন্টুর ট্রেঞ্চের ন্যায় কন্টুর বাঁধও বৃষ্টির জল ধরে রাখার পক্ষে খুবই উপযোগী। এর ফলে জল বিভাজিকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জমির আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায়। জমিকে আরও কৃষিবান্ধব করে তোলে। কন্টুর বাঁধ চাষযোগ্য জমিতে করা বাঞ্ছনীয়, এক্ষেত্রে জমির ঢাল ৩%-১০% মধ্যে হলেই এই ধরনের কাজ সহজেই করা যেতে পারে। ০.৬ মিটার উচ্চতা X ২.০ মিটার চওড়া এবং ০.৬৬ সেন্টিমিটার গভীরতাবিশিষ্ট কন্টুর বাঁধের ক্ষেত্রে ইউনিট বা একক প্রতি ব্যয় প্রতি হেক্টরে প্রায় ১৪,০০০ টাকা, Running দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে প্রতি Running মিটারে ব্যয় ৪২ টাকা। এই কাজের ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিক ও উপকরণের অনুপাত হল ৮৫ : ১৫।



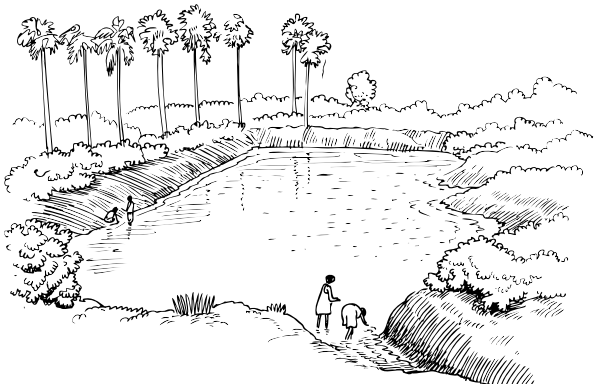
৩) বোল্ডার চেক (Boulder Check)

বোল্ডার চেক হল পাথরের দ্বারা নির্মিত ড্যাম যা ছোট ছোট নালা বা মরসুমি জলধারার ওপর (৫০ হেক্টর থেকে ক্ষুদ্র) তৈরি করা হয়ে থাকে। বোল্ডার চেক তৈরি করার মূল উদ্দেশ্য হল জল নিষ্কাশনের গতিবেগকে প্রশমিত করা। জলের গতিবেগকে সংযত করার মাধ্যমে বোল্ডার চেক ভূমিক্ষয় রোধ করতে সহায়তা করে, জলের গতিপথকে পলি দ্বারা রুদ্ধ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে এবং এর ফলে ভূমির জলধারণ ক্ষমতা স্যাবকভাবে বৃদ্ধ পায়। জলের প্রবাহ নিয়ামত হওয়ার ফলে জলানকাশী নালা আরও ভালভাবে ব্যবহৃত হয় ও জল আরও বেশিবার পরিশ্রুত (Refill) হয়। ৭ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট, অন্তত ১ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন ওপরের ঢাল ও নিচের ঢালের অনুপাত ১:১ এবং ৩:১ ও ০.৫ মিটার চওড়া বিশিষ্ট বোল্ডার চেক তৈরিতে ইউনিট প্রতি ব্যয় ৪,০০০ টাকা। এই কাজের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ অদক্ষ শ্রমিক বাবদ ব্যয় করা যাবে।

৪) ফার্ম বাঁধ (Farm Bunding)



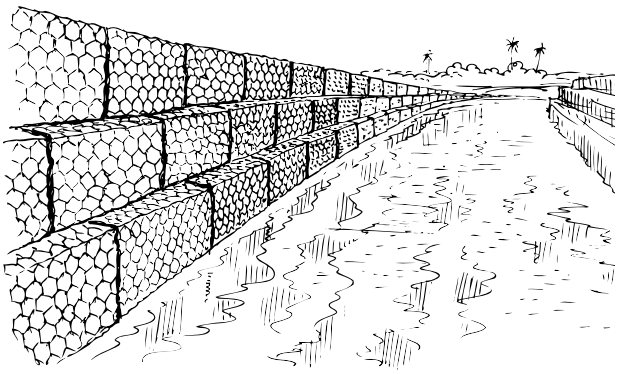
কৃষিজমিতে ভূমিক্ষয় রোধ তথা জমির আর্দ্রতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ফার্ম বাঁধ তৈরি করা হয়ে থাকে। সাধারণত এই ধরনের বাঁধ সমন্বিত রেখা (Contour Line) বরাবর করা প্রয়োজন। যদিও কৃষকরা এই পদ্ধতিকে সহজে গ্রহণ করতে চান না, কারণ এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে তারা বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হন। সমন্বিত রেখা বিশিষ্ট বাঁধ (Contour Bund) কৃষিজমিকে বিক্ষিপ্তভাবে বিভাজিত করে, এরফলে কৃষকের পক্ষে জমিতে লাঙল দিতে সমস্যা হয়। এই সমস্যার কারণে সাধারণত ফার্ম বাঁধের নামে জমির আলগুলিতে বাঁধ দেওয়ার কাজ করা হয়ে থাকে। যদিও ফার্ম বাঁধ তখনই করা উচিত যেখানে জমির ঢাল উপযুক্ত হবে ও তা অতিরিক্ত জল সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত হবে।

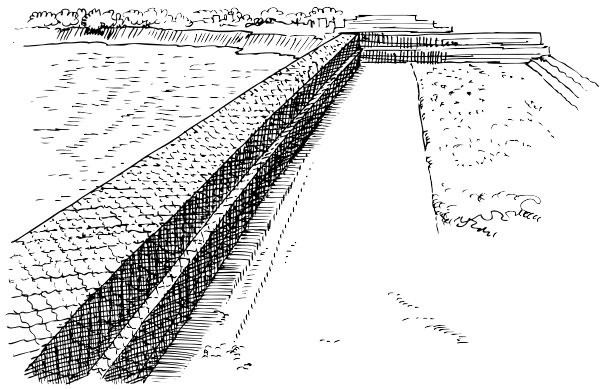


সকল ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জমির আলগুলিতে বাঁধ দিয়ে ভূমিক্ষয় রোধ করা বা ভূমির আর্দ্রতা শক্তি বাড়ানো সম্ভব নয়। কৃষিজমিকে বিভিন্ন ইউনিটে ভাগ করে বাঁধ দিলে প্রতিটি ইউনিট জলের গতিবেগকে সংযত করা সম্ভব হবে; প্রতিটি বাঁধে প্রবাহিত জল আলাদাভাবে সংরক্ষিত হবে। এরফলে জলকে অনেকটা লম্বা জায়গাজুড়ে প্রবাহিত হতে না দিয়ে প্রতিটি বাঁধে তার গতিবেগকে সংযত করা যাবে। ফলস্বরূপ সার্বিকভাবে ভূমিক্ষয় রোধ ও ভূমির আর্দ্রতা বৃদ্ধি পাবে। ০.৬ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট ১.৭ মিটার প্রশস্ত এবং ০.৫৭ সেন্টিমিটার গভীরতা বিশিষ্ট এই প্রকার বাঁধের ইউনিট প্রতি ব্যয় প্রায় ৪,০০০ টাকা প্রতি হেক্টর। Running দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিট ব্যয় প্রায় ৪০ টাকা। এই কাজের ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিক ও উপকরণের অনুপাত হল ৮৫ : ১৫। এই কাজটি একমাত্র তারাই করতে পারবেন যাদের নিজস্ব জমি আছে।

৫) গ্যাবিওন স্ট্রাকচারস্ (Gabion Structures)

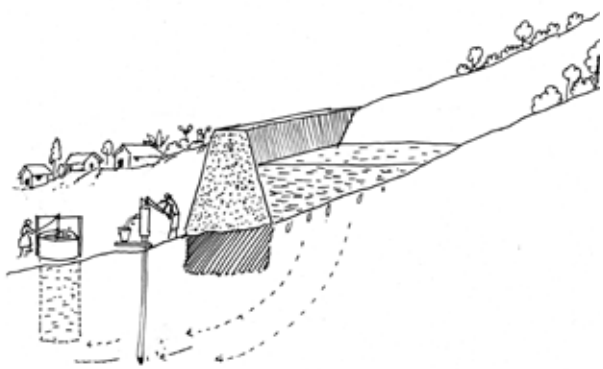
গ্যাবিওন স্ট্রাকচারস্ মূলত ৫০ থেকে ৫০০ হেক্টর জলাশয় এলাকায় এমন এক প্রকার বাঁধ যা পাথর ও তার দিয়ে তৈরি হয় এবং জলধারার পাড়ের অবস্থান হয়। এই প্রকারের বাঁধ নির্মাণের উদ্দেশ্য হল নিকাশী নির্গমপথ (Drainage Line) দিয়ে চলা জলের স্রোতকে হ্রাস করা। জলের বেগকে হ্রাস করার মাধ্যমে ভূমিক্ষয় রোধ করা সম্ভবপর হবে। পলি কম জমবে এবং এরফলে নিকাশী নির্গমপথ দিয়ে জলের প্রবাহিত হওয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলস্বরূপ জমির জলধারণ ক্ষমতা আরও শক্তিশালী হবে। এই ধরনের কাঠামো সাধারণত দুই ভাবে স্থাপন করা যায়। প্রথমত, নকশার বিভিন্ন দিক অনুযায়ী বাঁধের কাঠামো প্রস্তুত করা এবং পাথরগুলিকে তারের সাহায্যে





বেঁধে দেওয়া। একমাত্র নিচের অংশ ছাড়া বাকি সকল অংশ তার দিয়ে বেঁধে দেওয়া। দ্বিতীয়ত, পাথরগুলিকে খাঁচাবন্দী করে পাশাপাশি রেখেও এধরনের বাঁধ তৈরি করা যেতে পারে, বাঁধের কাঠামো এরকম অনেকগুলি খাঁচা পাশাপাশি তার দিয়ে বেঁধে প্রস্তুত করা হয়, এক্ষেত্রে তারকে সমান্তরালভাবে ও লম্বাভাবে ভালভাবে বাঁধা হয় যার ফলে এই বাঁধের কাঠামোটি প্রথম কাঠামো থেকে শক্তিশালী হয়। ২ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট, ১ মিটার চওড়া ও ১২ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এই ধরনের কাঠামো তৈরি করতে প্রায় ৪৫,০০০ টাকা ব্যয় হবে, এই কাজের ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিক ও উপকরণের অনুপাত হল ৩০ : ৭০।

৬) ভূ-গর্ভস্থ বাঁধ (Underground Dyke)



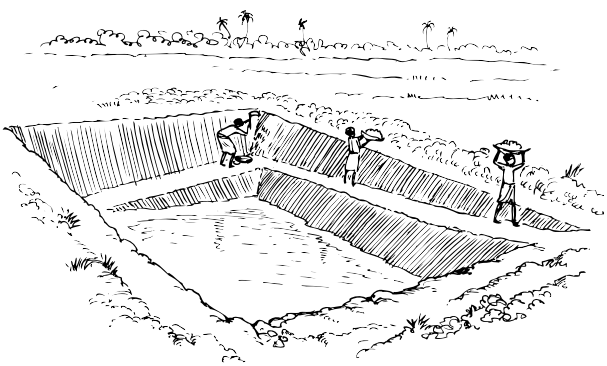
এটি এক প্রকারের মাটির বাঁধ যা ভূ-স্তরের জলধারার গতিবেগকে রোধ করে তা পার্শ্বস্থ কুয়ো বা টিউবওয়েলের দিকে চালিত করতে সহায়তা করে বাঁধ কোনও জমিকে জল দ্বারা পূর্ণ করে না বা জলের গতিপথকে একেবারে রুদ্ধ করে দেয় না। এই ধরনের ভূ-গর্ভস্থ বাঁধ শক্ত পাথুরে এলাকার পক্ষে খুবই উপযোগী, যেখানে জলস্তর অনেকটা নিচে এবং যেখানকার মাটির জলের প্রয়োজন খুব বেশি। এই প্রকারের বাঁধ জলবিভাজন এলাকায় জলধারণ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় ও বেশি সময়ের জন্য জল ধরে রাখতে সহায়তা করে, এই ধরনের বাঁধ তৈরির ফলে পার্শ্ববর্তী কুয়োগুলিতে জলস্তর সহজে নেমে যায় না এবং টিউবওয়েলের জলস্তরও নেমে যাওয়ার প্রবণতা কম দেখা যায়। ১২ মিটার দৈর্ঘ্য, ৬ মিটার গভীর ও ২ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন এই প্রকার ভূ-গর্ভস্থ বাঁধের ক্ষেত্রে ব্যয় প্রায় ৪,৩০০ টাকা। এই কাজের ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিক ও উপকরণের অনুপাত হল ৭০ : ৩০।



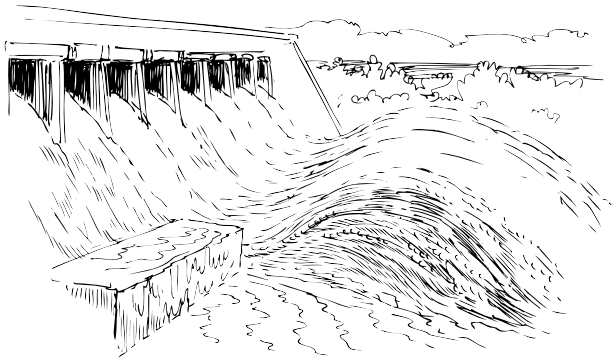
৭) মাটির বাঁধ (Earthen Dam)

যে কোনও জলবিভাজিকা প্রকল্পের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বাঁধ কাঠামো হল, মাটির তৈরি বাঁধ কাঠামো। পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ অঞ্চলে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের সময় হল জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বছরে ৪০ থেকে ৫০ দিনের বেশি বৃষ্টিপাত হয় না এবং এই বৃষ্টিপাত যে সময় নিয়মিত হয় তাও নয়। বৃষ্টিপাত অনেক সময়ই বিক্ষিপ্তভাবে হয়ে থাকে। অনেক সময়েই দেখা যায় যে, নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে বৃষ্টি শুরু হয় এবং শেষও হয়ে যায় নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই। এরফলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল প্রায়শই খরা কবলিত হয় পড়ে। এরজন্যে খরিফ শস্যকে রক্ষামূলক সেচব্যবস্থার মাধ্যমে খরার হাত থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন। মাটির বাঁধ সেই সব অঞ্চলে বেশি প্রয়োজন যেখানে ক্যানেল সেচব্যবস্থা নেই ও যেখানে জমির আর্দ্রতা খুব কম, রুক্ষ প্রকৃতির। ভূ-গর্ভস্থ জলস্তরে জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর (রিচার্জ) জন্যে এই ধরনের বাঁধ নির্মাণ করা যেতে পারে। এই ধরনের কাঠামো সাধারণত অববাহিকা (ক্যাচমেন্ট) এলাকার ওপর তৈরি করা হয়। প্রথমে জল এখানে জমা হয় এবং তারপরে চুঁইয়ে অববাহিকার নিচের অংশ যেখানে কুয়ো বা নলকূপ থাকে সেখানে গিয়ে জমা হয়। ৬৫ মিটার লম্বা দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ৪.৬৫ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন, ওপর ও নিচের ঢালের অনুপাত ২ : ১ এবং ২ : ৫। ১ মিটার এবং ২ মিটার চওড়া মাটির বাঁধ করতে আনুমানিক ব্যয় ২.৬ লক্ষ টাকা। সাধারণত ইউনিট প্রতি এর খরচ ২০-৩০ টাকা প্রতি ঘনমিটারে। এই কাজের ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিক ও উপকরণের অনুপাত ৯৫ : ৫। এই ধরনের কাজ কেবলমাত্র সরকারি জায়গায় (পাবলিক ল্যান্ডে) করা যাবে।

৮) ডি. ও. পি. (Dugout Farm Pond)

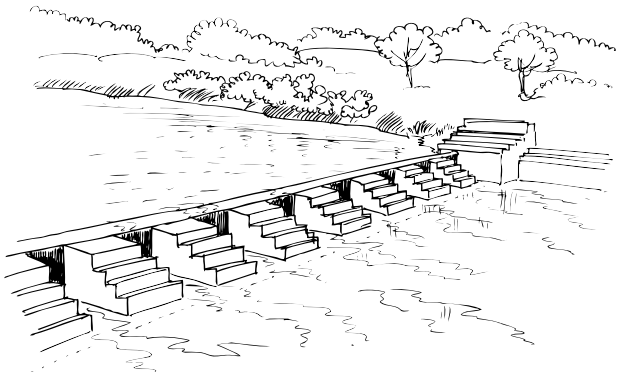


এই প্রকল্পটি সাধারণত ব্যক্তিগত জমিতে হয়ে থাকে। এই ধরনের পুকুর তৈরি করার মূল উদ্দেশ্য হল বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করা। অনেক সময় বর্ষার মরসুমে প্রায়শই বৃষ্টি হয় না বা অনিয়মিত বৃষ্টি হয়। এরফলে উৎপাদিত খরিফ শস্যের নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। ডি. ও. পি. শস্যকে নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। যে সমস্ত জমি খুবই সমান, জলাধারটি একেবারেই অগভীর এবং জলাধারের ধারগুলি খুব একটা উঁচু নয়, সেই সমস্ত জমিতে এটি খুবই উপযোগী প্রকল্প। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল, এমন সেচব্যবস্থা প্রণয়ন করা, যার মাধ্যমে খরিফ শস্যকে রক্ষা করা যায়। এক্ষেত্রে বলাই বাহুল্য যে আমাদের দেশের বেশ কিছু রাজ্যে যেমন, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ছত্তিশগড়, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশায় এই ধরনের জলাধার রবিশস্য ও মাছ চাষের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়ে থাকে। ১০০ ঘনমিটার জল সংরক্ষণ করতে পারবে এমন আয়তন বিশিষ্ট (২৫ মিটার X ২০ মিটার X ২ মিটার) জলাধার তৈরি করতে আনুমানিক খরচ ১,০০,০০০ টাকা। ইউনিট প্রতি জল সংরক্ষণ খরচ হল ৫০-৬০ টাকা। এই কাজের ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি হল ১০০%।



৯) স্টপ ড্যাম (Stop Dam)

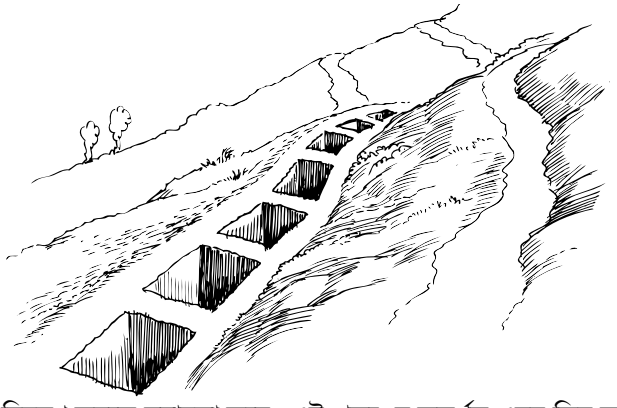
বড় জলাধারে সাধারণত এই বাঁধ তৈরি করা হয়ে থাকে। বর্ষা পরবর্তী বৃষ্টির জল সংগ্রহ করার জন্য এই ধরনের বাঁধ তৈরি করা হয়। সাধারণত বর্ষার মরসুমের এই বাঁধের দরজা খোলা রাখা হয় যাতে জল সহজে বেরিয়ে যেতে পারে। এরফলে কোনও রকম পলি পড়ার হাত থেকে বাঁধের দরজা সুরক্ষিত থাকে। বর্ষার পরে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সেই বর্ষার পরবর্তী বৃষ্টির জলে জলাধারটি পূর্ণ হতে থাকে। এই বাঁধ এমন জলাধারেই করা উচিত যেখানে সারা বছর জল থাকে। এরফলে



বর্ষা পরবর্তী সময়ে সারা বছরই এই জলাধারটিতে জল সংরক্ষণের সুযোগ থাকে। ১০০০ হেক্টর অববাহিকা (ক্যাচমেন্ট) এলাকায় ২০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট সর্বোচ্চ ২.৭ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন, ১.৫ মিটার চওড়া পাশের ঢাল ১১ (?) স্টপ ড্যাম তৈরিতে আনুমানিক খরচ ৫ লক্ষ টাকা। সাধারণত এই কাজের ক্ষেত্রে প্রতি ঘনমিটার পিছু জল সংরক্ষণের জন্য ৯০-১০০ টাকা খরচ হতে পারে। এই বাঁধ তৈরি করতে ইঁট ও পাথর লাগে। যেখানে শক্ত পাথর (ব্যাসল্ট ও গ্রানাইট) পাওয়া যায়, সেই সমস্ত জায়গায় নুড়ি পাথরও ব্যবহার করা যেতে পারে। স্টপ ড্যামের দরজা তৈরি করতে ১.৫ মিলিমিটার ঘনত্ব বিশিষ্ট প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড মেটাল শিট ব্যবহার করা যেতে পারে। এই কাজের ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিক ও উপকরণের অনুপাত হল ২৫ : ৭৫।

পার্বত্য অঞ্চলে জলবিভাজিকা সংক্রান্ত কাজ

(Watershed related works in mountainous regions)

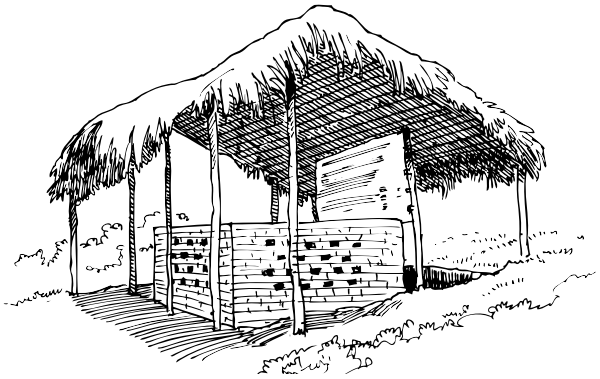


১) স্প্রিংশেড ডেভেলপমেন্ট

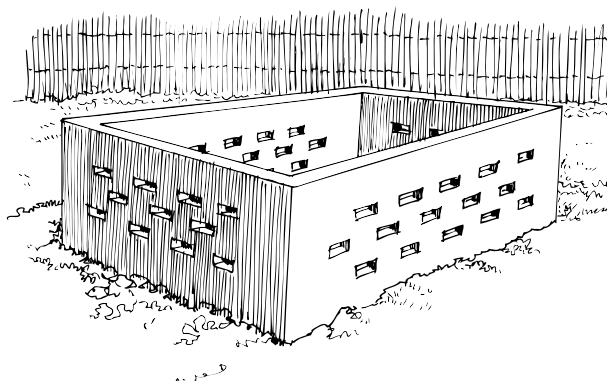
পার্বত্য এলাকায় জলাধারগুলির সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি, কারণ এই জলাধারগুলিই হল পার্বত্য এলাকার গ্রামীণ তথা শহরের জল সঞ্চয়ের একমাত্র উৎস। এখানকার বড় বড় জলাধার বা ঝর্ণাগুলি অনেক সময় সেচের কাজেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্প্রিংশেড হল পাহাড়ের এমন একটি ঢাল যা জলকে (ভূ-পৃষ্ঠের ওপরের জলকে) ভূ-গর্ভের মাধ্যমে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জলাধারগুলিতে গিয়ে জমা হতে সাহায্য করে। এই ঢালের মাধ্যমে বৃষ্টিপাতের ফলে সংরক্ষিত জল ভূ-গর্ভের মধ্যে সঠিক ভাবে পৌঁছাতে, জলাধারগুলিতে জল সঞ্চয় বাড়াতে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে। এই প্রকল্পের অন্তর্গত এমন কিছু কাজ আছে যা নিশ্চিতভাবেই জলবিভাজিকা উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন, পরিখা খনন করা, গাছ লাগানো, ঘাস উৎপাদন ও সংরক্ষণ, গালিচা সংরক্ষণ ইত্যাদি। এই স্প্রিংশেডের ইউনিট প্রতি খরচ কাজের স্থান, ঢাল কী ধরনের তার ওপর নির্ভর করে। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় হেক্টর প্রতি ১৮,০০০ টাকা থেকে ৩৮,০০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। শ্রমিক উপকরণ অনুপাত ৯০ : ১০ থেকে ৬০ : ৪০ পর্যন্ত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ জ্বালানি বা কাঠজাতীয় বৃক্ষরোপণ ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ ঢালে স্প্রিংশেড তৈরি করতে প্রতি হেক্টরে ২,২০০ টাকা খরচ পড়ে। এক্ষেত্রে শ্রমিক, উপকরণ অনুপাত হবে ৭০ : ৩০। একই ক্ষেত্রে যদি ফলের গাছ লাগানো হয় তাহলে হেক্টর প্রতি ব্যয় হবে ৩৮,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে শ্রমিক উপকরণ অনুপাত হবে ৯০ : ১০।

কৃষি সম্পর্কিত কাজ (Agriculture related works)

১) নাডিপ কম্পোষ্ট (NADEP Compost)



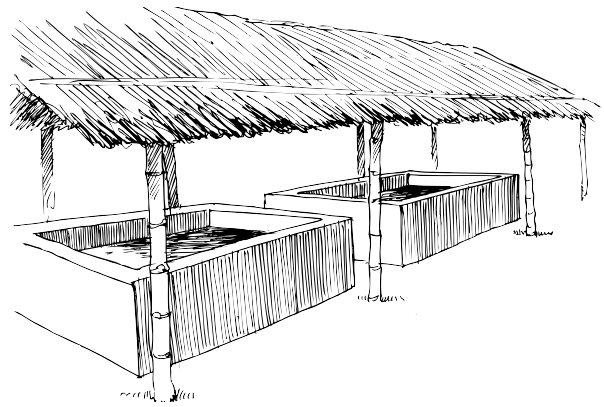
ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার উৎপাদন ক্ষমতার মূল চাবিকাঠি হল ভূমির সঠিকভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা। কম্পোষ্টিং হল এমন এক পদ্ধতি যার মাধ্যমে কঠিন বর্জ্য পদার্থকে কাজে লাগিয়ে তার জৈব উপাদানগুলিকে নিঃসৃত করে এমন একটি রূপ তৈরি করা যা সার হিসাবে কাজে লাগানো যায়। সাধারণত কঠিন বর্জ্য পদার্থে প্রচুর পরিমাণে ক্ষুদ্র জীবাণু থাকে। সঠিক পরিবেশ পেলে এই জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং এরফলে বর্জ্যের জৈব অংশগুলি পচনের ফলে উর্বর রূপ পায়। নাডিপ কম্পোষ্টের ক্ষেত্রে একটি ৩.৬ মি. X ১.৫ মি. X ০.৯ মি. কম্পোষ্ট পিট প্রয়োজন হয় যেখানে প্রতিবার এক টন পর্যন্ত কম্পোষ্ট উৎপাদিত হতে পারে। এই পরিমাণ সার ০.২৫ হেক্টর কৃষিজমিতে ব্যবহারের উপযুক্ত। এই পিটে সাধারণত বায়ু চলাচলের জন্য ইট দিয়ে জাফরি তৈরি করা হয়। এই পিটের মধ্যে কৃষিজাত বর্জ্য, গোবর, মাটি স্তর অনুযায়ী দিয়ে মিশ্রিত করা হয়। প্রথমে ১০০-১১০ কেজি কৃষিজাত বর্জ্য ৬ ইঞ্চি পুরু করে পিট দেওয়া হয়। এই স্তরের ওপরে ৪ কেজি গোবর ১২০-১২৫ লিটার জলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এই স্তরের ওপরে পরিষ্কার মাটি ৫০-৫৫ কেজি দেওয়া হয়। এইভাবে সমস্ত স্তরটি ১.৫ ফুট পর্যন্ত ঘনত্বযুক্ত হয়। এরপর সমগ্র মিশ্রণটির ওপর অংশটি ৩ ইঞ্চি গোবর মিশ্রিত মাটি দিয়ে (গোবর ৪০০-৫০০ কেজি) সিল করে দেওয়া হয়। ২–৩ মাসের মধ্যে ঘন বাদামি রঙের নরম আর্দ্র সার প্রস্তুত হয়ে যায়। সাধারণত দেখা যায় একটি গরু বছরে ৪০ টন বর্জ্য ত্যাগ করে। এই বর্জ্যে নাইট্রোজেন ০.৫% - ১.৫%, ফসফরাস ০.৫% - ০.৯% এবং পটাসিয়াম ১.২% - ১.৪% থাকে। একটি ৩.৬ মি. X ১.৫ মি. X ০.৯ মি. কম্পোষ্ট পিট তৈরির জন্য ইউনিট প্রতি খরচ হল ৮,০০০ টাকা। এই কাজটির ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিক ও উপকরণের অনুপাত হল ২৫ : ৭৫। এই কাজের জন্য শুধুমাত্র সেই পরিবারগুলিকেই চিহ্নিত করা যাবে যাদের ব্যক্তিগত জমি আছে। ওই পরিবারগুলিতে দ্বিতীয়বার পিট করা যাবে যদি পরিবারগুলি ইচ্ছুক হয় এবং তাদের ইতিমধ্যে একটি এই ধরনের পিট থাকে।



২) ভার্মি কম্পোষ্ট (Vermi Compost)

ভার্মি কম্পোষ্টের (কেঁচো সার) ক্ষেত্রে জৈবিক বর্জ্য পদার্থকে উন্নতমানের সারে পরিবর্তিত করবার জন্য কেঁচোর ব্যবহার করা হয়। সাধারণত প্রতিদিন একটি কেঁচো তার ওজনের সমান জৈব পদার্থ উৎপাদনে সক্ষম। এক একর জমিতে পর্যাপ্ত কেঁচো থাকলে তারা বছরে প্রায় ৩০-৪০ টন মল ত্যাগ করে যা গাছের বৃদ্ধিতে সহযোগী ভূমিকা পালন করে। সাধারণত ভার্মি কম্পোষ্টের জন্য জোড়া পিট (Twin Pit) মডেল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পিটের দৈর্ঘ্য ৩.৬ মি. X ১ মি. X ০.৭৫ মি. হয়, যার দেওয়াল বিভক্ত করা থাকে। ভার্মি কম্পোষ্টের পিট সাধারণত কিচেন গার্ডেন বা ছোট সবজি বাগানের ক্ষেত্রে খুব উপযোগী সার। একটি ভার্মি কম্পোষ্টের পিট ০.১৫ টন সার উৎপাদন করে যা প্রায় ০.২৫ হেক্টর জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সক্ষম। প্রতি ইউনিট ভার্মি কম্পোষ্ট পিট তৈরি করতে আনুমানিক খরচ প্রায় ৯,০০০ টাকা। এই কাজের ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিক এবং উপকরণের অনুপাত হল ২৫ : ৭৫, এই কাজের জন্য শুধুমাত্র সেই পরিবারগুলিকেই চিহ্নিত করা যাবে যাদের ব্যক্তিগত জমি আছে। ওই পরিবারগুলিতে দ্বিতীয়বার ভার্মিকম্পোষ্টের পিট করা যাবে যদি পরিবারগুলি ইচ্ছুক হয় এবং ইতিমধ্যেই তাদের পরিবারে এই ধরনের পিট তৈরি হয়ে থাকে।





সার রূপে মাঠে ব্যবহারের উপযোগী হয়ে যায়। এই তরল সার সেচের জলের সঙ্গেও মিশ্রিত করা যায়। এরফলে সমগ্র চাষযোগ্য জমিতে এই তরল সার হিসাবে মাঠে ব্যবহারের উপযোগী হয়ে যায়।

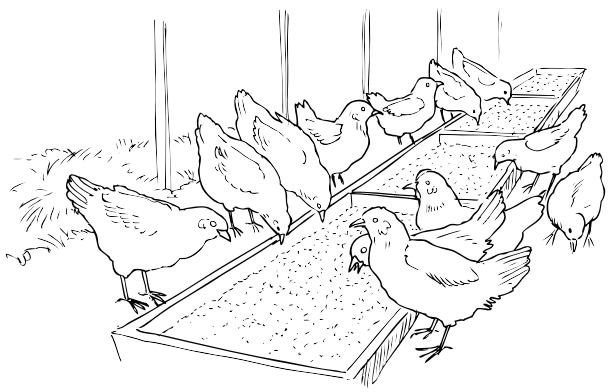
এই সারের ব্যবহার কিচেন গার্ডেন ও সবজি বাগানে করা যেতে পারে। সঞ্জীবক দ্বারা পুনরায় পিটটি পূর্ণ হতে পারে এবং আগামী ১৫ দিনের মধ্যে তা আবার জমিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। একটি সঞ্জীবক পিট তৈরি করতে আনুমানিক ২,০০০ টাকা খরচ হয়। এই কাজের ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিক, উপকরণ অনুপাত হল ৩০ : ৭০। এই কাজের জন্য শুধুমাত্র সেই পরিবারগুলিকেই চিহ্নিত করা যাবে যাদের ব্যক্তিগত জমি আছে। প্রতিটি পরিবারে সর্বাধিক তিনটি করে সঞ্জীবক পিট করা যেতে পারে।

৩) তরল জৈবসার বা সঞ্জীবক (Liquid Bio-Manures)

সঞ্জীবক হল একটি এমন তরল সার যা গোমূত্র দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। এই ধরনের স্বল্পমূল্যের সারের গাছের পুষ্টির বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অপরিসীম উপযোগিতা রয়েছে। একটি ১ মি. X ১ মি. X ১ মিটার ইঁটের পিটে ৫০ কেজি গোবর, ২০ লিটার গোমূত্র, ১ কেজি তালমিছরি, ১ কেজি ছোলা ১০০০ লিটারের জলে মিশ্রিত করা হয়। এই মিশ্রণটি ৫-৭ দিন পর্যন্ত গাঁজানো হয়। প্রতিদিন অন্তত তিনবার করে মিশ্রণটি নাড়াতে হয়। ৭ দিন পর ১০০০ লিটারের তরল সার সম্পূর্ণভাবে মিশ্রিত হয়ে যায় ও তা তরল



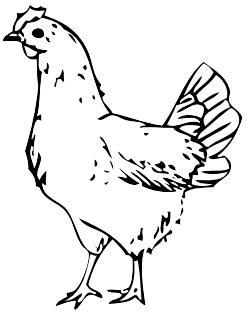
প্রাণীসম্পদ বিষয়ক কাজ (Livestock related works)



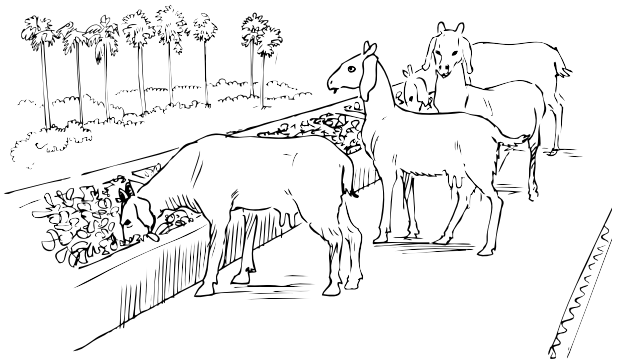
১) মুরগী খামার (Poultry Shelter)

গ্রামীণ পরিবারের কাছে বিকল্প আয় তথা পুষ্টির বিকাশের এক অন্যতম প্রধান বিষয় হল পোলট্রি। দুর্বল পরিকাঠামোর জন্য বেশির ভাগ সময়ই এই পোলট্রির পাখিরা নানান সমস্যার সম্মুখীন হয়। এর ফলস্বরূপ পাখি মৃত্যুর হার ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং গ্রামীণ পরিবারগুলির বিকল্প আয়ের পরিমাণও স্বল্প হতে থাকে। পোলট্রির পাখিদের এই রোগভোগের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে তাদের জন্য পাকা কাঠামোর আশ্রয়স্থল প্রয়োজন যা একদিকে তাদের রাতের আশ্রয়স্থল হিসাবে কাজ করবে এবং একই সঙ্গে তাদের ডিমকেও রক্ষা করবে। একটি ৭৫ বর্গমি. (দৈর্ঘ্য ৩.৭৫ মি. ও প্রস্থ ২ মি.) ঘরে ১০০ টি পাখি রাখা যায়। ৩০ সেমি. উচ্চতাসম্পন্ন ও ২০ সেমি. প্রশস্ত ইঁটের দেওয়াল ভিত্তিমূল স্তর (Plinth Level) পর্যন্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। Plinth থেকে আশ্রয়স্থলের ছাদ পর্যন্ত একটি ইঁটের পিলার তার দ্বারা আবৃত থাকে যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হল ৩০ সেমি. X ৩০ সেমি.। আশ্রয়স্থলের অপেক্ষাকৃত ছোট অংশটিতে ২০ সেমি. পুরু ইঁটের দেওয়াল থাকে যার গড় উচ্চতা ২.২ মি.। আশ্রয়স্থলের ছাদটি Steel Truss-এর দ্বারা আবৃত থাকে। ছাদটিকে অবশ্যই Galvanised লোহার পাতের হতে হবে। আশ্রয়স্থলের মেঝেটি শক্ত মোরামের হওয়া প্রয়োজন। মেঝেটি তৈরি করবার জন্য দ্বিতীয় গ্রেড ইঁট ও ১ : ৬ অনুপাত সিমেন্টের সঙ্গে প্যাকিং করে তৈরি করতে হবে। এই ধরনের পোলট্রি শেড করবার ফলে পরবর্তীকালে গ্রামীণ পরিবারগুলি ১০০ দিনের কাজ থেকে সরে এসে স্বনির্ভর হয়ে এই বিকল্প আয়কেই তাদের প্রধান জীবিকা হিসাবে বেছে নেবে।

Shed for 100 Broiller of 3 weeks' chain
(Brooder 1 Brooder 2)



- ঘরের উচ্চতা ৮ ফুট
- যথেষ্ট বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকবে
- অ্যাসবেস্টাসের ছাউনি হলেই ভাল
- পার্টিশন দেওয়ালগুলি আড়াই ফুট উঁচু হবে
- মেঝেতে ইঁটের সোলিং করে ডিপ লিটার দেওয়া হবে



২) ছাগল প্রতিপালনের ঘর (Goat Shelter)

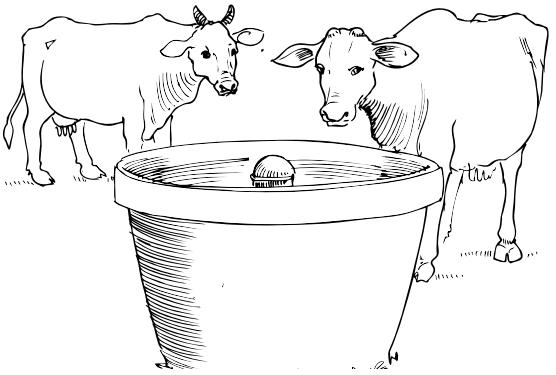
বেশিরভাগ দরিদ্র পরিবার তাদের গৃহপালিত পশুদের জন্য প্রয়োজনীয় বসবাসের পরিকাঠামো তৈরি করতে অক্ষম। এ বিষয়ে আমরা সকলেই জানি যে মধ্য ভারতের তফসিলী উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের কাছে পোলট্রি তথা গৃহপালিত পশুই তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উৎস। কিন্তু এই সমস্ত পোলট্রি তথা গৃহপালিত পশুদের সঠিক পরিকাঠামো তৈরি না করতে পারার জন্য তাদের রোগ-অসুখ লেগেই থাকে এরফলে তাদের সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা বাধাপ্রাপ্ত হয়। দুর্বল পরিকাঠামোর জন্য গৃহপালিত পশুদের দ্বারা নিষ্কাশিত বর্জ্য পদার্থ, মূত্র যা কৃষিতে জৈবসারের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে তা অত্যন্ত কম পরিমাণে পাওয়া যায়। এই কারণে গৃহপালিত পশুদের জন্য উন্নতমানের পরিকাঠামো তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরফলে একদিকে যেমন তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হবে, তেমনই অপরদিকে তাদের নিষ্কাশিত বর্জ্য পদার্থ জৈবসার হিসাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে জমির উৎপাদন ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হবে। এই পুরো ব্যবস্থাপনাটিই অত্যন্ত কম খরচে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। একটি ৭.৫ বর্গ মি. আশ্রয়স্থলে ১০টি পশুকে রাখা সম্ভব। এই আশ্রয়স্থলটির চারটি দেওয়ালের গড় উচ্চতা হবে ২.২ মি., দেওয়ালগুলি ১:৪ অনুপাতে ইঁট ও সিমেন্টের গাঁথনি দ্বারা তৈরি করতে হবে। ছাদটি লোহার পাত দ্বারা আবৃত থাকবে। মেঝেটি শক্ত মোরাম দ্বারা তৈরি করতে হবে। এই ধরনের আশ্রয়স্থল তৈরি করতে আনুমানিক খরচ ৩৫,০০০ টাকা। এই কাজটি করতে অদক্ষ শ্রমিক, উপকরণের অনুপাত হল ২৫ : ৭৫। আশা করা যায়, এই ধরনের ছাগল প্রতিপালনের ঘর পরবর্তীকালে গ্রামীণ পরিবারগুলিকে ১০০ দিনের কাজ থেকে সরে এসে স্বনির্ভর হয়ে এই বিকল্প আয়কেই তাদের প্রধান জীবিকা হিসাবে বেছে নিতে সহায়তা করবে।

Model goat shed

- ঘরের উচ্চতা ৮ ফুট
- যথেষ্ট বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকবে
- অ্যাসবেস্টাসের ছাউনি হলেই ভাল
- ছাগল দাঁড়ানোর জায়গা নেট সিমেন্টের হবে। মসৃণ হবে না
- ঘরের মেঝেতে প্রতি ১৫ ফুটে ১ ইঞ্চি ঢালু হবে

৩) গৃহপালিত পশুদের জন্য পাকা মেঝে, মূত্র ট্যাঙ্ক ও খাদ্যপাত্র নির্মাণ
(Construction of Pucca Floor, Urine Tank and Fodder Trough for cattle)

সাধারণত গৃহপালিত পশুদের জন্য যে ঘর থাকে তার মেঝেটি কাঁচা থাকার ফলে সেখানে বর্ষার সময় তাদের মল, মূত্র ও কাদায় মিলে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। এছাড়া তাদের মলমূত্র কোনও প্রকার তরল বা কঠিন জৈবসার প্রস্তুত করার পক্ষে অনুপোযুক্ত হয়ে পড়ে। যদি ঘরের মেঝেটি পাকা করা যায় তাহলে অনেক সহজে গোবর, মূত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করা যাবে। এছাড়া কাদা না হওয়ার ফলে পরিবেশ অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর হবে। বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। এছাড়া গৃহপালিত পশুদের মূত্র একত্রিত করবার জন্য একটি ট্যাঙ্ক তৈরি করা যেতে



পারে। এরফলে অনেক পরিমাণ মূত্র একসঙ্গে সংগ্রহ করা যাবে যা তরল সার হিসাবে জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এরই সঙ্গে গৃহপালিত পশুদের জন্য যদি একটি খাওয়ার পাত্র তৈরি করা যায় তাহলে খাবারের অপচয় অনেকাংশ রোধ করা যাবে। একটি ২৬.৯৫ বর্গ মিটার আয়তনের ঘরে ৬ টি পশু রাখা সম্ভব। কংক্রিট সিমেন্টের দ্বারা তৈরি পশু রাখার মেঝে, একটি খাওয়ার পাত্র (৭.৭ মি. X ০.২ মি. X ০.৬৫ মি.) এবং একটি মূত্র সংরক্ষণ ট্যাঙ্ক (২৫০ লি.) তৈরি করতে আনুমানিক খরচ ৩৫,০০০ টাকা। এই কাজটি করার ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিক, উপকরণের অনুপাত হল ৩০ : ৭০।





৪) অ্যাজোলা – একটি বিকল্প গৃহপালিত পশুখাদ্য (Azolla as Cattle-feed supplement)

অ্যাজোলা হল গৃহপালিত পশুদের জন্য এক সুষম আহার। এই ধরনের খাদ্যের মধ্যে যথেষ্ট প্রোটিন, প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড, ভিটামিন (ভিটামিন-A ও B-12) এবং ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাসিয়াম, আয়রন, কপার, ম্যাগনেসিয়ামের মতো মিনারেল আছে। শুষ্ক ওজন অনুযায়ী, এই খাদ্যে ২৫%-৩৫% প্রোটিন, ১০%-১৫% মিনারেল এবং ৭%-১০% অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে। পশুরা সহজেই এই খাদ্য হজম করতে পারে। অ্যাজোলা জলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা সরাসরিও ব্যবহার করা যায়। অ্যাজোলা গরু, মুরগী, হাঁস, ভেড়া, ছাগল, শূকর ও খরগোশের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। অ্যাজোলা ঢাকা শেডের নিচে জলের মধ্যে সহজেই উৎপাদন করা যেতে পারে। প্রাথমিকভাবে একটি ২ মি. X ২ মি. X ২ মি. মাপের পিট তৈরি করতে হয়। পিটের নিচের অংশটি প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। এরপর ১০-১৫ কেজি উর্বর মাটি ওই প্লাস্টিকের ওপর দিতে হয়। এরপর ২ কেজি গোবর ও ৩০ গ্রাম সুপার ফসফেট ১০ লিটার জলের সঙ্গে মিশ্রণ করে ১০ সেমি উঁচু করা হয়। এরপর ৫০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি অ্যাজোলা পিটের মধ্যে দেওয়া হয়। জলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাজোলা আকারে বড় হতে থাকে ও ১০-১৫ দিনের মধ্যে পিটটি অ্যাজোলা দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। এরপর প্রতিদিন ৫০০-৬০০ গ্রাম অ্যাজোলা উৎপাদিত হতে থাকে। একটি অ্যাজোলা পিট তৈরি করতে আনুমানিক ২,০০০ টাকা খরচ হয়। এই কাজের ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিক, উপকরণ অনুপাত হল ১৫ : ৮৫।

মৎস্যচাষ সম্পর্কিত কাজ (Fisheries related works)

১) সরকারি পুকুরে মাছ চাষ (Fisheries in Seasonal Water Bodies on Public Land)



দরিদ্রদের বিকল্প জীবিকা হিসাবে মৎস্যচাষ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হতে পারে। এম.জি.এন.আর.ই.জি.এস-এর মাধ্যমে তৈরি হওয়া বিভিন্ন ছোট ছোট জলাধার, ট্যাঙ্ক, পুকুর মাছ চাষের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গে এমন অনেক ছোট জলাধার আছে যা বৃষ্টির জলে পূর্ণ থাকে। এইসব জলাধারগুলিকে যদি সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় তাহলে মাছের বর্তমান উৎপাদনের ৪-৫ গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। যদি মাছের লালন-পালন করা যায় এবং সেখানে উন্নতমানের মাছের চারা (১০০ মীন বা তার বেশি) যার সংরক্ষণ ক্ষমতা প্রতি হেক্টরে ৫০০-১০০০ বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। এই ধরনের কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত

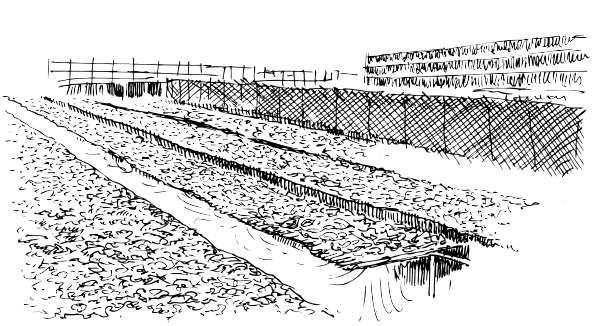


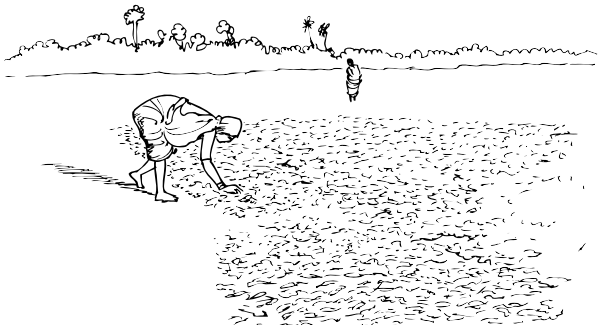
করার জন্য প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মতভাবে পুকুর খনন করা যাতে জল সংরক্ষণ করে সঠিক উপায়ে মাছ চাষ করা যায়। একটি ৫০০ কিউবিক মিটার নার্সারী পুকুর যার ট্যাঙ্ক বেড হবে ১৫০০০ কিউবিক মিটার এবং মাছ শুকানোর প্ল্যাটফর্মসহ (৩০ বর্গ মিটার) মোট আনুমানিক খরচ ১১ লক্ষ টাকা। এই কাজের ইউনিট প্রতি খরচ হবে আনুমানিক ৭৫ টাকা প্রতি কিউবিক মিটার। এই কাজের ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিক, উপকরণের অনুপাত হল ৮০ : ২০।

উপকূলবর্তী এলাকার কাজ (Works for coastal regions)

১) মাছ শুকানোর স্থান (Fish Drying Yards)

উপকূলবর্তী এলাকায় উন্নত উপায়ে মাছ শুকানোর জন্য যে কংক্রিটের উঠান বানানো হয়ে থাকে, তাকে Fish Drying Yards বলে। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সমুদ্রতীরে একটি ১০মি. X ১০মি. আয়তন বিশিষ্ট ১৫ সেমি পুরু সিমেন্ট কংক্রিট এবং তার

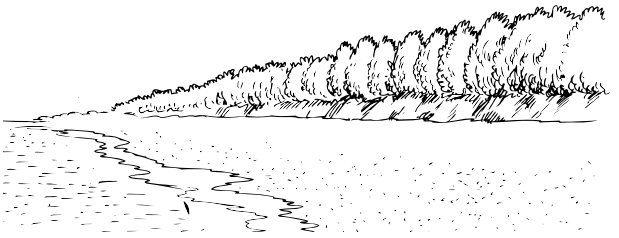




ওপর ২০ সেমি ঘনত্ব যুক্ত ইঁটের গাঁথনি দেওয়া হয়। এই সমগ্র জায়গাটি মাছের সুরক্ষার জন্য নেট দিয়ে ঘেরা থাকে। এই স্থানটি তৈরির জন্য ইউনিট প্রতি খরচ ৭৫,০০০ টাকা। এই কাজটির ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিক, উপকরণ অনুপাত হল ১৫ : ৮৫।

২) বেল্ট ভেজিটেশন (Belt Vegetation)

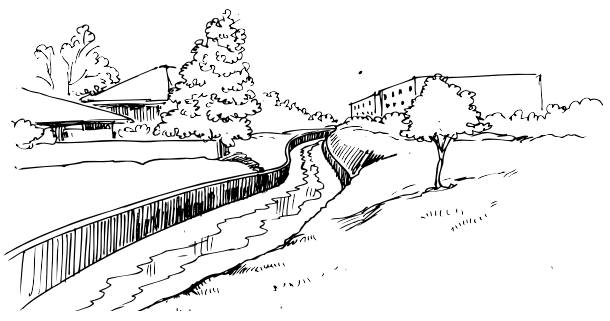
সমুদ্রপৃষ্ঠকে ক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ম্যানগ্রোভ, ক্যাসুরিনা, পাম জাতীয় বৃক্ষরোপণ খুবই উপযোগী। এই বৃক্ষরোপণের জন্য ইউনিট প্রতি খরচ হল ২০ টাকা। এই কাজটির ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিক, উপকরণ অনুপাত হল ৪০ : ২০।

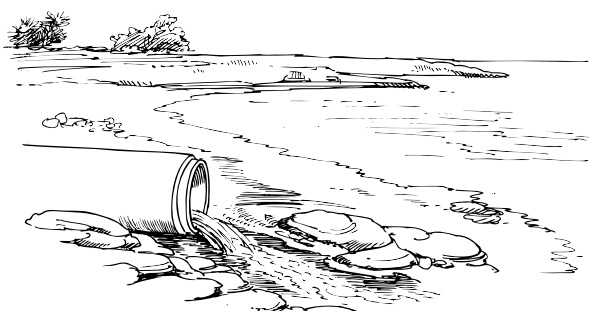


৩) উপকূলবর্তী অঞ্চলের সুরক্ষার জন্য নিষ্কাশনী ব্যবস্থাপনা

(Construction of Storm Water Drains for Coastal Protection)

উপকূলবর্তী এলাকার প্রতি ১০০ মিটার (প্রয়োজনীয় ঢাল তৈরি করে) অন্তর রাস্তার সমান্তরাল চ্যানেল তৈরি করা যা গিয়ে মূল চ্যানেলের সঙ্গে মিলিত হবে, তাহলে তা উপকূলবর্তী অঞ্চলের সুরক্ষায় উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। এই প্রকারের চ্যানেল,



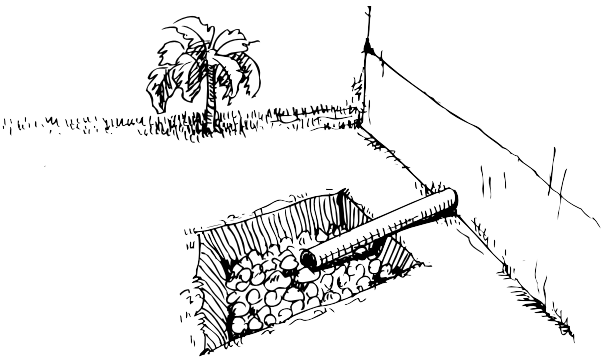


বাড়ি তৈরির পাথর দিয়ে তৈরি করা প্রয়োজন। এই চ্যানেলের প্রস্থ ০.৬০ মিটার। পাথরের আয়তন হয় ০.৬ সেমি X ০.৬ সেমি। চ্যানেলটির গভীরতা হয় ০.৬ সেমি। এই প্রকারের ১০০ মিটার দীর্ঘ চ্যানেল করতে খরচ পড়ে আনুমানিক ২,৩০,০০০ টাকা। এই কাজটির ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিক, উপকরণ অনুপাত হল ১৫ : ৮৫।

গ্রামীণ পানীয় জল সংক্রান্ত কাজ (Rural drinking water related works)

১) সোকপিট (Soak Pit)

সোকপিট হল একটি ভূ-গর্ভস্থ কাঠামো যা জলকে মাটির তলায় শুষে নিতে সাহায্য করে। এরফলে মাটির জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। একটি সোকপিট করতে আনুমানিক খরচ ২, ০০০ টাকা। এই কাজটি করার ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিক, উপকরণ অনুপাত হল ৫০:৫০। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, এই প্রকল্প একমাত্র তখনই এম.জি.এন.আর.ই.জি.এস থেকে করা যাবে যদি সেখানে NRDWP (National Rural Drinking Water Programme) থেকে সোকপিট না হয়ে থাকে। এই কাজটি ব্যক্তিগত ও সরকারি উভয় জমিতে করা যাবে। পরবর্তী সময়ে কাজটি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জমিতেই করা যাবে।





২) রিচার্জ পিট বা জলভরণ গর্ত (Recharge Pits)

রিচার্জ পিটের সহায়তায় বৃষ্টির জল ভূ-গর্ভস্থ জলস্তরকে বাড়াতে সাহায্য করে। রিচার্জ পিট বোর ওয়েলকে রিচার্জ করবার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে যার মাধ্যমে ভূ-গর্ভের জলস্তর বজায় থাকে। রিচার্জ পিটের একটি ইউনিট তৈরি করতে আনুমানিক খরচ ৫,০০০ টাকা। এই কাজটির ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিক, উপকরণ অনুপাত হল ৫০ : ৫০ এই কাজটি একমাত্র তখনই এম.জি. এন.আর.ই.জি.এস. থেকে করা যাবে যদি সেখানে NRDWP (National Rural Drinking Water Programme) থেকে তা না হয়ে থাকে। এই কাজটি ব্যক্তিগত ও সরকারি উভয় জমিতে করা যাবে। পরবর্তী সময়ে কাজটি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জমিতেই করা যাবে।

গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান সম্পর্কিত কাজ (Rural household latrines)

১) পরিবারভিত্তিক শৌচালয় (Individual Household Latrines [IHHL])

এই কাজের ক্ষেত্রে ইউনিট প্রতি ১০,০০০ টাকা খরচ। নির্মল ভারত অভিযানের NBA (Total Sanitation Campaign) অন্তর্গত সরকারি অনুদান এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৪,৬০০ টাকা এবং উপভোক্তাদের অবদান লাগে ৯০০ টাকা। এই কাজটি সম্পাদন করার জন্য ২০টি শ্রমদিবস পর্যন্ত অদক্ষ শ্রমিক ও দক্ষ শ্রমিক এবং কাঁচামাল বাবদ ১,৮০০ টাকা পর্যন্ত এম.জি.এন.আর.ই.জি.এস. থেকে নেওয়া যেতে পারে। উপভোক্তা পিছু এই প্রকল্প বাবদ এম.জি.এন.আর.ই.জি.এস থেকে ৪,৬০০ টাকার বেশি খরচ করা যাবে না। এই কাজটি করার ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিক, উপকরণ অনুপাত হল ৬০ : ৪০। এই সুবিধা শুধুমাত্র সেই পরিবারগুলিকেই দেওয়া যাবে ইতিপূর্বে যারা Total Sanitation Campaign থেকে কোনও সহায়তা পায়নি।

২) বিদ্যালয় শৌচাগার (School Toilet)

এই প্রকারের ইউনিট তৈরি করতে আনুমানিক খরচ ৩৫,০০০ টাকা। এই কাজটি করবার ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিক, উপকরণ অনুপাত হল ১০ : ৯০। যদি কোনও বিদ্যালয়ে Total Sanitation Campaign থেকে শৌচাগার তৈরি না হয়ে থাকে, তবেই এই কর্মসূচি গ্রহণ করা যাবে।

৩) অঙ্গনওয়াড়ি শৌচাগার (Anganwadi Toilets)

এই প্রকারের ইউনিট তৈরি করতে আনুমানিক খরচ ৮,০০০ টাকা। এই কাজটি করার ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিক, উপকরণ অনুপাত হল ১৭ : ৮৩। যদি কোনও বিদ্যালয়ে Total Sanitation Campaign থেকে শৌচাগার তৈরি না হয়ে থাকে, তবেই এই কর্মসূচি গ্রহণ করা যাবে।

৪) কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনা (Solid & Liquid Waste Management)

কঠিন তরল পদার্থকে যদি সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় তাহলে জনমানসের উপর অনেক সদর্থক প্রভাব পড়তে পারে। যদি কঠিন ও তরল পদার্থকে ঠিকমতো ব্যবহার করা যায় তাহলে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে মানুষ রক্ষা পাবে। প্রকাশ্যে জঞ্জাল বা বর্জ্য পড়ে থাকাটা একদিকে যেমন দৃষ্টিকটু, অন্যদিক তার মাধ্যমে সহজেই নানা ধরনের রোগ-জীবাণু মানুষের শরীরে বাসা বাঁধতে পারে। কঠিন ও তরল পদার্থের সুসংহত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যে কাজগুলি রূপায়ণ করা যায় সেগুলি হল;-

- কম্পোষ্ট পিট তৈরি করা
- এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে কঠিন ও তরল পদার্থ সংগ্রহ ও তার প্রক্রিয়াকরণ
- তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- স্বল্পমূল্যে জলনিকাশী ব্যবস্থাপনা
- সোকপিট / সোক চ্যানেল নির্মাণ
- স্থায়ী পুকুর নির্মাণ

প্রতি হাজার জনসংখ্যার ক্ষেত্রে কঠিন ও তরল পদার্থ ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সঠিক রূপায়ণ করতে হলে আনুমানিক খরচ ৫ লক্ষ টাকা। এই কাজটি করার ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিক, উপকরণ অনুপাত হল ৩৫ : ৬৫। এই কাজটি শুধুমাত্র নির্মল গ্রামগুলিতেই করা যাবে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধীয় কাজ (Flood management related works)

১) বন্যা নিয়ন্ত্রণের নালা গভীর করা ও সংস্কার করা (Deepening and Repair of Flood Channels)



দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি অন্যতম প্রধান দিক হল স্থানীয় জল নিকাশী ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা। বর্তমানে বহু বন্যাপ্রবণ গ্রামগুলিতে স্থানীয় জলনিকাশী নালাগুলিকে যদি সঠিকভাবে সংস্কার করা যায় ও সেগুলিকে মূল জলনিকাশী নালা, খাল বা বিলের সঙ্গে যুক্ত করা যায় তাহলে বন্যার জল সহজেই গ্রামের বাইরে বের হয়ে যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন বন্যাপ্রবণ গ্রামগুলির সকল স্থানীয় নালাগুলিকে আরও গভীর করা। এই কাজটি করার জন্য প্রতি মিটারে ১৮০ টাকা খরচ পড়বে। এই কাজটি করার ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিক, উপকরণ অনুপাত হল ১০০ : ০।

২) চর এলাকার নব রূপদান (Chaur Renovation)

জলাধারের কাছে যে নিচু জমি থাকে তাকে চর বলা হয়। এই চরে অনেক সময় বৃষ্টির জল জমে চরটিও জলাধারের রূপ নেয়। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় এই চরগুলি খুবই বিস্তৃত হয় এবং বেশকিছু গ্রাম এই চর সংলগ্ন এলাকায় থাকে (মুর্শিদাবাদে ডোমকল মহকুমায় জলঙ্গী ব্লক)। এই চরগুলিকে যদি যথাযথভাবে সংস্কার করা যায় তাহলে এই জলাধারে সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব। এই চর থেকে নিঃসৃত কাদাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে যদি চরের পাড়ে জমা করা যায় তাহলে সেই জমিতে কলা, পেঁপে, আম, মটর ইত্যাদি চাষ করা সম্ভব। চরে জমে থাকা জলকে সেচের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। চর সংস্কারের ক্ষেত্রে ইউনিট প্রতি আনুমানিক খরচ ৪.৭ লক্ষ টাকা প্রতি হেক্টরে। এই কাজটি করার ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিক, উপকরণ অনুপাত ১০০ : ০।

সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ (Irrigation related works)

১) ক্ষুদ্র মাঝারি নালার পুনঃপ্রতিষ্ঠা (Rehabilation Channels of Minors, Sub-Minors & Field)

খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিতকরণে তথা দারিদ্রতা হ্রাসের ক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। কিন্তু আমাদের মতো দেশে সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নের যে বিশাল সুযোগ রয়েছে তার খুব কম অংশই যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এম.জি.এন.আর.ই.জি.এস.এ এই সেচ ব্যবস্থাপনাকে উন্নত করার বড় সুযোগ রয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ছোট ছোট সেচনালা সংস্কার, ক্ষুদ্র ভাঙন সংস্কার, পাড়ের সংস্কার, বাঁধ সংস্কার ইত্যাদির কাজ করা যেতে পারে। এই কাজের জন্য প্রতি হেক্টরে আনুমানিক খরচ ৩,০০০ টাকা। এই কাজের ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিক, উপকরণ অনুপাত ৬০ : ৪০।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এলাকার মানুষকে সারা বছর ধারাবাহিকভাবে কাজের যোগান দেওয়ার জন্য একটি ঋতুভিত্তিক বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক। অর্থাৎ প্রকল্পগুলি এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে (অন্য প্রকল্পের সঙ্গে মেলবন্ধন বা Convergence ঘটানো) যাতে সারা বছর কাজ দেওয়া সম্ভব হয়। অনুমোদিত প্রকল্পগুলির একটি আনুমানিক হিসাব (Estimate) ও সম্ভাব্য কর্মদিবস তৈরির হিসাব থাকবে। রূপায়নকারী সংস্থা এই তালিকা থেকে যখন যে প্রকল্প রূপায়ণ করা সম্ভব তা জেনে বুঝে রূপায়ণ করবে।

পরিশেষে এটা বলা প্রয়োজন যে, রূপায়ণকারী সংস্থাগুলি যদি যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রূপায়িত প্রকল্পগুলির দৈন্যন্দিন তদারকি করেন, তাহলে কাজগুলির গুণগতমান সন্তোষজনক হবে এবং প্রকল্পটিকে উদ্দেশ্যপূরণের লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে যেতে পারব– এটাই আমাদের বিশ্বাস।

২) ৩০ X ৪০ মডেল

অধিক বৃষ্টিপাত প্রবণ এলাকায় সমন্বিত রেখা বিশিষ্ট বাঁধের বিকল্প হিসাবে এই বিশেষ ব্যবস্থা দেখা যায়। এছাড়া গ্রামের মানুষের পক্ষে এটি তৈরি করাও অত্যন্ত সহজ। কিন্তু কী এই ৩০ X ৪০ মডেল? এটা এমন এক পদ্ধতি, যা মাটি ও জল সংরক্ষণে সহায়তা করে। ৩০ X ৪০ মাপের (৪০ ফুট লম্বা ও ৩০ ফুট চওড়া) ৩%-৮% ঢালযুক্ত ছোট জমির বাঁধহীন এবং ধাপহীন উঁচু জায়গাগুলিকে বিভক্ত করে। এধরনের প্রতিটি জমির সর্বনিম্ন অংশে একটি গর্ত খনন করা হয় এবং গর্তটি থেকে যে মাটি পাওয়া যায় তা দিয়ে এর দুটি বাঁধ তৈরি করা হয়।



এই মডেল তৈরি করার জন্য প্রথমে টেপ, দড়ি ও চুনের সাহায্যে রিজ লাইন থেকে শুরু করে ৩০ X ৪০ ফুট জমি আলাদা করে চিহ্নিত করুন। তারপর সেই প্লটের সর্বনিম্ন অংশ সনাক্ত করে সেখানে একটি ৩ ফুট গর্ত করতে হবে। যার উপর দিকের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ৭ X ৭ ফুট হবে। এই গর্তে একটি ঢালু প্রাচীর থাকতে হবে, যার নিচের অংশের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ হবে ৫ X ৫ ফুট। পিটের গর্তের মাটি দিয়ে বাঁধ দিতে হবে। ঢাল বরাবর বাঁধের উচ্চতা ১ ফুট হওয়া উচিত, যার উপরের দিকটি চওড়ায় ১ ফুট এবং নিচের দিকটিও চওড়ায় ১ ফুট হবে। গর্তের অবশিষ্ট মাটি ঢালের দু'পাশে বাঁধ দেওয়ার কাজে ব্যবহার করতে হবে।

পতিত জমিতে অগাস্ট মাসে এই মডেল তৈরি করা যেতে পারে। কারণ বর্ষার পর মাটি নরম থাকায় গর্ত করতে সুবিধা হয়। আর জমিতে যদি খারিফ শস্য থাকে তবে সেই শস্য উঠে যাওয়ার ঠিক পরে অথবা অক্টোবর মাসে এই কাজ শুরু করা যেতে পারে।

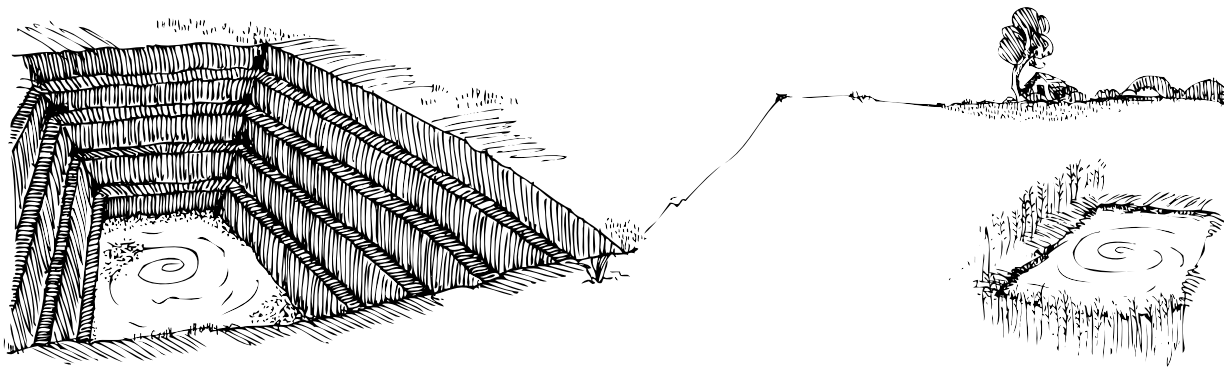
গাছ রোপণ ছাড়া যখন প্রতি ১০০ বর্গ ফুট কাজে ৬২ টাকা খরচ হয়, তখন প্রতি হেক্টর জমিতে এই কাজে আনুমানিক খরচ ৫,৬০০/- টাকা।

প্রতি হেক্টর জমিতে এই কাজ করতে ৯০টি শ্রমদিবস সৃষ্টি করা যায়।

এই মডেল ব্যবহার করে পছন্দ মতো গাছ লাগানো সম্ভব। বাঁধে ঘাস লাগানো যেতে পারে। এছাড়া এরফলে ভূমিক্ষয় রোধ হয় ও মাটির আর্দ্রতা বাড়ে, যার ফলে গাছের বৃদ্ধি তরান্বিত হয়।

৩) ৫% মডেল

মাঝারি-উঁচু জমিতে যেখানে প্রতিটি জমির নিজস্ব জলাশয় রয়েছে, সেখানে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে চাষের কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে এই মডেল খুবই উপযোগী। মুলত ওই জলাশয়ের আয়তন মূল জমির ৫ শতাংশ হতে হবে। অনেক সময় বৃষ্টির জল জমির বাইরে



বেরিয়ে যায়। কিন্তু এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বৃষ্টির জলকে জমিতেই ধরে রাখা সম্ভব। জলের অভাব দেখা দিলে এই জলই চাষের কাজে ব্যবহার করা হয়।

কীভাবে এই মডেল তৈরি করা হয় –

প্রথমে মূল জমিটির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপতে হবে। এরপর ওই একইভাবে জমিটির ৫% জায়গা চিহ্নিত করতে হবে। তারপর গর্ত করার জন্য জমির ডানদিকের কোণে মূল জমির পাঁচ ভাগের এক ভাগ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ও চার ভাগের এক ভাগ প্রস্থ বিশিষ্ট জায়গা চিহ্নিত করতে হবে। ধরা যাক, কোনও জমির দৈর্ঘ্য ১৫০ ফুট এবং প্রস্থ ১০০ ফুট। তবে পিটের জন্য ৩০ ফুট x ২৫ ফুট বা ৭৫০ বর্গ ফুট জায়গার প্রয়োজন। অসম আকৃতির জমির ক্ষেত্রে পিটের নকশা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অনুমানের উপর নির্ভর করবে।

পিটটির গভীরতা হবে ৫-৭ ফুট। তবে তা নির্ভর করে মাটির চরিত্র ও মাটির ঢালের ১:১ অনুপাতের উপর। গর্তের মাটি ক্ষেত্রের চারধারের বাঁধকে শক্তিশালী করার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্ষেত্রের চারপাশে ৪ ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট আর একটি ছোট বাঁধ তৈরি করতে হয়, যা বাড়তি কিছুটা জমা জল ধরে রাখতে পারে।

৫% মডেল তৈরির সময় –

৫% মডেল তৈরির সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হল, ডিসেম্বর থেকে জুন মাস।

৫% মডেল তৈরির খরচ –

প্রতি হেক্টরে এই মডেল তৈরির আনুমানিক খরচ প্রায় ২৫,০০০/- টাকা এবং মজুরি বাবদ খরচের হার ১০০ শতাংশ।

কতগুলি শ্রমদিবস তৈরি করা যায় -

১ হেক্টর জমিতে এধরনের ৫% মডেল তৈরি করতে ৪০০টি শ্রমদিবস সৃষ্টি করা যায়।

৫% মডেল তৈরির সুবিধা –

এই মডেল শুধু যে শস্যকে রক্ষা করে তাই নয়, জমির নিচের অংশে জলের প্রবাহকেও তরান্বিত করে। এছাড়া কৃষকের কাছে চাষের জন্য সারা বছর ধরে জল ব্যবহারের সুবিধা থাকে। তাই সে নিজের মতো করে তা ব্যবহার করতে পারে। দু'ক্ষেত্রেই কৃষিনির্ভর আবহাওয়ায় এই মডেল পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করে সফলতা পাওয়া গেছে।

৪) ডাইভারশন্ চ্যানেল (ডাইভারশন্ ড্রেন/গ্র্যাসড্ ওয়াটারওয়ে)

ডাইভারশন্ চ্যানেল হল, নতুন কোনও গতিপথ বা নালা তৈরি না করেই উপযুক্ত গতিবেগে উপরের ক্যাচমেন্টের জলকে বাহিত করে প্রাকৃতিক নিকাশী নালার সঙ্গে সংযোগ করা। জলপ্রবাহের কারণে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়, সেক্ষেত্রে ওয়াটারওয়ে ঝুকিপূর্ণ হতে পারে। যাতে বেশি জমি নষ্ট না হয়, সেজন্য অনেক কৃষক খুব সরু ওয়াটারওয়ে তৈরি করেন; তাই ক্ষয় ওই জায়গার মধ্যেই সীমিত থাকে। তাই ওয়াটারওয়ে তৈরি করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

যখন কৃষিজমি বা বাস্তুজমির জলকে আটকাতে বা অন্য পথে চালিত করে প্রাকৃতিক জলাভূমি বা নিকাশী ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করতে কোনও ওয়াটারওয়ে তৈরি করা হয়, তখন তাকে বলে ডাইভারশন্ চ্যানেল।

ডাইভারশন্ চ্যানেলের বিভিন্ন ব্যবহার –

- চাষের জমির উপরের এলাকা থেকে বাহিত জলকে আটকাতে এবং তাকে একটি ওয়াটারওয়ের দিকে চালিত করতে প্যাচগুলির উপরের অংশকে ৩০ x ৪০ মডেল বা সমন্বিত রেখা বিশিষ্ট/ গ্রেডেড বাঁধ হিসাবে ব্যবহার করা।
- চাষযোগ্য প্যাচের কোনও বিশেষ জায়গায়, প্রয়োজন বিশেষে যেখানে নীচু জমির দিকে বাহিত জলের প্রবেশ আটকানো দরকার সেখানে ওয়াটারওয়ের সঙ্গে মেশার আগে এই ডাইভারশন্ চ্যানেলকে উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমির মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
- দুটি রাস্তার সংযোগকারী অংশের নিকাশী ব্যবস্থার জলকে সংগ্রহ করে তা ওয়াটারওয়ের দিকে নিয়ে যেতে।

নকশা -

জলাশয়ের আকার, মাটির চরিত্র, জমির ঢাল এবং জমি কী কাজে ব্যবহৃত হয় তার উপর নির্ভর করে ওয়াটারওয়ের নকশা করা হয়। ওয়াটারওয়েতে বহমান জলের গতি কেমন হবে, তা চ্যানেলের প্রকারভেদের উপর নির্ভর করে।

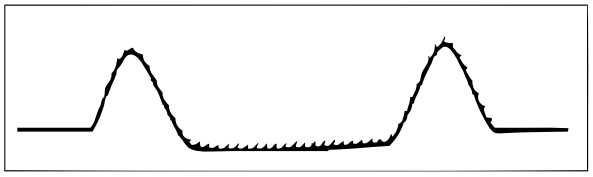


Figure 2.21: A Trapezoidal Waterway

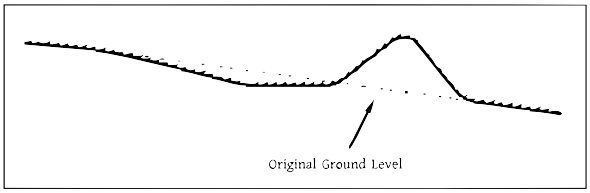


Figure 2.22: Diversion Channel Cross-Section

ওয়াটারওয়ে বা জলপথ তৈরির বিভিন্ন ধাপ -

ক) কোনাকুনিভাবে বিভাজিত ওয়াটারওয়ের প্রয়োজনীয় অংশ চিহ্নিত করা।

খ) যুক্তিগ্রাহ্য ফর্মুলার মাধ্যমে জমির সর্বোচ্চ জায়গাটি চিহ্নিত করতে হবে, যেখান থেকে জল ওয়াটারওয়ের দিকে ধাবিত হবে। জলের নিরাপদ গতি সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা রাখতে হবে। এছাড়া ওয়াটারওয়ের 'হাইড্রলিক রেডিয়াস' নির্ধারণ করতে হবে।

এরপর ওয়াটারওয়ে বা জলপথের ঢাল নির্ধারণ করতে হয়। সাধারণত, খরচ কমানোর জন্য জমির স্বাভাবিক ঢালকেই এক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়। আগাছা এড়াতে ডাইভারশন্ চ্যানেলের নতিমাত্রা খুব সামান্য হয়, প্রায় ০.৫% । 'ম্যানিং' ফর্মুলা ব্যবহার করে ঢাল ও গতিবেগ স্থির করতে 'হাইড্রলিক রেডিয়াস' নির্ণয় করতে হয়।

ডাইভারশন্ চ্যানেল তৈরির সময় –

মূলত খারিফ শস্য তোলার পর অথবা গ্রীষ্মকালে মাটি শক্ত হয়ে যাওয়ার আগে এই নির্মাণ করার উপযুক্ত সময়।

সুবিধা –

অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত এলাকায় আলাদা করে কোনও গতিপথ তৈরি না করেই বহমান জলের কিছুটা নিরাপদে বাইরে বের করে দিতে হয়। এক্ষেত্রে ডাইভারশন্ চ্যানেল বা গ্র্যাসড্ ওয়াটারওয়ে খুব উপযোগী। এছাড়া পাহাড় থেকে বয়ে আসা জলের উদ্বৃত্ত অংশ সঞ্চয় করে রেখে শস্যের সুরক্ষায় এই চ্যানেল ব্যবহার করা যেতে পারে।

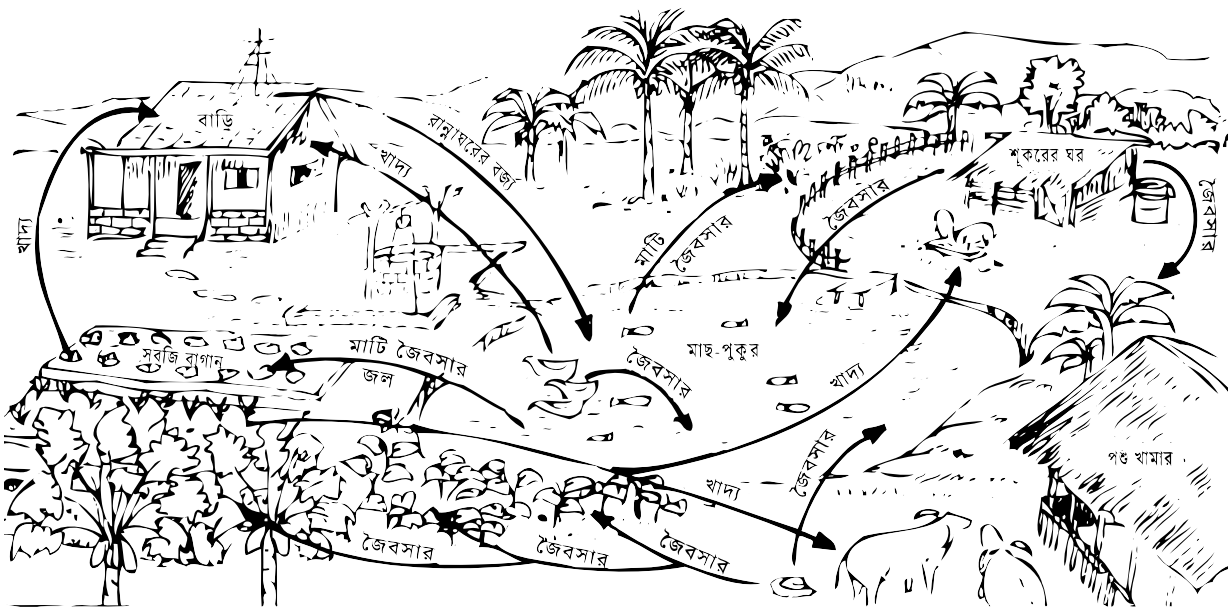
বিবিধ সম্ভাব্য উদ্যোগ

১) সুসংহত চাষ

একদিকে ক্রমশ বেড়ে চলা জনসংখ্যার চাপ, অন্যদিকে কৃষি জমির পরিমাণ কমতে থাকায় কৃষিকাজ নিয়ে চলছে নানান গবেষণা। আলোচনা হচ্ছে, ভবিষ্যতে চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে উৎপাদন অক্ষুণ্ণ রাখা নিয়ে। আর এসব ভাবনারই এক সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্যাস হল সুসংহত চাষ।

ছোট বা মাঝারি পুকুরযুক্ত জমিতে এই পদ্ধতি চাষ করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থায় চাষ করলে উৎপাদন খরচ অনেক কমে যায়। বছরের বিভিন্ন সময় একাধিক ফসল উৎপাদন হওয়ায় আয় আসতে থাকে এবং তা স্বাভাবিক পদ্ধতিতে চাষের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি হয়। কোনও একটি চাষ মার খেলেও, অন্য ফসলের উৎপাদন ভাল হলে সেই ক্ষতি পুষিয়ে যায়। কিন্তু যথেচ্ছভাবে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে জমিতে মরসুমভিত্তিক এক বা দুই ফসল চাষ বেশ ঝুকিপূর্ণ। এরফলে একদিকে যেমন নষ্ট হয় জমির উর্বরা শক্তি, অন্যদিকে প্রাথমিক অবস্থায় উৎপাদন বেশি মিললেও দিনে দিনে তা কমতে থাকে। এছাড়া কোনও মরসুমে উৎপাদন মার খেলে তারপর আর ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্ষতি সামাল দেওয়া সম্ভব হয় না।

মাটি তৈরি – সুসংহত চাষের সাফল্য মূলত পরিকল্পনামাফিক জমির উপযুক্ত ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। তবে তার আগে প্রয়োজন হয় জমি তৈরি করা। শুধু পাড় তৈরি বা তার সংস্কার নয়, প্রয়োজনে খনন করে মাছ চাষের জন্য জলাশয় সংস্কার করে তার গভীরতা আরও বাড়াতে হতে পারে। আর এই সব কাজই ১০০ দিনের কাজের আওতায় করানো যেতে পারে।



ধাপে ধাপে সুসংহত চাষ -

১) প্রাথমিক পর্যায় –

ক) মাছ চাষে - যদি জমির মধ্যেকার পুকুর বা জলাশয়ে পাড় না থাকে বা তা ভাঙা থাকে, তবে বৈশাখ মাসের আগেই ঠিক করে ফেলতে হবে এবং পাঁক থাকলে তাও ওই সময়ের মধ্যেই তুলে ফেলতে হবে। এরপর পুকুরের জলে চুন গুড়ো করে মেশাতে হবে। চুন জলের অম্লত্বের মাত্রাকে কমিয়ে দেয়। রোগ-জীবাণুকে নষ্ট করে জলের সুস্বাস্থ্য বজায়

রাখে। ফলে জলাশয়টিকে মাছ চাষের উপযোগী করে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে, সূর্যের আলো মাছের প্রধান অণুখাদ্য, তাই জলাশয়ে যেন রোদ পড়ে। জলাশয়ের ধারে বড় গাছ থাকলে তার ডালপালা ছেঁটে দিতে হবে। এরপর জলে বিঘা প্রতি ২৫০-৩০০ কেজি মহুয়ার খোল প্রয়োগ করে মৎস্যভূক বা অবাঞ্ছিত মাছ ও জলজ পোকামাকড় বিনষ্ট করতে হয়। মহুয়ার খোল দেওয়ার পর জলে ২০-২১ দিন বিষক্রিয়া থাকে। কুঁচো চিংড়ি ও জলজ পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ করতে বিঘা প্রতি ১৪০-১৫০ টি ৮-১০ সেমি মাপের ফলুই মাছের চারা ছেড়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

তবে মহুয়ার খোল ব্যবহার করলে এক্ষেত্রে আর কিছুই লাগে না। অন্যথায় গোবর, হাঁস-মুরগী বা শুকরের পচা মল ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া পাঁক তোলার পর জলাশয়ের তলদেশে বিঘা প্রতি ৩-৪ কেজি ধনচে ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে, পরে তা কোমর সমান হলে কেটে মাটিতে মিশিয়ে দিলে সবুজ সার পাওয়া যায়। যা মাটির উর্বরা শক্তিকে বৃদ্ধি করে।

খ) হাঁস/মুরগী/শুকর চাষে - বিঘা প্রতি ৬০-৭০টি হাঁস বা মুরগী এবং ৪-৫টি শুকর পালনই শ্রেয়। প্রতিটি হাঁস বা মুরগীর জন্য ০.৬-০.৭ বর্গ মিটার এবং একটি শুকরের জন্য ১.৫-২ বর্গ মিটার জায়গা দরকার। পশুপাখি পালনের ঘর কাঠ, বাঁশ, খড় ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করাই ভাল এবং ওই ঘর যেন পূর্ব বা দক্ষিণমুখী হয়। ঘরের মেঝে বালি-সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করতে হবে, যাতে তা শুকনো থাকে। ঘরে যেন পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচল করতে পারে। হাঁস, মুরগীর জন্য ধানের তুষ বা খড় দিয়ে ৩ ইঞ্চি উঁচু বিছানা তৈরি করতে হয়। পানীয়র পাত্রটি যেন ভারী হয়, যাতে কখনই তা উলটে না যায়। ৩০-৪০ সেমি ব্যাসযুক্ত ও উচ্চতার পাত্র হলে ভাল। মুরগীদের জন্য কাঠ বা বাঁশ দিয়ে একটু উঁচু করে দাঁড় করে দেওয়া যেতে পারে, কারণ রাতে এরা এর উপর থাকতে পছন্দ করে।

ঠাণ্ডা ও বৃষ্টির ছাট এড়ানোর জন্য শীতে ও বর্ষায় ঘরের চারপাশে চটের পর্দা দিতে হবে। একটি ৩ ফুট X ৪ ফুট X ৪ ফুট গর্ত বা চৌবাচ্চা তৈরি করে তাতে হাঁস, মুরগী ও শুকর মল পচাতে হবে। পচা মল সপ্তাহে একবার জলাশয়ে ছিটিয়ে দিলে তা মাছের অণুখাদ্য হবে। এছাড়া সবজি চাষে সার হিসাবেও এই মল উপযোগী।

গ) গাছ লাগিয়ে বেড়া তৈরি – সুসংহত চাষের জন্য মূল জমির চারপাশে ও পুকুরের চারধারে বেড়া দেওয়া প্রয়োজন। তবে সেই বেড়া জীবন্ত হলে তা থেকেও আয়ের সম্ভাবনা থাকে। মূল বেড়া করার ক্ষেত্রে বকফুল, সুবাবুল, সুপারি, কামরাঙা জাতীয় মাঝারি উচ্চতার গাছ লাগানো যেতে পারে। এই গাছে কিছু লতা জাতীয় গাছ যেমন, খামালু, কামরাঙা শিম, মাখন শিম, শাঁকালু, কাঁকরোল, শসা, গাঁদাল ইত্যাদি গাছ চড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। মাঝারি উচ্চতার গাছগুলির মাঝে মাঝে বা ভিতরের দিকে স্বল্প উচ্চতার কিছু গাছ যেমন, শিউলি, কারিপাতা, বাসক, নিশিন্দা ইত্যাদি লাগানো যায়। যে গাছগুলির নিচে খানিকটা ছায়া সহ্য করতে পারে এমন কিছু গাছ লাগানো যেতে পারে, যেমন আনারস, ঘৃতকুমারী, হলুদ, আদা ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে, বেড়ার গাছ বাছার সময় কোন দিকে কী গাছ লাগানো হবে তা ঠিক করার ক্ষেত্রে দেখতে হবে যেন রোদ পড়ার কোনও অসুবিধা না হয়।

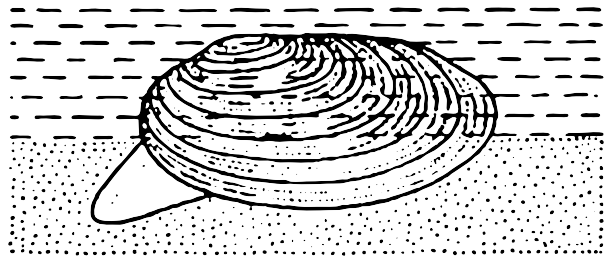
সবজি বা ফল চাষে –

ভিতরের দিকে মাটি তৈরি করে বেড করে বা সমতল মাটিতে মরসুম অনুযায়ী বিভিন্ন সবজির চাষ করা যেতে পারে। জলাশয়ের পাড়ে বাইরের ও ভিতরের দিক থেকে ৬-৮ ইঞ্চি ছেড়ে সবজি লাগানো খুবই উপযোগী। এতে পাড় ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না। সবজি চাষের জন্য পাতা পচা সার, গোবর পচা সার, হাঁস-মুরগীর মল পচা ব্যবহার করে জমি তৈরি করলে তাতে ফলন ভাল হয়। জলাশয়ের চারকোণায় কলা, নারকেল বা সুপারি গাছ লাগানো যেতে পারে। এছাড়া জলাশয়ের পাড়ের বাইরের দিকের ঢালের নীচ ও সংলগ্ন জায়গার সীমানা বরাবর করমচা বা পাতিলেবু ঘন করে বসানো যায়। জলাশয়ের ভিতর দিকের ঢালে মাচা করে বা ধাপ করে সবজি চাষ করা যেতে পারে। মাচার ক্ষেত্রে জলের প্রায় ৪০ ভাগই মাচার নিচে থাকতে পারে। বাকি ৬০ ভাগ জলে সরাসরি রোদ পড়া দরকার, যাতে সুস্থ জলজ পরিবেশ বজায় থাকে। এই মাচাতে যে কোনও লতানো সবজি, যেমন পুঁই, কুমড়ো, লাউ, চিচিঙ্গে, করলা, উচ্ছে, কুদরি, চালকুমড়ো ইত্যাদির চাষ করা যেতে পারে। পাড়ের মাটি যাতে না ভাঙে তারজন্য ভিতরের ঢালে পশুখাদ্যের উপযোগী বিভিন্ন ঘাস লাগানো যায়। যেমন, প্যারা ঘাস। জলাশয় সংলগ্ন উঁচু জায়গায় তাড়াতাড়ি ফল দেয়, এমন মাঝারি আকারের কিছু ফল গাছ যেমন, লিচু, পেয়ারা, সবেদা ইত্যাদি গাছ বসানো যেতে পারে।

সার ও পশুখাদ্য –

সবজি ও অন্যান্য গাছে সারের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে, সুসংহত চাষের জমিতেই একটি ভার্মি কম্পোষ্ট বা কেঁচোসারের পিট তৈরি করা যেতে পারে। এছাড়া মূল জমিতে হাঁস, মুরগী বা শুকর পালনের পরিকল্পনা থাকলে সেখানে উন্নত পশুখাদ্য হিসাবে অ্যাজোলার চাষও করা হতে পারে। আর এই দুই কাজই ১০০ দিনের কাজের অধীনে করানো সম্ভব।

২) মুক্তো চাষ



মুক্তোকে একটি প্রাকৃতিক রত্ন হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং মূলত মোলাস্ক বা এই প্রজাতির অন্য জলজ প্রাণী থেকে মুক্তো উৎপন্ন হয়। এই ধরনের মুক্তোর অত্যাশ্চর্য নান্দনিক সৌন্দর্য্য থাকার কারণে গোটা পৃথিবীতে এর জনপ্রিয়তা অসীম এবং বাজারে ভাল দামে তা বিক্রি হয়। প্রাকৃতিক মুক্তো সাধারণত সমুদ্রে পাওয়া যায়। তবে চাষ করে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এই মুক্তো সংগ্রহ করতে হয়।

বাজারে সাধারণত প্রাকৃতিক মুক্তো, চাষ করা মুক্তো, চাষ করা জাপানি মুক্তো, মিষ্টি জলের মুক্তো, সামুদ্রিক বা লবণাক্ত জলের মুক্তো, কেশী মুক্তো এবং মেব মুক্তো পাওয়া যায়। মুক্তো বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে। তবে সম্পূর্ণ গোলাকার মুক্তোর দাম বাজারে সবচেয়ে বেশি। প্রাকৃতিকভাবে, সামুদ্রিক জলে এবং মিষ্টি জলে, এই তিনভাবে মূলত মুক্তোর চাষ হয়ে থাকে।

মুক্তো উৎপাদকারী দেশ –

চিন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভিয়েতনাম, ভারত, আরব আমিরশাহী, আমেরিকা, ফিলিপাইনস্, ফ্রান্স, মায়ানমার এবং ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুক্তো উৎপাদনকারী দেশ।

মূলত তিনটি প্রজাতির ঝিনুক থেকে ভারতে মিষ্টি জলে মুক্তোর চাষ হয়। এই প্রজাতির ঝিনুকগুলির বিজ্ঞানসম্মত নাম হল, Lamellidens marginalis, L. corrianus এবং Parreysia corrugata

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই 'Pearl'-কে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। হিন্দিতে একে বলে মোতি, বাংলায় মুক্তো, তেলেগুতে মুথায়ালু, মালায়ালমে মুত্তুল, কন্নড়ে মুত্তুগালু এবং তামিলে বলে মুত্তুক্কাল।

মুক্তো চাষ করার আগে অবশ্যই লক্ষণীয় –

মুক্তো চাষ করার আগে মনে রাখতে হবে, এই চাষে সফলতা পেতে হলে দীর্ঘ সময় ধরে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ প্রয়োজন।

অধিক উৎপাদন ও লাভের জন্য ভাল জাতের মুক্তোই শেষ কথা।

ভাল জাতের মুক্তো উৎপাদনের উপযুক্ত পরিবেশ –

১. নির্ভরযোগ্য সুত্রের 'Pearl oyster'
২. যথাযথ জায়গা
৩. মুক্তো খামার তৈরি ও তা চালাতে পর্যাপ্ত অর্থের যোগান
৪. গ্রাফটিং পদ্ধতি ব্যবহারের সুবিধা
৫. সঠিকভাবে বাজারজাত করার যোগ্যতা

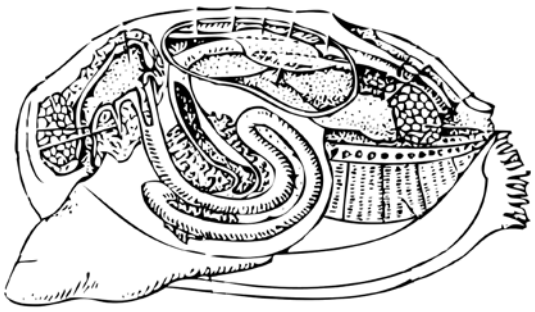
ধাপে ধাপে স্বচ্ছ জলে মুক্তো চাষ – মিষ্টি জলে মুক্তো চাষের প্রক্রিয়াতে পরপর ছ'টি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ থাকে। ধাপগুলি হল, ১) ঝিনুক সংগ্রহ ২) অস্ত্রোপচারের আগের প্রস্তুতি ৩) অস্ত্রোপচার ৪) অস্ত্রোপচারের পরের যত্ন ৫) জলাশয়ে চাষ এবং ৬) মুক্তো সংগ্রহ বা বের করা

১) ঝিনুক সংগ্রহ -

মিষ্টি জলের জলাশয় যেমন, নদী, পুকুর ইত্যাদি থেকে সুস্থ ঝিনুক সংগ্রহ করা হয়। হাতে করে ঝিনুকগুলি সংগ্রহ করে বালতিতে বা জলপূর্ণ পাত্রে রাখা হয়। মুক্তো চাষের জন্য ব্যবহৃত আদর্শ ঝিনুকের আকার সামনে থেকে পিছন পর্যন্ত ৮-১০ সেমি হতে হবে।

২) অস্ত্রোপচারের আগের প্রস্তুতি -

সংগৃহীত ঝিনুকগুলিকে অস্ত্রোপচারের আগে ২-৩ দিন গাদাগাদি করে পুরনো কলের জলে, লিটার প্রতি একটি ঝিনুকের অনুপাতে রাখা হয়। অস্ত্রোপচারের আগে এই পদ্ধতিটির মূল উদ্দেশ্য ঝিনুকের অ্যাডাক্টার পেশীগুলিকে দুর্বল করা। যা অস্ত্রোপচারের সময় ঝিনুকগুলিকে সহজে নাড়াচাড়ায় সাহায্য করে।



৩) ঝিনুকের অস্ত্রোপচার -

অস্ত্রোপচারের জায়গা বিশেষে স্থাপন সাধারণত তিন ধরনের হয়। ম্যাণ্টল গহ্বরে স্থাপন, ম্যাণ্টল কোষকলায় স্থাপন ও যৌনগ্রন্থীয় স্থাপন। অস্ত্রোপচার দ্বারা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান বস্তু হল, পুঁতি বা কেন্দ্রকণা। যা ঝিনুকের খোলা বা অন্য কোনও চুনযুক্ত বস্তুর দ্বারা গঠিত হয়। যৌনগ্রন্থীয় স্থাপন পদ্ধতির জন্যও গ্রাফট্ বা জোড় তৈরি করতে হয়। প্রথমে ঝিনুকের যৌনগ্রন্থির ধারে কাটতে হয়। তারপর যৌনগ্রন্থিটিতে একটা জোড় এবং তার সঙ্গে একটি কেন্দ্রকণা (২-৪ মিমি ব্যাসের) এমনভাবে প্রবেশ করানো হয়, যাতে জোড় এবং কেন্দ্রকণা নিবিড়ভাবে পরস্পর সংলগ্ন থাকে। এমনভাবে যত্ন নেওয়া হয় যাতে কেন্দ্রকণাটি জোড়ের বাইরের এপিথেলিয়াল স্তরের সঙ্গে লেগে থাকে এবং অস্ত্রোপচারের সময় অন্ত্র কেটে না যায়।

৪) অস্ত্রোপচারের পরের যত্ন -

স্থাপন করা ঝিনুকগুলি অস্ত্রোপচারের পরে অ্যান্টিবায়োটিক এবং প্রাকৃতিক খাবার দিয়ে যত্ন করার জায়গায় নাইলনের ব্যাগে ১০দিন রাখা হয়। ইউনিটগুলি প্রতিদিন পরীক্ষা করতে হয়। মরে যাওয়া যে ঝিনুকটি বা ঝিনুকগুলি কেন্দ্রকণাকে প্রত্যাখ্যান করে সেগুলিকে বের করে নেওয়া হয়।

৫) জলাশয়ে চাষ –

অস্ত্রোপচার পরবর্তী যত্নের পর স্থাপন করা ঝিনুকগুলিকে জলাশয়ে ছাড়া হয়। ঝিনুকগুলিকে নাইলনের ব্যাগে রাখা হয় (একটি ব্যাগে দুটো করে) এবং বাঁশের বা পিভিসি পাইপ থেকে ঝুলিয়ে জলাশয়ে ১ মিটার গভীরতায় রাখা হয়।

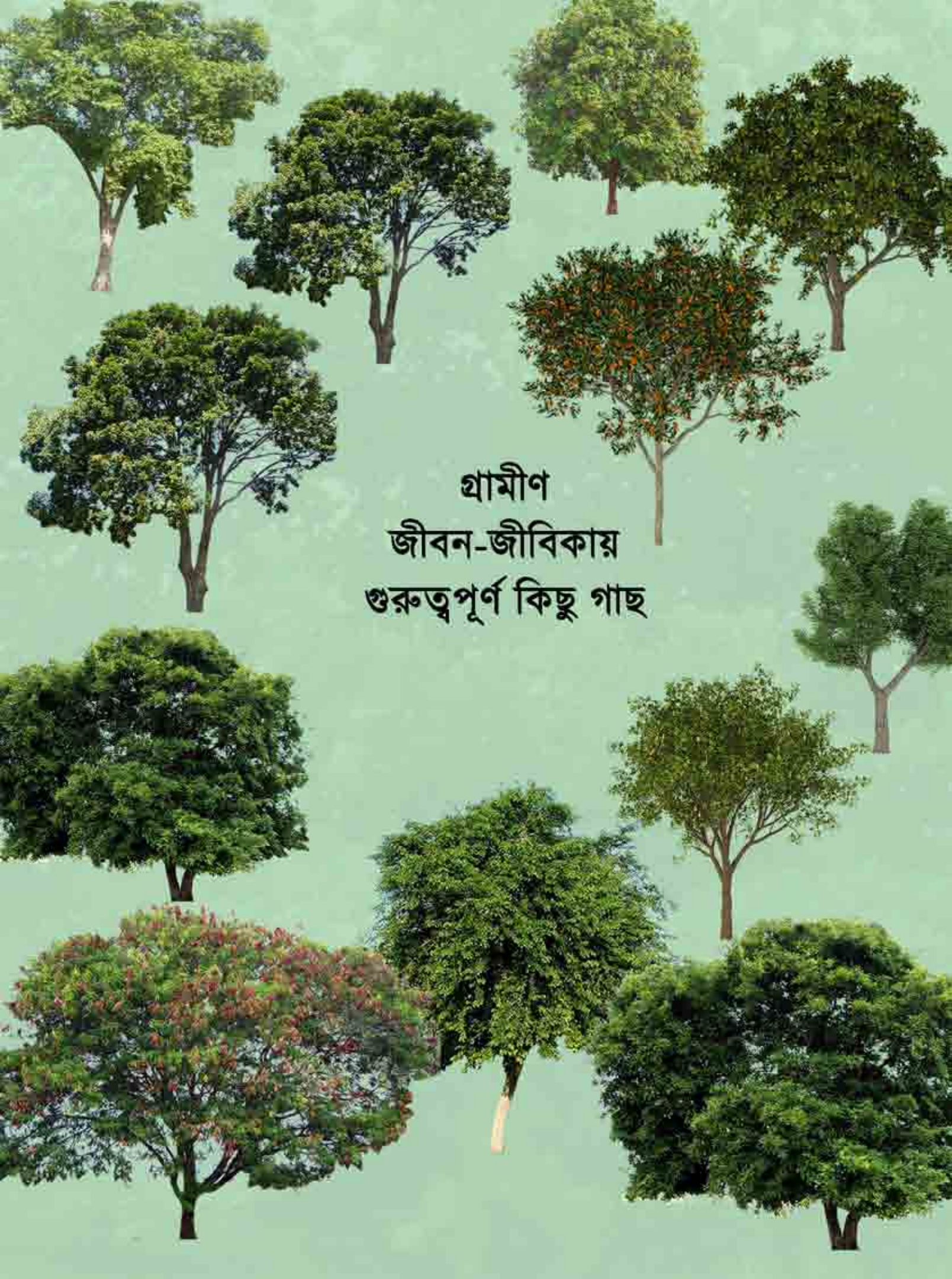
৬) মুক্তো সংগ্রহ –

চাষ শেষে ঝিনুক থেকে মুক্তো সংগ্রহ করতে হয়। ম্যান্টল টিস্যু থেকে মূলত এই মুক্তো বের করতে হয়। যদিও বিভিন্ন ধরনের মুক্তো বিভিন্ন অস্ত্রোপচার পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়;-

ক) ঝিনুকের খোলকের সঙ্গে সংযুক্ত অর্ধ-গোলাকার মুক্তো ম্যান্টল ক্যাভিটি পদ্ধতিতে।

খ) খোলকের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, এমন ছোট-অনিয়মিত মুক্তো ম্যান্টল টিস্যু পদ্ধতিতে।

গ) খোলকের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, এমন বড়-অনিয়মিত অথবা গোলাকার মুক্তকে গোনাডাল পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়।


গ্রামীণ
জীবন-জীবিকায়
গুরুত্বপূর্ণ কিছু গাছ

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়

বিভিন্ন ফল গাছ চাষের সম্ভাবনা

প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক জীবিকায়, বিশেষ করে ভূমিহীন গরিব পরিবারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গাছের গুরুত্ব অপরিসীম। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবহার উপযোগী গাছের মধ্যে ফল গাছ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ এই ফল একদিকে যেমন গরিব পরিবারে পুষ্টির জোগান দেয়, তেমন অন্যদিকে তাদের সামনে খুলে দিতে পারে বাড়তি আয়ের পথও।

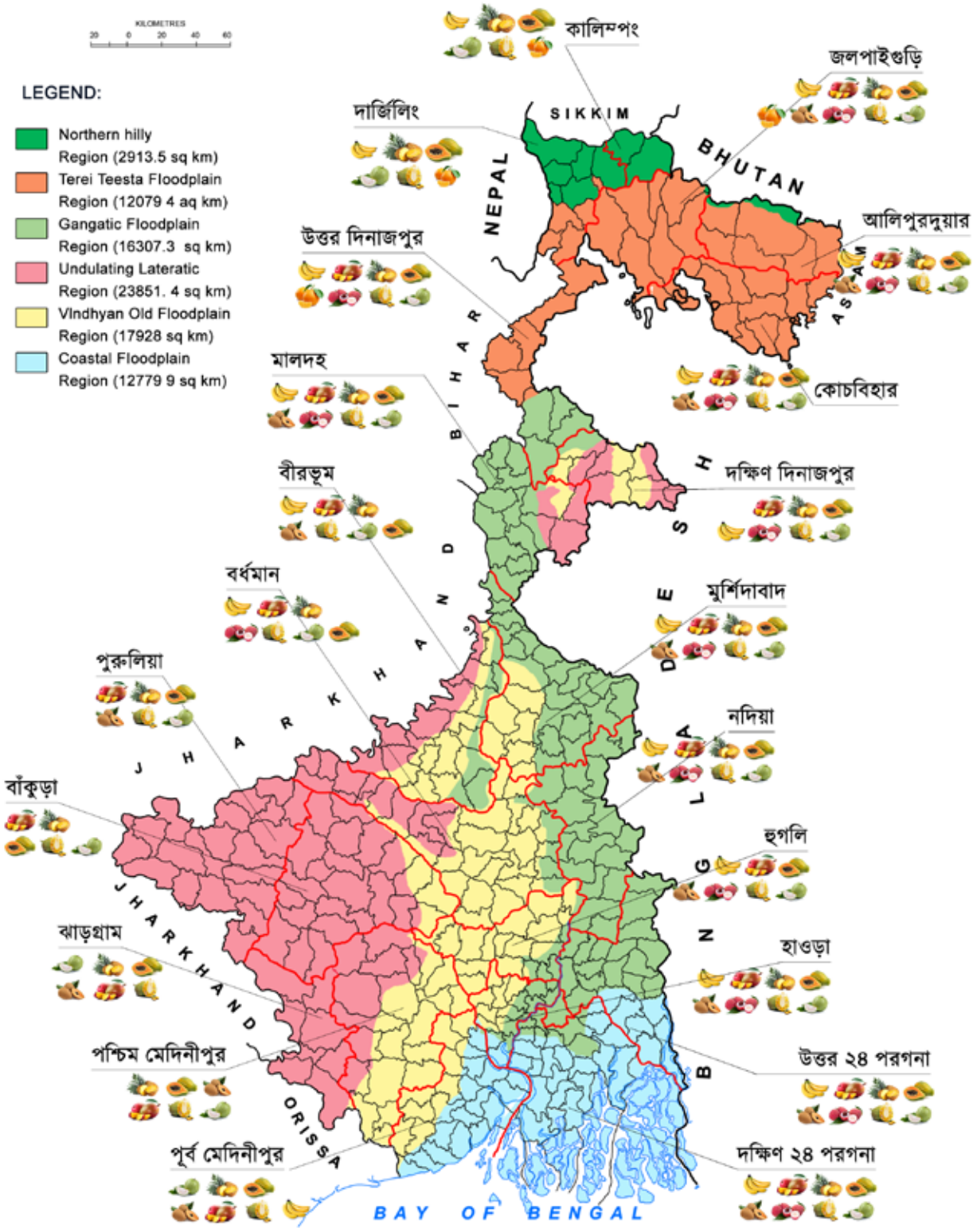
জেলাওয়াড়ি মানচিত্রে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শুধুমাত্র কয়েকটি ফল যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হয়। অথচ এর বাইরে আরও অনেক ফল গাছের সম্ভাবনা রয়েছে যা নিয়ে ইতিমধ্যেই আমাদের রাজ্য ও বাংলাদেশে সফলভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। আবার পুষ্টিগুণ সম্পন্ন অনেক দেশি ফলের গাছ রয়েছে যা আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। ১০০ দিনের কাজের সুযোগ নিয়ে এইসব হারিয়ে যাওয়া ফলের গাছের ব্যাপকতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

ফল গাছের ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন, ক্ষুদ্র পরিসরের মাটি ও আবহাওয়া (micro-climate) বিচার করলে অনেক জেলাতেই অনেক ফল গাছ চাষের সম্ভাবনা রয়েছে।

নিচে তালিকার মাধ্যমে এমন কয়েকটি ফল গাছের নাম তুলে ধরা হল এবং বইয়েও ওই গাছগুলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ফল ছাড়াও অন্যান্য অনেক গাছ রয়েছে, যার সবজি হিসাবে বা গ্রামীণ জীবন-জীবিকায় অথবা শিল্পের জোগানে যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষ করে গ্রামীণ গরিব পরিবারের প্রাণীপালনকে আরও লাভজনক ও প্রসারিত করতে উন্নতমানের সবুজ পশুখাদ্য উৎপাদনের ভূমিকা এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য।

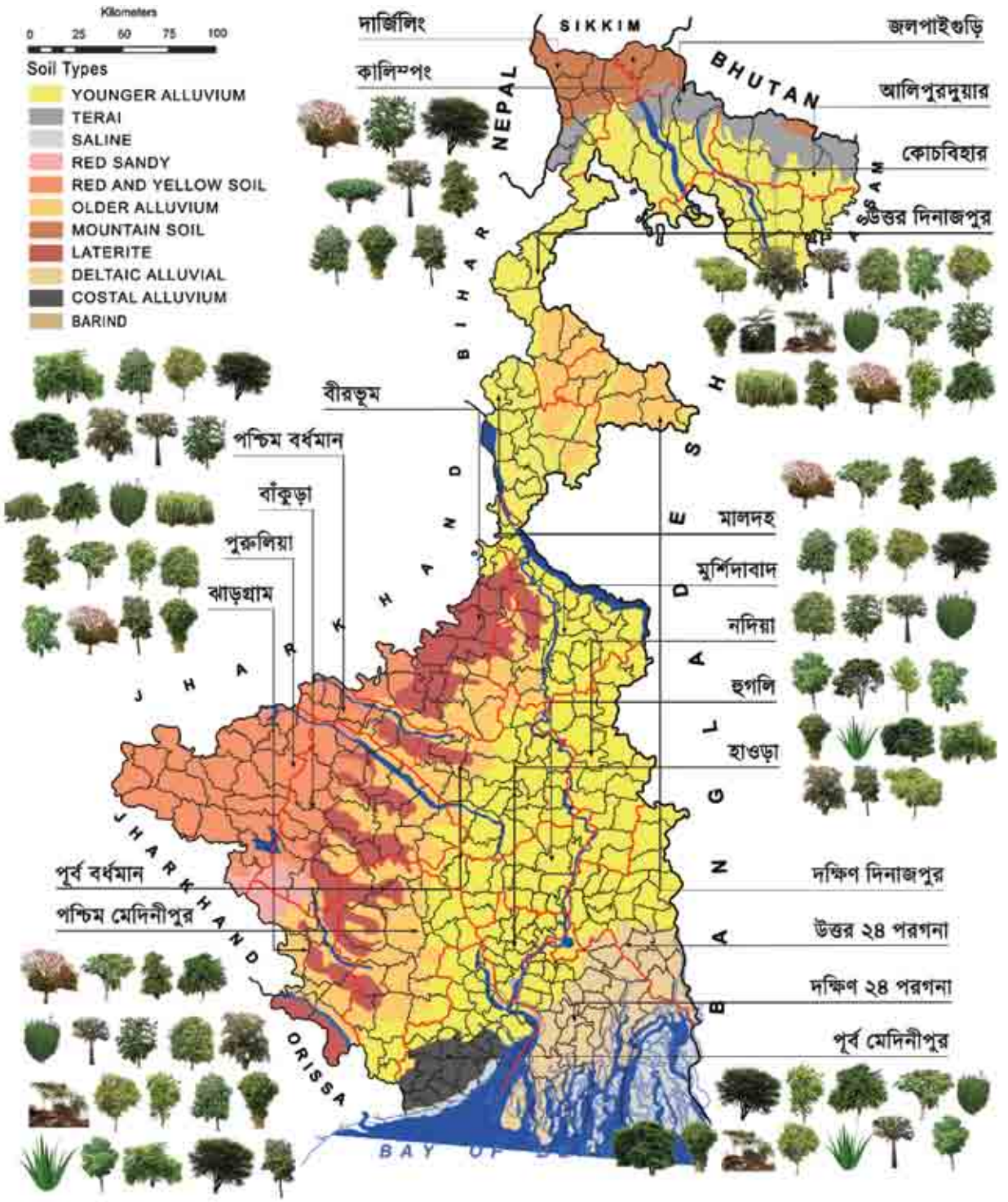
কিছু সম্ভাবনাময় ফলের গাছ	লুপ্তপ্রায় কিছু ফলের গাছ	প্রচলিত অন্যান্য ফলের গাছ		বাজারে বহুল প্রচলিত ফল
বিলাতি খেজুর	নোনা	নারকেল	বেল	কলা
মলটা	ফলসা	কাজু বাদাম	কতবেল	পেয়ারা
ডুমুর	বনটেপারি	মুসাম্বি	কাঠ বাদাম	কাঁঠাল
স্ট্রবেরী	গাব	জাম	বাতাবী লেবু	লিচু
ব্লুবেরী	গোলাব জাম	কুল ও আপেল কুল	সুন্দরবনের কেওড়া	কমলালেবু
ড্রাগন ফল	লটকন	আমড়া	কাঁচকলা	আম
কিউই	বেদানা	বিলাতি আমড়া	কাগজি বা পাতি লেবু	পেঁপে
ব্রেডফ্রুট	আতা	জামরুল	তেঁতুল	আনারস
বিলাতি জলপাই	দেশি খেজুর	কামরাঙা	দেশি জলপাই	সবেদা
	তাল	করমচা	চালতা	

অ্যাগ্রো-ক্লাইমেটিক জোন অনুযায়ী রাজ্যের
বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন ফল গাছ চাষের কম-বেশি অবস্থান



Map adapted from – West Bengal census administrative atlas, 2011 / Redefined agro-climatic sub-region of West Bengal, developed by Central remote sensing laboratory, Directorate of Agriculture Department, Government of west Bengal / West Bengal State Marketing Board

মাটির চরিত্র অনুযায়ী রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়
ফল ও সবজি ছাড়া অন্যান্য গাছের সম্ভাবনা



Map adapted from – West Bengal census administrative atlas, 2011 and Soil Types as delineated in 'Water Resource and its Quality in West Bengal, West Bengal Pollution Control Board, 2009 (Page 12)

মাটির চরিত্র অনুযায়ী পাশের ম্যাপে উল্লিখিত ফল ও সবজি বাদে জেলাওয়াড়ি নথিভুক্ত ও অন্যান্য গাছের সম্ভাবনা;-

জেলার নাম	সম্ভাবনাময় গাছের নাম
দার্জিলিং, কালিম্পং	শাল, সেগুন, চা, বাঁশ, তেজপাতা, শিমূল, গামার, বাবলা, বহেড়া
বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম	করঞ্জ, লেমন ঘাস, তেজপাতা, বাবলা, মহুয়া, ভেটিভার, আমলকী, শিমূল, অর্জুন, শাল, বহেড়া, শিশু, কুসুম, গামার, সেগুন, নিম, আকাশমণি, বাঁশ, শিউলি, নেপিয়ার
পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর	শিমূল, শাল, তেজপাতা, মহুয়া, কুসুম, গামার, বাঁশ, বাবলা, নিম, শিশু, অর্জুন, ভেটিভার, মেহগনি, সেগুন, অ্যালোভেরা, আকাশমণি, কেওড়া, বহেড়া, আমলকী
দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর	বাবলা, নিম, শিশু, অর্জুন, ভেটিভার, মেহগনি, সেগুন, অ্যালোভেরা, বাঁশ, করঞ্জ, আকাশমণি, কেওড়া
মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলি, হাওড়া	বাবলা, শিমূল, নিম, শিশু, আমলকী, গামার, মহুয়া, অর্জুন, বহেড়া, হরিতকী, তেজপাতা, করঞ্জ, বাঁশ, ভেটিভার, কুসুম, অ্যালোভেরা, সেগুন, আকাশমণি, শাল, শিউলি, চন্দন, লম্বু, মেহগনি
কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর	শাল, শিমূল, বেত, নিম, শিশু, কেওড়া, অর্জুন, গামার, সেগুন, বাঁশ, নেপিয়ার, ভেটিভার, কুসুম, শিউলি, আকাশমণি, মহুয়া, হরিতকী

ফল ও সবজি ছাড়া রাজ্যের কয়েকটি জেলায় নথিভুক্ত অন্যান্য কিছু গাছ;-

জেলার নাম	নথিভুক্ত গাছের নাম
দার্জিলিং	শাল, সেগুন, চা, বাঁশ, তেজপাতা, শিমূল, গামার, বাবলা
জলপাইগুড়ি	শাল, শিমূল, নিম, শিশু, হরিতকী, বেত, কেওড়া, অর্জুন, বহেড়া, আমলকি, গামার, সেগুন, বাঁশ, নেপিয়ার, ভেটিভার, করঞ্জ, কুসুম, শিউলি, আকাশমণি, মহুয়া
মুর্শিদাবাদ	বাবলা, শিমূল, নিম, শিশু, আমলকি, গামার, মহুয়া, অর্জুন, বহেড়া, হরিতকী, তেজপাতা, করঞ্জ, বাঁশ, ভেটিভার, কুসুম
নদিয়া	শিমূল, অর্জুন, বহেড়া, হরিতকী, শাল, আমলকি, শিশু, করঞ্জ, তেজপাতা, নিম, আকাশমণি, বাবলা, মহুয়া, কুসুম, গামার, সেগুন, বাঁশ, ভেটিভার, মেহগনি, লম্বু, চন্দন, শিউলি
বর্ধমান	শিমূল, অর্জুন, বহেড়া, শাল, আমলকি, শিশু, করঞ্জ, তেজপাতা, নিম, আকাশমণি, বাবলা, মহুয়া, কুসুম, গামার, সেগুন, বাঁশ, ভেটিভার,
বীরভূম	শিমূল, অর্জুন, বহেড়া, শাল, আমলকি, শিশু, করঞ্জ, লেমন গ্রাস, অ্যালোভেরা, তেজপাতা, নিম, আকাশমণি, বাবলা, মহুয়া, কুসুম, সেগুন, বাঁশ, শিউলি
বাঁকুড়া	বাবলা, শিমূল, নিম, শিশু, আমলকি, গামার, মহুয়া, অর্জুন, বহেড়া, হরিতকী, তেজপাতা, করঞ্জ, বাঁশ,
পুরুলিয়া	শিমূল, অর্জুন, বহেড়া, শাল, আমলকি, শিশু, করঞ্জ, কুসুম, গামার, সেগুন, নিম, আকাশমণি, মহুয়া, বাঁশ, শিউলি, নেপিয়ার
পশ্চিম মেদিনীপুর	অর্জুন, মহুয়া, শিমূল, বহেড়া, বাঁশ, নিম, আমলকি
পূর্ব মেদিনীপুর	বাবলা, নিম, শিশু, অর্জুন, করঞ্জ, বাঁশ, ভেটিভার, মেহগনি, সেগুন, অ্যালোভেরা, আকাশমণি, কেওড়া
হাওড়া	শিমূল, নিম, শিশু, গামার, মহুয়া, অর্জুন, করঞ্জ, বাঁশ, ভেটিভার, মেহগনি, তেজপাতা, সেগুন, অ্যালোভেরা

তথ্যসূত্র - Report on forest resources of Darjeeling district forest survey of India eastern zone Calcutta 1997; Flora of Howrah district - Tripti Bouri* and Ambarish Mukherjee Centre for Advanced Study, Department of Botany, University of Burdwan, West Bengal, India; Documentation of traditional knowledge and indigenous use of non-timber forest products in Durgapur forest range of Burdwan district, West Bengal; Flora of Howrah District - S.S. R.Bennet, 1979; Flora of Murshidabad District - D.N. Guhabaksi; Ethnobotanical survey of folklore plants used in treatment of snakebite in Paschim Medinipur district, West Bengal - Sumana Sarkhel; Vegetation Ecology of Coastal belt of Khejuri area of Purba Medinipur District with special reference to Hijli coast, West Bengal, India - Debabrata Das and Manika Das; An Analytical Study on the Phytoresources and Vegetation Ecology of Coastal Medinipur of West Bengal in India, Rabin Das, Research Scholar of Vidyasagar University, Midnapore, West Bengal and Assistant Professor of Geography, Bajkul Milani Mahavidyalaya, West Bengal, India; Study of angiospermic flora of coastal belt of Digha, West Bengal, India Achintya Kumar Samanta, Sauris Panda Dept. of Botany, Ramnagar College, Purba Medinipur, West Bengal.

মিশ্র ফলের বাগান

ফলের নাম	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
আম												
লিচু												
কলা												
আনারস												
পেয়ারা												

সূত্র – ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিস সার্ভে, ওয়েস্ট বেঙ্গল

উপরের টেবিলটি আম, লিচু, আনারস, কলা ও পেয়ারা সংগ্রহের সময়কালকে বর্ণনা করছে। হালকা ধূসর রঙের অংশ দিয়ে ফলটি কখন থেকে আমরা পেতে শুরু করি ও তা কতদিন পর্যন্ত পাওয়া যায় তা দেখনো হয়েছে এবং ফলটি যে সময়ে সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত হয় তা বোঝাতে টেবিলে গাঢ় ধূসর রং ব্যবহার করা হয়েছে।

জমির পরিমাণ অনুযায়ী মিশ্র ফলের বাগান পরিকল্পনা করতে হয়। এরপর দেখতে হয়, ওই পরিমাণ জমিতে লাগানো সম্ভব গাছগুলির ফসল সংগ্রহের সময়। লাভজনক বাগান তৈরির জন্য গাছ বাছাইয়ের সময় সঠিক ও উন্নত জাতের পাশাপাশি বছরভর যেন বাগান থেকে কোনও না কোনও ফল পাওয়া যায় তাও নজরে রাখতে হয়। এরফলে বাগানে কৃষকের নিয়মিত যাতায়াতে রক্ষণাবেক্ষণ অনেক ভাল হয়। আবার বছরভর আয়ও বজায় থাকে।

সফল বাগান তৈরির জন্য মাটির চরিত্র এবং জমিতে রোদ-ছায়ার পরিমাণ বুঝে নিতে হয়। গাছের উচ্চতা বা বেড়ের উপর নির্ভর করে সারি থেকে সারি বা গাছ থেকে গাছের দূরত্ব নির্দিষ্ট করতে হয়। এক্ষেত্রে সেচ প্রয়োগ বা ফসল সংগ্রহের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রাখতে হয়। আমাদের রাজ্যের পলিমাটি সমৃদ্ধ জেলাগুলিতে সাধারণত বাজারে মেলে এমন সব ফলই কম-বেশি হয়ে থাকে। কোনও ফলের উৎপাদন কম হলেও এই সার্ভে অনুযায়ী দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা, এই দুই জেলা আম, লিচু, আনারস, কলা ও পেয়ারা এই সবকটি ফল উৎপাদনেই রাজ্যের প্রথম ৫ জেলায় জায়গা করে নিয়েছে।

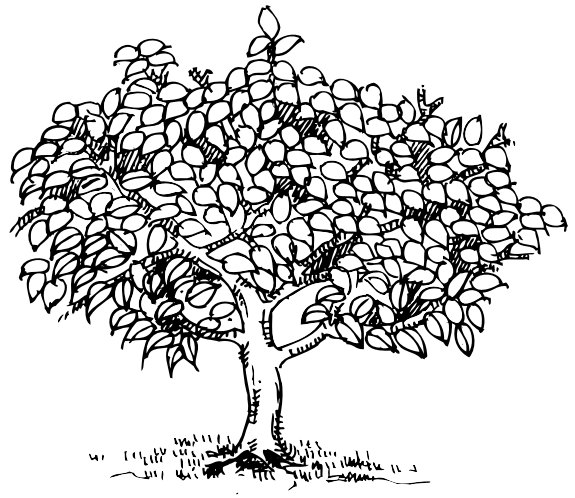
জীবন্ত গাছের বেড়া

গ্রাম-বাংলায় ছোট বাগানের ফসলকে গরু-ছাগল থেকে রক্ষা করতে বাঁশের বাখারি ও ধঞ্চের কাঠি, তালপাতা, খড়ের দড়ি বা প্যাকাটি বা পাটকাঠি দিয়ে কাঁটা জাতীয় গাছের ডাল পুঁতে বেড়া দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। আবার বড় বাগান বা খামার বাড়ির চারপাশে কংক্রিটের দেওয়াল কিংবা পিলারে কাঁটা তারের বেড়া দেখা যায়।

এখন অনেকেই বাগানের সীমানায় বেড়ার গাছ রোপণ করে, বীজ বপন করে বা জিওল জাতীয় গাছের ডাল কেটে পুঁতে জীবন্ত গাছের বেড়া (Life fencing) তৈরি করছেন। এই বেড়া দু'রকমের হয়, উৎপাদক এবং অনুৎপাদক বেড়া।

উৎপাদক জীবন্ত বেড়া ফসল রক্ষা করে কিছু ফসলও উৎপাদন করে। যা থেকে বাড়তি আয় হয়। যে গাছ দিয়ে এই বেড়া তৈরি হয় তা যেন গরু-ছাগলের পছন্দের না হয়। অর্থাৎ non-fodder plant হয়। যদি fodder plant হয়, তবে তা লম্বায় বড় হলে বেড়ার গাছগুলিকে সাট দিয়ে বেঁধে আরও মজবুত করা সম্ভব। বাগানের একদিকে ছোট গেট তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে ঘন করে অড়হড়, লম্বা সরিষা, ধঞ্চে বা জবার বীজ বপন করা যায়। বীজের গাছগুলি বড় হলে দেড় ফুট উচ্চতার উপরে দুই থাক বাখারির সঙ্গে মজবুত করে বেঁধে দিতে হয়। এছাড়া বকফুল, সুপারি, পাতিলেবু, করমচা প্রভৃতি গাছের চারা ঘন লাইন করে রোপণ করা যায়। নিয়মিত বেড়ার গাছের ডাল ছেঁটে দিতে হয়। অনুৎপাদক জীবন্ত বেড়া থেকে কোনও ফসল মেলে না। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্য বাগানের স্থায়ী ও মজবুত বেড়া পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে অতি ঘনভাবে গুল্মজাতীয় গাছের চারা রোপণ করা হয়। গাছগুলিকে কোমর সমান করে রাখা হয়। তিন-চার বছরের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী-মজবুত বেড়া তৈরি করা যায়। দুরন্ত (Duranta plumier বা D. inermis), Croton, ঘৃর্ণি (Putranjiva roxburghii), কামিনী (Murraya paniculata), ডাঙা-কলমি, বাবলা, জিওল, চোরপলতে প্রভৃতি গাছের সাহায্যে এই বেড়া করা যায়। এছাড়া Pluchia indica বা রাংচিতা (Pedilanthus tithymaloides) গাছকেও একাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের পশ্চিম অংশে Cactus-এর প্রাচীর বা Agave জাতীয় বিভিন্ন গাছ ঘন করে লাগিয়েও দীর্ঘস্থায়ী জীবন্ত বেড়া তৈরি করার চল রয়েছে।

ফল গাছ



পেয়ারা

পরিচয় –

পেয়ারার বিজ্ঞানসম্মত নাম Psidium guajava, পেয়ারা Myrtaceae গোত্রের উদ্ভিদ। পেয়ারা গাছ মাঝারি আকারের উদ্ভিদ। এর উচ্চতা ১০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। কাণ্ডের ব্যাসও তেমন মোটা হয় না, ২৫-৩০ সেমি পর্যন্ত হয়। পেয়ারা গাছের কাণ্ডের ছাল বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে উঠতে থাকে। কাণ্ডটি মসৃণ ও তামাটে সবুজ বর্ণের হয়। নতুন উৎপন্ন ডালগুলি প্রথমে চারকোণাকৃতি হয় (Quadrangular)। পাতাগুলি ৭-১৫ সেমি লম্বা এবং প্রস্থে ৩-৬ সেমি বিপরীতমুখি সজ্জিত থাকে। পেয়ারার ফুল সাদা রঙের হয়, এর বৃতিগুলি ফলের উপর অবস্থান করে। পুংকেশরের সংখ্যা অসংখ্য। পেয়ারার ফল বহুবীজি বেরী প্রকৃতির হয়। কচি অবস্থায় গাঢ় সবুজ বর্ণের হয়, পাকলে হালকা হলুদ বা Creamy ঘিয়ে বর্ণের হয়। পাকা অবস্থায় বা ডাঁসা অবস্থায় ফলের ভিতরের বর্ণ সাদা থেকে গোলাপী বা লাল বর্ণ ধারণ করে। ডাঁসা অবস্থায় পেয়ারা স্বাদে ও গন্ধে খুব ভাল হয় এবং ফল হিসাবে খাওয়ার জন্য এর প্রচুর চাহিদা থাকে। খুব পাকা ফল খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক চাহিদা থাকার জন্য পেয়ারার চাষ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ১৯৯১-৯২ সাল থেকে ২০০১-০২ সালের মধ্যেই ৬৪% চাষ বৃদ্ধি পেয়েছিল (৯৪ হেক্টর থেকে ১৫৫ হেক্টর) এবং ফলের উৎপাদন ১১ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ১৭ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ ৫৫% ফলন বৃদ্ধি পেয়েছিল। বর্তমানে উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমুদ্রতল থেকে ১৫০০-১৭০০ মিটার উচ্চভূমিতেও পেয়ারা গাছ জন্মাতে পারে। উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে ৮০০-১০০০ মিটার উচ্চভূমিতে যেখানে গড় উষ্ণতা ২৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস থেকে ২৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং রাতের তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে নামে না, সেখানে পেয়ারা ভাল হয়। যেখানে বছরে ১০০০-২০০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত এবং সারা বছর ধরে বৃষ্টিপাতের বন্টন ঠিক থাকে, সেই জায়গা পেয়ারা চাষের উপযুক্ত।

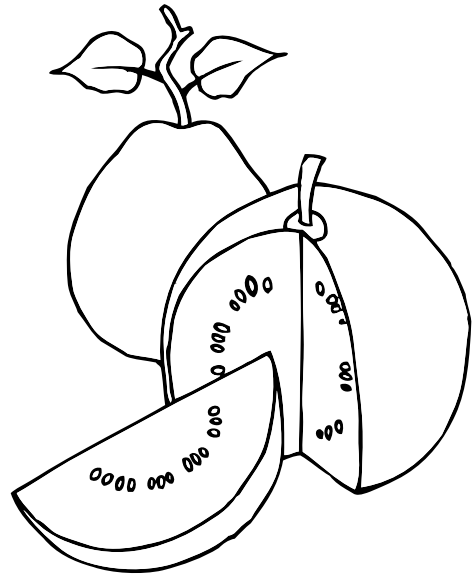
কাদাযুক্ত ভারী মাটি, পলিমিশ্রিত দোঁয়াশ মাটি, বেলে মাটি এমনকী অনুর্বর ল্যাটেরাইট মৃত্তিকাতেও পেয়ারা গাছ জন্মায়। তবে উপযুক্ত নিকাশী ব্যবস্থা যুক্ত মাটি, যার অম্লতা ও ক্ষারের মাত্রা ৪.৫$_{PH}$-৮.২$_{PH}$ সেই মাটিই পেয়ারা চাষের উপযুক্ত। বিভিন্ন মাটিতে গাছ জন্মালেও ফল উৎপাদন ও ফলের গুণগত মান বিভিন্ন প্রকারের মাটিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

পেয়ারার পৃথিবীর উষ্ণপ্রধান (Tropical) নতিশীতোষ্ণ (Sub-tropical) অঞ্চলে জন্মায়। Tropical America পেয়ারার আদি বাসস্থান। উপনিবেশিক শাসনকালে স্পেনীয়দের হাত ধরে আমেরিকা থেকে ফিলিপাইনস্ দ্বীপপুঞ্জে এর বিস্তার ঘটে এবং সেখান থেকে পর্তুগীজদের হাত ধরে ভারতে পেয়ারার চাষের সূত্রপাত। পেয়ারার বীজ অংকুরোদ্গমে অত্যন্ত সক্রিয় এবং অন্যদেশে তার অত্যন্ত দ্রুত বিস্তারলাভের ক্ষমতা থাকায় বিভিন্ন দেশে তা স্বাভাবিক উদ্ভিদ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতের গোয়ায় প্রথম পেয়ারা লাগানো হয়েছিল। পর্তুগীজরা একে 'পেরা', স্থানীয় কঙ্কণীরা একে 'পেরন', মারাঠীরা একে 'পেরু', বাংলায় পেয়ারা বা পিয়ারা এবং হিন্দীতে একে 'আমরুদ' বলা হয়। পেয়ারার মালায়লম নাম 'পেরাকোয়া' বা 'পেরাক্কা', তামিল ভাষায় 'কোইয়া' বা 'সেগাপ্পু কোইয়া', ইত্যাদি পেয়ারার ভারতীয় নাম। ইংরেজিতে Guava, আমেরিকায় একে Pichi, Phos, Enandi নামে ডাকা হয়।

আমেরিকার সমস্ত উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে অর্থাৎ মেক্সিকো থেকে সেন্ট্রাল আমেরিকা, ফ্লোরিডা, আফ্রিকা মহাদেশে ও ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের কিছু অংশে ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে পেয়ারার চাষ হয়। পেয়ারা পাকিস্তানের শীতকালীন জাতীয় ফল।

বিহার, ঝাড়খন্ড, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, আসাম ও অন্যান্য রাজ্যে পেয়ারার চাষ হয়। ভারতের ১৫,৪৬০০ হেক্টর জমিতে পেয়ারার চাষ হয়। ভারতের মোট উৎপাদন ১৭ লক্ষ ১৫ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন, যদিও উৎপাদনের মাত্র ০.০৫% পেয়ারা বিদেশে রফতানি হয়। প্রধানত আমেরিকা, সৌদি আরব, নেদারল্যান্ড, কুয়েত ও জর্ডনে পেয়ারা রফতানি হয়ে থাকে।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –



প্রধানত 'Apis' জাতের মৌমাছি পেয়ারায় পরাগ সংগযোগকারী পতঙ্গ। উন্নতজাতের পেয়ারার পুরুষ ফুলের রেণু সংগ্রহ করে তুলির সাহায্যে কৃত্রিমভাবে পরাগমিলন ঘটালে উন্নতমানের ফল পাওয়া সম্ভব। ফলের আকার বড় করার জন্য এবং বীজের পরিমাণ কমানোর জন্য হরমোন (অক্সিন বা জিবারেলিক অ্যাসিড) ফুলে স্প্রে করা যেতে পারে।

তবে পেয়ারার বীজ ভীষণভাবে অংকুরোদ্গমে সক্রিয়। তাই পাকা ফলের বীজ মানুষের দ্বারা ও পশুপাখির দ্বারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে আপনা থেকেই চারা গাছ জন্মায়। নার্সারীতে ২০ সেমি X ১০ সেমি মাপের পলিথিনের ব্যাগে ৩:১:১ হিসাবে মাটি, বালি, পাতা-পচা সার মিশ্রিত করে ভরা হয়। তার মধ্যে পরিষ্কার করে ধোয়া শুকনো বীজ ১০-১২ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর সালফিউরিক বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে ২-৩ মিনিট রেখে বীজত্বক নরম করা হয়। এরপর Captan বা Thiram ০.২% দ্রবণে ২ মিনিট ভিজিয়ে শোধন করে পলিব্যাগে বীজ বপন করে নিয়মিত ঝারি দিয়ে জল স্প্রে করলে চারা তৈরি করা যায়। এই পদ্ধতিতে ৯৫%-৯৭% সফলতা লাভ করা যায়।

পেয়ারা গাছের প্রধান মূলের থেকে বের হওয়া শাখা মূলগুলি পেনসিলের মতো মোটা হলে তা মাটি থেকে তুলে ৫-৭ ইঞ্চি মাপে কেটে উপযুক্তভাবে তৈরি মাটিতে পোঁতা হয়। এরপর সকাল-বিকেল ঝারি দিয়ে জল দিতে হয়। এইভাবে Root Cutting পদ্ধতিতে চারা তৈরি করে সঠিক পরিচর্যা করে তা অন্যত্র রোপণ করা হয়।

অর্ধ পরিণত পেয়ারার ডালে, যা লম্বায় ২ ফুট-২.৫ ফুট এবং পেনসিলের মতো মোটা এরকম ডালে Air Layering বা গুটি কলম বাঁধা হয়। ছুরি দিয়ে ২-৩ ইঞ্চি জায়গার ছাল তুলে ফেলে মূল সৃষ্টিকারী হরমোন যুক্ত জৈবসার মিশ্রিত মাটি পলিথিন পেপার দিয়ে ওই কাটা অংশে ভালভাবে বেঁধে দিতে হয়। সাধারণত জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে গুটি বাঁধলে কাটা ডালে শিকড় উৎপন্ন হবে এবং ২ মাস পর গাছ থেকে কলমটি কেটে অন্যত্র লাগানো হয়। অবশ্য তার আগে কলমটিকে ছায়াযুক্ত স্থানে মাটির মধ্যে বা পলিব্যাগে লাগিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম করিয়ে জমিতে লাগানো হয়। এছাড়া Patch budding, Grafting প্রভৃতি পদ্ধতিতে চারা তৈরি করে পেয়ারা গাছ জমিতে লাগানো হয়ে থাকে। কলমের চারা গাছের গুণগত মান সুনিশ্চিত থাকে এবং ২-৩ বছর পর থেকেই ফল উৎপাদন শুরু হয়ে যায়। অন্যদিকে বীজের গাছ থেকে ফল পেতে গেলে ৬-৭ বছর সময় লেগে যায়। তার উপরে ফলের গুণগত মান কীরকম হবে তা নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

পরিচর্যা –

গ্রীষ্মকালে জমিতে লাঙল বা ট্রাকটর দিয়ে ভাল করে চাষ দিয়ে মাটি প্রস্তুত করতে হয়। জমিতে যেন কোনও আগাছা না থাকে তা দেখতে হয়। জমিতে গোবরসার বা জৈবসার ছড়িয়ে মই দিয়ে জমির ঢাল বজায় রেখে সমান করা হয়। জমির উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে লাইন করে ৬ মিটার X ৬ মিটার দূরত্বে ১ মিটার X ১ মিটার X ১ মিটার আয়তনের গর্ত খুঁড়ে তাতে জৈবসার, সুপার ফসফেট ও নিম খোল প্রয়োগ করে কয়েকদিন রেখে তারপর পেয়ারার কলমগুলি লাগানো হয়। চারা লাগানোর পর থেকে প্রতিদিন গাছের গোড়ায় অল্প করে সকাল-বিকেল জল দিতে হয়।

পেয়ারা গাছে সাধারণত বছরে দু'বার সার প্রয়োগ করতে হয়, জুন-জুলাই মাসে একবার এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে একবার। প্রতিটি পরিণত গাছে ৬০-১০০ কেজি জৈবসার বা গোবরসার ও তার সঙ্গে ৩৬০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ১৮০ গ্রাম ফসফরাস এবং একই পরিমাণ পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। খনিজ পদার্থ ও ধাতব লবণ প্রভৃতির ঘাটতির কারণে পেয়ারা পাতা খসখসে, ফল ফাটা, ফল ছোট হওয়া, এই লক্ষণগুলি দেখা যায়। প্রতিকার হিসাবে জিঙ্ক, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, ম্যাঙ্গানিজ ২৫ গ্রাম হিসাবে এবং ১২.৫ গ্রাম হিসাবে কপার সালফেট ও ফেরাস সালফেট একত্রিত করে ৫ লিটার জলে গুলে গাছে স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যায়।

শীতকালে ২০-২৫ দিন অন্তর এবং গ্রীষ্মকালে ১০-১৫ দিন অন্তর জলসেচ দিতে হয়। Drip irrigation system দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা থাকলে ফসল উৎপাদন ভাল হয় এবং ৬০% জল বাঁচানো যায়।

হালকা করে পেয়ারা গাছের সারির ফাঁকা জায়গাগুলির মাটি কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে আগাছা দমন করার সঙ্গে সঙ্গে সাথী ফসল চাষের জন্য জমি তৈরিও করা যাবে। পেয়ারা গাছের লাইনের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় শাক-সবজি, ডাল জাতীয় ফসল, লঙ্কা, বেগুন, টমেটো প্রভৃতি চাষ করা যায়। সাথী ফসল চাষ করে একদিকে আর্থিক লাভ হয়, অন্যদিকে ডাল শস্য চাষ করে জমির উর্বরতা রক্ষা করা যায়। কিন্তু পেয়ারা গাছগুলি পরিণত হয়ে গেলে অর্থাৎ ৪ বছরের পর ফাঁকা জায়গায় সাথী ফসল চাষ করা যাবে না। তখন একর



প্রতি ৫০০ গ্রাম Divron, Oryzalin, SimaZine বা Atrazine প্রভৃতি আগাছানাশক ওষুধ প্রয়োগ করে আগাছা দমন করা যেতে পারে। এছাড়া গাছের ফাঁকা জমিতে খড় বা শুকনো পাতা বা কালো প্লাস্টিক পেপার চাপা দিয়ে একদিকে আগাছা দমন, অন্যদিকে মাটির আর্দ্রতা ধরে রেখে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক হরমোন প্রয়োগ করে বসন্তকালের গাছের বৃদ্ধি ঘটিয়ে এবং যাতে কম পরিমাণে ফুল ফোটে তা নিয়ন্ত্রণ করলে শীতের ফুল বেশি ফুটবে এবং শীতের ফলন বেশি হবে। যেহেতু শীতকালের ফল গুণমানে ভাল হয় এবং দামও এই সময় বেশি পাওয়া যায় তাই এই ব্যবস্থা কৃত্রিমভাবে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

পেয়ারা গাছের গোড়ার দিকে ১ মিটার নিচের ডালগুলি কেটে দিতে হয়, এতে গাছটি সোজাভাবে বেড়ে ওঠে। ২-৩ বছরের গাছগুলির উপরের দিকের ডালগুলি ছেঁটে দিতে হয়। যাতে গাছটি লম্বায় বেশি বাড়তে না পারে এবং পাশের দিকের ডাল বড় হয়ে গাছটি যাতে ঝাকড়া আকারের হয় সেইভাবে গাছটিকে তৈরি করা হয়, অথবা উপর দিকে সোজা হয়ে বেড়ে ওঠা ডালগুলিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নীচের দিকে বেঁকিয়ে দিতে হবে। এতে নতুন ডালপালা বেশি জন্মাবে এবং বেশি পরিমাণে ফল ধরবে।

পেয়ারা গাছে সাধারণত ফল ছিদ্রকারী পতঙ্গ, কাণ্ড ছিদ্রকারী পতঙ্গ ও বিভিন্ন ধরনের শোষক পোকার আক্রমণ ঘটে। ফলে গাছের বৃদ্ধি ও ফল উৎপাদনে ক্ষতিসাধন করে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ছত্রাক আক্রমণের কারণে পাতা শুকিয়ে যাওয়া, ফলের পচন রোগ, পাতায় ও ফলের ত্বকে খসখসে ধূসর দাগ ও ফলের ফাটা রোগ দেখা যায়। পোকামাকড়ের হাত থেকে ফলন বাঁচাতে ২ মিলিলিটার Malathian, ০.৫ মিলিলিটার Phosphamidon, Monocrotaphos বা Dimethilate স্প্রে করতে হবে এবং ছত্রাকনাশক ওষুধ যেমন, Carbondazim বা Thiophanate methyl ১ গ্রাম প্রতি লিটার এবং Mancozeb ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে গাছে স্প্রে করলে ছত্রাক আক্রমণ প্রতিহত করা যাবে। গাছের গোড়ায় জল জমার কারণে ছত্রাকের আক্রমণ প্রতিহত করতে হলে ৭২ লিটার জলে ৫০০ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট এবং ৩৫০ গ্রাম চুন মিশিয়ে ১৫-৩০ অন্তর গাছে স্প্রে করতে হবে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

গাছ থেকে খুব সাবধানে পরিণত ফলগুলি পাড়তে হয়। কারণ এসময় ফলে আঘাত লাগলে শীঘ্রই তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং আঘাত পাওয়া ফলের দামও পাওয়া যায় না। ফলগুলি বাছাই করে টিস্যু কাগজ, কলাপাতা বা লতাপাতার উপর রেখে ঝুড়ির মধ্যে ফলগুলি সাজাতে হয়। ঠিকমতো প্যাডিং না করলে চাপে ফল নষ্ট হতে পারে। নিকটবর্তী বাজারে এইভাবে ফল বিক্রির জন্য পাঠানো হয়। দূরবর্তী বাজারে বা রফতানির জন্য পেয়ারা সংরক্ষণ করতে হলে ফলের উপর ৩% মোমের আস্তরণ দিয়ে কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করলে ৮-১০ দিন পর্যন্ত তা তাজা রাখা সম্ভব। ৮ ডিগী থেকে ১০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং ৮৬% - ৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় হিমঘরে পেয়ারা রাখলে ২১ দিন পর্যন্ত তা সংরক্ষণ করা যায়। ফল পাকার ২০-৩০ দিন আগে জিবারেলিক অ্যাসিড ফলের উপর স্প্রে করলে বা ১% পটাসিয়াম সালফেট স্প্রে করলে ফলের মান ভাল হয় এবং বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায়।

সারা পৃথিবীতে পেয়ারা ফল হিসাবে কেটে খাওয়া হয়। খুব পাকা অপেক্ষা ডাঁসা পেয়ারার চাহিদা সবসময় বেশি থাকে। পাকা পেয়ারা মিষ্টি ও বেশ সুগন্ধযুক্ত হয়, বয়স্কদের পক্ষে তা খাওয়া খুবই সুবিধাজনক। পেয়ারার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন C থাকে। এছাড়া খাদ্যতন্তু(Dietary fiber)পটাসিয়াম, শর্করা প্রভৃতি থাকে। একটি পেয়ারাতে একটি কমলালেবুর চারগুণ ভিটামিন C থাকে।

১০০ গ্রাম পেয়ারায় নিম্নলিখিত খাদ্যগুণ বর্তমান;-

- শক্তি – ৬৮ কিলো ক্যালরি
- শর্করা – ১৪.৩২ গ্রাম
- সুগার – ৮.৯২ গ্রাম
- খাদ্যতন্তু – ৫.৪ গ্রাম
- ফ্যাট – ০.৯৫৮ গ্রাম

- প্রোটিন – ২.৫৫ গ্রাম
- ভিটামিন A – ৪%
- বিটা ক্যারোটিন – ৩%
- ভিটামিন B, B2, B3, B5,B6 ও B9 যথাক্রমে – ৬%, ৩%, ৭%, ৯%, ৮%, ও ১২%
- ভিটামিন C – ২৭৫%
- ভিটামিন K – ২%



গোলাপী ও লাল শাঁসযুক্ত পাকা পেয়ারাগুলি স্বাদে একটু বেশি টকভাব, এগুলি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে জ্যাম, জেলি, জুস এবং পিউরি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। তৈরি করা হয়। পেয়ারার পিউরি পুডিং, কেক, আইসক্রীম, সস্ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। Preservative দিয়ে কৌটোয় ভরে পেয়ারা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা যায়। জুস বা ফ্রুট ব্লেন্ডস্ - অন্য ফলের সঙ্গে মিশ্রিত করে ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য রাখা যায়।

পেয়ারার বীজ থেকে ভিটামিন সমৃদ্ধ তেল পাওয়া যায়। প্রাসাধন শিল্পেও এই তেল ব্যবহার হতে পারে। পেয়ারা গাছের পাতা, ছাল, ফল, মূল, বীজের তেল সবই পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। হার্টের রোগ, পেটের রোগ, ক্যানসার প্রতিরোধ, জ্বালাযন্ত্রণার প্রভৃতি প্রতিরোধের উপাদান পেয়ারার পাতা, গাছের ছাল ও ফলে বর্তমান। তাই পেয়ারা একটি অত্যন্ত উপকারী ফল।

জাতীয় হর্টিকালচার বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী, আধুনিক পদ্ধতিতে পেয়ারার চাষ করলে জমিতে সাবমার্শিবল্ পাম্প বসাতে হবে এবং Drip irrigation system-এর জন্য পাইপলাইন বসাতে হবে। এজন্য যথাক্রমে প্রায় ৪০ হাজার ও ২০ হাজার টাকা খরচ হবে। জমির চারদিকে বেড়া দিতে প্রায় ৩০ হাজার টাকা খরচ হবে। একটি পাম্পহাউস বা শেড বানাতে কমপক্ষে ১০ হাজার টাকা খরচ করতে হবে। এই সমস্ত খরচগুলি স্থাবর সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করতে হবে। এরপর এক একর জমিতে চাষের খরচ যুক্ত করে সেই পেয়ারা বাগানের জন্য সর্বমোট ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা খরচ ধরা হয়েছে। জাতীয় হর্টিকালচার বোর্ডের হিসাবে দেখানো হয়েছে, কৃষকদের অংশীদারিত্ব ৬২ হাজার ৫০০ টাকা, সরকারের ভরতুকি ২৫ হাজার টাকা ও মেয়াদী ঋণ ৩৭ হাজার ৫০০ টাকা। এই সমস্ত খাতে হিসাব করে এক একরে প্রতি বছর গড়ে লাভ ২৪ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে, লাভের পরিমাণ ৫৪ হাজার টাকা পর্যন্ত হওয়া সম্ভব। উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বাজারজাত করার ব্যবস্থা ও সরকারি ব্যবস্থার সাহায্যে পেয়ারা চাষ আরও লাভজনক চাষে পরিণত হতে পারে।

জাত পরিচিতি –

Pineapple guava বা Brazilian Guava, পেয়ারার মতোই দেখতে (Acca sellowiana) Myrtaceae গোত্রেরই গাছ, যা প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। এই সুমিষ্ট ও সুগন্ধযুক্ত ফলটিরও ইংরেজি নাম 'Guava', এছাড়া Strawberry Guava, যার বিজ্ঞানসম্মত নাম Psidium Littorale এবং এরই অন্য একটি জাত হল Cattleianum এবং Lemon Guava, যার বিজ্ঞানসম্মত নাম Psidium Littorale, যার আরেকটি জাত Littorale-ও এক ধরনের পেয়ারা।

সারা পৃথিবীতে বহু জাতের পেয়ারা জন্মায়। এখানে ভারতের কয়েকটি বিখ্যাত জাতের পেয়ারার নাম দেওয়া হল;-

L-৪৯, এলাহাবাদ সফেদা, গোয়ালিয়র–২৭, বেনারসী, চিত্তিদার/চিত্তধর, আর্কা, মৃদুলা, অমূল্য, ধারওয়া, হাফ্সী, সিলেকশন্-৮, হারিঝা, সর্দার, L–২৪, নাসিক সিডলেস্, লক্ষ্ণৌ সফেদা, দুধেখাজা, কাবলী ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র – wikipedia,www.nhd guava cultivation



আম

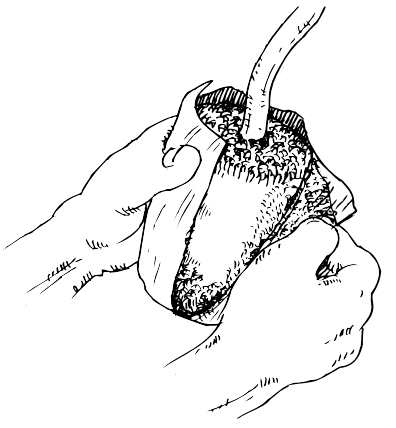
পরিচয় –

ভারতের জাতীয় ফল আম। বাংলাদেশের জাতীয় বৃক্ষ আম গাছ। পাকিস্তান ও ফিলিপাইনস্‌েরও জাতীয় ফল আম। আমের বিজ্ঞানসম্মত নাম Mangifera Indica, ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা। এটি Anacardiaceae গোত্রের উদ্ভিদ। আমগাছ বিশাল আকৃতির চিরহরিৎ বৃক্ষ। আম গাছ লম্বায় ৩৫-৪০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। আমগাছ অনেক বছর বাঁচে (৩০০ বছরের পুরনো গাছ এখনও ফল দিচ্ছে)। আমগাছের কাণ্ডের বেড় ২-২.৫ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। আম গাছের প্রধান মূল মাটির গভীরে ৬ মিটারেরও (২০ ফুট) বেশি নিচে পৌঁছতে পারে। বহু শাখা-প্রশাখা যুক্ত মূল বিশাল বৃক্ষটিকে মাটির উপর খাড়া থাকতে সাহায্য করে। আমের পাতাগুলি একান্তরভাবে বা সর্পিলভাবে কাণ্ডের উপর সজ্জিত থাকে। পাতাগুলি কচি অবস্থায় লালচে ধরনের হয়, পরে গাঢ় সবুজ বর্ণের হয় এবং বেঁকে যায়। পাতাগুলি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে যথাক্রমে ১৫-৩৫ সেমি ও ৬-১৬ সেমি পর্যন্ত হতে পারে। আমের ফুলকে মুকুল বলা হয়। শাখ-প্রশাখাযুক্ত পুষ্প মঞ্জরীর উপর সাদা বা ঘিয়ে রঙের ফুলগুলি জন্মায়। সাধারণত শীতের শেষে আমগাছে মুকুল আসে। আমের মঞ্জরীতে পুরুষ ফুল ও উভলিঙ্গ ফুল থাকে। আমের মুকুলের সুমিষ্ট গন্ধ থাকে যা পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে। আমের ফল বিভিন্ন আকৃতির হয়। জাত অনুযায়ী বিভিন্ন আকারের ফল দেখা যায়। ফজলী আম বিশাল আকারের হয়। আমের ফলটি রসালো ড্রুপ প্রকৃতির, কাঁচা অবস্থায় ফলের রং অর্থাৎ Exocarpটি সবুজ বর্ণের হয় এবং Mesocarp অংশটি সাদা রঙের হয়। ফল পেকে গেলে বাইরের রং হলুদ, লাল, গোলাপী বর্ণ ধারণ করে এবং Mesocarp অর্থাৎ শাঁসটি হলুদ বা লালচে বর্ণের হয়। Mesocarp আঁশযুক্ত বা আঁশহীন হতে পারে। ভাল জাতের আমে আঁশ থাকে না। ফলের শক্ত আঁটিটিকে Endocarp বলা হয়, যার মধ্যে বীজ থাকে। আমের বীজে দুটি বীজপত্র থাকে। বীজপত্রগুলি সাদ রঙের হয়। বীজ থেকে এক-দু'মাসের মধ্যে চারা উৎপন্ন হয়। বীজ শুকিয়ে গেলে অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। আমের ফুলের পরাগসংযোগে প্রায় ৪৪টি বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গের ভূমিকা রয়েছে। পরাগসংযোগে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা ১২টি পতঙ্গের, ৭ প্রকার মাছি ও ২ ধরনের দেশীয় মৌমাছির।

যদিও আম উষ্ণ মৌসুমীয় অঞ্চল আমের জন্মস্থান। তবুও বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু সহ্য করার ক্ষমতা আমের রয়েছে। তবে ফুল আসার পর কম বৃষ্টিপাত ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা এবং ফলের বৃদ্ধির জন্য বেশি তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে থাকলে আমগাছ মরে যেতে পারে। আবার ৪৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আমের ফল তাপদগ্ধ হয়ে খসে পড়ে। সমুদ্রতল থেকে ৪০০ মিটার উঁচু জমি আমের পক্ষে উপযুক্ত, তবে ৬০০ মিটার উঁচু জমি আমের পক্ষে ভাল নয়। তাপমাত্রা ২১ থেকে ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস, নির্দিষ্ট বৃষ্টিপাত এবং ৪-৫ মাস বৃষ্টিহীন শুষ্ক আবহাওয়া আম চাষের উপযুক্ত।

বিভিন্ন প্রকার মাটিতেই আমগাছ জন্মাতে পারে। তবে হালকা বালি মিশ্রিত দোঁয়াশ মাটি বা ভারী কাদাযুক্ত মাটি, যার গভীরতা ১ থেকে ২ মিটার সেখানে আমগাছ ভাল হয়। আমগাছের জন্য উপযুক্ত জলনিকাশী ব্যবস্থা ও অম্লতা-ক্ষারের মাত্রা ৪.৫$_{PH}$ থেকে ৭.০$_{PH}$ থাকা দরকার। অল্প অ্যাসিডযুক্ত মাটিতে আম ভাল জন্মায়, কিন্তু লবণাক্ত ও ভিজে কাদামাটি আমের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

আমের আদি নিবাস দক্ষিণ এশিয়ায়। প্রধানত মায়ানমার এবং পূর্ব ভারত আমের আদি জন্মস্থান। এখান থেকেই এবং অন্য মতে, ফিলিপাইনস্ থেকে সারা পৃথিবীতে আমগাছের প্রসার ঘটেছে। ১৮৮০ সালে ক্যালিফোর্ণিয়াতে প্রথম এই গাছ লাগানো হয়েছিল। ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যে আমের উল্লেখ আছে। আমের সংস্কৃত নাম 'আম্র'। প্রায় চার হাজার বছর ধরে ভারতে আমের চাষ হয়ে আসছে। ভারতীয় ইতিহাসে আম একটি অতি মর্যাদাসম্পন্ন গাছ বা ফল হিসাবে পরিগণিত হয়ে এসেছে। রাজা-বাদশা, আমির-ওমরাহ ও সম্মানীয় জ্ঞানীগুণী মানুষকে আম উপহার দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। যে রেওয়াজ আজও কিছু ক্ষেত্রে বর্তমান। মুঘল সম্রাট আকবর বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলায় ১৫০৬ – ১৬০৬ সালে প্রায় এক লক্ষ আমের গাছ লাগিয়েছিলেন। 'আইনি আকবরী' গ্রন্থে আমের অনেক জাতের উল্লেখ রয়েছে। এদেশের লক্ষীভোগ, তোতাপুরী, রাটাউল, কেশর প্রভৃতি জাতের আম বহু প্রাচীন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছেও আমগাছ অত্যন্ত পবিত্র।



কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

সাধারণত বীজ থেকে নিজে থেকেই বিনা পরিচর্যায় আমের চারা জন্মায়। ভাল

জাতের আম চাষ করতে হলে এবং ফলের গুণমান বজায় রাখতে হলে বীজের গাছের উপর নির্ভর না করাই ভাল। বহু ভ্রূণযুক্ত বীজ থেকেও উন্নত গুণমানের চারা তৈরি করা যেতে পারে।



প্রথমে সুস্থ পরিণত আমের বীজ সংগ্রহ করে বালি, মাটি ও জৈবসার মিশ্রিত মাটি তৈরি করে পলিথিন ব্যাগে মাটি ভরে বীজগুলি থেকে চারা তৈরি করা হয়। চারাগুলি পেনসিলের মতো মোটা হয়ে গেলে তাতে জোড়-কলম করা সম্ভব হয়। পছন্দ মতো জাতের আমের এই রকম মোটা ডগা সংগ্রহ করে চারার গাছটির সঙ্গে জোড়-কলম বাধা হয়। জোড়-কলম অনেকভাবে করা যায়। চারার বা আদি জোড়ের ডগা কেটে মাঝখানটা চিরে তার মধ্যে পছন্দ করা Scionটি তেরছাভাবে কেটে চেরা অংশে ঢুকিয়ে পলিথিন টেপ জড়িয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। ৮-১০ সপ্তাহ পরে পলিথিন টেপ খুলে কিছুদিন ছায়ায় রেখে জমিতে লাগানো হয়।

তৈরি করা চারার পাশে জোড়-কলম বাঁধা যেতে পারে, আবার বড় আমগাছের কোনও ডালেও পছন্দ মতো জাতের আমের জোড় কলম বেঁধেও জোড়-কলম বানানো যায়।

এভাবে উন্নতমানের পছন্দ মতো গাছ তৈরি করা যায় এবং দু'বছরের মধ্যে ফল উৎপাদন করা যায়। এছাড়া এভাবে তৈরি গাছ বেশি বড় হয় না। পাকা ফল সংগ্রহ করাও সহজ হয়।

পরিচর্যা –

বর্ষার আগেই জমিতে লাঙল বা ট্রাকটর দিয়ে মাটি তৈরি ও মই দিয়ে জমির ঢাল ঠিক করে ফেলতে হবে। চাষ দেবার আগে জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে গোবরসার বা জৈবসার প্রয়োগ করলে মাটির সঙ্গে তা ভালভাবে মিশে যাবে।

বীজের গাছের জন্য ২০ মিটার X ২০ মিটার দূরত্বে গাছ লাগানোর জন্য দূরত্ব বজায় রাখতে হয়। কলমের গাছ লাগানোর জন্য ৮ মিটার X ৮ মিটার বা ১০ মিটার X ১০ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে ০.৫ মিটার X ০.৫ মিটার X ০.৫ মিটার মাপের গর্ত কেটে জৈবসার দিয়ে ভর্তি করে ক'দিন ফেলে রাখতে হয়। এরপর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে বা জুলাই-অগাস্ট মাসে গভীরভাবে কলমগুলি লাগিয়ে বাঁশের লাঠির সঙ্গে গাছটি বেঁধে সোজাভাবে কলমগুলি লাগাতে হয়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে লাগানো চারায় সেচ দিতে হয়। চারা লাগানোর সময় প্লাস্টিকের ব্যাগটি সাবধানে খুলে নিতে হয়। বাগানের চারদিকে বেড়া দেওয়া প্রয়োজন।

আমগাছে বছরে তিনবার সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে একবার, ১৫ মার্চের মধ্যে দ্বিতীয়বার এবং ১৫ মে মাসে তৃতীয়বার। ১-২ বছর বয়সের গাছে নাইট্রোজেন ১১০ গ্রাম, ফসফেট ৫০ গ্রাম ও পটাশ ১০০ গ্রাম, এরপর প্রতি বছরে একটু করে সারের পরিমাণ বাড়িয়ে ১০ বছর বা পূর্ণবয়স্ক গাছের জন্য ১ কেজি নাইট্রোজেন, ৫০০ গ্রাম ফসফেট ও ২ কেজি পটাশ দিতে হয়। গাছ লাগানোর সময় মাটি শুকনো থাকলে ৪-৫ দিন অন্তর প্রতি গাছে ২০-৩০ লিটার জল দিতে হবে।

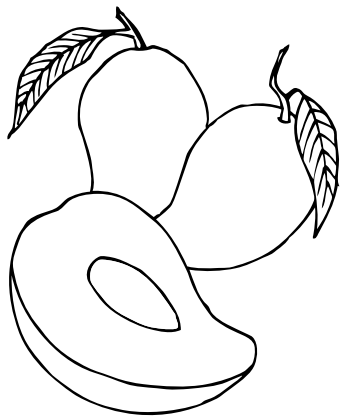
১ বছর বয়সের গাছে শুষ্ক অবস্থায় প্রতি গাছে ৪০-৫০ লিটার জল ৭-১০ দিন অন্তর দিতে হবে। পরবর্তী বছর প্রতি গাছে ১০০-১৫০ লিটার জল প্রতি ১০ দিন অন্তর দিতে হবে। ফুল আসার আগে সেচ দেওয়া উচিত নয়। মুকুলে আম ধরে গেলে ১৫ দিন অন্তর সেচের প্রয়োজন হয়। মাটি কুপিয়ে বা আগাছানাশক ওষুধ প্রয়োগ করে আগাছা দমন করা হয়। এছাড়া মালচিং পদ্ধতিতে খড় চাপা দিয়ে একসাথে আগাছা দমন ও জমির আর্দ্রতা ধরে রেখে ফলন বাড়ানো যায়।

ফল পাড়ার পর পুরাতন মঞ্জরীগুলি ও ডালগুলি কেটে দিলে নতুন ডালপালা গজাবে এবং গাছের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। গাছটির কাণ্ডটি যাতে সোজাভাবে বাড়ে তার জন্য ছোট গাছের নিচের দিকে ডালগুলি কেটে দিতে হয়।

জমিতে চারা লাগানোর পর থেকে ২-৩ বছর পর্যন্ত ফাঁকা জায়গায় সাথী ফসল হিসাবে শাক-সবজি সিম্ব জাতীয় ফসল, লঙ্কা, বেগুন বা অন্যান্য ফসলের চাষ করে একদিকে আগাছা দমন অন্যদিকে কিছু আর্থিক লাভ সম্ভব হয়।

মুকুল আসার আগে থেকেই গাছে পোকামাকড়ের আক্রমণ না ঘটে সেদিকে যত্ন নেওয়া দরকার। বিভিন্ন ধরনের শোষক পোকা, কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা, পাতা কাটা পোকা সাধারণত আমগাছের ক্ষতি করে। এর প্রতিকার হিসাবে Carbaryl এবং Monocrotophos জলে গুলে স্প্রে করলে রোগপোকা দমন করা যাবে।

এছাড়া ছত্রাকঘটিত রোগের কারণে Powdery Mildew , Anthracnose, ধ্বসা প্রভৃতি। ছত্রাক আক্রমণে ফুল ঝরে যাওয়া, মুকুল নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়। ছত্রাকঘটিত রোগের প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।



ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

অনেক জাতের গাছে প্রতি বছর মুকুল আসে না, এক বছর অন্তর রেস্ট ইয়ার থাকে। সেই সমস্ত গাছে বা সবরকম গাছেই ফুল উৎপন্নকারী হরমোন প্রয়োগ করে প্রতি বছরই ফসল ফলানো যায়। পরিণত গাছে পটাসিয়াম নাইট্রেট দু'দিন অন্তর ২%-৪% হিসাবে জলে গুলে স্প্রে করা যেতে পারে। অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ২% বা ক্যালসিয়াম নাইট্রেট ২%-৩% জলে গুলে স্প্রে করলে মুকুল আসা সুনিশ্চিত করা যায়। ফসল উৎপাদনের জন্য প্রতি বছর মুকুল আসা অত্যন্ত জরুরি। সঠিক পরিচর্যায় উন্নতজাতের আম একরে ৫-৭ টন পর্যন্ত হতে পারে।

হাত দিয়ে বা জাল লাগানো আঁকশি বা লগি দিয়ে আম সংগ্রহ করলে আঘাতজনিত ক্ষতি এড়ানো সম্ভব। এরপর আকার ও গুণমান অনুযায়ী সঠিক প্যাডিং করার জন্য টিস্যু পেপার, লতাপাতা বা এয়ার লেয়ার প্লাস্টিক শিট বিছিয়ে তার উপর সাজিয়ে ঝুড়িতে বা ক্রেটে বা কার্টুনে প্যাকিং করে বাজারে পাঠানো হয়। দূরবর্তী বাজারে পাঠানোর জন্য রঙ ধরা আম সংগ্রহ করতে হয়। পাকা আম পাড়ার সময়, আমের বোঁটা থেকে যে রস বের হয় তাতে Urushiol নামে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ থাকে। গায়ে-হাতে এর থেকে একপ্রকার চর্মরোগ হয়। আম পাড়ার সময় শরীর ভালভাবে ঢেকে আম পাড়া উচিত।

মরসুমের বিভিন্ন সময় ফলন পাওয়ার নিরিখে আমের প্রকার ভেদ-

মরসুমের শুরতে	মরসুমের মাঝামাঝি	মরসুমের শেষ দিকে
সুবর্ণরেখা	আলফানসো	মালগোবা
বোম্বাই	ল্যাংড়া	নীলম
হিমসাগর	হার্ডেন	ফজলী
কেশর	পাদ্রী	চৌসা
		ফারন্যান্দো

কাঁচা আম সাধারণত রান্না করে খাওয়া হয়। গরমের শুরুতে কাঁচা আমের প্রচুর চাহিদা থাকে। শুরুতে বেশ চড়া দামেই কাঁচা আম বিক্রি হয়। আমের ডাল, আমের চাটনি, আমের আচার, কাসুন্দি, জেলি প্রভৃতি ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়। কাঁচা আম কেটে হলুদ মাখিয়ে রোদে শুকিয়ে ভবিষ্যতে খাওয়ার জন্য সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া আম পোড়ার সরবৎ, আমের জেলিও বাড়িতে তৈরি করা যায়।

আর পাকা আম সকলের পছন্দের একটি ফল। ছোট বড় সকলেরই কাছেই পাকা আম অত্যন্ত প্রিয়। দই ও দুধ দিয়ে পাকা আম মেখে ভাত খেতে অনেকেই পছন্দ করেন। পশ্চিমবঙ্গে যত আম উৎপাদিত হয় তার বেশির ভাগটাই স্থানীয়ভাবে খাওয়ার জন্য বিক্রি হয়ে যায়।

১০০ গ্রাম আমে নিম্নলিখিত পদার্থ বর্তমান-

ক্যালরিক ভ্যালু	ভিটামিন	খনিজ লবণ
শক্তি – ৬৬ কিলো ক্যালরি	ভিটামিন C – ৩৭ মিলি গ্রাম	লবণ – ০.০১২৭ গ্রাম
প্রোটিন – ০.৬ গ্রাম	রেটিনল – ০.১৯ মিলি গ্রাম	আয়রন – ০.৪ মিলিগ্রাম
শর্করা – ১২.৫ গ্রাম	ভিটামিন E – ১ মিলি গ্রাম	জিঙ্ক – ০.১ মিলিগ্রাম
সুগার – ১২.৪ গ্রাম	থিয়ামিন – ০.০৫ মিলি গ্রাম	ম্যাগনেসিয়াম – ১৮ মিলিগ্রাম
ফ্যাট – ০.৪ গ্রাম	ভিটামিন B-৬ – ০.১৫ মিলি গ্রাম	ক্লোরিন – ৫ মিলিগ্রাম
ফাইবার – ১.৭ গ্রাম		ম্যাঙ্গানিজ – ০.২ মিলিগ্রাম

ক্যালরিক ভ্যালু	ভিটামিন	খনিজ লবণ
জল – ৮৪%		সালফার – ১২ মিলিগ্রাম
		পটাসিয়াম – ১৭০ মিলিগ্রাম
		ফসফরাস – ১৩ মিলিগ্রাম
		ক্যালসিয়াম – ১২ মিলিগ্রাম
		কপার – ০.০১ মিলিগ্রাম
		আয়োডিন – ২ মাইক্রো গ্রাম

খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পে আমের জুস, জেলি, জ্যাম, আমসত্ত্ব, ক্যান্ডি, আমচূর প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। মিষ্টি, চকোলেট তৈরিতে উপাদান হিসাবে আম ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ম্যাঙ্গো স্কোয়াশ, ম্যাঙ্গো স্লাইস, ম্যাঙ্গো ড্রিঙ্ক অত্যন্ত জনপ্রিয়। পুরাতন আমগাছের কাঠ দরজার জানালার পাল্লা তৈরিতে, তক্তাপোস, টেবিল, আলমারী ও কমদামী আসবাবপত্র বানাতে ব্যবহৃত হয়। পাকা আমগাছ গ্রামাঞ্চলে তাই বেশ দামেই বিক্রি হয়। এছাড়া ঢাক-ঢোলের খোল ও বারকোস আম কাঠ দিয়েই তৈরি হয়। ফুলের সঙ্গে আমের পল্লব প্রায় প্রতিদিনই সকলকে কিনতে হয়। বাড়ির শুভ অনুষ্ঠানে ও মণ্ডপ সাজাতে আমের পাতা শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। আমের ছালে একপ্রকার রঞ্জক পদার্থ থাকে তা রং তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়। ম্যাঙ্গিফেরিন নামক পদার্থ আমের ছাল থেকে পাওয়া যায়, যা ক্যানসার, অ্যাজমা, গ্যাস্ট্রিক, চর্মরোগ ইত্যাদি প্রতিরোধে সাহায্য করে। আমের আঠা পা ফাটা সারাতে সাহায্য করে এবং বীজের শাঁস কৃমির ভাল ওষুধ।

৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস থেকে ১৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৮৫%-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ৪-১০ দিন বাড়িতে সংরক্ষণ করা যায়। আধপাকা আমে ১.৮ মিলি লিটার ইথিলিন প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করলে আমের রং সুন্দর হয়। এইভাবে যত্ন নিয়ে প্যাকিং করে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে করে দূরবর্তী স্থানের বাজারে পাঠানো সম্ভব।

প্রচুর উন্নত জাতের আমের উৎপাদন সত্ত্বেও বাজারে এর দাম বেশ ভালই। ভাল আমের চাহিদাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। সঠিক পরিকাঠামো না থাকার জন্য বিদেশে ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সেভাবে আম রফতানি করা যাচ্ছে না। উন্নত পদ্ধতিতে প্যাকিং করে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে করে দূরবর্তী স্থানে পাঠানো সম্ভব হলে দেশীয় বাজারেও প্রচুর দামে তা বিক্রি করা যেত। পরিকাঠামোর অভাবে বহু আম পচে নষ্ট হয়ে যায়। তবুও সরকারি হর্টিকালচার বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী, প্রতি একর আম চাষে প্রথমদিকে গড় লাভ ২৫,৫০০ টাকা দেখানো হয়েছে, সেখানে পাম্প, তার শেড তৈরি, জমির চারদিকে স্থায়ী বেড়া ইত্যাদি স্থায়ী সম্পদ তৈরির খরচও ধরা হয়েছে এবং পরের বছরে বাগানের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাবে ও লাভের সম্ভাবনা আরও বাড়বে। সুতরাং আম চাষের ভবিষ্যত বেশ উজ্জ্বল।

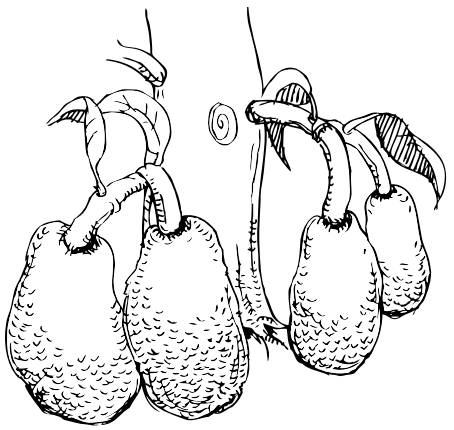
জাত পরিচিতি –

প্রায় ১১৯ রকম জাতের আমের কথা জানা যায়। তার মধ্যে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রসিদ্ধ কিছু জাতের আমের উল্লেখ করা হল-

- চৌসা – হিমাচলপ্রদেশ
- দশেরী – উত্তরপ্রদেশ
- ল্যাংড়া – উত্তরপ্রদেশ
- কেশর – গুজরাট
- হিমসাগর – পশ্চিমবঙ্গ
- আলফানসো – মহারাষ্ট্র
- বঙ্গনাপল্লী – অন্ধ্রপ্রদেশ
- তোতাপুরী – কর্ণাটক
- ফজলী – পশ্চিমবঙ্গ

এছাড়া আম্রপালী, মল্লিকা, বোম্বাই, বাদশা পসন্দ, গোলাপখাস, পেয়ারাফুলী, চ্যাটার্জী, রানিপসন্দ, কিষেণভোগ, রাজভোগ ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র – wikipedia,https://hort.purdue.edu/newcrop/morton/mango_ars.html,www.nhb mango cultivation



কাঁঠাল

পরিচয় –

কাঁঠাল গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Artocarpus heterophyllus, কাঁঠাল Moraceae গোত্রের উদ্ভিদ। কাঁঠাল গাছ বৃক্ষ শ্রেণীর উদ্ভিদ। এই গাছের উচ্চতা ২০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এর ফল যৌগিক প্রকৃতির। শত শত ফুল একত্রিত হয়ে ফল উৎপন্ন হয়। কাঁঠালের প্রতিটি কোয়া এক একটি পরিপুষ্ট ফুলের পরিণত রূপ। কাঁঠাল ফুলের (দলমন্ডল) পাপড়িগুলি বীজের উপর আবরণটি গঠন করে পরিপক্ক হলে হলুদ বর্ণের হয়। এই পরিবর্তিত রসালো পাপড়িগুলিই আমরা খেয়ে থাকি। কাঁঠালের ফল কাণ্ডজ অর্থাৎ গাছের মোটা গুড়িতেও এটি জন্মায় আবার মোটা ডালেও জন্মায়। উদ্ভিদ জাতের কাণ্ডজ ফল হিসাবে কাঁঠাল সর্ববৃহৎ। এক একটি ফল ৪০ কেজি ওজনেরও হতে পারে। তামিলনাড়ুর পানরুটি তালুকে ৬০-৭০ কেজি ওজনের কাঁঠাল উৎপন্ন হয়। এই রাজ্যের কুড্ডালোর জেলায় পানরুটি তালুক কাঁঠাল উৎপাদনে দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এখানকার কাঁঠাল গুণমানে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত (১৫০০ মিলিমিটার) কম হওয়ায় কাঁঠালের স্বাদ ও মান খুবই উপাদেয়। এখানে কাঁঠালের স্থানীয় নাম 'পাল্লা পালম', যা একরের পর একর জমিতে চাষ করা হয়। এখানকার কৃষকরা কাঁঠাল চাষ থেকে হেক্টর পিছু ৩-৫ লাখ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করতে পারে। এই অঞ্চলটি ৭০-১০০ কেজি কাঁঠাল ফলিয়ে গিনেস বুক-এ জায়গা করে নিয়েছে। উদ্যানপালন দফতরের হিসাব অনুযায়ী তামিলনাড়ুর এই অঞ্চলে ১০৮৪ হেক্টর জমিতে কাঁঠালের চাষ হচ্ছে এবং তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি হেক্টর জমিতে গড়ে ৪০ টন কাঁঠাল উৎপন্ন হয়। কাঁঠাল উৎপাদনে এই অঞ্চল ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

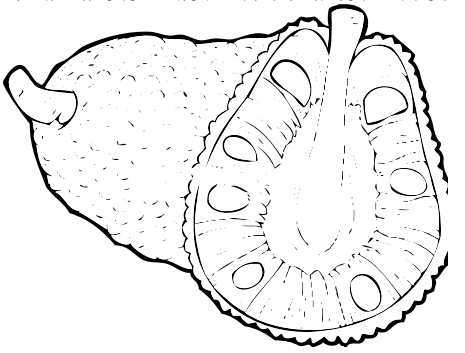
কাঁঠাল উষ্ণপ্রধান অঞ্চলের (Tropical Region) শুষ্ক ও বৃষ্টিস্নাত অঞ্চলে জন্মায়। অতিরিক্ত আর্দ্র ও ঠান্ডা আবহাওয়ায় এবং জল জমে থাকা স্থানে ভাল হয় না। বীজ লাগিয়ে ও কলমের (গ্রাফটিং) সাহায্যে কাঁঠালের চাষ করা হয়। পৃথিবীর উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে কাঁঠাল গাছের চাষ করা হয়। ইংরেজিতে কাঁঠালকে "Jackfruit" বলা হয়। "Jack" শব্দটি এসেছে পর্তুগীজ শব্দ "Jaca" থেকে। আবার "Jack" শব্দটি কেরালায় কাঁঠালের স্থানীয় নাম "ছাক্কার" (Chakka) পরিবর্তিত রূপও হতে পারে। কারণ Hortus Malabarica (১৬৭৮-১৭০৩) তৃতীয় খণ্ডে Hendrik Van Rheede এই "Chakka" শব্দটিকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আবার Rheede-র প্রায় শতাধিক বছর পর Ralph Ramdles Stewart কাঁঠালের ইংরেজি নামটি East India Company-র একজন স্কটিশ বোটানিস্ট William Jack-এর নামে নামাঙ্কিত করার সুপারিশ করেন।

বালি মিশ্রিত দোঁয়াশ মাটিতে কাঁঠাল গাছ ভাল হয়। জৈব পদার্থ যুক্ত উর্বর মাটিতে কাঁঠাল গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। যে জমিতে বর্ষায় জল জমে যায় সেই জায়গায় কাঁঠাল গাছের বৃদ্ধি ভাল হয় না।

কাঁঠাল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উদ্ভিদ। মনে করা হয়, দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতের বৃষ্টিস্নাত অরণ্য এর আদি জন্মস্থান। পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের মতে, ভারতে ৩,০০০ থেকে ৬,০০০ বছর আগে থেকেই কাঁঠাল গাছের চাষ হয়ে (ভারতের বাইরে শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনস্, নেপাল, ব্রাজিলেও কাঁঠাল চাষ করা হয়) আসছে।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

ইংরেজির মে-জুন থেকে অগাস্ট-সেপ্টেম্বর অর্থাৎ বাংলার জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত ফল হিসাবে পাকা কাঁঠাল পাওয়া যায়। বীজ সংগ্রহেরও আদর্শ সময় এপ্রিল-জুলাই মাস। রোগপোকামুক্ত যে গাছের কাণ্ড সোজা ও ডালপালার বিস্তার বেশ ভাল, সেই গাছ থেকেই কাঁঠালের বীজ সংগ্রহ করা ভাল। এক কেজি কাঁঠালে ৬০-৭০টি পর্যন্ত বীজ পাওয়া যেতে পারে। কাঁঠাল বীজকে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়।



ফল থেকে বীজগুলো বের করে ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে। এরপর পলিথিনের চাদরে ঢেলে আধো-আলোয় শুকনো করতে হবে। সর্বোচ্চ এক মাস পর্যন্ত কাঁঠালের বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সম্ভাবনা অক্ষুণ্ণ থাকে। কাঁঠালের বীজ থেকে চারা তৈরির জন্য বীজ বপনের উপযুক্ত সময় এপ্রিল-জুলাই মাস। বীজগুলো ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর লাগাতে হয়। মাদার বেডে ১০ সেমি. দূরত্ব অনুযায়ী বীজ বপন করতে হয়। বেডে বা টিউবে বীজ বপনের পর তা খড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হয় এবং সকালে ও বিকেলে ওই খড়ে ঝারি দিয়ে জল দিতে হয়। বীজ অঙ্কুরিত

হয়ে চারা বের হতে সাধারণত ১২-১৫ দিন সময় লাগে। কাঁঠাল বীজের অঙ্কুরোদ্গমের হার ৭০%-৮০% পর্যন্ত হয়ে থাকে। বীজ থেকে চারা বের হলেই উপরে ছাউনি দেওয়া দরকার। বীজগুলোকে ১০% জিবারেলিক অ্যাসিডে ভিজিয়ে রাখলে অঙ্কুরোদ্গম তাড়াতাড়ি হয়। এভাবে বীজ থেকে চারা তৈরি করে রোপণের পরিবর্তে মাঠে সরাসরি কাঁঠালের বীজ বপন করেও কৃত্রিম পদ্ধতিতে এই গাছের প্রসারণ ঘটানো যেতে পারে। বাড়ির আশপাশের বাগানে, সাধারণত যেখানে কাঁঠাল গাছ লাগানো হয় তা একপ্রকার বিনা পরিচর্যায় ও বিনা যত্নেই বেড়ে ওঠে। কিন্তু কৃত্রিম পদ্ধতিতে বাণিজ্যিকভাবে তুলনায় বড় জমিতে কাঁঠাল গাছের প্রসারণ করতে হলে উপযুক্ত পরিচর্যা ও যত্ন নিতে হয়। প্রসারণের সময়ে সাথী ফসল হিসাবে কাঁঠালের সঙ্গে শাক-সবজি ও আনাজপাতির চাষ করা যেতে পারে।

যে জমিতে এই প্রসারণের ব্যবস্থা করা হবে প্রথমেই কোদাল দিয়ে কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে সেখানকার আগাছা দমন করতে হবে। এছাড়া আগাছা দমনের (Weed controlled) ওষুধও ব্যবহার করা যেতে পারে। উপযুক্ত দেখভালের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ, সুষম সার প্রয়োগ পদ্ধতি এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরফলে অল্পবয়সী গাছের দ্রুত বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করা যায় এবং গাছের ফলনও বেশি হয়। জৈবসারের পাশাপাশি এর জন্য নাইট্রোজেন, ফসফেট এবং পটাসিয়াম বেশ উপযোগী হতে পারে।

প্রতিটি গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নিচে দেওয়া হল-

গাছের বয়স	গাছের বয়স
১ থেকে ২ বছর +	৫ বছর +
প্রতিটি গাছের গোড়ায় একটু দূরত্ব বজায় রেখে	একইভাবে
১০ কেজি জৈবসার	৫০ কেজি জৈবসার
+নাইট্রোজেন ০.১৫ কেজি	+নাইট্রোজেন ০.৭৫ কেজি
+ফসফেট ০.০৮ কেজি	+ফসফেট ০.৪০ কেজি
+পটাসিয়াম ০.১০ কেজি	+পটাসিয়াম ০.৫০ কেজি

কাঁঠাল গাছের প্রধান ক্ষতিকারক পতঙ্গ হল Brown weevil, যা গাছের কাণ্ড ছিদ্র করে গাছের ক্ষতিসাধন করে। একে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে Monocrotophos ০.০৩৫% জলে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে। এছাড়া কচি ফলের পচনরোগ (Fruit rot) থেকে রক্ষা পেতে Bavistin ০.০৫% বা Fytolan ০.২% অথবা M45 ০.২% দু'সপ্তাহ অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে। তবে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এই কীটনাশক প্রয়োগের ফলে কাঁঠাল ফুলের পরাগসংযোগ ঘটানোর উপকারী পতঙ্গ, যার বিজ্ঞানসম্মত নাম Tetragonula Iridipennis, তার যেন কোনও ক্ষতি না হয়।

কাঁঠাল গাছে গুরুতর ছত্রাক বা ভাইরাসজনিত রোগ দেখা যায়। জলের অভাবে বা অতিরিক্ত জলের কারণে এই রোগ হতে পারে। গাছে ফল আসার পর তা যখন বড় হতে থাকে তখন ছত্রাকের কারণে কাঁঠাল গাছে আরও একটি রোগ হয়, যা ফলনে বাধা সৃষ্টি করে। পচন ধরা ফল ও ফুলগুলোকে গাছ থেকে দ্রুত আলাদা করে এই রোগ সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচানো যেতে পারে। এছাড়া কিছু ছত্রাকনাশকও স্প্রে করতে পারলে ভাল হয়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

কাঁঠাল গাছ ৬-৭ বছর পর থেকে ফল দিতে শুরু করে। ৩-৪ বছরেও গাছে দু'-একটি ফল ধরতে দেখা যায়। মার্চ থেকে জুলাই মাসের মধ্যে কাঁঠাল পেড়ে নিতে হয়। অবশ্যই এঁচোড় বা কচি কাঁঠাল তার আগেই কেটে নেওয়া যেতে পারে। উপযুক্ত আবহাওয়ায় ও পরিচর্যায় এক-একটি পূর্ণবয়স্ক গাছে ২৫-১০০টি পর্যন্ত ফল ফলতে পারে। ওজনে ৩ কেজি থেকে ৩০ কেজি ওজনের কাঁঠাল বেশি দেখা যায়।

সব জায়গাতেই পাকা কাঁঠালের কোয়া থেকে বীজটা বের করে শুধুই খাওয়া হয়। আবার রুটি, ভাত, চিড়ে, মুড়কি দই সহ পাকা কাঁঠাল ফল হিসাবে খাওয়া হয়। ফল হিসাবেও বাজারে পাকা কাঁঠালের ব্যাপক চাহিদা থাকে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ (Food Processing) পদ্ধতিতে কাঁঠাল কোয়া বিদেশে রফতানি দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। রফতানি হচ্ছে কাঁঠালের চিপস্ও। কাঁচা কাঁঠালকে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে এঁচোড় বলা হয়। এঁচোড়ের তন্তু বা Fiber খাসির মাংসের মতোই তাই একে গাছপাঁঠাও বলা হয়। মাংসের মতো মশলা সহযোগেই এঁচোড়ের তরকারি রান্না করা হয়। এঁচোড় দিয়ে নিরামিষ পদও বানানো হয়। এছাড়া এঁচোড়ের গুলিকাবাব খুবই উপাদেয় একটি পদ। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও কাঁচা কাঁঠাল তরকারি হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাই এটি উপাদেয় একটি সবজি। বাজারে এঁচোড়ের মূল্য সর্বদাই ভাল থাকে। প্রতি কেজি ২৫ থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়। ভারতের প্রায় সর্বত্রই কাঁঠালের বীজের তরকারি বানিয়ে বা অন্য তরকারির সাথে রান্না করে খাওয়া হয়। কাঁঠালের বীজ শুকিয়ে ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেওয়া হয়।



পুড়িয়ে বা সিদ্ধ করেও কাঁঠালের বীজ খাওয়া হয়। কাঁঠালের বীজ খুবই সুস্বাদু। মহারাষ্ট্র, গোয়ায় এবং কোঙ্কন অঞ্চলে নরম প্রজাতির কাঁঠালের রস থালায় নিঙরে রোদে শুকিয়ে 'Pancake'-এর মতো শুকনো কাঁঠালসত্ত্ব বানানো হয়, যাকে 'ফানাসাচা সথ' (Phanasacha Sath) বা 'ফানাসাস পোলি' (Phanasas Poli) নামে পরিচিত। এইভাবে কাঁঠালের সত্ত্ব ভবিষ্যতে খাওয়ার জন্য সংরক্ষিত করা হয়।

কেরালায় শক্ত প্রকার কোয়াযুক্ত কাঁঠালকে 'ভারিক্কা' বলা হয় এবং নরম কোয়ার কাঁঠালকে 'কুজা' বলা হয়। 'কুজা' কাঁঠাল দিয়ে একপ্রকার মিষ্টি তৈরি করা হয়। 'ছাক্কা ভারাট্টিয়াথু'(Chakka Varattiyathu), যা একপ্রকার কাঁঠালের জ্যাম (Jackfruit Jam), শক্ত কোয়াযুক্ত 'ভারিক্কা' কাঁঠালের কোয়া রোদে শুকিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহ করা হয়। কাঁঠালের চিপস্‌ও তৈরি করা হয়। কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোর অঞ্চলে শক্ত কোয়ার কাঁঠাল 'বাক্কি' (Bakke) এবং নরম কোয়ার কাঁঠাল 'ইম্বা' (Imba) নামে পরিচিত। 'ইম্বা' কাঁঠালের কোয়ার বীজ ছাড়িয়ে বেটে পেস্ট বানানো হয়। তারপর এই পেস্ট বা লেই চাটাইয়ে ঢেলে রোদে শুকনো করে 'Chewy Candy' বানানো হয়।

কাঁঠালকে গরীব মানুষের ফল বলে কিছুটা অবহেলা করা হয়। কারণ শহরের উচ্চবিত্ত মানুষের কাছে অত্যন্ত পুষ্টিকর এই ফলটি বেশ অবহেলিত। যদিও এই ফল উৎকৃষ্টমানের পুষ্টিগুণসম্পন্ন। প্রতি ১০০ গ্রাম কাঁঠাল থেকে প্রায় ৯৫ গ্রাম ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। এতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যতন্তু (Dietary Fiber) থাকার জন্য পেট পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে এই ফল খুবই উপকারী, কাঁঠাল খাদ্যনালীর মধ্যে থেকে ক্যানসার সৃষ্টিকারক পদার্থ বিনাশ করে। কাঁঠালে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন A, ভিটামিন B Complex(B1–B9), ভিটামিন C এবং ভিটামিন E আছে, যা বিভিন্ন রোগের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে। ১৯.০৮ গ্রাম শর্করা থাকায় প্রচুর শক্তি সমৃদ্ধ, ১.৭২ গ্রাম প্রোটিন থাকায় এই ফল স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী। এতে ক্ষতিকারক ফ্যাট বা কোলেস্টেরল (মাত্র ০.৬৪ ফ্যাট) না থাকায় হার্টের রোগীরাও কাঁঠাল খেতে পারে। এছাড়া এই ফলে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, জিঙ্কের মতো খনিজ পদার্থ (Minerals) যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় কাঁঠালকে খুবই উপকারী ফল হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

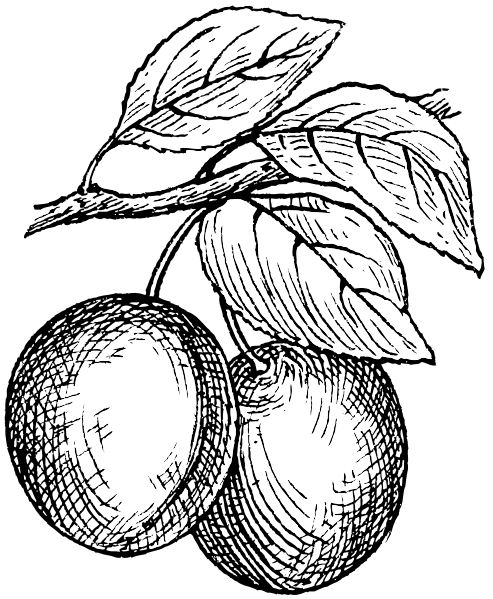
কাঁঠাল গাছের বিভিন্ন অংশ বাজারে বেশ ভাল দামেই বিক্রি হয়। কাঁঠাল গাছের সরু সরু ডালপালা অনেকক্ষেত্রে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই গাছের পাতা ছাগল, ভেড়ার অত্যন্ত প্রিয় খাবার। এছাড়া কাঁঠাল গাছ খুব পুরনো হলে এর কাঠ সোনালি হলুদ বর্ণের হয়। এই ধরনের পাকা কাঠ খুবই মূল্যবান। পালঙ্ক, আলমারী, জানালা-দরজার পাল্লা, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি তৈরির কাজে এই কাঠ ব্যবহৃত হয়। বৌদ্ধ মন্দিরে এবং কেরালায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কাঁঠাল কাঠের তৈরি জিনিসপত্র অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়।

তবে সরকারিভাবে তেমন পরিকাঠামো না থাকায়, কাঁঠাল নিয়ে বর্তমানে বিভিন্ন কর্মশালা ও খাদ্য মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। আলোচনা হচ্ছে কাঁঠালের গুরুত্ব নিয়ে। এরফলে দিনদিন বাড়ছে কাঁঠালের উৎপাদন। ভারত ১৪,৩৬,০০০ টন কাঁঠাল উৎপাদন করে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বাংলাদেশে ৯,২৬,০০০ টন, থাইল্যান্ডে ৩,৯২,০০০ টন, ইন্দোনেশিয়ায় ৩,৪০,০০০ টন ও নেপালে ১,৮৯,৭০০ টন কাঁঠাল উৎপন্ন হয়। আরব দেশে, ইংল্যান্ডে, অস্ট্রেলিয়ায়, জার্মানিতে কাঁঠালের কোয়া ও কাঁঠালের চিপস্ রফতানি হচ্ছে। তাই কাঁঠাল ভবিষ্যতে একটি অর্থকরী বাগিচা ফসলরূপে পরিগণিত হবে। কাঁঠাল গাছের পাতাও পশুখাদ্য হিসাবে বাণ্ডিল করে বেশ ভাল দামেই বাজারে বিক্রি হয়। প্রমাণ উচ্চতার পুরনো কাঁঠাল গাছের দাম ৫০ থেকে ৭০ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

জাত পরিচিতি –

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কাঁঠালকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। কখনও তা কেমন দেখতে তার ভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে নামকরণ করা হয়ে থাকে। তবে এদেশের আবহাওয়ায় মূলত ছয় ধরনের বা জাতের (Variety) কাঁঠাল দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, ব্ল্যাক গোল্ড, চিনা, কোচিন, রেড বার্টলেট বা দং রাসিমি, গোল্ডেন নাগেট এবং গোল্ডেন পিলো।

তথ্যসূত্র - wikipedia,www.agrifarming.in/jackfruit-farming



সবেদা

পরিচয় –

সবেদা গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Manilkara zapota, এর সুপরিচিত অপর বিজ্ঞানসম্মত নাম Achras Sapota, সবেদা গাছ Sapotaceae গোত্রের দ্বিবীজপত্রী বহু বর্ষজীবী, চিরহরিৎ বৃক্ষ।

গাছটির আদি জন্মস্থান মেক্সিকোতে বা আমেরিকার উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের ব্রাজিল, গুয়েতেমালায়। বহু প্রাচীনকাল থেকে মধ্য আমেরিকায় সবেদার চাষ হয়ে আসছে। ভারতের উপকূলভাগে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে সবেদার চাষ হয়। এদেশের প্রায় ৫২ হাজার হেক্টর জমিতে সবেদা চাষের বিস্তার ঘটেছে। দেশের উপকূলভাগ ছাড়াও জম্মু ও উত্তরাখন্ডের শিবালিক পর্বতমালায় এর চাষ হচ্ছে। এদেশে প্রায় ৫.৯৪ লক্ষ টন সবেদা উৎপন্ন হয়।

ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চলে সবেদা 'চিকু' নামে পরিচিত। তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকে একে সাপোটা, অন্ধ্রপ্রদেশে এর নাম স্যাপোথিলা এবং বাংলায় এই ফল সবেদা নামে পরিচিত।

সবেদা গাছ বিশালাকৃতির বৃক্ষ। উচ্চতায় ৩০ মিটারের বেশি হতে পারে। কাণ্ডের বেড় ১-৫ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। যদিও চাষের জন্য সবেদা গাছের উচ্চতা ৯-১৫ মিটারের মধ্যে থাকে। সবেদা গাছের কাণ্ড থেকে একপ্রকার আঠা (Latex) বের হয় যাকে "চিক্‌ল" (chicle) বলা হয়। পাতাগুলি চকচকে মসৃণ (glossy), একান্তরভাবে সজ্জিত থাকে এবং শাখার অগ্রভাগে পাতাগুলি সর্পিলভাবে সজ্জিত থাকে। পাতাগুলি ডিম্বাকার, ৭.৫ -১১.৫ X ২.৫ – ৪ সেমি আকারের হয়। ফুলগুলি বাদামি রঙের ঘণ্টাকৃতির হয়। ফুলগুলি ৬টি বৃতি, ৬টি হালকা-সবুজ পাপড়ি নিয়ে গঠিত। সবেদা গাছের ফুল protogynous প্রকৃতির হওয়ায় Cross pollination-এর মাধ্যমে ফল জন্মায় অর্থাৎ স্ব-পরাগমিলন হয় না।

ফলগুলি গোলাকার, ডিম্বাকার, উপবৃত্তাকার (ellipsoid) বা মোচাকৃতির হয়ে থাকে। মোটামুটি ৫-১০ সেমি আকারের ও ধূসর বাদামি বর্ণের হয়। কাঁচা ফল ভীষণ কষটে স্বাদের। পাকলে ফলের ত্বক উজ্জ্বল বাদামি বর্ণের হয়ে যায়। ফলের রসালো Mesocarpটি মিষ্ট, সুগন্ধযুক্ত একটু দানাদার হয়। Mesocarp-এর কেন্দ্রস্থলে ৩-৫টি কালচে বাদামি রঙের বীজগুলি থাকে। বীজের কিনারায় ঈষৎ সাদা দাগ দেখা যায়।

১০-৩৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ৭০% আপেক্ষিক আর্দ্রতা সবেদা গাছের পক্ষে উপযুক্ত। উপকূলীয় অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল সবেদা গাছের অনুকূল।

বিভিন্ন প্রকার মাটিতেই সবেদা জন্মায়। তবে বালিযুক্ত দোঁয়াশ মাটি ও কাদাযুক্ত দোঁয়াশ মাটি ও জৈব পর্দাথপূর্ণ পলিমাটি সবেদা চাষের উপযুক্ত। লবণযুক্ত মাটিতেও এই গাছ জন্মাতে পারে।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক নিয়মে বিস্তারলাভ করার পাশাপাশি কৃত্রিমভাবে বীজ বপন করেও সবেদা গাছের চারা উৎপন্ন করা যায়।

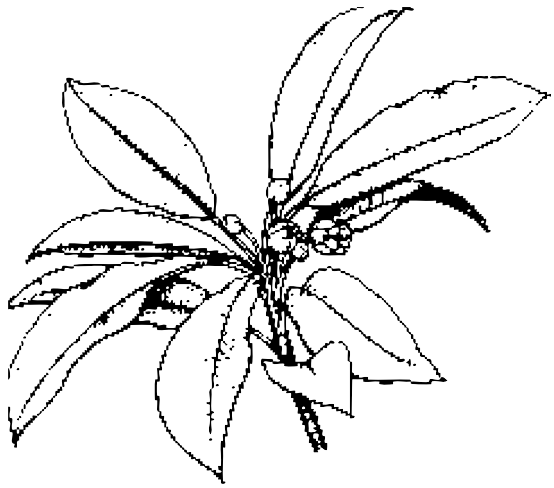
বাণিজ্যিকভাবে সবেদা চাষের জন্য সাধারণত কলমের চারা ব্যবহার করা হয়।

এছাড়া জুলাই-অগাস্ট মাসে অর্থাৎ বর্ষাকালে গুটিকলম বাঁধা যেতে পারে। সবেদা গাছের জোড়কলমের জন্য সবেদা চারা অপেক্ষা Khirni বা Khirnea (Malinkara hexandra) আদি জোড়ের (root stock) উপর জোড় বাঁধলে বেশি সফলতা পাওয়া যায়। এরকম এক বছরের চারার উপর উন্নতজাতের scion কলমের জোড় লাগিয়ে কলম তৈরি করা যায়।

সবেদা গাছের জোড়কলমের জন্য অন্য প্রজাতির Root stock, যেমন Bassia latifolia, Madhuca latifolia অর্থাৎ মহুয়া, বকুল গাছের Root stock-এর সঙ্গে grafting করে জোড়কলম করা সম্ভব। এছাড়া inarching পদ্ধতিতে কলম তৈরি করা যায়। কলমের সাহায্যে উন্নত জাতের গাছ তৈরি করে রোপণ করলে শীঘ্র ফল উৎপাদন সম্ভব হয়।

জমিতে দু'বার বা তিনবার লাঙল বা ট্রাক্টর সহযোগে চাষ দিয়ে মই দিয়ে জমির ঢাল বজায় রেখে জমি প্রস্তুত করতে হয়। অসমতল জমিতে ধাপ চাষ পদ্ধতিতে (Terrace cultivation) জমি প্রস্তুত করা হয়। জমির সীমান্তে আম, জাম, তেঁতুল, সিলভার ওক, ক্যাসুরিনা, ঝাউ ইত্যাদি লম্বা ও শক্তপোক্ত গাছ লাগিয়ে ঝড় প্রতিরোধক বেড়া তৈরি করা হয়।

সাধারণত বর্ষার আগে সবেদা গাছের চারা বা কলমগুলি রোপণ করা হয়। তবে যেখানে সেচের সুবিধা রয়েছে সেখানে যে কোনও সময়েই চারা রোপণ করা যায়। বাণিজ্যিকভাবে চাষ করার জন্য সাধারণত উন্নতজাতের গুটিকলমের গাছ রোপণ করা হয়। সাধারণত ৮.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে চারাগুলি রোপণ করা হয়। অতি ঘনভাবে রোপণের ক্ষেত্রে ৫ X ৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখা হয়। সেই হিসাবে নির্দিষ্ট দূরত্বে ৬০ X ৬০ X ৬০ সেমি মাপের গর্ত করে তাতে ৩ কেজি জৈবসার সুপার ফসফেট, পটাশ সার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দু'সপ্তাহ সূর্যের তাপে মাটি শুকনো করে নেওয়া হয়। এরপর গর্তের মাঝখানে কলমের চারাটি খুব যত্ন সহকারে লাগিয়ে শক্ত কঞ্চি বা বাঁশের লাঠির সঙ্গে বেঁধে দিতে হয়, যাতে গাছটি ঝড়ে পড়ে না যায়। দু-চারদিন, প্রতিদিন দু'বেলা চারা গাছের গোড়ায় জল দিতে হয় এবং খড় ও ঘাস দিয়ে একটু ছায়া তৈরি করার প্রয়োজন হয়।



চারা রোপণের প্রাথমিক অবস্থায় গাছগুলির ফাকে রবি ফসল ও খারিফ ফসল যেমন, কলা, পেঁপে, আনারস, কোকো, বীন কড়াই, মটরশুঁটি, টমেটো, বেগুন, বাধাকপি ও ফুলকপি, করলা, কুমড়ো ইত্যাদি সাথী ফসল হিসাবে চাষ করা যায়। এরফলে সবেদার উৎপাদনহীন বছরগুলিতে কিছু আর্থিক লাভ করা সম্ভব হয়।



পরিচর্যা –

সবেদা গাছের সেভাবে ডাল ছাঁটার প্রয়োজন পড়ে না। তবুও প্রয়োজন মতো গাছকে সঠিক আকৃতি দেওয়ার জন্য ও প্রধান কাণ্ডটি যাতে সোজাভাবে বেড়ে ওঠে তার জন্য প্রয়োজনীয় ডাল ছাঁটাই করতে হয়।

বয়স অনুযায়ী সবেদা গাছে সারের প্রয়োগ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হয়ে থাকে। গাছের বয়স যখন ১-৩ বছর থাকে, তখন ৫০ কেজি জৈবসার, ৫০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ২০ গ্রাম সুপার ফসফেট ও ৭৫ গ্রাম পটাশ দেওয়া হতে পারে। ৪-৭ বছর বয়সের গাছে ৫০ কেজি জৈবসার, নাইট্রোজেন ১০০ গ্রাম, ৪০ গ্রাম সুপার ফসফেট ও ১৫০ গ্রাম পটাশ প্রয়োগ করা হয়।

৮-১০ বছরে এই পরিমাণ দাঁড়ায়, ৫০ কেজি জৈবসার, নাইট্রোজেন ২০০ গ্রাম, ৮০ গ্রাম সুপার ফসফেট ও ৩০০ গ্রাম পটাশ এবং ১১ বছর বয়স থেকে ৫০ কেজি জৈবসার, নাইট্রোজেন ৪০০ গ্রাম, ১৬০০ গ্রাম সুপার ফসফেট এবং ৪৫০ গ্রাম পটাশ সার প্রয়োগ করতে হয়।

অর্ধেক পরিমাণ সার একবার জুন-জুলাই মাসে এবং একবার সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে দিতে হয়।

সবেদা গাছের খরা সহ্য করার ক্ষমতা অসীম। কিন্তু উৎপাদন ঠিক রাখতে হলে গ্রীষ্মকালে মাসে ৭-১০ দিন অন্তর ও শীতকালে মাসে একবার সেচই যথেষ্ট। Drip irrigation-এর মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা করতে গেলে প্রাথমিকভাবে তা ব্যয়সাপেক্ষ হলেও জমিতে একটি স্থায়ী সম্পদ তৈরি করা যায়। এরফলে অনেক বছর ধরে জমিতে উন্নত সেচের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা যায়। এই পদ্ধতিতে সেচের ব্যবস্থা করলে ৪০% জল সাশ্রয় করা যায় এবং ৭০-৭৫% আর্থিক লাভ সম্ভব হয়।

মাটিতে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে বা নিড়ানীর সাহায্যে আগাছা দমন সবচেয়ে ভাল, গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে সেখানে একটু মাটি দিয়ে উঁচু করে দেওয়া যায়, যা মিশ্র চাষের জন্য প্রয়োজন।

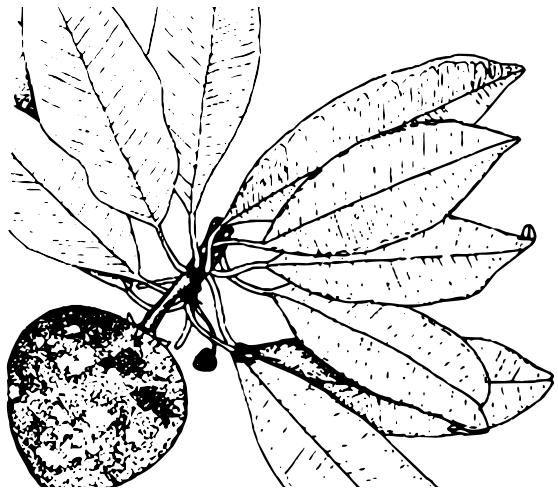
এছাড়া প্রতি হেক্টর জমিতে ২ কেজি bromacil এবং ২ কেজি diuron বছরে একবার প্রয়োগ করেও আগাছা দমন করা সম্ভব।

ফল ধরার সময়ে ৫০-১০০ P.P.M. মাত্রায় জিবারেলিক অ্যাসিড জলে গুলে গাছে স্প্রে করলে ফল ঝরে যাওয়া বন্ধ করা যায় এবং ফুল আসা ও উন্নতমানের ফল উৎপাদন সুনিশ্চিত করা যায়।

সবেদা গাছের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে, তবুও পাতাকাটা, মুকুল ও কাণ্ডছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। প্রতি লিটার জলে ২ মিলিলিটার Phosalone ৩৫ EC, Chloropyriphos ২০ EC বা Endosulfon ৩৫ EC স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়।

নিম গাছ থেকে যে জৈব কীটনাশক উৎপন্ন হয়, তা স্প্রে করেও রোগপোকার আক্রমণ প্রতিহত করা যায়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –



সবেদা ফল পেকেছে কিনা তা অনুমান করা বেশ কঠিন। কারণ একই সময় গাছে ফুল, কচি ফল ও পরিণত ফল থাকে। ফল পরিণত হলে তার রং হালকা বাদামি বর্ণের হয় এবং ত্বক মসৃণ হয়। এছাড়া এক্ষেত্রে দু-একটি ফল পেড়ে তা কেটে দেখে নেওয়া যেতে পারে। যদি দেখা যায় বীজগুলি বাদামি বা লাল রঙের হয়েছে তবে বুঝতে হবে ফল পেকেছে। জালযুক্ত লগির সাহায্যে ফলগুলি পাড়তে হয়। গাছ প্রতি উৎপাদন ৯০-১৮০ কেজি হতে পারে। তবে তা নির্ভর করে গাছের জাত ও বয়সের উপর। একটি পূর্ণবয়স্ক গাছ থেকে ১২০ কেজিরও বেশি ফল উৎপন্ন হতে পারে। ১০ বছরের পর থেকে ৩০-৩৫ বছর বয়স পর্যন্ত গাছের ফলন ক্রমশ বাড়তে থাকে। ফলগুলি পেড়ে আঠা ঝরাবার জন্য তা কিছু সময় রেখে দিতে হয়। এরপর ফলের ছোট, মাঝারি, বড় আকার অনুযায়ী বাছাই করে শুকনো পাতা, নরম কাগজের উপর সাজিয়ে (Padding) প্যাকিং করে বাজারজাত করা হয়। পাকা ফল ২-৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৮৫-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ২৫-৩০ দিন সংরক্ষণ করা যায়।

আম, কাঁঠাল, কলার মতো সবেদাও মিষ্টি স্বাদের একটি উপকারী ফল। সাধারণভাবে পাকা ফল কেটে ফলের ত্বক ছাড়িয়ে খাওয়া হয়। ফলটিকে কেটে বীজগুলি ফেলে দিয়ে চামচের সাহায্যে শাঁসটি খাওয়া যায়। খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সবেদার জেলি, জ্যাম, পানীয়, স্কোয়াশ খুবই উপাদেয়। অন্য ফলের সঙ্গে সবেদা ফলের মিশ্রণ যুক্ত সরবত খুবই সুস্বাদু। কাঁচা ফলের আঠা (Latex) চুইংগাম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

সবেদা অতি পরিচিত, মিষ্টি একটি ফল। ১০০ গ্রাম সবেদায় ৮৩ কিলো ক্যালরি শক্তি, ১৯.৯ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ০.৪৪ প্রোটিন, ১.১০ চর্বিজাতীয় পদার্থ এবং খাদ্যতন্তু ৫.৩ থাকে। এছাড়া এই ফল প্রচুর ভিটামিন ও খনিজ বা ধাতব লবণে সমৃদ্ধ।

সবেদার যথেষ্ট ঔষধি গুণও রয়েছে। এই ফলে খাদ্যতন্তু থাকায় কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। আমাশা রোগের পক্ষে সবেদা খুবই উপকারী, অন্ত্রের মধ্য থেকে বিষাক্ত Toxin দূর করে সবেদা Colon cancer প্রতিরোধ করে।

সবেদায় পর্যাপ্ত পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট (Polyphenolic compound toxin) থাকায় ভাইরাসঘটিত, ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগ সারাতে ও শরীরের জ্বালা-যন্ত্রণা কমাতে সাহায্য করে এই ফল। আবহমানকাল ধরে পেটের অসুখ সারাতে, অর্শের রক্ত পড়া বন্ধ করতে এই ফল ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। চোখের দৃষ্টি ভাল রাখতে, সর্দিকাশি প্রতিরোধ করতে, ফুসফুসের ও মুখগহ্বরের ক্যানসার রোগ প্রতিরোধ করতে এই ফল খুবই উপকারী।

জাত পরিচিতি –

ভারতে বিভিন্ন জাতের সবেদা পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জাত হল, Kalipati, Calcutta special, Pilipatti, Bhuripatti, Jumakhia, Mohon Gooti, Kittubarti, Cricket ball, Dwarapudi, Bangalora, Vavivalsa প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে Calcutta special ও Cricket ball পশ্চিমবঙ্গে চাষ হওয়া বেশ বড় আকারের সবেদার জাত।

তথ্যসূত্র - wikipedia



বেদানা

পরিচয় –

বেদানা গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Punica granatum, এটি Lythraceae গোত্রের বহুবর্ষজীবী গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ।

বেদানা একটি অতি উৎকৃষ্ট মানের বাণিজ্যিক ফল। এই গাছের আদি জন্মস্থান ইরানে ও ভারতের হিমালয় পর্বতের উত্তরাংশ। রোপণের দ্বারা প্রাচীনকাল থেকে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, আফ্রিকা মহাদেশে ও ইউরোপে এই গাছ বিস্তারিত হয়েছিল। বর্তমানে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বেদানার বিস্তার ঘটেছে। মিশরের পৌরাণিক কাব্যে ও শিল্পকলায় এবং বাইবেলেও বেদানা গাছের উল্লেখ রয়েছে। ফ্রান্সে ২০০ বছরেরও প্রাচীন ডালিম গাছ দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের দক্ষিণ অংশে ও মধ্য ভারতে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ইরান দেশ থেকে বেদানার আমদানি হয়েছিল ও বিস্তার ঘটেছিল। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বেদানার চাষ হয়। পৃথিবীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেদানা উৎপাদক দেশগুলি হল মিশর, চিন, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইরান, ইরাক, ভারত, মায়ানমার, সৌদি আরব প্রভৃতি।

ইংরেজিতে বেদানাকে Pomegranate বলে। সংস্কৃত ভাষায় বেদানা দাদমিয়া বা ডালিম, হিন্দিতে আনার, তামিল ভাষায় মাদালাই, তেলেগুতে ডালিম্মা, মালায়লাম ভাষায় দাদিমান ও বাংলা ভাষায় বেদানা বা ডালিম নামে পরিচিত।

বেদানা গাছটি একটি ছোট বৃক্ষ বা গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। এর উচ্চতা ৫-৮ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। কাণ্ড শাখাবিশিষ্ট, কাঁটা থাকতে পারে। এর পাতাগুলি বিপরীতভাবে বা কিছুটা বিপরীতমুখী, আবার চক্রাকারে শাখাপ্রশাখার উপর সজ্জিত থাকে। পাতাগুলি মসৃণ, লম্বা-চওড়ায় ৪-৮ X ২ সেমি। আয়তকার, কিন্তু পত্রের অগ্রভাগ বল্লমাকৃতির হয়ে থাকে। বেদানা গাছের ফুলগুলি কমলা-লাল বা গাঢ় লাল রঙের হয়ে থাকে। ফুলগুলি ৩ সেমি ব্যাসের হয়ে থাকে। ফুলগুলি একটি বা ২-৩টি গুচ্ছকারে শাখাপ্রশাখার উপরে জন্মায়। ফুলে ৫-৭টি বৃত্তি বা Calyx, ৫-৭টি পাপড়ি এবং অসংখ্য পুংকেশর থাকে। বেদানা ফুলের বৃত্তিগুলি ফলের মাথার উপর স্থায়ীভাবে অবস্থান করে। ডালিম বা বেদানা ফলটি পরিণত অবস্থায় ৬-১২ সেমি ব্যাসের হয়ে থাকে। ফলের বাইরের ত্বক চামড়ার মতো, লাল বা খয়েরী রঙের হয়ে থাকে। ফলে ২০০-১৪০০টি বীজ থাকতে পারে। প্রতিটি বীজের বাইরে সাদা-লাল, গোলাপী বা গাঢ় লাল রঙের রসালো আবরণ থাকে। আমরা এই রসালো অংশটি খেয়ে থাকি। এই রসালো অংশটি বীজের বাইরের ত্বক বা Sarcotesta থেকে সৃষ্টি হয়।

উপক্রান্তীয় বা উষ্ণক্রান্তীয় অঞ্চলের মাঝারি তাপমাত্রায় এবং ঠাণ্ডা এলাকার শীতকালের তাপমাত্রা ও উষ্ণ গ্রীষ্মকাল সহ্য করার ক্ষমতা এই গাছের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। তবে ফল উৎপন্ন হয় গ্রীষ্মকালেই, বেদানা গাছ খরা সহ্য করেও বেঁচে থাকতে পারে।

বেদানা গাছ বিভিন্ন প্রকার মাটিতেই জন্মাতে পারে। চূনাপাথর মিশ্রিত ক্ষারীয় গভীর মৃত্তিকা, অম্লযুক্ত দোয়াঁশ মাটিতে এই গাছ জন্মায়। উত্তর ভারতের পাথর মিশ্রিত দানাদার মাটিতেও ডালিম গাছ জন্মাতে পারে।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ -

বেদানার ফুল উভলিঙ্গ। কীটপতঙ্গ দ্বারা এই গাছের স্বপরাগসংযোগ এবং অন্য গাছের ফুলের পুংরেণুর সঙ্গে মিলন (Cross Pollination) ঘটে থাকে। স্বপরাগসংযোগে ৪৫% ফলের জন্ম হয়। Cross pollination-এর মাধ্যমে ৬৮% ফলের জন্ম হতে পারে।

বেদানার বীজ মাটিতে পড়ে আপনা থেকেই নতুন চারা জন্মাতে দেখা যায়। বাণিজ্যিকভাবে বা উৎকৃষ্ট জাতের বেদানা উৎপাদনের জন্য কাটিং-এর দ্বারা কলমের গাছ রোপণ করে চাষ করা হয়ে থাকে।

২৫-৫০ সেমি লম্বা-মাঝারি পরিণত ডাল কেটে ৫০ PPM মূল উৎপাদনে সহায়ক IBA (Indole Butyric Acid) হরমোন প্রয়োগ করে নার্সারীতে প্রায় ২০% আর্দ্রতাযুক্ত বেডে বা উপযুক্ত প্লাস্টিক ব্যাগে বা টবে একটি বা দুটি কাক্ষিক মুকুল (Bud) মাটির উপর রেখে কাটিংগুলি রোপণ করা হয়।

এইভাবে এক বছর নিয়মিত পরিচর্যার মাধ্যমে কলমের চারাগাছ তৈরি করে নির্দিষ্ট জমিতে রোপণ করে বেদানার চাষ করা হয়। ডালিম গাছের জোড়কলমের চারা তৈরির সফলতা প্রায় নেই বললেই চলে। তবে গুটিকলম ও গাছের গোড়া থেকে Root sucker রোপণের মাধ্যমেও বেদানার চাষ করা যায়। সাধারণত বর্ষাকাল গুটিকলম প্রস্তুত করার উপযুক্ত সময়।



বেদানা চাষের জন্য চিহ্নিত জমিটিকে প্রথমে লাঙল, ট্রাক্টর বা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে নিতে হয়। জমির আগাছা মুক্ত করে এবং মই দিয়ে জমির ঢাল বজায় রেখে জমি প্রস্তুত করা হয়।

সাধারণত বসন্তকালে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে এবং জুলাই-অগাস্ট মাসে উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে বেদানার চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

বেদানা চাষের জন্য চারাগুলিকে ৫ X ৫ মিটার দূরত্বে রোপণ করা উপযুক্ত। কিন্তু বেশি ঘনভাবে রোপণ (২.৫ X ৪.৫ মিটার) করলে দ্বিগুণেরও বেশি ফল উৎপাদন সম্ভব। অতি ঘন রোপণে রোগপোকার আক্রমণ বৃদ্ধি পায়।

নির্দিষ্ট দূরত্বে ৬০ X ৬০ X ৬০ সেমি আয়তনের গর্ত কেটে প্রতিটি গর্তে ৫০ গ্রাম B.H.C. ৫% বা কার্বারিল পাউডার ছড়িয়ে পোকামাকড় মুক্ত করে ফেলে রাখা হয়। তারপর গর্তগুলির উপরে মাটির সঙ্গে ২০ কেজি জৈবসার (FYM), ১ কেজি সুপারফসফেট মিশিয়ে জল ঢেলে মাটিকে চারা রোপণের উপযুক্ত করতে হয়। এরপর গর্তের মাঝখানে চারাগুলি রোপণ করা হয়। রোপণের পর থেকে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে জল দিয়ে পরিচর্যা করতে হয়।

পরিচর্যা –

বিভিন্ন জাতের ডালিমের ক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থায় কিছু হেরফের ঘটাতে হয়। তবে সাধারণভাবে মে মাসের পর থেকে বর্ষার আগে পর্যন্ত সপ্তাহে একবার এবং শীতকালে ১৫ দিন অন্তর জলসেচের প্রয়োজন হয়। ড্রিপ সেচ পদ্ধতিতে ৪৪% পর্যন্ত জলের অপচয় রোধ করা সম্ভব।

ডালিম গাছ রোপণের পর ৩-৪ বছর পর্যন্ত গাছে ফল আসে না। এই সময় উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ করে গাছটির সঠিকভাবে বৃদ্ধি ঘটিয়ে গাছটিকে ফল উৎপাদনের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। এই বয়সের প্রতি গাছে প্রতি বছর ১০ কেজি জৈবসার(FYM), ১২৫ গ্রাম ইউরিয়া, ১২৫ গ্রাম ট্রাই-অ্যামোনিয়াম ফসফেট (TSP) এবং ১২৫ গ্রাম পটাশ সার প্রয়োগ করতে হয়। উক্ত পরিমাণ সার অর্ধেক ভাগে দুই কিস্তিতে, একবার মে-জুন মাসে এবং বাকি অর্ধেক পরিমাণ সার অক্টোবর-নভেম্বর মাসে প্রয়োগ করলে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়।

পূর্ণবয়স্ক গাছের ক্ষেত্রে সারের পরিমাণ যথাক্রমে ৬০ কেজি জৈবসার (FYM), ১.৫ কেজি নাইট্রোজেন, ১.৫ কেজি ফসফেট, ১.৫ কেজি পটাশ, ৭০ গ্রাম জিপসাম একই পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

বেদানা চাষের জন্য গাছটিকে শক্ত ও মজবুতভাবে বড় করে তোলার জন্য নির্দিষ্ট উচ্চতায় (৪ মিটার) গাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা, Root Sucker কেটে একক কাণ্ড হিসাবে বড় করে তোলার জন্য কাণ্ডের ১ মিটার নীচের দিকে ডাল কেটে দেওয়া এবং শুকনো ও রুগ্ন ডাল কেটে পরিচর্যার প্রয়োজন হয়।

বেদানা চাষের জমিতে গাছের সারি ও গাছের মধ্যেকার খালি জায়গায় একই সঙ্গে ডাল জাতীয় শস্য, সবুজ সারের চাষ করা যায়। তবে বেদানা গাছের বয়স ৩-৪ বছর হয়ে গেলে আর এইভাবে মিশ্রচাষ করা সম্ভব হয় না।

বেদানা গাছে ফল ছিদ্রকারী পোকা Mealy bug, Aphids, বিভিন্ন প্রকার মথের আক্রমণ ঘটে থাকে।

জৈব ও রাসায়নিক কীটনাশক যেমন, Dimethoate, Deltamethrin বা Malathion প্রভৃতি স্প্রে করে পোকার আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব।

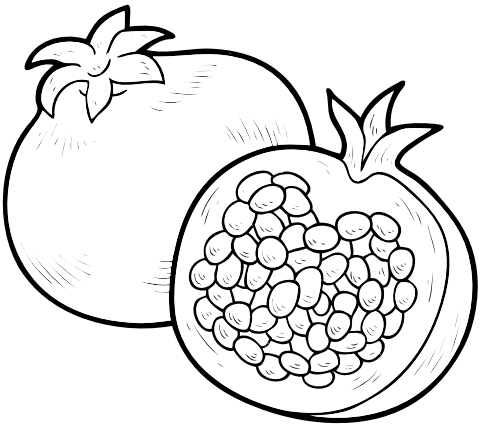
বেদানা গাছের প্রধান এবং মারাত্মক রোগ হল ফল পচে যাওয়া, ফল ফেটে যাওয়া ইত্যাদি। ২ গ্রাম Mancozeb বা ২ গ্রাম Kavach প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করে বা অন্য প্রকার ছত্রাকনাশক স্প্রে করে এক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায়। ফল ফেটে যাওয়া রোধ করতে জমিতে Calcium hydroxide প্রয়োগ করে জমিতে Calcium বা চুনের ঘাটতি পূরণ করে উপকার পাওয়া যেতে পারে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব -

৫ বছর বয়স থেকে বেদানা গাছের ফল উৎপাদন শুরু হয়। ফল ধরার ১২০-১৩০ দিনের মাথায় ফল পরিণত হয় বা সংগ্রহ করার উপযুক্ত হয়ে যায়। ফলের মাথায় বৃত্তিগুলির অবস্থান দেখে ফল পেকেছে কিনা তা বোঝা যায়। ফল পেকে গেলে ফলগুলি লালচে হলুদ রঙের হয়ে গেলে তবেই তা তোলা হয়।

ফল হিসাবে বেদানা গাছ থেকে পেড়েই খাওয়া যায়। অসুস্থ রোগীকে পথ্য হিসাবে বেদানা দেওয়া হয়। রস করে বেদানা খাওয়ার

চল খুব বেশি। ভারতে উৎপন্ন বেদানার ৭০% রস তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।



১০০ গ্রাম বেদানায় ৬৩-৭৮ কিলো ক্যালরি শক্তি, ৭২.৬–৮৬.৪ গ্রাম জল, ০.০৫–১.৬ গ্রাম প্রোটিন, ০.৯ গ্রাম ফ্যাট, ১৫.৪–১৯.৬ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ৩.৪–৫.০ গ্রাম তন্তু, ০.৩৬–০.৩৭ গ্রাম ছাই থাকে। এছাড়া ক্যালসিয়াম ৩.১২ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ৮.৩৭ মিলিগ্রাম, আয়রন ০.৩-১.২ মিলিগ্রাম, ৩ মিলিগ্রাম সোডিয়াম ও ২৫৯ মিলিগ্রাম পটাসিয়াম থাকে। পাশাপাশি এই পরিমাণ বেদানায় ভিটামিন - B1 ৬%, ভিটামিন B2 – ৪%, ভিটামিন B3 – ২%, ভিটামিন B5 - ৮%, ভিটামিন B6 – ৬%, ভিটামিন B9 – ১০%, ভিটামিন C – ১২%, ভিটামিন E – ৪% ও ১৬% ভিটামিন K থাকে।

বেদানার রস জ্যাম, জেলি, সিরাপ তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বেদানা গাছের সমস্ত অংশই চর্মশিল্পে ট্যানিন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর ফুলের রং বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত হয়।

যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় আয়ুর্বেদিক ওষুধ হিসাবে বেদানা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বেদানা ত্বকের ক্যানসার, প্রোস্টেট ক্যানসার, Osteoarthritis, Urinary Infection, মধুমেহ রোগ প্রতিরোধে খুবই কার্যকর। এছাড়া নিয়মিত বেদানা খেলে হার্টের বিভিন্ন সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বেদানা রক্ত পাতলা করে এবং রক্ত চলাচলে বাধা দূর করে। ফলের বীজ সিফিলিস রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

ভারতে ০.১২৫ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে বেদানার চাষ হয়। গড়ে প্রতি হেক্টরে ৯.১২ টন ফল উৎপাদন হয়। ২০০৮ সালের Pomegranate Industry Research & Development in India-র দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, ভারতে মোট ১.১৪০ মিলিয়ন টন বেদানা উৎপন্ন হয় এবং ৩৩,১৭৬ টন বেদানা ভারত থেকে বিদেশে রফতানি হয়।

ফলের আকৃতি ও রং অনুযায়ী বাছাই করে হিমঘরে ৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ২ মাসেরও বেশি সময় সংরক্ষণ করে রেখে বেদানা বাজারজাত করা যায়। বিদেশে বেদানা রফতানির জন্য কাগজের টুকরোর আসনের উপর সাদা Corrugated Fiber Board-এর বাক্স ব্যবহার করা হয়। তবে স্থানীয় বাজারে অবশিষ্ট ফলগুলি কার্টুনের মধ্যে উপযুক্ত আসন বা Cushioning করে বাজারজাত করা হয়। ফলের প্রচলিত মান, Grade-১২, ১২-A, ১২-B নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

স্থায়ী সম্পদের মেয়াদ ১৫ বছর ধরে বিভিন্ন খরচ-খরচা হিসাব করে দেখা গেছে, এক একর জমিতে বেদানা চাষে প্রথম ৫ বছরে গড় লাভ ৩১ হাজার ২০০ টাকা। অষ্টম বছরে গড় লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৮ হাজার ৮০০ টাকা, যা পরবর্তী বছরগুলিতে একইভাবে চলতে থাকে।

জাত পরিচিতি -

ভারতে উন্নতমানের বেদানার জাতগুলি হল, আলান্দা বা ভাদকি, ডোলকা, কুদরি, কাবুল, মুস্কাটি রেড, পেপার শেলড্, স্প্যানিশ রুবি, গণেশ (GB1), G - ১৩৭, P-২৩, P-২৬, মৃদুলা, আরক্ত, জ্যোতি ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র – Glossary of Indian medicinal plants, www.fruit-crops.com, www.nhb.gov.in, www. agricultural-info.blogspot.com, www.fecon.com, www.phytojournal.com



লিচু

পরিচয় -

লিচুর বিজ্ঞানসম্মত নাম Lichi chineusis. এটি Sapindaceae গোত্রের চিরহরিৎ উদ্ভিদ।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ২০০০ হাজার বছর (২০০০BC) আগেই লিচু চাষের কথা জানা যায়। পৃথিবীর উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এই গাছ জন্মায়। চিন দেশের দক্ষিণে গুয়াংডঙ ও ফুজিয়ান প্রদেশ লিচুর আদি জন্মস্থান। চিনে সবথেকে বেশি লিচু উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ও ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশে এবং দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার ফ্লোরিডা, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ জাপান, নিউজিল্যান্ডে লিচুর চাষ শুরু হয়েছে।

লিচুকে ফলের রানি বলা হয়। উচ্চতায় লিচু গাছ ১০-১৫ মিটার বা আরও বেশি বড় হতে পারে। বিভিন্ন জাতের লিছু গাছের আকার ও আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। গাছের কাণ্ড কালচে ধূসর রঙের হয়। লিচু গাছের পাতা ১০-২৫ মিটার লম্বা হয়। পাতাগুলি যৌগিক প্রকৃতির। লম্বা পত্রাক্ষের (Rachis) উপর একান্তরভাবে বা সামান্য বিপরীতমুখীভাবে সজ্জিত থাকে। পত্রবৃন্তে ২- ৮ জোড়া পত্রক (Leaflet) থাকতে পারে। পত্রকগুলি (Leaflet) বক্রাকার (eliptical) বা বল্লমাকার (lanceolate)। লম্বা ও চওড়ায় যথাক্রমে ৭.৬ -১৭ × ২.৫ -৬.৪সেমি। গাঢ় সবুজ বর্ণের ও মসৃণ হয়। কচি পাতা গোলাপী বা তামাটে লাল রঙের হয়। লিচু গাছের ফুল শাখাযুক্ত মঞ্জরীর অগ্রভাগে দণ্ডের উপর জন্মায়। জাত অনুযায়ী নভেম্বর-এপ্রিল মাস পর্যন্ত লিচু গাছে ফুল আসার সময়। ফুলগুলি খুব ছোট সবুজাভ হলুদ বা বাদামি হলুদ বর্ণের হয়। ফুলের পুংকেশরের সংখ্যা ৪টি। মঞ্জরীদণ্ডের নিচের দিকের ফুলগুলি পুরুষ ফুল, দ্বিতীয় ধাপের ফুলগুলি উভলিঙ্গ ফুল কিন্তু স্ত্রী ফুলের চরিত্র বিশিষ্ট। উপরের স্তরের ফুলগুলি অপরিণত উভলিঙ্গ বা কিছুটা পুরুষ প্রকৃতির হয়। মঞ্জরীতে অবস্থিত ফুলের মধ্যে মাত্র ২০% ফুল ফলের জন্ম দিতে সক্ষম। লিচু সরস প্রকৃতির ফল। যা ফুল আসার পর থেকে ৮০-১১২ দিনে পরিণত হয়। ফলের আকার গোল বা ডিম্বাকৃতি হতে পারে। ফলগুলি পাকলে গোলাপী বা লাল বর্ণের হয়। ফলের আবরণ অমসৃণ, কাঁটাকাঁটা মতো, খসখসে। ফলের খোসাটি সহজেই ছাড়িয়ে সুগন্ধযুক্ত, মিষ্টি, রসালো সাদা আবরণটা আমরা খেয়ে থাকি। এখন বিভিন্ন উন্নত জাতের লিচু চাষ করা হয়, যার বীজের আকার অত্যন্ত ছোট এবং শাঁসের পরিমাণও অনেক বেশি। এই জাতের ফল উৎকৃষ্ট ও দামী। টাটকা ফলের স্বাদ ও গন্ধ সব সময় বেশি থাকে।

১২৫-২০০ সেমি বৃষ্টিপাত যুক্ত উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে লিচু চাষ ভাল হয়। তুষারপাত হয় এমন জায়গা লিচু চাষের পক্ষে ভাল নয়। দীর্ঘ গ্রীষ্মকাল, বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতার আধিক্য লিচু চাষের উপযুক্ত। লিচু আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ভাল হয়। সমতল থেকে থেকে ৮০০ মিটার উচ্চ জমিতে লিচু গাছ জন্মায়। কিন্তু ৮০০ মিটারের কম উচ্চতার জমিতে লিচু বেশি ভাল হয়। তুষারপাত, শুষ্ক গ্রীষ্মকাল লিচু চাষের পক্ষে ক্ষতিকারক। পরাগসংযোগের পরপর পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত বা জলসেচের প্রয়োজন হয়। তাপমাত্রা লিচু গাছের ফুল উৎপাদনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। তাপমাত্রার তারতম্যে লিচু গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধি বেশি হয়, কিন্তু ফুলের বৃদ্ধি কমে যায়। চিন এবং ভারত যেহেতু নিরক্ষরেখার ১৫-৩০ ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত তাই এই দুটি দেশেই উষ্ণ জলবায়ু ও ক্রান্তীয় উষ্ণ জলবায়ুর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাই দেশের বিভিন্ন জায়গার জমির উচ্চতা ও তাপমাত্রার তারতম্য ঘটে। পাহাড়ী অঞ্চলের অনেক প্রকার লিচু গাছে কম তাপমাত্রার কারণে কিছুই হয় না। আবার ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারা হার্ডি নামক জাতের গাছে লিচু হলেও, তা খুব টক হয়। তাই তাপমাত্রার হেরফেরে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় প্রতি বছর লিচুর উৎপাদন কম- বেশি হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে শীতকালের তাপমাত্রা ১০-১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকলে ১০০% মুকুল জন্মায়। ২০-২৫ ডিগ্রী ও ৩০-৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় লিচুর মুকুল জন্মায় না। পরিবর্তে পত্র- মুকুল উৎপন্ন হয়। ফল জন্মানোর আগে বা মুকুল আসার আগে ৬ সপ্তাহ ধরে ১৫/১০ ডিগ্রী – ২০/১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা বা তুষারপাত ঘটলে লিচুর ফুল নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি ছোট গাছ মরেও যায়।

উপযুক্ত নিকাশীযুক্ত অল্প অম্ল প্রকৃতির জৈব পদার্থপূর্ণ মাটিতে লিচু ভাল জন্মায়। ৬-৭ PH-এর উর্বর গভীর পলিমাটিতে ও শুষ্ক তাপমাত্রার বালি মাটিতে, কাদামাটি (দোঁয়াশ) লিচু চাষের উপযুক্ত। ১.২৫ মিটার গভীরতা বিশিষ্ট সামান্য অম্ল মাটি বা নিরপেক্ষ মাটি লিচু গাছের পক্ষে বেশি ভাল। লিচুর মূল (Root) একপ্রকার Mycorrhizal fungi-র সঙ্গে মিথোজীবী সমন্বয়ে বেড়ে ওঠে। ওই ছত্রাকটি লিচু গাছের পুষ্টি ও বৃদ্ধির সহায়ক।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ -

প্রায় ১১ প্রকার মৌমাছি, মাছি, পিপঁড়ে, বোলতা লিচু গাছের পরাগসংযোগকারী পতঙ্গ। তবে Apts cerena, A. dorsata, A.

florea ৭৮% পরাগসংযোগ (pollination) ঘটায়। মুকুল আসার আগে ২০-২৫ বাক্স মৌমাছি এক হেক্টর জমির লিচু পরাগসংযোগের (pollination) পক্ষে উপযুক্ত। মৌমাছিরা সকাল ৬-১১টার মধ্যে মধু সংগ্রহ করতে আসে। মাত্র ১-২.৫% ফুল থেকে ফল জন্মায়।



মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে লিচু বীজের অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। আবার বীজের গাছ থেকে পছন্দ মতো গুণের লিচু পাওয়া যাবে কিনা তারও নিশ্চয়তা থাকে না । এছাড়া বীজের গাছ থেকে ফল পেতে ৫-১২ বছর অপেক্ষা করতে হয়। বীজের গাছ তৈরিই করা হয়, জোড়কলমের Rootstock হিসাবে ব্যবহারের জন্য। উৎকৃষ্ট গুণমানের গাছের ডালে গুটিকলম বেঁধে কলম তৈরি করে লিচু চাষ সবচেয়ে জনপ্রিয়। নির্বাচিত গাছের ২-৩ সেমি মোটা এবং ৩০-৬০ সেমি লম্বা সুস্থ ডালে কলম বাঁধার জন্য নির্বাচন করা হয়। উক্ত ডালের গোড়ার দিকে একটু ছেড়ে ছাল কেটে তারপর মূল বা শিকড় উৎপন্নকারী হরমোন IBA ৫০০ PPM লাগিয়ে জৈবসার আর নারকোল ছোঁবড়া দিয়ে ঢেকে পলিথিন কাগজ দিয়ে ভালভাবে জড়িয়ে বেঁধে রাখা হয়।

কলমের গুটিতে নিয়মিত জল দিলে গুটিতে শিকড় উৎপন্ন হতে থাকবে। ১০০ দিনে উপযুক্ত কলম তৈরি হয়ে যায় এবং গাছ থেকে কেটে পলিথিন ব্যাগে নার্সারী প্লটে লাগিয়ে ছায়াযুক্ত স্থানে যত্ন করে বড় করে নির্দিষ্ট জমিতে রোপণ করা হয়।

এছাড়াও অন্য পদ্ধতিতে গুটিকলম তৈরি করা হয়। চিনে বিভিন্নভাবে গুটিকলম তৈরি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। গুটিকলম করার ৯২ প্রকার পরিবর্তন (Modification) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উন্নত পদ্ধতিতে ৬ সপ্তাহের মধ্যে কলমের শিকড় উৎপন্ন করে নার্সারী container (plastic bag)-এ রোপণ করা সম্ভব হচ্ছে। গাছের ডালকে বেঁকিয়ে মাটিতে ঠেকিয়ে শিকড় উৎপন্ন করে কলম তৈরি অনেক দিনের পুরনো পদ্ধতি।

পাহাড়ী লিচু গাছের চারা (Rootstock) বানিয়ে তার সঙ্গে উৎকৃষ্ট মানের লিচু গাছের ডালের জোড়কলম করে রোপণ করেও লিচুর চাষ করা সম্ভব। যদিও জোড়কলমের চারা নার্সারীতে ২ বছর ধরে যত্নে রাখার পর রোপণ করা সম্ভব হয়। কলমের গাছে ২-৫ বছরের পর থেকে ফল উৎপাদন শুরু হয়ে যায়।

Stooling পদ্ধতিতে ভারতে বর্তমানে খুব কম খরচে উন্নতমানের ৮১-৮২% survival- plant তৈরি করা হচ্ছে। যেখানে গুটিকলমে তৈরি চারার survival Rate ৪০-৫০%। লিচু গাছের গুটিকলম নিয়েও অনেক modification করা হয়েছে। লিচু গাছে গ্রাফটিং করা খুব অসুবিধাজনক। তাই লিচু গাছের গ্রাফটিং জনপ্রিয় নয়।

যে গর্তে চারা রোপণ করা হয় সার-মাটি দিয়ে ভর্তি করে তা ২ সপ্তাহ ফেলে রাখতে হয়। অক্টোবর মাসে একবার, ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে একবার, জুন-জুলাই মাসে আর একবার সার প্রয়োগ করে যথাযথ পরিচর্যা করে ২-২.৫ বছর ধরে গাছটি বড় করতে হয়। এরপর গাছটিকে মাটির উপরে ১০ ইঞ্চি থেকে ১ ফুট কাণ্ড রেখে কেটে ফেলতে হবে। কাটা কাণ্ডের গোড়া থেকে অনেকগুলি নতুন ডাল উৎপন্ন হবে। ডালগুলির একটি বাদে বাকিগুলি গোড়ার দিকের ছাল রিং (Ring) আকারে তুলে শিকড় উৎপাদনকারী হরমোন (IBA ২৫০০ ppm) প্রয়োগ করে ১০ দিন ফেলে রেখে চারাগুলির গোড়ায় ১০-১৫ সেমি উঁচু করে মাটি ঢেকে দিতে হবে। এরপর ২ মাসের মধ্যে শিকড় উৎপন্ন হয়ে যাবে। তখন চারাগুলিকে কেটে আলাদা করে এক বছর নার্সারীতে যত্ন সহকারে ছায়ায় রেখে পরে অন্যত্র রোপণ করা হয়।

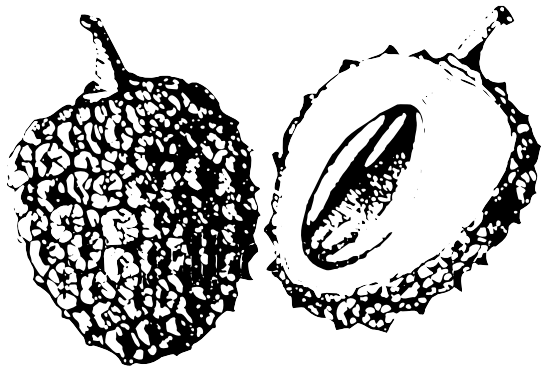
নির্দিষ্ট জমিতে চারা রোপণের আগে ভালভাবে চাষ দিয়ে আগাছা মুক্ত করে জমিতে জৈবসার প্রয়োগ করে ফেলে রাখতে হবে। তারপর মই দিয়ে জমির ঢাল বজায় রেখে সমান করতে হয়।

জমিতে গাছগুলি বড় হলেও যেন সঠিকভাবে সূর্যের আলো পায় তা মাথায় রেখে চারা রোপণ করা হয়। ৮ × ১০ মিটার দূরত্বে সারি ও দুটি গাছের মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখে চারা রোপণ করা হয়। চারা রোপণের আগে ১ × ১ × ১ মিটার আয়তনে গর্ত করে প্রতি গর্তে ২০-২৫ কেজি জৈবসার বা গোবর সার, ২ কেজি হাড়ের গুঁড়ো ও ৩০০ গ্রাম পটাশ জল দিয়ে ফেলে রাখতে হয়। লিচু গাছের মূল বা শিকড়ের সঙ্গে একপ্রকার ছত্রাকের মিথোজীবীতা রয়েছে। তাই পুরনো গাছের গোড়া থেকে এক ঝুড়ি করে পুরনো মাটি ওই গর্তে দিয়ে দেওয়া হলে ভাল। এরপর অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বা বর্ষার পর গর্তের মাঝখানে লিচু গাছ রোপণের উপযুক্ত সময়।

পরিচর্যা -

কালবৈশাখী বা ঝড়ের হাত থেকে লিচু গাছকে রক্ষা করতে জমির চারদিকে Wind breaker হিসাবে বড় বড় গাছ লাগানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে আম, ইউক্যালিপটাস, জাম প্রভৃতি গাছ উপযুক্ত হতে পারে।

চারা লাগানোর পর চারার চারপাশে Sesbania-র বীজ বপন করে বেড়া তৈরি করলে, ঝোড়ো হাওয়ার পাশাপাশি তা চড়া রোদের হাত থেকেও গাছগুলিকে রক্ষা করে।



মাটির আর্দ্রতা অনুযায়ী মাঝেমধ্যে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। মাটি শুষ্ক থাকলে বা গ্রীষ্মে ৪বছর বয়সের গাছে সপ্তাহে একবার সেচ দেওয়ার প্রয়োজন। সার প্রয়োগের পর সেচ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। পরিণত বাগানে গাছে ফল ধরার পর সেচ দেওয়া প্রয়োজন, এতে ফলের বৃদ্ধি ও গুণগত মান ভাল হয়।

নতুন রোপণ করা গাছে সার প্রয়োগ না করাই বাঞ্ছনীয়। জৈবসার প্রয়োগ করে রোপণের পর কেবলমাত্র নিয়মিত জল দেওয়াই প্রাথমিক কাজ। তবে গাছ লাগানোর ২ সপ্তাহ পরে প্রতি গাছের গোড়ায় ৫০ গ্রাম DAP সার প্রয়োগ করতে হবে। এরপর প্রতি ২ মাস অন্তর DAP প্রয়োগ করে যেতে হবে।

পরে চারা গাছটি যখন সতেজ হয়ে বেড়ে উঠবে, তখন গাছের গোড়ার থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা উচিত। সাধারণত খোল ও পাঁক মাটি গাছের গোড়ায় প্রয়োগই যথেষ্ট। কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য জমির উর্বরতা সাপেক্ষে ও গাছের বয়স ও আকার অনুযায়ী প্রতি গাছে বছরে দু'বার সার প্রয়োগ করতে হয়। পটাশ সার ১.৩৬ কেজি , ফসফেট ৪৫৪ গ্রাম, ৪৫৪ গ্রাম নাইট্রোজেন, চুন ৩৪০ গ্রাম ও ২২৮ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম থাকে।

ফেব্রুয়ারি – মার্চ মাসে জৈবসার, সুপার ফসফেট এবং পটাশ, ২ বা৩ কিস্তিতে বা ফেব্রুয়ারির মাঝে নাইট্রোজেন, জিঙ্ক ও জিঙ্ক সালফেট ফল পাকার সময় গাছ প্রতি ৫০ গ্রাম বা ০.২% জলে গুলে ডিসেম্বর মাসে স্প্রে করতে হবে। বোরনের ঘাটতি পূরণ করার জন্য ৫০-৬০ গ্রাম boric acid জুন মাসে বা যখন অন্য সার প্রয়োগ করা হবে তার সঙ্গেও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সাধারণভাবে লিচু গাছের ডাল ছাঁটার প্রয়োজন হয় না। ফল পাড়ার সময় ফলের থোকার অনেকটা পিছন থেকে ডাল কেটে ফল তোলা বা পাড়া হয়। এই সময় তাই স্বাভাবিক কারণেই কিছুটা ডাল ছাঁটাই হয়ে যায়।

লিচু চাষের জমিতে লিচু গাছ রোপণের পর কয়েক বছর গাছগুলির ফাঁকা জায়গায় শিম্বগোত্রের গাছ যেমন, খেসারি, মটরশুটি, বিনস্, শাক-সবজি, আনারস, ছোলা প্রভৃতি অল্প দিনের ফসল চাষ করে উৎপাদনহীন বছরগুলিতে কিছু আর্থিক লাভ সম্ভব।

লিচু গাছে ফুল আসা বা মুকুল ধরা সুনিশ্চিত করতে এবং ফুল আসলে ফুল যাতে খসে যায় তার জন্য হরমোন স্প্রে করা বাণিজ্যিক চাষকে লাভজনক করার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত জরুরি পরিচর্যা। অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে অক্সিন ও অন্যকিছু হরমোন যেমন, Ethrel @১৫০ PPM, নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে Ethrel @ ৪০০ PPM মাসে দু'বার, আবার অগাস্ট – সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রাথমিক শাখাগুলির ডগায় এই হরমোন স্প্রে করে সফলভাবে ফুল ফোটানো বা মুকুল আসা সুনিশ্চিত করা যায়। গাছের কাণ্ডে ও গাছের ডালে Girdling করে বেশি ফল উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু প্রতি বছর এই পদ্ধতিতে গাছের প্রচুর ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

ফল ধরার পর বিভিন্ন জাতের গাছের কচি ফল ঝরে পড়া বা খসে পড়ার হার বিভিন্ন রকমের হয়। প্রতিকূল জলবায়ু, হরমোনের মাত্রার ঘাটতি বা রোগপোকার কারণে ফল ঝরে পড়ে যায়। এছাড়া কলি চুনের সঙ্গে জিঙ্ক সালফেট মিশিয়ে এক সপ্তাহ অন্তর স্প্রে করলে এবং সেচ দিয়ে মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখলে ফল ঝরে যাওয়া কমানো যায়। কাণ্ডছিদ্রকারী এবং গাছের ছাল খাওয়া পোকা লিচু গাছের ক্ষতি করে।

প্রায় সর্বত্রই লিচু গাছের পাতাতে যে পোকা আক্রমণ করে তা হল, erinose (Aceria Litchii)। পাতাগুলি মোটা হয়ে কুঁচকে নষ্ট হয়ে যায়। পাতার নিচের দিকে উলের মতো বাদামি রঙের স্তর গঠন করে।

Dudua aprobola-এর আক্রমণে পাঞ্জাবের সমস্ত লিচু গাছের ক্ষতি হওয়ার নজির রয়েছে। চিনে Sting bug (Tessoralonea Papillosa) নামক শোষক পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। গাছের ডাল ঝাঁকিয়ে পোকাগুলিকে মাটিতে ফেলে কেরোসিন তেল দিয়ে মেরে পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। মাকড় জাতীয় পোকা এবং কাণ্ডছিদ্রকারী পোকা লিচু গাছের সবচেয়ে ক্ষতি করে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এবং ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে যখন নতুন শাখা-প্রশাখা জন্মায় তখন রোগপোকার আক্রমণ বেশি হয়।

কাণ্ডছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ প্রতিহত করতে ০.০১% Cypermethrin এক সপ্তাহ অন্তর দু'বার স্প্রে করা যেতে পারে।

ভারতের কোথাও লিচু গাছে ছত্রাকঘটিত রোগের নজির নেই। তবে ফলের পচনরোগ রুখতে যে কোনও ছত্রাকনাশক স্প্রে করা যায়। তবে ফল তোলার ২০ দিন আগে কোনও ওষুধ স্প্রে করা গাছের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

লিচু গাছে fruit cracking ও fruit dropping, এই দু'ধরনের শরীরবৃত্তিয় রোগ দেখা যায়। এই দুই প্রতিবন্ধকতায় ফলের

গুণমান ও উৎপাদনে ভীষণ ক্ষতি হয়। জমিতে আর্দ্রতার অভাব ফল ফেটে যাওয়ার প্রধান কারণ। তাই জমিতে ফল ধরার পর আর্দ্রতা পরখ করে সেচ দেওয়া ও ফল ধরার পর ১০ দিন অন্তর ২০ PPM NAA পাতায় স্প্রে করতে হয়। সেচ দেবার সাথে ২০% DASM তিনদিন অন্তর মে-জুন মাসে প্রয়োগ করে এই রোগ প্রতিরোধ করা হয়। এছাড়া ০.৪% বোরিক অ্যাসিড স্প্রে করলে ভাল।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

সাধারণত মে-জুন মাসে লিচু গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করা হয় এবং কোনও পূর্ণবয়স্ক গাছ থেকে বছরে ৪০-১০০ কেজি পর্যন্ত লিচু পাওয়া যেতে পারে। গুটিকলমের গাছ ২-৫ বছরের মধ্যে ফল দেওয়া শুরু করে। লিচু গাছ ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে ফল দিতে পারে।

বেশিরভাগ লিচুই গাছ থেকে পেড়ে খোসা ছাড়িয়ে ফল হিসাবে খাওয়া হয়। আইসক্রীম, ফ্রুটজুস (ফলের সরবত), লিচুর পিউরি প্রভৃতি তৈরিতে লিচু ব্যবহার করা হয়। লিচুর শাঁস টিনজাত করে বিদেশে রফতানি করা হয়।

১০০ গ্রাম লিচুতে ৬৩-৬৪ কিলো ক্যালরি শক্তি, ৮১.৯ – ৮৪.৩৩% জল, ০.৬৮ -১.০ গ্রাম প্রোটিন,০.৩ – ০.৫৮ গ্রাম ফ্যাট, ১৩.৩১–১৬.৪ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ০.২৩-০.৪ খাদ্যতন্তু, ০.৩৭–০.৫ কার্বন অ্যাশ, ৮.১০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ৩০–৪২ মিলিগ্রাম ফসফরাস, ০.৪ মিলিগ্রাম আয়রন, ১৭০ মিলিগ্রাম পটাসিয়াম, ২৮ মাইক্রোগ্রাম থিয়ামিন, ০.৪ মিলিগ্রাম নিকোটিন অ্যাসিড, ০.০৫ মিলিগ্রাম রাইবোফ্ল্যাভিন ও ২৪-৬০মিলিগ্রাম অ্যাসকরবিক অ্যাসিড থাকে।

বিভিন্ন জাতের লিচুর খাদ্যগুণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। সাধারণভাবে ভাল জাতের লিচুতে শর্করা, ভিটামিন B1 (Riboflavin) , ভিটামিন C ছাড়াও ০.৭% প্রোটিন, ২.২৫% ফাইবার, ০.২১% ক্যালসিয়াম, ০.৩১% ফসফরাস, ০.০৩% আয়রন ও ক্যারোটিন থাকে। লিচু ফলের থেকে লিচু শুকনো চিনাদের কাছে বেশি প্রিয়। লিচু থেকে মদ তৈরিও হয়।

পৃথিবী বিভিন্ন দেশের মধ্যে যেখানে ২৮% লিচু রফতানি করে দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড করে ২৫%, চিন ২৫% লিচু রফতানি করে, সেখানে দেশীয় বাজারে অসম্ভব চাহিদা থাকার কারণে ভারত মাত্র ১% লিচুই বিদেশে রফতানি করতে পারে। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি লিচু হয় চিনে। ভারতের স্থান দ্বিতীয়। দেশের ৬.১ হাজার হেক্টর জমিতে লিচু চাষ হয়। জাতীয় উদ্যান প্রতিপালন দফতরের হিসাব অনুযায়ী, ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লিচু চাষ হয় বিহারে। তারপরেই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। বিহারে ২৭.৭ হাজার হেক্টর জমিতে আর পশ্চিমবঙ্গে ৫.৯ হাজার হেক্টর জমিতে লিচুর চাষ হয়। বিহারে উৎপাদন ২২১.৭ হাজার মেট্রিক টন (গড়ে প্রতি হেক্টরে ৮ মেট্রিক টন) এবং পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদন ৬১.৪ হাজার মেট্রিক টন (গড়ে ১০.৫ মেট্রিক টন প্রতি হেক্টরে)।

প্রান্তিক কৃষকেরা উৎপাদিত লিচু ঝুড়িতে বা কার্টুনে করে গাছের পাতা বা শুকনো পাতার আবরণে ঢেকে স্থানীয় বাজারে নিয়ে গিয়ে খুচরো দরে বিক্রি করেন বা পাইকারি বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে দেন। তবে বাণিজ্যিক চাষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফসল তোলার আগে কৃষক তার পুরো জমির লিচু গাছ লিজে দিয়ে দেন অথবা কোনও কন্ট্রাক্টরকে দিয়ে দেন (বিক্রি করে দেন)। এরপর ওই কনট্রাক্টর ফসল তুলে তা বাছাই ও প্যাকিং করে পাইকারি বিক্রেতার কাছে বেচে দেন। পাইকারি বিক্রেতার হাত থেকে ওই লিচু কমিশন এজেন্ট, স্টকিস্ট ও খুচরো বিক্রেতার হাত ঘুরে আমাদের কাছে আসে।

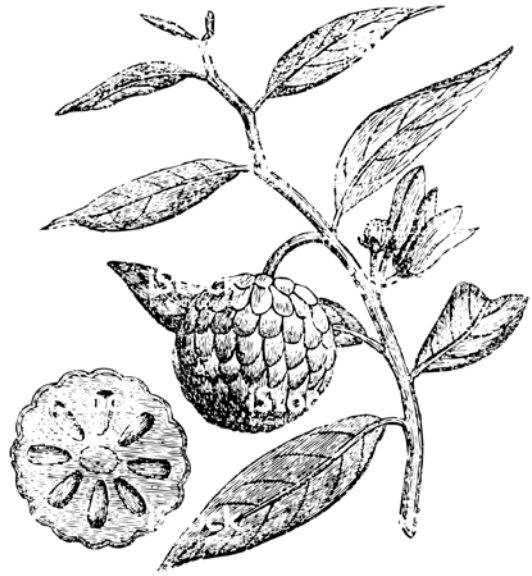
জাতীয় উদ্যান প্রতিপালন দফতরের হিসাব বলছে, এক একর জমিতে লিচু চাষ করতে মোট খরচ হয় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ৫ বছরে ওই জমি থেকে মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়াবে ১ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। অর্থাৎ প্রতি বছরে ওই জমি থেকে লিচু চাষে আনুমানিক লাভ হবে ৩৫ হাজার ৬০০ টাকা।

জাত পরিচিতি –

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে একাধিক জাতের লিচুর চাষ হয়ে থাকে। বিহার ও ঝাড়খণ্ডে China, Deshi, Purbi, Early & Late Bedena, Mclean, Muzzaffarpur, Rose Scented, Shahi ও Kasba, ওড়িশায় Muzzaffarpur, Bombai ও China, পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় Saharanpur, Dehradun, Calcuttia, Muzzaffarpur, Seedless(Late) ও Rose Scented, উত্তরাঞ্চলে Rose Scented, Calcuttia ও Early & Late Seedless, উত্তরপ্রদেশে Seedless Early, Seedless Late, Early Large Red, Late Large Red, Calcutta, Rose Scented ও Dehradun, পশ্চিমবঙ্গে Muzzaffarpur, China, Deshi, Purbi, Elachi Early, Elachi Late, Bombai, Goothi, Bedana, Potee ও Kalyani Selection

এছাড়া চাষের বৈচিত্র্যের কারণে বিভিন্ন স্থানীয় জাতের লিচু তৈরি হয়েছে। যেমন, বোম্বাই, মুজফ্ফরপুর, দেরাদুন, শাহী, চায়না, কসবা, রোজ সেন্টেড, ইলাচি ও পূর্বি। আসলে ভারতে বিভিন্ন জাতের লিচুর চাষের কথা শোনা যায়। তবে হয়তো একই জাতের লিচুই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে পরিচিত।

তথ্যসূত্র – www.nhb.gov.in



আতা

পরিচয় –

আতার বিজ্ঞানসম্মত নাম Annona squamosa , এটি Annonaceae গোত্রের উদ্ভিদ।

আতা গাছের প্রকৃত জন্মস্থান কোথায় তা জানা যায়নি। তবে মনে করা হয়, ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে শুরু করে মেক্সিকো হয়ে দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা ও পৃথিবীর উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের দেশগুলিতে এর প্রসার ঘটে। আবার এমনও মনে করা হয়, ভারত বা মধ্য আমেরিকা ছিল আতার আদি জন্মস্থান। সম্ভবত ১৫৯০ সালে ভারতে পর্তুগীজরা এই আতা গাছ রোপণ করেছিলেন। যা ধীরে ধীরে গোটা দেশে প্রাকৃতিক উদ্ভিদ রূপে ছড়িয়ে পড়ে। সকলের কাছে আতা অতি প্রিয় একটি ফল।

ইংরেজিতে আতাকে Custard apple বলে। হিন্দিতে আতাকে সীতা ফল বা সরীফা বলে। মণিপুরীরাও একে ওই একই নামে ডাকে। অসমীয়া ভাষায় আতাকে কাতাল, তামিল ও তেলেগু ভাষায় যথাক্রমে সীতা ফলম ও সীতা ফলেসু বলে। বাংলায় এই ফল আতা নামেই পরিচিত।

আতা গাছ ছোট আকৃতির ও গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। শীতকালে এই গাছের পাতা কম-বেশি ঝরে যায়। তাই একে পর্ণমোচী বা অর্ধ-পর্ণমোচী উদ্ভিদও বলা হয়। গাছটি উচ্চতায় ৩-৬ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। কাণ্ডের উপর ডালপালাগুলি এলোমেলোভাবে জন্মায়। পাতাগুলি শাখপ্রশাখায় একান্তরভাবে সজ্জিত থাকে। পাতাগুলি কিছুটা আয়তাকার, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ৫-১৫ সেমি X ২-৫ সেমি হতে পারে। পাতাগুলি হালকা সবুজ রঙের হয়। এই গাছে পাতা রোমযুক্ত হয় এবং পাতায় একপ্রকার গন্ধ থাকে। শাখাগুলিতে পাতার বিপরীত দিক থেকে একটি করে বা একসঙ্গে ২-৪টি মলিন হলুদ বা সবুজ হলুদ রঙের ফুল জন্মায়। ফুলগুলি উভলিঙ্গ, ২.৫ -৩.৫ সেমি ব্যাসের। ফুলে ৬টি পাপড়ি থাকে। বাইরের রং সবুজ ও ভিতরটা ক্রীম রঙের হয়। ফুলগুলি বৃন্তযুক্ত ও নিচের দিকে ঘণ্টার মতো ঝুলে থাকে, কখনও সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয় না অর্থাৎ পাপড়িগুলি পুরোটা খোলে না। পাপড়িগুলি পুরু, ফুল মিষ্টি গন্ধযুক্ত। বাইরের ৩টি পাপড়ির ভিতরে আঁশের মতো আরও ৩টি পাপড়ি থাকে। পাপড়ির ভিতর দিকে লালচে-বেগুনী ছোপ দেখা যায়।

আতা গাছের ফলটি যৌগিক প্রকৃতির , গর্ভদন্ডের উপর অবস্থিত প্রতিটি ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়ে বহু সংখ্যক ফল গর্ভাশয়ের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়ে যৌগিক প্রকৃতির ফলটি তৈরি হয়। ফলগুলি ডিম্বাকার বা গোলাকার হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফলের বাইরের ত্বকটি সবুজ রঙের হয়। ফলত্বক উঁচু-নিচু ও অমসৃণ প্রকৃতির হয়। এই উঁচু-নিচু অংশগুলিকে স্থানীয় ভাষায় চোখ বলে। ফলটি পাকলে চোখগুলি মধ্যেকার ফাঁকটা বাড়ে, একে চোখ ছেড়েছে বলা হয়। এই সময় ফলগুলি সংগ্রহ করে নিতে হয়। ফলগুলি পেকে লালচে রঙের হয়। পাকা ফলের মধ্যে সাদা বা ঘিয়ে রঙের দানাদার, সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত মাখনের মতো মিষ্টি পদার্থ থাকে এবং ফলের মাঝখান পর্যন্ত বিস্তৃত গর্ভদণ্ডটির উপর সাদা মিষ্টি সুগন্ধ যুক্ত পুরু শাঁসের আবরণ যুক্ত কালো রঙের বীজগুলি থাকে। বীজগুলি ৬-১০ সেমি ব্যাসের হয়। আতা ফল লালচে রঙের হয়।

আতা গাছ উষ্ণ জলবায়ুর উদ্ভিদ, ১০-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা এই গাছের পক্ষে উপযুক্ত। হিমালয়ের কাছাকাছি তাপমাত্রায় আতা গাছের চারা মারা যায়। আবার তাপমাত্রা বেশি হলেও উৎপাদন কম-বেশি হয়। আতা গাছ গরম সহ্য করতে পারলেও অতিরিক্ত তাপমাত্রা গাছ ও ফলের ক্ষতি করে। ৭৫০-১২০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত এই গাছের জন্য উপযুক্ত। ফুল ফোটার সময় ৬০% আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকলে ভাল।

বালিযুক্ত লোম মাটি হলে এই গাছ সবচেয়ে ভাল হয়। তবে কাদাযুক্ত লোম মাটির ক্ষেত্রে মাটির গভীরতা ১ মিটার এবং জল নিকাশীর সুবন্দোবস্ত থাকা চাই। সম্ভব হলে যে জমিতে টমেটো, আলু, বেগুন, আদার চাষ করা হয়েছে ওই জমিতে আতার চাষ না করাই ভাল। কারণ ওই ফসল আশ্রিত ব্যাকটেরিয়া আতা গাছের ক্ষতি করে।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

পাকা আতার বীজ মানুষ, পাখি বা অন্যান্য প্রাণীর দ্বারা স্বাভাবিকভাবে প্রসারিত হয়ে বীজ থেকে নতুন আতা গাছ জন্মাতে পারে। এছাড়া জলের স্রোতে বীজ অন্যত্র ভেসে গিয়েও প্রাকৃতিকভাবে নতুন গাছের জন্ম হতে পারে।

তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬০% -এর নীচে থাকলে আতা গাছের পরাগমিলন ভাল হয় না। আবার ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ৮০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় আতার পরাগমিলন কিন্তু ভাল হয়। এছাড়াও আতা গাছের ফুলের



পরাগসংযোগের হার খুব কম। কারণ এই ফুলে Cantharophily pollination syndrome লক্ষ্য করা যায়, এরফলে পুংকেশর ও গর্ভকেশর একই সঙ্গে পরিণত হয় না এবং স্বপরাগমিলনও সম্ভব হয় না। Carpophilus dimidiatus এবং Carpophilus hemipterus, এই দুই প্রকারের পোকা আতা ফুলের পরাগসংযোগ ঘটাতে সাহায্য করে। তাই হাতের সাহায্যে কৃত্রিম পরাগসংযোগ ঘটিয়ে উৎপাদন সুনিশ্চিত করা যেতে পারে।

এক্ষেত্রে ২০-৩০ টি Pollen তুলির সাহায্যে নাড়িয়ে পাত্রে সংগ্রহ করে ফ্রিজে রেখে দিতে হয়। পরের দিন সকালে একইভাবে পাত্রের রেণু প্রয়োগ করে ৫০-৬০টি ফুলের পরাগসংযোগ ঘটানো যেতে পারে। তবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষের ক্ষেত্রে হাতের দ্বারা পরাগমিলন সম্ভব হয় না। কারণ এতে প্রচুর সময় লাগে ও শ্রমিক নিয়োগের প্রয়োজন হয়।

নির্দিষ্ট জায়গায় বা জমিতে পরিকল্পিতভাবে বীজ বপন করে বা নার্সারীর বেডে চারা তৈরি করে, পরে তা রোপণ করে চিরাচরিত পদ্ধতিতে আতা গাছের কৃত্রিম প্রসারণ ঘটান হয়। যদিও বীজের গাছ থেকে উন্নতমানের ফলের উৎপাদনের নিশ্চয়তা নাও হতে পারে। তাছাড়া আতা বীজের অঙ্কুরোদ্গমের হারও খুব কম। ৬ মাস পর থেকে এই বীজের অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষমতা নষ্ট হতে থাকে। বীজ থেকে উৎপন্ন গাছে ফল পেতেও অনেকে বেশি সময় লেগে যায়। এসব সমস্যা সত্বেও আতা গাছের প্রসারণ এখনও বীজ থেকেই হয়ে চলেছে।

জোড়কলম করার জন্য প্রথমে বীজ থেকে পলিব্যাগে চারার Root stock তৈরি করা হয়। চারা গাছের Root stock-গুলিকে নার্সারীতে সঠিক পরিচর্যায় বড় করে তোলা হয়। সেগুলি কলমের জন্য উপযুক্ত হয়ে গেলে সাধারণত শীতের শেষে উন্নতমানের গাছের ডগাকে (Scion) Root stock-এর সাথে Side grafting বা পার্শ্বজোড় করে কিংবা root stock-এর উপর Cleft grafting করে কলমের গাছ তৈরি করা হয়। আতা গাছের গুটি কলমের সফলতার হার খুব কম, প্রায় ৮.৩%-র নিচে। তবে জোড় কলমের সফলতার হার ৭০%-র কাছাকাছি। এছাড়া Annona প্রজাতির অন্য গাছের Root stock-এর সঙ্গে Annona squamosa আতা গাছের জোড়কলম করা যায়।

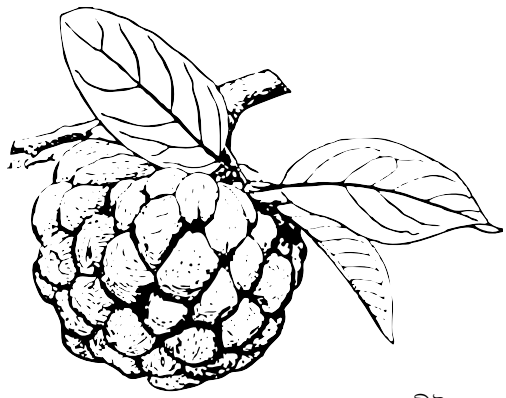
যে জমিতে আতা গাছ রোপণ করা হবে, প্রথমে সেই জমির মাটি পরীক্ষা করে প্রয়োজন অনুসারে সব রকম ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর লাঙল বা ট্রাক্টর দিয়ে দিয়ে ভালভাবে চাষ দিয়ে ও মই দিয়ে জমির ঢাল বজায় রেখে সমান করে নিতে হবে। সাধারণত বর্ষাকালে আতা গাছের চারা রোপণ করতে হয়। ৪ X ৪ মিটার বা ৫ X ৫ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে ৬০ X ৬০ X ৬০ সেমি আয়তনের গর্ত করে তার মধ্যে চারাগুলি রোপণ করতে হয়। যদি ৫ X ৫ মিটার দূরত্বে চারাগুলি রোপণ করা হয়, তবে এক হেক্টর জমিতে ৪০০টি চারা লাগানো যাবে। রোপণের পর সেচ, সার প্রয়োগ ও রোগপোকা আক্রমণ প্রতিরোধ করে চারাগুলিকে সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে বড় করে তুললে ৩-৪ বছর পর থেকে ফল উৎপাদন শুরু হয়ে যায়।

পরিচর্যা –

একমাত্র বর্ষাকাল বাদে জমির আর্দ্রতা অনুযায়ী শুষ্ক মরসুমে ১২-১৫ দিন অন্তর সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। খরার সময় পাতা খসে পড়তে পারে ও ফল ঝরে যেতে পারে, তাই ওই সময় সেচের পরিমাণ বাড়াতে হতে পারে। ফুল ধরার জন্য পরাগসংযোগের সময় এবং ফলের বৃদ্ধির জন্য ধারাবাহিকভাবে যদি জমির আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে ফলের উৎপাদন ভাল থাকবে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬০% রাখা গেলে ফলের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।

রোপণের আগে জমি তৈরি করার সময় জমিতে জৈবসার প্রয়োগ করতে হয়। গাছের বয়স অনুযায়ী গাছ প্রতি প্রয়োজন মতো নিমের খোল, করঞ্জ খোল ইত্যাদি প্রয়োগ করলে যথেষ্ট ভাল ফল পাওয়া সম্ভব। কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে চাষে উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। আতা গাছের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অনুপাতে ওইসব সার ৪ মাস অন্তর প্রয়োগ করতে হয়।

আতা গাছের ফুল ধরা ও ফল উৎপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে জলবায়ুর প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। তাই ফল ধরা সুনিশ্চিত করতে ও ফলের গুণমান ভাল রাখতে প্রয়োজনে IAA, NAA, ও GA হরমোনের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। প্রতিটি গাছকে একটি নির্দিষ্ট আকারে বড় করে তুলতে বিক্ষিপ্তভাবে বেড়ে ওঠা ডালপালাগুলিকে কেটে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। প্রতিবার ফল তোলার সময় অল্প করে ডালের ডগাগুলি কেটে দিলে নতুন সুস্থ ডালপালা গজাবে ও ফলের মানও ভাল হয়। আবার ১০ বছরের গাছের ডাল ছাঁটাই অত্যন্ত জরুরি, কারণ পুরনো ডালগুলিতে ফুল-ফল ধারণ করার শক্তি কমে যায়। তাই এই বয়সের গাছে ডাল ছেঁটে দেওয়াটা প্রয়োজন।



আতার ক্ষেতে আগাছা দমন অত্যন্ত জরুরি। গাছ রোপণের প্রথমদিকে সঠিক বৃদ্ধির জন্য কোদাল দিয়ে বা মেশিন দিয়ে বা চাষ দিয়ে মাটি ওলট-পালট করে আগাছা দমন খুবই উপযোগী। এছাড়া কালো রঙের পলিথিন চাপা দিয়ে মালচিং পদ্ধতিতে একদিকে পরোক্ষভাবে আগাছা দমন করা যায়, অন্যদিকে আর্দ্রতা সংরক্ষণ করে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। মজুরি খরচ কমাতে ওষুধ ব্যবহার করেও আগাছা দমন করা যেতে পারে। আতা গাছের ডাল খুবই পলকা ও নরম হয়। সামান্য ঝড়েই তা ভেঙে পড়ে। তাই বাগানের সীমানায় শক্তপোক্ত গাছ লাগালে একদিকে বেড়া তৈরি হয় অন্যদিকে সরাসরি ঝড়ের আঘাত থেকে গাছগুলিকে রক্ষা করা সম্ভব এবং ক্ষতির আশঙ্কা কম থাকে। রোগপোকার আক্রমণে আতা গাছের উৎপাদন কমতে পারে। সব থেকে ভাল পদ্ধতি হল, ফলগুলিকে উপযুক্ত বায়ু চলাচল যুক্ত পলিব্যাগ দিয়ে ঢেকে দেওয়া, কাগজের মোড়ক দেওয়া যেতে পারে। তবে কীটনাশক স্প্রে করলে আতা গাছে উপকারী পতঙ্গ মরে যেতে পারে। এরফলে পরাগমিলনে বিঘ্ন ঘটে। অন্য ক্ষতিকারক পতঙ্গগুলিকে চিহ্নিত করে Bio-pesticide ব্যবহার করা যায়। বর্ষাকালে ও বেশি তাপমাত্রার কারণে আতা গাছে ছত্রাকঘটিত রোগ ও পাতার কালো দাগ দেখা যায়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

আতা গাছে একসঙ্গে সব ফল পাকে না। তবে জুন মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত আতা পাওয়া যায়। তাই ফল পরিণত হওয়ার সময় ফলগুলির ত্বকের চোখ অর্থাৎ প্রতিটি উঁচু জায়গার মাঝখানটা সাদা বা ক্রীম রঙের হয়ে যায়। যাকে স্থানীয় ভাষায় অনেক সময় 'চোখ সরেছে' বলা হয়। এই সময় ফলগুলিকে ডাল থেকে সাবধানে কেটে সংগ্রহ করতে হয়। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ফলগুলি পাকার ঠিক আগে পরিণত হলেই তা সংগ্রহ করে প্যাকিং করে দূরবর্তী জায়গায় বা বাজারে পাঠানো হয়। লক্ষ্য রাখতে হয়, বাগান থেকে ফল তোলা ও তা বাজারে আসার মধ্যেকার সময়ে যেন ফল পেকে যায়। তাই সেই সময়টা হিসাব করেই এক্ষেত্রে ফল সংগ্রহ করা উচিত। অথবা পরিণত কিন্তু কাঁচা ফলগুলিতে রাসায়নিক প্রয়োগ করে পাকিয়ে বিক্রি করা হয়।

তিন বছর বয়সের আতা গাছ থেকে ফল পাওয়া শুরু হয়। একটি পরিণত আতা গাছ থেকে ১০০-১৮০টি ফল পাওয়া যেতে পারে। সাধারণত প্রতি হেক্টর জমি থেকে ৭ টন আতা উৎপাদন করা সম্ভব। তবে অধিক ঘনত্বে রোপণের ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টর জমি থেকে ২৫ টন আতা পাওয়া যেতে পারে। পাকা আতা অত্যন্ত সুস্বাদু একটি ফল। মূলত ফলের সাদা বা ঘিয়ে রঙের মাখনের মতো কিন্তু দানাদার, মিষ্টি ও পুষ্টিকর অংশটি আমরা খেয়ে থাকি। এটি হজমের পক্ষে খুবই সহায়ক। বীজের উপরের সাদা রঙের রসালো, সুগন্ধযুক্ত সুমিষ্ট পরিবর্তিত গর্ভপত্রটিও খুব উপাদেয়।

১০০ গ্রাম আতায় ৯৪ কিলো ক্যালরি শক্তি, ২৩.৬৪ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ৪.৪ গ্রাম খাদ্যতন্তু, ফ্যাট ০.২৯ গ্রাম, ২.০৬ গ্রাম প্রোটিন ছাড়াও থায়ামিন (B1) ০.১১ মিলিগ্রাম, রাইবোফ্ল্যাভিন (B2) ০.১১৩ মিলিগ্রাম, ০.৮৮৩ মিলিগ্রাম নিয়াসিন (B3), প্যান্টোথেমিক অ্যাসিড (B5) ০.২২৬ মিলিগ্রাম, ভিটামিন - B6 ০.২ মিলিগ্রাম, ফলেট (B9) ১৪ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন - C ৩৬.৩ মিলিগ্রাম থাকে। এর পাশাপাশি ১০০ গ্রাম আতায় ২৪ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ০.৬ মিলিগ্রাম আয়রন, ২১ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম, ০.৪২ মিলিগ্রাম ম্যাঙ্গানিজ, ৩২ মিলিগ্রাম ফসফরাস, ২৪৭ মিলিগ্রাম পটাসিয়াম, সোডিয়াম ৯ মিলিগ্রাম ও ০.১ মিলিগ্রাম জিঙ্ক থাকে।

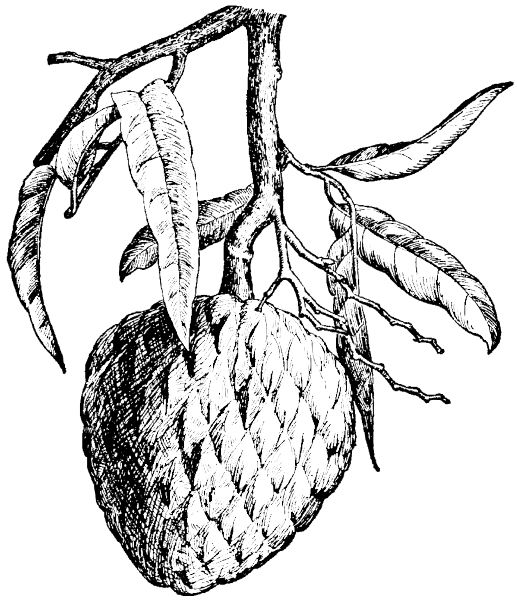
ফিলিপাইনসের একটি সংস্থা আতা থেকে মদ তৈরি করেছে বলে জানা যায়। আতা গাছের ছাল ও শিকড় পেটের অসুখ সারাতে ব্যবহার করা হয়। জ্বর, সর্দি-কাশির ওষুধ তৈরিতে এই গাছের পাতা ব্যবহৃত হয়। কলম্বিয়াতে বাচ্চাদের বালিশের তলায় আতার পাতা রাখা হয়, যা বাচ্চাদের ঘুমে সহায়ক হয়।

১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৮৫-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় দু'সপ্তাহ পর্যন্ত আতা ফল সংরক্ষণ করা যায়। তবে এক্ষেত্রে আতার বাইরের রং একটু কালচে হয়ে যায়। প্যাকিং কাগজের কার্টুনে নরম কুশনের উপর ফলগুলিকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থাযুক্ত বাক্সে রেখে দূরবর্তী স্থানের বাজারে বা রফতানি জন্য পাঠানো হয়।

জাত পরিচিতি -

আতার যে জাতগুলির কথা জানা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, লাল আতা (Anona squamosa var.sangareddyiz), রেড স্পট আতা, ক্রিমশন ডিপ রেড আতা, ইয়েলো আতা, হোয়াইট স্টিমড়, ম্যামথ, বলাগড়, কাকড়ালাপাহাড, ওয়াশিংটন, বার্বাডোজ, ব্রিটিশ গুয়েনা ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র - Custard apple — promising crop for tropics (The Hindu), www.aihd.ku.edu



নোনা

পরিচয় -

নোনা গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Annona reticulata, এটি Annonaceae গোত্রের ছোট আকৃতির পর্ণমোচী বা কিছুটা চিরহরিৎ প্রকৃতির বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ।

আগে নোনা গাছকে পরিবেশগতভাবে বাগানে বা কৃষি জমিতে অবস্থিত আগাছা হিসাবে মনে করা হত। পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশে ফলের গাছ হিসাবে বিস্তারলাভ করেছে। 'Global Compendium of Weeds by Randal – 2012' নিবন্ধে নোনা গাছকে অবাঞ্ছিত আগাছা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। সিঙ্গাপুর, গুয়াম, সলোমন দ্বীপপুঞ্জে, পলিনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং মধ্য আফ্রিকার বিভিন্ন দেশেও এই গাছকে ক্ষতিকারক (invasive) আগাছা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। যদিও আমাদের দেশে ও আরও অন্যান্য দেশে ফলের গাছ হিসাবে নোনার চাষ হয়ে থাকে। Annonaceae গোত্রের আতা ফলটির (Annona squamosa) তুলনায় এই ফল কিছুটা নিম্ন মানের, এর জংলি গন্ধ অনেকেরই অপছন্দ।

নোনা গাছের আদি জন্মস্থান ওয়েষ্ট ইন্ডিজ (West Indies)। যদিও মধ্য আমেরিকা, মেক্সিকো, দক্ষিণ আমেরিকাতে এই ফল পাওয়া যেত। পাকিস্তান, নেপাল, মায়ানমার, ফিলিপাইনস্, চিন, জাভা, সুমাত্রা, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ এবং আমেরিকার উষ্ণ অঞ্চলে এই গাছ জন্মায়। তাইওয়ান, বাংলাদেশ, ভারতের আসাম, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গে নোনা জন্মায়। সপ্তদশ শতকের শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকাতে নোনা গাছ রোপণ করা হয়েছিল। ভারতে এই গাছ প্রথম কলকাতার আশপাশে কোথাও রোপণ করা হয়েছিল যা পড়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে আমাদের দেশের মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে সবচেয়ে বেশি নোনার চাষ হয়।

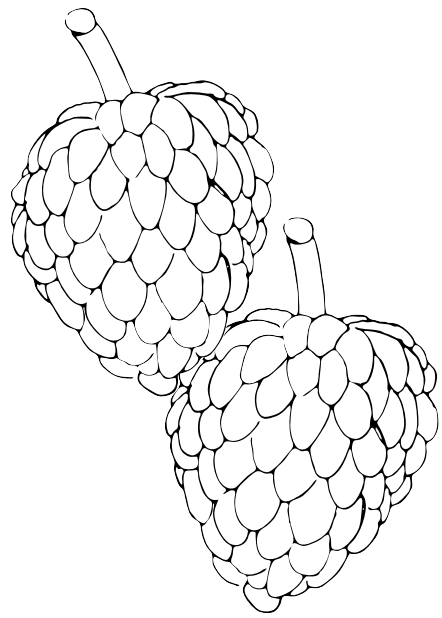
ইংরেজিতে নোনাকে Custard apple, Bull's heart, Bullock's heart, Ox-heart, Sour sop, Wild-sweet sop ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। মনে করা হয়, পাকা ফলের রং দেখে এবং এর আকার অনেকটা হার্টের মতো হওয়ায় এর এমন নামকরণ। সংস্কৃত ও হিন্দিতে রামফল, তামিল ভাষায় রামচিতা, তেলেগুতে রমিষ্ট ফলমু, নেপালী ভাষায় শ্রীরাম ফল এবং বাংলা ভাষায় এই ফলকে নোনা বা নোনা আতা বলা হয়।

নোনা গাছ উচ্চতায় ৮-১০ মিটারের কাছাকাছি হতে পারে। ডালপালার বিস্তার খুব বেশি হয় না। কাণ্ডটি ২৫-৩৫ সেমি মোটা হতে পারে। পত্রবিন্যাস একান্তর। পাতাগুলি ১০-২০ সেমি X ২.৫ সেমি, বল্লমাকৃতির। পাতার শিরাগুলি পাতায় সুস্পষ্টভাবে থাকে। পাতা একপ্রকার বুনো গন্ধ যুক্ত হয়। নোনা গাছের ফুল হালকা সবুজ বা বিবর্ণ হুলুদ রঙের হয়। একসঙ্গে ৩-৪টি ফুল ঝুলতে থাকে। পাপড়িগুলি পুরু, সংখ্যায় ৩টি। পাপড়ির কেন্দ্রস্থলে গোলাপী বা লাল ছোপ দেখা যায়। ফুলটি ২-৩ সেমি ব্যাসের হয়। ফুলটি কখনও সম্পূর্ণভাবে ফোটে না। নোনার ফল যৌগিক (Compound) প্রকৃতির, ৮-১২ সেমি ব্যাসের হতে পারে। গোলাকার বা হার্টের আকৃতির (Heart shaped) ফলের বাইরের আবরণ অমসৃণ, উঁচু-নিচু খাঁজযুক্ত। পাকা ফলের রঙ বাদামি। ফলের বোঁটাটি বেশ মোটা ও শক্তপোক্ত হয়। ফলের শাঁস ঘিয়ে বা সাদা রঙের দানাদার জেলির মতো নরম পদার্থের মধ্যে বীজগুলি অবস্থিত। প্রতিটি ফলে ৫০-৮০টি কালো রঙের ১-১.৫ সেমি লম্বা বীজ থাকে। নরম মিষ্টি গন্ধযুক্ত মিষ্ট স্বাদের জেলির মতো পদার্থটি ও সাদা মিষ্টি আবরণটা খাওয়া হয়। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৪৫০-২০০ গ্রাম। এক একটি ফল ৫০০ গ্রাম ওজনেরও হতে পারে।

নোনা গাছটি উষ্ণ অঞ্চলের বৃষ্টিস্নাত আর্দ্র জলবায়ুতে ভাল জন্মায়। তবে খরা সহ্য করার পাশাপাশি যেখানে রাতের তাপমাত্রা -২0 থেকে -৩ ডিগ্রী সেলসিয়াসে নেমে যায় সেখানেও এই গাছ বেঁচে থাকতে পারে। ৩৫-৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ৫০০- ৭০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে সমুদ্রতল থেকে ১৫০০ মিটার উঁচু জমিতে নোনা গাছ জন্মাতে দেখা যায়। তবে ৮০০ – ১২০০ মিটার উচ্চতায় নোনা গাছ ভাল জন্মায়। ভারতে ১২২০ মিটার উচ্চ ভূমিতে ভাল জন্মায়। সাধারণত উঁচু ও বন্ধ্যা জমিতে নোনার চাষ হয়। বিভিন্ন প্রকার মাটিতে এই গাছ জন্মাতে পারে। অম্ল-ক্ষারের মাত্রা ৫-৮ PH এমন গভীর ও উর্বর মাটি নোনা গাছের জন্য উপযুক্ত। তবে নিকাশী ব্যবস্থা খুব ভাল থাকা জরুরি। জল জমে এমন জমিতে এই গাছ বাঁচে না।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

নোনা গাছে কম সংখ্যক ফল জন্মায়। ফলের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বা উৎপাদন সুনিশ্চিত করার জন্য ফুলে জিবারেলিক অ্যাসিড ৫০



PPM/lt জলে গুলে স্প্রে করলে ফলের আকার বড় হয় এবং উৎপাদন বাড়ানো যায়। এই পদ্ধতিতে বীজের সংখ্যাও কম হবে। A. reticulata, A. squamosa (আতা), A. atemoya, A. cherima প্রভৃতি বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে Cross pollination করে উল্লেখ্যযোগ্য ফল পাওয়া গেছে। Self Pollination-এর চেয়ে hand pollination করে বহুগুণ ভাল ফল উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে ।

সাধারণভাবে বাদুড় বা অন্য পাখির দ্বারা বীজ আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে, জলের স্রোতে ভেসে গিয়ে বীজ থেকে চারা তৈরি হয়ে নতুন গাছ জন্মায়। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এই গাছ মানুষের দ্বারাই বিস্তারলাভ করেছে। হাওয়ায় শুকিয়ে ৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করলে এক বছর পর্যন্ত বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা বজায় থাকে। নোনার বীজের অঙ্কুরোদ্গমের হার মাঝারি। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গলেও এই গাছ স্বাভাবিকভাবে বিস্তারিত হয়েছে আবার চাষের মাধ্যমেও প্রসারিত হয়েছে।

মাটিতে ডাল বেঁকিয়ে শিকড় উৎপন্ন করে পরে তা কেটে অন্যত্র লাগিয়ে নোনা গাছের চারা তৈরি করা যায়। এছাড়া নোনা গাছের জোড়কলম ও বাডিং পদ্ধতিতে কলম তৈরি করেও চারা করা সম্ভব। Annona নোনা গাছের চারার (Root stock) সঙ্গে A. atemoya-র জোড়কলম করে নতুন গাছের কলম তৈরি করা যায়। একইভাবে A. squamosa, A.cherimola, A.glabra প্রভৃতি গাছের মধ্যে জোড়কলমও অত্যন্ত সফল। এভাবে ডন্নত ও ডৎকৃষ্ট মানের ফল উৎপাদন সম্ভব। নোনা গাছের জোড়কলম খুব ভাল সফলতা পেয়েছে। Annona sp.-এর অন্য গাছে বা নোনার Root stock-এ নোনার Scion করে জোড়কলম করা হয় বা নোনার Rootstock Soursop, Sugar apple & atemoya গাছের জোড়কলম করাও সম্ভব হয়েছে।

জমির মাটি পরীক্ষা করে উপযুক্ত পরিমাণ চুন ও ফসফরাস দিয়ে চাষ দিয়ে জমি প্রস্তুত করে ৫ X ৫ মিটার বা ৭ X ৬ মিটার চওড়া সারি তৈরি করে রোপণ করা হয়। চারাগুলি রোপণের সময় ৫০ গ্রাম phosphobactarium, ১৫০ গ্রাম Vesicular Arbuscular Mycorhiza প্রয়োগ করা হয়। যে গর্তে চারা রোপণ করা হয় তাতে ১০ কেজি F.M, ২৫০ গ্রাম N, ১২৫ গ্রাম P2O5, ২৫০ গ্রাম K2O দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ঢেলে দিতে হয়। এর ক'দিন পর বর্ষার শুরুতে সেখানে চারা রোপণ করা হয়। বৃষ্টি না হলে সেচ দেওয়ার বা Mulching করার প্রয়োজন পড়ে। আর্দ্রতার সংরক্ষণ ও আগাছা নিয়ন্ত্রণ একসঙ্গেই করা হয়ে থাকে। প্রতি বছর গাছ প্রতি সেচের জন্য প্রায় ৭৭৭ লিটার জল প্রয়োজন হতে পারে।

পরিচর্যা –

ফুল ধরার সময় ৩-৪ দিন অন্তর সেচ দিতে হয়, প্রতি গাছে ৫০০-৭৫০ লিটার জলের প্রয়োজন হয়। জমির আর্দ্রতা অনুযায়ী গাছের বৃদ্ধির সময় ৪ সপ্তাহ অন্তর প্রতি গাছে ১৪০০ লিটার জল দিতে হয়। গ্রীষ্মে নিয়মিত সেচ ও Mulching দ্বারা আর্দ্রতা সংরক্ষণের দ্বারা ফল খসে পড়া রোধ করা যেতে পারে।

দেখা গেছে, অনেক গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধি যদি খুব বেশি হয় তখন ফুল ও ফল ধরার সংখ্যা কমে যায়। তাই সারের পরিমাণ সেই অনুযায়ী নির্দিষ্ট করতে হয়। সাধারণত নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ সার নোনা চাষের জন্য ব্যবহার করা হয়। দফায় দফায় গাছের বয়স অনুযায়ী এই সার প্রয়োগ করতে হয়। গাছের বয়স যখন ২ বছর তখন ৪০০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ৫০০ গ্রাম ফসফেট ও ৩৬০ গ্রাম পটাশ দিতে হয়। গাছের বয়স ৪ বছর হলে ৮৬০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ৫৮০ গ্রাম ফসফেট ও ৯৩০ গ্রাম পটাশ দিতে হয়। গাছের বয়স যখন ৬ বছর হয় তখন ১৩০০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ৭৮০ গ্রাম ফসফেট ও ১১৭০ গ্রাম পটাশ দিতে হয়। একটি ৮ বছর বয়সের গাছে নাইট্রোজেন ১৬০০ গ্রাম, ফসফেট ৮৮০ গ্রাম ও ১৫০০ গ্রাম পটাশ সার প্রয়োগ করতে হয়। ১০ বছর বয়সের গাছে ১৭৫০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ৮৮০ গ্রাম ফসফেট ও ১৬৫০ গ্রাম পটাশ সার প্রয়োগ করলে ভাল হয়। আবার বছরের বিভিন সময়ে সারের প্রকার ও মাত্রা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। যেমন বসন্তকালে নোনা গাছে ২০%, গ্রীষ্মকালে ৩০%, শরৎকালে ৪০% এবং শরতের শেষে ১০% ইউরিয়া দিতে হয়। শুধুমাত্র শরৎকালেই ১০০% সুপারফসফেট দিতে হয়। তবে পটাশের পরিমাণ বসন্তকালে ১০%, গ্রীষ্মকালে ৩০%, শরৎকালে ৪০% এবং শরতের শেষ দিকে ২০% হারে প্রয়োগ করতে হয়।

চারা অবস্থার প্রধান কাণ্ডের ১ মিটারের নীচে কাণ্ড থেকে গজানো ডাল কেটে দিতে হয়। এরফলে গাছটি গোড়া থেকে একটি কাণ্ড নিয়েই বেড়ে ওঠে। ফল তোলার পর সামান্য ডাল ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন হয়, কারণ নতুন ডালপালা গজালে তাতে ফুল আসলে নতুন ফল উৎপাদন শুরু হয় এছাড়া রোগগ্রস্ত শুকনো ডালপালগুলি কেটে দিলে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়।

নোনা গাছের ক্ষতিকারক পোকামাকড় প্রধানত bug, যা গাছের পাতা, কাণ্ডের ডগ ও ফলের ক্ষতি করে। এই পোকাগুলিকে গাছ

ঝাঁকিয়ে মাটিতে ফেলে কেরোসিন তেল দিয়ে মারা যেতে পারে। এছাড়া বেশি করে জল দিয়ে ভাসিয়ে সেচ দিলে পোকার ডিম ধ্বংস হতে পারে। নভেম্বর মাসে জমির মাটি লাঙল দিয়ে চাষ দিলে পোকার ডিমকে নষ্ট করে দেওয়া সম্ভব। ফল পাকার আগে জাল দিয়ে গোটা গাছটি ঢাকা দিয়ে বাদুড়ের আক্রমণ রোখা যায়।

Bractrocosa zonata নামক স্ত্রী পতঙ্গ (Fruit fly) ফলের উপর প্রায় ৩ হাজারেরও বেশি ডিম পাড়ে। ১৬ দিনের মাথায় লার্ভাগুলি ফল থেকে বেরিয়ে আসে এবং মাটিতে পড়ে। ৯ দিনের মধ্যে গুটি থেকে বাদামি বর্ণের হলুদ পতঙ্গ বেরিয়ে আসে। যা কচি নোনা ফল খেয়ে ব্যাপক ক্ষতি করে এবং শেষমেশ ফলগুলি গাছ থেকে খসে পড়ে। Heterographis Bengalella জাতীয় পোকা (Fruit borer) এই গাছের ফল ছিদ্রকারী পোকা। শীতকালে এরা একটি মাত্র ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে caterpillar জন্মায় না। Maconellicoccus horsutus নোনা গাছের একপ্রকার শোষক পোকা (Mealy bug)। এরা গাছের কচি ডগা, কচি পাতা ও ফল থেকে রস শোষণ করে গাছের ও ফলের ক্ষতিসাধন করে। Ceroplastes floridensis পোকাগুলি তারার মতো দেখতে, এদের আক্রমণে গাছের কচি পাতা ঝরে পড়ে, ডালগুলি শুকিয়ে যায়। আঠা লাগানো লাঠি দিয়ে বা লাঠির মাথায় জাল লাগিয়ে তা দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলতে পারলে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয় না। এরজন্য প্রতিদিন গোটা বাগান ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা জরুরি। নোনা গাছে ফলের পচন রোগ হয়। এছাড়া ছত্রাকঘটিত রোগের কারণে কাণ্ড, পাতা থেকে শুরু করে সমগ্র ফলটিতে ছড়িয়ে পড়ে ফলের ও গাছের ক্ষতি করে। ছত্রাকের কারণে পাতায় ছোপ পড়া প্রভৃতি রোগের আক্রমণও ঘটে।

০.০৫% Carbenalazim স্প্রে করলে বা অন্যান্য ছত্রাকনাশক ওষুধ স্প্রে করে রোগ প্রতিরোধ সম্ভব হয়। Indofil M-45 (০.০২%) ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করলে ছত্রাক রোধ করা যায়। সাথী ফসল হিসাবে নোনা চাষের জমিতে শুরুর দিকে চিনাবাদাম, খেসারি, বজরা, শাক-সবজির চাষ করা যেতে পারে। ওষুধ স্প্রে করা ছাড়াও সাথী ফসল চাষ করে, Mulching করে, মাটি কুপিয়ে চাষ দিয়ে বা hand weeding করে আগাছা দমন করা যায়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব -

শীতের শেষে বা বসন্তকালে এই ফল পাকে। তখনও অন্য জাতের Annona ফল পাকে না। ফলের রং যখন লালচে হলুদ বর্ণের হয় তখন পাকা ফলগুলি তুলে নিয়ে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা হয়। পরিণত একটি নোনা গাছ বছরে ৩৪-৪৫ কেজি ফল উৎপাদন করতে পারে। মার্চ-এপ্রিল মাসে নোনা গাছে ফুল আসে। এই সময় ২০ PPM NAH হরমোন সপ্তাহে একবার করে মোট চারবার স্প্রে করলে ফলের উৎপাদন ও গুণগত মানকে উন্নত করা সম্ভব হয়।

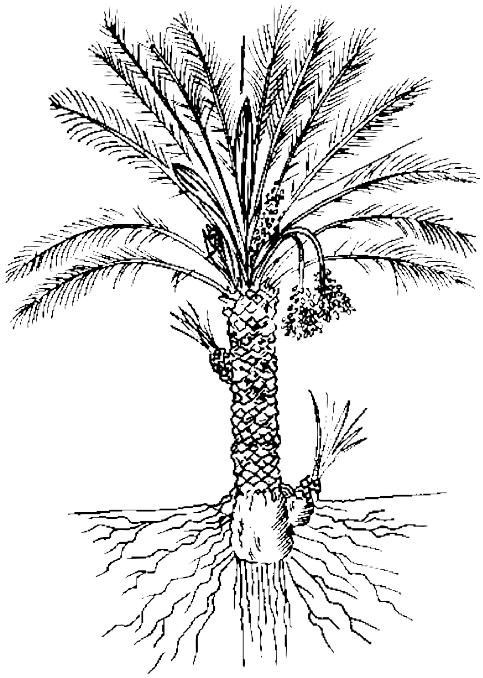
ভারতে নোনা ফলের কদর খুবই কম। গ্রামে-গঞ্জে গরিব মানুষ সাধারণত এই ফল খায়। মধ্য আমেরিকা, মেক্সিকো, ওয়েস্ট ইন্ডিজে এই ফলটি সকলের কাছে খুবই প্রিয়। ফলের জেলির মতো দানাদার শাঁস চামচে করে বার করে চিনি মিশিয়ে ও ক্রীম মিশিয়ে খাওয়ার চল রয়েছে। কাস্টার্ড, আইসক্রীম, কেক, পুডিং তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

১০০ গ্রাম নোনায় ৮০-১০১ কিলো ক্যালরি শক্তি, ২০-২৫ গ্রাম শর্করা, তন্তু জাতীয় পদার্থ ০.৯-৬.৬৮ গ্রাম, ফ্যাট ০.৬ গ্রাম ও ১.৭-২.৪ গ্রাম প্রোটিন থাকে। এছাড়া ০.০৮ মিলিগ্রাম ভিটামিন-B1, ভিটামিন-B2 ০.১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-B3 ০.৫ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-B5 ০.১৩৫ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-B6 ০.২২১ গ্রাম ও ১৯.২ গ্রাম ভিটামিন–C থাকে। পাশাপাশি এই পরিমাণ নোনায় ক্যালসিয়াম ১৭.৬ মিলিগ্রাম, আয়রন ০.৭১-১.১৪ মিলিগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ১৮ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ১৪.৭-৩২.১ মিলিগ্রাম, পটাসিয়াম ৩৮২ মিলিগ্রাম ও ৪ মিলিগ্রাম সোডিয়াম থাকে। নোনার বীজের শাঁস খুবই বিষাক্ত। গাছের পাতা, কাঁচা ফল ও বীজ কীটনাশক। নোনার বীজ ও কাঁচা ফল মানুষের শরীরে এলার্জির কারণ হতে পারে। পাতার রস উকুন মারতে সাহায্য করে। এই গাছের ছালে ০.১২% anonaine রয়েছে। ছালের রস শরীরে ইঞ্জেকশন্ হিসাবে প্রবেশ করালে হাত-পা বা শরীর অবশ হয়ে যায়। গাছের রস চোখে পড়লে চোখের প্রচুর ক্ষতি হতে পারে। মূলের ছালে তিন ধরনের ক্ষতিকারক উপক্ষার থাকে। বিভিন্ন কারণে Pacific Island Ecosystem Organization এই গাছটিকে high risk plant হিসাবে চিহ্নিত করেছে। তাদের ওই তালিকায় নোনা গাছ ১১ নম্বরে রয়েছে।

জাত পরিচিতি –

নোনার কোনও বিশেষ জাতের তথ্য পাওয়া যায়নি। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার গাছের ফলের গুণগত মান ও আকারের বিভিন্নতা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন। হলুদ রঙের ফলগুলি বাদামি রঙের ফলের চেয়ে ভাল। পাকা ফলের শাঁসের পরিমাণ বেশি, পুরু এবং রসালো । লালচে বা Purple রঙের ফল Florida-তে জন্মায়, এর গুণমানও উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য আতা বা নোনা জাতীয় ফল হল, A. charimda, A. muricata, A. Squamosa, A. glabra, A. cherimoya+ A. squamosa = A. atemoya (হাইব্রিড আতা) ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র - PIER (Pacific Island Ecosystem at Risk), Pseudo xenical effect of allion Annona sp., Custard appeal IPM for export. Pdf, A comprehensive review on Annona reticulata, www,nhb.gov.in



খেজুর

পরিচয় –

ভারতীয় খেজুর গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Phoenix sylvestris, এটি Arecaceae গোত্রের বহুবর্ষজীবী (১৫০ বৎসর পর্যন্ত বেঁচে থাকে), একবীজপত্রী চিরহরিৎ উদ্ভিদ।

খেজুর গাছের আদি জন্মস্থান পাকিস্তানের দক্ষিণ অংশে। পরবর্তীকালে ভারত ছাড়াও বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা সহ পৃথিবীর অনেক জায়গায় এই গাছ একটি স্বাভাবিক উদ্ভিদ হিসাবে বিস্তারিত হয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে ফল হিসাবে খেজুরের গুণমান তেমন ভাল না হলেও এই গাছের রস থেকে যে গুড় তৈরি করা হয়, তা খেজুরের গুড় বা নলেন গুড় নামে সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। সাধারণত শীতকালে জয়নগরের মোয়া, নলেন গুড়ের সন্দেশ, পিঠে পায়েসের সঙ্গে খেজুর গুড় বাঙালির অত্যন্ত প্রিয়।

ইংরেজিতে এই ভারতীয় খেজুর wild Date Palm, Date-sugar Palm, Sugar date Palm, Indian Date Palm, Indian Wild Date, Silver Date Palm নামে পরিচিত। সংস্কৃতে খেজুরকে পিন্ডাখরজুরা, বাংলা ও হিন্দিতে খেজুর, তামিল ভাষায় পেরিছাম, তেলেগুতে খারজুরামু, মালায়লমে তেনিট্টা বলে।

আরবের খেজুরের বিজ্ঞানসম্মত নাম Phoenix dactylifera, এটিও Arecaceae গোত্রের একই ধরনের উদ্ভিদ। এই গাছটির ফল এক সময় মিশর, আরব, তুর্কী, পারস্য, ইরাক, ইরান ছাড়া আরও অনেক দেশের মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল। এই ফল চাষের পুরাতাত্ত্বিক ইতিহাস রয়েছে। যীশুখ্রিষ্টের জন্মের ৫৫৩০ এবং ৫৩২০ বছর আগে আরব দেশে এর চাষ শুরু হয়েছিল। মেসোপটেমিয়া, সভ্যতা ও হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার যুগেও এর চাষের উল্লেখ পাওয়া যায়। বালুচিস্তান ও সিন্ধুনদের পশ্চিম উপত্যকায় ৭০০০ B.C থেকে এই ফলের চাষ হয়ে আসছে। এই ফলটি অতি পবিত্র ফল। সব ধর্মের মানুষই পূজা-পার্বণে এর ব্যবহার করে থাকে, পবিত্র বাইবেল ও কোরানে এই ফলের গুণাগুণ ও ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে।

সৈদি আরবের সেনাবাহিনীর পোশাকে খেজুর গাছের ছবির সঙ্গে তরবারির চিহ্ন রয়েছে। খেজুর গাছকে সে দেশে জাতীয় গাছের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে ভারতে প্রচুর পরিমাণে আরবের শুকনো খেজুর আমদানি হচ্ছে। এই খেজুরের আকৃতি ফলটির শাঁসের পরিমাণ ও ফলের মিষ্টতা অনেক বেশি। পুষ্টিকর ফল হিসাবে এটি খাওয়া হয়। এর পুষ্টিগুণ ও ফলের গুণমান খুবই উৎকৃষ্ট। পৃথিবীর এই প্রাচীন ফলের গাছটির পুষ্টিগুণের কারণে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের দেশেও বাণিজ্যক ভিত্তিতে এই খেজুর চাষের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । ইংরেজিতে এই খেজুর Date Palm বা Date নামে পরিচিত।

Phoenix dactylifera বা Date Palm (আরবের খেজুর) একটি একবীজপত্রী উদ্ভিদ অর্থাৎ পুরুষ ফুল ও স্ত্রী ফুল আলাদা গাছে জন্মায়। এই গাছটি লম্বায় ২১-২৩ মিটার হতে পারে। একক ভাবে বা একই সঙ্গে অনেকগুলি গাছ ঝাড় হিসাবে জন্মাতে পারে।

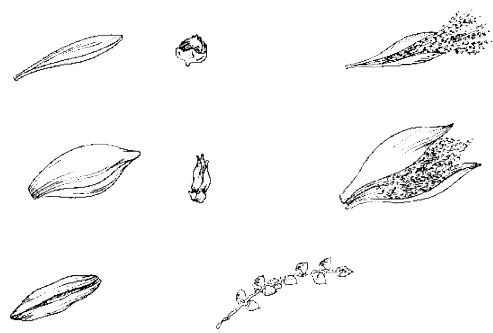
পাতাগুলি ৪-৬ মিটার লম্বা পত্রাক্ষের উপর কম-বেশি ১৫০টি কাঁটা বিশিষ্ট পত্রকযুক্ত হয়। খেজুর গাছের মাথা মুকুটের মতো হয় এবং ৬-১০ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত থাকতে পারে।

এই গাছের পুরুষ ফুল স্প্যাডিক্স প্রকৃতির। প্রধান মঞ্জরীদণ্ডের উপর ৫০-১৫০টি শাখা বের হয়ে পুরুষ ফুল বা স্ত্রী ফুল ধারণ করে পুষ্পমঞ্জরীটি গঠিত হয়। বহু শাখাযুক্ত মঞ্জরীদণ্ডের উপর অসংখ্য পুরুষ ফুল থাকে। স্ত্রী ফুলও একইভাবে মঞ্জরীদণ্ডে সজ্জিত থাকে। স্ত্রী ফুলের পরাগ মিলনের ফলে ফল উৎপন্ন হয়।

খেজুর ড্রুপ প্রকৃতির ফল। ফলে একটি মাত্র বীজ থাকে। ফলগুলি ২.৫ -৫.০ X ১ - ১.৫ সেমি বেলনাকার আকৃতির হয়। বীজের উপর বীজের বহিঃত্বক ও মধ্যত্বক (Exocarp and Mesocarp) পুরু ও রসালো হয়। বীজের উপর লম্বালম্বি চেরা খাঁজযুক্ত দাগ থাকে। এই প্রকার গাছের Root sucker উৎপন্ন হয়, যা রোপণ করে খেজুর গাছের চাষ করা হয়।

Phoenix sylvestris বা Indian Date Palm (ভারতীয় খেজুর) গাছও আরবের খেজুর গাছের মতোই। তবে এই খেজুর আকারে অনেকটা ছোট হয় এবং এককভাবে জন্মায়, ঝাড় হিসাবে নয়। কাণ্ডের গায়ে পাতার বৃন্তের আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে। পাতা, ফুল, ফল সবই আরবের খেজুর অপেক্ষা ছোট হয়। ফলের শাঁস পাতলা ও শাঁসের পরিমাণ বেশি হয়। Date palm-এর মিষ্টতা অনেক

বেশি। বীজের আকার বড় ও লম্বালম্বি চেরা বা খাঁজযুক্ত (Grooved) হয়। এই প্রকার গাছের Root Sucker বের হয় না। বীজের চারা থেকেই এই গাছ প্রসারিত হয়।



শুষ্ক ও উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে এবং উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে সূর্যালোকের উপস্থিতে ১২.৭–২৭.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা (যদিও এই গাছ সর্বনিম্ন ৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস ঠাণ্ডায় এবং ৫০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রাতেও বেঁচে থাকতে পারে) খেজুর চাষের সহায়ক। শীতকালে রাতের কম তাপমাত্রা সহ্য করতে পারলেও, তুষারপাত এই গাছের পক্ষে ক্ষতিকর। গাছের ফুল-ফল ধরার সময় বৃষ্টি হলে ভাল হয়।

খেজুর গাছের পক্ষে বালিযুক্ত দোঁয়াশ মাটি উপযুক্ত। যথাযথ নিকাশীযুক্ত ৮.০-১০.০ PH অম্ল ও ক্ষারীয় মাত্রা খেজুর গাছের উপযুক্ত। চূনামাটিতে খেজুর গাছ জন্মায় না। তবে নিকাশীযুক্ত লবণাক্ত জমিতে বা অনুর্বর জমিতে খেজুর গাছ জন্মাতে পারে।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

বাতাসের সাহায্যে, পোকামাকড় বা মৌমাছির দ্বারা খেজুর ফুলের পরাগমিলন ঘটে থাকে। কৃত্রিম পদ্ধতিতে পুরুষ ফুলের থেকে রেণু সংগ্রহ করে স্ত্রী ফুলে হাতের সাহায্যে লাগিয়েও পরাগমিলন ঘটানো যায়। উন্নতজাতের পুং রেণু বিদেশ থেকে সংগ্রহ করে ফ্রিজে সংরক্ষণ করে পরাগমিলন ঘটিয়ে উন্নত মানের ফল উৎপাদন সম্ভব।

পাকা ফলের বীজ কাঠবিড়ালী, পাখি মুখে করে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে ফেলে। উপযুক্ত পরিবেশে তা অঙ্কুরিত হয়ে নতুন গাছ জন্মাতে পারে। স্বাভাবিকভাবে খেজুর গাছের প্রসারণ এভাবেই ঘটে থাকে।

খেজুর গাছের বীজ বপন করে ও টিস্যু কালচার পদ্ধতিতেও প্রসারণ ঘটানো সম্ভব। বীজের গাছ থেকে উৎকৃষ্ট মানের ফল পাওয়া যায় না। এছাড়া বীজ থেকে যে গাছ জন্মায় তাঁর অর্ধেকের বেশি পুরুষ প্রকৃতির হয়। তাই গাছের গোড়া থেকে বের হওয়া Root Suckers গুলি ৪-৫ বছরের হলে কৃষকেরা সেগুলি কেটে Mother plant থেকে আলাদা করে রোপণের জন্য সংগ্রহ করে। ৪-১০ বছরের গাছের গোড়া থেকে ৯-২০ টি Root sucker বের হয়। যদিও খেজুর গাছের বৃদ্ধি খুব কম, তাই Tissue culture-কে জনপ্রিয় করার চেষ্টা চলছে। তবে কৃষকেরা এখনও Tissue culturer-এর গাছের প্রতি ততটা আকৃষ্ট হন না।

Root sucker সংগ্রহ করার সময় Mother Plant -এর বাইরের দিকের পাতাগুলির তিন ভাগের দু'ভাগ কেটে দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রের দিকের পাতাগুলির অর্ধেক অংশ কেটে দেওয়া হয়

সংযুক্ত আরব আমীরশাহী পৃথিবীর মধ্যে টিস্যু কালচারের চারা উৎপাদনে প্রথম। সেদেশে বছরে প্রায় ১ লক্ষ Tissue culture-এর গাছ তৈরি হয়। ভারতীয় খেজুর অর্থাৎ P. sylvestris বা আরবের খেজুর বা P. dactylifera, এই দু'প্রকার গাছেই স্বাভাবিক পরাগমিলনের দ্বারা ফল উৎপন্ন হয়। যে ফলের বীজ বপন করেও খেজুর গাছের বিস্তার করা যায়। কিন্তু Date Palm, বা P. dactylifera-র ক্ষেত্রে পুরুষ গাছ কেবল পরাগসংযোগের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং বীজের থেকে জন্মানো উভয় প্রকার গাছের ৫০% স্ত্রী ও ৫০% পুরুষ গাছ জন্মায়। কিন্তু Date Palm-এর ক্ষেত্রে ফল উৎপাদন যেখানে প্রধান লক্ষ্য সেখানে পুরুষ গাছ বেশি জন্মালে ফল উৎপাদন কমে যায়। তাই স্ত্রী গাছের Root sucker or Offshoot রোপণ করে চাষ করা হয়ে থাকে।

আমাদের দেশে যেহেতু ইদানীং Date Palm-এর চাষ শুরু হয়েছে, তাই Root sucker পাওয়া সম্ভব নয়। এজন্য নার্সারীর বেডে বা পলিথিন ব্যাগে বালিযুক্ত জৈবসারের মাটিতে বীজ বপন করে চারাগাছ তৈরি করে উপযুক্ত পরিচর্যায় বড় করে নির্দিষ্ট জমিতে রোপণ করা যাতে পারে।

খেজুর গাছ বেলে-দোঁয়াশ মাটিতে ভাল জন্মায়। উপযুক্ত নিকাশীযুক্ত জমিতে খেজুর গাছের চাষ করা হয়ে থাকে। তাই নির্দিষ্ট জমিতে গর্ত করে মাটির সঙ্গে জৈবসার মিশিয়ে জৈব কীটনাশক প্রয়োগ করে মাটিকে জীবাণুমুক্ত করে, কয়েকদিন রোদ খাইয়ে খেজুরের চারার প্রধান মূলটি কেটে দেওয়া হয় এরপর গুচ্ছাকারে মূল গজিয়ে গুটি তৈরি হলে তবেই তা জমিতে রোপণ করতে হয়। অপরিণত চারার বেঁচে থাকার হার কম হয়। চারা রোপণের পর প্রতিদিন অল্প পরিমাণ জল দিয়ে গাছের গোড়া ভিজিয়ে রাখতে হয়। শুধুমাত্র জৈবসার ও হাড় গুঁড়ো প্রয়োগই যথেষ্ট। রাসয়নিক সার ব্যবহার করা হয় না।

পরিচর্যা –

আরব দেশে জলের অভাব প্রচুর। তাই মরুদ্যানের আশেপাশে খেজুর গাছের চাষ হয়ে থাকে। খেজুর চাষের উপযুক্ত পরিবেশ সম্বন্ধে একটি কথা প্রচলিত রয়েছে – " Its feet in the water and its head in the fire" অর্থাৎ ভূমি সংলগ্ন জলস্তর ও

প্রচুর তাপমাত্রাযুক্ত স্থান খেজুর চাষের উপযুক্ত। তাই প্রয়োজনে সেচের ব্যবস্থা করলে তা গাছের বৃদ্ধি ও উৎপাদনে সহায়ক হয়। পরাগসংযোগ ও ফল ধরার সময় Flood-irrigation, Oldest System Sprikler ও Micro Sprinkle এবং Drip-irrigation প্রয়োজন হয়।

খেজুর গাছের জমিতে একরে ৭২০ কেজি থেকে ৯০০ কেজি গোবর প্রয়োগই যথেষ্ট। তবে গাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন সার ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও বিভিন্ন জাতের গাছের উৎপাদনে এর তেমন কোনও প্রভাব দেখা যায়নি।

খেজুর গাছের গোড়ায় মাটি কুপিয়ে আগাছা দমন করা হয়ে থাকে এবং কিছু পরিমাণ মাটি গাছের গোড়ায় জমা করে ঢালুভাবে Dressing করে দেওয়া হয়ে থাকে।

আরবে খেজুর চাষের বাগানে উন্নত প্রযুক্তির দ্বারা Mechanical Lift দিয়ে গাছের শুকনো পাতা ও অতিরিক্ত পাতা কেটে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। গাছে চড়ে খেজুর গাছের পরিচর্যা করা খুব কঠিন কাজ। বিদেশে এই পাতা কাটার মেসিনের দ্বারা একাজ করা হয়। এছাড়া ফলের কাঁদি যাতে বেশি ঝুলে না পড়ে তার জন্য কাঁদিটিকে পাতার গোড়ার সঙ্গে বেঁধে সার্পোট দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়।

খেজুর গাছের সব থেকে ক্ষতিকারক রোগ হল ছত্রাকঘটিত। Fuserium Oxysporum এবং F. albedinis নামক ছত্রাক Bayout রোগ ঘটিয়ে গাছের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। বিভিন্ন প্রকার পোকামাকড়ের আক্রমণও খেজুর গাছে লক্ষ্য করা যায়। রাসয়নিক কীটনাশক ছাড়াও জৈব পদ্ধতিতে ও Pheromone Trapping পদ্ধতির সাহায্যে ও জৈব কীটনাশক (Bio pesticide) ব্যবহার করে রোগপোকার আক্রমণ প্রতিহত করা যেতে পারে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

খেজুর গাছে ফল ধরার পর ৫টি দশার পর তা সম্পূর্ণ পরিপক্ক হয়। দশাগুলি হল, হাবাবাউক, কিমরি, খালাল, রুতাব এবং তামার। এই দশার মধ্য দিয়ে ফলের রং পরিবর্তন ও বৃদ্ধি সম্পন্ন হয়। খেজুর পরিণত হওয়ার এই ৫টি দশার সময়কালগুলি হল; –

১. হাবাবাউক দশা - শুরুতে কচি ফল ধরার অবস্থা থেকে ৪-৫ সপ্তাহ পর্যন্ত।

২. কিমরি দশা - এই অবস্থায় আসতে ৯-১৫ সপ্তাহ সময় লাগে। ফলটি শক্ত হয়ে সবুজ বর্ণের হয়। এসময় ফলটির বৃদ্ধি সম্পন্ন হয়।

৩. খালাল দশা – ২ সপ্তাহ সময়ে ফলটি সম্পূর্ণ পরিণত হয়ে সবুজাভ-হলুদ বা গোলাপী, লাল রঙের হয়ে যায়। এই সময়কালে suger-এর পরিমাণ ও আর্দ্রতা বেড়ে যায়।

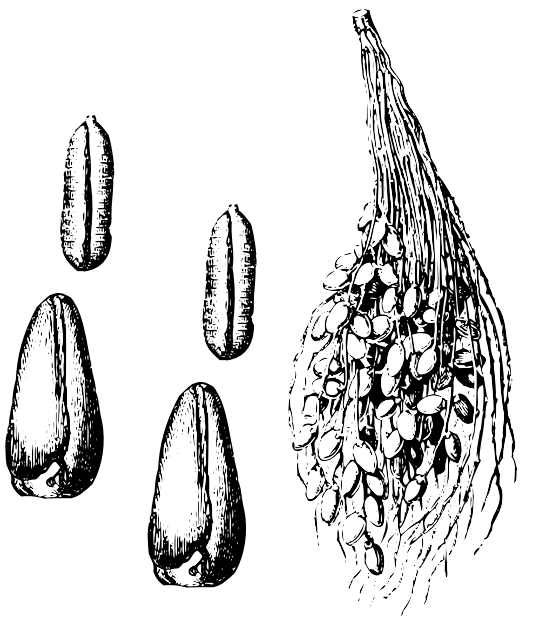
৪. রুতাব দশা – ২-৪ সপ্তাহ সময়ে এই দশায় ফলটি খুব নরম হয়ে যায় ফলের রং কালচে বাদামী হয়ে যায়। এই দশায় আবার sugar-এর মাত্রা কমতে থাকে।

৫. তামার দশা – এই দশায় ফলটি সম্পূর্ণ পেকে যায়। ফলের রং সম্পূর্ণ কালো হয়। ফলের ত্বক কুঁচকে যায়।

খেজুর গাছের ফল প্রায় পরিণত হয়ে গেছে, এইরকম অবস্থায় গাছে মই লাগিয়ে বা আধুনিক Mechanical Lift ব্যবহার করে হাত দিয়ে (যেখানে বছরের পর বছর খেজুর চাষ হয় সেখানে ফসল রোপণ, offshoot কাটিং এবং অন্যান্য পরিচর্যার আধুনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে) সংগ্রহ করে বা সব খেজুরের কাঁদি কেটে ফসল সংগ্রহ করা হয়। যেহেতু খেজুর অল্প আর্দ্রতা যুক্ত ফল, তাই কোনও রকম ব্যবস্থা ছাড়াই এই ফল সংরক্ষণ (Store) করা যায় এবং বাজারজাত করা হয়। বড় Agricultural farm, যেখানে প্রচুর উৎপাদন সেখানে উন্নত প্রযুক্তিতে সংরক্ষণ, প্যাকিং এবং ফ্রিজিং ব্যবস্থাযুক্ত পরিবহণে বাজারজাত করা বা বিদেশে রফতানি করা হয়।

ইজরায়েলে Barhee জাতের খেজুর গাছের প্রতি গাছ থেকে ৫০০ কেজি পর্যন্ত ফল উৎপন্ন হতে পারে। তবে সাধারণভাবে প্রতি গাছ থেকে ২০০ কেজি খেজুর উৎপাদন হয়ে থাকে। ২০০৫ সালের হিসাব অনুযায়ী, সারা পৃথিবীতে ৬ কোটি ৯২ লক্ষ ৪ হাজার ৯৭৫ টন (৬,৯২,৪,৯৭৫) খেজুর উৎপাদন হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। খেজুর উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম স্থানে রয়েছে মিশর (১১ লক্ষ ৭০ হাজার টন)। আমদানিকারী দেশ হিসাবে শীর্ষে রয়েছে ভারত।

প্রতি ১০০ গ্রাম খেজুরে ২৮২ ক্যালরি শক্তি, ৭৫.০৩ গ্রাম শর্করা, ৬৩.৩৫ গ্রাম সুগার, ৮ গ্রাম খাদ্যতন্তু, ০.৩৯ গ্রাম ফ্যাট, ২.৪৫ গ্রাম প্রোটিন থাকে। পাশাপাশি এই পরিমাণ খেজুরে বেটা ক্যারোটিন ও ভিটামিন –A ছাড়াও ৬% ভিটামিন B2, ভিটামিন B3 ৮%, ভিটামিন B5 ১২%, ভিটামিন B9 ৫%, ভিটামিন C ০.৪ মিলিগ্রাম, ভিটামিন E ০.০৫ মিলিগ্রাম ও ২.৭ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন K থাকে। এছাড়া ১০০ গ্রাম খেজুরে ১৪% পটাসিয়াম, ২ মিলিগ্রাম সোডিয়াম, ৩% জিঙ্ক, ৪% ক্যালসিয়াম, ৮% আয়রন, ১২% ম্যাগনেসিয়াম, ৯% ফসফরাস ও ২০.৫৩ গ্রাম অন্যান্য জলীয় উপাদান থাকে।



শুকনো খেজুর ও পাকা নরম খেজুর গাছ থেকে পেড়ে ফল হিসাবে খাওয়া হয়। অন্যান্য শুকনো ফলের সঙ্গে ড্রাইফ্রুট হিসাবেও খাওয়া হয়। পায়েস বা চাটনীতে রান্না করে এবং দুধে ফুটিয়েও খেজুর খাওয়া হয়ে থাকে। কেক তৈরিতে, পুডিংয়ে, চকোলেট, আইসক্রীম, বিস্কুট তৈরিতেও খেজুর ব্যবহৃত হয়। Fruit juice ও মদ তৈরিতেও খেজুর ব্যবহার হয়ে থাকে। মধুর সঙ্গে, মিষ্টির উপাদানেও খেজুর ব্যবহৃত হয়।

P. sylvestris বা ভারতীয় খেজুর থেকে শীতকালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে নলেন গুড় বা খেজুর গুড় পাওয়া যায়। যা পিঠে,পায়েস, রসগোল্লা, সন্দেশের স্বাদ বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং জয়নগরের মোয়া, যা নলেন গুড় ছাড়া তৈরি করা সম্ভব নয়। সবই এই ভারতীয় খেজুর গাছের কল্যাণে আমরা পেয়ে থাকি। এই খেজুর গাছটিরও উপকারীতা প্রচুর। বহু মানুষ শীতকালের অপেক্ষায় থাকেন। কখন খেজুর গাছে ভাঁড় বেঁধে রস সংগ্রহ করা হবে এবং সেই রস থেকে উৎপন্ন গুড় তৈরি হবে। যার উপর নির্ভর করে বহু গ্রামীণ মানুষের জীবিকা। এই খেজুর গাছের রস সংগ্রহ ও গুড় তৈরির কোনও আধুনিক, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এখনও এদেশে ব্যবহৃত হয়নি। ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে এই কষ্টসাধ্য কাজ করার বা দক্ষ শ্রমিক হওয়ার উৎসাহ একেবারে নেই বললেই চলে। তাই ভবিষ্যতে আমাদের দেশে হয়তো খেজুর গাছ বেঁচে থাকবে, কিন্তু খেজুর রস সংগ্রহ করার লোক পাওয়া যাবে না। যদিও প্রতিবছর দেশে ও বিদেশে নলেন গুড়ের বা খেজুরের গুড়ের ও রসের চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়ে চলেছে।

খেজুর অর্থাৎ P. dectylefera ও P. sylvestris ফলের জন্য ও গুড় তৈরিতে ব্যবহারের জন্য বিখ্যাত। এছাড়া দু'প্রকার গাছের পাতা ও কাণ্ড একই প্রকার কাজে ব্যবহৃত হয়।

খেজুর গাছের পাতা চাটাই ও ঝাঁটা তৈরিতে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া প্যাকিংয়ের কাজে, শৌখিন গৃহসজ্জার সামগ্রী তৈরিতে খেজুরের কচিপাতা ব্যবহৃত হয়। এছাড়া জ্বালানী হিসাবে খেজুর পাতা ব্যবহার করা হয়।

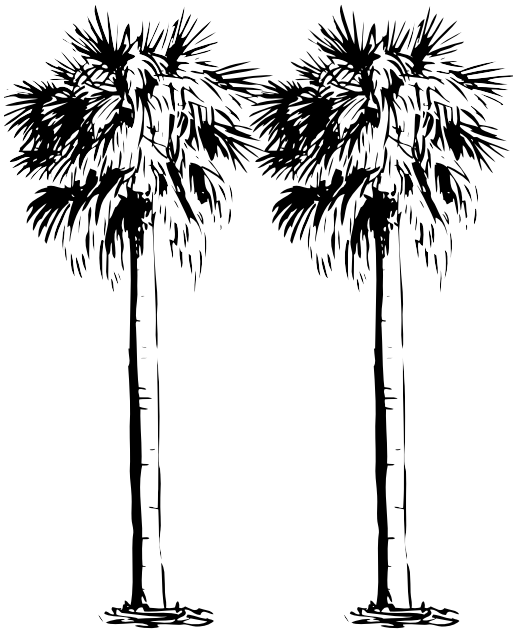
পুরুষ খেজুর ফুলের মঞ্জরী ও গাছের পাতার গোড়ায় জালের মতো যে লালচে ছোবড়া থাকে ইদানীং তা মণ্ডপসজ্জায় ও শৌখিন সামগ্রী তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পুরনো খেজুর কাঠ অস্থায়ী চালা বানানোর কাজে কাঠামোতে ব্যবহার করা হয়। জ্বালানী হিসাবেও এই কাঠ ব্যবহৃত হয়। নরম কাণ্ডের তন্তু দড়ি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

জাত পরিচিতি –

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতের খেজুরের চাষ হয়ে থাকে। এর মধ্যে Hayany, Bireir, Barhi, Holwah, Kenta, Medjool, Khalash, Lulu এবং Manakbir হল উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জাত।

তথ্যসূত্র - http://hortsci.ashspublications.org/content/42/5/1077.full, Wikipedia, FAO PLANT PRODUCTION AND PROTECTION PAPER 156Rev.



তাল

পরিচয় –

তাল গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Borassus flabellifer, এটি Arecaceae বা palm গোত্রের বহুবর্ষজীবি একবীজপত্রী শাখাহীন উদ্ভিদ।

তাল গাছের আদি জন্মস্থান ভারতীয় উপমহাদেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। ভারত ছাড়া নেপাল, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, কাম্বোডিয়া, লাওস, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইনস্, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় তাল গাছ জন্মায়। পাকিস্তানে ও চিনের কিছু অংশে তাল গাছ স্বাভাবিক উদ্ভিদ হিসাবে বিস্তার লাভ করেছে।

তাল গাছের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি, শিক্ষা ও ধর্মীয় সম্পর্ক রয়েছে। কাগজ আবিষ্কারের আগে শিক্ষাবিস্তারের জন্য পুঁথিপত্র লেখার কাজে তালপাতাই ব্যবহৃত হত। বহু প্রাচীন গ্রন্থের পান্ডুলিপি প্রথমে তালপাতার উপরে লেখা হয়েছিল। তালগাছ তামিলনাড়ুতে সরকারি বৃক্ষের মর্যাদা লাভ করেছে। তামিল সংস্কৃতিতে তাল গাছকে পবিত্র উদ্ভিদ হিসাবে পুজো করা হয়। মনে করা হয়, Karpahe Venuksham (celestial tree) অর্থাৎ স্বর্গের দেবতার আশীর্বাদে তাল গাছের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গেও তাল পবিত্র ফল। শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন অর্থাৎ জন্মাষ্টমীতে তালের বড়া দেবতাকে নিবেদন করা হয়। বিশ্ব কবির কবিতাতেও তাল গাছের ঠাঁই হয়েছে। "তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে ....."

ইংরেজিতে সাধারণভাবে তাল গাছকে Doub palm, Palmyra palm, Tala palm, Toddy palm বা wine palm বলে। সংস্কৃত ও বাংলায় এটি তাল, হিন্দিতে তার, মারাঠী ও গুজরাটিতে তাড, তামিলে পানাই ও তালাই, মালায়লামে পানা এবং তেলেগু ভাষায় তাডি ছেট্টু নামে পরিচিত।

তাল গাছ উচ্চতায় ৩০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। কাণ্ডটি কালচে ধূসর বর্ণের হয়। কাণ্ড অসমান ও পাতা দাগযুক্ত হয়। পাতাগুলি কাণ্ডের উপরে সর্পিলভাবে সজ্জিত থাকে। পত্রবৃন্তের গোড়ার দিকটা কাণ্ডকে বেষ্টন করে থাকে। পুরনো পাতাগুলি শুকিয়ে গেলেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত গাছে ঝুলে থাকতে দেখা যায়। পাতার আকার পাখার আকৃতির হয়ে থাকে। পত্রবৃন্ত সহ পাতাটি ৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। পত্রফলকে পত্রাংশগুলি লম্বালম্বি ভাঁজে জোড়া অবস্থায় বৃন্তের অগ্রভাগে অবস্থান করে। কিন্তু পাতার (পত্রাংশের) অগ্রভাগ বল্লমাকৃতির এবং প্রতিটি পত্রাংশ আলাদাভাবে বিস্তারিত হয়ে অবস্থান করে। পত্রবৃন্ত শক্ত মজবুত হয়, যা তাল বাগড়া নামে পরিচিত। এর দু'দিকে করাতের মতো কালো রঙের ধারালো দাঁতের মতো কাঁটা থাকে। তাল গাছের পুরুষ ফুল ও স্ত্রী ফুল আলাদা আলাদা গাছে জন্মায়। পুরুষ ফুলগুলি লম্বা, মোটা ও শাখাযুক্ত হয়, ক্যাটকিন প্রকারের পুষ্পবিন্যাসে পুষ্পদণ্ডের উপরে, পুষ্পপত্রের খাঁজে খাঁজে অবস্থান করে। ফুলগুলি খুব ছোট হালকা হলুদ রঙের হয়ে থাকে। স্ত্রী ফুলগুলি ছোট বলের আকারের, মোটা, শক্ত ও শাখাযুক্ত। মজবুত মঞ্জরীদণ্ডের অক্ষের উপরে একটি করে ফল সজ্জিত থাকে এবং যা পরিণত হয়ে তালের কাঁদি তৈরি করে। পরাগ সংযোগের পর স্ত্রী ফুলগুলি বড় হয়ে ১০-১৮ সেমি ব্যাসার্ধের তালে পরিণত হয়। তাল ফলটি ড্রুপ প্রকৃতির। তাল সাধারণত কালো বাদামি, হলুদ বা সোনালী রঙের হয়। তালের বহিত্বকটি পাতলা ফাইবার যুক্ত, কালো বা বাদামী হলুদ রঙের হয়। মধ্যত্বকটিতেও ফাইবার থাকে, তবে এটি রসালো শাঁসযুক্ত হয়। এন্ডোকার্পটি শক্ত, কাষ্ঠল হয়। বেশিরভাগ তালে ৩টি বীজ থাকে। তবে ১ বা ২টি বীজযুক্ত তালও কাঁদিতে থাকতে পারে। তালের ফুলের bract গুলি স্থায়ীভাবে ফলের গোড়ায় লেগে থাকে। তালের বীজ বেশ বড় ফাইবার বা তন্তুর আবরণযুক্ত হয়। এটিই তালের আঁটি নামে পরিচিত। আঁটিটি খুব শক্ত হয়। আঁটিটি কাটলে এর মধ্যে সাদা এন্ডোস্পার্ম, যা তালের 'ফোকর' নামে পরিচিত। তার মধ্যেই বীজের ভ্রুণটি থাকে।

তাল উষ্ণ ও উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের উদ্ভিদ। এই গাছের উপযুক্ত তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। তাল গাছ ৪৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং শীতে শূন্য ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রাও সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারে। উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের বেশি বৃষ্টিপাতপ্রবণ এলাকায় প্রচুর পরিমাণে তাল উৎপন্ন হয়। বাংলার গ্রামাঞ্চলে প্রবাদ আছে 'তালে ডাকে বান' অর্থাৎ প্রচুর তালের ফলন বন্যার আগাম পুর্বাভাস।

ভারতে তাল গাছ ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫০০-৮০০ মিটার উচ্চতায় জন্মাতে দেখা যায়। উপযুক্ত নিকাশীযুক্ত বালি মিশ্রিত মাটি, কৃষ্ণ মৃত্তিকা, লাল মাটি ও পলিমাটি তালের ফলনের পক্ষে উপযুক্ত। তবে সমস্ত প্রকার মাটিতেই তাল গাছ জন্মায়।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –



তাল গাছের বিস্তার বা প্রসারণ স্বাভাবিক নিয়মে গাছ থেকে পড়া তালের আঁটি বা বীজ থেকেই আপনা-আপনি হয়ে থাকে। সাধারণভাবে শত শত বছরের প্রাচীন পদ্ধতিতে জমির সীমানায়, রাস্তার ধার, পুকুর পাড় বা কৃষিকাজের অনুপযুক্ত জমিতে সরাসরি তালের আঁটি বা বীজ পুঁতে এর চাষ হয়ে আসছে। তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে সারিবদ্ধভাবে প্রচুর তাল গাছ দেখা যায়।

তাল সাধারণত বর্ষাকালে পাকে এবং বর্ষার শেষে অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে তালের অঙ্কুরোদগম হয়ে যায়। সুতরাং শীঘ্র রোপণ করলে চারা গাছ জন্মানোর হার বৃদ্ধি পায়। অঙ্কুরোদ্গমের পর দীর্ঘদিন ফেলে রাখলে তালের ভ্রূণগুলি শুকিয়ে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নার্সারীতে পরিচর্যার মাধ্যমে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঘটানোর পর হলদে রঙের জার্মটিউব শিকড়ের মতো মাটির মধ্যে প্রবেশ করে ভ্রূণ কাণ্ডের আবরণী ও ভ্রূণ মূলের আবরণী থেকে যথাক্রমে পাতা ও মূলের সৃষ্টি হয়ে নতুন চারা গাছ উৎপন্ন হয়। জার্মটিউবের এই অংশ পলিব্যাগে বড় করে পরের বছর বর্ষাকালে জমিতে রোপণ করা যায়।

তাল গাছ রোপণের নির্দিষ্ট জমির মাটি কুপিয়ে, আগাছা মুক্ত করে ৭ X ৭ মিটার দূরত্বে ৪৫ X ৪৫ X ৪৫ সেমি গর্ত করে তাতে জৈবসার বা গোবর সার প্রয়োগ করে বীজ বপন করা হয়। একসারি রোপণে আড়ে ঘন করে চারা রোপণ করা যায়।

পরিচর্যা –

তালের চারা গরু ছাগলের খুব প্রিয় খাদ্য। তাই চারাগাছগুলিকে উপযুক্ত বেড়া দিয়ে ঘিরে দিতে হয়। উপযুক্ত পরিচর্যায় চারাগুলি ২-৩ বছরের মধ্যেই অনেকটা বড় হয়ে যায়। তখন আর গরু-ছাগল তাল গাছের বিশেষ কোনও ক্ষতি করতে পারে না।

বীজ বপনের পর থেকেই নিয়মিতভাবে গর্তে জল প্রয়োগ করতে হয়। এক মাসের মধ্যেই চারাগাছগুলি জন্মাতে দেখা যায়। বর্ষার মধ্যে বীজ বপন বা চারা রোপণ করলে সেচের প্রয়োজন হয় না। শীতকালে ১৫ দিন অন্তর এবং গ্রীষ্মকালে সপ্তাহে একদিন গাছের গোড়ার চার দিকে সেচের মাধ্যমে জল প্রয়োগ করলে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়।

তালের বীজ বপনের বা চারা রোপণের সময় প্রতি গর্তে ১০ কেজি হিসাবে গোবর সার বা জৈবসার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এরপর ২০ কেজি হিসাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে, চতুর্থ ও পঞ্চম বছরে ৩০ কেজি হিসাবে, ষষ্ঠ ও সপ্তম বছরে ৪০ কেজি হিসাবে, অষ্টম ও নবম বছরে ৫০ কেজি হিসাবে এবং এর পরবর্তী সময়ে প্রতি বছর ৬০ কেজি হিসাবে জৈবসার প্রয়োগে গাছের বৃদ্ধি ও ফল উৎপাদনে ব্যাপক উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।

তাল গাছে প্রথম ৪ বছর কোনও পাতা কাটার প্রয়োজন হয় না। পরবর্তী বছরগুলিতে শুকনো পাতা কেটে গাছের পরিচর্যা করলে গাছটি উচ্চতায় বেড়ে ওঠে ও কাণ্ডের বৃদ্ধিও ভাল হয়।

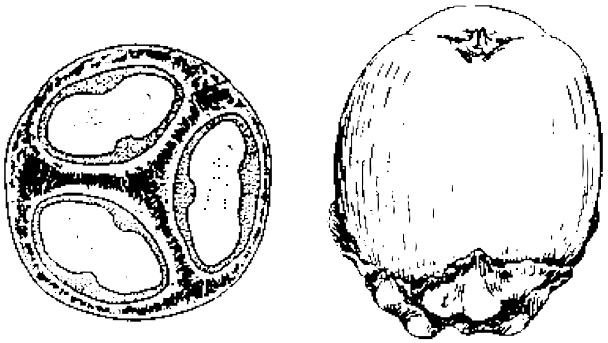
বছরে অন্তত দু'বার, গ্রীষ্মকালে একবার এবং বর্ষার শেষে একবার মাটি কুপিয়ে গাছের গোড়া উঁচু করে মাটি দিয়ে পরিচর্যা করলে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়।

তাল গাছের সারির ফাঁকা জায়গায় বর্ষাকালের শেষে চিনাবাদাম, খেসারি কলাই, শিম, বরবটি জাতীয় ডাল শস্য এবং আমলকি, আতা, পেয়ারা, কুল জাতীয় ছোট আকারের ফলের গাছ রোপণ করা যেতে পারে।তাল গাছে তেমন কোনও রোগপোকার আক্রমণের ঘটনা ঘটে না। তাই আলাদা করে রোগপোকা প্রতিরোধের ব্যবস্থাও করতে হয় না।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব -

সঠিক পরিচর্যায় গাছগুলি বেড়ে উঠলে ৮-৯ বছর বয়স থেকে তাল গাছে ফল জন্মাতে শুরু করে। পরিণত গাছ থেকে ১৫০-২৫০টি তাল পাওয়া যায়।

বিভিন্ন অবস্থায় কচি তাল সংগ্রহ করা হয়। এপ্রিল-মে মাসে অপরিণত তাল কাঁদি সমেত কেটে সগ্রহ করা হয়ে থাকে এবং তা থেকে ধারালো কাটারি বা ছুরি দিয়ে কেটে তালের শাঁস বা তালশাঁস বের করে বাজারে বিক্রি করা হয়। জলভরা তালশাঁস স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু।



এরপর সাধারণত জুলাই-অগাস্ট মাসে তাল পেকে যায়। গাছ থেকে পাকা তাল মাটিতে খসে পড়লে তা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। গাছ থেকে সমস্ত তাল খসে পড়তে এক মাসেরও বেশি সময় লাগে।

তাল গাছের সমস্ত অংশই মানুষ নানান কাজে ব্যবহার করে। তাল উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের শুষ্ক ও আর্দ্র উভয় জায়গাতেই জন্মায়। তালের প্রায় ৮০০ ধরনের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। খাদ্য হিসাবে তালের লেই অত্যন্ত সুস্বাদু, যা তালক্ষীর নামেও পরিচিত। তালের বড়া, তালের লুচি, পরটা, সরবত, তালক্ষীর জাল দিয়ে ফুটিয়ে রুটি বা মুড়ির সঙ্গে খাওয়ার রেওয়াজ আছে। তালক্ষীর মিষ্টি, লজেন্স, আইসক্রীমে ব্যবহার করা হয়। তালের ফোকর অর্থাৎ বীজের ভিতরের সাদা অংশটি খুব সুস্বাদু। এই অংশটি বিভিন্নভাবে খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। তালের আঁটির ভিতরের নীলাভ-সাদা অংশটি পান মশলায় ব্যবহৃত হয়। তালের রস তাড়ি নামে পরিচিত। এটি উত্তেজক পানীয় হিসাবে খুবই জনপ্রিয়। আবার এই তালের রস থেকেই তালের পাটালি, গুড় ও সন্দেশ, তালমিছরি তৈরি হয়ে থাকে। গ্রামীণ ভারতে বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে তালের গুড় ও পাটালির ভাল বাজার রয়েছে। তালের পাতা পাখা তৈরিতে, ঘর ছাওয়ার কাজে, অস্থায়ী বেড়া দেওয়ার কাজে, চাটাই তৈরির কাজে, শৌখিন গৃহসজ্জার দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। আবার তালের পাতা বা তালবাগড়া থেকে ছাল তুলে ও তন্তু বের করে মোড়া তৈরির কাজে ও ঘর ছাওয়ার সময় দড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর এই তন্তুগুলি খুব মজবুত হয়। তাই মাছ ধরার খাঁচা তৈরিতে এর প্রচুর ব্যবহারের নজির আছে। তাল গাছ থেকে ডোঙা তৈরি, সেচ দেওয়ার ডোঙা কল গ্রাম বাংলায় প্রচুর দেখা যায়। তালের কাঠকে কাঁড়ি বলা হয়। এটি অত্যন্ত মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী। যা গ্রাম বাংলায় ঘরবাড়ির কাঠামোতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তাল গাছের এতগুণ থাকা সত্ত্বেও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বা বাণিজ্যিকভাবে তালকে মেলে ধরার ক্ষেত্রে উদ্যোগের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

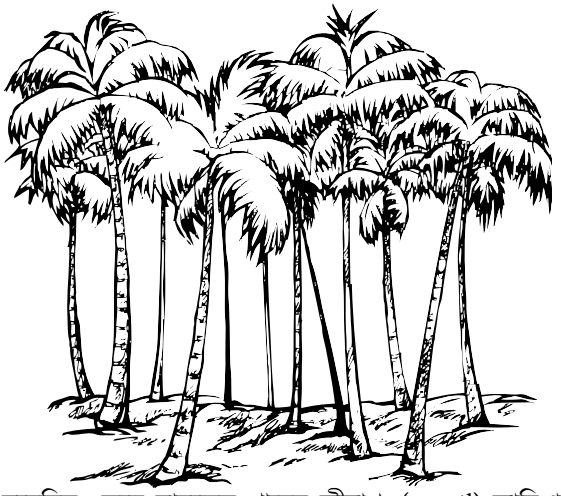
তাল গাছ ভারতের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ, যা বহুদিন থেকে আমাদের খাদ্য, বাসস্থান, আচ্ছাদন (বর্ষার 'টোকা'), 'পেখে' (রেন কোট) জোগান দিয়ে আসছে এবং দরিদ্র মানুষের আর্থিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করে চলেছে। দরিদ্র মানুষের মনে আনন্দ দিতে তাল রসের জুড়ি মেলা ভার। শিক্ষার বিস্তারে প্রাথমিক ধাপ তালপাতার মধ্যে দিয়েই বিকশিত হয়েছিল।

পরিবেশগতভাবেও তালগাছ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। উপকূলবর্তী অঞ্চলের সামুদ্রিক ঝড়ের প্রথম ধাক্কাটা তালগাছ কিছুটা প্রতিহত করার চেষ্টা করে, ভূমিক্ষয় ও জলসংরক্ষণেও এর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। পরিবেশ দূষণ রোধ করতেও তাল গাছের অবদান আছে। বন্যাপীড়িত মানুষকে উদ্ধার করার কাজে ডোঙা বা সাঁজোড় ডোঙার অবদান অসীম। বাবুই পাখির বাসা তৈরি করার জন্য এই গাছকেই বেছে নেয়। তবুও তাল গাছের ফলের কদর দিন দিন হ্রাস পেয়ে চলেছে। গ্রাম বাংলায় নতুন করে তাল গাছ রোপণের পরিমাণ ভীষণভাবে কমে গেছে। তাই এই অত্যন্ত উপকারী গাছটিকে নিয়ে ভাববার সময় এসেছে।

জাতের পরিচিতি –

তাল গাছের দেশীয় কোনও প্রকার জাতের উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

তথ্যসূত্র - TNAU Agritech Portal, www.ais.gov,bd, www.ncbi.nlm.nih.gov/, Wikipedia, www.nhb.gov.in, Glossary of Indian medicinal plants



নারকেল

পরিচয় –

নারকেল গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Cocos nucifera, এটি Arecaceae গোত্রের (Palm বা তাল গোত্রের) একটি বহুবর্ষজীবী, একবীজপত্রী, শাখাহীন উদ্ভিদ।

গাছটির আদি জন্মস্থান কোথায় তা নিয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। অনেকের মতে, গাছটির আদি জন্মস্থান ভারত ও ইন্দোনেশিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে। সমুদ্রের স্রোতে ভাসতে ভাসতে ধীরে ধীরে তা দেশ-বিদেশের উপকূল অঞ্চলে আপনা থেকেই বিস্তারিত হয়েছিল। আবার অন্য মতে, নারকেল গাছের আদি জন্মস্থান আমেরিকার প্রশান্ত মহাসগরীয় উপকূলে এবং সেখান থেকে সমুদ্রের স্রোতে ভেসে বিভিন্ন দেশে বিস্তারিত হয়েছিল। তবে নারকেল গাছের জীবাশ্ম (Fossil) আবিষ্কার হয়েছে তা থেকে জানা যায়, ইয়োসিন যুগ থেকেই অর্থাৎ ৩৭-৫৫ মিলিয়ন বছর আগে থেকেই পৃথিবীতে এই গাছের আর্বিভাব হয়েছিল।

ভারতে নারকেল গাছ ও নারকেল আমাদের দেশে হিন্দুদের কাছে অতি পবিত্র একটি ফল হিসাবে গণ্য হয়। Green coconut অর্থাৎ ডাব ছাড়া পুজোর ঘট স্থাপন করা যায় না। সারা ভারতে ডাব ও নারকেল বিভিন্ন দেবদেবীর পুজোয় অতি আবশ্যিক সামগ্রী। পুজোর প্রসাদে নারকেলের নাড়ু, নারকেলের পায়েস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

নারকেলের ইংরেজি নাম Coconut- এর উৎপত্তি Cocos (মাথার খুলি) শব্দ থেকে। সংস্কৃতে নারিকেলা, হিন্দিতে নারিয়েল, তামিল ভাষায় তেনকাই, তেলেগুতে নারিকেলম এবং বাংলা ভাষায় এটি নারিকেল, নারকেল ও নারকোল নামে পরিচিত।

নারকেল গাছ উচ্চতায় ৩০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। কাণ্ডটি ধূসর বর্ণের ও বেলনাকার হয়। নারকেল গাছের পাতা পক্ষল যৌগিক প্রকৃতির ৪-৬ মিটার লম্বা । যৌগিক পত্রকগুলি (Leaflets) ৬০-৯০ সেমি লম্বায় হয় এবং ২০০টিরও বেশি পত্রক (Leaflets) থাকতে পারে। পাতাগুলি কাণ্ডের উপর সর্পিলভাবে সজ্জিত থাকে। পাতাগুলি ৩ বছর পর্যন্ত গাছে থাকতে পারে, তারপর শুকিয়ে গাছ থেকে খসে পড়ে। নারকেল গাছের একই পুষ্পমঞ্জরীতে পুরুষফুল ও স্ত্রীফুল একসঙ্গে জন্মায়। নারকেলের পুষ্পমঞ্জরী স্প্যাডিক্স (Spadix) প্রকৃতির, চলতি বাংলায় আমরা একে মুচি বলে থাকি। নারকেলের মুচি (Spadix) নৌকার আকারের এবং যা পরিণত হয়ে ফেটে গিয়ে ফুলগুলি বেরিয়ে আসে। একই সঙ্গে গাছে পরিণত নারকেল, ডাব মঞ্জরী থাকতে দেখা যায়। নারকেল গাছে স্বপরাগসংযোগের (Self pollination) ফলে ফল উৎপন্ন হয়। নারকেল গাছের ফলটি শুষ্ক ড্রুপ (Dry Drupe) প্রকৃতির। বিভিন্ন জাতের ফলের আকার বিভিন্ন প্রকারের হয়। ২৫-৩০ সেমি, উপবৃত্তাকার। কচি অবস্থায় ফলের বাইরের ত্বক সাধারণত সবুজ ও হালকা হলুদ বা সোনালী বর্ণের হয়। পরিণত হওয়ার পর রঙের পরিবর্তন ঘটে। ফলের মধ্যত্বক (Mesocarp) ফাইবার যুক্ত হয়। যাকে নারকেলের ছোবড়া বলা হয়। Endocarpটি শক্ত থাকে, এটি নারকেলের মালা। নারকেল বীজটি এই শক্ত মালার মধ্যে থাকে। নারকেলের বীজটি এন্ডোস্পার্ম বা শস্যের মধ্যে থাকে। নারকেলের এন্ডোস্পার্মটি তরল ও শক্ত (Solid) অবস্থায় বীজটাকে ঘিরে অবস্থান করে। নারকেলের দুধ বা Copra শাঁস, শক্ত এন্ডোকার্প থেকে পাওয়া যায়।

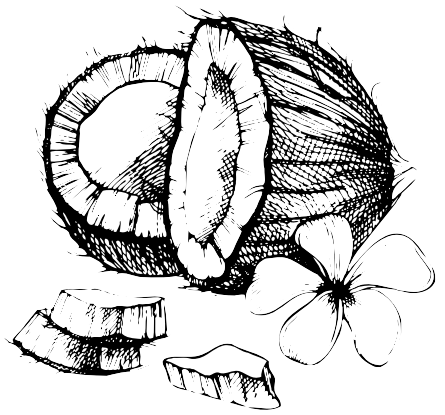
নারকেল গাছ প্রধানত উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের উদ্ভিদ। যদিও বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে নারকেল গাছ জন্মাতে দেখা যায়। কিন্তু নারকেল উৎপাদনের জন্য ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ১৫০০-৩০০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত উপযুক্ত। এক কথায় উষ্ণ ও আর্দ্রতা যুক্ত জলবায়ুতে নারকেল গাছ জন্মায়।

নিকাশীর ব্যবস্থাযুক্ত উপকূলীয় বালিমাটি নারকেলের ফলনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভাল। ১.২-১.৫ মিটার গভীর লাল বেলে-দোঁয়াশ মাটি, পলিমাটি এবং ল্যাটেরাইট মাটিতেও নারকেল গাছ ভাল জন্মায়। মাটির অম্লতা ও ক্ষারীয় মাত্রা ৫.৮ থেকে ৮.০ PH সব থেকে ভাল। এঁটেল মাটি ও পাথুরে মাটি নারকেলের গাছের পক্ষে কখনই উপযুক্ত নয়।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

বীজের দ্বারাই নারকেল গাছের প্রসারণ ঘটে থাকে। নার্সারীর বেডে বা বাড়িতে উপযুক্ত মাটিতে পরিণত নারকেল রোপণ করে নিয়মিত জল দিয়ে পরিচর্যা করে নারকেলের অঙ্কুরোদগম ঘটানো হয়। নারকেলের অর্ধেকটা মাটির উপরে রেখে জল দিয়ে পলিথিনের ব্যাগের মধ্যে চারা তৈরি করলে পরবর্তীতে দূরবর্তী স্থানে রোপণের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। বর্ষাকালে এই চারা তৈরি করার উপযুক্ত সময়।

চারা রোপণের জন্য বিভিন্ন জমি বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রস্তুত করতে হয়। ঢালু বা উঁচু-নিচু জমিতে Contour পদ্ধতিতে চারা রোপণের



জন্য গর্তের ঢালু দিকে কম-বেশি ১ মিটার উঁচু করে মাটির বাঁধের মতো করে ঘিরে দিতে হয়। দোঁয়াশ মাটির সমান জমিতে, যেখানে জলস্তর খুব কাছেই সেখানে নির্দিষ্ট দূরত্বে কমপক্ষে ১ মিটার উঁচু করে মাটি জড়ো করে মাদা বা ঢিপি বা বেদি তৈরি করে তার মাঝখানে চারা রোপণের জন্য ১ X ১ X ১ মিটার আয়তনের গর্ত করতে হবে। ল্যাটারাইট মাটি, যেখানে মাটির নিচে পাথর থাকে সেখানে ১.২ X ১.২ X ১.২ আয়তনের গর্ত কেটে রাখতে হবে। বেলেমাটিতে ৭৫ X ৭৫ X ৭৫ সেমি গর্ত কেটে চারা রোপণের উপযুক্ত করে মাটি প্রস্তুত করে গর্তের মধ্যে শুকনো গোবর সার, উইপোকা মারার পাউডার (BHC 10%), উপরের মাটি (Top soil), ছাই ও প্রতি গর্তে ২ কেজি লবণ প্রয়োগ করতে হয়। রোপণের ৬ মাস আগেই মাটি তৈরির কাজ শেষ করে রাখতে হয়।

বিভিন্ন জাতের নারকেল গাছের জন্য গাছের সারির মধ্যে ও দুটি গাছের মাঝখানের দূরত্ব ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তবে সাধারণভাবে ৭.৫ X ৭.৫ মিটার দূরত্বে রোপণ করলে প্রতি হেক্টরে ১৭৭টি গাছের প্রয়োজন হবে।

নারকেলের চারাগুলি ১ বছর বয়সের হলে তা রোপণের উপযুক্ত হয়ে যায়। চারাগাছগুলি বর্ষার আগে আগে বা বর্ষার শুরুতে রোপণ করলে সবচেয়ে ভাল। গর্তের মধ্যে আগে থেকে প্রস্তুত করা মাটির মধ্যে নারকেল চারার গোড়ার মাপের গর্ত করে রোপণ করে মাটি দিয়ে পুরো গর্তটি ভরাট করে গাছের গোড়ার দিকের মাটি উঁচু করে লেভেল করে দিতে হয়। এতে গাছের গোড়ায় অতিরিক্ত জল জমতে পারে না।

পরিচর্যা –

জমির আর্দ্রতা ও আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে সময় মতো সেচ ব্যবস্থার দ্বারা পরিচর্যার মাধ্যমে নারকেল গাছের ফলন ৫০% পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব। গ্রীষ্মকালে প্রতি গাছে গড়ে ৪০ লিটার করে জলের প্রয়োজন হয় বা বেসিন সেচ ব্যবস্থা প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। যেখানে জলের অভাব থাকে সেখানে drip irrigation ব্যবস্থার মাধ্যমে সেচ দিলে জলের অপচয় রোধ করা যায়।

প্রতি গাছে ৫০ কেজি জৈবসার (FYM) প্রতি বছর বর্ষার আগে প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়া নিমখোল, বাদামখোল, Fish meal, Blood meal প্রভৃতি প্রয়োগ তা নারকেল গাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়।

রোপণের পর নারকেল গাছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমাণে জৈব ও রাসয়নিক সার প্রয়োগ করতে হয়। প্রথম বছরে গাছ প্রতি FYM (জৈবসার) ৪০-৫০ কেজি, নাইট্রোজেন ৫০ গ্রাম, ফসফেট ৪০ গ্রাম ও পটাসিয়াম ১৩৫ গ্রাম, দ্বিতীয় বছরে গাছ প্রতি FYM (জৈবসার) ২০-২৫ কেজি, নাইট্রোজেন ১৬০ গ্রাম, ফসফেট ১২০ গ্রাম ও পটাসিয়াম ৪০০ গ্রাম, তৃতীয় বছরে গাছ প্রতি FYM (জৈবসার) ২৫-৩০ কেজি, নাইট্রোজেন ৩৩০ গ্রাম, ফসফেট ২৪০ গ্রাম ও পটাসিয়াম ৮১০ গ্রাম এবং চতুর্থ বছরে গাছ প্রতি FYM (জৈবসার) ৩০-৩৫ কেজি, নাইট্রোজেন ৫০০ গ্রাম, ফসফেট ৩২০ গ্রাম ও পটাসিয়াম ১২০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হয়।

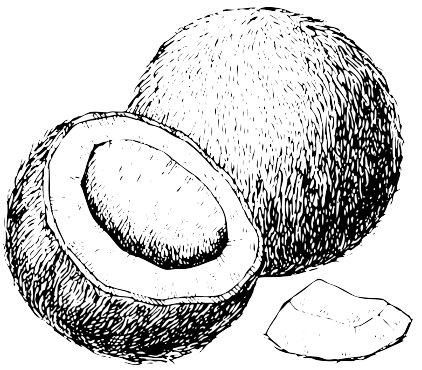
নারকেল গাছের সারিগুলির মধ্যেকার ফাঁকা জায়গায় চাষ দিয়ে আগাছা মুক্ত করে মাটি তৈরি করে ৮-১০ বছর পর্যন্ত আনারস, কলা, ওল, চীনা বাদাম, রাঙা আলু, টেপিওয়া প্রভৃতি ফসল চাষ করা যেতে পারে। এরপর ১০-২২ বছর পর্যন্ত সাথী ফসল হিসাবে, ছায়াতে জন্মাতে পারে এমন গাছ যেমন, কোকো, পান, গোলমরিচ, লবঙ্গ গাছের চাষ করা সম্ভব। এছাড়া নেপিয়ার ঘাস, শিম্বজাতীয় পশুখাদ্য প্রভৃতি মিশ্র চাষের মাধ্যমে বা একই সঙ্গে মালচিং, আগাছা দমন করা যেতে পারে।

আর যদি এভাবে মিশ্র পদ্ধতিতে নারকেল গাছের সঙ্গে অন্য ফসলের চাষ না করা হয় তবেই অন্তবর্তী পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। সাধারণত অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে লাঙ্গল দিয়ে বা কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে, গাছের গোড়া উঁচু করে মাটি দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া এবং গাছে ও সারির মাঝখানে ২ মিটার চওড়া একটু নিচু করে মাটি লেভেল করে এই পরিচর্যা করা হয়ে থাকে। প্রয়োজনে পরবর্তী সময়ে এই পরিচর্যার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। এর ফলে আলাদা করে আর আগাছা দমনের দরকার পড়ে না। তবে গাছের গোড়ায় খড় বা শুকনো পাতা ঢাকা দিয়ে (মালচিং এর মাধ্যমে) আর্দ্রতা সংরক্ষণ করলে নারকেলের ফলন বৃদ্ধি করা যায়।

বছরে অন্তত একবার নারকেল গাছের পাতা কাটা হয়ে থাকে। সাধারণত অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসেই গাছের শুকনো ও পুরানো পাতা, পাতার গোড়ায় থাকা জালির মতো অংশ ও পুরনো পুষ্পমঞ্জরী কেটে গাছের মাথা পরিষ্কার করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে গাছের মাথায় পোকামাকড়ের, ইঁদুর প্রভৃতির আক্রমণ রোধ করা যায়।

নারকেল গাছে উইপোকা, পিপঁড়ে মিলিবাগ, ফড়িং জাতীয় পোকা, White grub, শুয়োপোকা প্রভৃতি পোকামাকড়ের উপদ্রব লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া কচিফল খসে পড়া, পাতার গোড়ায় পচন ধরা, কাণ্ড থেকে রস নির্গত হওয়া, মূলের রোগ দেখা যায়, যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কৃষি ও উদ্যানপালন দফতরের নির্দেশ ও পরামর্শ মেনে কীটনাশক ও জৈব কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –



পাকা অবস্থায় ফল হিসাবে খাওয়ার জন্য নারকেল এবং কচি অবস্থায় নারকেলের জল পান করার জন্য ডাব সংগ্রহ করা হয়। ফল ধরার পর নারকেলটি পরিপূর্ণভাবে পরিণত হতে প্রায় এক বছর সময় লাগে। ডাব কাটার কোনও নির্দিষ্ট সময় থাকে না। বাজারে কচি ডাব ও শাঁসওয়ালা ডাব উভয় প্রকার ডাবেরই চাহিদা প্রচুর। নারকেল গাছ ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত ফল উৎপাদনে সক্ষম। তবে নিয়মিত ব্যবধানে গাছ থেকে ডাব কাটা হলে গাছের ফলন বৃদ্ধি হয়। বিভিন্ন জাতের নারকেলের উৎপাদন ভিন্ন ভিন্ন হয়। এছাড়া জলবায়ু, মাটি ও পরিচর্যার উপরেও গাছের ফলন নির্ভর করে। তবে Hybrid গাছের ক্ষেত্রে ফলন সব সময়ই বেশি হয়। মোটামুটিভাবে প্রতি হেক্টর জমি থেকে ১০-১৪ হাজার নারকেল উৎপাদন করা যায়।

১০০ গ্রাম নারকেলে ৩.৩% জল (ডাবে ৯৫%), ৫৫৬ কিলো ক্যালরি শক্তি (ডাবে ১৯ কিলো ক্যালরি), ৩.৬% প্রোটিন (দাবে ০.৭%), ৩৯.১% প্রোটিন (ডাবে ০.২%), ৫৬.২% কার্বোহাইড্রেট (ডাবে ৩.৭%) ও ৪.১% তন্তু (ডাবে ১.১%) থাকে। নারকেলে ০.৮%, ১%, ১% ও ১% অনুপাতে যথাক্রমে ভিটামিন A, B1, B2 ও B3 থাকলেও ডাবে এইসব ভিটামিন থাকে না। তবে নারকেলে ০.৭% ভিটামিন C পাওয়া গেলেও ডাবে তা ৫.৩% থাকে। এছাড়া এই পরিমাণ নারকেলে ৫.৪% ক্যালসিয়াম (ডাবে ৩.০%), ২৩.৯% ফসফরাস (ডাবে ২.৫%), ৩৬% আয়রন (ডাবে ৩.০%), ০.৪% সোডিয়াম (ডাবে ২.৪%) এবং ১৬.৪% পটাসিয়াম (ডাবে ৫.৩%) থাকে।

ভারতে বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতীয়দের রান্নায়, প্রায় প্রতিটি পদেই নারকেল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নারকেল পেষাই করে (paste) চাটনী তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, Uruttu chammanthi বা দানাদার চাটনী, যা দক্ষিণ ভারতে ভাতের সঙ্গে খাওয়া হয়। ইডলি, ভাদই ধোসা প্রভৃতি নারকেল বাটার চাটনী ছাড়া চলে না। পশ্চিমবঙ্গে পিঠে, পায়েশ, নাড়ু ও মিষ্টি তৈরিতে নারকেল ব্যাপক ব্যবহার হয়ে থাকে। এছাড়া আইসক্রীম, বিস্কুট, লজেন্স, কেক, পেস্ট্রি প্রভৃতি তৈরিতে নারকেল একটি অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

তেল তৈরির জন্য Oil industry-তে, সাবান কারখানায়, প্রসাধন শিল্পে নারকেল তেলের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।

নারকেলের ছোবড়া (Coir) দিয়ে কাতার দড়ি তৈরি হয়। গদি, পাপোস ও অন্যান্য শৌখিন জিনিস তৈরিতেও এই ছোবড়ার ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

নারকেল পাতার শিরাকে ঝাঁটার কাঠি বলা হয়। ঝাঁটা তৈরিতে এর ব্যবহার হয়। এই গাছের পাতা চাটাই তৈরিতে ও জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

নারকেল মালা ঘর সাজানোর শৌখিন জিনিস, বোতাম, বাদ্যযন্ত্র তৈরির কাজে লাগে। মেঝের শ্যাওলা পরিষ্কার করতে, হাতা ও চারকোল তৈরিতেও এই মালা ব্যবহার হয়ে থাকে। নারকেল গাছের কাণ্ড ঘরের কাঠামো তৈরিতে ব্যবহার করা যায়। Hard Wood -এর বিকল্প হিসাবে গৃহ নির্মাণের কাজে, বিশেষ করে ছাদ ঢালাইয়ে এর ব্যবহার হয়।

নারকেল পরিণত হলে তা পেড়ে কোনওরকম বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়াই অনেক দিন সংরক্ষণ করা যায়। উপযুক্ত দাম পেলে সরাসরি পাইকারী ব্যবসায়ীর কাছে তা বিক্রি করে দেওয়া যায়। নারকেল চাষ একটি লাভজনক চাষ। একবার উন্নত জাতের বাগান তৈরি করতে পারলে খুব সামান্য পরিচর্যার মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে লাভ পাওয়া সম্ভব।

সারা পৃথিবীতে প্রায় ৬১.৪ মিলিয়ন টন নারকেল উৎপন্ন হয়। ২০১৪ সালের হিসাব অনুযায়ী, নারকেল উৎপাদনে পৃথিবীর ৫টি দেশের মধ্যে (ইন্দোনেশিয়ায় ১০.১ মিলিয়ন টন, ফিলিপাইনসে ১৪.৭ মিলিয়ন টন, ভারতে ১১.১ মিলিয়ন টন, ব্রাজিলে ২.০ মিলিয়ন টন এবং শ্রীলঙ্কায় ২.২ মিলিয়ন টন) ভারত তৃতীয় স্থানে ছিল।

ভারতের মোট ২০৮৮.৪৭ হেক্টর জমিতে নারকেলের চাষ হয়। ভারতের প্রধান নারকেল উৎপাদক রাজ্য কেরালা (৭৭০.৬২ হেক্টর জমিতে)। তামিলনাড়ুতে ৪৫৯.৭৪ হেক্টর জমিতে, কর্ণাটকে ৫২৬.২৮ হেক্টর জমিতে অন্ধ্রপ্রদেশ ১০৩.৯৫ হেক্টর জমিতে এবং পশ্চিমবঙ্গে ২৯.৫১ হেক্টর জমিতে নারকেলের চাষ হয়। এছাড়া ভারতের ওড়িশা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র,বিহার, আসাম, ছত্তিশগড়, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে নারকেলের চাষ হয়।

জাত পরিচিতি -

নারকেলের প্রধানত তিনটি জাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, Tall, Dwarf এবং hybrid variety. এছাড়া ভৌগোলিক এলাকা অনুযায়ী Cylon Tall, Indian Tall, Jamaica Tall ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র – www.fruitcrops.com, www.agrifarming.in



কাজু বাদাম

পরিচয় –

কাজু গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Anacardium occidentale, এটি Anacardiaceae গোত্রের বৃক্ষ শ্রেণীর বহবর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী, পর্ণমোচী উদ্ভিদ।

উদ্ভিদটির আদি জন্মস্থান উত্তর-পূর্ব ব্রাজিলে। পর্তুগীজরা ব্রাজিল থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এর রফতানি শুরু করে। ইংরেজিতে এর নাম Cashew, নামটি পর্তুগীজদের দেওয়া Caju নাম থেকে এসেছে। যা আবার উৎপত্তি হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার Tupian ভাষার Kazu শব্দ থেকে। কাজু পৃথিবীর উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের বৃক্ষ। ভারতের প্রধানত আটটি রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে এর ব্যাপক চাষ হয়। এছাড়াও আসাম, ছত্তিশগড়, গুজরাট, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরার কিছু অংশে এর চাষ করা হয়। ২০১০-১১ সালের হিসাব অনুসারে ৯.৫৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে কাজুর চাষ হয়েছে এবং ভারতে ৬.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন কাজু উৎপন্ন হয়। ভারত পৃথিবীর মধ্যে কাজু উৎপাদনে ও কাজু রফতানিতে তৃতীয় স্থানে আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানের দেশগুলি হল যথাক্রমে নাইজেরিয়া ও ভিয়েতনাম। সারা পৃথিবীর ২৩% কাজু এদেশেই উৎপন্ন হয়। ভারতের উপকূলবর্তী অঞ্চলের প্রায় ২ লক্ষ শ্রমিক ও তাদের পরিবারের জীবন-জীবিকা কাজুর উপর নির্ভরশীল। শ্রমিকদের ৯০% মহিলা কাজু প্রক্রিয়াকরণের কাজে যুক্ত। কাজু একটি বড় চিরসবুজ বা চিরহরিৎ বৃক্ষ। এর উচ্চতা ১৪-১৫ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। কাণ্ডটির বৃদ্ধি হয় আঁকাবাঁকা ভাবে। পাতাগুলি উপবৃত্তাকার বা উলটো ডিম্বাকৃতির। একটু পুরু ও শক্ত পাতাগুলি আকারে ৪-২২ সেমি X ২-১৫ সেমি মাপের হয়। পাতার কিনারা মসৃণ এবং পাতাগুলি শাখাপ্রশাখার উপর সর্পিলভাবে সজ্জিত থাকে।

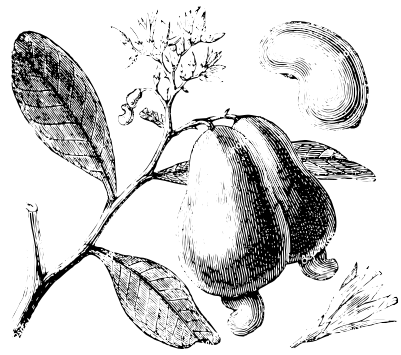
কাজু গাছের ফুল বহু শাখাবিশিষ্ট পুষ্পমঞ্জরীর উপর জন্মায়। মঞ্জরীদন্ডটি লম্বায় ২৬ সেমি পর্যন্ত হতে পারে। ফুলগুলি পরিণত অবস্থায় লালচে বর্ণের হয়। ফুলের পাপড়ির সংখ্যা ৫টি, ৭-১৫ মিলিমিটার লম্বা। কাজু ফলটি একটু ভিন্ন প্রকৃতির Anacardiaceae গোত্রের। কাজু ফল আসলে accessory fruit। আবার একে Pseudo carp or false fruitও বলা হয়। ফুলের বৃন্তটি রূপান্তরিত হয়ে এই ফল তৈরি হয়। কাজু ফল হলুদ বা লাল বর্ণের হয় লম্বায় ৫-১১ সেমি, এই অংশটি কাজু আপেল নামে পরিচিত। এর শেষ প্রান্তের উপর কিডনি আকৃতির ড্রুপ প্রকৃতির আসল ফলটি জন্মায়। প্রথমে ফুল নিষিক্ত (Fertilized) হয়ে কিডনি আকৃতির আসল ফলটি জন্মায়, পরে ফুলের বৃন্তটি (Pedicel) বৃদ্ধি পেয়ে কাজু আপেলটি গঠিত হয়। আসল ফলটিতে একটি মাত্র বীজ বা কাজু থাকে।

কাজু চাষের পক্ষে গভীর বালিযুক্ত দোঁয়াশ মাটি ও উত্তম নিকাশীযুক্ত মাটি উপযুক্ত। তবে অনেক প্রকার মাটিতেই কাজু জন্মাতে পারে। নিকাশীহীন, এঁটেল মাটি ও PH-এর মাত্রা ৮.০-র বেশি, এরকম মাটি কাজু চাষের উপযুক্ত নয়। হালকা অ্যাসিড যুক্ত লাল বেলে দোঁয়াশ, ল্যাটেরাইট মাটি ও উপকূলীয় বালিভূমি কাজু চাষের পক্ষে ভাল। সমুদ্রতল থেকে ৭০০ মিটার উচ্চভূমিতেও কাজু গাছ জন্মাতে দেখা যায়। ২০-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ১০০০ থেকে ২০০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চল কাজু চাষের পক্ষে আদর্শ। ৩৬ ডিগ্রী সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রা, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, দীর্ঘদিন ধরে ২০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে থাকা তাপমাত্রা এবং তুষারপাত কাজু গাছের ফুল-ফল ধারণে ও বৃদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটায়। চারমাস বৃষ্টিহীন শুষ্ক আবহাওয়া কাজু উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

বীজের দ্বারা বিস্তার লাভ করলে উন্নতমানের ফল উৎপাদনের নিশ্চয়তা থাকে না। তাই বাণিজ্যকভাবে চাষের ক্ষেত্রে কলমের তৈরি চারা ব্যবহার করাই লাভজনক। কাজু গাছের ডালে গুটিকলম বা Air layering বেঁধে কলমের গাছ করা একটি বহু প্রচলিত কলম তৈরির পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে তৈরি গাছের Root system বা প্রধান মূল না থাকায় মূলতন্ত্র খুব দুর্বল হয় এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলের ঝড়-ঝাপটা সহ্য করার ক্ষমতা কম হয়। প্রধান মূল না থাকার কারণে খরার সময় মাটির গভীর থেকে জল সংগ্রহ করতে পারে না। তাই এই পদ্ধতির চাষে প্রচুর ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা থাকে। Epicotyle grafting দ্বারা জোড়কলম পদ্ধতিতে কৃত্রিম প্রসারণ সম্ভব। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সফলতার হার কম। চারাগাছের মৃত্যুর হার বেশি।

Softwood grafting করেও কাজু গাছের চারা তৈরি করা যায়। এই পদ্ধতির জোড়কলমে দেড় মাস থেকে দু মাসের বীজের চারা বা Root stock ব্যবহার করা হয়। চারার উপরের দিকে ২ জোড়া পাতা রেখে ডগাটি কেটে ফেলা হয়। ডগার নরম অংশ লম্বাভাবে



চিরে (৪-৫ সেমি) উন্নতজাতের কাজুর scion শাখার অগ্রভাগ ডগার নীচের দিকে ছাল দু'দিক থেকে কেটে পাতলা করে Root stock এর মাঝখানের চেরা অংশে সুন্দরভাবে বসিয়ে পলিথিন টেপ দিয়ে ১৫-৩৫ সেমি অংশ জড়িয়ে শক্তভাবে বেঁধে দেওয়া হয়। এরপর পুরো কলমটিকে পলিথিনের ব্যাগ টুপির মতো করে ঢেকে দেওয়া হয়। এরপর চারাগুলিকে Screen house-এ ৮-১০ দিন রেখে দেওয়া হয়। কলমের গাছের ডগা থেকে নতুন শাখা জন্মানো শুরু করলে পলিথিনের টুপিটি খুলে রোদে রাখা হয়। এই পদ্ধতিতে Root stock এবং scion উভয়েরই নরম কাণ্ড ব্যবহৃত হয়। কলমে প্রয়োজন মতো জল দিতে হয়। তবে অতিরিক্ত জল যেন না জমে যায়। Root stock থেকে গাছ বের হলে তা তৎক্ষণাৎ কেটে দিতে হয়। পলিথিনের বাঁধন ৩-৪ মাস বাদে খুলে নেওয়ার প্রয়োজন হয়। যখন scion-এর পাতা বাদামি থেকে সবুজ হয়ে যাবে তখন Root stock-এর পাতাগুলি কেটে দেওয়া হয়। নতুন কলমের গাছে ফুলের মরসুমে ফুল এলে তা কেটে দিতে হয়। তাহলে গাছের বৃদ্ধি ভাল হবে। এছাড়া কলমের চারাটি প্রধান মূল সমেত মাটির গভীরে প্রবেশ করিয়ে রোপণ করা দরকার। কারণ মজবুত মূলতন্ত্র গাছটিকে ঝড় থেকে বাঁচিয়ে মাটিতে ধরে রাখতে সক্ষম হবে।

এরপর যে জমিতে কাজু গাছ রোপণ করা হবে তার মাটি পরীক্ষা করে ক্ষারের মাত্রা, লবণের মাত্রা, উর্বরতা, মাটির প্রকার ইত্যাদি পরীক্ষা করে জমিতে লাঙল বা ট্রাক্টর দিয়ে বা কোদালের সাহায্যে কুপিয়ে জমির আগাছা মুক্ত করে সমান করে বর্ষার আগেই তৈরি করে ফেলতে হয়। এরপর জমিতে ৭.৫ X ৭.৫ বা ৮ X ৮ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে ৬০ ×৬০ × ৬০ সেমি মাপের গর্ত কেটে প্রতিটি গর্তে ১০ কেজি জৈবসার এবং ২০০ গ্রাম সুপার ফসফেট মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ১৫-২০ দিন ফেলে রাখা হয়।

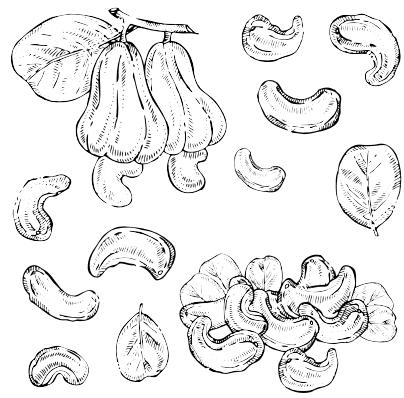
অতি ঘন রোপণের ক্ষেত্রে ৪ X ৪ মিটার দূরত্বে চারা রোপণ করা হলে প্রতি হেক্টর জমিতে ৬২৫টি চারার প্রয়োজন। অতি ঘন পদ্ধতিতে রোপণের প্রাথমিক উৎপাদনের সময় বেশি ফল উৎপাদন করা হয় এবং পরবর্তীকালে গাছের স্বাস্থ্য অনুযায়ী কেটে ছেঁটে ৮ X ৮ মিটার দূরত্বে পরিবর্তন করা যায়। ৮ X ৬ বা ৭.৫ X ৭.৫ মিটার দূরত্বে রোপণের গাছের মধ্যে বেশি করে অন্য সাথী ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। বিশেষ করে প্রাথমিক অবস্থায় অর্থাৎ চারা রোপণের পর কয়েক বছর যখন গাছগুলির মাঝের ফাঁকা জায়গায় যথেষ্ট আলো-বাতাস থাকে। সাধারণত ছোলা, বাদাম, মুগ ইত্যাদি শিম্বগোত্রের ফসলের চাষ করা হয়। এতে একদিকে যেমন জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়, তেমনই আগাছা দমন, উষ্ণতা ও আর্দ্রতা সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় এবং তা কাজু গাছের উপকার করে। কেরালা, কর্ণাটকে কাজুর সাথে আনারস চাষ করা হয়। অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশায় কাজু বাগানে নারকেল গাছ ও ক্যাসুরিনা গাছের চাষ করে ঝড় প্রতিরোধ করা হয়। সাধারণত জুলাই-অগাস্ট মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। নির্দিষ্ট দূরত্বের গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে চারাগুলো যত্ন করে রোপণ করা হয়, যাতে প্রধান মূলের অগ্রভাগ অটুট থাকে সেই দিকে যত্ন নিতে হয়। জোড়া স্থানটি যাতে মাটির উপরে কমপক্ষে ৫ সেমি থাকে ও চারা গাছটি যাতে সোজা থাকে এবং হাওয়ায় না ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার জন্য শক্ত বাঁশের কঞ্চি বা ডগা বা লাঠি পুঁতে গাছটিকে সার্পোট দেওয়া হয়।

পরিচর্যা –

যেহেতু উপকূলের বালিযুক্ত বা ঢালু জমিতেও কাজু চাষ করা হয় সেক্ষেত্রে কন্টুর পদ্ধতিতে চারা রোপণ এবং গাছের গোড়ায় উঁচু মাটি কেটে গাছের গোড়ার দিকে Terrace বা ধাপ তৈরি করা হয়। গাছকে কেন্দ্র করে এর চর্তুদিকে চক্রাকারে মাটি দিয়ে বাঁধের মতো উঁচু করে ঘিরে দেওয়া, যা জল ধরে রাখতে পারবে এবং ভূমিক্ষয় রোধ করবে। গাছ প্রতি ১০-১৫ কেজি জৈবসার, ৫০০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ১.১ কেজি ইউরিয়া, ১২৫ গ্রাম P2 O5 (৬২৫ গ্রাম), ১২৫ গ্রাম K2 O = ২০৮ গ্রাম পটাশ সারের প্রয়োজন হয়। গাছের বয়স অনুযায়ী, ৭৫০ গ্রাম পর্যন্ত নাইট্রোজেন দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। উক্ত সার অর্ধেক পরিমাণে বর্ষার আগে অর্থাৎ মে-জুন মাসে এবং বাকি অর্ধেক সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে প্রয়োগ করলে ভাল উপকার পাওয়া যায়। গাছের চারিদিকে গোড়া থেকে ১.৫-২ মিটার দূরে নালা কেটে তাতে সার প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

কাজুর চাষ সাধারণত বৃষ্টিস্নাত অঞ্চলে হয়ে থাকে। তাই কাজু চাষে বেশি সেচের প্রয়োজন হয় না। তবুও গ্রীষ্মকালে ১৫ দিন অন্তর প্রতি গাছে ২০০ লিটার জলের প্রয়োজন হয়। উপযুক্ত সেচের দ্বারা ফসল উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। কম বৃষ্টিপাত অঞ্চলে গাছের গোড়ার চারিদিক খড় বা শুকনো ঘাস, বা প্লাস্টিক পেপার বা বস্তা ইত্যাদি দিয়ে মাটিতে চাপা দিয়ে মাটির আর্দ্রতা সংক্ষরণ করে আগাছাও দমন করা যায়। বর্ষার আগে ও বর্ষার পরে সার প্রয়োগের আগে গাছের গোড়ার চারিদিকের মাটি কুপিয়ে বছরে ২ বার আগাছা দমন প্রয়োজন। এছাড়া ৪ মিলিলিটার Agrodar ৯৬ বা ৫ মিলিলিটার Grammoxone প্রতি লিটার জলে গুলে আগাছা দমনের ওষুধ গুলে স্প্রে করেও আগাছা দমন করা হয়। সাধারণত বর্ষার পর যখন প্রচুর আগাছা জন্মায় তখন এই পদ্ধতিতে হেক্টরে ৪০০ লিটার ওষুধ মিশ্রিত জল স্প্রে করতে হয়।

সাধারণত ১-৩ বছরের কাজু গাছগুলিকে নির্দিষ্ট আকারে বড় করে তোলার জন্য ও গাছের সঠিক বৃদ্ধির জন্য অবাঞ্ছিত ডালপালা



কেটে দেওয়া, কাণ্ডের ১ মিটার নীচের দিকে কোনও ডালপালা যেন না থাকে তা লক্ষ্য রাখতে হয়। কম বয়সের চারাগাছে ফুল এসে গেলে তা কেটে দেওয়া ইত্যাদি কাজগুলি Pruning ও Training-এর মাধ্যমে করা হয়।

ভারতে কাজু গাছের ক্ষতিকারক ৬০ প্রকার পোকামাকড় চিহ্নিত করা গেছে। চা গাছের মশা (Tea mosquito) কাজুর কাণ্ড ও মূল ছিদ্রকারী পোকা, পাতা এবং ফুলের কুঁড়ির ক্ষতিকারক পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। এইসব ক্ষেত্রে বছরে তিনবার স্প্রে করতে হয়। প্রথম ও দ্বিতীয়বার Endosulfan বা Monocarotophos ০.০৫%, শেষবার বা তৃতীয়বার Carboryl ০.১৫% স্প্রে করতে হয়। কখনও কখনও কাজু গাছের পাতা ও ডাল শুকিয়ে যায়। Botrydiplodia theobromae ছত্রাকের আক্রমণে প্রতিকার হিসাবে শুকনো গাছের ডাল ছাঁটাই করে দেওয়া এবং কাটা অংশে ১০% Bordeaux Paste-এর প্রলেপ দেওয়া যেতে পারে। ১% Bordeaux mixture গাছে স্প্রে করতে হয়। নিম তেল ৫% স্প্রে করলেও এক্ষেত্রে উপকার পাওয়া যায়। মার্চ এবং নভেম্বর মাসে গাছের কাণ্ডে ১:২ অনুপাতে আলকাতরা ও কেরোসিন তেলের মিশ্রণের প্রলেপ দিলে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

কাজু গাছে প্রধান ফসল তোলার মরসুম হচ্ছে ফেব্রুয়ারি–মে মাস। পরিণত ফল সংগ্রহ করতে হলে ২-১ টি ফল জলের পাত্রে রাখলে যদি ফলটি জলে ডুবে যায় তা হলে বুঝতে হবে ফল পরিণত হয়েছে। পরিণত বাদামের স্বাদ ও গন্ধ উৎকৃষ্ট হয়। ফল সংগ্রহ করার পর কাজু আপেল ফল থেকে বিছিন্নকরে ভালো করে রোদে শুকনো করা হয়। শুকনো ঠিক মতো না হলে বাদামের গুণমান ঠিক থাকে না। কাজু আপেলগুলি ফল প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের জন্য বাজারজাত করা হয়।

সাধারণত ৯২% গাছে তিনবছর পর থেকে ফল দিতে শুরু করে। গড়ে ২ কেজি ফল উৎপন্ন হয় ৩-৫ বছরের গাছে,৬-১০ বছরের গাছ গড়ে ৪ কেজি এবং ১১-১৫ বছরের গাছে ৫-১৬ কেজি ফল উৎপাদন হয়। মূলত তিনটি ধাপে কাজুর ফল থেকে বাদামটি বের করা হয়, যেমন প্রাথমিকভাবে ফলগুলিকে পরিষ্কার করা, দ্বিতীয় ধাপে ফলগুলি Roasting করা বা ভাজা। তৃতীয় ধাপে, ফলের খোলা থেকে বাদামটি সংগ্রহ করা হয়। চতুর্থ ধাপে, বাদামগুলি শুকনো করা এবং শেষধাপে খোলা ছাড়ানো হয়। ১ পাউন্ড বাদামে কটি গোটা ও সাদা রঙের বাদাম রয়েছে তার সংখ্যা বিচার করে এবং মিষ্টি কিনা তা দেখে কাজুর মান নির্নয় করা হয়ে থাকে। ভাঙা বাদামকে splits বলা হয়, যার মান খুব একটা উৎকৃষ্ট নয়। এক্ষেত্রেও splits বাদাম কতটা সাদা ও মিষ্টি তা বিচার করে কাজুর মান নির্দিষ্ট করা হয়। গোটা কাজুর (Wholes) গুণমানের মাত্রাকে গ্রেড বলে। সাধারণত ২১০, ২৪০, ২৮০, ৩২০, ৪০০, ৫০০ গ্রেডের হয়। এরমধ্যে ৩২০ গ্রেড খুব জনপ্রিয়। সাধারণত Vita pack method (প্যাকিং টিনে বাতাস ভরে তার মধ্যে বাদাম রাখা হয়, যাতে বাদামগুলি ভেঙে না যায় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হয়)-এ কাজু বাদাম প্যাকিং করা হয়।

কাজু বাদাম বাজারজাত করার মরসুম মার্চ–মে মাস। কৃষকরা সাধারণত গ্রামের বাজারে ছোট ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে এবং সেখানকার ব্যবসায়ীরা শহরের বড় মার্কেটে তা বিক্রি করে। এইভাবে কৃষক থেকে রফতানিকারকদের মধ্যে একটি যোগসূত্র তৈরি হওয়ার মধ্য দিয়ে কাজুর বাজারজাত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। কাজুর উৎকৃষ্ট মান নির্দিষ্ট হয়, বাদামের আকার এবং বাদামের স্বাদের উপর নির্ভর করে। শতকরা ৮০% কাজু ৩৫ দিনের মধ্যে বেচাকেনা শেষ হয়ে যায়। ভারতে বর্তমানে কাজু বাদামের ১০,০০০ মিলিয়ন টাকার ব্যবসা-বাণিজ্য হয়।

সামগ্রিকভাবে দেশে কাজু উৎপাদন ৪৩,০০০০ টন। পৃথিবীতে যত পরিমাণ কাজু উৎপাদন হয় তার ৬৫% ভারত বিদেশে রফতানি করে। ভারত থেকে ৬০টি দেশে নিয়মিত কাজু রফতানি করা হয়। এক হেক্টর জমিতে কাজু চাষ করতে সবকিছু ধরে ৮৩,৮০০/- টাকা খরচ হতে পারে। ব্যাঙ্ক থেকে ৮৫-৯৫% ঋণ পাওয়া যেতে পারে। ব্যাঙ্কের সুদ ১২% হিসাবে হতে পারে। সব খরচ বাদ দিয়ে ওই পরিমাণ জমির ৯ বছরের বাগান থেকে ১৩,৯৫৮৮/- টাকা লাভ করা সম্ভব হবে। পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন ওই গাছের ফল থেকে লাভ করা সম্ভব। যদিও ৯-১০ বছর পর থেকে উৎপাদন একটু একটু করে কমতে থাকে।

জাত পরিচিতি -

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন প্রকার জাতের কাজুর চাষ করা হয়। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য বিপিপি ৪, বিপিপি ৬ ও বিপিপি ৮, চিনামনি ১, চিনামনি ২, উল্লাল১, উল্লাল ৩, উল্লাল ৪, ভেঙ্গুলার ৪, ভেঙ্গুলার ৭ প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম ১ ও বিপিপি ৮ উল্লেখযোগ্য দুটি কাজুর জাত।

তথ্যসূত্র – http://agricoop.nic.in/sites/default/files/Cashewnut%20Cultivation%20%281%29.pdf/Wikipedia, https://www.nabard.org/news-article.aspx?id=25&cid=552&NID=78



কমলালেবু

পরিচয় -

কমলালেবু গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Citrus reticulata, এটি Rutaceae গোত্রের দ্বিবীজপত্রী বড় গুল্ম বা ছোট বৃক্ষ প্রকৃতির চিরহরিৎ গাছ।

কমলালেবু গাছের আদি বাসস্থান সম্ভবত দক্ষিণ-পূর্ব চিনে। দক্ষিণ জাপানে বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইন্দো-চিন অঞ্চলে বা উত্তর-পূর্ব ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে কমলালেবু স্বাভাবিকভাবে জন্মায়। ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় বণিকদের দ্বারা এবং ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে পর্তুগীজ বণিকদের হাত ধরে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে কমলালেবুর বিস্তার ঘটছে। আজ সারা পৃথিবীর প্রায় ১০০টি উষ্ণ এবং উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের দেশে কমলালেবুর চাষ হয়। পৃথিবীতে প্রায় ৬৬ মিলিয়ন টন কমলালেবু উৎপন্ন হয়।

Molecular Studies In Plant Sciences-এর গবেষণায় জানা গেছে যে, সব ধরনের লেবু জাতীয় ফল, যা আজ আমরা খেয়ে থাকি সেই সব ধরনের লেবুই বুনো (Wild) লেবু গাছের মধ্যে স্বাভাবিক ও কৃত্রিম সংকরায়নের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। ম্যান্ডারিন, পোমিলো, প্যাপিডা প্রভৃতি আদিম বা বন্য লেবুগুলি বর্তমানে চাষ হওয়া সমস্ত লেবুর পূর্বপুরুষ (Ancestor parent plants)। ম্যান্ডারিন ছাড়া সব প্রকার আদিম লেবুই তিক্ত স্বাদের। ম্যান্ডারিন লেবু Citrus reticulate-এর সঙ্গে Citrus maxima-র পর্যায়ক্রমে সংকরায়ন ঘটিয়ে উন্নতমানের মিষ্টি স্বাদযুক্ত বা অল্প টক স্বাদের কমলালেবুর জন্ম হয়েছে। পৃথিবীতে উৎপাদিত সব লেবুর মধ্যে ৬০% কমলালেবু।

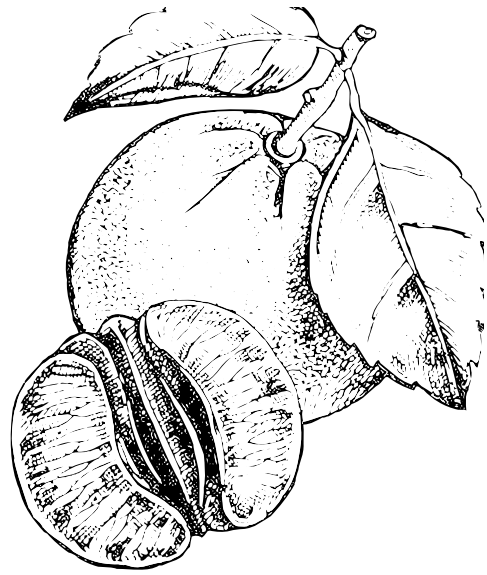
কমলালেবু ছোট আকৃতির উদ্ভিদ, উচ্চতায় ৩-৪ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। কমলালেবু গাছ প্রচুর ডালপালা বিস্তার করে থাকে। গাছের কাণ্ডে প্রচুর কাঁটা থাকে। কমলালেবু গাছের পাতা এক ফলক যৌগিক প্রকৃতির। পাতার ফলক বল্লমাকার, উপবৃত্তাকার বা চওড়া-ডিম্বাকার। প্রধান পত্রফলকের নিচের দিকের ছোট্ট ফলকটি সংযুক্ত থাকে। নিচের ক্ষুদ্র ফলকটি ডানার মতো চওড়া বা সরু হয়ে পত্রবৃন্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে অবস্থান করে। পাতার কিনারা অল্প খাঁজকাটা হয়। কখনও কখনও পাতার কিনারা মসৃণ হয়ে থাকে। ফুলগুলি সাধারণত শাখাপ্রশাখায়, পাতার কক্ষে একটি করে বা একসঙ্গে থোকা হিসাবে ৩টি করে জন্মাতে দেখা যায়। ফুলগুলি সাদা রঙের হয়। ফুলের বৃতিগুলি ৩-৫টি লতিতে বিভক্ত থাকে। পাপড়িগুলি কম-বেশি ১.৫ সেমি লম্বা। ফুলে ২০-২৫টি পুংকেশর থাকে। গর্ভদণ্ডটি লম্বা গদার মতো আকৃতির হয়। কমলালেবু Hesperidium জাতীয় একপ্রকার বেরী জাতীয় ফল। ফলটি পাকলে কমলা রঙের বা হলুদ রঙের হয়ে থাকে। ফলটি গোলাকার, কিন্তু নিচে চ্যাপ্টা ফলের ত্বক মসৃণ বা গর্তগর্ত, অমসৃণ হয়ে থাকে। ফলের খোসাটি পুরু বা পাতলা হতে পারে। কিন্তু খোসাটিকে সহজেই ছাড়িয়ে ফেলা যায়। ফলের Mesocarp স্থূল ও রসালো এবং ৭-১৪টি কোয়ায় বিভক্ত, একে Sarcocarp বলা হয়। ফলের রস কিছুটা অম্ল, কিন্তু মিষ্টি (Sweet to acidic) স্বাদের। ফলের মধ্যে ছোট ছোট অসংখ্য রসস্থলী থাকে। বীজ সাধারণত আকারে ছোট এবং ডিম্বাকৃতির হয়। বীজত্বক সাদা রঙের হয়।

কমলালেবু গাছ উষ্ণ এবং উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে জন্মায়। ১০-৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং বার্ষিক ১০০-২০০ সেমি বৃষ্টিপাত কমলালেবু চাষের পক্ষে উপযুক্ত। সমুদ্রতল থেকে ১৫০০ মিটার উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে কমলালেবু বেশি জন্মাতে দেখা যায়। কমলালেবু গাছ বিভিন্ন প্রকার মাটিতে জন্মাতে পারে। তবে উত্তম নিকাশীযুক্ত অম্ল ও ক্ষারের মাত্রা ৬.০-৮.০ PH ও মাঝারি থেকে হালকা দোঁয়াশ মাটিতে কমলালেবু চাষ ভাল হয়।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

নার্সারীতে বীজ থেকে চারা তৈরি করে বা অঙ্গজ জননের মাধ্যমে এবং বাডিং পদ্ধতিতে কমলালেবু গাছের কৃত্রিম প্রসারণ ঘটানো হয়। জানুয়ারি মাসের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বাডিং করা হয়ে থাকে। কমলালেবু চাষের জন্য নির্দিষ্ট জমিতে লাঙল দিয়ে বা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে ঝোপ-ঝাড় কেটে পরিষ্কার করে আগাছা মুক্ত করে জমি তৈরি করা হয়। পাহাড়ী ঢালে ধাপেধাপে জমি চাষ করে উপযুক্ত জল নিকাশীর ব্যবস্থা করে তবেই চারাগাছ রোপণ করা হয়।

জমিতে বর্গাকার আয়তনের গর্ত কেটে মাটিতে জৈবসার (FYM) মিশিয়ে কয়েকদিন রোদ খাইয়ে তারপর গর্তের মধ্যে চারা রোপণ করা হয়। ৪.৫ X ৬ মিটার দূরত্বে বর্গাকার পদ্ধতিতে চারা রোপণ করার জন্য প্রতি হেক্টরে ৩৫০-৪৫০টি চারা গাছের প্রয়োজন হয়। আবার ৪.৫ X ৪.৫ মিটার দূরত্বে খুব ঘনভাবে রোপণের জন্য প্রতি হেক্টরে কম-বেশি ৫০০টি চারা লাগে। তবে National



Horticultural Board–এর বর্তমান (২০০১-২০০২ সালের) মডেল অনুযায়ী, ৬ X ৬ মিটার দূরত্বে রোপণ করতে হেক্টরে ৩৬০টি চারার প্রয়োজন।

পরিচর্যা -

মাটির আর্দ্রতা অনুযায়ী শীতকালে ১০-১৫ দিন অন্তর এবং গ্রীষ্মকালে ৫-৭ দিন অন্তর জলসেচের প্রয়োজন হতে পারে। ৯০০-১১০০ মিলিমিটার বার্ষিক বৃষ্টিপাত এই গাছের পক্ষে উপযুক্ত। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য গাছ প্রতি জলের পরিমাণ এবং গাছের বয়স অনুযায়ী জলের পরিমাণ আলাদা হয়ে থাকে। তাই কোথাও ৩৫-১০৫ লিটার প্রতিদিন, আবার কোথাও ৬০-১৭০ লিটার প্রতিদিন জলের প্রয়োজন হতে পারে। তাই খরাপ্রবণ অঞ্চলে Drip Irrigation ব্যবস্থার মাধ্যমে সেচ প্রয়োগে ৫০%-৬০% জলের সাশ্রয় হয়। এছাড়া তা গাছের বৃদ্ধিতে ও উৎপাদনে সহায়ক হয়ে থাকে। জমির মাটি পরীক্ষা করে কৃষি বা উদ্যান গবেষণাগারের নির্দেশ অনুযায়ী সার প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

National Horticultural Board–এর মডেল বলছে, গাছের বয়স অনুযায়ী বছরের বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট অনুপাতে NPK (নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ) প্রয়োগ করতে হয়। গাছের ১ বছর বয়সে ১৫০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ৫০ গ্রাম ফসফরাস ও ২৫ গ্রাম পটাশ দিতে হয়। দ্বিতীয় বছরে ৩০০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ১০০ গ্রাম ফসফরাস ও ৫০ গ্রাম পটাশ। গাছের বয়স যখন ৩ বছর তখন ৪৫০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ১৫০ গ্রাম ফসফরাস ও ৭৫ গ্রাম পটাশ প্রয়োগ করতে হয়। এরপর গাছের বয়স ৪ বছর বা তার বেশি হলে, ৬০০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ২০০ গ্রাম ফসফরাস ও ১০০ গ্রাম পটাশ সার দিতে হবে। নাইট্রোজেন সার তিন ভাগে ভাগ করে তিন দফাতে এপ্রিল, অগাস্ট ও নভেম্বর মাসে প্রয়োগ করলে বেশি উপকার পাওয়া যায়। ফসফরাস সার দুই দফায়, অগাস্ট মাসে একবার ও নভেম্বর মাসে একবার প্রয়োগ করতে হয় এবং পটাশ সার একবারে, শুধু নভেম্বর মাসে দিলে তা কমলালেবু চাষে সহায়ক হয়। এছাড়াও নাইট্রোজেন সারের সঙ্গে জৈবসার (FYM) ও খোল দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এছাড়া অণুখাদ্য সার হিসাবে জিঙ্ক, কপার, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন, বোরন প্রভৃতি পাতায় স্প্রে করলে কমলালেবুর উৎপাদন ও গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়।

কমলালেবুর গাছগুলিকে একক কাণ্ড হিসাবে বড় করে তোলার জন্য এবং নির্দিষ্ট আকারে বড় করে তোলার জন্য রুগ্ন অবাঞ্ছিত ডালপালাগুলি এবং গাছের গোড়ায় জন্মানো Root Sucker কেটে দিতে হয়। এভাবে পরিচর্যা করা হলে বাগানে প্রবেশ করে ফল তোলা, সেচ দেওয়া, স্প্রে করা, প্রভৃতি করার ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা হয় না। সাধারণত ফল সংগ্রহ করার পর ডাল ছাঁটাই করা হয়। প্রতি হেক্টর জমির জন্য ৩ কেজি Diuron অথবা ৪ কেজি Simazine ৩ মাস অন্তর জলে গুলে স্প্রে করে আগাছা দমন করা হয়ে থাকে।

কমলালেবু গাছের গোড়ার ও বাগানের মাটির আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করতে গাছের গোড়ায় শুকনো পাতা, খড় বা কালো পলিথিন দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এইভাবে পরিচর্যায় করলে কিছু মাত্রায় আগাছা দমন করাও সম্ভব হয়। তবে ঠিক মতো ফসল পাওয়ার জন্য গাছের গোড়ায় ৬০-৭০ সেমি ব্যাসার্ধের মাটি ৭-১০ সেমি গভীর থেকে তুলে গাছের শিকড়ে রোদ খাওয়ানোর (Sun expose) ব্যবস্থা করা হয়। জল সেচ বন্ধ করে কিছু দিন পরে মাটিতে জৈবসার মিশ্রিত করে জলসেচ দিয়ে পরিচর্যা করলে নতুন ডালপালা জন্মাতে সহায়ক হয় এবং বেশি বেশি ফুলে-ফলে গাছগুলি ভরে যায়।

আবার জলের সংকট থাকলে ফুলের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে (এপ্রিল-মে মাসে মধ্য ভারতে) গাছকে বিশ্রাম দেওয়া যেতে পারে। ফলে পরবর্তীতে প্রচুর ফসল পাওয়া যায়। এছাড়া বেশি লাভের জন্য বাজার দরের উপর নির্ভর করেও এমনটা করা হয়ে থাকে।

কমলালেবু গাছের বাগানে চারাগাছ রোপণের পর গাছের সারির ফাঁকা জায়গায় মটর, খেসারি ও শিম্বগোত্রের অন্যান্য ফসলের চাষ করা যেতে পারে।

বিভিন্ন প্রকার পতঙ্গ, যেমন Citrus black fly, Citrus psyllid, Citrus leaf miner, শুঁয়োপোকা, মিলিবাগ, Citrus aphids প্রভৃতি ফলের ক্ষতি করে। পোকামাকড়ের আক্রমণে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া, ফল খসে পড়া, কাণ্ডের ক্ষতির পাশাপাশি ফসলের উৎপাদন ও ফলের গুণমান হ্রাস পায়। National Horticultural Board–এর (২০০১-০২ সালের) মডেল অনুযায়ী, পোকামাকড়ের প্রকারভেদে প্রতিকার হিসাবে বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক, যেমন Monocrotophos, Phosalone, Dimethoate, Phosphamidon, Quinalphos ইত্যাদি প্রয়োগ করা যেতে পারে। বর্তমানে উন্নত ধরনের জৈব কীটনাশক স্প্রে করে পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থার মাধ্যমে পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত পরামর্শ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। বিভিন্ন প্রকার হরমোন স্প্রে করেও ফল খসে পড়া ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

সাধারণত কমলালেবু গাছে ছত্রাকঘটিত ধ্বসা রোগের আক্রমণে কাণ্ডের ক্ষত, শিকড়ের পচন ইত্যাদি রোগ দেখা যায়। Ridomil Mz-72, Bavistin, Benomyl প্রভৃতি ছত্রাকনাশক স্প্রে করে এইসব রোগ প্রতিরোধ করা হয়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

এপ্রিল-মে মাসে কমলালেবু গাছে ফুল আসে। আর অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসেরমধ্যে ফল পরিণত হয়ে যায়। দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে কমলালেবু গাছে বছরে তিনবার ফল উৎপন্ন হয়। ফেব্রুয়ারি মাসের ফুল-ফল আসাকে অ্যাম্বি বাহার (ambe bahar), জুন মাসে মির্জ বাহার (Mirg bahar) এবং অক্টোবর মাসের ফুল আসাকে হ্যাস্ত বাহার (hast bahar) বলা হয়।

সাধারণত ৪ বছর বয়স থেকে কমলালেবু গাছে ফল উৎপাদন শুরু হয়। যদিও ৬ বছরের পর থেকে পরিমাণ মতো ফল পাওয়া যায়। ১৫-২০ বছর পর্যন্ত কোনও কমলালেবু গাছ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফল দিতে পারে। ৯-১০ বছরের একটি পরিণত গাছ থেকে ৫০০-৯০০টি কমলালেবু পাওয়া যেতে পারে। তবে সর্বাধিক ফল পাওয়া যায় ১০-১২ বছরের গাছ থেকে। প্রতি একর কমলালেবুর বাগান থেকে প্রায় ৪৮ টন ফল পাওয়া সম্ভব। কমলালেবু পরিণত হলে ফলের রং উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং ফলের স্বাদে টক ও মিষ্টির পরিমাণ ঠিক থাকে। আঁকশিযুক্ত সিকেটিয়ার দিয়ে ছোট্ট ডাল সমেত ফলটি কেটে ফল সংগ্রহ করা হয়। ফল যাতে মাটিতে না পড়ে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। কখনই স্যাঁতস্যাঁতে ভিজে আবহাওয়ায় বা বৃষ্টির সময় ফল সংগ্রহ করা উচিত নয়। সংগ্রহের এক সপ্তাহ আগে পরিণত ফলে Ethrel (50PPM) স্প্রে করলে একসঙ্গে সব ফল কমলা বা হলুদ রঙের হয়ে যায়। গাছ থেকে পেড়ে খোসা ছাড়িয়ে ফল হিসাবেই কমলালেবু খাওয়া হয়ে থাকে।

১০০ গ্রাম কমলালেবুতে শক্তি ৫৩ ক্যালরি, কার্বোহাইড্রেট ১৩.৩৪ গ্রাম, সুগার ১০.৫৮ গ্রাম, খাদ্যতন্তু ১.৮ গ্রাম, ফ্যাট ০.৩১ গ্রাম ও ০.৮১ গ্রাম প্রোটিন ছাড়াও ৪% ভিটামিন A, বিটা ক্যারোটিন ১%, ৫% ভিটামিন B1, ভিটামিন B2 – ৩%, ভিটামিন B3 – ৩%, ভিটামিন B5 – ৪%, ভিটামিন B6 – ৬%, ভিটামিন B9 – ৪%, ভিটামিন C – ৩২% ও ১% ভিটামিন E থাকে। পাশাপাশি ১০০ গ্রাম কমলালেবুতে ৪% ক্যালসিয়াম, ০.১৫% আয়রন, ৩% ম্যাগনেসিয়াম, ২% ম্যাঙ্গানিজ, ৩% ফসফরাস, ৪% পটাসিয়াম এবং ১% জিঙ্ক থাকে।

গাছ থেকে কমলালেবু সংগ্রহ করার পর তাদের আকার ও রং অনুযায়ী বাছাই করে আলাদা করা হয়। তবে অপুষ্ট, ছোট বা বিকৃত আকৃতির ফলগুলিকে বাতিল করা হয়। গাছ থেকে সংগ্রহ করা বাছাই করা ফলগুলিকে ক্লোরিন (১০০০ PPM) মিশ্রিত জলে ধুয়ে ফলের গা থেকে জল মুছে ফলের উপর মোমের প্রলেপ দিয়ে Bavistin (৪০০০ PPM) স্প্রে করে ৫০-৬০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা যুক্ত টানেলের মধ্যে শুকনো করা হয়। এরপর কাঠের বাক্স বা বাঁশের ঝুড়িতে ঘাস কিংবা খড়ের কুশনে (Padding) সাজিয়ে বাজারে পাঠানো হয়। প্রয়োজনে বাছাই করা ফলগুলিকে Bavistin (১০০০ PPM) স্প্রে করে ৮-১০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ও ৯০-৯৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত হিমঘরে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

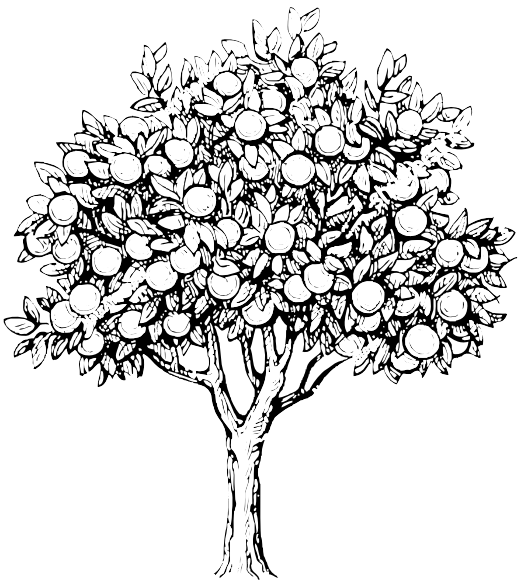
ফল হিসাবে কমলালেবুর যথেষ্ট চাহিদা থাকায় প্রতি বছর এর বাজার ভালই থাকে। ভারতের মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, আসাম, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে কমলালেবুর চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার কমলালেবুর সুনাম খুব বেশি, এছাড়া নাগপুরের কমলালেবুও বেশ ভাল মানের। ২০০১-২০০২ সালের National Horticultural Board-এর তথ্য অনুযায়ী, ভারতে কমলালেবু চাষের জমির পরিমাণ ১.১৯ লক্ষ হেক্টর থেকে বেড়ে ১.৯৯ লক্ষ হেক্টর হয়েছে। অর্থাৎ ওই সময়ের হিসাবে ৬৭% চাষ বেড়েছিল। যার ফলস্বরূপ ৫৭% উৎপাদন বেড়ে মোট উৎপাদন ১০.৫৮ লক্ষ টন থেকে ১৬.৬০ লক্ষ টনে গিয়ে দাঁড়ায়।

National Horticultural Board-এর হিসাব (২০০১-২০০২) অনুযায়ী, ভারতে এক একর জমিতে কমলালেবু চাষ করতে হলে, চাষের খরচ (৩০ হাজার টাকা), সেচ ব্যবস্থা (৭১ হাজার ১০০ টাকা), ষ্টোররুম তৈরি (৪০ হাজার টাকা) এবং জমি সমান করতে ও বেড়া দিতে (৩৩ হাজার টাকা) মোট খরচ ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। কৃষকের অংশ, ভর্তুকি যুক্ত ঋণের কিস্তি সহ সব খরচ বাদ দিয়ে হিসাব করে দেখা গেছে, গড়ে প্রথম বছর থেকে ১৯ হাজার ৮০০ টাকা এবং পরবর্তী বছর থেকে প্রতি বছরে আয় বেড়ে ৩০ হাজার টাকা হওয়া সম্ভব। এর পাশাপাশি চাষের সুবিধার্থে গড়ে তোলা স্থায়ী সম্পদ (পাম্প, টিউবওয়েল, ষ্টোররুম, স্থায়ী ছাউনি ইত্যাদি) এক্ষেত্রে বাড়তি লাভ হিসাবে পাওয়া যায়।

জাত পরিচিতি -

ভারতের গুরুত্বপূর্ণ কমলালেবুর জাতগুলি হল, নাগপুর সান্তারা, ফ্রুগ সান্তারা, খাসি সান্তারা, মুডখেদ, শ্রীনগর, বুটয়াল, ড্যান্সি, কারা (Abohar), SZ-IN-COM, দার্জিলিং ম্যান্ডারিন, সুমাত্রা ম্যান্ডারিন, সীডলেস-182 এবং কিন্নো ম্যান্ডারিন।

তথ্যসূত্র - www.efloras.org (China), wikipedia



মলটা

পরিচয় –

মিষ্টি কমলার এক অসাধারণ জাত যার বিজ্ঞানসম্মত নাম citrus sinensis, বাংলাদেশে এই ফলটি (বারি মলটা -১) মলটা নামে পরিচিত।

কমলালেবুর সঙ্গে এর মূল পার্থক্য হল, কমলালেবুর খোসা ঢিলা কিন্তু মলটার খোসা সংযুক্ত হয়ে বা জুড়ে থাকে।

জাতটি উচ্চফলনশীল ও নিয়মিত ফলদানকারী। এই জাতের পাকা ফল দেখতে আকর্ষণীয়, সবুজ এবং খেতে সুস্বাদু। গাছটি ছড়ানো ও অত্যাধিক ঝোপঝাড়যুক্ত হয়। মধ্য ফাল্গুন থেকে মধ্য চৈত্র পর্যন্ত সময়ে গাছে ফুল আসে এবং কার্তিক মাসে ফল সংগ্রহ করার উপযোগী হয়। ফল গোলাকার হয়। ফলের পুষ্পপ্রান্তে পয়সা সাদৃশ সামান্য নিচু বৃত্ত বিদ্যমান। ফলের খোসা মধ্যম পুরু ও শাঁসের সঙ্গে সংযুক্ত। শাঁস হলুদাভ, খুব রসালো, মিষ্টি ও সুস্বাদু। গাছ প্রতি ৩০০ – ৪০০ টি ফল ধরে। সামান্য যত্নসহকারে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় ২০ টন পর্যন্ত দেখা যায়।

কম বৃষ্টিবহুল সুনির্দিষ্ট গ্রীষ্ম ও শীতকাল বিশিষ্ট শুষ্ক ও উষ্ণ জলবায়ু মলটা চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। বাতাসের অধিক আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত প্রবণ এলাকায় মলটা ফলের খোসা পাতলা হয় এবং ফল বেশি রসালো ও নিম্নমানের হয়। শুষ্ক আওবহাওয়ায় ফলের স্বাদ উন্নতমানের হয়।

সব ধরনের মাটিতে জন্মালেও সুনিষ্কাশিত, উর্বর, মধ্যম থেকে হালকা দোঁয়াশ মাটি মলটা চাষের জন্য উপযুক্ত। মাঝারি অম্ল থেকে সামান্য ক্ষারীয় মাটিতে মলটা জন্মায়। তবে মাটির ৫.৫-৬.৫ অম্লতা মলটা উৎপাদনের জন্য খুব ভাল। মলটা জলবদ্ধতা একদম সহ্য করতে পারে না এবং উচ্চমাত্রার লবণের প্রতি সংবেদনশীল।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

বীজ ও কলমের মাধ্যমে মলটার প্রসারণ ঘটানো যায়। তবে এই ক্ষেত্রে বীজের থেকে কলমের মাধ্যমেই চারা তৈরি করা ভাল। রোগ প্রতিরোধী ও বলিষ্ঠ শিকড় সমৃদ্ধ আদিজোড়ের উপর কলম করার ফলে গাছের জীবনকাল ও ফলন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

জোড়কলমের এর জন্য প্রথমে আদিজোড় উৎপাদন করতে হবে। আদিজোড় হিসাবে বাতাবী লেবু, রাফ লেমন, কাটা জামির প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। তারপর কাঙ্খিত মাতৃগাছ হতে উপজোড় সংগ্রহ করে ভিনিয়ার অথবা ফাটল পদ্ধতিতে কলম করা হয়। আদিজোড় হিসাবে ১.০-১.৫ বছর বয়সের সুস্থ্য, সবল ও সোজাভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত চারা নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত মাতৃগাছ হতে Scion তৈরির জন্য দুটি চোখসহ ৫-৬ সেমি লম্বা ও ৮-৯ মাস বয়সের গাছের ডাল সংগ্রহ করতে হবে। আশ্বিন ও ফাল্গুন মাস মলটার কলম করার উপযুক্ত সময়।

সারাদিন রোদ পোড়েনা এবং বৃষ্টির জল জমে না এমন উঁচু বা মাঝারি উঁচু জমি মলটা চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত জমিটিতে বারবার চাষ ও মই দিয়ে সমান করে নিতে হবে। জমি থেকে আগাছা পরিস্কার করতে হবে এবং আশেপাশে উঁচু গাছ থাকলে তার ডালপালা ছেঁটে দিতে হবে।

সমতল জমিতে বর্গাকার বা ষড়ভূজী পদ্ধতিতে এবং পাহাড়ী এলাকায় কন্টুর পদ্ধতিতে চারা বা কলম রোপণ করা হয়। সাধারণত মধ্য বৈশাখ থেকে মধ্য ভাদ্র (মে–অগাষ্ট) মাসের মধ্যে মলটার চারা লাগানো ভাল। তবে জলসেচ নিশ্চিত করা গেলে বছরের অন্যান্য সময়েও চারা লাগানো যেতে পারে।

চারা রোপণের ১৫–২০ দিন আগে উভয়দিকে ৪.০ মিটার দূরত্বে ৭৫ X ৭৫ X ৭৫ সেমি মাপের গর্ত করতে হবে। প্রতি গর্তে ১৫ কেজি পচা গোবর, ৩-৫ কেজি ছাই, ২৫০ গ্রাম টি.এস.পি., ২৫০ গ্রাম এম.ও.পি, সার এবং ২৫০ গ্রাম চুন গর্তের উপরের মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে।

গর্তে সার প্রয়োগের ১০–১৫ দিন পর নির্বাচিত চারা বা কলমটি গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে রোপণ করতে হবে। রোপণের পর খুঁটির সঙ্গে চারা বা কলমটি বেঁধে দিতে হবে এবং প্রয়োজনমতো জল ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

পরিচর্যা –



ভাল ফলনের জন্য শুষ্ক মরসুমে নিয়মিত সেচ দেওয়া একান্ত দরকার। বর্ষার সময় গাছের গোড়ায় যাতে জল না জমে যায় এবং জল যাতে জমি থেকে তাড়াতাড়ি বের করে দেওয়ার জন্য জল নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

গাছের যথাযথ বৃদ্ধির জন্য সময়মতো সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। বয়স ভেদে গাছ প্রতি বিভিন্ন অনুপাতে গোবর সার, ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিঙ্ক সালফেট এবং বরিক অ্যাসিড দেওয়া যেতে পারে। ফাল্গুন– চৈত্র (মার্চ), বর্ষার আগে বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ (মে) এবং বর্ষার শেষে ভাদ্র–আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) মাসে, এই তিনভাগে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে সেচের ব্যবস্থা না থাকলে বর্ষার আগে ও শেষে সার প্রয়োগ করা ভাল।

বর্ষার শেষে সার প্রয়োগের পর গাছের গোড়া থেকে একটু দূরে বিভিন্ন লতাপাতা বা খড় দ্বারা বৃত্তাকারে মালচিং করে দিলে আগাছা দমনের পাশাপাশি শুষ্ক মরসুমে আর্দ্রতা সংরক্ষিত হয়। সাধারণত বর্ষার শুরুতে ও বর্ষার শেষে সম্পূর্ণ বাগানে হালকা চাষ দিয়ে আগাছা পরিস্কার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

মলটা গাছের জন্য ডাল ছাঁটাই অপরিহার্য। ফল ধরার আগে পর্যন্ত ধীরে ধীরে ডাল ছেঁটে গাছকে নির্দিষ্ট আকার দিতে হবে, যাতে গাছ চারিদিকে ছড়াতে পারে। কারণ পার্শ্ব ডালগুলিতে বেশি ফল ধরে। কাণ্ডের ১ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সব ডাল ছাঁটাই করতে হবে। ডাল ছাঁটাই করার পর ডালের কাটা অংশে বর্দোপেষ্ট-এর প্রলেপ দিতে হবে। মরা, শুকনো, রোগ বা পোকামাকড় আক্রান্ত ডালপালা কেটে পরিস্কার রাখতে হবে।

মলটা গাছে প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক ফল আসে। সমস্ত ফল রাখা হলে ফল আকারে ছোট ও নিম্নমানের হয়। এই জন্য প্রতি পুষ্পমঞ্জরীতে সুস্থ্য ও সতেজ দেখে দুটি করে ফল রেখে বাকিগুলি মার্বেল অবস্থায় ছাঁটাই করা দরকার। কলমের গাছ প্রথম বা দ্বিতীয় বছর থেকে ফল দিতে শুরু করে। গাছের বৃদ্ধির জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় বছর ফল না রাখাই ভাল।

Leaf miner মলটার অন্যতম একটি মারাত্মক পোকা। সাধারণত গ্রীষ্ম ও শরৎকালে গাছে নতুন পাতা গজালে এই পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। এই পোকাগুলি পাতার উপত্বকের ঠিক নিচের সবুজ অংশ খেয়ে আঁকাবাকা সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করে। আক্রমণের মাত্রা তীব্র হলে গাছের পাতা কুঁকড়ে যায় ও বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়ে। গাছ দুর্বল হয়ে যায় ও গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। অগাস্ট-অক্টোবর মাসে এই পোকার আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এই আক্রমণ প্রতিহত করতে পরিচ্ছন্ন ভাবে চাষাবাদ করতে হবে। প্রাথমিক অবস্থায় পোকাসহ আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। আঁঠালো হলুদ ফাঁদ ব্যবহার করা যেতে পারে। হলুদ রঙের বয়ামের বাইরের অংশে পোড়া মবিলের প্রলেপ দিয়ে এই ফাঁদ তৈরি করা হয়। কচি পাতায় অ্যাডমায়ার ২০০ এসএল ০.৫ মিলিলিটার বা কিনালাক্স ২৫ ইসি ২ মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পরপর ৩–৪ বার গাছে স্প্রে করতে হবে।

ড্যাম্পিং অফ রোগ যে কোনও লেবু জাতীয় ফলের নার্সারীরতে একটি মারাত্মক রোগ। বীজ গজানোর আগে বা পরে এই রোগের আক্রমণ হতে পারে। এই রোগে চারার গোড়ার দিক পচে যায় এবং মরে যায়। বর্ষার মরসুমে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। বীজ বপনের আগে বীজতলা পচা খোল (৬০ গ্রাম প্রতি বর্গমিটারে) দিয়ে শোধন করতে হবে। বীজতলায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সেচ দেওয়া যাবে না এবং জল দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। রোগ দেখা মাত্র রিডোমিল গোল্ড ০.২% হারে প্রয়োগ করতে হবে।

গামোসিস রোগে আক্রান্ত গাছের কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখা বাদামি বর্ণ ধারণ করে। আক্রান্ত শাখাপ্রশাখায় লম্বালম্বি ফাটল দেখা দেয় এবং ফাটল থেকে আঠা বার হতে থাকে। আক্রান্ত ডালের পাতা হলুদ হয়ে যায় এবং ডালগুলি উপর দিক থেকে মরতে থাকে এবং শেষে গাছটিও মরে যায়। মাটিতে অতিরিক্ত জল জমে গেলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন আদিজোড় যেমন, রাফ লেমন, বাতাবী লেবু, কাটা জামির প্রভৃতি ব্যবহার করতে হবে। জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করতে হবে এবং গাছকে সবল ও সতেজ রাখতে হবে। মাটি কখনও স্যাঁতস্যাঁতে হতে দেওয়া যাবে না এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত জলসেচ দেওয়া যাবে না। আক্রান্ত স্থান ছুরি দ্বারা চেঁছে বর্দোপেষ্টের (৭০ গ্রাম তুঁতে ও ১৪০ গ্রাম চুন ১ লিটার জলে মিশিয়ে বর্দোপেষ্টের মিশ্রণ তৈরি করা হয়) প্রলেপ দিতে হবে। জিঙ্কের অভাবজনিত কারণে মিষ্টি কলমায় প্রায়শই পাতার সবুজ শিরার মাঝে হলুদ হলুদ ছোপ দেখা যায়। ঘাটতি প্রকট হলে পাতা সরু ও ছোট হয়ে যায় ও গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ফলস্বরূপ

ফল ছোট ও বিকৃত হয়ে যায়। প্রতিকার হিসাবে মাটিতে জৈবসার ও জিঙ্ক সার (গাছ প্রতি ৫০-৭৫ গ্রাম জিঙ্ক-অক্সাইড বা জিঙ্ক-সালফেট) প্রয়োগ করতে হবে। গাছে এই রোগের লক্ষণ দেখা দিলে ১৫ দিন পরপর ২-৩ বার ০.৫% জিঙ্ক-সালফেট দ্রবণ (১০ লিটার জলে ৫০ গ্রাম জিঙ্ক-সালফেট) পাতায় স্প্রে করতে হয়।

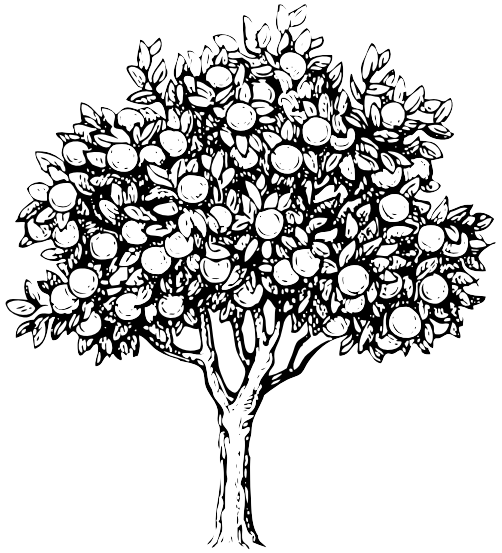


ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

ফল পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফলের গাঢ় সবুজ বর্ণ, হালকা সবুজ বা ফ্যাকাসে সবুজ হতে থাকে। মলটা সেপ্টেম্বর–অক্টোবর মাসে ফল সংগ্রহ করা হয়। পরিপক্ক ফল হাত অথবা জালিযুক্ত বাঁশের কোটার সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়। ফল সংগ্রহের পর আঘাতপ্রাপ্ত ও নষ্ট হওয়া ফলগুলিকে আলাদা করতে হয়। ভাল মানের ফলগুলি প্রয়োজনে গ্রেডিং করে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে ঠাণ্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

মালটা ভিটামিন - C সমৃদ্ধ একটি ফল। প্রতি ১০০ গ্রামে খাদ্যোপযোগী অংশে ৮০-৯০ গ্রাম জল, ০.৭–১.৩ গ্রাম প্রোটিন, ০.১–০.৩ গ্রাম চর্বি, ১২.০–১২.৭ গ্রাম শর্করা, ০.৫ গ্রাম আঁশ, ০.৫-০.৭ গ্রাম কার্বন, ০.৫–২.০ গ্রাম সাইট্রিক অ্যাসিড এবং ২০০ কিলো ক্যালরি শক্তি থাকে। ফলের খোসা থেকে প্রাপ্ত পেকটিনের মাধ্যমে প্রসাধনী ও ওষুধ শিল্পে ব্যবহৃত অত্যাবশ্যকীয় তেল প্রস্তুত করা যায়। মলটা সর্দিজ্বর নিরাময়ে অত্যন্ত উপকারী।

তথ্যসূত্র – Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI)



বাতাবী লেবু

পরিচয় –

বাতাবী লেবুর বিজ্ঞানসম্মত Citrus maxima, এটি Rutaceae গোত্রের উদ্ভিদ।

এই গাছের আদি জন্মস্থান দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। ১৬৯৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এক নাবিকের হাত ধরে জামাইকায় এই গাছ পৌঁছয়। এই ফল গাছটির সঙ্গে জাপানের পরিচয় হয় ১৭৭২-১৭৮১ সালের মধ্যে। পাশ্চাত্যে এই ফলকে Pomelo, Shaddock, Batavia Lemon or Pamplemousse বলা হয়। ইংরেজিতে বাতাবী লেবু Shaddock নামেই অধিক পরিচিত। ভারতে এই ফলকে Chakotras বলে। পক্ষান্তরে এই ফল জাম্বুরা নামেও পরিচিত। এছাড়া এদেশে এই ফল সাধারণভাবে Pomelo, Jabong, Pummelo, Pommelo Shaddock এবং Chinese grapefruit নামে পরিচিত। হিন্দিতে বাতাবী লেবুকে সাদাফল, কন্নড়ে চাকোথা হান্নু, তেলেগুতে পাম্পারা পানাসা বা দাব্বা কায়া, মালায়লমে পাম্পারামাসান, তামিলে গাদারাঙ্গাই, কোঙ্কনিতে তোরাঞ্জি, মারাঠীতে পাপানাস এবং বাংলায় বাতাবী লেবু বা জাম্বুরা বলে।

এই গাছ উচ্চতায় ৫-১৫ মিটার হতে পারে। এটি একটি মাঝারি উচ্চতার গাছ হলেও Citrus প্রজাতির সবচেয়ে বড় গাছ। বাতাবী লেবু গাছের চিরসবুজ পাতাগুলি আয়তকার থেকে উপবৃত্তাকার হয়ে থাকে। হালকা সবুজ বর্ণের পাতাগুলি লম্বায় ৫-২০ সেমি এবং চওড়ায় ২-১২ সেমি হয়। পাতার উপরিতল চকচকে এবং নিচের দিকটা তুলনায় ফ্যাকাসে এবং লোমযুক্ত হয়। বাতাবী লেবু গাছের ফুল হলদেটে সাদা রঙের। লম্বায় ১.৫-৩.৫ সেমি। অনেক সময় ফুলের বাইরের দিকটা লোমযুক্ত হয়। ফলগুলি প্রায় গোলাকার, অনেকটা কমলালেবু বা নাসপাতি আকৃতির। ফলের ত্বক খুব মোটা। কাঁচা অবস্থায় ফলের রং সবুজ বা হলদেটে সবুজ রঙের হয়। ফল পেকে গেলে রং হলুদ হয়ে যায়। বাতাবী লেবু Citrus পরিবারের সবচেয়ে বড় আকৃতির ফল।

মোটা বালি মাটি বা ভারী কাদা মাটি, যে কোনও ধরনের মাটিতেই এই গাছ জন্মাতে পারে। তবে চাষযোগ্য নিচু ও গভীর জমি এই গাছের পক্ষে উপযুক্ত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪০০ মিটারের বেশি উঁচু জমিতে কখনই বাতাবী লেবু গাছ লাগান উচিত নয়। মাটির PH–এর মাত্রা ৫.৫-৬.৫ এই গাছের সহায়ক। বাতাবী লেবু গাছের বৃদ্ধি ও ভাল ফলনের জন্য ২৫-৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৫০-১৮০ সেন্টিমিটার সবচেয়ে উপযুক্ত।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

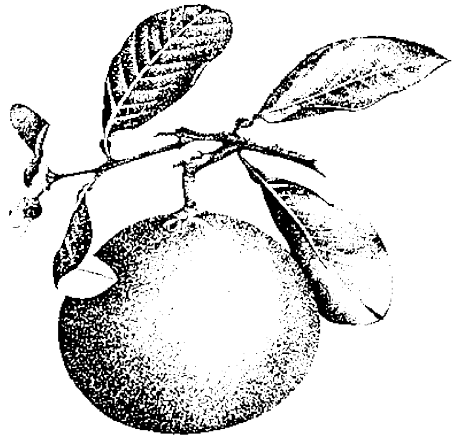
বীজ থেকে বাতাবী লেবুর বিস্তার ঘটানো যায়। তবে বীজ শুকিয়ে যাওয়ার আগেই তা জমিতে বপন করতে হয়। এছাড়া কৃত্রিম প্রসারণের ক্ষেত্রে গুটি কলম, গ্রাফটিং, বাডিং ও কাণ্ড কেটে এই গাছের অঙ্গজ জনন ঘটানো সম্ভব। সাধারণত ৮-১০ মাস বয়সের বাতাবী লেবুর চারা বাডিং ও গ্রাফটিং-এর জন্য ব্যবহার করা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সবচেয়ে প্রচলিত প্রসারণ পদ্ধতি হল গুটি কলম।

পরিচর্যা –

চারা রোপণের আগে জমিতে ভাল করে লাঙল দিয়ে চাষ করে সমান করে নিতে হয়। জমিতে আগে কোনও চাষ হয়ে থাকলে এরফলে জমি ভালভাবে পরিস্কার হয়ে যায় এবং আগাছা মুক্ত হয়। জমিতে চারা রোপণের জন্য ০.৫ মিটার গভীর গর্ত করতে হয়। এরপর ৩ ভাগ মাটির সঙ্গে ১ ভাগ জৈবসার মিশিয়ে তা দিয়ে ওই গর্ত ভরাট করে দিতে হয়। তবে কাঁচা সারের ক্ষেত্রে ১৫-২০ দিন পরে চারা রোপণ করাই ভাল। চারা রোপণের সময় ৮-১০ মিটার X ৬-৮ মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হয়। রোপণের জন্য সোজা ও দ্রুত বৃদ্ধির সম্পন্ন চারা নির্বাচন করা হয়। এরপর সার ভর্তি গর্তের মাঝখানে সোজা করে চারাটি রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের পর হালকা সেচ, খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

যে জমিতে বাতাবী লেবুর চাষ করা হয় সেখানে চারা যখন ছোট থাকে তখন মিশ্র ফসল হিসাবে কলা, এরিকা পাম বা যে কোনও ধরনের সবজির চাষ করে কিছু বাড়তি আয় করা সম্ভব। পরবর্তীকালে ওই জমিতে ছায়া সহ্যকারী গাছ সাথী ফসলরূপে লাগানো যেতে পারে। জমির আগাছা নিয়ম করে পরিস্কার করতে হয়। গাছের গোড়ায় মালচিং করেও আগাছা দমন করা যেতে পারে।

বর্ষার শুরু চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে অধিক বৃষ্টিপাতের সময় চারা রোপণ না করাই ভাল। সেচের সুবিধা থাকলে সারা



বছর ধরেই এই গাছের চারা রোপণ করা যেতে পারে। Drip irrigation পদ্ধতিতে সেচ দিলে সবচেয়ে ভাল। সেচ মূলত নির্ভর করে মাটির আর্দ্রতা ধারণের ক্ষমতা ও গাছের বৃদ্ধি উপর। চারা রোপণের পর তার শিকড় যাতে মাটির সংস্পর্শে আসে তার জন্য প্রথম সেচটি দিতে হয়। গাছে ফুল আসার আগে নিয়মিত সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। যদিও গাছের বৃদ্ধি ও ফল পরিণত হওয়ার জন্য নিয়মিত সেচ দিতে হয়। গ্রীষ্মে পূর্ণবয়স্ক বাতাবী লেবু গাছের দিনে ১০০-২৫০ লিটার জলের প্রয়োজন হয়।

ভাল ফলনের জন্য জৈবসারের পাশাপাশি এই গাছে রাসায়নিক সার প্রয়োগেরও প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম ১৩:১৩:২১ অনুপাতে দু'দফায় দেওয়া যেতে পারে। ফুল আসার আগে প্রথম দফায় এবং ৫-৬ মাস পর দ্বিতীয় দফায় এই সার প্রয়োগ করতে হয়। গাছের বয়স অনুযায়ী প্রতি বছর এই সারের পরিমাণ বাড়ানো উচিত। চারা রোপণের গর্তে সার দেওয়ার ক্ষেত্রে গাছের গুঁড়ির ১-২ মিটার দূরে তা দিতে হয়। এছাড়া চারা রোপণের ৪০ দিন পর থেকে প্রতি ২০ দিন অন্তর ফল ধরার পর ১৪০ পর্যন্ত পাতাযুক্ত সারও স্প্রে করা যেতে পারে। চারা রোপণের ৫-৬ মাস পর তার নিচের দিকের সব কুশিগুলি কেটে ফেলতে হবে। গাছটিকে মজবুত করার জন্য গোড়া থেকে সোয়া দু'হাত পর্যন্ত সব ডালপালা কেটে দিতে হবে। এরপর সোয়া দু'হাত থেকে সোয়া তিন হাত উপরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া ৪-৫টি ডাল রেখে দিতে হবে। প্রতি বছর ফল সংগ্রহের পর অবাঞ্ছিত ডালপালা ছাঁটাই করতে হয়।

সাধারণত Citrus শস্যে যে ধরনের রোগপকার আক্রমণ দেখা যায় সেই একই ধরনের রোগপোকার দেখা মেলে এই গাছে। এগুলি হল সাধারণ leaf miners, leaf-eating caterpillars, red mites, fruit-boaring caterpillar, fruit flies, scales, rats এবং nematodes এইসব রোগপোকা প্রতিরোধ করতে স্থানীয় উদ্যান প্রতিপালন দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

সাধারণত গাছে ফল আসার ৫-৬ মাস পর থেকে মূলত সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসে বাতাবী লেবু সংগ্রহ করা যায়। ফল পাকতে শুরু করলে এর বিবর্ণ ত্বকটি উজ্জ্বল হয়ে যায়। তৈলগ্রন্থিগুলি আরও স্পষ্ট ও চকচকে হয়ে ওঠে।

গাছের জাত, আবহাওয়া এবং চাষ পদ্ধতির উপর এই গাছের ফলন নির্ভর করে। তবে মোটামুটিভাবে প্রতি বছর একটি গাছ ৭৫-১০০টি অথবা প্রতি হেক্টর জমি থেকে ২০ টন ফল পাওয়া যেতে পারে। বাতাবী লেবু ওজনে ১-২ কেজি হয়। তবে সর্বোচ্চ ১০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। পাকা বাতাবী লেবু গাছ থেকে পেড়ে ফল হিসাবে খাওয়া যায়। জাম্বুরা খুব বেশি টক বা অম্ল স্বাদের হয় না। রান্নার কাজে ডেসার্ট বা জেলি তৈরি করতেও এই ফল ব্যবহৃত হয়। ১০০ গ্রাম বাতাবী লেবুর কোঁয়ায় শক্তি ৩৮ কিলো ক্যালরি, কার্বোহাইড্রেট ৯.৬২ গ্রাম, খাদ্যতন্তু ১ গ্রাম, ফ্যাট ০.০৪ গ্রাম, প্রোটিন ০.৭৬ গ্রাম, থিয়ামিন(ভিটামিন – B1) ০.০৩৪ মিলিগ্রাম, রাইবোফ্ল্যাভিন (ভিতামিন – B2) ০.০২৭ মিলিগ্রাম, নিয়াসিন (ভিটামিন – B3) ০.২২ মিলিগ্রাম, ০.০৩৬ মিলিগ্রাম ভিটামিন – B6, ৬১ মিলিগ্রাম ভিটামিন – C , আয়রন ০.১১ মিলিগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ৬ মিলিগ্রাম, ম্যাঙ্গানিজ ০.০১৭ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ১৭ মিলিগ্রাম, পটাসিয়াম ২১৬ মিলিগ্রাম, সোডিয়াম ১ মিলিগ্রাম ও ০.০৮ মিলিগ্রাম জিঙ্ক থাকে।

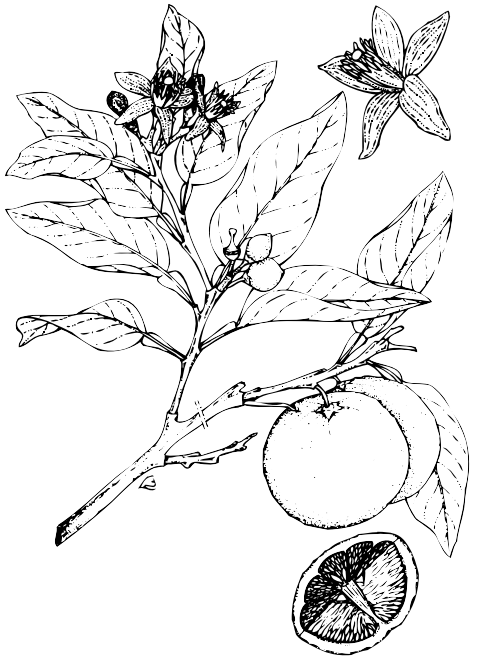
এই ফল মুত্রনালীর সংক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করে, সাধারণ সর্দি-জ্বরে এই ফল খুবই উপকারী। এছাড়া রক্তাল্পতা দূর করতে, দাঁত ও মাড়ি সুস্থ রাখতে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে, কোষ্ঠকাঠিন্য সারাতে ও ওজন কমাতে এই ফল যথেষ্ট কার্যকরী।

বাতাবী লেবু গাছের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন দেশে নানান জিনিস তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এই গাছের ফুল সুন্দর গন্ধযুক্ত হওয়ায় ভিয়েতনামে তা সুগন্ধি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া সেখানে এই গাছের ভারী কাঠ যন্ত্রপাতির হাতল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। অনেকাংশে ফলের খোসার ভিতরের সাদা অংশটি নানান কাজে ব্যবহৃত হয়। কখনও তা গাঢ় চকোলেট তৈরিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ব্রাজিলে এই ফলের বাইরের মোটা খোসাটি মিষ্টি সংরক্ষণের কাজে লাগানো হয়। এই গাছের কাঠও বিভিন্ন জিনিসের হাতল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

জাত পরিচিতি –

সাধারণভাবে বাতাবী লেবুর দুটি জাত হল, Dangyuja ও Benpeiyu এছাড়া বিভিন্ন স্বাদের বাতাবী লেবুর সংকরায়ন ঘটিয়ে বর্তমানে নানা ধরনের হাইব্রিড বাতাবী লেবুর জাত সৃষ্টি করা হচ্ছে।

তথ্যসূত্র – https://it.wikipedia.org/wiki/Citrus_maxima,worldwidefruits.com, www.agrifarming.in



মুসাম্বি

পরিচয় –

মুসাম্বি লেবুর বিজ্ঞানসম্মত নাম Citrus sinensis, এটা Rutaceae গোত্রের দ্বিবীজপত্রী ছোট বৃক্ষশ্রেণীর চিরহরিৎ উদ্ভিদ।

সব ধরনের লেবুজাতীয় ফলের মতো স্বাভাবিক সংকরায়ন এবং কৃত্রিম সংকরায়নের মধ্য দিয়ে মুসাম্বির সৃষ্টি হয়েছে। Citrus maxima ও Citrus reticulata মধ্যে সংকরায়ন ঘটিয়ে মুসাম্বি ফলের জন্ম হয়েছে।

Citrus sinensis হল sweet orange ও Citrus limetta হল sweet lemon, দু'প্রকার লেবুকেই মুসাম্বি লেবু বলা হয় এবং উভয় প্রকার লেবুই দেখতে প্রায় একইরকম। তবে sweet orange-এর ১০০ মিলিলিটার ফলের রসে ৮৯.৬৯ মিলিগ্রাম এবং sweet lime-এর ১০০ মিলিলিটার রসে ৩৩.১৫৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন - C থাকে।

মুসাম্বি লেবুর আদি জন্মস্থান কোথায়, সেই সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে মনে করা হয়, এশিয়ার দক্ষিণ, চিন এবং ভিয়েতনাম এর আদি জন্মস্থান।

Citrus limettaও মুসাম্বি নামে পরিচিত। এর আদি জন্মস্থান ইন্দোনেশিয়া থেকে চিন দেশে। কিন্তু ২০০৪ সালের Agriculture Review-তে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় Sweet lime-এর আদি জন্মস্থান (origin) ভারতের মেঘালয় ও নাগাল্যান্ড রাজ্যে।

ভারতের বিভিন্ন জায়গায় মুসাম্বি বিভিন্ন নামে পরিচিতি। হিন্দি, বাংলা ও মারাঠীতে মুসাম্বি, তামিল ভাষায় সাথাগুড়ি এবং তেলেগুতে বাত্তাভী নারিঙ্গা নামে পরিচিত।

মুসাম্বি লেবুর গাছ উচ্চতা ৭.৫ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। কিন্তু ১৫ মিটার বা ৫০ ফুট লম্বা গাছও দেখা যায়। কাঁটাযুক্ত গাছটির মাথার দিকে ডালপালাগুলি ঘন ও প্রসারিত হয়ে থাকে। পাতাগুলি সুগন্ধযুক্ত ডিম্বাকার বা উপবৃত্তাকার বা আয়ত-ডিম্বাকার হয়ে থাকে। পাতাগুলি লম্বা-চওড়ায় ৭.৫-১৫ সেমি X ২.৫-৯.৫ সেমি পাতার ফলক পুরু, পাতার কিনারা সমান বা খাঁজকাটা হয়। পত্রাগ্র সূঁচালো বা উপবৃত্তাকার হয়। পত্রবৃন্তের সঙ্গে সরু ডানাযুক্ত উপপত্রটি সংযুক্ত থাকে। ফুলগুলি সুগন্ধযুক্ত সাদা রঙের হয় পাতার কক্ষে এককভাবে বা ৫-৬টি ফুল একসঙ্গে গুচ্ছাকারে জন্মায়। ফুলে ৫টি পাপড়ি থাকে। পুংকেশর হলুদ রঙের হয় এবং সংখ্যায় ২০-২৫টি হয়ে থাকে। ফলগুলি গোলাকার বা ডিম্বাকার ৬.৫-৯.৫ সেমি আকারের হয়ে থাকে। ফল হেস্পেরিডিয়াম প্রকৃতির একপ্রকার বেরী জাতীয়। ফলের খোসা গাঢ় হলুদ বা কমলা রঙের হয়। উষ্ণ জলবায়ুতে ফল পরিণত হয়ে গেলেও সবুজ রঙের হয়ে থাকে। ভারতে মুসাম্বি লেবু সাধারণত সবুজ রঙের বা হালকা হলুদ রঙের হয়ে থাকে। ফলের ত্বক অমসৃণ ছোট ছোট গ্রন্থিযুক্ত হয়। ফলের শাঁস রসালো ও মিষ্টি স্বাদের হয় এবং ১০-১৪ টি ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে। ফলের রসালো শাঁসটি হালকা হলুদ। তবে বিভিন্ন জাত অনুযায়ী আলাদা বর্ণেরও হয়ে থাকে।

মুসাম্বি লেবুর গাছ উপক্রান্তীয় শুষ্ক ও কিছুটা মরু জলবায়ু অঞ্চলে জন্মায়। -৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস (মাইনাস তিন ডিগ্রী সেলসিয়াস) তাপমাত্রায় অর্থাৎ ঠাণ্ডায় গাছের প্রচুর ক্ষতি হতে পারে। অন্যদিকে ৩২-৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের বেশি উষ্ণতা মুসাম্বি গাছের পক্ষে ক্ষতিকারক। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ১৬-২০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৫০০-৭৭৫ মিলিমিটার মুসাম্বি লেবু গাছের পক্ষে উপযুক্ত। শুষ্ক আবহাওয়ায় জন্মালে ফলের স্বাদ ও গুণগত মান ভাল হয়। বেশি আর্দ্র আবহাওয়ায় জন্মালে ফলের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়।

বিভিন্ন ধরনের মাটিতে মুসাম্বি গাছ জন্মাতে পারে। পলিমাটি, বেলে-দোঁয়াশ মাটি, দোঁয়াশ মাটি, বালিযুক্ত লাল মাটি, মহারাষ্ট্রে, ও দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে ভারতের মধ্যে উৎকৃষ্ট জাতের মুসাম্বি জন্মায়। উত্তম নিকাশীযুক্ত বেলে-দোঁয়াশ মাটি বা কাদাযুক্ত দোঁয়াশ মাটি মুসাম্বি চাষের জন্য উপযুক্ত।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

বীজের দ্বারাও মুসাম্বি লেবু গাছের কৃত্রিম প্রসারণ করা যায়। পাকা ফলের বীজ ভালভাবে ধুয়ে সংগ্রহ করা হয়। নার্সারীর গ্রীন হাউসে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় (৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস) বীজের অঙ্কুরোদ্গম হতে ২-৩ সপ্তাহ সময় লাগে। মুসাম্বি লেবু বীজ বহু ভ্রুণযুক্ত।



তাই বীজ থেকে দুটি বা দুইয়ের বেশি চারাগাছ উৎপন্ন হয়। বীজের তৈরি চারাগাছ রোপণ করেও একই প্রকারের গুণগত মানসম্পন্ন ফল উৎপাদন করা যায়। কারণ বহু ভ্রুণযুক্ত মুসাম্বির বীজ থেকে Nucellar–Seedling চারাগাছ রোপণ করা যেতে পারে। এরপর চারাগুলি পলিব্যাগ বা টবের মধ্যে রোপণ করা হয় বা Root stock হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

উচ্চফলনশীল ও পরিবেশ সহনশীল মুসাম্বি লেবু চাষের জন্য বিভিন্ন প্রকার বীজের থেকে উৎপন্ন এক থেকে দেড় বছর বয়সের (Root stock) চারাগাছ নার্সারীতে পরিচর্যার মাধ্যমে পলিব্যাগের মধ্যে বা টবের মধ্যে বড় করা হয়। সাধারণত Citrus jambhiri, জাট্টি খাট্টি (Jatti Khatti), করন খাট্টা (Citrus Karan), রংপুরলেবু বা Rough lime টকলেবু প্রভৃতি জাতের বীজের থেকে তৈরি Root stock চারাগাছের উপর উন্নত জাতের ৫-৭ সেমি লম্বা বা ডালের জোড়কলম করে কলমের গাছ তৈরি করে রোপণ করা হয়। রংপুর লেবুর জোড়কলমের গাছের সফলতার হার এবং উৎপাদন বেশি হয়।

মুসাম্বি লেবু গাছের প্রসারণ 'T' বাডিং ও Shield বাডিং-এর দ্বারাও করা যায়। এক বছরের Root Stock-এর উপর বাডিং করে ও কলমের গাছ তৈরি করেও মুসাম্বির কৃত্রিম প্রসারণ করা যায়। এই পদ্ধতিই বেশি জনপ্রিয়। বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য বাডিং-এর দ্বারা তৈরি কলমের গাছ বেশি ব্যবহৃত হয়।

এছাড়া নার্সারীতে মুসাম্বি গাছের ডালে গুটিকলম বেঁধেও কলমের গাছ তৈরি করা যায়।

মুসাম্বি চাষের জন্য উপযুক্ত জমিতে আড়ে এবং লম্বায় লাঙল দিয়ে বা ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ দিয়ে ও মই দিয়ে জমির ঢাল বজায় রেখে জমির মাটি প্রস্তুত করা হয়। সাধারণত ৬ মিটার দূরত্বে ৬০ X ৬০ X ৬০ সেমি আয়তনের গর্ত কেটে প্রতি গর্তে ১৫-২০ কেজি করে জৈবসার (FYM) এবং অনুখাদ্য হিসাবে প্রতি গর্তে ২৫ গ্রাম হিসাবে জিঙ্ক + লৌহ + ম্যাঙ্গানিজ + কপার ঘটিত যৌগ মাটির সঙ্গে মিশ্রিত করে ফেলে রাখা হয়। এছাড়া কীটনাশক হিসাবে ১০% BHC পাউডার প্রয়োগ করে পিঁপড়ে ও কীটপতঙ্গ মুক্ত করে গর্তগুলি তৈরি করা হয়।

বর্ষার শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে চারাগাছ রোপণের উপযুক্ত সময়। রোপণের সময় এবং রোপণের পরে নিয়মিত জল দিয়ে পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। গাছের গোড়ায় যাতে জল জমে না থাকে সেইভাবে গাছের গোড়ার চারদিকে মাটি ঢালু করে চারাগাছ রোপণ করা হয়।

হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবে জাত্তি খাট্টির Root Stock-এর জোড়কলমের মাধ্যমে Blood Red জাতের মুসাম্বি লেবুর চাষ হয়ে থাকে। সেখানে হেক্টরে ২৫০-৩০০টি চারাগাছের প্রয়োজন হয়ে থাকে। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ ও অন্যান্য জায়গায় সাথগুড়ি ও রংপুর লাইম (লেবুর) Root Stock-এর জোড়কলমের বা বাডিং-এর চারা রোপণ করা হয়। সাথগুড়ি ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে ১৭০-২০০টি এবং রংপুর কলমের জন্য ২৭০টি চারাগাছের প্রয়োজন হয়।

পরিচর্যা –

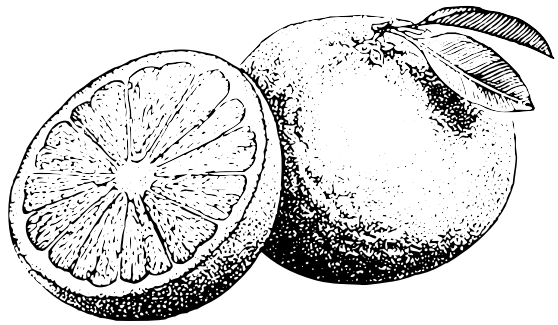
মাটির আর্দ্রতা অনুযায়ী মুসাম্বি লেবু গাছে নিয়মিত সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। নভেম্বর–ফেব্রুয়ারি মাসে ১০-১২ দিন অন্তর সেচ দিতে হয়। বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় যাতে জল না জমে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

মার্চ-জুন মাসে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে ৬-৮ দিন অন্তর সেচ দিতে হয়। মুসাম্বি লেবু গাছে বছরে ২০-২৫ বার সেচের প্রয়োজন হয়ে থাকে। মহারাষ্ট্রে এই চাষে Drip irrigation system খুব জনপ্রিয় সেচ পদ্ধতি। Double-ring or bed irrigation system-এ সেচ ব্যবস্থায় কাণ্ডের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে সেচ দেওয়া হয়। এতে গাছের মূলে ছত্রাক আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

মুসাম্বি লেবু গাছের জন্য গাছের বয়সের বিচারে বিভিন্ন সার (জৈবসার ও NPK) প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। যদিও বিভিন্ন জায়গার মাটির উর্বরতার তারতম্যে সারের মাত্রা ভিন্ন হতে পারে।

পরিমাণ মতো সারগুলির মধ্যে নাইট্রোজেন সার দুই কিস্তিতে মার্চ এবং অক্টোবর মাসে গাছের গোড়া থেকে ৭০সেমি দূরত্বে মাটি কুপিয়ে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। গাছের ফল ধরার পর থেকে তিনমাস অন্তর জিঙ্ক সালফেট ০.০৫%, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ০.৫% ম্যাঙ্গানিজ সালফেট ০.২৫%, বোরন ০.১%, মলিবডিনাম ০.০০৩% জলে গুলে স্প্রে করলে ফলের উৎপাদন ভাল হয়।

মিশ্র চাষের দ্বারা মুসাম্বি বাগানের আর্দ্রতা সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু যখন বাগানে মিশ্র চাষ করা সম্ভব হয় না তখন অর্থাৎ ফল উৎপাদনের পর থেকে গাছের গোড়ার চারদিকে শুকনো ঘাসপাতা, খড় বা কালো প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে মালচিং পদ্ধতিতে আর্দ্রতা



সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।

বর্ষার শেষে বা শীতের আগে মাটিতে চাষ দিয়ে আগাছা দমন করে রোপণের পর থেকে গাছে ফল ধরার আগে পর্যন্ত শিম্ব জাতীয় ডাল শস্য, তূলা, সয়াবিন, মটর, খেসারি বা অন্যান্য শাক-সবজি চাষ করা হয়ে থাকে। এরফলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, আগাছা দমন এবং আর্দ্রতা সংরক্ষণের কাজ একসঙ্গেই করা যেতে পারে। মিশ্রচাষ যখন আর সম্ভব হয় না বা অতিরিক্ত আগাছা জন্মে গেলে প্রতি হেক্টরে আগাছানাশক ওষুধ Diuron ৩ কেজি প্রয়োজন অনুযায়ী ২-৩বার স্প্রে করে বা Fornoxone ৫ কেজি এবং তার সঙ্গে ২.৫ লিটার Paraquat ৫০০ লিটার জলে গুলে স্প্রে করে আগাছা দমন করা যায়।

মুসাম্বি গাছকে একক কাণ্ডের গাছ হিসাবে বড় করে তোলার জন্য গাছের গোড়ার দিকে মাটির থেকে ০.৭–১ মিটার উচ্চতার নিচের দিকের কাণ্ডের পাশের শাখাগুলি কেটে দেওয়া হয়। গাছের কাণ্ডের ৩-৪ মিটার উচ্চতায় ৪-৬টি প্রধান শাখা রেখে বাকি অবাঞ্ছিত ডালপালা কেটে দেওয়া হয়। কয়েকবছর পর্যন্ত এইভাবে পরিচর্যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট আকারে গাছগুলিকে বড় করে তোলা হয়। ফল সংগ্রহ করার পর এবং নিয়মিত রুগ্ন মরা ডালপালা ছাঁটাই করা হয়ে থাকে। ডালপালার কাটা অংশে Bordeaux প্রলেপ দিয়ে ছত্রাক আক্রমণের দ্বারা কাণ্ডের ক্ষতির আশঙ্কা দূর করা হয়।

মুসাম্বি লেবু গাছের প্রধান অনিষ্টকারী কীট Leaf miner, এই পোকা মুসাম্বি গাছের কচি পাতা খেয়ে ফেলে। ফলে গাছের পাতা কুঁকড়ে যায় এবং গাছের বৃদ্ধি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে গাছের প্রচুর ক্ষতি হয়। প্রতিকার হিসাবে প্রতি লিটার জলে ১ মিলিলিটার Dichlorvos বা ২ মিলিলিটার Dimethoate30%, নিম জাতীয় জৈব কীটনাশক যেমন, NSKE (Neem Seed Kernel Extract), নিম তেল ৩% প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া যায়।

মুসাম্বি লেবু গাছের শিকড়ে একটি পরভোজী থাকে। যা গাছের শিকড়ে রোগ সৃষ্টিকারী কৃমিজাতীয় কীটকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। প্রতি গাছে গোড়ার থেকে ৫০ সেমি দূরে এবং ১৫ সেমি মাটির গভীরে ২০ গ্রাম হিসাবে এই ব্যাকটেরিয়া প্রয়োগ করে কৃমিজাতীয় এই কীটকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মাটিতে ২ গ্রাম হিসাবে Phorate, Metalaxly + Mancozeb ইত্যাদি প্রয়োগ করেও এই কীটকে দমন করা যায়।

Little leaf malady ও মুসাম্বি লেবু গাছের একপ্রকার ক্ষতিকারক পোকা যা জিঙ্ক সালফেটের দ্রবণের সঙ্গে ১ মিলিলিটার ট্রিপোল প্রতি ১ লিটার জলে গুলে স্প্রে করে এই পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

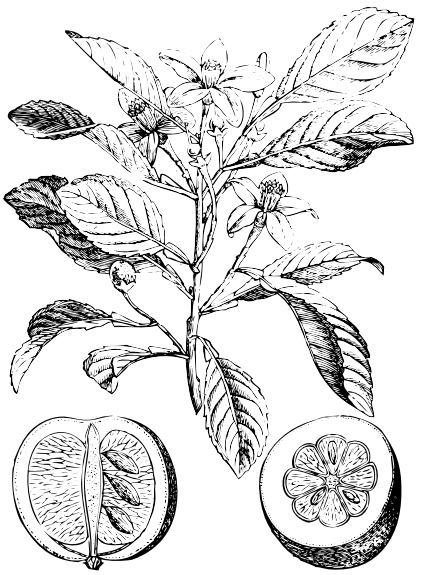
মুসাম্বি লেবু গাছের উৎপাদন গাছের ৫ বছর বয়স থেকে শুরু হয় এবং ২০ বছর বয়স পর্যন্ত ফল উৎপন্ন হয়ে থাকে। সাধারণত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে মুসাম্বি ফল পাকতে শুরু করে। উষ্ণ আবহাওয়ার গাছের ফল গাঢ় সবুজ থেকে ক্রমশ হালকা সবুজ বর্ণে পরিণত হলে বুঝতে হবে ফল সংগ্রহ করার সময় হয়ে গেছে। জালযুক্ত আঁকশি দিয়ে বা মইয়ে উঠে হাত দিয়ে সংগ্রহ করলে আঘাতজনিত কারণে ফল নষ্ট হতে পারে না।

পরিণত প্রতিটি গাছে গড়ে ৩০০-১০০০ টি ফল বছরে উৎপন্ন হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রকার জাতের Sweet Orange বা মুসাম্বি লেবুর উৎপাদনের তারতম্য হয়ে থাকে। তবে গড়ে প্রতি হেক্টরে ২৫-৩০ টন ফল উৎপন্ন হতে পারে।

ফল সংগ্রহের পর ফলগুলি ধুয়ে শুকনো করা, বাছাই করা এবং নরম কাগজের মোড়কে আবৃত করে কার্টুন বা কাঠের বাক্সে বা ঝুড়িতে ভর্তি করে বাজারে পাঠানো হয়।

বাক্সের মধ্যে খড় বা নরম কাগজ দিয়ে প্যাকিং করে উন্নত পরিবহনের মাধ্যমে দেশীয় বাজারে বা বিদেশে রফতানি করা হয়। অল্পমাত্রায় কিছু ছত্রাকনাশক ওষুধ ফলের উপর স্প্রে করে ঘরের তাপমাত্রায় ১৫-২০ দিন সংরক্ষণ করা যেতে পারে। ৩-৪ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণের জন্য নিয়ন্ত্রিত ৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং উপযুক্ত আপেক্ষিক আর্দ্রতায় (৮৫-৯০%) ফলগুলিকে হিমঘরে রাখতে হয়।

ভারতে সব ধরনের ফলের পরিমাণের বিচারে আম ও কলার পরেই লেবুর স্থান। এখানে সব রকমের (কমলা লেবু, মুসাম্বি লেবু ও টক লেবু বা Lime) লেবুকে বোঝানো হয়েছে। National Horticulture Board-এর তথ্য অনুযায়ী, ভারতে প্রায় ০.৬২ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে লেবুর চাষ হয় এবং সমস্ত ধরনের লেবুর মোট উৎপাদন ৪.৭৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন। এরমধ্যে কমলা লেবু ৪১% এবং মুসাম্বি লেবু ২৩% এবং বাকিটা অন্য ধরনের লেবু। এই হিসাব থেকে অঙ্ক কষে জানা যায় যে, ভারতে কম-বেশি ১.৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে মুসাম্বির চাষ হয় এবং ১৩ লক্ষ ৫ হাজার টন মুসাম্বি লেবু উৎপন্ন হয়।



ভারতে মুসাম্বি লেবু চাষে যে রাজ্যগুলি এগিয়ে (২০১৪-১৫ সালে National Horticulture Board-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী) সেগুলি হল, তেলেঙ্গনায় ২২৭৮.৭০ হাজার টন (৫৩.৮৮%), অন্ধ্রপ্রদেশে ১২১৭.৪৫ হাজার টন (২৮.৭৯%), মহারাষ্ট্রে ৫৪৩ হাজার টন (১২.৮৪%), মধ্যপ্রদেশে ১১১ হাজার টন (২.৬২%), কর্ণাটকে ৩২.১৬ হাজার টন (০.৭৬%), পাঞ্জাবে ২১.৯১ হাজার টন (০.৫২%), মিজোরামে ৪.৯৪ হাজার টন (০.১২%), রাজস্থানে ৩.৮৪ হাজার টন (০.০৯%), জম্মু ও কাশ্মীর ২.৪৮ হাজার টন (০.০৬%) এবং হিমাচলপ্রদেশে ২.১০ হাজার টন (০.০৫%)।

এই ফলের রস সুস্বাদু, সুগন্ধযুক্ত এবং অন্যান্য টক জাতের Lime-এর অপেক্ষা স্বাদে কম টক। চাট মশলা ও বীট লবণ সহযোগে গ্রীষ্মকালে এই ফলের রস খুবই উপাদেয় এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী ভিটামিন - C সমৃদ্ধ মুসাম্বি ফলের রস সর্দিকাশি প্রতিরোধ করতে, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে, রক্ত পরিষ্কার করতে, পেটের নানা অসুখ সারায়, খাদ্যনালীর ঘা সারায়, কিডনি ও মূত্রনালী ভাল রাখে, মুখের দুর্গন্ধ ও ক্ষত সারায়, হজমশক্তি বাড়াতে, কোষ্টকাঠিন্য দূর করতে, চুলের স্বাস্থ্যরক্ষা করতে, ব্রণ কমাতে, রক্ত চলাচলে উন্নতি ঘটিয়ে হৃদযন্ত্রকে ভাল রাখে, চোখের পক্ষেও খুব উপকারী। স্কার্ভি রোগের হাত থেকে বাঁচতে ভিটামিন-C সমৃদ্ধ ফলটি ভীষণ উপকারী। এছাড়া শরীরের শক্তিবৃদ্ধিকারক, ত্বক ফাটা রোধ করে ও ত্বক উজ্জ্বল রাখে এবং বয়সের ছাপ পড়তে দেয় না। হাড়ের পক্ষে ও মাংস পেশীর স্বাস্থ্যরক্ষায় মুসাম্বি উপকারী।

১০০ গ্রাম মুসাম্বিতে ৪৩ ক্যালরি শক্তি, ৪৯০ মিলিগ্রাম পটাসিয়াম, ১১.৭৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ২.৪ গ্রাম খাদ্যতন্তু, ৯.৩৫ গ্রাম সুগার, ০.৯৪ গ্রাম প্রোটিন ও ০.১২ গ্রাম ফ্যাট থাকে। ৬৪% ভিটামিন – C, ১% ভিটামিন A, ৪% ক্যালসিয়াম, ১% আয়রন, ৮% ভিটামিন B1, ৩% ভিটামিন B2, ২% ভিটামিন B3, ৫% ভিটামিন B5, ৫% ভিটামিন B6, ৮% ভিটামিন B9, ১% ভিটামিন E, ২% ক্লোরাইড, ৩% ম্যাগনেসিয়াম, ১% ম্যাঙ্গানিজ, ২% ফসফরাস, ৪% পটাসিয়াম এবং ৮৬.৭৫ গ্রাম জল থাকে।

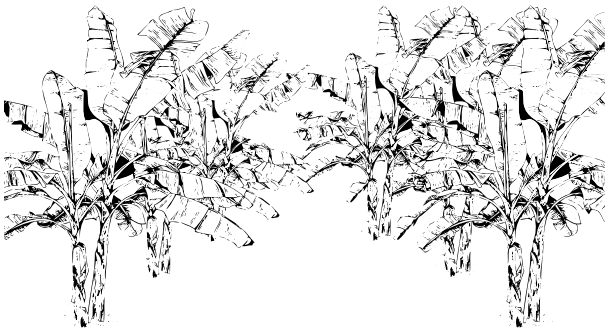
জাত পরিচিতি –

ভারতে বিভিন্ন প্রকার জাতের মুসাম্বি লেবু পাওয়া যায়। কিছু বিদেশি জাতের মুসাম্বি লেবু যেমন Jaffa, Hamlin, Pineapple ইত্যাদি পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থানে চাষ করা হচ্ছে। এগুলির মধ্যে Hamlin জলদি জাতের। তাই প্রথমেই বাজারে আসে। মাঝামাঝি সময়ে Jaffa জাতের মুসাম্বি।

এছাড়া Valeccia, Washington Navel জাতের Sweet Orange বা মুসাম্বি লেবুর চাষও ভারতে হয়ে থাকে।

মুসাম্বি লেবুর জাত, যা ভারতের মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশে প্রচুর পরিমাণে চাষ হয়ে থাকে সেগুলি হল মোসাম্বি, সাতগুড়ি এবং Blood red ও Sweet Orange

তথ্যসূত্র- Shodhganga.inflibent.ac.in/bitstream/10603/99536/6/06



কলা

পরিচয় –

কলা গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Musa Paradisiaca, এটি Musaceae গোত্রের উদ্ভিদ। Musa acuminate এবং Musa Balsamina কলার এই দুই প্রকার প্রজাতির প্রাকৃতিক সংরায়নের ফলে এই উৎকৃষ্ট ফলটির সৃষ্টি হয়েছে। কলা একবীজপত্রী বিরুৎ (Herbs) শ্রেণীর উদ্ভিদ। কলাগাছ উচ্চতায় ২ মিটার থেকে ৯ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এর কাণ্ডটি মাটির নিচে থাকে। একে কন্দ বলা হয়। মাটির উপর কাণ্ডের মতো দেখতে Pseudostem টি পত্রাবরণীর দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। কলাগাছের পত্রাবরণীর পরে ৩০-৪০ সেন্টিমিটার বৃন্তর উপরে বিশাল আয়তকার পত্রফলকটি (কলার পাতাটি) থাকে। কলার পাতার পত্রবৃন্তটি বর্ধিত হয়ে পাতার প্রধান শিরাটি (midrib) গঠন করেছে। প্রধান শিরার দুই দিকে সমান্তরাল শিরাবিন্যাস দেখা যায়। কন্দ থেকে পত্রাবরণীর কেন্দ্রস্থলের মধ্য দিয়ে নতুন পাতাগুলি জন্মায়। কলার মোচাটাই হচ্ছে কলার ফুল। পরিণত গাছের পাতা বের হওয়া বন্ধ হলে কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে পত্রবৃন্তের মাঝখান দিয়ে মোচাটি বাইরে বেরিয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে। মোচাটি লালচে ধরনের হয়। মোচা বের হওয়ার ৩-৪ দিন পর থেকে একটি একটি করে মোচার খোল বা পুষ্পপত্র (Flower Bract) খসে যায়, তখন কলার ছড়াগুলি (Hand) দেখা যায়। প্রতিটি ছড়ায় ১২টি থেকে ২২টি পর্যন্ত কলা (Finger) থাকে। কলাগুলি দুটি সারিতে ছড়ার উপর সজ্জিত থাকে। ৫-১৫ টি ছড়া বের হওয়ার পর মোচা কেটে ফেলতে হয়, কারণ নিচের দিকের মোচার মধ্যে কেবল পুং ফুলগুলিই থাকে। তার থেকে কলা জন্মায় না। মোচা প্রচুর পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ সবজি, যা রান্না করে খাওয়া হয়।

কলা সাধারণত উষ্ণপ্রধান অঞ্চলের উদ্ভিদ। সমুদ্রতল থেকে ২০০০ মিটার উচ্চভূমিতে কলাগাছ জন্মায়। ১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস থেকে ৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা, বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭৫%-৮৫% বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৮০ কিমি-এর নিচে থাকলে এবং বর্ষায় বৃষ্টিপাত ৬৫০ থেকে ৭৫০ সেন্টিমিটার হলে তা কলা চাষের জন্য উপযুক্ত।

জৈব পদার্থ মিশ্রিত পলিমাটি বা কালি মিশ্রিত দোঁয়াশ মাটি, যার অম্লতা ও ক্ষারীয় মাত্রা ৪.৫$_{PH}$ থেকে ৭.৫$_{PH}$ এবং গভীরতা ১ মিটার থেকে ১.২ মিটার, সেই মাটিতে কলার চাষ ভাল হয়। কলা গাছের গোড়ায় জল জমে থাকলে কলা গাছে মড়ক লাগে।

কলা একটি অন্যতম কৃষিজ ফসল। কলা চাষের ইতিহাস বহু প্রাচীন। পৌরাণিক সাহিত্যেও কলার উল্লেখ রয়েছে। সম্রাট আলেকজাণ্ডার ও চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণে কলার উল্লেখ আছে। যদিও কবে কোথায় কলার চাষ শুরু হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্ক আছে। মনে করা হয়, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনস্, বোরনিও এবং পাপুয়া নিউগিনিয়া ছিল কলার আদি জন্মস্থান। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের প্রায় ১২০ টি দেশে কলার চাষ হয়। কলা চাষে ভারত পৃথিবীতে প্রথম। কলা চাষের অগ্রণী অন্যান্য দেশগুলি হল, ইকুয়েডর, ব্রাজিল, চীন, ফিলিপাইনস্, কলম্বিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কোস্টারিকা, ক্যামেরুন ও মেক্সিকো। সারা পৃথিবীতে প্রায় ৮৬ মিলিয়ন টন কলা উৎপন্ন হয়। ভারতে প্রায় ১৪.২ মিলিয়ন টন কলা উৎপন্ন হয়। ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, আসাম, কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে কলার চাষ হয়। বাংলা ভাষায় এর নাম কলা, কদলী, রম্ভা ইত্যাদি, হিন্দিতে কেলা, দক্ষিণ ভারতে ভাঝঝা বা ভাজ্ঝা, মণিপুরীতে লফফোথারো, নেপালি ভাষায় কেরা এবং ইংরেজি 'Banana', যা পশ্চিম-আফ্রিকার সেনেগাল থেকে উৎপত্তি হয়েছে।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

যেহেতু কলাগাছের বিস্তার বীজের দ্বারা হয় না, তাই মানুষের দ্বারাই এই গাছের বিস্তার সম্ভব। কলাগাছের পরাগসংযোগ হলেও ডিম্বাণুর সঙ্গে নিষিক্ত হয়ে কলার জন্ম হয় না। কলা একটি প্রাকৃতিক Parthenocarpic ফল। যদিও কিছু কিছু কলার বীজ উৎপন্ন হয়, তবে তা Sterile seed, অংকুরোদ্গমে সক্ষম নয়।

কলা ফলটি একপ্রকার বেরী জাতীয় ফল। কলার বাইরের খোসাটি Exocarp, শাঁস অর্থাৎ যেটা খাওয়া হয় সেটা Mesocarp এবং ফলের মাঝখানে কালচে রঙের পাতলা আস্তরণের মতো অংশটি Endocarp, মঞ্জরীদণ্ডের প্রতিপর্বে ছড়ার উপর দুটি সারিতে কলাগুলি সজ্জিত থাকে। ছড়াগুলি সমেত সমগ্র মঞ্জরীদন্ডটিকে কলার কাঁদি বলা হয়। চারা লাগানোর থেকে ১৩ থেকে ১৫ মাসের মধ্যে কলা গাছ থেকে কলা পাওয়া যায়।

কলাগাছের ঝাড়ে যে চারা জন্মায় তার মধ্যে যে চারাগুলির পাতা সরু ও সোজাভাবে বেড়ে ওঠে সেগুলি 'অসিতেউড়', একে শিকড় সমেত তুলে নির্দিষ্ট জমিতে লাগিয়ে কলার চাষ করা হয়। মাটির নিচের বিশাল কন্দটি মাটি থেকে শিকড় সমেত তুলে নির্দিষ্ট জমিতে বসালে খুব তাড়াতাড়ি নতুন কলার ঝাড় তৈরি করা যায়। এছাড়া কন্দকে টুকরো টুকরো করে কেটে উপযুক্ত জৈবসার যুক্ত



মাটিতে রোপণ করে প্রতিদিন ঝারির দ্বারা জল দিয়ে ওই টুকরো থেকে চারা তৈরি করা যায়। একটু বড় হলে নির্দিষ্ট জমিতে লাগিয়ে কলার চাষ করা হয়। বর্তমানে টিস্যু কালচার দ্বারা আধুনিক প্রযুক্তি যুক্ত নার্সারীতে বা সরকারি কৃষি খামারে কলা গাছের কোষ থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বৃদ্ধি ঘটিয়ে রোগ-জীবাণু মুক্ত বহু চারা তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। এই প্রকার উন্নতমানের চারা লাগিয়ে প্রচুর পরিমাণে কলার চাষ শুরু করা হয়েছে।

পরিচর্যা –

জমিতে লাঙল বা ট্রাকটর দিয়ে উল্টেপাল্টে ৪-৫ বার চাষ দিয়ে ও মই দিয়ে মাটি গুঁড়িয়ে চাষের আগে জমিতে দেওয়া গোবর সার বা জৈবসার মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে জমির ঢাল বজায় রেখে জমি সমান করা হয়। সাধারণত ২.১ মিটার X ১.৫ মিটার দূরত্বে, ১.৮ মিটার X ১.৮ মিটার দূরত্বে ও ১.৮ মিটার X ৩.৬ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে চারা রোপণের পদ্ধতি দেখা যায়। অতি ঘনত্বে চারা রোপণ করে ৫৫ থেকে ৬০ টন কলা এক একর জমিতে ফলানো যেতে পারে। নির্দিষ্ট জমিতে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে ০.৫ মিটার X ০.৫ মিটার X ০.৫ মিটার গর্ত খুড়ে মাটির সঙ্গে জৈবসার, সুপার ফসফেট ও পটাশ মিশ্রিত করে ঢেকে রাখতে হবে। ১০-১৫ দিন পরে নির্দিষ্ট গর্তে একটি করে চারা গাছ রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের পর মাটিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে সেচ দিতে হবে।

গাছ লাগানোর সময় প্রতিটি গাছে ১০০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ১০০ গ্রাম পটাশ ও ৪০ গ্রাম ফসফেট দিতে হয়। এরপর ৬০ দিনের মাথায়, ৯০ দিনের মাথায় এবং ১২০ দিনের মাথায় তিন দফায় সার প্রয়োগ করতে হয়। প্রতি বিঘা জমিতে কলা চাষের জন্য ১২ কেজি ইউরিয়া, ১৮ কেজি ফসফেট ও ২০ কেজি পটাশ প্রয়োজন হয়। এছাড়া অণুখাদ্য, ধাতব লবণ, খনিজ পদার্থ প্রয়োজন অনুসারে জিঙ্ক সালফেট ০.৫%, ফেরাস সালফেট ০.২%, কপার সালফেট ০.২% জলে গুলে গাছে তিন দফায় উক্ত ব্যবধানে স্প্রে করতে হবে।

কলাগাছের শিকড় মাটির বেশি গভীরে প্রবেশ করে না, তাই প্রচুর পরিমাণে সেচের প্রয়োজন হয়। শীতকালে ৭-৮ দিন অন্তর এবং গ্রীষ্মকালে ৪-৫ দিন অন্তর জমিতে সেচ দিতে হয়। আবার বর্ষাকালে যাতে জমিতে জল না জমে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। Drip irrigation system দ্বারা সেচ দিলে ৫৮% জল বাঁচানো যায় এবং ফলের উৎপাদন ২৩%-৩২% বৃদ্ধি করা যায়।

কোদাল দিয়ে কুপিয়ে মালচিং পদ্ধতিতে জমির ফাঁকা জায়গা খড়, পাতা বা প্লাস্টিক শিট দিয়ে ঢেকে বা আগাছানাশক ওষুধ প্রয়োগ করে আগাছা দমন করা হয়। কোদাল দিয়ে কুপিয়ে আগাছা পরিস্কার করলে গাছের গোড়ার মাটি আলগা হবে এবং গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়াও যাবে। মালচিং পদ্ধতিতে জমির আর্দ্রতা সংরক্ষণ ও আগাছা দমন একসঙ্গে করা সম্ভব।

কলাগাছের শুকনো পাতা কেটে পরিষ্কার করা, অতিরিক্ত চারা শিকড় সমেত উপরে ফেলা ও কাঁদি কাটার পর গাছটির কন্দটি বের করে নতুন মাটি দিয়ে ভর্তি করা ইত্যাদির মাধ্যমে কলা গাছের ছাঁটাই পর্ব সম্পূর্ণ করা হয়। কলা গাছের কাণ্ডটি দুর্বল, তাই কাঁদির ভারে ভেঙে অপুষ্ট কলাগুলি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই ১০-১২ ফুট লম্বা দুটি বাঁশ আড়াআড়ি কলার কাঁদির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। এতে ঝড়েও কলা গাছটি ভারে পড়ে যাবে না। কলা চাষে এই পদ্ধতি অবশ্যই দরকার।

কলাগাছের ফাঁকা স্থানগুলিতে প্রথম দিকে কিছু শাক-সবজি, ডাল, শসা, আদা, হলুদ, আনারস ইত্যাদি সাথী ফসল হিসাবে চাষ করা যেতে পারে। এতে অতিরিক্ত কিছু আর্থিক লাভ করা যেতে পারে।

কলা গাছের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক রোগ হল ছত্রাকঘটিত Singatoka disease, পৃথিবীর সর্বত্রই এই রোগের আক্রমণ ঘটে। Singatoka দু'ধরনের Yellow Singatoka (Mycosphaerella Musicola) নামের ছত্রাক দ্বারা এবং Black Singatoka (M. fijiensis) নামের ছত্রাক দ্বারা ঘটে। এই রোগে আক্রান্ত হলে কলা অপরিণত অবস্থায় পেকে নষ্ট হয়ে যায়। এই রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এই রোগের আক্রমণ ঘটে। ছত্রাকনাশক ওষুধের সঙ্গে মিনোরেল ওয়েল মিশিয়ে প্রতি সপ্তাহে স্প্রে করলে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়। কলা গাছের আর একটি ছত্রাকঘটিত রোগ হল পানামা রোগ। রোগগ্রস্ত গাছ কেটে ফেলে দিয়ে ১% Bordeaux, Copper oxychloride ও Carbendazim প্রভৃতি স্প্রে করে রোগ প্রতিরোধ করা যায়। এছাড়া শুয়োপোকা ও পাতা ছিদ্রকারী ও পাতাকাটা পোকার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কীটনাশক ওষুধ প্রয়োজন অনুসারে স্প্রে করতে হয়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

কলা গাছ লাগানোর ১২-১৫ মাসের মধ্যেই কলা গাছের ফল কাটার উপযোগী হয়ে যায়। কলার শিরগুলি পুষ্ট হলে গোলাকার হয়ে যায় এবং পাতাগুলিও হলুদ হয়ে শুকোতে শুরু করে এই সময় কলার কাঁদিটি কাটার উপযুক্ত হয়ে যায়। কলার কাঁদি প্লাস্টিক ব্যাগে ঢেকে রাখলে এবং ০.২% Monocrotophos স্প্রে করলে কলার ত্বক মসৃণ ও সুন্দর হয়।

কলার কাঁদিটি কাটার পর ছড়াগুলি কেটে পরিষ্কার করে বাছাই করে নরম কাগজ বা পাতা বিছিয়ে ঝুড়িতে প্যাকিং করে বা প্যাকিং বাক্সে সাজিয়ে বাজারে পাঠানো হয়। অল্পমাত্রায় এথিলিন স্প্রে করা থাকলে একসঙ্গে সুন্দরভাবে কলাগুলি পেকে যাবে। স্থানীয় বাজারে কলার কাঁদি সমেত বিক্রয় করা হয়। কাঁদিটি কাটার পর ১৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। উন্নত প্রযুক্তিতে চাষ করে একরে ৫৫ থেকে ৬০ টন পর্যন্ত কলা উৎপাদনের নজির রয়েছে।

ফল কাটার পর কাণ্ডটি কেটে মাঝখান থেকে থোড়টি বের করে নিতে হবে। থোড় তরকারি হিসাবে রান্না করে খাওয়া হয়। অবশিষ্ট পাতা ও খোলগুলি গরু ও মহিষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গাছের গোড়াটিও কন্দ সমেত তুলে ফেলে সার মাটি দিয়ে ভরাট করে দিতে হয়।

কলা অত্যন্ত জনপ্রিয় ও উপকারী ফল। কলার পুষ্টিগুণের হিসাব নিচে দেওয়া হল-

- ১০০ গ্রাম কলায়
- ক্যালরি – ৮৯ গ্রাম
- জল – ৭৫%
- প্রোটিন – ১.১ গ্রাম
- কার্বোহাইড্রেট – ২২.৮ গ্রাম
- সুগার – ১২.২ গ্রাম
- ফাইবার – ২.৬ গ্রাম
- ফ্যাট – ০.৩ গ্রাম

এছাড়া পটাসিয়াম, ভিটামিন B6, ভিটামিন C ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ কলাতে বর্তমান। প্রচুর পুষ্টিসমৃদ্ধ এই ফলটি হার্ট, কিডনি, চোখ ও পেটের পক্ষে ভাল। কলা ক্যানসার ও অ্যাজমা প্রতিরোধে সহায়ক, হতাশা কাটাতেও সাহায্য করে এই ফল। শিশুদের পক্ষে ফলটি খুবই উপকারী।

কলা অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং পবিত্র ফল। হিন্দুদের প্রতিটি অনুষ্ঠানে কলাগাছ, কলাপাতা, কলা ফল হিসাবে বা সিন্নীতে, নৈবেদ্যে, বরণডালা ও শ্রাদ্ধে অতি নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। শ্রাদ্ধের কাজে কলার পাতা ও কলার খোল (Leaf Sheath) ব্যবহৃত হয়। কাঁচাকলা বা কাঁচকলা সবজি হিসাবে, ভাজা, ঝোলে, শুক্তোয় ও চিপস্ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। থোড় সবজি হিসাবে খুব সস্তা হলেও প্রচুর আয়রন সমৃদ্ধ। কলাগাছের এই অংশটিও প্রচুর উপকারী। মোচাও আয়রন সমৃদ্ধ সবজি, বিভিন্নভাবে রান্না করে খাওয়া হয়। পাকা কলা সকালের প্রাতঃরাশে, টিফিনে, দই চিঁড়ের সঙ্গে কলা খাওয়ার প্রচলন আছে। রুটি দিয়েও খাওয়া হয়। এছাড়া খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে জ্যাম, জেলি, মদ তৈরি করার কাজেও কলা ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কলার পাতা খাবার থালা হিসাবে ব্যবহার হয়।

ভারতের সর্বত্রই কলা অত্যন্ত প্রিয় পুষ্টিকর ফল। সরকারি গবেষণাগারে কলা নিয়ে নিয়ত গবেষণা চলছে, নিত্যনতুন পদ্ধতিতে উন্নতমানের কলা উৎপাদনের পন্থা আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং তার ফলে উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বাড়ছে। তবুও চাহিদা অনুযায়ী সকলের কাছে এই পুষ্টিকর ফলটি পৌঁছতে পারছে না। তাই আরও উৎপাদন প্রয়োজন। সরকারি Agri – Horticulture দফতরের হিসাব অনুসারে, উন্নত পদ্ধতিতে কলা চাষ করে এক হেক্টর জমি থেকে বছরে ১ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা উপার্জন করা সম্ভব।

জাত পরিচিত –

সারা পৃথিবীতে প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ জাতের কলা পাওয়া যায়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন প্রকার কলার চাষ হয়। বাংলা, বিহার, ঝাড়খন্ডে কাঁঠালি, বাশরী, মর্তমান, চাঁপা, সিঙ্গাপুরী কলার চাষ হয়, কর্ণাটকে ডোয়ার্ফ ক্যান্ডিভাস, রোবাষ্ট, রসথালী, পুভন, মন্থন, এলাকীবালী, কেরালায় পেন্দ্রান পালায়ন কোডান, লালকলা ইত্যাদি। এছাড়া হোল্ডারওয়াল নেন্দ্রান, নালাবোন্থা, কানপুরীবালী প্রভৃতি জাতের কলার চাষ হয়। বর্তমানে Tissue Culture-এর মাধ্যমে আরও উন্নত জাতের কলার চাষ শুরু হয়েছে।

তথ্যসূত্র – Wikipedia,http://www.agrifarming.in/ banana-farming, banana cultivation in national horticulture board



জাম

পরিচয় -

জাম গাছের বিজ্ঞানসম্মত Syzygium cumine, এর আরও দুটি বিজ্ঞানসম্মত নাম হল, Eugenia jambolane ও Eugenia cumini, এটি Myrtaceae গোত্রের দ্বিবীজপত্রী বহুবর্ষজীবী চিরহরিৎ শ্রেণীর বৃক্ষ।

জাম গাছের আদি জন্মস্থান সম্ভবত ভারত, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে হতে পারে বলে মনে করা হয়। আমেরিকার ফ্লোরিডা, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশে ১৯১১ সালের পর থেকে এই গাছের রোপণ শুরু হয়। এইভাবে রোপণের মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যান উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে জামের বিস্তার ঘটেছে।

ভারতের বেশিরভাগ রাজ্যেই জাম গাছ দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের চিরহরিৎ অরণ্যে এবং উষ্ণ পর্ণমোচী শুষ্ক অরণ্যে অনেক জাম গাছ দেখা যায়। অধিক আর্দ্রতার ঘন অরণ্যে জাম গাছ ভাল জন্মায়। তবে মরু জলবায়ু অঞ্চলের অরণ্যে এই গাছ জন্মায় না।

জাম্বুল দ্বীপে এই ফলটি উৎপন্ন হত বলে একে জাম্বুল (Jambul) বলা হয়। ইংরেজিতে এর নাম ব্ল্যাক বেরী (Black Berry)। সংস্কৃতে জাম্বু, হিন্দিতে জামুন, তামিল ভাষায় নেরিদম, তেলেগুতে জাম্বুভু, মালায়লমে নাভাল এবং বাংলায় একে জাম বলা হয়।

জাম গাছ একটি মাঝারি থেকে বড় আকারের উদ্ভিদ। উচ্চতায় ১০-৩০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। কাণ্ডের বেড় ৪০-১০০ সেমি পর্যন্ত হতে পারে। গাছের ছাল বেশ পুরু হয়। ছাল ২.৫ সেমি পর্যন্ত পুরু হতে পারে। কাণ্ডটি ধূসর বা সাদাটে বাদামী বর্ণের মসৃণ হয়ে থাকে। পাতাগুলি বিপরীতমুখী হয়ে শাখাপ্রশাখায় সজ্জিত থাকে। পাতাগুলি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ৭-৮ X ৩-৯ সেমি হয়ে থাকে। পাতাগুলি সরল প্রকৃতির। পত্রফলক পুরু, মসৃণ, চকচকে। কচিপাতা লালচে বাদামি বর্ণের হয়ে থাকে। পাতার প্রধান শিরা দু'দিকে এবং উপশিরাগুলি সমান্তরালভাবে সজ্জিত থাকে। পাতার কিনারা মসৃণ। পাতাগুলি ১.৫-২ সেমি লম্বা বৃন্তযুক্ত হয়। পাতাগুলি ডিম্বাকার, আয়তকার বা উপবৃত্তাকার আকৃতির হয়ে থাকে। ফুল ও ফলগুলি পাতার কক্ষ থেকে বা ছোট শাখাযুক্ত মঞ্জরীদণ্ডের উপর জন্মায়। ফুলগুলি ছোট, কমবেশি ৭ মিলি মিটার লম্বা, সুগন্ধযুক্ত এবং সাদাটে বা ঘিয়ে রঙের হয়। পুষ্প অক্ষটি কাপের আকারে বা চুড়ির মতো, সবুজ রঙের হয়। পুষ্প অক্ষটির উপর সূতোর মতো অসংখ্য পুংকেশর থাকে। পুংকেশরগুলি সাদা বা গোলাপী রঙের হয়। গর্ভদণ্ডটি লম্বায় ৬-৭ মিলিমিটার হয়ে থাকে। গর্ভাশয়ে অসংখ্য ডিম্বাণু থাকে। ফলগুলি গোলাকার, ডিম্বাকার, আয়তকার ড্রুপ প্রকৃতির হয়ে থাকে। ফলগুলি প্রায় বৃন্তহীন হয়। ফলটি প্রথমে সবুজ রঙের হয়। পরে পরিণত হলে লালচে বেগুনী রঙের এবং পেকে গেলে হালকা বেগুনী-কালো রঙের হয়। ফলগুলি ১-২.৫ সেমি লম্বা, বেলনাকার বা গোলাকার হয়ে থাকে।

জামগাছ উষ্ণ জলবায়ু ও উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে জন্মাতে দেখা যায়। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২০০ মিটার উচ্চভূমিতে এবং নীলগিরি পর্বতের ১৮০০ মিটার উচ্চতায় জাম গাছ জন্মাতে দেখা যায়। অর্থাৎ -২ ডিগ্রী সেলসিয়াস থেকে ৪৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রাযুক্ত আবহাওয়ায় জন্মাতে পারে। তুষারপাতে ছোট গাছের প্রচুর ক্ষতি হয়। ১৭-৩৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস জাম গাছে ফুল ধরা ও ফল উৎপাদনের জন্য সহায়ক। ৬০০-৫০০০ মিলিমিটার বার্ষিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে জাম গাছ জন্মায়। তবে ৯০০-১২০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত এই গাছের পক্ষে উপযুক্ত। ফল পাকার আগে বৃষ্টিপাত ফলের পক্ষে উপকারী।

যে কোনও প্রকার মাটিতেই জাম গাছ জন্মাতে পারে। কিন্তু ভাল ফল উৎপাদনের জন্য গভীর দোঁয়াশ মাটি এবং উপযুক্ত নিকাশীযুক্ত জমির প্রয়োজন হয়। বন্যা কবলিত অঞ্চলে দীর্ঘদিন জল জমে থাকলে তাও সহ্য করে এই গাছ বেঁচে থাকতে পারে। অল্প লবণাক্ত জমিতে ও ল্যাটেরাইট মাটিতেও জাম গাছ মোটামুটি ফল উৎপাদনে সক্ষম। তবে গভীর দোঁয়াশ মাটি, পলিমাটি ও বালিযুক্ত পলিমাটিতে জামগাছের বৃদ্ধি ও ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযোগী।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ -

বিভিন্নভাবে জাম গাছের বীজের বিস্তার ঘটে থাকে এবং তার থেকেই স্বাভাবিকভাবে জাম গাছের প্রসারণ ঘটে নতুন গাছ জন্মায়। যেমন মানুষ এবং পশুপক্ষীর দ্বারা এই গাছের স্বাভাবিক বিস্তার হয়। এছাড়া মৌমাছি বা বাতাসের সাহায্যে ফুলের পরাগমিলন হয়ে থাকে। বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঘটিয়ে ও অঙ্গজ জনন পদ্ধতিতে জাম গাছের কৃত্রিম প্রসারণ করা হয়ে থাকে। জাম গাছের কৃত্রিম প্রসারণে এখনও বীজের তৈরি গাছের ব্যবহারই বেশি হয়। তবে এই পদ্ধতিতে গাছের উৎপাদন শুরু হতে অনেক সময় লেগে



যায়। নার্সারীতে পরিণত ও পুষ্ট বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঘটাতে ১০-১৫ দিন সময় লাগে। এরপর চারাগুলিকে Root stock তৈরি করার জন্য ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে বা অগাস্ট মাসে পলিব্যাগে বা পাত্রে রোপণ করা হয়।

এক বছর বয়সের চারাগাছগুলি ১০-১৪ মিলিমিটার মোটা হলে তা বার্ডিং-এর উপযুক্ত হয়। বাডিং শুরু করার আদর্শ সময় জুলাই-অগাস্ট মাস। তবে বৃষ্টি শুরু হওয়ার সময়ের পার্থক্যের উপর নির্ভর করে মে-জুন মাসে বাডিং করা হয়ে থাকে। Shiled, Patch ও Forkert পদ্ধতিতে বাডিং করে অঙ্গজ জনন প্রক্রিয়ায় চারা গাছ তৈরি করে নার্সারীতে বড় করে তা অন্যত্র রোপণের মাধ্যমে জাম গাছের কৃত্রিম প্রসারণ ঘটানো হয়ে থাকে।

উপযুক্ত জমি নির্বাচন করে জমির মধ্যে থেকে ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করে লাঙল বা ট্র্যাক্টর দিয়ে আড়ে-লম্বায় চাষ দিয়ে জমির মাটি প্রস্তুত করে মই দিয়ে জমির ঢাল বজায় রেখে জমি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। সাধারণত চারা রোপণের এক-দেড় মাস আগে জমি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

৭০ মিটার দূরত্বের সারি তৈরি করে ১০ মিটার দূরত্বে ১ মিটার X ১ মিটার X ১ মিটার আয়তনের গর্ত করে তার মধ্যে জমির ৭৫% উপরের মাটির সঙ্গে ২৫% জৈবসার (FYM) মিশ্রিত করে ফেলে রাখা হয়। গর্তের মধ্যে জল ঢেলে বা একটা বৃষ্টি খাইয়ে মাটিকে চারা রোপণের উপযুক্তভাবে তৈরি করে গর্তের মাঝখানে চারাগাছগুলি রোপণ করে একটু ছায়ার ব্যবস্থার করে প্রতিদিন জল দিয়ে চারাগাছগুলিকে পরিচর্যার মাধ্যমে বাঁচিয়ে তোলা হয়।

পরিচর্যা -

জাম গাছের মূল বা শিকড় মাটির অনেক গভীর পর্যন্ত প্রসারিত থাকে, তাই পরিণত গাছে সেচের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাণিজ্যিকভিত্তিতে চাষের জন্য শীতকালে, গ্রীষ্মকালে, ফুল ফল ধরার আগে এবং পরের বছরে ৮-১০বার সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

জাম গাছের দ্রুত বৃদ্ধি ও সুস্থ সবলভাবে গাছগুলিকে বড় করে তোলার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি গাছে ২০-২৫ কেজি করে এবং ফল দেওয়া শুরু করলে গাছ প্রতি ৫০-৬০ কেজি জৈবসার (FYM) প্রয়োগ করতে হয়। মাটির উর্বরতা অনুযায়ী রাসায়নিক সার হিসাবে ৫০০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ৬০০ গ্রাম ফসফেট, এবং ৩০০ গ্রাম পটাশ সার দেওয়া যেতে পারে। তবে অতিরিক্ত অঙ্গজ বৃদ্ধি ঘটলে ফুল ও ফল ধরার পরিমাণ কমে যায়। তাই এব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

জমিতে জাম গাছ চাষ করার সময় রোপণের পর ৩-৪ বছর পর্যন্ত জাম গাছের সারির ফাঁকে শাক-সবজি, ডালজাতীয় শস্য, পেঁপে, কলা প্রভৃতি স্বল্প আয়ুর গাছ লাগানো যেতে পারে। এরফলে আগাছা দমনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু সাথী ফসল উৎপাদন করে অতিরিক্ত লাভ করা সম্ভব। জাম গাছের জন্য বিশেষভাবে ডাল ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন হয় না। তবুও রোগগ্রস্ত ও এলোমেলোভাবে জন্মানো ডাল এবং দুর্বল ডালপালাগুলি কেটে দিলে গাছটিকে সঠিক আকারে বড় করে তোলা যায়।

সাধারণত পাতা খাওয়া পোকা, কাণ্ডছিদ্রকারী পোকা জাম গাছের প্রচুর ক্ষতি করে। ০.০৫% Dimethoate, ০.১% Malathion স্প্রে করে এইসব রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে। এছাড়া কাণ্ডের গর্তে পেট্রোল ইঞ্জেক্ট করে বা গর্তের মধ্যে মাটির প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দিয়ে এই পোকা দমন করা সম্ভব। এছাড়া পরিবেশবান্ধব জৈব কীটনাশক ব্যবহার করেও পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। কচি জাম গাছে Anthracnose রোগ দেখা যায়। এরফলে পাতায় দাগ দেখা যায় ও পাতা খসে যায়। ০.২% Moncozeb, ১% Bordeaux mixture প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যায়। এই ওষুধ ব্যবহার করলে ফুল, ফল ঝরে পড়াও প্রতিরোধ করা যায়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

বীজের জাম গাছ ৮-১০ বছর বয়স থেকে ফল উৎপাদন শুরু করে এবং কলমের গাছে ফল আসতে ৬-৭ বছর সময় লেগে যায়। ৫০-৬০ বছর পর্যন্ত জাম গাছ ফল উৎপাদন করে থাকে।

সাধারণত জুন-জুলাই মাসে জাম পাকতে শুরু করে। তখন গাছে উঠে আঁকশিযুক্ত ব্যাগে সাবধানে পাকা ফলগুলি সংগ্রহ করতে হয়। বেশি পেকে যাওয়ার আগেই পাকা ফলগুলি সংগ্রহ করে নিতে হয়। কারণ অল্প আঘাতেই ফলগুলি নষ্ট হয়ে যায়, তাই খুব যত্নসহকারে জাম সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

বীজের চারা গাছের উৎপাদন বেশি হয়। কোনও একটি পরিণত বীজের গাছ থেকে ৪০-১০০ কেজি জাম পাওয়া যায়। অন্যদিকে কলমের গাছ থেকে ৬০-৭০ কেজি ফল পাওয়া যায়।

গাছ থেকে পেড়ে ফল হিসাবে জাম খাওয়া যায়। উপকারী ফল হিসাবে জামের চাহিদা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। শহরের বাজারে তাই ১ কেজি জামের দাম ১৫০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে।

১০০ গ্রাম পাকা জামে ৬০ ক্যালরি শক্তি, ১৪ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ০.৬ গ্রাম খাদ্যতন্তু, ০.২৩ গ্রাম ফ্যাট, ০.৯৯৫ গ্রাম প্রোটিন থাকে। এছাড়া থাকে ভিটামিন B1 ০.০১৯ মিলিগ্রাম, ভিটামিন B2 ০.০০৯ মিলিগ্রাম, ভিটামিন B3 ০.২৪৫ মিলিগ্রাম, ভিটামিন B6 ০.০৩৮ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন C ১১.৮৫ মিলিগ্রাম। পাশাপাশি এই পরিমাণ জামে ১১.৬৫ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ১.৪১ মিলিগ্রাম আয়রন, ৩৫ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম, ১৫.৬ মিলিগ্রাম ফসফরাস, ৫৫ মিলিগ্রাম পটাসিয়াম,২৬.২ মিলিগ্রাম সোডিয়াম এবং ৮৪.৭৫ গ্রাম জল থাকে।

রক্তের শর্করার মাত্রা ঠিক রাখতে অর্থাৎ ডায়াবেটিস্ নিয়ন্ত্রণে রাখতে জাম খুবই উপকারী। লখনউ-এর CDRI তাদের গবেষণায় প্রমাণ পেয়েছে যে, জামের বীজ রক্তে শর্করার মাত্রা ঠিক রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া জামের পাতা ও গাছের ছালও একই কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া হার্টের স্বাস্থ্য রক্ষায়, রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে, জণ্ডিস রোগ প্রতিরোধে ও মুখ গহ্বরের স্বাস্থ্য রক্ষায় জাম খুব উপকারী একটি ফল।

জামের রস মূত্রঘটিত রোগ, প্লীহার সমস্যা, বন্ধ্যাত্ব প্রতিরোধে, অ্যাজমা ও সর্দি-কাশি, অর্শ, দাঁতের সমস্যা, পেট অসুখ সারাতে জাম উপকারী একটি ফল। উত্তেজনা বৃদ্ধি করতে জাম কাজ করে এবং এরমধ্যে যে রাসায়নিক উপাদান রয়েছে তা ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়ক।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে জাম জেলি, জ্যাম, আচার ও মদ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

জাম গাছের পাতা তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্য হিসাবে পরিচিত। পাতায় ৯.১% ক্রুড প্রোটিন, Crude Protein, ৪.৩% ফ্যাট, ১৭.০% ক্রুড ফাইবার, ৭% অ্যাশ, ১.৩% ক্যালসিয়াম এবং ০.১৯% ফসফরাস থাকে। এছাড়া জ্বালানী হিসাবে জাম গাছের ডালপালা ব্যবহৃত হয়।

জামের কাঠ কৃষি যন্ত্রপাতি, কম দামী আসবাবপত্র, গরুর গাড়ির কাঠামো, দরজা জানালার ফ্রেম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। কাঠের গুণমান মাঝারি মানের হলেও তা বেশ মজবুত।

খালি পেটে জাম খাওয়া উচিত নয়। বেশি পরিমাণে জাম খাওয়া ক্ষতিকারক। গর্ভবতী মেয়েদের ও স্তন দুগ্ধদাত্রী মায়েদের জাম খাওয়া ক্ষতিকারক। জাম খাওয়ার পর দুধ খাওয়া উপকারী। প্রচুর পরিমাণ জাম খেলে গা-হাতের যন্ত্রণা বেড়ে যায় ও জ্বর পর্যন্ত হতে পারে।

অন্যান উষ্ণবায়ুতে জন্মানো ফলের মতো জাম গাছের রোপণ ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য, বিশেষ করে গ্রামবাংলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলের গাছ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। শক্তকাঠ ও ফলের ঔষধিগুণের জন্য জামের চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। অব্যবহৃত শুকনো জমিতে বা বাগানে জাম গাছ লাগিয়ে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটানোর প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

জাম অত্যন্ত পচনশীল, ফল পাড়ার পর ১-২ দিন সংরক্ষণ করা যায়। ৮-১০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ও ৮৫%-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ছিদ্রযুক্ত পলিথিনের থলিতে ভর্তি করে এক সপ্তাহ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা সম্ভব।

ফলগুলির মধ্য থেকে বাছাই করে বড়-মাঝারি ও ছোট আকারে ফলগুলি আলাদা আলাদা ঝুড়িতে সঠিক Padding কলাপাতার উপর বা কাটুনের মধ্যে, ধানের কুঁড়োর মধ্যে সাজিয়ে বাজারজাত করা হয়ে থাকে বা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ Industry-তে পাঠানো হয়ে থাকে। চাপে যাতে ফলগুলি নষ্ট না হয়ে যায় সেই রকম ব্যবস্থা যুক্ত পরিবহনের মাধ্যমে ফলগুলি পাঠানো হয়।

জাত পরিচিতি -

দেশীয় ফল হিসাবে জাম গাছ রোপণের জন্য কোনও আগ্রহ আগে দেখা যায়নি এবং বাণিজ্যিকভাবে এই ফলের ব্যবহার কম থাকার জন্য উন্নত জাতের জাম গাছও তৈরি করা হয়নি। স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন জলবায়ুতে ও ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্যের কারণে নানা প্রকার স্বাভাবিক জাতের জাম গাছের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই জাতগুলি হল, –

রা জামুন - উত্তর ভাবতে এই জাতটি পাওয়া যায়। ফলগুলি বড় হয়, বেলনাকার, নীলচে কালো রঙের বা গাঢ় বেগুনী রঙের হয়। ফলের শাঁস ও মিষ্টতা অনেক বেশি, বীজও ছোট।

পরশ – এই জামগুলিও বেশ বড় হয়। সাধারণত এটি গুজরাটে পাওয়া যায়। ভারতের বিভিন্ন কৃষি দফতর ও ICAR (Indian Council of Agricultural Research) গবেষণাগারে কিছু বীজহীন উন্নত জাতের জামের উদ্ভাবন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। যেগুলি হল, Narendra Jamun, Rajendra Jamun, Konkan Bahadoli, Goma Priyanka, CISH J-37 ও CISH J-42

তথ্যসূত্র – TNAU Agritech Portal, www.nhb.gov.in, www.icar.org.in



কুল ও আপেল কুল

পরিচয় –

বের বা আপেল কুল গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Ziziphus jujuba, অপর বিজ্ঞানসম্মত নাম (Syn. Name) Ziziphus muratiana। এটি Rhamnaceae গোত্রের বহুবর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী মাঝারি আকৃতির উদ্ভিদ।

বের বা আপেল কুল গাছের আদি জন্মস্থান কোথায় তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য না থাকলেও মনে করা হয় দক্ষিণ এশিয়ার লেবানন ও উত্তর ভারতের মধ্যবর্তী কোনও জায়গায় বা চিন দেশের দক্ষিণ অংশ এর আদি জন্মস্থান ছিল। সেখান থেকে বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে রোপণের ফলে সব দেশেই এর বিস্তার ঘটেছে এবং সেখানকার স্বাভাবিক উদ্ভিদ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

আপেল কুল বা বের Indian jujuba নামে পরিচিত। ভারতের পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খন্ড, মধ্যপ্রদেশ ছাড়াও অন্যান্য রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে কুলগাছের চাষ হয়ে থাকে। ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে হিন্দুদের কাছে আপেল কুল পবিত্র ফল। শিবের পুজোয় এই ফল ব্যবহৃত হয়। বিশ্বাস করা হয়, কুলের গাছ মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্ত করবে। বাঙালিদের মধ্যে কুল বিদ্যার দেবী সরস্বতীকে নিবেদন করার পরই তা খাওয়া শুরু হয়। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীরা সরস্বতী পুজোর আগে কুল খায় না।

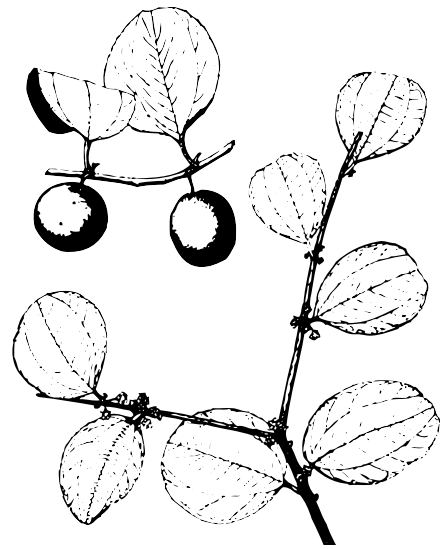
বের শব্দটি উর্দু ভাষা থেকে এসেছে। ইংরেজিতে Jujube berry নামে পরিচিত। হিন্দিতে বের, সংস্কৃতে বদরী, তামিল ভাষায় ইলানতাই, তেলেগু ভাষায় গঙ্গরেণু, মালায়লাম ভাষায় বাদারম, কন্নড়ে বোর এবং বাংলায় এটি কুল বা বোরোই নামে পরিচিত।

কুল গাছ একটি বড় গুল্ম বা ছোট বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। উচ্চতায় ৪-১০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। কাণ্ডটি বাদামী রঙের হয়। শাখাপ্রশাখাগুলি নিচের দিকে ঝুলে থাকে এবং কাঁটাযুক্ত হয়ে থাকে। পাতাগুলি ডিম্বাকৃতির বা আয়তাকার–উপবৃত্তাকার (Oval – oblong – elliptic) হয়ে থাকে। লম্বা ও চওড়ায় পাতাগুলি ২-৭ × ১-৩ সেমি হয়ে থাকে। পাতায় নিচের দিক থেকে তিনটি প্রধান শিরা (Nerve) উপরের দিকে প্রসারিত থাকে। উপশিরাগুলি প্রধান শিরা থেকে বেরিয়ে পাতায় reticulate জালিকাকার শিরাবিন্যাস গঠন করে। পাতাগুলি শাখাপ্রশাখায় একান্তরভাবে সজ্জিত থাকে। এটি চকচকে সবুজ রঙের হয়। পাতার নিচের তল প্রচুর রোমযুক্ত (tomentose) হয়। পাতার কিনারা অল্প খাঁজকাটা হয়। প্রতিটি পত্রবৃন্তের গোড়ায় ২ টি করে কাঁটা থাকে। ফুলগুলি সবুজাভ হলুদ রঙের হয়। পাতার কক্ষ থেকে গুচ্ছাকারে জন্মায়। ফুলগুলি Corymbose (করিম্বোস) পুষ্পবিন্যাসে সজ্জিত থাকে। ফুলগুলি উভলিঙ্গ প্রকৃতির। ফুলে ৫টি করে ক্ষুদ্রাকার বৃতি ও দল বা পাপড়ি (Sepals & Petals) থাকে। একটি পুরু অক্ষের (Fleshy Disk) উপর গর্ভাশয়টি অবস্থিত। পতঙ্গের দ্বারা কুলের পরাগমিলন ঘটে। সাধারণত মৌমাছি, ফড়িং ও অন্যান্য পতঙ্গ কুলের পরাগসংযোগ ঘটায়। ফলটি ড্রুপ প্রকৃতির, পরিণত হলে ফলগুলি হালকা হলুদ ও লাল বা কমলা রঙের হয়ে থাকে। ফলগুলি ২-৩.৫ সেমি লম্বা × ১.৫ – ২ সেমি ব্যাসের (diam) হয়ে থাকে। কুল গাছের অনেক প্রকার variety সৃষ্টি হয়েছে। আপেল কুলও কুলের একপ্রকার উন্নত জাত। সাধারণ কুলের থেকে এর ফলের আকার অনেক বড়। ৩ -৭ সেমি পর্যন্ত লম্বা ও গোলাকার বা ডিম্বাকার হতে পারে। ফলের শাঁসের পরিমাণ অনেক বেশি, স্বাদেও অনেক মিষ্টি। ফলের মাঝখানের শাঁসটি (Mesocarp) রসালো ও পুরু হালকা টক ও মিষ্ট (Sweet & Sour) স্বাদের হয়ে থাকে। ফলে একটিমাত্র বীজ থাকে। বীজটি লম্বা ও পাথরের মতো শক্ত, বীজের উপর চেরা দাগ দেখা যায়। বিভিন্ন জলবায়ুতে কুল গাছের ফুল ও ফল উৎপন্ন হওয়ার সময় আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। আমাদের রাজ্যে অগাস্ট-সেপ্টেম্বর থেকে ফুল জন্মাতে শুরু করে। ফল পাকে জানুয়ারি-মার্চ মাসে।

কুল গাছ বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুতে জন্মাতে পারে। সাধারণত রুক্ষ ও গরম আবহাওয়ায় কুল গাছ ভাল জন্মায়। খুব ঠাণ্ডা বা তুষারপাত কুল গাছের প্রচুর ক্ষতি করে। আবার অধিক আপেক্ষিক আর্দ্রতাও কুল গাছের পক্ষে উপযুক্ত নয়। ২৫-২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা উপযুক্ত এবং বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১২৫-২২২৫ মিলিমিটারে কুল গাছ জন্মাতে পারে। সমুদ্রতল থেকে ১০০০ মিটার উচ্চভূমিতেও কুল গাছ জন্মায়।

যে কোনও প্রকার মাটিতেই কুল গাছ জন্মাতে পারে। অনুর্বর মাটি, লবণাক্ত মাটি এবং অম্লযুক্ত মাটিতেও কুলগাছ জন্মাতে দেখা যায়। তবে বালিযুক্ত দোঁয়াশ বা কাদামাটিতে কুলগাছ ভাল জন্মায়। জল জমে থাকা নিচু জমি বা খরা কবলিত মরু কিংবা প্রায় জলহীন প্রান্তরেও কুল গাছ বেঁচে থাকতে পারে।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –



সাধারণভাবে পাখি, কাঠবিড়ালী, ইঁদুর প্রভৃতি পশুপাখির দ্বারা ও মানুষের খাওয়া ফলের বীজ মাটিতে পড়ে। উপযুক্ত পরিবেশে বীজ থেকে চারা গাছ তৈরি করে এই গাছের স্বাভাবিক (Natural) প্রসারণ ঘটে থাকে।

কুল গাছের বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা দু'বছর পর্যন্ত বজায় থাকে, গাছ থেকে পাকা ফল সংগ্রহ করে পরিষ্কার করে ধুয়ে বীজ থেকে ফলের শাঁস অপসারণ করে শুকনো করে গানী ব্যাগের মধ্যে শুষ্ক গুদাম ঘরে (Store room) সংরক্ষণ করে বীজগুলোকে ৫০০ ppm thiourea -র দ্রবণে ৪ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে তারপর বীজের আবরণটিকে ফাটিয়ে বের করে বপন করলে ৭ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদগম হয়ে যায়। তা না হলে বীজের শক্ত আবরণ ভেদ করে অঙ্কুরোদগম হতে ২১-২৮ দিন সময় লেগে যেতে পারে। নার্সারীতে পরিচর্যায় বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটিয়ে পলিব্যাগে চারাগুলি বড় করে জমিতে রোপণের উপযুক্ত করে তোলা হয়।

৮-১০ মিলিমিটার ব্যাসের উন্নত জাতের গাছের শিকড় সংগ্রহ করে তাকে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নার্সারীর বেডে উপযুক্ত পরিচর্যায় শিকড়ের ওই টুকরো থেকে শাখা মুকুল উৎপন্ন করা যায়। শাখা মুকুলের মধ্যে থেকে একটি স্বাস্থ্যবান শাখা রেখে অন্যগুলি কেটে দেওয়া হয়। উপযুক্ত পরিচর্যায় এগুলি বড় করে রোপণের উপযুক্ত করা হয়ে থাকে।

cutting কুল গাছের গোড়ার আশপাশের বেশ কিছু চারা গাছ দেখা যায়। যেগুলি গাছের মূল বা শিকড় থেকে জন্মায়। একে Root Sucker বলে। এগুলিকে কাটিং করে উপযুক্ত পরিচর্যায় বাঁচিয়ে রেখে নির্দিষ্ট জমিতে রোপণ করা যায়। এছাড়া কুল গাছের Tissue culture, grafting বা budding করে চারা উৎপন্ন করে রোপণের মাধ্যমে প্রসারণ ঘটানো যায়।

আপেল কুল চাষের জন্য নির্দিষ্ট জমিতে চারা রোপণের আগে লাঙল বা ট্রাক্টর দিয়ে আড়ে-লম্বায় (cross ploughing) চাষ দিয়ে ও মই দিয়ে জমির ঢাল বজায় রেখে আগাছা পরিস্কার করে জমি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

এরপর বর্ষার শুরুতেই চারা রোপণ করতে হয়। এর আগে গ্রীষ্মকালে কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে ৬মিটার দূরত্বে এবং সেচযুক্ত বা বেশি বৃষ্টিপাত অঞ্চলে ৮ মিটার দূরত্বে ৬০ X ৬০ X ৬০ সেমি আয়তনের গর্ত করে তাতে দুই ঝুড়ি বা ২০ কেজি করে জৈবসার(FYM), ৫০ গ্রাম heptacholar dust (উইপোকার আক্রমণ রোধ করার জন্য) মাটির সঙ্গে জল দিয়ে ভিজিয়ে জৈবসার ও উপরের মাটি ভালোভাবে মিশ্রিত করে ফেলে রাখা হয়। তারপর বর্ষার শুরুতে গর্তের মাঝখানে চারাগুলি রোপণ করা হয়।

জমিতে সরাসরি বীজ বপন করে পরিচর্যার মাধ্যমে চারা তৈরি করে in- situ বাডিং (budding) করে পরে নির্দিষ্ট জমিতে রোপণ করেও আপেল কুলের চাষ করা যায়।

পরিচর্যা –

গ্রীষ্মকালে ৩-৪ সপ্তাহ অন্তর একবার সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। গরম আবহাওয়ায় এবং ফলের বৃদ্ধির সময়, বিশেষ করে শীতকালে প্রয়োজন মতো ঘনঘন সেচ প্রয়োগে ফলের গুণগত মান ও ফলের আকার বৃদ্ধি পায়।

এক বছর থেকে ৫ বছর বয়সের প্রতি গাছে ১০ কেজি জৈবসার (FYM), ৫০০ গ্রাম অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রতি বছর একবার করে অথবা N.P.K. Compound বছরে দু'বার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। প্রথম কিস্তিতে হেক্টরে ১১০ কেজি এবং দ্বিতীয় কিস্তিতে প্রতি হেক্টরে ১৭২ কেজি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়া হরমোন স্প্রে করলে ফলের আকার বড় হয়, ফলন বেশি হয় ও ফল খসে পড়া রোধ করা হয়। আবার ফলগুলি একসঙ্গে পাকতেও সাহায্য করে। অনেক সময় ফলের গায়ে খসখসে বাদামি দাগ দেখা যায়। জিংক এবং বোরন স্প্রে করলে ফলের ত্বক চকচকে থাকবে।

গাছটিকে শক্তপোক্ত করে সুস্থ সবলভাবে বড় করে তোলার জন্য রোপণের পর থেকে ৩-৪ বছর পর্যন্ত গাছের গোড়ার দিকের ডালপালা কেটে কাণ্ডটিকে লম্বায় বাড়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়। এছাড়া এলোমেলোভাবে জন্মানো ডালগুলি কেটে দেওয়া হয়। পরিণত গাছের ফল সংগ্রহের পর ডাল ছেঁটে ৩% thiourea বা পটাসিয়াম নাইট্রেট দিনে একবার করে দু'দিন স্প্রে করলে প্রচুর পরিমাণে নতুন ডালপালা জন্মায় এবং তাতে উন্নতমানের ফল উৎপন্ন হয়। পুরনো ডালপালায় ফলের আকার ছোট হয়ে থাকে।

গাছের গোড়ার মাটি কুপিয়ে আগাছা দমন করে এবং মাটি আলগা করে দিলে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন দুই-ই ভাল হয়।

কালো পলিথিন শীট্ (Black Polythin Sheet) দিয়ে গাছের গোড়ার চারিদিকে ঢেকে দিয়ে আর্দ্রতা সংরক্ষণ করলেও গাছের বৃদ্ধির সহায়ক হয়ে থাকে।



ভাল বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে কুল গাছের সারির ফাঁকা জায়গায় শিম্ব জাতীয় ডাল শস্য যেমন, খেসারি, ছোলা, মুগ, বিনস্ ও অন্যান্য শাক- সবজির চাষ করা যেতে পারে। এভাবে ৩-৪ বছর পর্যন্ত সাথী ফসলের চাষ করা যেতে পারে।

মাছি জাতীয় পোকা, ফলছিদ্রকারী পোকা, শুয়োপোকা, মিলিবাগ, ফড়িং প্রভৃতি কুল গাছের প্রধান ক্ষতিকারক পোকামাকড়। সঠিক পরিচর্যা বা ডাল ছাঁটাই ইত্যাদির মাধ্যমে পোকার আক্রমণ কমানো যায়। এছাড়া বিভিন্ন জৈব অথবা রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করে পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

কুল গাছের প্রধান ছত্রাকঘটিত রোগ powdery mildew, পাতার দাগ, রাস্ট এবং কালো দাগ। এই সমস্ত ছত্রাকঘটিত রোগের জন্য প্রতি লিটার জলে গুলে ২ গ্রাম Karach Rovral বা Mancozole বা Wettable Sulpher প্রভৃতি ওষুধ প্রয়োগ করে রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

আপেল কুল গাছে ফুল আসার পর ১৫০–১৭৫ দিন সময় লাগে ফল পরিণত হতে। ফল তোলার আগে তা দ্রুত পাকানোর জন্য ৭৫০ PPM bi-chloro–ethyl phosphoric acid (ethephon) ব্যবহার করা হয়। সম্পূর্ণ পাকা ফল সকাল সকাল তুলে নিতে হয়। ভারতের বিভিন্ন জলবায়ুর পার্থক্য অনুসারে দক্ষিণ ভারতে অক্টোবর-নভেম্বরে, রাজস্থানে জানুয়ারি-মার্চ মাসে, গুজরাটে ডিসেম্বর-মার্চ মাসে এবং অন্যান্য রাজ্যে ফেব্রুয়ারি – এপ্রিল মাসে ফল তোলার মরসুম।

বাডিং-এর গাছে সাধারণত ৩-৪ বছর পর থেকে ফল উৎপন্ন হতে শুরু করে। পরিণত গাছে অর্থাৎ ১০ বছর বয়সের গাছ থেকে ৮০-২০০ কেজি পর্যন্ত ফল উৎপন্ন হতে পারে। কেবলমাত্র বৃষ্টির জলে চাষের ক্ষেত্রে প্রতি গাছ থেকে ৫০-৮০ কেজি ফল উৎপন্ন হয়। আপেল কুল গাছ ২৫-৩০ বছর পর্যন্ত ফল দিতে পারে।

পাকা বা পরিণত আপেল কুল এমনিই খাওয়া হয়। রসালো তাজা ফলগুলি দেখে সকলেই পছন্দ করে। কাঁচা ও পাকা অবস্থায় চাটনী তৈরি করতে বা আচার তৈরিতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। পাকা কুল রোদে শুকনো করে ভবিষ্যতে খাওয়ার জন্য সংরক্ষণ করে রাখা হয়। কুলের জ্যাম, জেলি ইত্যাদি খাবার তৈরি করা হয়ে থাকে। যদিও আপেল কুল মিষ্টি স্বাদের এবং Ziziphus jujuba syn. Z. meuritiana. Horticultural Plants। এটি আপেল কুল নামে পরিচিত। এই ফল কেবল তাজা অবস্থায় কাঁচা ফলের মতো খাওয়া হয়ে থাকে । বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ ফলটি স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী।

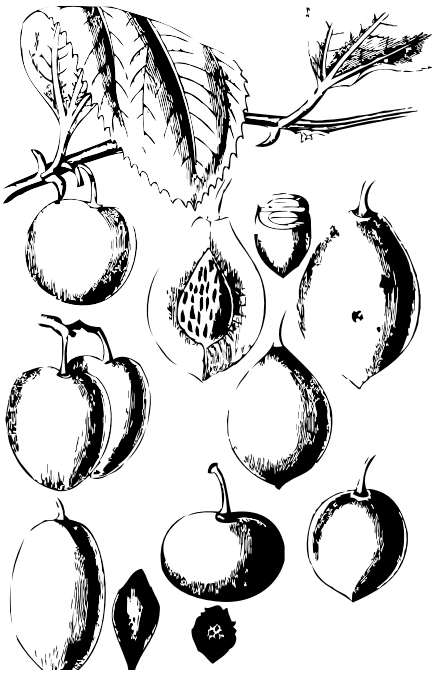
১০০ গ্রাম আপেল কুলে (SUDA National data base-এর তথ্য অনুযায়ী), ৭৯ কিলো ক্যালরি শক্তি, ১৬% কার্বোহাইড্রেট, ২% প্রোটিন, ১% ফ্যাট, ৫% ভিটামিন B3 (নিয়াসিন), ৬% ভিটামিন B6, ১% ভিটামিন A, ১১.৫% ভিটামিন C, ৩% রাইবোফ্ল্যাবিন এবং ২% থিয়ামিন থাকে। এছাড়া এই পরিমাণ কুলে ১% সোডিয়াম, ৫% পটাসিয়াম, ২% ক্যালসিয়াম, ৮% কপার, ৬% আয়রন, ৪% ম্যাগনেসিয়াম, ৩% ফসফরাস এবং ১% জিঙ্ক থাকে।

আপেল কুল স্বাদে মিষ্টি, এটি পেট ঠাণ্ডা করতে gastritis–এর সমস্যা কম করতে সাহায্য করে। আয়ুর্বেদের পঞ্চকর্ম চিকিৎসায় purgation, বিভিন্ন স্ত্রীরোগ যেমন বন্ধ্যাত্ব, heavy periods এবং পুরুষদের শুক্রাণু বৃদ্ধি করতে কুল একটি ফল উপকারী। অর্শ রোগে রক্তপাত বন্ধ করতে ও অর্শের ফোলা কমাতে আপেল কুল খুব কার্যকর। গবেষণায় প্রমাণ মিলেছে, কুলের মধ্যে ক্যানসার প্রতিরোধক পদার্থ রয়েছে। কুল গাছের পাতা ফুসফুসের সমস্যা ও সর্দিকাশির সমস্যায় ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এর পাতা বাতের চিকিৎসায়, জ্বালা-যন্ত্রণা কমাতেও এই পাতা ব্যবহৃত হয়। গাছের ছালের কাথ (pest) বিষফোঁড়া ভাল করতে ব্যবহৃত হয়।

গাছ থেকে আপেল কুল পাড়ার পর আকার অনুযায়ী বাছাই করা হয়। শীঘ্রই ১০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফলগুলি সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করতে হয়। এরফলে ফলের আয়ু বৃদ্ধি করা যায়। ৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ৮৫-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ৩০-৬০ দিন পর্যন্ত ফলগুলি সংরক্ষণ করা যায়। এরপর বাছাই করা ফলগুলি কাপড়ের থলিতে বা নাইলনের জালের থলিতে বা গানী ব্যাগে প্যাক করা হয়। দূরবর্তী বাজারে পাঠানোর জন্য বাছাই করা বড় বড় কুলগুলি, হাওয়া-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থাযুক্ত perforated কাঠবোর্ডের ৬ কেজি পরিমাণের কার্টুনে সঠিকভাবে নরম কাগজের আসনের (cushion) উপর সাজিয়ে বা গানী ব্যাগে ভর্তি করে দূরবর্তী বাজারে পাঠানোর জন্য যথাযথ ব্যবস্থাযুক্ত লরিতে করে অন্য রাজ্যে পাঠানো হয়ে থাকে।

National Horticultural Board-এর হিসাব অনুযায়ী, এক একর জমিতে আপেল কুল চাষ করতে হলে চাষের জন্য চারাগাছ, সার, কীটনাশক, শ্রমিকের মজুরি, বিদ্যুতের খরচ মিলিয়ে মোট খরচ ১৫ হাজার টাকা, সেচ বা উন্নত সেচ ব্যবস্থা বা স্থায়ী সম্পদের

জন্য পাম্প, পাইপ, Drip spronkler বাবদ খরচ ৫০ হাজার টাকা, পরিকাঠামো বা store shed বা Pump shed-এর মতো স্থায়ী কাঠামো তৈরির জন্য খরচ ১১ হাজার টাকা এবং জমি প্রস্তুত ও বেড়া ইত্যাদি স্থায়ী সম্পদের জন্য খরচ ২৪ হাজার টাকা। অর্থাৎ সর্বমোট খরচ ১ লক্ষ টাকা।

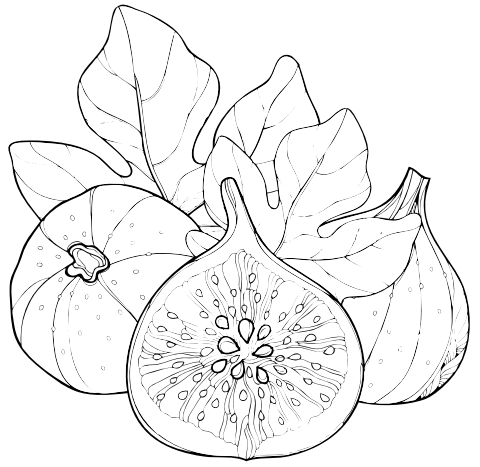


প্রতি একরে ৩ বছর পর থেকে ৩ টন করে এবং ৭ বছরের পর থেকে ৭ টন করে ফল উৎপন্ন হতে পারে। প্রতি কেজি ৮ টাকা দাম হিসাব করে তিন বছর পর থেকে গড়ে ২৪-৫৬ হাজার আয় হতে থাকবে। ৭ বছর পর থেকে উৎপাদনের খরচ কমতে থাকবে। কিন্তু ফসল উৎপাদন কিছু বাড়তে থাকবে। ফলত আয়ও বাড়তে থাকবে। এই প্রকল্পের আয়ু ১৫ বছর। সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে হিসাব করে প্রতি বছরে গড় লাভ ১০ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭ হাজার ৭০০ টাকায় দাঁড়াবে।

জাত পরিচিতি –

ভারতে বিভিন্ন জাতের কুলের চাষ হয়ে থাকে। এগুলি হল, গোলা (Gola), উমরান (Umran), বেনারসী (Banarasi), কার্কা (Karka), মুন্ডিয়া (Mundia), কৈথালি (Kaithali), মেহরুন (Mehrun), পার্বণি (Parbani), ইলাইচি (Elaichi) এবং সনম-৫ (Sanam-5)।

তথ্যসূত্র - hort/purde/edu/indiajujubafooduses



ডুমুর

ডুমুর গাছের ৭০০টিরও বেশি জাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এরমধ্যে অনেক ডুমুর কোনও কাজেই আসে না বা তার কোনও ব্যবহার নেই। এই সমস্ত জাতগুলিকে ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই চারটি ভাগ হল, Caprifigs, Smyrna, San Pedro ও Common figs

বিভিন্ন জাতের ডুমুরের মধ্যে কয়েকটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। Ficus hispida, সাধারণত বাংলাদেশে এই জাতের ডুমুর দেখতে পাওয়া যায়। যা স্থানীয়ভাবে কাক ডুমুর নামে পরিচিত। এই গাছের ফল খুব ছোট ও লোমযুক্ত হয়। এরপর বলা যায় Ficus racemosa জাতের ডুমুরের কথা। ভারতে এই ডুমুর গাছটি দেখা যায়। যা Indian fig tree বা Gular tree নামে পরিচিত। গাছে এই ডুমুরগুলি থোকা থোকায় থাকে। তাই একে Cluster fig ও বলা হয়। বাংলাদেশে একে জগ বা যজ্ঞ ডুমুরও বলা হয়ে থাকে। সাধারণত এই ডুমুর ঔষধি গুণসম্পন্ন। তাই আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় এই ডুমুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। মূলত ফল হিসাবেই এই ডুমুর খাওয়া হয়। বন্য পশুপাখির খুব ভাল খাদ্য এই জগ ডুমুর। এই প্রসঙ্গে আরও একটি ডুমুরের কথা উল্লেখ করতেই হয়। যা হল, আনজির ডুমুর। যার বিজ্ঞানসম্মত নাম Ficus carica, আমাদের দেশে ছোট এই ডুমুর ফল-ফসল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই ৩ ধরনের ডুমুরই Moraceae গোত্রের অন্তর্ভূক্ত।

আনজির ডুমুর

পরিচয় –

আনজির ডুমুরের বিজ্ঞানসম্মত নাম Ficus carica, এটি Moraceae গোত্রের একটি উদ্ভিদ।

এই ডুমুর গ্রীষ্মকালের ফসল হিসাবে পরিচিত। এই ফল-ফসলটি বাণিজ্যিক চাষ ভারতের গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটকের কিছু অংশে সীমাবদ্ধ। বেশিভাগ ক্ষেত্রে গাছ থেকে পেড়ে সবজি হিসাবে রান্না করে এই ডুমুর খাওয়া হয়।

আমাদের দেশে এই ডুমুর আনজির নামেও পরিচিত। গুজরাটি, মারাঠী, উর্দু ও পাঞ্জাবীতে অঞ্জের, তেলেগুতে আথি পল্লু, তামিল ও মালায়লমে আত্তী পজহম, বাংলাতে ডুমুর, ওড়িয়াতে দিমিরি বলা হয়।

আনজির ডুমুর উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের পর্ণমোচী গাছ। এই গাছ গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা পছন্দ করে। এই ডুমুর চাষে প্রচুর সূর্যের আলোর প্রয়োজন হয়। ৩৯ ডিগ্রী সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রায় ফলনের গুনগত মান কমতে পারে। যদি ৪৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করে এই গাছ বেঁচে থাকতে পারে। এই গাছের জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা ১৫-২১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। জলবায়ু কারণে ফলের আকার, আকৃতি, ত্বকের রং এবং শাঁসের গুনগত মান প্রভাবিত হয়। তবে গাছের বৃদ্ধি ও ফল পরিণত হওয়ার সময় গরম-শুষ্ক আবহাওয়া থাকলে অধিক গুণ সম্পন্ন ফসল পাওয়া যায়। কম তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার কারণে ফল ফেটে যেতে পারে এবং তা অল্প গুণমানের হতে পারে।

ডুমুর গাছ সাধারণত খুব বেশি খরা ও লবণাক্ততা সহ্য করতে সক্ষম। মাঝারি বা কিছু বেশি পরিমাণে ক্লোরাইড লবণ বা সালফেট সহ্য করে এই গাছ বেঁচে থাকতে পারে। ভাল নিকাশীর ব্যবস্থা রয়েছে এমন ৭-৮ PH বিশিষ্ট চুনযুক্ত মাঝারি থেকে ভারী মাটি ডুমুর চাষের জন্য উপযুক্ত।

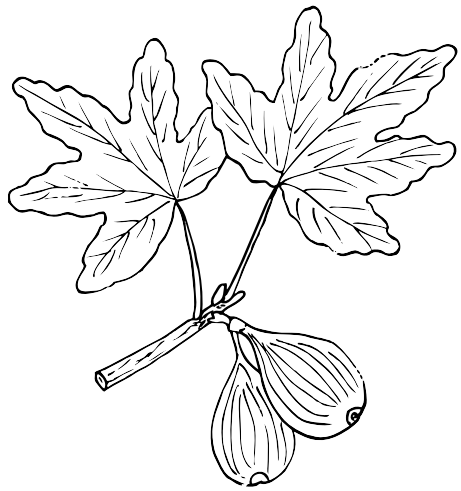
কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

সাধারণত কাটিং করে ডুমুর গাছের কৃত্রিম প্রসারণ ঘটানো যেতে পারে। আগের বছরের প্রায় ২৫ সেমি লম্বা ও ৩-৬ টি গাঁট বিশিষ্ট কাটিং হিসাবে ব্যবহার করতে হয়।

জমিতে ৫ X ৫ মিটার দূরত্বে বর্গাকারে কাটিং বা চারা রোপণ করা উচিত। এভাবে রোপণ করলে প্রতি একরে প্রায় ১৫০টি কাটিং বা চারার প্রয়োজন হয়। কাটিংগুলি রোপণের জন্য জমিতে ০.৬ কিউবিক মিটার গর্ত খনন করা হয়। রোপণের সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হল জুন-সেপ্টেম্বর মাস।

বীজের মাধ্যমে ডুমুরের চাষ করতে হলে অক্টোবর মাসে বীজ বপন করা উচিত।

পরিচর্যা –



উষ্ণ ও খরা প্রবণ অঞ্চলে ডুমুর বেঁচে থাকতে পারে। বাণিজ্যিকভাবে চাষের ক্ষেত্রে রোপণের পরপর সেচ দিতে হয়। গ্রীষ্মকালে ৯-১২ দিন অন্তর সেচ প্রয়োগ বাধ্যতামূলক। drip irrigation পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া যেতে পারে। দিনে গাছ প্রতি ১৫-২০ লিটার ভাল ফলন পাওয়া যায়।

সময় অনুযায়ী বিভিন্ন পরিমাণে ডুমুর চাষে বিভিন্ন জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হয়। প্রথম থেকে চতুর্থ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন অনুপাতে FYM, নিমের খোল, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম প্রয়োগ করতে হয়। পঞ্চম বছর বা তারপর থেকে গাছ প্রতি বছরে ৩৫ কেজি FYM, ২ কেজি নিম খোল, ৩০০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ২০০ গ্রাম ফসফরাস ও ২০০ পটাসিয়াম সার দিয়ে যেতে হয়।

কিছু জাতের ডুমুর গাছ চাষের ক্ষেত্রে হালকা ডাল ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন হয়। এছাড়া গাছের ফল ঝরে পড়া রোধ করতে বা ডালপালার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে প্রতি লিটার জলে ৩০ মিলিলিটার জিবারেলিক অ্যাসিড গুলে গাছে স্প্রে করা যেতে পারে।

ডমুর গাছের প্রধান ক্ষতিকারক পোকাগুলি হল, leaf defoliators, stem borers ও fig flies, ০.০৫% Demecron স্প্রে করে fig fly-কে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কেরোসিন বা পেট্রোলে Phorate granules মিশিয়ে গাছের পাতায় প্রয়োগ করলে stem borers-কে প্রতিরোধ করা যায়। ডুমুর গাছের প্রধান রোগ হল, Rust রোগ। Blitox বা Sulphur বা Dithane Z-78 এবং Dithane M-45 স্প্রে করে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

সাধারণত দ্বিতীয় বছর থেকে ডুমুর গাছ ফলন দিতে শুরু করে। তবে বাণিজ্যিকভাবে চাষের ক্ষেত্রে তৃতীয় বছর থেকে ফলন সংগ্রহ করতে হয়। ডুমুর গাছ প্রায় ৩০-৩৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। ফসল সংগ্রহ শুরু হয় ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে। শেষ হয় মে-জুন মাসে। ২-৩ দফায় হাত দিয়ে ফসল সংগ্রহ করতে হয়।

বিভিন্ন বয়সের ডুমুর গাছ থেকে বিভিন্ন পরিমাণে ফসল পাওয়া যায়। ৩ বছর বয়সের প্রতিটি ডুমুর গাছ থেকে ৩ কেজি, ৪ বছর বয়সের গাছ থেকে ৬ কেজি, ৫ বছর বয়সের গাছ থেকে ৯ কেজি, ৬ বছর বয়সের গাছ থেকে ১২ কেজি, ৭ বছর বয়সের গাছ থেকে ১৫ কেজি এবং ৮ বা তার পরের বছর থেকে ১৮ কেজির মতো ফলন উৎপাদন হতে পারে।

এই আনজির বা ডুমুরকে গাছ থেকে পেড়ে ফল হিসাবে খাওয়া যায়। আবার সংরক্ষণ করে পরে সবজি হিসাবে রান্না করেও খাওয়া সম্ভব।

ডুমুরে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে। ডুমুর হজমে, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে। এছাড়া শরীরে আয়রনের ঘাটতি পূরণ করে এই ডুমুর।

জাত পরিচিতি –

সারা পৃথিবীতে চাষ হয় এমন ২১টি জাতের ডুমুরের কথা জানা যায়। এমন কয়েকটি জনপ্রিয় জাত হল, Black Mission, White Adriatic, Kalamon, Kodota, Conadira, Sultani ইত্যাদি। ভারতে ফল হিসাবে চাষ হওয়া ডুমুরের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল, Poona আমাদের দেশের মধ্যে দৌলতাবাদ, গঞ্জাম, কোয়েম্বাটুর, ম্যাঙ্গালোর, বেল্লারি, লখনউ এবং সাহারানপুরে সর্বাধিক ডুমুরের চাষ হয়। মত ডুমুর ফলগুলির বেশিরভাগই পুনা ডুমুর। সম্প্রতি দৌলতাবাদ জাতের ডুমুরকে আরও উন্নত করে Dinkar নামে আরও ভাল জাতের ডুমুর পাওয়া গেছে। ফলন ও ফলের গুণমানের কারণে যা বাণিজ্যিক গুরুত্ব অর্জন করেছে।

তথ্যসূত্র – www.agrifarming.in, www.gardeningknowhow.com, bn.wikipedia.org, www.fruitsinfo.com



আমড়া

পরিচয় –

আমড়ার বিজ্ঞানসম্মত নাম Spondius dulcis, এটি Anacardiaceae গোত্রের উদ্ভিদ।

আমড়া মূলত নিরক্ষীয় বা ক্রান্তীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ। মেলানশিয়া ও পলিনেশিয়া এই গাছের আদি জন্মস্থান। ১৭৮২ সালে এই গাছ জামাইকায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং পানামা, কিউবা, হাইতি, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, ভেনেজুয়েলা সহ একাধিক দেশে চাষ করা হয়। ১৯০৯ সালে আমেরিকার কৃষি দফতর লাইবেরিয়া থেকে এই গাছের বীজ পায়। কিন্তু সে দেশে এই গাছ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। যদিও দক্ষিণ ফ্লোরিডায় এই গাছ বেড়ে উঠেছে। এছাড়া ১৯৬০ সাল নাগাদ সোমালিয়ার কৃষি এলাকায় আমড়া গাছের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে।

এই গাছ সাধারণভাবে ambarella বা jew plum নামে পরিচিত। তেলেগুতে আমড়াকে আদাভি মামিদি, তামিলে আমড়া কাই, কোঙ্কনে আমবাদো, মালায়লমে আমবাঝাঙ্গা, কন্নড়ে আমতে কাই, বাংলায় আমড়া নামে ডাকা হয়।

আমড়া গাছ খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সাধারণত এই গাছের গড় উচ্চতা ১০-১২ মিটার হয়। তবে সর্বোচ্চ ২০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে আমড়া গাছ। এই গাছের পাতা পক্ষল যৌগিক প্রকৃতির, লম্বায় ২০-৬০ সেমি। পাতায় ৯-১০ সেমি দৈর্ঘ্যের ৯-২৫টি উজ্জ্বল, উপবৃত্তাকার পত্রক থাকে। পত্রকগুলি খুব সুন্দর খাঁজ বিশিষ্ট। এই গাছের ফুল খুব ছোট, হালকা সাদা ও প্রান্তীয় মঞ্জরী বিশিষ্ট। আমড়া ফলটি অর্ধগোলাকার। লম্বায় ৬-৯ সেমি। ড্রুপ প্রকৃতির ফলগুলি গাছের শাখায় বা লম্বা বৃন্ততে জন্মায়। ফলের মধ্যে ১টি বীজ থাকে।

এই গাছ আর্দ্র ও ক্রান্তীয় এবং উষ্ণক্রান্তীয় আবহাওয়া অঞ্চলে জন্মায়। ২৩০০ ফুট উঁচু জমিতেও আমড়া গাছ ভাল হতে পারে।

জল নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকলে সব ধরনের মাটিতেই এই গাছ হতে পারে। ফ্লোরিডার পাথুরে মাটিতেও এই গাছ হয়।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

সাধারণত বীজ থেকে এই গাছের বিস্তার ঘটানো হয় এবং ২-৪ বছরের মধ্যে ফল পাওয়া যায়। ৪ সপ্তাহের মধ্যে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়ে নতুন চারা তৈরি হয়।

বীজ থেকে আমড়ার চারা তৈরি করে পরবর্তীতে তা নির্দিষ্ট জমিতে রোপণ করা যায়। সঠিকভাবে চারা লাগানো হলে একটি পুষ্ট বীজ থেকে ২-৩ টি চারা তৈরি করা সম্ভব। বীজ নার্সারীর বেডে বা পলিথিন ব্যাগে বপন করে এই চারা তৈরি করা যেতে পারে।

এছাড়া গাছের শক্ত ও বড় ডাল কেটে অথবা গুটিকলম করেও আমড়া গাছের কৃত্রিম প্রসারণ সম্ভব। পাশাপাশি নিজের rootstock-এ গ্রাফটিং করেও আমড়া গাছের বিস্তার সম্ভব। কিন্তু ভারতে দেশীয় প্রজাতির Spondius pinnata -তে এই গ্রাফটিং করা হয়ে থাকে।

পরিচর্যা –

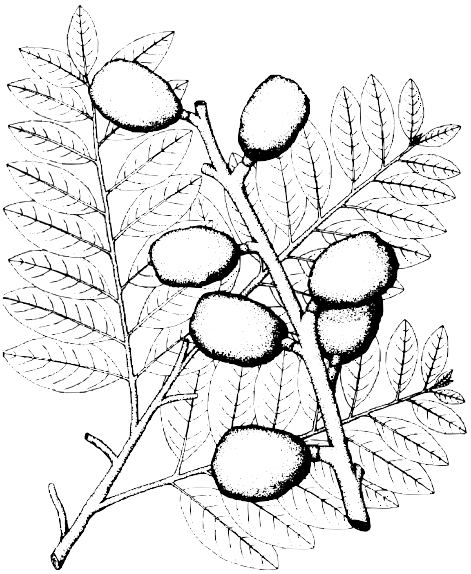
উঁচু ও মাঝারি-উঁচু জমি আমড়া চাষের উপযোগী। বর্ষায় জল উঠে যায় এবং জল জমে থাকে এরকম জমি আমড়া চাষের উপযুক্ত নয়। সাধারণত ৬.৫ হাত X ৬.৫ হাত বা ১৩ হাত X ১৩ হাত দূরত্বে বর্গাকার জমিতে আমড়ার চারাগুলি রোপণ করতে হয়। তবে ষড়ভুজ আকারে চারা রোপণ করলে চারা কম লাগে। জুন-অক্টোবর (জৈষ্ঠ্য থেকে আশ্বিন) মাস আমড়ার চারা জমিতে রোপণ করার উপযুক্ত সময়।

জমিরে চারা রোপণের আগে সোয়া ২ হাত X সোয়া ২ হাত X সোয়া ২ হাত মাপের গর্ত করতে হয়। তারপর ওই গর্তে

২০ কেজি গোবর সার, ২৫০ গ্রাম TSP (ট্রিপল সুপারফসফেট) ও ২৫০ গ্রাম পটাশ সার মাটির সঙ্গে ভরাট করে ১৫-২০ দিন এভাবে ফেলে রাখতে হবে।

১৫-২০ দিন পর ওই গর্তে চারাটি সোজা করে লাগিয়ে গোড়া ভাল করে হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে দিতে হবে।

চারা রোপণের পর বিকেলের দিকে জলসেচ দিতে হবে এবং প্রয়োজনে চারপাশে খাঁচার ব্যবস্থা করতে হয়।



জমিতে চারা লাগানোর পর বারবার হালকা সেচ দিতে হবে। শুকনো মরসুমে ও ফল ধরার পর মাটির অবস্থা বিচার করে ১৫-২০ দিন পরপর ২-৩ বার সেচ দিলে ভাল ফলন পাওয়া যাবে। তবে বৃষ্টির পর ও সেচের পর গোড়ায় কোনওভাবেই জল জমতে দেওয়া চলবে না।

গাছের গোড়ার আগাছা ও পরগাছা নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে। চারাটি বড় হলে তার থাকলে মরা ডালপালা ও অতিরিক্ত ডালপালা ছেঁটে দিতে হবে। এতে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়।

গাছের বয়স ও জমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে আমড়া গাছে নির্দিষ্ট অনুপাতে নিয়মিতভাবে জৈবসার, ইউরিয়া, TSP (ট্রিপল সুপারফসফেট) ও MOP (পটাসিয়াম ক্লোরাইড) প্রয়োগ করতে হয়। মূলত বৈশাখ, আষাঢ়, আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ মাস আমড়া গাছে সার দেওয়ার উপযুক্ত সময়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে আমড়া গাছে ফুল আসে এবং ফল পাকে অগাস্ট-অক্টোবর মাসে। বীজ থেকে চারা তৈরি করার জন্য গাছে পাকা আমড়ার বীজ সংগ্রহ করে রাখতে হয়। গাছ থেকে পেড়ে কাঁচা ও পাকা দুই অবস্থাতেই আমড়া খাওয়া যায়। আমড়ার চাটনী অত্যন্ত উপাদেয় খাবার।

আমড়ার ১০০ গ্রাম ভোজ্য অংশে ১৫৭.৩০ কিলো ক্যালরি শক্তি, আর্দ্রতা ৫৯.৬৫% – ৮৫.৪৭%, প্রোটিন ০.৫০%-০.৮০%, ফ্যাট ০.২৮% -১.৭৯%, শর্করা ৮.০৫% - ১০-৫৪%, ক্রুড ফাইবার ০.৮৫-৩-৬০%, অ্যাসিড ০.৪৭% ও অ্যাশ ০.৪৪-০.৬৫% । এছাড়া এই ফলে কিছু মাত্রায় ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন এবং বিভিন্ন ভিটামিন থাকে।

এই ফলের নানান ঔষধি গুণ রয়েছে। মধূমেহ রোগে, মূত্রনালীর সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে, উচ্চ রক্তচাপ কমাতে ও অর্শ্ব রোগের ক্ষেত্রে এই ফল খুবই উপযোগী। এছাড়া কাটাছেঁড়া, পুড়ে যাওয়ার চিকিৎসায় এই ফল ব্যবহার হয়ে থাকে। ডায়রিয়ার উপশমে এই গাছে পাতা ও ছাল যথেষ্ট উপকারী। আমড়া ও এর পাতার নির্যাসে অ্যান্টি-মাইক্রোবায়াল, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, সাইটোটক্সিক ও থ্রম্বোলাইটিক পদার্থ থাকে।

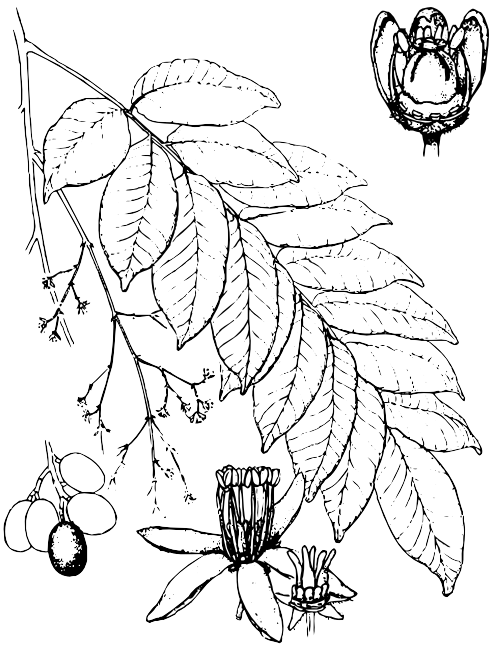
প্রশান্ত মহাসাগরের সোসাইটি দ্বীপে আমড়া গাছের হাল্কা-বাদামি বর্ণের কাঠ নৌকা তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

গাছ থেকে পাড়ার পর এই ফলকে যদি আরও পাকাতে হয় তবে তা ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রেখে দিতে হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে ফলগুলি পরিণত হয়। অতিরিক্ত আরও দু'সপ্তাহ রাখতে হলে ফলগুলিকে রেফ্রিজেরেটরে রাখতে হয়। তবে এই ফলকে কখনই ৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে সংরক্ষণ করা উচিত নয়।

জাত পরিচিতি –

ভারতে সাধারণভাবে আমড়ার আরও একটি জাত, Spondius pinnata দেখতে পাওয়া যায়। কিছু উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর মতে, Spondius pinnata হল Spondius dulcis-এর একটি জংলা প্রজাতি। উত্তর ভারতের হিমালয় অঞ্চল থেকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এর চাষ হয়ে থাকে। এছাড়া গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও মালয়েশিয়ায় এই আমড়ার চাষ হয়।

তথ্যসূত্র – www.hort.purdue.edu, http://theindianvegan.blogspot.in, www.bari.gov.bd, https://en.wikipedia.org/wiki/Spondias_dulcis এবং http://en.hortipedia.com



বিলাতি আমড়া

পরিচয় –

এই গাছে বিজ্ঞানসম্মত নাম Spondias mombin, এটি Anacardiaceae গোত্রের মাঝারি আকারের একটি পর্ণমোচী বৃক্ষ।

আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ ও ভারতে এই গাছটি জন্মায়।

উচ্চতায় এই গাছ ২০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে এবং ১.৫ মিটার জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গাছে কম শাখা-প্রশাখা থাকে। গাছের ছাল পুরু হয়। প্রতিটি যৌগিক পাতায় ৫-৮ জোড়া বিপরীতমুখী পত্রক থাকে। পত্রকগুলি ২-৪ ইঞ্চি লম্বা হয়। ফলগুলি সাধারণত সবুজ রঙের হয়। ইংরেজিতে এই ফলকে Hog plum বলে। বাংলায় এটি বিলাতি আমড়া নামে পরিচিত।

জমিতে জল নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত থাকে হবে। এই গাছের জন্য খুব বেশি উর্বর মাটির প্রয়োজন হয় না। তবে বালি মিশ্রিত দোঁয়াশ মাটি এক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত। মাটির PH –এর মাত্রা ৫.৫-৬.৫ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের এই উদ্ভিদটিকে ১০০০ মিটার পর্যন্ত উঁচু জমিতে জন্মাতে দেখা যায়। যেখানে দিনে বার্ষিক তাপমাত্রা ২১-২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস সেই জায়গায় এই গাছ ভাল হয়। তবে বিলাতি আমড়া গাছ ৩৫ দিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০০০-২০০০ মিলিমিটার এই গাছের পক্ষে উপযুক্ত। যদিও সর্বোচ্চ ২৮০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতেও এই গাছ বেঁচে থাকতে পারে।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

সাধারণত ফলের বীজ থেকে এই গাছের বিস্তার হয়ে থাকে। বিলাতি আমড়ার বীজের অঙ্কুরোদ্গম খুব ভাল হয়। ৩৫-৭৫ দিনের মধ্যে বীজ থেকে চারা তৈরি হয়। তবে সবচেয়ে ভাল হয় পাকা ফলের বীজ থেকে কোনও পাত্রে তার চারা তৈরি করে নেওয়া। চারা তৈরি হলে তারপর তা নির্দিষ্ট জমিতে রোপণ করা যেতে পারে। এছাড়া গত বছরের ৫০-১০০ সেমি লম্বা ও ৫-১০ পুরু ডাল কেটে কলম করেও প্রসারণের জন্য চারা তৈরি করা যায়।

জমিতে চারা রোপণের আগে চাষ দিয়ে ভাল করে জমি তৈরি করে নিতে হয়। এই গাছ খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সে কারণে চারা রোপণের সময় খেয়াল রাখতে হয় গাছটি বড় হওয়ার জন্য তার আশপাশে যেন যথেষ্ট জায়গা থাকে। সারি করে চারা রোপণ করলে দুটি চারার মাঝে কমবেশি ১৮ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হয়। কিন্তু অন্য গাছের পাশে কোনও একটি বিলাতি আমড়ার চারা রোপণের ক্ষেত্রে ১০ ফুট দূরত্বই যথেষ্ট।

পরিচর্যা –

এই গাছে জল দেওয়ার ক্ষেত্রে নজর রাখতে হবে যেন গাছটি অল্প হলেও মাটি শোষণে সক্ষম হয় এবং যতক্ষণ না গাছের উপর দিকের ২ ইঞ্চি শুকিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ আর জল দিতে নেই। আলো, জায়গা এবং পাতার পরিমাণের উপর নির্ভর করে গাছে রোজ বা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে জল দিতে হয়। দেখতে হবে গাছে কখনই বাড়তি জল না দেওয়া হয়। মাটি বেশি কাদাযুক্ত হয়ে গেলে গাছ মরে যেতে পারে।

গাছে জল সেচের সময়ই সার প্রয়োগ করা সবচেয়ে ভাল। তবে অতিরিক্ত সার প্রয়োগ অনেক সময় গাছের ক্ষতি করতে পারে। গাছ পুড়িয়ে দেয়, শেষমেশ গাছটি মরে যায়। এই গাছের একাধিক সার প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে। এতে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

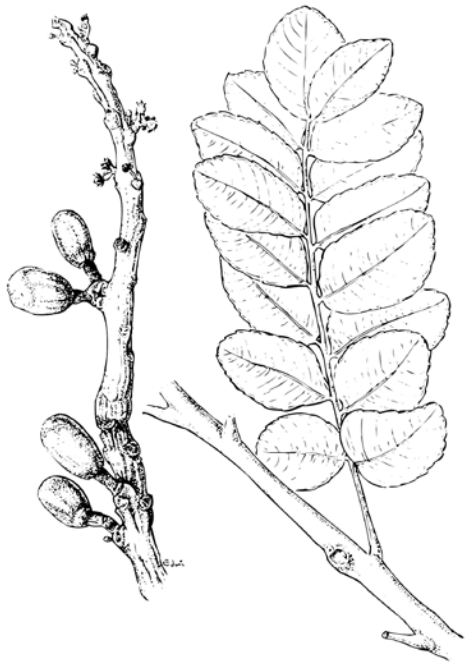
সাধারণত জানুয়ারি-মে মাসে এই গাছে ফুল আসে। গাছে ফল থাকে জুলাই-সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। মোটামুটি অগাস্ট-অক্টোবর মাস এই ফল বাজারে থাকে। ৫-৭ বছরেই গাছ থেকে ফল পাওয়া যায়। গাছ থেকে পেড়ে এই ফল কাঁচা ও পাকা দুই অবস্থাতেই খাওয়া যায়।

এই ফল কাঁচা ও পাকা রান্না করে বা আচার বানিয়ে খাওয়া যায়। এছাড়া আমড়ার চাটনীও বেশ সুস্বাদু। এই ফলের অসীম খাদ্যগুণ

রয়েছে। ১০০ গ্রাম বিলাতি আমড়ায় ৯০% জল, ৬৬ কিলো ক্যালরি শক্তি, ১৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ১.১ গ্রাম প্রোটিন, ০.১ গ্রাম ফ্যাট, ৫৫ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ৩.৯ মিলিগ্রাম আয়রন, ৮০০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন, ১০২৮ মিলিগ্রাম ভিটামিন – B, ৯২ মিলিগ্রাম ভিটামিন – C, ০.৬ মিলিগ্রাম অন্যান্য খনিজ পদার্থ থাকে। এছাড়া এই ফলে যথেষ্ট পরিমাণ পেকটিন জাতীয় ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট জাতীয় উপাদান থাকে।

এই ফল কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে ওজন কমাতে সহায়তা করে। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। বিলাতি আমড়ায় অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট জাতীয় উপাদান থাকায় এই ফল বার্ধক্যকে প্রতিহত করে। রক্তাল্পতা দূর করার পাশাপাশি এই ফল রক্তের তঞ্চন ঘটাতেও বেশ কার্যকর। মুখের অরুচিভাব দূর করে ক্ষুধা বাড়ায় বিলাতি আমড়া।

তথ্যসূত্র–www.tropical.theferns.info,www.botanicalgrowersnetwork.net, www.bn.wikipedia.org





আনারস

পরিচয় –

আনারসের বিজ্ঞানসম্মত নাম Ananas comosus, এটি Bromeliaceae গোত্রের বীরুৎ শ্রেণীর একবীজপত্রী বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ।

আনারস গাছের আদি জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকা। সম্ভবত দক্ষিণ ব্রাজিল ও প্যারাগুয়ের মধ্যবর্তী কোনও জায়গা থেকেই পৃথিবীর অন্যান্য অংশে বিস্তারলাভ করে। কলম্বাস এর নাম দিয়েছিলেন 'Pina da indes' অর্থাৎ Pine of India, ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগীজদের দ্বারা দক্ষিণ ভারতে আনারস গাছ রোপণ করা হয়েছিল। ক্রমে তা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর আনারস উৎপাদনকারী দেশগুলি হল, ফিলিপাইনস্, থাইল্যান্ড, কোস্টারিকা, ইন্দোনেশিয়া, চিলি, ব্রাজিল, ভারত, নাইজেরিয়া, মেক্সিকো ও কলম্বিয়া।

আনারসকে ফলের রাজা বা 'The King of Fruits' বলে। আনারসের সঙ্গে পাইন গাছের Cone (ফুল বাকল)-এর মিল থাকায় ইংরেজিতে আনারস Pineapple বলে। হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠী, পাঞ্জাবী ও কন্নড় ভাষায় আনারসকে আনানস, তামিলে আনাসি পাঝাম বা পরাঙ্গি থালাই, মালায়লমে কাইথা চাক্কা, কোঙ্কনীতে আনাস বা আম্বো, তেলেগুতে আনাস পাণ্ডু, অসমীয়ায় আনাবস, ওড়িয়াতে সাপুরি বা সুপুরি আনাসিয়ানাস এবং বাংলায় আনারস নামে পরিচিত।

আনারস গাছ উচ্চতায় ১-২মিটার পর্যন্ত হতে পারে। আনারস গাছের কাণ্ডটি খুবই ছোট। কাণ্ডের মোটা অংশটি মাটির মধ্যে থাকে। মাটির উপরের অংশটি সরু হয়। কাণ্ডটি ৫০ সেমি পর্যন্ত লম্বা এবং ৮ সেমি মোটা গদাকৃতির হয়ে থাকে। পাতাগুলি কাণ্ডের উপর ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে সর্পিলভাবে সজ্জিত থাকার জন্য কাণ্ডটি দেখা যায় না। কাণ্ডটি ফলের মাঝখান দিয়ে বর্ধিত হয়ে ফলের উপর পর্যন্ত পৌঁছয়। আনারস গাছের পাতা অবৃন্তক, লম্বা। কলার মতো কাণ্ডবেষ্টক, পুরু পাতায় সাদা পাউডারের মতো প্রলেপ থাকে। পাতার কিনারা বেকানো কাঁটাযুক্ত। অগ্রভাগ সূঁচালো। নিচের পাতাগুলি ছোট হয়, উপরের পাতাগুলি লম্বায় ১ মিটার এবং চওড়ায় ৪ সেমি পর্যন্ত হতে পারে। মাঝখানের পাতা সোজা কলা পাতার সজ্জিত থাকে। ফুল আসার আগে পাতার মাঝখান দিয়ে লাল ফুল বেরিয়ে আসে। প্রতিটি ফুল লাল, হলুদ বা সবুজ পুষ্পপত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। গাছে ৭০-৮০টি পাতা থাকে। কাণ্ডের অগ্রস্থ ভাজক কলা (Meristem) থেকে মঞ্জরীদণ্ডটি পাতাগুলির মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসে। মঞ্জরীদণ্ডের উপর ২০০টির মতো ফুল থাকে। ফুলটি ৩টি বৃতি, ৩টি পাপড়ি, ৬টি পুংকেশর ও ৩টি গর্ভকেশর নিয়ে গঠিত। ফুলের সমস্ত অংশ রসালো। পুষ্পপত্র বর্ধিত হয়ে মঞ্জরীদণ্ডের গোড়া থেকে ৩-৪ সপ্তাহ ধরে fruilletsগুলি বৃদ্ধি পায়। একটি স্বতন্ত্র ফুল থেকে একটিই ফল উৎপন্ন হয়। ফলগুলি পাশাপাশি যুক্ত হয়ে রসালো মোচাকৃতির যৌগিক ফলটি সৃষ্টি হয়। আনারাস ফলের সমস্ত অংশ পুষ্পপত্র, গর্ভকেশর পাশাপাশি বর্ধিত হয়ে মিলিত হয়ে যৌগিক Compaed ফলটির সৃষ্টি হয়। ফলের গায়ে অনেকগুলি উঁচু ও খাঁজকাটা চোখ থাকে। ফলের মধ্য দিয়ে মঞ্জরীদণ্ডটি বর্ধিত হয়ে একটি মাত্র পাতা নিয়ে ফলের মাথায় মুকুটের আকার তৈরি করে। আনারস গাছে দুই ধরনের মূল দেখা যায়। গাছ লাগানোর কিছু দিনের মধ্যে প্রাথমিক মূলটি মরে যায়। এরপর অস্থানিক মূলগুলি বের হয়। এই মূলগুলি মাটির নিচে ১-২ মিটার গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকতে পারে এবং মূলতন্ত্র গঠন করে গাছকে মাটির সঙ্গে শক্তভাবে ধরে রাখতে সাহায্য করে। আনারসের ফলের নিচ থেকে একাধিক শাখা বের হয়। এগুলিকে স্লিপ (Slip) বলে। এছাড়া আনারস গাছের মাটি সংলগ্ন কাণ্ড থেকে যে শাখাগুলি বের হয় তাকে সাকার (Sucker) বলে। Slip ও Sucker গুলি থেকে এই গাছের প্রসারণ ঘটানো যায়।

আনারসের উৎপাদনে তাপমাত্রার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আনারস চাষের উপযুক্ত তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াস (দিনে) এবং ২০ ডিগ্রী সেলসিয়াস (রাতে)। এই তাপমাত্রার সামান্য হেরফের ঘটলে উৎপাদন কমে যায়।

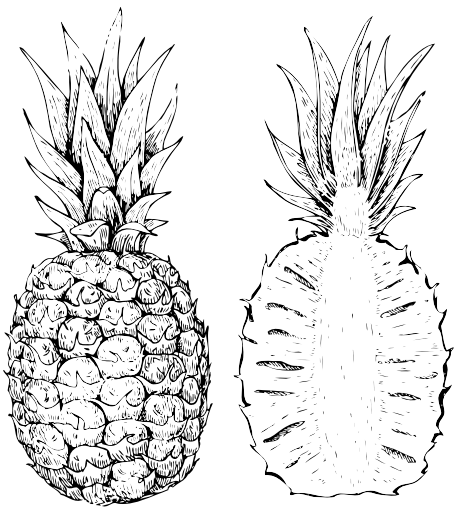
সারা বছর ধরে উপযুক্ত সমবণ্টিত বৃষ্টিপাতযুক্ত জায়গা, যেখানকার বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০০-১৫০ সেমির বেশি সেখানে আনারস ভাল হয়। সূর্যের প্রখর কিরণ বা তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের উপরে থাকলে ফলের প্রচুর ক্ষতি হয়। সমুদ্রতল থেকে ১০০০মিটার উচ্চতায় আনারস জন্মায়।

সব ধরনের মাটিতেই আনারস চাষ হতে পারে। তবে উপযুক্ত নিকাশী যুক্ত ১ মিটার গভীর অল্প দোঁয়াশ বা বালিযুক্ত দোঁয়াশ মাটি যার অম্ল ও ক্ষারের মাত্রা ৪.৫-৫.৬ PH, তেমন মাটি আনারস চাষের পক্ষে উপযুক্ত।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

বীজের দ্বারা আনারস গাছের বিস্তার ঘটানো যায়। তবে বীজ তৈরি করার জন্য সেক্ষেত্রে হাত দিয়ে পরাগসংযোগ করে পরাগমিলন

ঘটাতে হবে। এরফলে বীজ উৎপন্ন হতে পারে এবং সেই বীজ থেকে চারা তৈরি সম্ভব হয়। তবে এই চারা রোপণের উপযুক্ত হতে এবং পরে তা থেকে ফল পেতে অনেক সময় লাগে।



এইজন্য আনারস চাষ ফলের মূলত মুকুট বা crown, Sucker কিংবা Slip রোপণ করে করা হয়ে থাকে। Sucker থেকে তৈরি গাছে ফল আসতে সবচেয়ে কম, ১৬-১৭ মাস সময় লাগে। ১৯-২০ মাস লাগে Slip-এর ক্ষেত্রে এবং ফল পেতে সব থেকে বেশি সময় লাগে crown–এর গাছে। প্রায় ২২-২৫ মাস।

বর্তমানে বেশ কিছু আধুনিক নার্সারীতে বা সরকারি কৃষি গবেষণাগারে টিস্যু কালচারের চারাও পাওয়া যাচ্ছে। তবে এই চারা ও Crown-এর চারার উৎপাদন ও গুণমানে বিশেষ কোনও পার্থক্য হয় না। তবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যখন অনেক চারার প্রয়োজন হলে টিস্যু কালচারের চারা রোপণ করা থাকে।

বর্ষার আসার সময়ের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় চারা রোপণ করা হয়ে থাকে। তবে ভাল সেচের ব্যবস্থা থাকলে বছরের যে কোনও সময় আনারসের চারা রোপণ করা যেতে পারে।

জমিতে চারা রোপণের আগে চাষ দিয়ে জমির ঢাল রক্ষা করে জমি তৈরি করতে হয়। জমিতে চাষ দিয়ে জমির উপযুক্ত ঢাল রক্ষা করে জমি তৈরি করার কাজে বিশেষ নজর দিতে হয়। এরপর কোদাল দিয়ে মাটি কেটে উঁচু উঁচু সারিগুলি তৈরি করা হয়। দুটি সারির মাঝে ৬০-৯০ সেমি দূরত্ব বজায় রাখতে হয়। সারিগুলি সব সময় জমির ঢাল অনুযায়ী কাটতে হয়। দুটি সারি মাঝের নালাগুলি দিয়ে যাতে জল বা সেচ দেওয়া যায় এবং জমিতে থাকা বৃষ্টির জল বা অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যেতে পারে সেদিকে নজর রাখতে হয়। খুব ঘনভাবে চাষ করা হলে হেক্টরে ৬৩ হাজার ৪০০টি চারার প্রয়োজন হয়। সেখানে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২২.৫ সেমি এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০-৭৫ সেমি। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে এভাবে রোপণ খুবই উপযোগী। তবে গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া যুক্ত অঞ্চলে আনারস রোপণে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২৫ সেমি এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০-৯০ সেমি বজায় রাখলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। বেশি বৃষ্টিপাতযুক্ত উর্বর জমিতে পাতলাভাবে একটু বেশি দূরত্বে চারা রোপণ করলে (উত্তর-পূর্ব ভারতে) প্রতি হেক্টরে ৩১ হাজার চারার প্রয়োজন হয়।

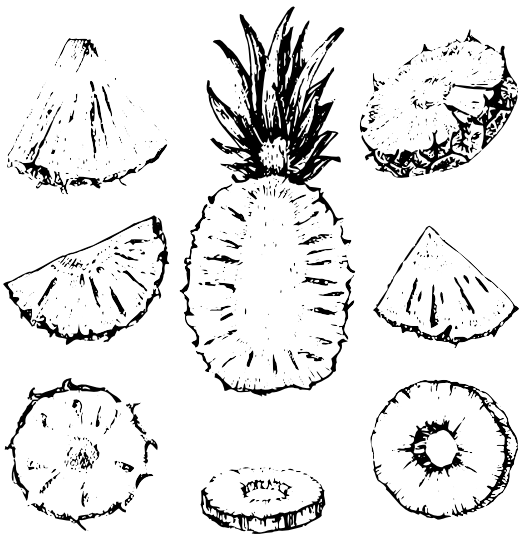
পরিচর্যা –

সাধারণত বৃষ্টি উপর নির্ভর করেই আনারসের চাষ করা হয়। গরমের সময় শুষ্ক জমিতে সেচ প্রয়োগের মাধ্যমে সারা বছর ফসল উৎপাদন সম্ভব। এক্ষেত্রে ২০-২৫ দিন অন্তর সেচ দিয়ে ফলের আকার ও ওজনও বৃদ্ধি করা যায়। তবে প্রতিবার সার প্রয়োগের পর সেচ দিতে হয়।

বিভিন্ন স্থানে জমির উর্বরতা অনুযায়ী সার প্রয়োগের মাত্রা বিভিন্ন হয়। নাইট্রোজেন সারের উপর ফলের আকার ও উৎপাদন নির্ভর করে। গাছ প্রতি বছরে ১২ গ্রাম নাইট্রোজেন, ৪ গ্রাম ফসফরাস পেন্টোক্সাইড ও ১২ গ্রাম পটাসিয়াম সুপার-অক্সাইড প্রয়োগ করা হয়। আমাদের রাজ্যে নাইট্রোজেন ১২-১৬ কেজি, ফসফরাস পেন্টোক্সাইড ২-৪ কেজি এবং পটাসিয়াম সুপার-অক্সাইড ১০-১২ কেজি দেওয়া হয়। প্রথমবার চারা রোপণের ২ মাস পর প্রথম কিস্তিতে নাইট্রজেন প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় কিস্তিতে এই সার প্রয়োগ করা হয় ১২ মাস পর। তবে ফসফরাস পেন্টোক্সাইড ও পটাসিয়াম সুপার-অক্সাইড একই সঙ্গে চারা রোপণের সময় দেওয়া হয়। বৃষ্টি সময় সার প্রয়োগ করলে সেচ দিতে লাগে না। এছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন অনুপাতে আনারস গাছে ইউরিয়া, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, জিঙ্ক সালফেট ও পটাসিয়াম নাইট্রেট প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আনারস গাছের গোড়ার চারপাশে কোদাল বা নিড়ানীর সাহায্যে কুপিয়ে বছরে চারবার মাটি আলগা করে গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে পরিচর্যা করতে হয়। দুটির বেশি Sucker তুলে ফেলে পরের বছর Crown –এর পরিচর্যা করা দরকার। এইভাবে করলে আগাছা দমনের পাশাপাশি গাছেরও পরিচর্যা হয়ে যায়। এছাড়া প্রতি হেক্টর জমির জন্য ২ কেজি Diuron বা ২ কেজি Diuron ও Bromacil-এর মিশ্রণ প্রয়োগ করেও আগাছা দমন করা যেতে পারে।

বিভিন্ন হরমোন যেমন ন্যাফথালিন অ্যাসিটিক আসিড (২০০-৩০০ PPM) ২-৩ মাস অন্তর গাছে ফল ধরার পর স্প্রে করলে ফলের আকার ১৫-২০% বৃদ্ধি পায়। সারা বছর ফলের উৎপাদন বজায় রাখার জন্য ২০ গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বাইড বা ০.২৫ মিলিলিটার ইথারেল প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করলে তা ফুল আসার পক্ষে সহায়ক হয়। সম্প্রতি একসঙ্গে সব ফল পাকানোর জন্য বা Sucker-এর শাখগুলি শীঘ্র ফুল আনার জন্য Ethephone প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এরফলে ফসল তোলার খরচ কমানো যায় এবং সঠিক সময়ে আনারস বাজারজাত করা যায়।



গাছের গোড়ায় শুকনো খড় বা কালো প্লাস্টিক বিছিয়ে দিলে মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণের পাশাপাশি আগাছাও দমন করা যায়। এছাড়া ফলগুলি ঢাকা সম্ভব হলে পাখির হাত থেকে বা রোদে ঝলসে যাওয়া রোগের হাত থেকে সেগুলিকে রক্ষা করা সম্ভব।

আনারস গাছে বিভিন্ন ধরনের রোগপোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। সব থেকে মারাত্মক রোগ হল, পাতা খসে যাওয়া বা পাতা ঝুলে যাওয়া। Wilt disease নামক রোগটি মিলিবাগের আক্রমণে হয়। এছাড়া ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকঘটিত (Phytophthora cinnamon ও Phytophthora parasitica) কারণে আনারস গাছে বিভিন্ন রোগ দেখা যায়। তবে আনারস গাছে সবচেয়ে মারাত্মক রোগ হল, ছত্রাকঘটিত কারণে হওয়া Heart rot রোগ। ভেজা জায়গার চারাগাছে এই রোগ দেখা যায়। এই রোগ প্রতিহত করা খুব কঠিন। তবে রোপণের আগে চারাগুলিকে Bordeaux mixture নামক ছত্রাকনাশকে ভিজিয়ে নিলে এই রোগ আক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

রোপণের ১২-১৫ মাস পর আনারস গাছে ফুল আসে। ফল পরিণত হতে আরও ৪-৫ মাস সময় লাগে। অর্থাৎ গাছ রোপণের ১৬-২০ মাস পর থেকেই পরিণত আনারস উৎপাদন শুরু হয়ে যায়। তবে গাছের জাত অনুযায়ী, এক্ষেত্রে তারতম্য ঘটতে পারে। যেহেতু জমির সব গাছে একই সঙ্গে ফুল আসে না, তাই ফসল সংগ্রহ করতে কয়েক মাস সময় লেগে যায়। সাধারণত মে-অগাস্ট মাসে ফসল তোলার সময়। যদিও এরপরও কিছু ফলন তোলা হয়। প্রতি একর জমি থেকে গড়ে ৭-১২ টন আনারস পাওয়া যায়।

ভারতে আনারস একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ফসল। এর স্বাদ ও সুগন্ধের কারণে পৃথিবীর সব দেশেই এই ফল সমাদৃত হয়েছে। পৃথিবীর উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে গত ১০০ বছর ধরে বাণিজ্যিকভাবে আনারসের চাষ হয়ে আসছে। আজ পৃথিবীর অন্যত্রও বাণিজ্যিকভাবে আনারসের চাষ হচ্ছে। ১৯৫২-৫৩ সালে পৃথিবীতে মোট ১৫ লক্ষ টন আনারস উৎপাদন হয়েছিল। ২০১৪ সালে সারা পৃথিবীর উৎপাদন ছিল ২৫.৪ মিলিয়ন টন।

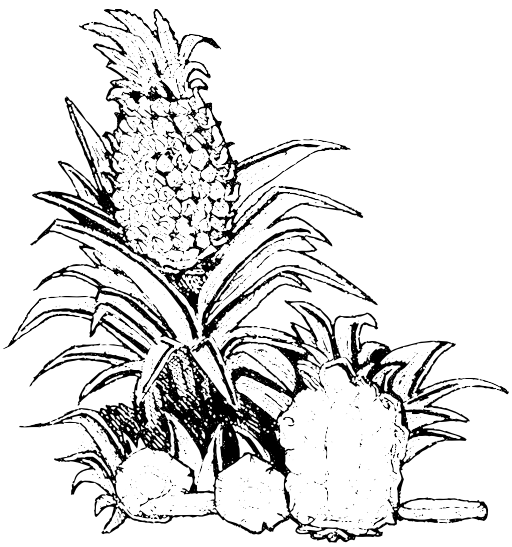
ভারতের আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে আনারস চাষ হয়। উৎপাদনের দিক থেকে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রথমস্থানে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর ও কোচবিহারে ১১.৫ হাজার হেক্টর জমিতে আনারস চাষ হয়, উৎপাদন ২৫ হাজার মেট্রিক টন। অন্যদিকে আসামে ১৪.১ হাজার হেক্টর জমিতে আনারস চাষ হলেও উৎপাদন ১৫.৬ হাজার মেট্রিক টন।

ফসল তোলার পর আনারস গাছের পরিণত শাখাগুলিতে ফুল আসে। এগুলির সঠিক পরিচর্যা করলে একই জমি থেকে ৩-৪ বছর ধরে ফসল পাওয়া যেতে পারে। প্রতি বছর ফসল উৎপাদন ও ফলের আকার ছোট হতে থাকে। শেষে জমি থেকে সমস্ত গাছ কেটে জমি পরিস্কার করে নতুন করে চাষের প্রস্তুতি নিতে হয়।

ফসল তোলার পর তার আকার অনুযায়ী বাছাই করে মুকুট সমেত সাজিয়ে রাখা হয়। কোনও সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছাড়াই ১০-১৫ দিনের মধ্যে স্থানীয় বাজারে বিক্রির জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে আনারসকে ২০ দিন ধরে সংরক্ষণ করতে হলে ১০-১৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ও ৮০-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় রাখতে হয়। এরপর উপযুক্তভাবে প্যাডিং করে খড় বা কাগজের মোড়কে বেঁধে বাক্সে বা ঝুড়িতে করে দূরবর্তী বাজারে পাঠানো হয়। বাতানুকূল পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে এভাবে আনারস বিদেশেও রফতানি করা সম্ভব।

খোসা ছাড়িয়ে চোখ বাদ দিয়ে পাকা আনারস ফল হিসাবে লবণ দিয়ে বা শুধু খাওয়া হয়। ১০০ গ্রাম পাকা আনারসে ২১৮ কিলো ক্যালরি শক্তি, ৮৬ গ্রাম জল, ০.৫ গ্রাম প্রোটিন, ০.২ গ্রাম লিপিড, ১৩.৫ গ্রাম শর্করা ও ০.৩ গ্রাম ফাইবার থাকে। এই পরিমাণ আনারসে ক্যালসিয়াম ১৮ মিলিগ্রাম, আয়রন ০.৩ মিলিগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ১২ মিলিগ্রাম, পটাসিয়াম ৯৮ মিলিগ্রাম ও ১ মিলিগ্রাম সোডিয়াম থাকে। এছাড়া এতে ১০ মিলিগ্রাম অ্যাসকরবিক আসিড, ০.০৯ মিলিগ্রাম থিয়ামিন, ০.০৪ মিলিগ্রাম রাইবোফ্ল্যাভিন, ০.২৪ মিলিগ্রাম নিয়াসিন ও ভিটামিন A ৫৩ IU থাকে।

ফল ছাড়াও আনারস চাটনী, জুস, জেলি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। আনারসের জুস ও ফলের টুকরো টিনজাত করা যায়। তাই খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ইদানীং এর ব্যবহার অতিমাত্রায় বাড়ছে। আনারস থেকে তৈরি সিরাপ সারা পৃথিবীতে ব্যবহৃত হয়। আনারসের ছাল থেকে যে জুস পাওয়া যায় তা ভিনিগার ও মদ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।



গা বমি কাটাতে, গলার ঘা সারাতে আনারসের রস দিয়ে কুলকুচি করলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। ৩ দিন কচি ফলের শাঁস খেলে তা গর্ভপাত ঘটাতে পারে। পাতার রস কৃমি নাশ করতে, মহিলাদের বন্ধ ঋতুস্রাব চালু করতে ও পেট পরিষ্কার রাখতে ব্যবহৃত হয়।

আফ্রিকায় আনারসের কচিপাতা ও পুষ্পমঞ্জরী তরকারি হিসাবে রান্না করে খাওয়ার চল রয়েছে।

টাটকা আনারসে Bromelain নামে উৎসেচক থাকায় তা রান্নার কাজে (মাংস নরম করতে), হজমে সাহায্য করে, আঘাতজনিত যন্ত্রণা ও ফোলা কমাতে ব্যবহৃত হয়।

আনারস গাছের পাতা থেকে শক্ত সাদা সিল্কের মতো সুতো পাওয়া যায়। যা একসময় দক্ষিণ আফ্রিকার উপজাতিদের প্রধানের টুপি তৈরি ও জুতো সেলাইয়ের কাজে ব্যবহার করা হত।

আনারসের জুসের সঙ্গে বালি মিশিয়ে ছুরি ও কৃষি যন্ত্রপাতি ধার দেওয়া যায়। পাকা আনারস ঘোড়ার খাবার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ঘর সাজানোর সামগ্রী তৈরতে আনারসের গাছ ও ফল দুই ব্যবহৃত হয়।

জাত পরিচিতি –

আমাদের রাজ্যের অধিকাংশ জেলাতেই কম-বেশি দেশী জাতের (পাতায় বেশি কাঁটা থাকে ও ফলের আকার ছোট) আনারসের চাষ হয়। তবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উন্নত পদ্ধতিতে মসৃণ পাতাযুক্ত অপেক্ষাকৃত বড় মাপের আনারসের চাষ হচ্ছে। আনারসের এমন কিছু উল্লেখযোগ্য জাত হল, Kew, Giant Kew, Charlotte Rothchild, Queen, Mauritius, Jaldhup and Lakhat, এছাড়া স্থানীয় জাতের আনারসের মধ্যে ইদানীং Haricharanvita-র চাষ হচ্ছে।

তথ্যসূত্র – wikipidea, www.agrifarming.in, www.fruitpidea.com, http://www.kew.org/science



জামরুল

পরিচয় –

জামরুল এর বৈজ্ঞানিক নাম Syzygium samarangense, এটি Myrtaceae পরিবারের Syzygium গণের অন্তর্ভুক্ত ফলের গাছ।

জামরুল ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের গাছ। মূলত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই গাছ বেশি দেখা যায়। ভারত, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনস্, সামোয়া, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশে জামরুল গাছ জন্মায়।

ইংরেজিতে জামরুলকে Champoo (থাই ভাষা থেকে এসেছে) বলে। এছাড়া এই ফলটি Wax Apple, Wax Jambu, Java Apple, Rose Apple, Bell Fruit, Jambu, Malabar Plum ইত্যাদি বিভিন্ন নামেও পরিচিত।

বাংলায় এই ফলকে জামরুল বলা হয়ে। অনেকে অবশ্য জামরুলকে সাদা জামও বলে থাকেন। জামরুল গাছের উচ্চতা প্রায় ২০-২৪ ফুট বা তার বেশিও হতে পারে। গাছের পাতাগুলি লম্বায় ৭-৮ ইঞ্চি এবং চওড়ায় ২ ইঞ্চি হয়।

ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের গাছ হওয়ায় জামরুল গাছের জন্য ভাল তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। ২৫-৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা জামরুল গাছের জন্য উপযোগী। গাছের ভাল বৃদ্ধি এবং উন্নত গুণমানের বেশি ফলন পেতে হলে পর্যাপ্ত জলের অথবা যথেষ্ট বৃষ্টির দরকার হয়।

অল্প অম্ল বা অল্প ক্ষার যুক্ত কাদা মিশ্রিত বেলে মাটি জামরুল চাষের জন্য উপযুক্ত। উপকূল অঞ্চলের সামান্য ক্ষার যুক্ত কাদা মাটিতে ফলের গুণমান ভাল হয়। সারা বছর ধরে মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখতে হয়, তবে যেন কখনই জল জমে না থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বাণিজ্যিকভাবে যে কোনও জমিতে জামরুল চাষের জন্য অবশ্যই মাটি পরীক্ষা করে নিতে হবে।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

বীজের দ্বারা জামরুল গাছের কৃত্রিম প্রসারণ ঘটানো সম্ভব। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাটিং বা গুটিকলম করে জামরুল গাছের কৃত্রিম প্রসারণ করা হয়ে থাকে।

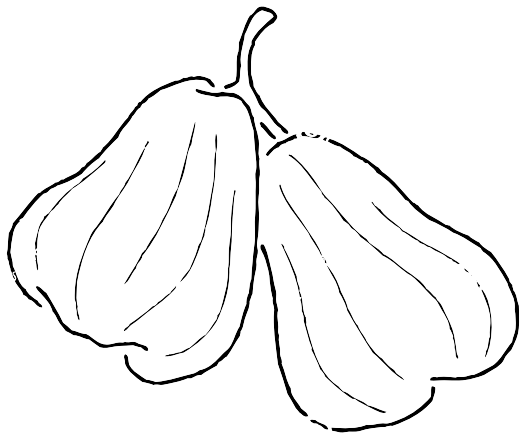
জমিতে চারাগাছ রোপণের আগে ভাল করে জমি তৈরি করে নিতে হবে। দেখতে হবে, জমিতে যেন কোনও আগাছা বা নুড়ি-পাথর জাতীয় অন্য কোনও অবাঞ্ছিত জিনিস না থাকে। এরপর যথাযথভাবে গর্ত করে তাতে চারাগাছগুলি রোপণ করতে হয়। এসময় চারাগুলিতে সেচ দিতে হয়। রোপণের সময় সারি থেকে সারির দূরত্ব ৭-৮ মিটার এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৫-৬ মিটার। এই নিয়মে রোপণ করলে প্রতি হেক্টর জমিতে ২৫০-৩২৫টি গাছ থাকতে পারে।

পরিচর্যা –

জামরুল গাছের বৃদ্ধির সময় যথেষ্ট পরিমাণের জলের প্রয়োজন হয়। মাটির আর্দ্রতা সব সময় বজায় থাকা জরুরি। এরজন্য গাছের নীচে মালচিং পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি এক্ষেত্রে প্রকৃতিক পদার্থ যেমন, খড়, শুকনো পাতা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় তাহলে পরবর্তীকালে তা পচে গিয়ে জৈবসার হিসাবেও কাজ করতে পারে। তবে গাছের গোড়ায় যেন জল না জমে। বিশেষ করে গাছের বৃদ্ধির সময়তো নয়ই। তবে এই চাষের Drip irrigation পদ্ধতির ব্যবহার খুব উপযোগী হতে পারে। তবে জামরুল গাছে কতদিন অন্তর সেচ দিতে হবে তা নির্ভর করে আবহাওয়া ও মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখার ক্ষমতার উপর।

সাধারণত গাছের বয়স যখন ৭ বছর হয়ে যায়, তখন গাছ প্রতি ১৩০০-১৬০০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ফসফরাস পেন্টোক্সাইড(P2O5) এবং K2O দিতে হয়। বছরে প্রতি হেক্টর জমিতে ২.৫-৩.৫ কেজি ইউরিয়া ১৫-২০ টন জৈবসারের (FYM) সঙ্গে প্রয়োগ করা উচিত। প্রথমবার সার প্রয়োগ করতে হয় রোপণের জন্য জমিতে গর্ত করার সময়। বাকি সার সেচ দেওয়ার আগে দিতে হয়। বালি মাটির ক্ষেত্রে জামরুল গাছে অল্প পরিমাণ সার কম সময়ের ব্যবধানে দেওয়া উচিত। আবার কাদামাটির জামরুল গাছে খুব কম রাসায়নিক সারের প্রয়োজন হয়।

হাতের সাহায্যে গাছের গোড়ার আগাছা দমন করা যেতে পারে। মালচিং পদ্ধতি ব্যবহারেও আগাছা দমন হয়ে থাকে।



জামরুল গাছের উচ্চতা নির্দিষ্ট (৪-৫ মিটার) করে রাখতে ডাল ছাঁটাই অত্যন্ত জরুরি। সাধারণত ফসল তোলার পরে বা ফল উৎপাদনের আগে আগে এই ডাল ছাঁটাই করা হয়। সাধারণত বাগানে উৎপাদনের সময় কখন নির্ধারণ করা হচ্ছে, মাটির ধরন কেমন বা মরসুম, এই সমস্ত বিষয়ের উপর ডাল ছাঁটাইয়ের সার্থকতা নির্ভর করে।

রোপণের পরে অর্থাৎ শুরুর দিকে জামরুলের সঙ্গে সাথী ফসলের চাষ করে বাণিজ্যিকভাবে চাষে যুক্ত কৃষকেরা কিছু বাড়তি আয় করতে পারেন। এক্ষেত্রে কিছু সবজি বা অকাষ্ঠল কাণ্ড যুক্ত গাছ লাগানো যেতে পারে।

বাগান করে বাণিজ্যিকভাবে জামরুল চাষের সময় রোগপোকার নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরি। যদি এই গাছে মারাত্মক রোগ বা পোকামাকড়ের আক্রমণ খুব কম। জামরুল গাছে Root rot এবং Mushroom root rot নামক রোগ দেখা যায়। স্থানী উদ্যান প্রতিপালন দফতরের পরামর্শ মেনে এইসব রোগপোকার নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। তবে পোকার কামড় বা সূর্যের আলোয় ফল পুড়ে যাওয়া রুখতে অনেক কৃষক কাগজের ব্যাগের সাহায্যে ফল মুড়ে রাখছেন।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

সাধারণত রোপণের ৩-৫ বছর জামরুল গাছে ফল আসতে শুরু করে। তবে তা জাতের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। গাছ থেকে হাত দিয়েই ফল সংগ্রহ করা ভাল। যেহেতু জামরুল খুব দ্রুত পচনশীল, তাই ফল পাকতে শুরু করলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা গাছ থেকে পেড়ে নিতে হয়।

কোন জাতের জামরুল চাষ করা হয়েছে, মাটির ধরন, সেচ এবং আবহাওয়া বা চাষ পদ্ধতির উপর ফলন নির্ভর করে। সাধারণত জামরুল গাছ ৩০ বছরের বেসি সময় ধরে ফল দেয়। একটি পুর্ণবয়স্ক জামরুল গাছ থেকে গড়ে ৬০০-৭০০টি ফল পাওয়া যেতে পারে। গাছ থেকে পেড়ে ফল হিসাবেই এই সুস্বাদু ফলটি খাওয়া হয়।

ফল হিসাবে জামরুল বেশ পুষ্টিগুণ সম্পন্ন। ১০০ গ্রাম জামরুলে ২৫ কিলো ক্যালরি শক্তি, প্রোটিন ০.৬০ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ৫.৭০ গ্রাম ও ফ্যাট ০.৩০ গ্রাম থাকে। এছাড়া থিয়ামিন (ভিটামিন B1) ০.০২০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন B2 - ০.০৩০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন B3 - ০.৮০০ মিলিগ্রাম এবং ভিটামিন C - ২২.৩ মিলিগ্রাম রয়েছে। পাশাপাশি এই পরিমাণ জামরুলে ক্যালসিয়াম ২৯ মিলিগ্রাম, আয়রন ০.০৭ মিলিগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ৫ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ৮ মিলিগ্রাম, পটাশিয়াম ১২৩ মিলিগ্রাম এবং ০.০৬ মিলিগ্রাম জিঙ্ক পাওয়া যায়।

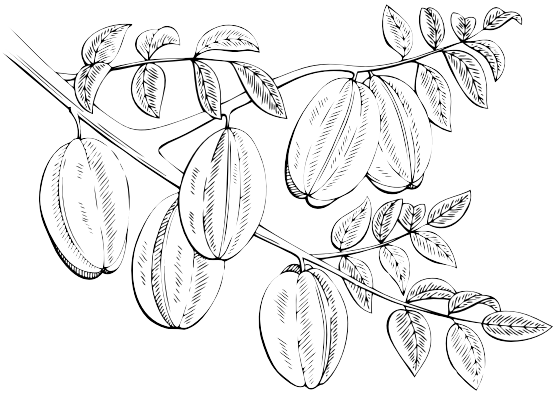
এমন পুষ্টিগুণের কারণে এই ফল আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব উপকারী। জামরুলে হজমশক্তি বাড়ায় ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে। এই ফল খেলে হৃদরোগের সম্ভাবনা কমে। জামরুলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন- C থাকায় শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তিকে বৃদ্ধি করে। কয়েক ধরনের ক্যানসার প্রতিরোধে জামরুল খুব উপকারী। প্রতিদিন জামরুলের রস খেলে লিভার ও কিডনি ভাল থাকে। এই গাছের ছাল ডায়াবেটিস প্রতিরোধেও সক্ষম। চোখের নিচের কালো দাগ দূর করতেও জামরুলের ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। জামরুল কিছুটা হলেও পুষ্টিহীনতাকে পূরণ করতে পারে।

বর্তমানে এই ফলের বাজার ও চাহিদা দুই-ই বেড়েছে। তাই সঠিক পরিচর্যায় বাণিজ্যিকভাবে জামরুল চাষ বেশ লাভজনক হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে চড়া রোদে হওয়া জামরুলের স্বাদ মিষ্টি হয়। কিন্তু বৃষ্টির সময় যে জামরুল হয় তা অনেকটাই পানসে স্বাদের হয়ে থাকে। তবে হালকা লাল রঙের জামরুল খেতে আপেলের মতো মিষ্টি হয়।

জাত পরিচিতি –

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চাষ হওয়া জাতগুলি প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত। এই ভাগ দুটি হল, Black Pearl ও Green Pearl এই দুই ভাগের মধ্যে যে জাতগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি হল, Pink, Big Fruit, Thub thim Chan, Indonesian Big fruit, Beg Red এবং Vietnam white এই জাতগুলির মধ্যে Pink ও Big Fruit জাতের জামরুল সবচেয়ে বেশি (৮০%) চাষ হয়। তবে সঠিক জাত নির্বাচনের জন্য চাষের আগে অবশ্যই স্থানীয় উদ্যান প্রতিপালন দফতরের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

তথ্যসূত্র – www.agrifarming.in, wikipedia



কামরাঙা

পরিচয় –

কামরাঙার বিজ্ঞানসম্মত নাম Averrhoa carambola, এটি Oxalidaceae গোত্রের এবং Averrhoa গণের মাঝারি উচ্চতার একটি ফল গাছ।

কামরাঙা বাইরে থেকে আসা ক্রান্তীয় রসালো প্রকৃতির একটি ফল। এর আদি জন্মস্থান ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ চিন। যদিও কয়েকশো বছর ধরে ভারতীয় উপমহাদেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এর চাষ হয়ে আসছে। কামরাঙা ওইসব এলাকায় স্থানীয় পছন্দের তালিকায় থাকলেও সম্প্রতি পূর্ব-এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড অংশে এই ফল বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। পাশাপাশি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপের বিশেষ করে তাহিতি, নিউ ক্যালিডোনিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, হাওয়াই এবং গুয়াম অঞ্চলেও কামরাঙা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ চিন, তাইওয়ান এবং ফ্লোরিডায় বাণিজ্যিকভাবে কামরাঙার চাষ করা হয়। মূলত এই ফল নিকারাগুয়া, কোস্টারিকা, পানামা, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, পেরু, ব্রাজিল, জ্যামাইকা, হাইতি, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, পুয়ের্তো রিকো, ত্রিনিদাদ, মেক্সিকো, গায়ানা এবং আফ্রিকা বিভিন্ন অংশে অধিক পরিমাণে জন্মায়।

ইংরেজিতে কামরাঙাকে Chinese gooseberry বা Carambola বলে। হিন্দি ও গুজরাটিতে এই ফল কামরাখ, মারাঠী ও কোংকণীতে কারামবাল, কন্নড়ে কাপারাখসি হানু, মালায়লমে চতুরাপুল্লি বা ভাইরাপুল্লি, তামিলে থাম্বারাথাম, তেলেগুতে আম্বানামকায়া, অসমীয়াতে করদোই বা রহদোই, ওড়িয়াতে কারমাঙ্গা এবং বাংলায় কামরাঙা নামে পরিচিত। কামরাঙা একটি চিরসবুজ গাছ, যা লম্বায় ১৫-২৫ ফুট হয়। ঘন ডালপালা আচ্ছাদিত, পাতা যৌগিক প্রকৃতির ১ ইঞ্চি লম্বা। গাছের ছাল মসৃণ ও কালচে রঙের। ফলগুলি উপবৃত্তাকার আকৃতির গভীর খাঁজযুক্ত হয়। সাধারণত এই ফল এধরনের ৫টি অনুদৈর্ঘ্য ঢাল বিশিষ্ট হয়। ফলগুলি দৈর্ঘ্যে প্রায় ইঞ্চি (৫.১- ১৫.২ সেমি) এবং ৩-৬ ইঞ্চি ব্যাসের হয়। কিন্তু ব্যতিক্রমীভাবে কখনও কখনও ৪টি বা ৮টি বা তার চেয়েও বেশি খাঁজ থাকতে পারে। ক্রুশ আকৃতির ভাগের কারণে এটি দেখতে অনেকটা তারার মতন। কামরাঙার ত্বক পাতলা, মসৃণ, ও মোমের মতো হয়। ফলের রং কাঁচা অবস্থায় সবুজ এবং পাকলে হলুদ হয়ে যায়। কোনও কোনও গাছ থেকে একাধিকবার বা সারা বছর ধরেই ফল পাওয়া যায়। প্রতিটি ফলে ১০-১২টি সমতল হালকা বাদামি বর্ণের বীজ থাকতে পারে। বীজগুলি প্রস্থে ০.২৫-০.৫ ইঞ্চি (০.৬৪-১.২৭ সেমি) এবং নরম ও চটচটে খোসায় আবদ্ধ। ফল থেকে বীজগুলি অপসারণ করা হয়ে গেলে অল্পদিনের মধ্যেই তার অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।

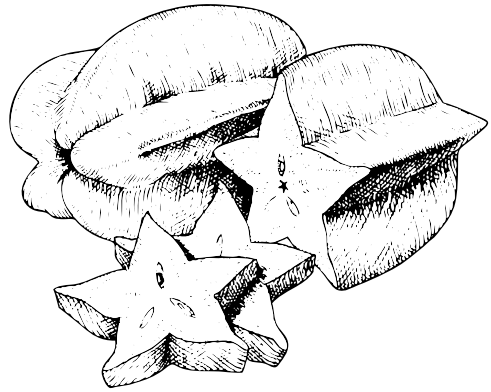
পাকানোর সুযোগ দেওয়া হলে চুকা বৈচিত্র্যের 'গোল্ডেন স্টার', ফলও মিষ্টি হতে পারে। কামরাঙা গরম আবহাওয়ায় আর্দ্র মাটিতে ভাল জন্মায়। ভারতে ১২০০ মিটার অবধি উঁচু জায়গায় পাহাড়ের ঢালে কামরাঙার চাষ করা যেতে পারে। সারা বছর ধরে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত এই গাছের বৃদ্ধি ও ভাল ফলনের জন্য উপযোগী। বিভিন্ন ধরনের মাটিতে এই গাছ হতে পারে। যদিও জৈবসারে সমৃদ্ধ ও জল নিকাশীর সুবন্দোবস্তযুক্ত গভীর মাটিতে কামরাঙার ফলন সবচেয়ে ভাল হয়। অম্ল ও ক্ষারীয়, উভয় মাটিতে এই গাছ বেড়ে উঠতে পারে, তবে এক্ষেত্রে PH -এর মাত্রা ৫.৫-৬.৫ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

যদিও কখনও কখনও বীজ থেকেই এই গাছের প্রসারণ হয়ে থাকে, তবুও এক্ষেত্রে গ্রাফটিং, বাডিং ও লেয়ারিং পদ্ধতিকেই সর্বদা অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। একই জাতের গাছ উৎপাদনের স্বার্থেই এমনটা করা হয়। বীজ থেকে চারা তৈরির ক্ষেত্রে তা দ্রুত মাটিতে বপন করতে হয়। কারণ কামরাঙা বীজের অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষমতা বেশিদিন বজায় থাকে না। এক্ষেত্রে তুলনায় শক্তবীজগুলিকে প্রথমে ভাল করে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিতে হয়। এরপর সেগুলিকে প্লাস্টিকের ব্যাগে বপন করা হয়। পরে চারাগুলিকে মূল জমিতে রোপণ করতে হয়। গ্রাফটিং বা বাডিং-এর জন্য আগামীতে এর rootstock ব্যবহারের পরিকল্পনা থাকলে জমিতে কমপক্ষে এক বছর বয়সের চারাই রোপণ করতে হবে।

সমতল জমিতে বর্গাকার বা আয়তকার গর্ত করে এবং পাহাড়ি জায়গায় কন্টুর পদ্ধতিতে চারা রোপণ করা হয়। চারা রোপণের আগে জমিতে ১মিটার X ১মিটার X ১মিটার আকারের গর্ত করতে হয়। তারপর ১৫-২০ কেজি জৈবসার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি এবং ১০০ গ্রাম জিপসাম ভাল করে মিশিয়ে ওই গর্ত ভরাট করে ১০-১৫ দিন ওইভাবে রেখে দিতে হয়। কামরাঙার চারা বা কলম রোপণের উপযুক্ত সময় জৈষ্ঠ্যের মাঝামাঝি থেকে ভাদ্রের মাঝামাঝি। তবে সেচের ব্যবস্থা ভাল থাকলে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসেও রোপণ করা যেতে পারে। গর্তের মধ্যখানে চারা বসিয়ে গোড়ার মাটি একটু উঁচু করে দিতে হবে। চারা লাগিয়ে একটি শক্ত কাঠিতে তা বেঁধে দিতে হবে। সাধারণত রোপণের দুটি চারার মাঝের দূরত্ব ৮ মিটার X ৮ মিটার রাখা উচিত।

পরিচর্যা –



মূল জমিতে চারা রোপণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম সেচ দিতে হয়। কম চারাগুলিতে নিয়মিত সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয়, যতদিন না ওই চারাগুলি মাটিতে ভাল করে দাঁড়িয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে গরম আবহাওয়া থাকলে প্রয়োজন বিচার করে সেচ বাড়াতে হয়। বর্ষাকালে এই গাছে কোনও সেচ দেওয়ার দরকার পড়ে না। ভারী বৃষ্টি বন্যার সময় নিকাশী ব্যবস্থা ভাল রাখতে হবে। কারণ মাটিতে জল জমে গেলে এই গাছের পক্ষে ক্ষতিকর।

কামরাঙা গাছের জন্য ভাল জৈবসারের প্রয়োজন হয়। গাছ প্রতি ৫০ কেজি জৈবসার প্রয়োগ করলে তা ভাল জাতের ফল ও ফলন দুই-এরই সহায়ক হয়। তবে এই গাছে সার প্রয়োগের নির্দিষ্ট কোনও পরিমাণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। যদিও নাইট্রোজেন ও ফসফেট জাতীয় সার এই গাছের বৃদ্ধির পক্ষে উপযুক্ত। মূলত জমির উর্বরতা ও গাছের বয়স বিচার করে এইসব সারের পরিমাণ ঠিক করা হয়। এবিষয়ে প্রয়োজনে স্থানীয় কৃষি অথবা উদ্যানপালন দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। কামরাঙা চাষের জন্য একাধিকবার জমির আগাছা দমন করার প্রয়োজন হয়। এরজন্য স্থানীয় কৃষি দফতরের পরামর্শ মেনে যথাযথ আগাছা দমনকারী ওষুধও প্রয়োগ করা যেতে পারে। গাছের বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করতে ডাল ছাঁটাই করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনও পদ্ধতি নেই। কামরাঙা চাষের সময় সাধারণত leaf spot, black spot, anthracnose, flyspeck, root rot ও algal রোগের প্রকোপ দেখা যায়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরত্ব –

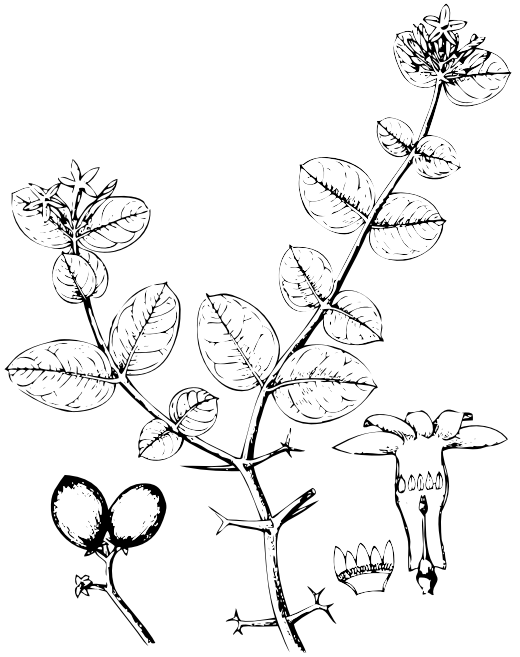
সাধারণত সারা বছর ধরেই কামরাঙা গাছে ফল থাকতা পারে। তবে সবচেয়ে বেশি ফল পাওয়া যায় জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে। গ্রাফটিং করে তৈরি চারার গাছ থেকে ১-২ বছরে ফল পাওয়া যায়। অন্যদিকে বীজ থেকে তৈরি গাছে ফল আসতে প্রায় ৪ বছর সময় লেগে যায়। ফলের রং সবুজ থেকে হলুদ হয়ে গেলে তা তোলা যেতে পারে। সব সময় ফল হাত দিয়েই তোলা ভাল। গাছের বয়স ও তার জাতের উপর ফলন নির্ভর করে। তবে পূর্ণবয়স্ক গাছ থেকে গড়ে ৮০-৯০ কেজি ফলন পাওয়া সম্ভব। গাছ থেকে পেড়ে পাতলা ত্বকসহ কামরাঙা ফল হিসাবে খাওয়া যায়। ফল কচকচে ও রসালো। ফলে আঁশ নেই এবং এই ফল অনেকটা আঙুরের মতো। জাতের নিরিখে কামরাঙা টক বা টক-মিষ্টি, উভয় স্বাদের হতে পারে। এক কথায় এই ফলের স্বাদ আপেল, আঙুর ও লেবু জাতীয় ফলের স্বাদের সংমিশ্রণ বলা যেতে পারে। কামরাঙা পাকার পরপরই খেতে সবচেয়ে ভাল লাগে, আবার বেশি পেকে গেলে স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের দেশের অনেক জায়গায় কামরাঙার রস দিয়ে সরবত তৈরি করা হয়। পাকা কামরাঙা অনেক সময় রান্না করেও খাওয়া হয়। আচার বা চাটনী তৈরিতেও এই ফল ব্যবহার হয়। দক্ষিণ এশিয়াতে আপেল ও চিনি দিয়ে কামরাঙা রান্না করে খাওয়ারও চল রয়েছে। চিনে মাছ দিয়ে কামরাঙা রান্না করা হয়। অস্ট্রেলিয়াতে সবজি হিসেবে রান্না করা হয়, আচার বানানো হয়। জামাইকাতে কামরাঙা শুকিয়ে খাওয়া হয়।

এই ফলে অক্সালিক অ্যাসিড থাকায় অম্ল স্বাদের হয়। কামরাঙার প্রচুর পুষ্টিগুণসম্পন্ন একটি ফল। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন C, A ও B-complex রয়েছে। কামরাঙা প্রাকৃতিক অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর। ১০৮ গ্রাম কামরাঙায় ৩৩ কিলো ক্যালরি শক্তি, ১.১২ গ্রাম প্রোটিন, ৭.২৭ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ৩ গ্রাম খাদ্যতন্তু, ০.৩৬ গ্রাম ফ্যাট, ৩ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ০.০৯ মিলিগ্রাম আয়রন, ১৩ মিলিগ্রাম ফসফরাস, ১৪৪ মিলিগ্রাম পটাসিয়াম থাকে। এছাড়া বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে। এই ফল অন্ত্রের ক্যানসার প্রতিরোধে, কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমাতে, বহুমূত্র রোগ ও উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে এবং অর্শ্বরোগের ক্ষেত্রে খুবই উপকারী। কামরাঙা বিষনাশক হিসাবে কাজ করে, ত্বককে ভাল রাখে, রক্তক্ষরণ বন্ধ করে, পেটের ব্যথার উপশমে কামরাঙা বেশ উপকারী, মুখে রুচি ফেরায় ও হজমশক্তি বাড়ায়, জলবসন্ত ও বক্রকৃমির নিরাময়ে এই গাছের পাতা ও ডগার গুঁড়ো খাওয়া যেতে পারে। এছাড়া সর্দিকাশি ও জ্বরে শুকনো কামরাঙা খুবই উপকারী। খাওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত কামরাঙার রস ত্বকে ব্যবহার করা যায়। যা ত্বকের তারুণ্যকে ধরে রাখে এবং ত্বক দাগমুক্ত রাখে, চোখের নিচের ফোলাভাব, বয়সের ছাপকেও দূর করে।

জাত পরিচিতি –

ভারতে চাষ করা কামরাঙার উন্নত জাতের কোনও উল্লেখ নেই। কিন্তু এদেশে মিষ্টি ও টক স্বাদের কামরাঙা পাওয়া যায়। হাওয়াইয়ে, তাইওয়ানে মিষ্টি স্বাদের উন্নত জাতের কামরাঙা পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র - https://en.wikipedia.org/wiki/Averrhoa_carambola, https://www.healthbenefitstimes.com/Carambola/, www.agrifarmin.in



করমচা

পরিচয় –

করমচার বিজ্ঞানসম্মত নাম Carissa carandas, এটি Apocynaceae গোত্রের উদ্ভিদ।

করমচা সাধারণত হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের ৩০-১৮০০ মিটার উঁচু জমি, শিবালিক পর্বতমালা এবং পশ্চিমঘাট পর্বত এলাকার স্বাভাবিক উদ্ভিদ। এছাড়া নেপাল, আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কার কিছু বনাঞ্চলে এই উদ্ভিদ দেখা যায়। উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে এই গাছ খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ভারতে খুব সামান্য পরিমাণে এই গাছ রাজস্থান, গুজরাট, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরপ্রদেশে দেখা যায়।

করমচা গুল্ম শ্রেণীর উদ্ভিদ হলেও এই গাছ বেশ শক্ত। এই গাছ লম্বায় প্রায় ২.৫-৩ মিটার দীর্ঘ হয়, পাশেও ২-৩ মিটার জায়গা জুড়ে করমচা গাছ বিস্তৃত থাকে। গাছের শাখায় মোটা ও সোজা কাঁটা থাকে। এর ফল বেরী প্রকৃতির। করমচা দেখতে উজ্জ্বল লালচে বর্ণের। অনেকটা চেরি ফলের মতো।

ইংরেজিতে এই ফলকে Bengal currant বা Christ's thorn বলে। তেলেগুতে ভাক্কায়া, তামিলে কালিয়াক্কাই, কন্নড়ে কাউলি বা হান্নু, মালায়লমে কেরেন্ডা, মারাঠিতে কালিমইনা, আসমীয়াতে করজা টেঙ্গা, সংস্কৃতে করামরদকা এবং বাংলায় করমচা নামে পরিচিত।

যে কোনও মাটিতে করমচা গাছ জন্মাতে পারে। তবে বেলে-দোঁয়াশ বা হালকা মাটি এই গাছের পক্ষে উপযুক্ত। এই গাছ খরা সহ্য করতে পারে এবং উন্মুক্ত বা আংশিক ছায়াতে চাষ করা যায়।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

সাধারণভাবে বীজ থেকে এই গাছের প্রসারণ ঘটানো যায়। এছাড়া অঙ্গজ জনন পদ্ধতিতে বাডিং এবং ইনারচিং করেও এর বিস্তার সম্ভব। কাটিং করেও এই গাছের প্রসারণের ক্ষেত্রে সফলতা পাওয়া গেছে।

বিভিন্ন পদ্ধতিতে কলম করে এই গাছের চারা তৈরি করে বিস্তার ঘটানো সম্ভব।

বর্ষা শুরুর প্রথম বৃষ্টিতে এই গাছের চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। এই সময় চারা লাগালে খুব বেশি যত্নের প্রয়োজন হয় না।

চারা রোপণের ১৫-২০ দিন আগে জমিতে ভাল করে চাষ দিয়ে চারদিকে ২ ফুট দৈর্ঘ্যের গর্ত তৈরি করতে হবে। প্রতিটি গর্তে ১০-১৫ কেজি গোবরসার বা খামারজাত সার, ৫০০ গ্রাম কাঠের ছাঁই, ২৫০ গ্রাম হাড়ের গুঁড়ো মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ভরাট করে হবে। এরপর গর্তের মাঝখানে চারা রোপণ করে গোড়ার মাটি ভালভাবে চেপে দিয়ে সেচ দিতে হবে। রোপণের সময় পাশাপাশি দুটি চারার মধ্যে ৬.৬৭-১০ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

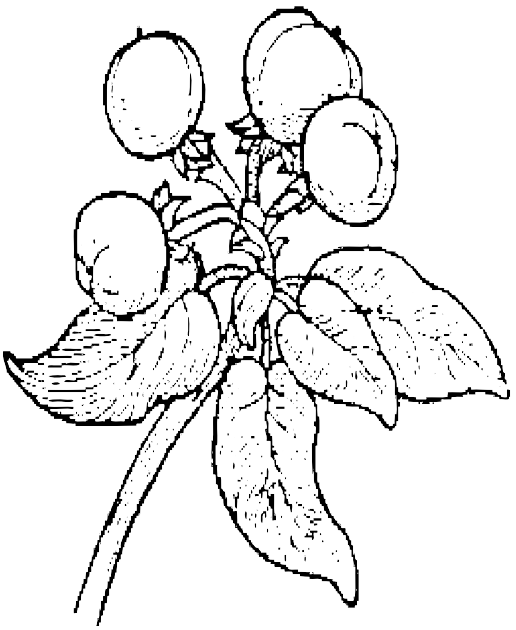
পরিচর্যা –

গাছের ফল সংগ্রহ শেষ হয়ে গেলে ঘন ডালপালা ছেঁটে দিতে হয়। বর্ষার আগে গোড়ায় মাটি দিয়ে জায়গাটা উঁচু করে দিতে হয়, যাতে গাছের গোড়ায় বৃষ্টির জল না জমতে পারে। গোড়ায় জন্মানো আগাছে নির্মূল করতে মাঝেমধ্যে সেখানকার মাটি কুপিয়ে দিতে হয়।

করমচা গাছে সাধারণত সার দেওয়ার প্রচলন খুব একটা নেই। তবে ফলন বেশি পেতে হলে এবং গুণগত মান ভাল রাখতে হলে জমির পরিমাণ বিচার করে বছরের বিভিন্ন সময় করমচা গাছে নির্দিষ্ট অনুপাতে গোবর সার, ইউরিয়া, T.S.P. (ট্রিপল সুপারফসফেট) এবং পটাশ সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ছোট অবস্থায় চারায় সার দেওয়ার পর এবং ফুল আসার পর এই গাছে সেচ দিতে হয়। তবে গাছ বড় হয়ে গেলে সেচের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। তবে গ্রীষ্মের সময় ১৫ দিন অন্তর একবার সেচ দিলে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –



বীজের থেকে তৈরি চারা রোপণের দু'বছর পর থেকে ফল দিতে শুরু করে। তবে কলম থেকে যে চারা তৈরি হয় রোপণের পরের বছরই সেই গাছে ফল ধরে। সব ফল একসঙ্গে পাকে না। তাই সারা বছর কমবেশি ফল পাওয়া যায়। তবে বর্ষাকালেই করমচা গাছে ফল সবচেয়ে বেশি হয়। সাধারণত মার্চ মাসে এই গাছে ফুল আসে। উত্তর ভারতে জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে এই ফল পাকে। পাকা ফল যখন ডাল থেকে সংগ্রহ করা হয় তখন তা থেকে এক ধরনের সাদা রঙের আঠার মতো পদার্থ বের হয়।

উপযুক্ত আবহাওয়ায় একটি পূর্ণবয়স্ক গাছ থেকে বছরে ৪০-৫০ কেজি ফল পাওয়া যায়।

গাছ থেকে পরিণত ফল সংগ্রহ করে শুধু খাওয়া যেতে পারে। এছাড়া আচার তৈরিতে এই ফল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। পাশাপাশি জ্যাম, জেলি, সিরাপ ও চাটনী তৈরিতে করমচা ব্যবহার হয়ে থাকে। ইদানীং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে এই ফলের যথেষ্ট ব্যবহার হচ্ছে।

করমচায় প্রচুর আয়রন থাকে। তাই রক্তাল্পতার চিকিৎসায় অনেক সময় এই ফল ব্যবহৃত হয়। এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন – C থাকায় স্কার্ভি রোগের প্রতিরোধে উপকারী।

করমচা গাছের মূল প্রচুর শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে থাকে। তাই এই গাছ মাটির ভূমিক্ষয় রোধে সহায়ক।

জাত পরিচিতি –

congesta ও paucinervia নামে, করমচা ফলের দুটি জাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ফল সাধারণত টক হয়, তবে বর্তমানে মিষ্টি করমচা ফলও পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র – http://en.wikipedia.org/wiki/Carissa_carandas, www.agrifarming.in, www.digitalkrishi. dae.gov.bd



বেল

পরিচয় –

বেল গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Aegle marmelos, এটি Rutaceae গোত্রের উদ্ভিদ।

বেল গাছের আদি বাসস্থান ভারতে। দক্ষিণ ভারতের পূর্বঘাট পর্বতমালা থেকে মধ্য ভারত, এই গাছের জন্মস্থান বলে মনে করা হয়। আমাদের দেশের শুষ্ক পাতাঝরা জঙ্গলে, পার্বত্য জঙ্গলে প্রচুর বেল গাছ জন্মাতে দেখতে পাওয়া যায়। মধ্য ও নিম্ন হিমালয় অঞ্চল ছাড়াও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ও কাশ্মীরে বেল গাছ জন্মায়। খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০ সালেও বেল গাছের উল্লেখ পাওয়া গেছে। চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ৬২৯ খ্রীস্টাব্দে যখন ভারতে এসেছিলেন তখন তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির প্রাঙ্গণে বেল গাছ দেখে গিয়েছিলেন এবং এই দেশে বেলের ধর্মীয় গুরুত্বের বিষয়টি লক্ষ্য করেছিলেন। বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের বিভিন্ন জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে বা মানিয়ে নিয়ে বেল গাছ বেঁচে থাকতে পারে। ডায়রিয়া প্রতিরোধ করতে নেপাল, মায়ানমার, তিব্বত, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনস্, জাভা, সুমাত্রা ত্রিনিদাদ, মিশর প্রভৃতি দেশে পর্তুগীজ ও ইংরেজ বণিকরা এই বেল গাছ রোপণ করেছিলেন। বর্তমানেও সারা পৃথিবীতে রোপণের মাধ্যমে বেলগাছ বিস্তারিত হচ্ছে। ইংরেজিতে বেলকে Wood Apple বলা হয়। কারণ এই ফলের খোসা কাঠের মতো শক্ত। বাংলায় ফলটির ব্যাপক কদর দেখে ব্রিটিশরা একে Bengal quince নাম দিয়েছিলেন। সংস্কৃতে এর নাম বিল্ব এবং বাংলায় বেল নামে পরিচিত।

বেল গাছ একটি পর্ণমোচী শ্রেণীর দ্বিবীজপত্রী বহুবর্ষজীবী বৃক্ষ। এর বৃদ্ধির হার খুব কম। উচ্চতায় গাছটি ১২-১৫ মিটার হয়। গাছের পাতাগুলি ত্রিফলক যৌগিক প্রকৃতির এবং একান্তরভাবে সজ্জিত থাকে। তবে বেল গাছে একফলক ও দ্বিফলক পাতাও দেখা যায়। পাতাগুলি ৪-১০ X ২-৫ সেমি আকারের হয়। পাতার কক্ষে ২টি কাঁটা থাকতে পারে। ফুলগুলি গাছের ডালে গুচ্ছাকারে জন্মায়। ফুলে ও পাতায় সুগন্ধ থাকে। ফুলে ৪টি পাপড়ি ও কম-বেশি ৫০টি পুংকেশর থাকে। ফলগুলি গোলাকার, ডিম্বাকার বা আয়তকার আকৃতির হয়। ফলের বাইরের আবরণ শক্ত হয় এবং ভিতরের অংশে ৮-২০টি আঠাপূর্ণ প্রকোষ্ঠ থাকে। ফলের শাঁসে বীজগুলি অবস্থান করে।

সমুদ্রতল থেকে ১২০০ মিটার উচ্চভূমিতে বেল গাছ জন্মাতে দেখা যায়। যদিও মাটি থেকে ৪০০০ ফুট উঁচু জমিতেও এই গাছ হয়। গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ ৪৮.৮৯ ডিগ্রী এবং শীতকালে সর্বনিম্ন -৬.৬৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করে এই গাছ বেঁচে থাকতে পারে।

জল নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্তযুক্ত যে কোনও সমৃদ্ধ মাতিতেই এই গাছ জন্মাতে পারে। ভারতে যে সমস্ত জায়গায় অন্য কোনও গাছ জন্মায় না, সাধারণত সেই সব এলাকায় স্বাভাবিকভাবে বেল গাছে বিস্তার ঘটে।

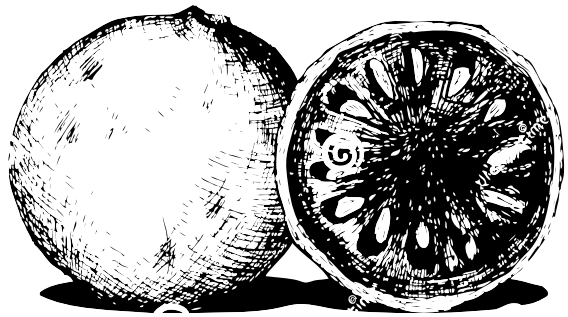
কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

সাধারণত নার্সারীতে বীজ থেকে চারা তৈরি করে নির্দিষ্ট জমিতে রোপণ করে বেল গাছের বিস্তার ঘটানো হয়। বীজ থেকে তৈরি চারার গাছে নানান বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে ফলের আকার, ফলের শাঁসের পরিমাণ ও গুণগত মান এবং বীজের সংখ্যা বিভিন্ন হয়। তাই উন্নতজাতের প্রসারণের জন্য অঙ্গজ জনন পদ্ধতিতে এর প্রসারণ ঘটানোই সবচেয়ে ভাল। ১৯৫৪ সালে এক পরীক্ষায় দেখা গেছে, একমাস বয়সী ডালের সঙ্গে ২ বছর বয়সী চারার গাছের সঙ্গে বাডিং করে ৮০%-৯৫% শতাংশ সফলতা পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এছাড়া অঙ্গজ জনন পদ্ধতিতে তৈরি চারার গাছে ফল আস্তে ৬-৭ বছর সময় লাগে। অন্যদিকে বীজ থেকে চারা তৈরি করে রোপণ করলে সেই গাছে ৫ বছরে ফল আসে। তবে বেল গাছের সম্পূর্ণ ফলন পেতে ১৫ বছর সময় লেগে যায়।

চারা তৈরির পর তা নির্দিষ্ট জমিতে রোপণ করতে হয়। ফল বাগানের ক্ষেত্রে রোপণের সময় দুটি গাছের মধ্যে ২৫-৩০ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হয়।

পরিচর্যা –

বেল গাছে সাধারণত খুব বেশি পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না। সামান্য সেচ ও সার প্রয়োগই এক্ষেত্রে যথেষ্ট।



কম বয়সের গাছের ক্ষেত্রে নিয়মিত জলসেচের প্রয়োজন হয়। শীতে একমাস অন্তর জল দিলে গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধি ভাল হয়।

তবে গাছে ফল ধরে গেলে যদি তা ছায়া পায় তবে গ্রীষ্মকালেও জল দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু গাছে নতুন পাতা আসার সময় অবশ্যই সেচের প্রয়োজন হয়।

বেল শক্ত ধরনের একটি ফল। এখনও অবধি বেল গাছে তেমন কোনও রোগপোকার আক্রমণের কথা জানা যায়নি। তবে বাণিজ্যিকভাবে চাষের ক্ষেত্রে অনেক সময় Shooty mold–এর আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। জলে গুলে যেতে সক্ষম সালফার, ক্লোরপাইরিফস বা মিথাইল প্যারাথিয়ন ও গাম অ্যাকাসিয়ার যথাক্রমে ০.২%, ০.১% ও ০.৩% অনুপাতে মিশ্রিত করে গাছে স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়। যখন গাছে নতুন পাতা আসে সে সময় পাতা খাওয়া Catepillar পোকা আক্রমণ দেখা যায়। ০.১% থিয়ডিন ব্যবহার করে এই আক্রমণ প্রতিহত করা যেতে পারে। এছাড়া ফল ফেটে যাওয়া বা ফল মাটিতে ঝরে পড়া, এই দু'ধরনের অস্বাভাবিকতা বেল গাছে লক্ষ্য করা যায়। ভাল সেচব্যবস্থা, হাওয়া প্রতিরোধকারী বেড়া এবং ০.১% বোরাক্স ফুল ফোটার পর ও গাছে ফল ধরার পর করে এক্ষেত্রে উপকার পাওয়া সম্ভব।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

বেল গাছে নতুন পাতা আসার পর ভারতে সাধারণত এপ্রিল-মে মাসে বেল গাছে ফুল আসে। এর ১০-১১ মাস পর অর্থাৎ পরের বছর মার্চ-জুন মাসে বেল পাকে। কোনও মরসুমে একটি বেল গাছ থেকে গড়ে ১৫০-২০০টি ফল পাওয়া যায়। ভাল জাতের গাছের ক্ষেত্রে এই ৪০০ পর্যন্ত হতে পারে। তবে একটি গাছ থেকে মরসুমে সর্বোচ্চ ৮৮০টি বেলও পাওয়া সম্ভব।

ফলের রং হলদেটে সবুজ হলে তা গাছ থেকে সংগ্রহ করে ৮দিন রেখে দিতে হয়। এরপর ফলের সবুজ ভাবটা চলে গেলে তা থেকে কাণ্ডটি আলাদা করা যেতে পারে। সাধারণত পরিণত হওয়ার ২-৩ মাস আগেই ফল সংগ্রহ করতে হয়। বেলকে এরপর ১৮-২৪ দিন ধরে ১০০০-১৫০০ ppm ইথরেল (ethrel) সহযোগে ৩০ ডিগী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কৃত্রিমভাবে পাকাতে হয়। তবে পরিচর্যার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হয়, কোনওভাবেই যেন ফলের শক্ত খোলাটি আঘাত পেয়ে ফেটে না যায়।

সাধারণভাবে ৩০ ডিগী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ২ সপ্তাহ ধরে এবং ৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৪ মাস যাবৎ এই ফলকে সংরক্ষণ করে রাখা যেতে পারে।

বেলের ১০০ গ্রাম শাঁসে জল ৫৪.৯৬-৬১.৫ গ্রাম, প্রোটিন ১.৮-২.৬২ গ্রাম, ফ্যাট ০.২-০.৩৯ গ্রাম, শর্করা ২৮.১১-৩১.৮ গ্রাম, অ্যাশ ১.০৪-১.৭ গ্রাম, ক্যারোটিন ৫৫ মিলিগ্রাম, থিয়ামিন ০.১৩ মিলিগ্রাম, রাইবোফ্ল্যাভিন ১.১৯ মিলিগ্রাম, নিয়াসিন ১.১ মিলিগ্রাম, অ্যাসকরবিক অ্যাসিড ৮-৬০ মিলিগ্রাম ও ২.১১ মিলিগ্রাম টারটারিক অ্যাসিড থাকে।

বেলকে বলা হয় শ্রীফল। কারণ পূজা-অর্চনায় হিন্দুরা বেলের পাতা ও ফল ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া বেল কাঠও তাদের কাছে পবিত্র। তাই কখনও এই কাঠ পুড়িয়ে রান্না করা হয় না। শিবের আরাধনায় হিন্দুরা ত্রিনয়নের প্রতীক হিসাবে বিল্বপত্র (বেল পাতা) ব্যবহার করেন।

গাছ থেকে পেড়েই এই ফল খাওয়া যায়। এছাড়া বেলের পানা (সরবত) অত্যন্ত সুস্বাদু একটি পানীয়। জ্যাম, জেলি তৈরিতেও এই ফল ব্যবহৃত হয়। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বর্তমানে এই ফলের ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। বেলের শাঁস জামাকাপড় পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী। ঘরোয়া আঠা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, যা গহনা শিল্পে, সাবানের বিকল্প হিসাবে, বাড়ির দেওয়াল জল নিরোধক করতে, বাড়ি তৈরির সময় সিমেন্টের সঙ্গে মিশিয়ে এবং চিত্রশিল্পীরা জল রঙের সঙ্গে মিসিয়ে ব্যবহার করে থাকেন। ফলের খোলার তৈলগ্রন্থি থেকে প্রাপ্ত তেল হেয়ার অয়েলকে সুগন্ধিত করতে ব্যবহৃত হয়।

অনেকে মনে করেন, প্রতিদিন একটি করে বেল পাতা ঘি দিয়ে ভেজে চিনি সহ খেলে স্মৃতিশক্তির উন্নতি ঘটে। এছাড়া এই পাতা ও তার শুকনো অংশ পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয়। থাইল্যান্ডে বেল গাছের পাতা ও কাণ্ডকে সবজি হিসাবে এবং ইন্দোনেশিয়ায় মরসুমি খাওয়ার হিসাবে খাওয়া হয়।

বেলের ফুলের পাতন ঘটিয়ে এক ধরনের সুগন্ধি পাওয়া যায়।

এই গাছের কাঠ কাটার সময় সুগন্ধ বের হয়। ধূসর সাদা বর্ণের বেল কাঠ শক্ত অথচ কম টেকসই, যা নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়।

পাকা ফলের শাঁসের ঔষধিগুণ অসীম, যা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে মল পরিষ্কার করতে, দেহের শক্তি বৃদ্ধি করতে ও হজমে সাহায্য করতে খুবই উপযোগী। ত্বকের সাধারণ রং অক্ষুন্ন রাখতে ও রোদ সহ্য করার ক্ষমতাকে বাড়ায় এই ফল। এছাড়া লিউকোডার্মা, মার্মেলসিনের এই ফল ব্যবহৃত হয়। তবে এর পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের হার কমে যেতে পারে, অতিরিক্ত ঘুম

পেতে পারে কিংবা হৃদযন্ত্রের কাজকর্ম ধীর হয়ে যেতে পারে।

চাষ করা গাছের ফলের তুলনায় জঙ্গলে স্বাভাবিকভাবে জন্মানো গাছের ফলে ৯% বেশি ট্যানিন থাকে। এইসব গাছের ফলের খোলাতেও ২০% ট্যানিন থাকে। বেল গাছের পাতাতেও এই ট্যানিন থাকে। বেল গাছের পাতা মহিলাদের বন্ধ্যাত্ব ও গর্ভপাতের কারণ হতে পারে। গাছের ছাল মাছের বিষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।



জাত পরিচিতি –

আমাদের দেশের বিহার ও উত্তরপ্রদেশে সবচেয়ে ভাল জাতের বেল পাওয়া যায়। ফলের আকার, স্বাদ, শাঁসের পরিমাণ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন (প্রায় ১২টি) জাতের বেল পাওয়া যায়। যেমন, Basti No.1, Gonda No.1, 2 ও 3, Deoria Large, Chakaiye, Bengal ইত্যাদি। এছাড়াও ১৯৭৫ সালে বেলের ২৪টি জাতের সন্ধান পাওয়া যায়। সাহারানপুর হর্টিকালচার ইনস্টিটিউটের Dr. L. B. Singh চাষের জন্য Mitzapuri, Darogaji, Ojha, Rampuri, Azamati, Khamaria প্রভৃতি জাতের বেলের উল্লেখ করেছেন। তবে এরমধ্যে Mitzapuri জাতটি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। এই জাতের বেলটির খোলা পাতলা, আঠা কম, শাঁস বেশি ও দানাদার, সুন্দর গন্ধযুক্ত এবং বীজের সংখ্যাও খুব কম।

এছাড়া ফৈজাবাদের Narendra Deo University-র Agri-techno department Narendra-4, 5 ও 7 এবং Narendra -9 নামের উন্নতজাতের বেল উদ্ভাবন করেছে। সম্প্রতি Paut Shivani নামে ২ কেজি ওজনের আরও একটি উন্নত বেলের কথা জানা যায়। পাকলে এই বেলটি হালকা হলুদ রঙের হয়ে যায় এবং এটি মাঝারি আঠাযুক্ত ও শাঁস খুব মিষ্টি স্বাদের।

তথ্যসূত্র - www.hort.purdue.edu/, http://www.planetayurveda.com, www.krishisewa.com, www.ijpab.com



কতবেল

পরিচয় –

কতবেল গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Limonia acidissima, এটি Rutaceae গোত্র ও Aurantioideae উপগোত্রের উদ্ভিদ। Liminia গণের মধ্যে মধ্যে Limonia acidissima হল একমাত্র প্রজাতি।

এই গাছের আদি জন্মস্থান ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার বেশ কিছু অঞ্চলে। এছাড়া থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য অংশে এই গাছ জন্মায়। আন্দামান-নিকোবর সহ গোটা ভারত জুড়েই এর চাষ সম্ভব। যদিও ভারতে বাণিজ্যিকভাবে কতবেলের চাষ হয় না। তবে মহারাষ্ট্রে কিছু মিষ্টি ও বড় জাতের কতবেলের চাষ ব্যাপক আকারে করা হয়।

ইংরেজিতে কতবেলকে Elephant apple বলে। আবার অনেকে একে বেলের মতো Wood apple নামেও ডাকেন। বাংলায় এই ফলটি কতবেল বা কয়েতবেল নামে পরিচিত।

এই গাছ খুবই বড় হয়, উচ্চতায় ৩০ ফুট হতে পারে। গাছের ছাল খসখসে ও কণ্টকময়। শীতকালে গাছের সব পাতা ঝরে যায়। আবার বসন্তে নতুন পাতা আসে। পত্রফলকের অগ্রভাগ সূঁচালো। গাছের পাতাগুলি পক্ষল প্রকৃতির। যাতে ৫-৭টি পত্রক থাকে। প্রতিটি পত্রক লম্বায় ২৫-৩৫ মিলিমিটার এবং চওড়ায় ১০-২০ মিলিমিটার হয়ে থাকে। ফুলগুলি হালকা সবুজ থেকে সাদা রঙের হয়। বোঁটা ছোট হয়, ফুলে ৪টি পাপড়ি থাকে, পুংকেশর অসংখ্য গর্ভাশয় বিস্তৃত ও কেন্দ্রস্থল খোলা। ফুলে মিষ্টি গন্ধ রয়েছে। বেলের মতো কতবেল ফলটিও বড়, গোলাকার, শক্ত খোসাবিশিষ্ট। ফলের ভিতরের শাঁসটি ৮টি কোয়া বা ১৫টি খণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি ভাগে বা খণ্ডে চটচটে আঠার সঙ্গে অনেক বীজ লেগে থাকে। কাঁচা ফলের রং সবুজ, পাকলে তা ধূসর বর্ণের হয়ে যায়।

চারিত্রিকভাবে এই গাছ ও ফল শক্ত প্রকৃতির হওয়ায়, যে কোনও আবহাওয়া মানিয়ে নিতে পারে। এই গাছের জন্য উষ্ণ ক্রান্তীয় অঞ্চল অর্থাৎ দারুণ গরম ও শুষ্ক গ্রীষ্মকাল ও হালকা শীত প্রয়োজন হয়। পশ্চিম হিমালয়ের ১৫০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু জায়গায় এই গাছ হতে পারে।

কতবেল গাছ বিভিন্ন ধরনের মাটিতে হতে পারে। যদিও উপযুক্ত জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থাযুক্ত হালকা বেলে মাটি এই গাছের বৃদ্ধি ও ফলনের পক্ষে আদর্শ।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

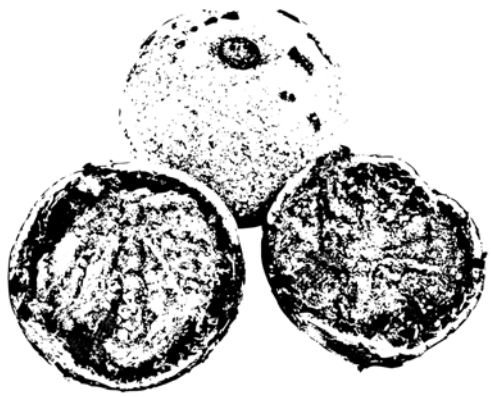
সাধারণত বীজ থেকে চারা তৈরি করে কতবেল গাছের বিস্তার ঘটানো হয়। এছাড়া শিকড় কাটিং, গুটিকলম বা বাডিং পদ্ধতিতেও এর কৃত্রিম প্রসারণ সম্ভব। এই গাছ লাগানোর জন্য এমন জমি বেছে নিতে হবে যেখানে জল জমতে না পারে।

এরপর তৈরি চারা ওই নির্দিষ্ট জমিতে রোপণ করতে হবে। চারা বীজ থেকে তৈরি করা হলে রোপণের সময় ১০ মিটার X ১০ মিটার বজায় রাখতে হবে। আর তা যদি বাডিং পদ্ধতিতে করা হয় তবে তা ৮ মিটার X ৮ মিটার দূরত্বে রোপণ করতে হবে। তবে এর আগে ৮০-৯০ সেমি X ৮০-৯০ সেমি X ৮০-৯০ সেমি গর্ত খনন করতে হয়। এরপর কমবেশি ২০-২৫ কেজি জৈবসার এবং ৫০ গ্রাম gamma BHC মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গর্তটিকে মাটি থেকে ৬ সেমি উঁচু পর্যন্ত ভরাট করে সেখানে চারা রোপণ করে সামান্য জল দিতে হবে। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে বা জুলাই-অগাস্ট মাস কতবেলের চারা রোপণের মরসুম।

পরিচর্যা –

সাধারণভাবে কতবেল গাছে নিয়ম করে ডালপালা ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন পড়ে না। তবে শাখা-প্রশাখায় রোগপোকার সংক্রমণ হলে ডাল কেটে দেওয়া যেতেই পারে।

পাশাপাশি নিয়ম করে আগাছা দমন করলে গাছের বৃদ্ধির হার সমান থাকে। এছাড়া আগাছা দমন করতে সাথী ফসল হিসাবে বর্ষায় কতবেল গাছের সঙ্গে কলাই জাতীয় শস্যের চাষ করা যেতে পারে।



যদিও কতবেল গাছে কম জলের প্রয়োজন হয়, তাসত্বেও গাছের বৃদ্ধি ও ভাল ফলনের জন্য সেচ বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে বেসিন রিং বা ড্রিপ পদ্ধতিতে সেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। নতুন গাছগুলির ক্ষেত্রে যথেষ্ট জলের প্রয়োজন হয়, বিশেষত সার প্রয়োগের পরপর। তবে বর্ষায় এই গাছের জলের প্রয়োজন হয় না এবং বর্ষার পর মাসে একবার সেচই যথেষ্ট। বন্যা হলে বা জমিতে বৃষ্টির জল জমে গেলে যত দ্রুত সম্ভব তা বের করে দিতে হবে।

সাধারণত কতবেল গাছের ক্ষেত্রে কোনও সার প্রয়োগের কথা জানা যায় না। যদিও সার প্রয়োগ করলে ফলন নিশ্চিতভাবে বাড়ে। এক বছর বয়সী প্রতি গাছে ১০-১৫ কেজি জৈবসার, ৫০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ২৫ গ্রাম ফসফরাস এবং ৫০ গ্রাম পটাসিয়াম প্রয়োগ করা যেতে পারে। এরপর ১০ বছর পর্যন্ত প্রতি বছর এই একই অনুপাতে সারের পরিমাণ বাড়াতে হয়। মে মাসের শুরুতে গাছে জৈবসার প্রয়োগ করতে হয়। অর্ধেক পরিমাণ নাইট্রোজেন, সম্পূর্ণ পরিমাণ ফসফরাস ও অর্ধেক পটাসিয়াম ঠিক গাছে ফুল আসার আগে এবং নাইট্রোজেন ও পটাসিয়ামের বাকি অর্ধেকটা অগাস্টের শেষ সপ্তাহে প্রয়োগ করতে হয়। গোটা জমিতে গাছের ছায়াযুক্ত জায়গায় এই সার ছড়িয়ে দিতে হয়। সার প্রয়োগের পরপরই সেচ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

সাধারণত এই গাছে ক্ষতিকারক রোগপোকার আক্রমণ ঘটে না। কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে চাষের ক্ষেত্রে বা কতবেল গাছের বাগানে ছত্রাকজাতীয় sooty mould রোগ দেখা যায়। এক্ষেত্রে ভেজানো যায় এমন ০.২% সালফার, ০.১% ক্লোরপাইরিফস বা মিথাইল প্যারাথিয়ন ও ০.৩% Gum acacia একত্রে মিশিয়ে প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

রোপণের ৫ বছর পর থেকে বাডিং পদ্ধতিতে তৈরি চারার গাছ ফল দিতে শুরু করে। অন্যদিকে বীজের চারা থেকে যে গাছ হয়, তা ফল দেয় ৮ বছর বয়সের পর থেকে। সাধারণত ফল আসার ৮ মাস পর তা পরিণত হয়ে ওঠে এবং গাছে ফল পাকতে ১১-১২ মাস সময় লাগে। এই সময় ফলের খোলার রং গাঢ় সবুজ থেকে হালকা সবুজ এবং ফলের ভিতরের অংশ হালকা হলুদ থেকে গাঢ় হলুদ বর্ণের হয়ে যায়।

ফলের পানীয় তৈরি করতে হলে তা পাকলেই সংগ্রহ করতে হয়। গাছ থেকে ফল একটা একটা করে বৃন্তসহ সংগ্রহ করতে হয়। লক্ষ্য রাখতে ফল সংগ্রহের সময় তা যেন মাটিতে না পড়ে।গাছ থেকে পেড়ে পাকা বেল ফল হিসাবে খাওয়া যায়। এছাড়া পাকা বেলের সরবত তৈরি করেও আমরা খেতে পারি।

কতবেল একটি পুষ্টিকর উপকারী ফল। কাঁচা পাকা দুটোই সমান উপকারী। কাঁচা ফল ডায়রিয়া ও আমাশয় রোগে ধন্বন্তরী। পাকা কতবেলের সরবত সুস্বাদু। বেলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন - C, ভিটামিন - A এবং ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও পটাসিয়ামের মতো মূল্যবান পুষ্টি উপাদান। ১০০ গ্রাম কতবেলের শাঁসে প্রোটিন, স্নেহপদার্থ, শর্করা, টারটারিক আসিড, অ্যাসকরবিক অ্যাসিড ইত্যাদিও বিভিন্ন পরিমাণে থাকে।

এই ফল হজমে সাহায্য করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, মধূমেহ রোগকে নিয়ন্ত্রণ করে, শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে, রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণ করে, প্রসূতি মহিলাদের পক্ষে উপকারী, চুল ও ত্বকের পক্ষে ভাল এবং লিভারকে ভাল রাখে। কতবেল গাছের পাতার রস মধু ও গোলমরিচের গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে খেলে তা জন্ডিস রোগের পক্ষে খুবই উপকারী।

অনেক কিছুর উপর কতবেলের উৎপাদন নির্ভর করে, যেমন, গাছের জাত, মাটি, আবহাওয়া, কীভাবে প্রসারণ ঘটানো হচ্ছে, গাছের বয়স এবং বাগিচা রক্ষণাবেক্ষণের অন্যান্য নিয়মনীতির উপর। গাছের প্রসারণের পদ্ধতি ও বয়সের ভিত্তিতে কতবেলের গড় উৎপাদন বিভিন্ন হয়। বাডিং পদ্ধতির চারা থেকে তৈরি ১০ বছর বয়সের গাছ থেকে ১০০-১৬০টি বা প্রতি হেক্টর জমি থেকে ২০-২১ টন ফল পাওয়া যায়। বীজের চারা থেকে তৈরি ১২ বছর বয়সের গাছ থেকে ২০০-৩৫০টি বা প্রতি হেক্টর জমি থেকে ২৫-৩০ টন ফল পাওয়া সম্ভব।

জাত পরিচিতি –

কতবেল চাষের জন্য আলাদা করে কোনও জাতের কথা জানা যায়নি। তবে ফলের আকার ও স্বাদের নিরিখে দু'ধরনের কতবেল দেখতে পাওয়া যায়। একটি আকারে বেশ বড় ও কিছুটা মিষ্টি স্বাদের। অন্যটি অপেক্ষাকৃত ছোট ও অম্ল স্বাদ বিশিষ্ট হয়।

তথ্যসূত্র - Wikipedia, www.tropical.theferns.info



স্ট্রবেরী

পরিচয় –

স্ট্রবেরীর বিজ্ঞানসম্মত নাম Fragaria vesca, এটি Rosaceae গোত্রের গুল্ম শ্রেণীর উদ্ভিদ।

স্ট্রবেরীর আদি জন্মস্থান ইউরোপে। মনে করা হয়, পৃথিবীতে স্ট্রবেরী চাষের প্রথম নজির সৃষ্টি প্রাকৃতিক নিয়মে সংকরায়নের ফলে। ১৭১৪ সালে চিলি থেকে ফ্রান্সে এক ধরনের সাদা ফলের আমদানি ঘটেছিল। এরও আগে ১৬০০ সালে ভার্জিনিয়া কলোনী থেকে ইউরোপে লাল রঙের একটি ফলের প্রজাতি এসেছিল। তবে এর চেয়েও আগে ১৩০০ সালে ইউরোপে ভিন্ন এক প্রজাতির স্ট্রবেরী চাষের দাবি করা হয়।

বর্তমানে গোটা ইউরোপ জুড়ে স্ট্রবেরীর চাষ হয়। এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে এবং কানাডা ও দক্ষিণ আমেরিকাতেও ব্যাপক হারে স্ট্রবেরী চাষ হয়। ভারতে ক্রান্তীয় উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে ২০১০ সালের আগে পর্যন্ত সফলভাবে স্ট্রবেরী চাষের কোনও নজির ছিল না। দেশের অধিকাংশ মানুষ কখনও স্থানীয়ভাবে স্ট্রবেরী চাষও হতে দেখেননি। পরিস্থিতি বদলে যায় ২০১০ সালে। যখন দেশের তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিহার এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি, তিরহাত কলেজ অফ এগ্রিকালচার ও রাজেন্দ্র এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি পরীক্ষামূলকভাবে স্ট্রবেরী চাষ করে সফলতা পায়।

স্ট্রবেরী গাছ অকাষ্ঠল। এই গাছের চারটি প্রধান ক্রাউন, পাতা, মূল ও রানার। দিন যখন বড় থাকে এবং তাপমাত্রা ৩২-৮৬ ডিগ্রী ফারেনহাইটের মধ্যে থাকে তখন এই গাছের ভাল পাতা জন্মায়। তাপমাত্রা খুব নিচে নেমে গেলে নতুন পাতা কম গজায়। পাতার আকার বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। নতুন পাতা সাধারণত উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের হয়। পুরনো পাতাগুলি ঈষৎ গাঢ় সবুজ বর্ণের হয়ে যায়। প্রতিটি স্ট্রবেরী গাছের মূল ও পাতার সংযোগস্থলে থাকে এই গাছের ক্রাউন বা মুকুট নামক অংশটি। এখানেই পাতা ও ফুল তৈরি হয়। রানার গাছটিও এখান থেকে গজায় এবং এর নিচ দিয়ে শিকড় বাড়তে থাকে। গাছ থেকে জন্ম নেওয়া রানার গাছটি থেকে স্ট্রবেরী গাছের বিস্তার ঘটানো হয়। ভারতে যে জাতের স্ট্রবেরী পাওয়া যায় তা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেও চাষ করা সম্ভব। এদেশে সাধারণত পাহাড়ী অঞ্চলে স্ট্রবেরীর চাষ করা হয়। মূলত উত্তরপ্রদেশের দেরাদুন, পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং ও মহারাষ্ট্রের মহাবালেশ্বরে স্ট্রবেরীর চাষ হয়। তবে বর্তমানে সমতলেও সমানভাবে স্ট্রবেরীর চাষ হচ্ছে, যেমন, মহারাষ্ট্রের পুণে, নাসিক ও সঙ্গালি শহরে।

পৃথিবীর ঠাণ্ডা জলবায়ু অঞ্চলে স্ট্রবেরী চাষের আধিক্য থাকলেও, এই গাছ মূলত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে সবচেয়ে ভাল হয়। শীতে এই গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তবে ভারতের মতো উষ্ণ ও ক্রান্তীয় উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলেও বর্তমানে স্ট্রবেরীর চাষ হচ্ছে। এই ধরনের জাতের ক্ষেত্রে শীতকালেও বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। স্ট্রবেরী গাছের খুব কম সূর্যালোকের প্রয়োজন হয়। কিছু জাতের স্ট্রবেরী রয়েছে যারা বেশি ও কম আলো, দুই-ই সহ্য করতে সক্ষম। আবার কিছু স্ট্রবেরী গাছ শুধুমাত্র অল্প দিনের আলোই সহ্য করতে পারে।

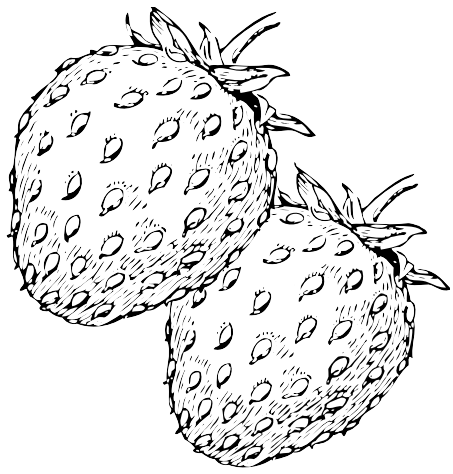
খুব ভাল জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা যুক্ত হালকা, জৈবসারে পরিপূর্ণ দোঁয়াশ মাটি এই চাষের উপযোগী। মৃদু অম্ল মাটিতে অর্থাৎ মাটির অম্ল ও ক্ষারের মাত্রা ৫.৭-৬.৫ PH-এর মধ্যে থকা বাঞ্ছনীয়। অধিক অম্ল জাতীয় মাটিতে শিকড়ের বৃদ্ধি ভাল হয় না। মাটিতে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বেশি থাকলে পাতার রং হলদে হয়ে যায়। নতুন সবুজ জৈবসার যুক্ত মাটিতে স্ট্রবেরী চাষ করলে ভাল হয়। ক্ষারযুক্ত মাটিতে এবং একই জমিতে একাধিকবার এই চাষ না করাই ভাল।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

ফুল ফোটার সময়ে সাধারণত রানারের দ্বারা স্ট্রবেরীর বংশবিস্তার ঘটানো হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিক রানার গাছ থেকে কাটা যেতে পারে, তবে ফলযুক্ত রানার কখনই নয়। এক্ষেত্রে প্রসারণের জন্য ভাল শিকড় যুক্ত গাছ বাছতে হয়। উপযুক্ত পরিচর্যায় কোনও একটি গাছ ১২-১৮টি রানারের জন্ম দিতে পারে। এরপর নার্সারীতে রানারগুলির শিকড় বের হলে তা তুলে নির্দিষ্ট জমিতে রোপণ করতে হয়। তবে স্থানান্তরের (মার্চ-এপ্রিল) আগে পলিব্যাগে ৫০ ভাগ গোবর সার ও ৫০ ভাগ পলিমাটি ভর্তি করে তাতে রোপণ করে ছায়াযুক্ত ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করা যেতে পারে। শিকড় যুক্ত রানারগুলি রোপণের সঠিক সময় হল, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (আশ্বিন) মাস। যদি তার অনেক আগে তা রোপণ করা হয় তবে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন কম হয়। তবে নভেম্বর-ডিসেম্বর পর্যন্ত চারা লাগানো যায় এবং সমতল জমির ক্ষেত্রে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসেও রোপণের কাজ করা যেতে পারে।

চাষ দিয়ে ভাল করে জমি প্রস্তুত করে ১ মিটার চওড়া ও ১৫-২০ সেমি উঁচু লম্বা বেড তৈরি করে জমিতে চারাগুলি রোপণ করতে

হবে। তবে গাছ থেকে গাছ বা সারি থেকে সারির দূরত্ব কতটা হবে তা নির্ভর করে গাছের জাত ও জমির চরিত্রের উপর। সাধারণত এক্ষেত্রে ৩০ সেমি X ৬০ সেমি দূরত্ব বজায় রাখা হয়। তবে মডেল পদ্ধতিতে প্রতি একর জমিতে ২২ হাজার গাছের ক্ষেত্রে ৩০ সেমি X ৩০ সেমি দূরত্ব থাকে। রোপণের পর কিছু সময় ঘন ঘন সেচ দিতে হয়।



পরিচর্যা –

এই গাছের গোড়া থেকে নিয়মিতভাবে রানার বের হয়। তা পুনরায় রোপণের ভাবনা না থাকলেও ১০-১৫ দিন অন্তর নিয়ম করে রানারগুলি কেটে দিতে হয়, না হলে ফলন কমে যায়। স্ট্রবেরী গাছের শিকড় মাটির সামান্য নিচ দিয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সেই কারণে মাটির পরিমাণ ভাল থাকা ও তাতে আর্দ্রতা বজায় থাকাটা জরুরি। তাই হালকাভাবে কোদাল বা নিড়ানী দেওয়ার প্রয়োজন হয় এবং রোপণের পরপরই আগাছা পরিষ্কার করা আবশ্যক।

ঠান্ডা আবহাওয়ায় শৈত্য প্রবাহ থেকে গাছের শিকড়কে বাঁচাতে মালচিং করে মাটি ঢেকে দিতে হয়। তাছাড়া এর ফলে ফল মাটিতে ঠেকে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না। এই মালচিং ব্যবহারের ফলে গরমেও জমির আর্দ্রতা বজায় থাকে। এই মালচিং যদি খড়ের হয় তবে লক্ষ্য রাখতে হবে তাতে যেন উই পোকার আক্রমণ না হয়। আর যদি তা হয় তাহলে ৩ মিলিলিটার ডারসবান (২০ ইসি) এবং ২ গ্রাম ব্যাভিস্টিন ডি.এফ. প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে খড়ে স্প্রে করা যেতে পারে।

রোপণের পর ঘন ঘন সেচ দিতে হয়। তা না হলে গাছ মরে যাওয়ার সংখ্যা বাড়তে পারে। বৃষ্টি যদি না হয় তবে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে সপ্তাহে দু'বার সেচ দিতে হয়। নভেম্বরে সেচের পরিমাণ কমিয়ে সপ্তাহে একবার করা যেতে পারে। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে প্রতি ১৫ দিন অন্তর একবার সেচ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু গাছে ফল ধরতে শুরু করলে সেচের পরিমাণ আবার বাড়াতে হয়। এই সময় ঘন ঘন সেচ ফলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। জৈবসারের পাশাপাশি স্ট্রবেরী চাষের জন্য বিভিন্ন সময় জমিতে প্রয়োজন অনুসারে ইউরিয়া, T.S.P. (ট্রিপল সুপারফসফেট), পটাশ ও জিপসাম দেওয়া যেতে পারে।

স্ট্রবেরী গাছে লাল মাকড়সা ও শুয়োপোকার আক্রমণ দেখা দেয়। লাল মাকড়সাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ০.০৫% মনোক্রোটোফসের সঙ্গে ০.২৫% ভেজানো যায় এমন সালফার ব্যবহার করা যেতে পারে। আর শুয়োপোকার আক্রমণ প্রতিহত করতে রোপণের আগে মাটি ভাল করে গুঁড়ো করে প্রতি হেক্টর জমিতে ৫% ক্লোরাডেন বা হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে দিতে হবে।

ছত্রাকঘটিত কারণে এই গাছে কিছু রোগ দেখা যায়। ছত্রাকনাশক স্প্রে করে এক্ষেত্রে উপকার পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া ভাইরাসঘটিত কিছু রোগও স্ট্রবেরী গাছে দেখা যায়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

নভেম্বরের মাঝামঝি সময়ে স্ট্রবেরী গাছে ফুল আসে। ডিসেম্বর মাসে যখন ফলের রং লাল বর্ণের হয় তখন শুরু হয় ফল সংগ্রহের কাজ, চলে মার্চ মাস পর্যন্ত। প্রতিটি গাছ থেকে গড়ে ২৫০-৩০০টি ফল পাওয়া যায়। সেই হিসাবে বিঘা প্রতি জমি থেকে গড়ে ১.৩৩-১.৬ টন স্ট্রবেরী উৎপাদন হতে পারে। স্ট্রবেরী বেশিদিন সংরক্ষণ করে রাখা যায় না। তবে কোল্ড স্টোরেজে ৩২ ডিগড়ি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১০ দিন এই ফল সংরক্ষণ করা সম্ভব। বিক্রির জন্য দূরবর্তী স্থানে পাঠানোর ক্ষেত্রে ২ ঘণ্টা ধরে ৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ঠাণ্ডা করে গাড়িতেও ওই একই তাপমাত্রা বজায় রাখতে হয়। ভাল মানের স্ট্রবেরী ছাঁট কাগজের উপর রেখে কার্ডবোর্ডের বাক্সে প্যাকিং করা হয়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্ন মানের ফলের ক্ষেত্রে তা সাধারণ ঝুড়িতেই প্যাকিং করা হয়ে থাকে। মূলত ফলের ওজন, আকার ও রঙের উপর নির্ভর করে স্ট্রবেরীর মান নির্ণয় করা হয়।

পাকা অবস্থায় গাছ থেকে সংগ্রহ করে স্ট্রবেরী খাওয়া যেতে পারে। মিষ্টি এই ফলটিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন – C ও আয়রন থাকে। কিছু জাতের স্ট্রবেরী যেমন, অলিম্পাস, হুড ও সুস্কান তাদের উজ্জ্বল লাল রঙের জন্য আইসক্রীম তৈরির জন্য উপযোগী। এছাড়া মিডওয়ে, মিডল্যান্ড, রেডচিফ, বিউটি প্রভৃতি জাতের স্ট্রবেরী খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

জাত পরিচিতি –

স্ট্রবেরীর বিভিন্ন ধরনের জাত দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের পাহাড়ী এলাকায় Royal Sovereign, Srinagar, Dilpasand জাতের দেখা মেলে। এদেশের ব্যাঙ্গালোরে যে জাতের স্ট্রবেরী পাওয়া যায় তার নাম ব্যাঙ্গালোর, যা মহাবালেশ্বরেও ফলেছে। আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়ায় Torrey, Toiga এবং Solana জাতের স্ট্রবেরী চাষ খুবই সফলতা পেয়েছে।

তথ্যসূত্র - www.agrifarming.in, www.strawberryplant.org



ব্লুবেরী

পরিচয় –

ব্লুবেরীর বিজ্ঞানসম্মত নাম Vaccinium corymbosum, এটি Ericaceae গোত্রের উদ্ভিদ।

বিভিন্ন প্রজাতির ব্লুবেরী সাধারণত উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশে দেখা যায়। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার কিছু অংশে, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে উত্তর আমেরিকার ব্লুবেরীর বাণিজ্যিকভাবে চাষ হয়। এই Genus-এর আরও কিছু ঝোপঝাড় প্রকৃতির গুল্ম জাতীয় বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ রয়েছে যেগুলি খাওয়ার উপযোগী ব্লুবেরী উৎপন্ন করে। বাণিজ্যিকভাবে চাষের ক্ষেত্রে জংলা বা স্বল্প উচ্চতার ব্লুবেরী প্রজাতিকে বেছে নেওয়া হয়। তবে ১৯৩০ সালের ইউরোপে ব্লুবেরী চাষের কোনও নজির পাওয়া যায় না।

তামিল ভাষায় ব্লুবেরীকে আভুরিনিলেই, তেলেগুতে ফল সাই, হিন্দিতে নিলাবদিরি, মালায়লমে নজাভল, মারাঠীতে জাম্বুল বা কারভান্ড, গুজরাটিতে ফলসা, ওড়িয়া ও বাংলায় ব্লুবেরী নামেই পরিচিত।

উচ্চতায় এই গাছ ৪ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। ব্লুবেরী গাছের পাতা সব সময় সবুজ থাকে। লম্বায় এই পাতা ১-৮ সেমি এবং চওড়ায় ০.৫-৩.৫ সেমি হয়। ফুলগুলি দেখতে ঘণ্টাকৃতির। ফুলের রং সাদা, হালকা গোলাপী বা লাল বর্ণের। তবে কখনও কখনও কিছুটা সবজে রঙেরও হয়ে থাকে। ব্লুবেরী ফলটি বেরী প্রকৃতির। যার ব্যাসার্ধ ৫-১৬ মিলিমিটার। ফলগুলির নিচের দিকটা খানিক মুকুটের মতো দেখতে হয়। ছোট অবস্থায় এর রং হালকা সবুজ বর্ণের থাকে, পরে তা লালচে বেগুনী বর্ণ ধারণ করে। আর যখন ফল পুরোপুরি পেকে যায় তখন তার রং গাঢ় বেগুনী হয়ে যায়। ব্লুবেরী ফলগুলির উপর এক ধরনের গুঁড়ো গুঁড়ো মোম জাতীয় পদার্থের আবরণ থাকে। স্থানীয়ভাবে যা 'ব্লুম' নামে পরিচিত। পরিণত অবস্থায় এই ফলের স্বাদ মিষ্টি।

প্রধানত স্যাঁতস্যাঁতে, অধিক ঠাণ্ডা এমনকি হালকা গ্রীষ্মেও ব্লুবেরী চাষ ভাল হয়। তবে এই গাছে বেশ কিছু প্রজাতি রয়েছে যেগুলি অল্প ঠাণ্ডা, উষ্ণ অঞ্চল ও উপকূলীয় এলাকাতেও জন্মাতে পারে। উষ্ণ অঞ্চলের ব্লুবেরী চাষের জন্য কেবলমাত্র ১০০-২০০ ঘণ্টা প্রবল ঠাণ্ডা আবহাওয়াই যথেষ্ট। যা দক্ষিণ ফ্লোরিডার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বর্তমানে ব্লুবেরী ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। তবে ব্লুবেরী চাষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হল, এই গাছ বেড়ে ওঠার জন্য বিশেষ পরিবেশের প্রয়োজন হয়। যে মাটিতে ব্লুবেরী চাষ করা হবে, তা অধিক অম্ল হতে হবে। এই অম্লতার মাত্রার সর্বোচ্চ সীমা ৪.০-৫.৫PH পর্যন্ত হতে পারে। থাকতে হবে জল নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত। সাধারণভাবে অনেক ক্ষেত্রেই যা পাওয়া যায় না। তবে চাষের আগে জমির মাটি পরীক্ষা করে নেওয়া ভাল।

জমি নির্বাচনের পর দেখতে হবে, সেখানে যেন বেশি সময় ধরে সূর্যালোক থাকে। দিনের মধ্যে যেন কমপক্ষে ৭৫ ভাগ সময় আলো থাকে। তবে দিনের শেষে আংশিক ছায়া থাকলে খুব একটা সমস্যা হয় না।

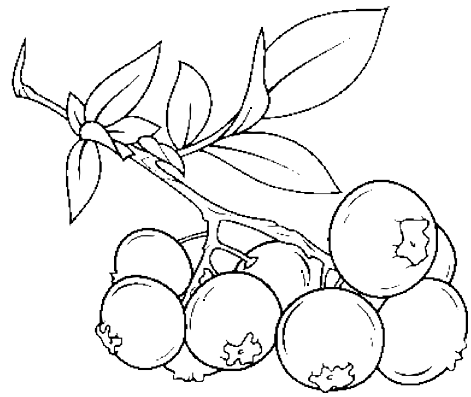
কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

বীজের দ্বারা বা গাছের শক্ত ডাল কেটে কলম করে ব্লুবেরীর প্রসারণ ঘটানো যেতে পারে। মাটি পরীক্ষার পর যদি দেখা যায় PH-এর মাত্রা খুব বেশি, তবে মাটিতে সামান্য পরিমাণ সালফার মেশানো যেতে পারে। প্রথমে জমিটিকে ভাল করে কুপিয়ে সমান করে আগাছা মুক্ত করে পরিষ্কার করতে নিতে হয়। এরপর চারা রোপণ করে সেচ দিতে হয়।

প্রতিটি সারিতে চারাগুলি ৮০ সেমি দুরত্বে রোপণ করতে হয়। যদি অনুকূল সেচের ব্যবস্থা থাকে তাহলে বছরের যে কোনও সময়ে এই গাছে চারা রোপণ করা যেতে পারে। ১-২ বছর চারাগুলিকে প্রথমে ১-৩.৫ লিটার পাত্রে বড় করতে হয়। এরপর কাণ্ডের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১৫-২৫ সেমি এবং ২৫-৪৫ সেমি হলে মূল জমিতে রোপণ করা হয়। জমিতে চারা রোপণের দু'সপ্তাহ আগে ১০ ইঞ্চি গভীর গর্ত করতে হয়। চারার মূল শিকড় যাতে ছড়িয়ে পড়তে পারে ১ মিটারের বর্গাকার গর্ত খনন করা হয়। তাই এক মিটার জায়গা জুড়ে বর্গক্ষেত্র খনন করা হয়। গর্তের মাটির সঙ্গে পচা পাতা বা কম্পোষ্টের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়।

পরিচর্যা –

ব্লুবেরী গাছ সাধারণত ঝোপ প্রকৃতির এবং মুকুটের মতো অংশ থেকে কাণ্ড বেড়ে ওঠে। মূলত গাছ থেকে ৯-১২টি প্রজননে সক্ষম কাণ্ড বের হয়। প্রতি বছর নিয়ম করে ৫-৬ বছরের ডালগুলি ছেঁটে দিতে হয়। প্রথম কয়েকবছর গাছে ফল না ধরতে দেওয়াই



ভাল। কুঁড়ি অবস্থাতেই ফুলগুলি তুলে ফেলে দিতে হয়, এতে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। ডাল ছাঁটাই শীতকালে করা উচিত, ঠিক যখন গাছের বৃদ্ধি শুরু হয়। তবে প্রথম চার বছর ডাল ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন হয় না।

ব্লুবেরী চাষের ক্ষেত্রে শুকনো ও নষ্ট পাতা ফেলে দিয়ে নিয়মিতভাবে আগাছা দমন করতে হয়। গাছের গোড়ার চারপাশ ভাল পরিস্কার রাখতে হয় এবং অম্লতা সহ্য করতে পারে এমন গাছের জন্য তৈরি সার সহযোগে যে কোনও ধরনের মালচিং ব্যবহার (বসন্তকালে) করা যেতে পারে। মালচিং আর্দ্রতা ধরে রেখে জলের অভাব দূর করে, আগাছার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে, মাটির ভাঙন আটকায় এবং এর উপকরণ ধীরে ধীরে জৈবসারে পরিণত হয়। রোপণের পর মালচিং সাধারণত ২-৪ ইঞ্চি কাঠের গুঁড়ো দিয়ে করা হয়। গাছের নিচের অংশে যে সব ফল থাকে তা তুলে ফেলে দিতে হয়। এরফলে গাছটি বিশেষ করে তার শিকড় শক্তপোক্ত হয়। মূল জমিতে চারা গাছ স্থানান্তর করে রোপণের পরপরই সেচ দিতে হয়। ব্লুবেরী গাছে সপ্তাহে একদিন সেচ দেওয়া হয়। তবে কলের জলের চেয়ে সেচের কাজে বৃষ্টির জলই উপযুক্ত, কারণ প্রাকৃতিক নিয়মে এই জলে ক্ষারের মাত্রা বেশি থাকে। একটানা শুষ্ক আবহাওয়ায় জমির আর্দ্রতা ধারণের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে বারংবার সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

ব্লুবেরী চাষে কম্পোষ্ট সার ব্যবহারের অনেক সুফল রয়েছে। জমি তৈরির সময় গরুর গোবরের মতন জৈবসার প্রয়োগ খুই উপযোগী হতে পারে। যেহেতু ব্লুবেরী গাছ অম্ল-মৃত্তিকা পছন্দ করে তাই অম্লযুক্ত সার যেমন, অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বা সালফারযুক্ত ইউরিয়া ব্যবহার করা যেতে পারে। গাছের পাতা বড় হওয়ার আগে বসন্তকালে সার প্রয়োগ করা উচিত।

সাধারণত ব্লুবেরী গাছের রোগপোকা প্রতিরোধের ক্ষমতা রয়েছে। প্রধান সমস্যা হল এই ব্লুবেরী ফল পাখিদের খুব প্রিয় খাদ্য। তাই বাগান বিশেষ গাছের চারপাশে ভাল করে নেট দিতে হয়। বিশেষত জুন মাসে যখন গাছে ফল ধরে তখন এর প্রয়োজন আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

গাছ থেকেই পেড়েই ব্লুবেরী খাওয়া যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সকালের জল খাবারে এই ফল খাওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণেও এই ফল ব্যবহার হয়। ব্লুবেরী অসীম পুষ্টিগুণ সম্পন্ন হওয়ায় স্বাস্থ্যের পক্ষে এই ফল খুবই উপযোগী। ব্লুবেরী শুধু একটি জনপ্রিয় ফলই নয়, অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের পরিমাণের নিরিখে এই ফল বারেবারে আমেরিকার খাদ্য তালিকায় উপরের দিকে জায়গা করে নিয়েছে। ভারতে ব্লুবেরীর চাষ খুবই কম হয়। তবে শরীর সুস্থ রাখতে ভারতে বাণিজ্যিকভাবে ব্লুবেরী চাষের ভাল ভবিষ্যৎ রয়েছে। যদিও এদেশে যথাযথভাবে চাষে সফলভাবে ব্লুবেরী ফলানো সম্ভব হয়েছে। এই ফল একটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ফল। অধিক পুষ্টিগুণের এই ফলে অল্প মাত্রায় ক্যালরি থাকে। ব্লুবেরী ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে। মস্তিষ্কের কাজকর্ম সঠিকভাবে চালনা করতে এই ফল উপযোগী। কোলেস্টেরল ও রক্তচাপকে কমাতে সাহায্য করে ব্লুবেরী। এই ফল মধুমেহ রোগের ক্ষেত্রেও উপকারী। মুত্রনালীর সংক্রমণ রোধ করে এই ফল। এছাড়া হৃদরোগের আশঙ্কা কম করে ব্লুবেরী।

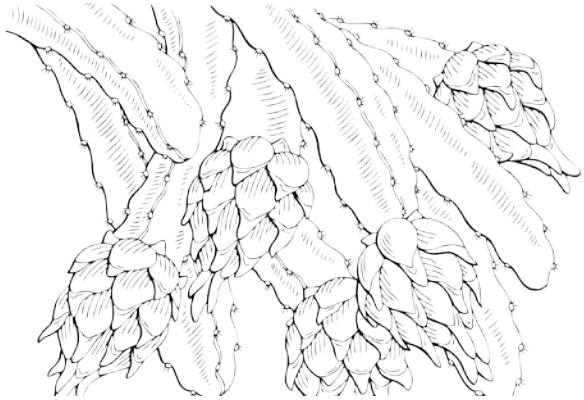
ব্লুবেরী গাছ দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় মরসুমে ফল দিতে শুরু করে। এই গাছে বছরে মাত্র একবারই ফল ধরে। সাধারণত অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ফসল তোলা শুরু হয়। তবে ফল নীল হলেই তা তুলতে নেই, কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়। গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করার পর তা সঠিকভাবে কৌটো ভর্তি করে টাটকা অবস্থায় বাজারজাত করা হয়।

ব্লুবেরীর ফলন বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে যেমন, গাছের জাত, মাটির চরিত্র, সেচ ও আবহাওয়া। সাধারণত ব্লুবেরী চাষে গাছ প্রতি ১ কেজি ফল লাভের আশা করা যেতে পারে। পরের বছরগুলি থেকে ফলন পরপর দ্বিগুণ হতে থাকে। গাছটি ৬-৭ বছর বয়সের পরিণত গাছ হওয়া পর্যন্ত এমনটা চলতে থাকে। একটি গাছ থেকে সর্বোচ্চ ১০ কেজি ফলন পাওয়া সম্ভব এবং গাছ প্রতি গড়ে ৫-৬ কেজি ফল পাওয়া যায়। ব্লুবেরী গাছ ২০-২৫ বছর বয়স অবধি ফল উৎপাদনে সক্ষম।

জাত পরিচিতি –

ব্লুবেরীর বিভিন্ন জাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। সাধারণভাবে তিন ধরনের ব্লুবেরী দেখা যায়, উচ্চ, নিম্ন এবং আধা-উচ্চ সংকর প্রজাতির। বিভিন্ন জাতের ব্লুবেরী নাম হল, ডুক, টোরো, চ্যান্ডলার, চ্যান্টনিক, অয়ানাল, মিস্ট্রি নেলসন, লেগ্যাসি, এলিয়ট, এলিজাবেথ, আরলেন, রেভিয়েল প্রিন্স, কলম্বাস প্রিমিয়াম, পাউডার ব্লু-ক্লাইমেক্স, ব্রাইট ওয়েল, ব্লু-ক্রপ, ব্লু-রে, ব্লু-জে।

তথ্যসূত্র – www.agrifarming.in



ড্রাগন ফল

পরিচয় –

ড্রাগন ফলের বিজ্ঞানসম্মত নাম Hylocereus undatus, এটি Cactaceae গোত্রের উদ্ভিদ।

ড্রাগন ফলের আদি জন্মস্থান মধ্য আমেরিকায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। দক্ষিণ এশিয়া বিশেষ করে মালয়েশিয়াতে এই ফলের চাষ আরম্ভ হয় বিংশ শতাব্দীর শেষে। তবে ভিয়েতনামে বাণিজ্যিকভাবে ব্যাপকহারে এর চাষ করা হয়। বর্তমানে মেক্সিকো, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ চিন, ইজরায়েল, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশে ড্রাগন ফল চাষ হচ্ছে। হালকা মিষ্টি স্বাদের এই ফল এশিয়ার মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয়। এই ফলকে ড্রাগন ফল ছাড়াও পিটাইয়া, টিহায়া ইত্যাদিও নামেও ডাকা হয়।

সাধারণভাবে এই গাছকে ক্যাকটাস বলে মনে করা হয়। এই গাছ উজ্জ্বল আলো পছন্দ করে। লম্বায় এই গাছ ১.৫-২.৫ মিটার হয়। তবে উপরের দিকে গাছটিকে ধরে রাখার জন্য সিমেন্টের বা বাঁশের সঙ্গে তুলে দেওয়া যেতে পারে। এতে খুব সহজেই লতাগুলি বাড়তে পারে। ড্রাগন ফল গাছ খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং মোটা শাখা তৈরি করে। একটি এক বছরের গাছ ৩০টি পর্যন্ত শাখা তৈরি করতে পারে। ফলগুলি ড্রাগনের চোখের মতো আকার ও রঙ ধারণ করে। ফলটির সামনের দিকের শেষ অংশে হালকা গর্তের মতো থাকে। এই ফলের চামড়ার উপরে আনারসের মতো স্কেল থাকে। ড্রাগন ফল গোলাকার থেকে ডিম্বাকার হয়। ফলের উজ্জ্বল গোলাপী থেকে লাল রঙের হয়। ওজনে ২০০-৭০০ গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। ফলগুলি ৭-১০ সেমি চওড়া এবং ৮-১৪ সেমি লম্বা। ভিতরের Pulp সাদা, লাল, হলুদ ও কালো রঙের হয়। Pulp-এর মধ্যে ছোট ছোট কালো রঙের অনেকগুলি নরম বীজ থাকে। বীজগুলি দাঁতের নীচে পড়লে সহজেই গলে যায়। ফলগুলি হালকা মিষ্টি (মিষ্টতা ১৬%-২৪% এসএসটি বা ব্রিক্স হয়)।

এই গাছ শুধুমাত্র রাতে ফুল দেয়। ফুলকে রাতের রানি বা মুন ফ্লাওয়ার বলে। ফুল লম্বাটে, সাদা ও হলুদ বর্ণের হয়। এটি এটি একটি লতানো উদ্ভিদ হলেও, এর কোনও পাতা থাকে না। ড্রাগন ফল প্রচুর আলো পছন্দ করে। সাধারণত শুষ্ক উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে এই গাছ ভাল হয়। মাঝারি বৃষ্টিপাত এই গাছের উপযুক্ত। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে ফুল ঝরে পড়ে এবং ফলের পচন দেখা দেয়। প্রায় সব ধরনের মাটিতেই ড্রাগন ফল চাষ করা যায়। তবে জল জমে না এমন উঁচু জমিতে এই গাছের চাষ করা ভাল। উচ্চ জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ বেলে-দোঁয়াশ মাটি এর পক্ষে উত্তম।

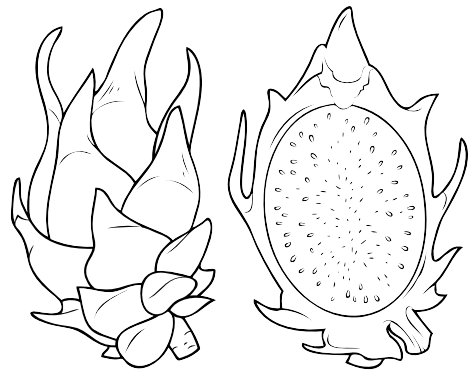
কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

এই গাছে স্বপরাগমিলন ঘটে। তবে মাছি, মৌমাছি ও পোকামাকড়ের দ্বারা পরাগমিলন ত্বরান্বিত হয়ে থাকে। কৃত্রিম পদ্ধতিতে বীজ থেকে চারা তৈরি করা সম্ভব হলেও উপযুক্ত জাতের গাছ নির্বাচন করে কাটিং-এর মাধ্যমে চারা করাই সবচেয়ে ভাল। কারণ বীজের চারায় ফল আসতে দেরি হয় এবং মাতৃগুণও হুবহু বজায় থাকে না। কাটিং-এর সফলতার হার প্রায় ১০০% এবং তাড়াতাড়ি ফল ধরে। কাটিং থেকে উৎপাদিত গাছে এক থেকে দেড় বছরের মধ্যেই ফল ধরতে শুরু করে। সাধারণত বয়স্ক এবং শক্ত শাখা কেটে (১-১.৫ ফুট) হালকা ছায়ায় বালি বা বালিযুক্ত দোঁয়াশ মাটিতে গোড়ার দিকের কাটা অংশ পুঁতে সহজেই চারা উৎপাদন করা যায়। ২০-৩০ দিন পরে কাটিং-এর গোড়া থেকে শিকড় বেরিয়ে আসে এবং তখন ওই কাটিং রোপণের উপযুক্ত হয়ে যায়। তবে উপযুক্ত পরিবেশে প্রয়োজন অনুযায়ী কাটিং করা কলম সরাসরি মূল জমিতে লাগানো যায়। তবে কাটিং রাখার জায়গায় শেড বা ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মাটিতেও রস থাকতে হবে। এমনটা করা হলে কাটিং সাধারণত মরে না।

পরিচর্যা –

রোপণের আগে জমি ভালভাবে চাষ দিয়ে সমান করে ৩ মিটার পরপর সব দিকে সারি করে চারা লাগানো যেতে পারে। চারা রোপণের মাস-খানেক আগে গর্ত তৈরি করে তা সারমাটি দিয়ে ভরে রেখে দিতে হবে। প্রতি গর্তে ৪০ কেজি পচা গোবর সার, ৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম করে T.S.P.(ট্রিপল সুপারফসফেট) ও M.O.P.(পটাসিয়াম ক্লোরাইড), ১০ গ্রাম করে জিপসাম, জিঙ্ক সালফেট ও বোরাক্স সার দেওয়া যেতে পারে। বছরের যে কোনও সময় চারা রোপণ করা যেতে পারে। তবে এপ্রিল-সেপ্টেম্বরের মধ্যে লাগালে ভাল হয়। প্রতিটি গর্তে ৪-৫টি চারা লাগাতে হবে। সিমেন্ট বা বাঁশের খুঁটির সঙ্গে গাছটিকে চড়িয়ে দিতে হয় যাতে তা লতিয়ে বাড়তে পারে।

ড্রাগন ফল গাছ অতিরিক্ত জল সহ্য করতে পারে না। তাই এই চাষে জল খুব কম লাগে। শুষ্ক মরসুমে অবশ্যই সেচ দিতে হবে



এবং বর্ষার সময় জমি থেকে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে দুটি সারির মাঝখানে ৫০-১০০ সেমি আকারের নালা তৈরি করা যেতে পারে। এই নালা বর্ষায় যেমন জমির জমা জল বের করতে সাহায্য করে তেমন গরমের সময় ১-২ দিন জল ধরে রেখে গাছের মাটিতে রস সরবরাহ করতে পারে।

ড্রাগন গাছের কাণ্ড লতানো প্রকৃতির হওয়ায় চারা লাগানোর পর খুঁটি বা পিলার পুঁতে গাছটিকে বেঁধে দিতে হয়। তিনটি পদ্ধতিতে গাছটিকে এভাবে সাপোর্ট দেওয়া যায়, যেমন ভিয়েতনাম পদ্ধতি, ফ্লোরিডা পদ্ধতি ও শ্রীলঙ্কা পদ্ধতি।

ভিয়েতনাম পদ্ধতিতে পিলারের চারদিকে কাটিং করা কলম চারা লাগিয়ে পিলারের সঙ্গে বেঁধে দিতে হয়। ফ্লোরিডা পদ্ধতিতে দু'পাশে দুটি খুঁটি পুঁতে মোটা তারের উপর জাংলার মতো তৈরি করে গাছ জাংলায় তুলে দিতে হয়। শ্রীলঙ্কা পদ্ধতিতে পিলার পুঁতে দিয়ে চারা লাগিয়ে তা পিলারের সঙ্গে বেঁধে দিতে হয়। পিলারের চারদিকে বাঁশের চ্যাগারের উপরে মোটর গাড়ির পুরনো টায়ার দিয়ে তার উপর গাছের শাখাগুলিকে বাড়তে দেওয়া হয়।

এই গাছ খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং মোটা শাখা তৈরি করে। একটি এক বছরের গাছ ৩০টি পর্যন্ত শাখা তৈরি করতে পারে। তবে শাখাপ্রশাখার উৎপাদন গাছের ডাল ছাঁটাইয়ের উপর নির্ভর করে। সাধারণত ফল সংগ্রহের পর ৪০-৫০টি প্রধান শাখার প্রত্যেকটিতে ১-২টি শাখা অনুমোদন করা হয়। তবে এই ডাল ছাঁটাইয়ের কাজ দিনের মাঝামাঝি সময়েই করা ভাল। ডাল ছাঁটার পর অবশ্যই যে কোনও ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে। তা না হলে বিভিন্ন ধরনের রোগের আক্রমণ ঘটতে পারে।

ড্রাগন ফলে খুব একটা ক্ষতিকর পোকামাকড় দেখা যায় না, তবে মাঝে মধ্যে এফিড বাগ ও মিলি বাগের আক্রমণ দেখা যায়। এরা গাছের কচি শাখা ও পাতার রস চুষে খায়, ফলে রং ফ্যাকাসে হয়ে যায় এবং গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। এই পোকার আক্রমণ দেখা দিলে সুমিথিয়ন বা ডেসিস বা ম্যালাথিয়ন ২৫ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার জলে ভালভাবে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এছাড়া কখনও কখনও গাছের শিকড়, কাণ্ড ও গোড়াপচা রোগ দেখা যায়। গাছের গোড়ায় অতিরিক্ত জল জমে গেলে মূল পচন দেখা দেয়। গাছকে টান দিলে মূল ছাড়াই গাছটি উঠে আসে। এরজন্য উঁচু জমিতে চাষ করতে হবে। যাতে গোড়ায় জল না জমে। ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার কারণে এই কাণ্ড ও গোড়া পচা রোগের আক্রমণ ঘটে। এই রোগ হলে প্রথমে হলুদ রং, পরে কালো রং ধারণ করে। পরে ওই অংশে পচন শুরু এবং তা ধীরে ধীরে বাড়তে পারে। এই রোগ দমনের জন্য ছত্রাকনাশক যেমন, বেভিস্টিন, রিকোমিল, থিওভিট ইত্যাদির যে কোনও একটি ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

১২-১৮ মাস বয়সের একটি গাছে ৫-২০টি ফল পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ণবয়স্ক একটি গাছ থেকে ২৫-১০০টি ফল পাওয়া যায়। হেক্টর প্রতি ফলন ২০-২৫ টন।

ড্রাগন ফল একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর ফল। এই ফল মানুব শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টির অনেকটাই পূরণ করতে পারে। ১০০ গ্রাম ড্রাগন ফলে চর্বি জাতীয় পদার্থ ০১০-০৬ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৬-১০ মিলিগ্রাম, আয়রন ০.৩-০.৭ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ১৬-৩৫ গ্রাম, সামান্য পরিমাণে ক্যারোটিন, ভিটামিন B3 ০.২-০.৪ মিলিগ্রাম থাকে।

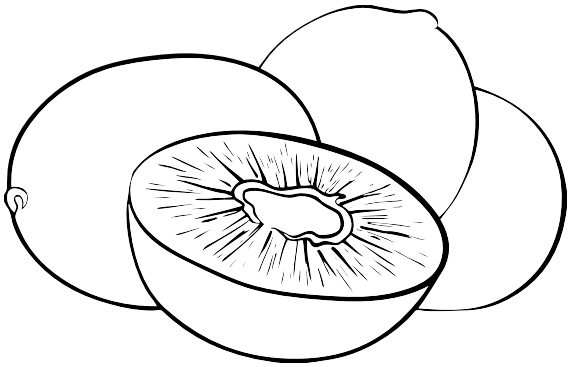
ক্যারোটিন সমৃদ্ধ হওয়ায় এই ফল চোখের পক্ষে ভাল। হজম শক্তি বাড়ায় ও শরীরের চর্বি কমায়। এই ফলে ক্যালসিয়াম থাকায় হাড় ও দাঁত শক্ত হয়। এছাড়া ড্রাগন ফলে বিভিন্ন ভিটামিন থাকায় এই ফল কোলেস্টেরল কমায়, ত্বক মসৃণ রাখে, শরীরের কাটা অংশ ভাল করতে ও ভাঙা অংশ জোড়া লাগাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি ফসফরাস বেশি থাকায় কোষ কলা গঠনে সাহায্য করে।

এই ফলের আরও ঔষধি গুণ রয়েছে। ড্রাগন ফল শর্করা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। তাইওয়ানে ডায়াবেটিসে রোগীরা প্রধান খাদ্যের পরিবর্তে এই ফল খেয়ে থাকেন। ড্রাগন ফল রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ফলটিতে ফাইটো অ্যালবুমিন ও অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকায় ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে। এই ফল লিভারের পক্ষে খুবই উপকারী ও ক্রনিক আন্ত্রিকে সমস্যার সমাধান করে। গবেষণায় জানা গেছে, নিয়মিত এই ফল খেলে ওজন কমে এবং শরীর সুন্দর হয়।

জাত পরিচিতি –

মিষ্টি ও টক, এই দুই স্বাদের নিরিখে সাধারণত তিন ধরনের ড্রাগন ফল দেখা যায়। লাল ড্রাগন ফল বা পিটাইয়া, কোস্টারিকা ড্রাগন ফল ও স্টেনোসেরাস ড্রাগন ফল। এছাড়া হলুদ ও কালচে লাল বর্ণের ড্রাগন ফলের কথাও জানা যায়।

তথ্যসূত্র – www.agrifarming.in



কিউই

পরিচয় –

এই ফলের বিজ্ঞানসম্মত নাম Actinidia deliciosa, এটি Actinidiaceae গোত্রের একটি লতানো জাতীয় উদ্ভিদ। এই প্রজাতির কিউই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত, যা fuzzy kiwifruit নামেও পরিচিত।

১৮৪৭ সালে লন্ডনের রয়্যাল হর্টিকালচার সোসাইটির এক প্রতিনিধি এই গাছটি সংগ্রহ করেন। বিংশ শতাব্দীতে যখন নিউজিল্যান্ডে এর বীজ পাওয়া যায় তখন চিনে এই গাছের চাষ প্রসারলাভ করে। ১৯০৬ সালে এই গাছের বীজ প্রথম চিনে বপন করা হয়। আগে মানুষ মনে করতেন, এই ফলের স্বাদ বৈঁচির মতন। তাই একে চিনা বৈঁচি বলে ডাকা শুরু হয়। নিউজিল্যান্ডে Actinidia deliciosa–র চাষ শুরু হয় ১৯২৪ সালে। কিউইয়ের এই প্রজাতির চাষ সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি। ২০০৬ সাল পর্যন্ত এই ফল উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম ছিল ইতালি। তালিকায় এর পরের নামগুলি ছিল নিউজিল্যান্ড, চিলি, ফ্রান্স, গ্রীস, জাপান এবং আমেরিকায়। চিনে এখনও এই ফলের চাষ হয়। তবে এই দেশ কখনই এই ফল উৎপাদনে প্রথম দশের তালিকায় জায়গা পায়নি। ২০১০ ও ২০১১ সালে ইতালি, ফ্রান্স এবং নিউজিল্যান্ডে ছত্রাকজনিত আক্রমণে এই চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়। ভারতে এই ফল মূলত জন্মায় হিমাচল প্রদেশের মাঝারি পাহাড়ে, উত্তরপ্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর, সিকিম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ এবং কেরালায়। তবে বর্তমানে দেশের অন্যান্য অংশেও কিউই ফল চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এই গাছের পাতা বিপরীতমুখীভাবে সজ্জিত থাকে। পাতাগুলি লম্বা বৃন্তযুক্ত, উপবৃত্তাকার থেকে গোলাকার হয়। পাতা লম্বায় ৭.৫-১২.৫ সেমি হয়। গাছের নতুন পাতাগুলি লাল লোমে ঢাকা থাকে। পরিণত হলে পাতার রং গাঢ় সবুজ এবং পাতার উপরের তল লোমহীন হয়ে যায়। নিচের তলে স্পষ্ট পত্রশিরাগুলি বিন্যস্ত থাকে। কিউই গাছের ফুল সুগন্ধযুক্ত হয়। ফুলগুলি একলিঙ্গ বিশিষ্ট। গাছের মূল কাণ্ড থেকে একটি বা তিনটি পাতা জন্মায়। ফুলে ৫-৬টি পাপড়ি থাকে। প্রথমের দিকে ফুলগুলি সাদা থাকে, পরে তার রং পরিবর্তীত হয়ে বাদামী-হলুদ বর্ণের হয়ে যায়। চওড়ায় কিউই ফুল ২.৫-৫ সেমি হয়। অনেক ক্ষেত্রে ফুলগুলি উভলিঙ্গ হয়, তবে সেক্ষেত্রে স্ত্রী ফুলের পরাগ বেশিদিন সক্রিয় থাকে না। আসলে মিলনে সক্রিয় স্ত্রী ও পুরুষ সব সময় আলাদা আলাদা গাছে জন্মায়। তাই ফল ধরার জন্য উভয় গাছকে পাশাপাশি রোপণ করতে হয়। আয়তাকার কিউই ফলগুলি ৬২৫ সেমি পর্যন্ত লম্বা হয়। হলদে বাদামী বর্ণের ফলগুলি ঘন ছোট, বাদামী লোমে ঢাকা থাকে। ফল পাকলে তবেই ফলের ভিতরের মাংসল অংশ পরিণত হয়। পাকা ফলগুলি খুব তরতাজা, রসালো ও মনোরম হয়। ফলের মাংসল অংশের রং উজ্জ্বল সবুজ বা কখনও হলুদ, বাদামি বা ধূসর সাদা হয়। ফলগুলি ঈষৎ অম্ল থেকে অম্ল স্বাদযুক্ত হয়। অনেকটা বৈঁচি বা স্ট্রবেরী স্বাদের হয়।

কাণ্ডবিশিষ্ট লতানো এই গাছের ভাল বৃদ্ধির জন্য উর্বর, আর্দ্র অথচ জল নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্তযুক্ত হালকা বেলে মাটি সবচেয়ে উপযুক্ত। জল দাঁড়ায় এমন ভারী মাটি এই গাছের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

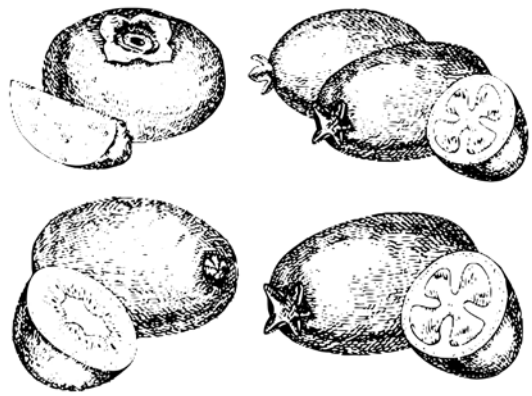
কিউই গাছ সাধারণত ২০০০-৬৫০০ ফুট উঁচু জমিতে ভাল জন্মায়। শীতকালে এই গাছটির প্রতিদিনকার প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৪.৪৪-৫.৫৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৩.৮৯-১৫.৫৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং গ্রীষ্মে এই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩.৩৩-১৩.৮৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস ও সর্বোচ্চ ২৩.৮৯-২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস, বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭৬-৭৮% এবং বার্ষিক ১৩০-১৬৩ সেন্টিমিটার উপযুক্ত।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

সাধারণত কাছাকাছি দূরত্বে রোপণ করা চারার ক্ষেত্রে মৌমাছির দ্বারা ফুলের পরাগসংযোগ ঘটে। একটি পুরুষ গাছ প্রতি ৫টি স্ত্রী গাছের প্রয়োজন হয়। বাণিজ্যিকভাবে চাষের ক্ষেত্রে, জমির ১০-১২% গাছকে অবশ্যই পুরুষ হতে হয় অর্থাৎ প্রতি ৮-৯টি স্ত্রী গাছের জন্য একটি করে পুরুষ গাছ প্রয়োজন। গাছে ফুল আসার সময় পুরুষ ও স্ত্রী গাছগুলিকে চিহ্নিত করতে হয়, যাতে তারা পরাগমিলন ঘটাতে পারে। এছাড়া কৃত্রিমভাবে হাতের সাহায্যেও পরাগমিলন ঘটানো সম্ভব। সেক্ষেত্রে পুরুষ ফুলগুলি থেকে রেণু সংগ্রহ করে তা স্ত্রী ফুলের উপর ছড়িয়ে দিতে হয়।

বীজ থেকে তৈরি চারার গাছ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হলেও একমাত্র পরীক্ষামূলক জমিতে ক্লোন নির্ণয় করা বা বাডিং অথবা গ্রাফটিং-এর জন্য rootstock উৎপাদনের জন্য ছাড়া কখনই এভাবে এই গাছের প্রসারণকে উৎসাহিত করা হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাটিং ও গ্রাফটিং করে অঙ্গজ জনন ঘটিয়েই এই গাছের প্রসারণ হয়ে থাকে।

তবে বীজ থেকে প্রসারণের জন্য পাকা ফলের তরল মিশ্রণকে ভাল করে ছেঁকে তা থেকে ছোট বীজগুলি সংগ্রহ করতে হয়। তারপর বীজগুলি আর্দ্র বালিতে মিশিয়ে প্লাস্টিক ব্যাগ, প্লাস্টিক বাক্স বা অন্য কোনও পাত্রে রেখে ২ সপ্তাহ পর্যন্ত হিমাঙ্কের নিচের তাপমাত্রায়



রাখতে হয়। এরপর ওই মিশ্রণকে নার্সারীর বেডে বা সরাসরি জমির মাটিতে ঢেলে দিতে হয়। তবে দেখতে হবে তা যেন কখনই মাটির ৩ মিলিমিটার গভীরে না চলে যায় অর্থাৎ তার আর্দ্রতা যেন বজায় থাকে। এর ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঘটে। চারাগুলি খুব ঘন ঘন হলে কিছু চারা উপড়ে তুলে দিতে হয়। এরপর নার্সারীতে যখন বাকি চারার উচ্চতা ৩ ইঞ্চি হয়ে যায় তখন তা সফলভাবে নির্দিষ্ট জমিতে রোপণ করা যায়। আর যদি rootstock-এর কথা ভাবা থেকে, তবে একমাত্র নার্সারীর সারি ছাড়া অন্য জায়গায় উচ্চতায় ১২-১৫ ইঞ্চি হলে তুলে জমিতে রোপণ করতে হয়। চারাটি এক বছরের হলে তা বাডিং-এর উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

গ্রাফটিং-এর জন্য মা গাছের নতুন ডালকে সংগ্রহ করে ২-৩টি কুড়ি রেখে দু'পাশটা ভাল করে ছেঁটে দিতে হয়। এরপর Whip বা Tongue পদ্ধতিতে সেই ডালকে মাটি থেকে ৪ ইঞ্চি উপরে Stock-এ জুড়ে দিতে হয়।

ভাল কিউই ফলের বাগান করতে হলে খুব ভাল করে মাটি প্রস্তুত করা অত্যন্ত জরুরি। ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই গর্ত তৈরি করে তাতে জৈবসার দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে। অধিক সূর্যালোক পাওয়ার জন্য সারিগুলি যেন উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী হয়।

এরপর সাধারণত জানুয়ারি মাসে এই গাছের চারা জমিতে রোপণ করা হয়ে থাকে। নার্সারীতে মাটির নিচে চারা যতটা গভীর ছিল, জমিতে তা রোপণের সময়ও ওই একই গভীরতা বজায় রাখতে হয়। রোপণের পর গোড়ার চারপাশ মাটি দিয়ে ভাল করে চেপে দিতে হবে।

মূলত গাছের জাতের উপর নির্ভর করে রোপণের দূরত্ব স্থির করা হয়। সাধারণভাবে T-bar ও pergola নামের দুই বিশেষ পদ্ধতিতে এই চারা রোপণ করা হয়ে থাকে। T-bar পদ্ধতির ক্ষেত্রে রোপণের সময় সারি থেকে সারির দূরত্ব হয় ৪ মিটার ও চারা থেকে চারার দূরত্ব হয় ৫-৬ মিটার। অন্যদিকে pergola পদ্ধতির ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬ মিটার রাখা হয়। Pergola পদ্ধতিতে সমতল উঁচু বা criss-cross তারের জালি তৈরি করে তার উপর কিউই গাছের লতাগুলি চড়িয়ে দিলে খুব ভাল ফলন পাওয়া যায়, তবে এই ব্যবস্থা খুব ব্যয়বহুল ও কষ্টকর। গাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে ডাল ছাঁটাই করলে ভাল হয়।

পরিচর্যা –

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে যখন বৃদ্ধি প্রথম দশায় থাকে তখন কিউই গাছে সেচ দিতে হয়। ১০-১৫ দিন অন্তর সেচ এক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে।

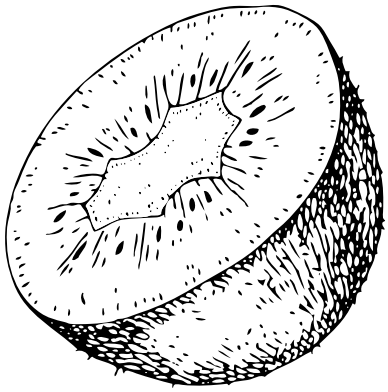
প্রতি বছর কিউই গাছে ২০ কেজি জৈবসার, ০.৫ কেজি NPK মিশ্রণ (১৫ নাইট্রোজেন যুক্ত) প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। গাছের ৫ বছর বয়সের পর থেকে প্রতি বছর ৮৫০-৯০০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ৫০০-৬০০ গ্রাম ফসফরাস, ৮০০-৯০০ গ্রাম পটাসিয়াম এবং জৈবসার ব্যবহার করা উচিত। নাইট্রোজেন সার দু'দফায় প্রয়োগ করতে হয়। সারের অর্ধেক বা দুই-তৃতীয়াংশ প্রথম দফায় জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে এবং বাকি পরিমাণ সার গাছে ফল আসলে অর্থাৎ এপ্রিল-মে মাসে প্রয়োগ করতে হয়। এই চাষে অতিরিক্ত ক্লোরিনের প্রয়োজন হয়। কারণ এর ঘাটতির ফলে গাছের কাণ্ড ও মূলের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। গাছ যখন খুব ছোট থাকে (এক বছরের কম বয়সী) তখন সার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গাছের চারধারে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়।

কিউই যেহেতু নরম কাণ্ড বিশিষ্ট লতানো উদ্ভিদ তাই কৃত্রিম কাঠামো তৈরি করে তাতে এই গাছ চড়িয়ে দিতে হয়। জমিতে গাছ রোপণের আগেও এই কাঠামো তৈরি করা যায়। নিয়মিতভাবে এই চাষের সময় জমিতে সাথী ফসল লাগিয়ে আগাছা দমন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে চারা রোপণের পর পাঁচ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন সবজি ও শিম্ব জাতীয় শস্যের চাষ করা লাভজনক হয়।

সেভাবে এই গাছে তেমন কোনও ক্ষতিকারক রোগপোকার আক্রমণের নজির নেই। তবে বিশেষ করে যে জমিতে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা খুব খারাপ সেখানে ফাইটোফোরা নামক ছত্রাকের কারণে গাছের শিকড়ে এক ধরনের স্ফীত তৈরি হয়। এছাড়া এই গাছের আক্রান্ত মরা কাণ্ড বা খারাপ ডাল থেকে Armillaria novaezelandiae নামক ছত্রাকের কারণে ফল সংক্রমিত হয়। আর্দ্র জলবায়ুতে Botrytis cinerea –র কারণে এই গাছের ফুল ও নতুন ফল আক্রান্ত হয়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

৪-৫ বছর বয়সে এই গাছে ফল আসে। তবে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু হয় ৭-৮ বছর বয়সে। তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে অধিক উঁচু জমির তুলনায় কম উঁচু জমির কিউই গাছের ফল তাড়াতাড়ি পরিণত হয়। ফল সংগ্রহের সময় বড় বেরী প্রকৃতির



ফলগুলিকে আগে তুলতে হয় যাতে ছোট ফল দ্রুত বড় হতে পারে। ফল সংগ্রহের পর মোটা কাপড় দিয়ে ফলগুলিকে ঘসে উপরের শক্ত লোমগুলিকে তুলে ফেলতে হয়। গাছ থেকে গড়ে ৫০-১০০ কেজি ফল পাওয়া যায়। গাছগুলি তারের জালির উপর চড়িয়ে দিলে ৭ বছর পর প্রতি হেক্টর জমি থেকে প্রায় ২৫ টন ফল পাওয়া যেতে পারে।

এই ফল শুধুই খাওয়া যায় অথবা স্যালাড বা ডেজার্টে অন্য ফলের সঙ্গেও খাওয়া যেতে পারে। এছাড়া স্কোয়াশ ও ওয়াইন প্রস্তুত করতেও কিউই ফল ব্যবহৃত হয়। কিউই ফল দিয়ে তৈরি জুস অত্যন্ত উপাদেয় ও স্বাস্থ্যকর। বিভিন্ন প্রকার কেক, মাফিন, পেস্ট্রি, জ্যাম, স্যান্ডউইচ, সস, দই ইত্যাদি তৈরিতে কিউই ফল ব্যবহার করা হয়।

কিউই ফলের অসীম পুষ্টিগুণ ও ঔষধি গুণ রয়েছে। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন B, ভিটামিন C, ভিটামিন K, ভিটামিন E এবং ফসফরাস, পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়ামের মতো খনিজ পদার্থ রয়েছে। এছাড়া একটি মাঝারি আকারের (৭৬ গ্রাম ওজনের) কিউই ফলে ৪৬ ক্যালরি শক্তি, ০.৩ গ্রাম ফ্যাট, ১ গ্রাম প্রোটিন, ১১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট এবং ২.৬ গ্রাম খাদ্যতন্তু থাকে।

এই ফলের বীজের তেলও খুব উপকারী। এই তেলে alpha-linolenic acid থাকে, যা একটি omega-3 fatty acid.

ওজনের ভিত্তিতে কিউই ফলের মান নির্ণয় করা হয়ে থাকে। ফলের ওজন ৭০ গ্রাম বা তার উপরে হলে তা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের(A-Grade) কিউই বলে বিবেচিত হয়। আর ওজন ৪০-৭০ গ্রামের মধ্যে থাকলে তা তুলনায় নিচু মানের (B-Grade) ফল হিসাবে চিহ্নিত হয়।

কিউই ফলকে সংরক্ষণ করা খুব সহজ। রেফ্রিজেরেটর ছাড়াই মোটামুটি ঠাণ্ডা জায়গায় ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত এই ফলকে রেখে দেওয়া যায়। আবার -০.৬ থেকে ০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রাখতে পারলে ৪-৬ মাস অবধি এই ফল সংরক্ষণ করা সম্ভব।

কিউই ফল বাজারে পাঠানোর জন্য প্যাকেজিং-এর তেমন কোনও সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। সাধারণভাবে ৩-৪ কেজি ফল ধরে এমন কাডবোর্ডের বাক্সে এই ফল প্যাকেজিং করা হয়। বাক্সে ধাপে ধাপে পলিথিন বিছিয়ে ফল রাখলে তার আর্দ্রতা বজায় থাকে এবং ভালভাবে অনেকদিন পর্যন্ত রাখা যায়। তুলনায় শক্ত ফলগুলি দূরবর্তী বাজারে পাঠাতে হয়। এরফলে ২ সপ্তাহের মধ্যে ফল নরম হয়ে যায় ও তা খাওয়ার উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

ভারতের হিমাচল প্রদেশ ও কেরালার বেশ কিছু অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে কিউই চাষ করলে তার ভবিষ্যত উজ্জ্বল হতে পারে।

ন্যাশনাল হর্টিকালচার বোর্ডের মডেল হিসাব অনুযায়ী, কমপক্ষে এক একর জমিতে কিউই ফলের চাষ করতে পারলে তা লাভজনক হতে পারে। যেক্ষেত্রে সব খরচ-খরচা ধরে মোট খরচ দেখানো হয়েছে আড়াই লক্ষ টাকা। চার বছর পর থেকে উৎপাদন পাওয়া যাবে। চতুর্থ বছর এক একর জমি থেকে যেখানে আনুমানিক উৎপাদন ৫ টন দেখানো হয়েছে, সপ্তম বছরে সেই উৎপাদন গিয়ে দাঁড়াবে ৮ টনে। প্রতি টন ফসলের দাম ১৮ হাজার টাকা হলে আয়ের অঙ্কটা ৯০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা হবে।

এক্ষেত্রে দেখা যায়, ঋণের টাকা পরিশোধ করেও লাভের পরিমাণ ফসল উপাদনের প্রথম বছরের চেয়ে পঞ্চম বছরে অনেকটাই বেড়ে যায়।

ন্যাশনাল হর্টিকালচার বোর্ডের মতে, উৎপাদন যেহেতু চতুর্থ বছর থেকে শুরু হয়, তাই ওই প্রাথমিক সময়ে যদি এক একর ওই জমিতে কিছু সবজির চাষ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ১০ হাজার টাকা খরচ হতে পারে এবং ওই জমি থেকে গড়ে ৬ টন সবজি মিলতে পারে, যার বাজারমূল্য ৩০ হাজার টাকা।

জাত পরিচিতি –

Acitinidia Genus-এর ৬০টি প্রজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। Actinidia deliciosa ছাড়া সাধারণত যে কিউই ফলগুলি খাওয়া হয়ে থাকে সেগুলি হল, Actinidia chinensis (Golden kiwifruit), Actinidia coriacea (Chinese egg gooseberry), Actinidia arguta (Baby kiwifruit), Actinidia kolomikta (Arctic kiwifruit), Actinidia melanandra (red kiwifruit), Actinidia polygama (silver vine), Actinidia purpurea (purple kiwifruit)

ভারতে চাষ হয় এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ জাতের কিউই হল, Abbott, Allison, Bruno, Hayward, Monty ও Tomuri

তথ্যসূত্র - http://nhb.gov.in, https://en.wikipedia.org/wiki/Kiwifruit, www.hort.purdue.edu, http://amader-kotha.com



আঙুর

পরিচয় –

আঙুর গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Vitis vinifera, এটি Vitaceae গোত্রের একটি লতানো উদ্ভিদ।

মনে করা হয়, রাশিয়ার ক্যাসপিয়ান সাগরের নিকটবর্তী আর্মেনিয়া এই আঙুরের আদি বাসস্থান। সেখান থেকে পরবর্তী সময়ে এই গাছ ইউরোপের পশ্চিম অংশে এবং ইরান ও আফগানিস্তানের পূর্ব অংশে বিস্তারলাভ করে। ইরান ও আফগানিস্তান থেকে আগত আক্রমণকারীদের হাত ধরে ১৩০০ সালে ভারতে আঙুর গাছের প্রবেশ ঘটে। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আঙুরের চাষ হয়। সবচেয়ে বেশি আঙুর উৎপাদিত হয় ইতালিতে। এছাড়া ফ্রান্স, স্পেন, টার্কি, চিন, আর্জেন্টিনা, ভারত প্রভৃতি দেশ আঙুর উৎপাদনে প্রথম সারিতে রয়েছে। আঙুর একটি লতানো জাতীয় উদ্ভিদ। লম্বায় গাছটি প্রায় ৩২ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। আঙুরের লতাগুলি একাধিক স্তর বিশিষ্ট হয়। পাতাগুলি করতলাকার, খাঁজকাটা ও একান্তরভাবে সজ্জিত থাকে। আঙুর গাছের পাতাগুলি ৫-২০ সেমি হয়ে থাকে। আঙুর ফল বেরী প্রকৃতির। জঙ্গলে জন্মানো আঙুরের ব্যাসার্ধ ৬ মিলিমিটার হয়ে থাকে। ফলের রং গাঢ় বেগুনী থেকে কালচে বর্ণের হয়। ফলের গায়ে মোমের মতো ফ্যাঁকাসে আস্তরণ থাকে। আবার চাষ হওয়া প্রজাতির আঙুর সাধারণত অনেকটা বড় হয়। লম্বায় প্রায় ৩ সেমি হয়ে থাকে। ফলের রঙও সবুজ, লাল বা বেগুনী (কালো) হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের মাটিতে বিভিন্ন অ্যাগ্রো-ক্লাইমেটিক জোনে আঙুর চাষ করা যেতে পারে। যেমন ভারতের উপক্রান্তীয়, উষ্ণ-ক্রান্তীয় এবং আংশিক ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে আঙুর হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের মাটিতে আঙুর চাষ করা সম্ভব হলেও ভাল নিকাশীর সুবিধাযুক্ত জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ হালকা বালি মাটি আঙুর চাষের উপযুক্ত। খারাপ নিকাশী ব্যবস্থা যুক্ত ক্ষারীয় মাটি এক্ষেত্রে এড়িয়ে চলাই ভাল। মাটির অম্ল-ক্ষারের মাত্রা ৮.৭ PH-এর কম থাকা বাঞ্ছনীয়।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

বীজ ছাড়াও বিভিন্ন উপায়ে আঙুর গাছের কৃত্রিম প্রসারণ ঘটানো সম্ভব। সাধারণত Cutting, Layering, Grafting এমনকি Budding পদ্ধতি ব্যবহার করে এই প্রসারণ করা যায়। রোপণ কী পদ্ধতিতে হচ্ছে তার উপর আঙুর চাষের জমির আয়তন নির্ভর করে। রোপণের আগে ভাল করে প্রস্তাবিত আঙুর চাষের জমি তৈরি করতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয় জমির সব অংশে যেন সেচের জল সমানভাবে সরবরাহ করা যায়। প্রয়োজন হলে মাটির ধরন বা তার উপাদান বিচার করে একাজে ট্রাক্টর বা বুলডোজার ব্যবহার করা যেতে পারে। বাগান তৈরির ক্ষেত্রে ১১৮ মিটার লম্বা, ৭৫ সেমি চওড়া এবং ৭৫ সেমি গভীরতা বিশিষ্ট ট্রেঞ্চ তৈরি করা হয়। বাগানে এরূপ দুটি ট্রেঞ্চের মাঝে ৩ মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হয়। এরপর ওই ট্রেঞ্চের ৪৫ সেমি গভীর অংশ উপরের মাটি দিয়ে ভরাট করে ১৫ দিন ধরে রোদ খাওয়াতে হয়। পরে বাকি অংশটিকে মাটি, গবাদি পশুর মল, সিঙ্গল সুপারফসফেট, সালফেট অফ পটাশ এবং অণুখাদ্যের মিশ্রন দিয়ে ভর্তি করে দিতে হয়। চাষ হওয়া জাতের আঙুরের কাটিং মূল জমিতে রোপণের উপযুক্ত সময় সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস। তবে rootstock রোপণের সঠিক সময় হল ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস। কী দূরত্বে রোপণ হবে তা মূলত মাটির উর্বরতা এবং জাতের উপর নির্ভর করে। যেমন ২ মিটার X ১৫ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে Head পদ্ধতিতে রোপণে প্রতি হেক্টরে ৩৩০০টি Vine লাগে, Kniffin পদ্ধতিতে ৩ মিটার X ৩ মিটার দূরত্ব বজায় রাখলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৮৯টি এবং Bower পদ্ধতিতে ৩ মিটার X ৬ মিটার দূরত্বে রোপণে সংখ্যাটা কমে হয় ৫৬১টি।

পরিচর্যা –

ভারতে আঙুর চাষের ক্ষেত্রে সেচের প্রয়োজনীয়তা বেশ কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন সেই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, ছাঁটাইয়ের সময়, বৃদ্ধির বিভিন্ন অবস্থা, মাটির জল ধরে রাখার ক্ষমতা, কোন জাতের বা কী দূরত্ব বজায় রেখে ওই আঙুর চাষ করা হচ্ছে ইত্যাদি। তবে সাধারণভাবে রোপণের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি ৩ দিন অন্তর গোড়ার ৫০ সেমি ব্যাসার্ধের এলাকাজুড়ে সেচ প্রয়োগ করতে হয়। পরবর্তী সময়ে গোড়ার ৩০ বা ৪০ সেমি ব্যাসার্ধের এলাকায় কমিয়ে বা বাড়িয়ে এই সেচ প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে ছাঁটাইয়ের পর পর অতিরিক্ত সেচের প্রয়োজন পড়ে। দেখতে হয় এসময় গাছের গোড়ার মাটি যেন ভেজা থাকে এবং শিকড়ে জলের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ থাকে। শীতকালে ১০-১২ দিন অন্তর হালকা সেচের (৫-৭.৫ লিটার/হেক্টর) প্রয়োজন হয়। আবার গ্রীষ্মের সময় এই হারে সেচ প্রয়োগ করতে হয় ৫-৭ দিন অন্তর। তবে গাছে ফল ধরতে শুরু করলে দু'বার সেচ প্রয়োগের মাঝের

সময় বাড়াতে হয়। এরফলে ফলের গুণগত মান ভাল হয়। আঙুর বাগানের মাটি হয় হালকা বালিযুক্ত বা ভারী কাদামাটির হয়, তাই ভারতে আঙুর চাষে জৈবসার প্রয়োগের গুরত্ব রয়েছে। সদ্য রোপণের পর মার্চ মাসে ২০ গ্রাম ইউরিয়া দেওয়া যেতে পারে। এই সার ওই একই হারে পরবর্তী সময়ে মে ও জুলাই মাসে প্রয়োগ করতে হয়। ৩ মিটার X ৩ মিটার দূরত্বে রোপণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বছরের পর থেকে এই সার একইভাবে দেওয়া যায়। এছাড়া ছাঁটাইয়ের পর FYM এবং সুপারফসফেট ছাড়াও অর্ধেক নাইট্রোজেন ও পটাসিয়াম প্রয়োগ করতে হয়। এপ্রিল মাসে ফল আসার পর বাকি অর্ধেক পরিমাণ নাইট্রোজেন এবং পটাসিয়াম প্রয়োগ করতে হয়। এই সারের ব্যভারে গাছে অঙ্গজ বৃদ্ধি ভাল হয়। আঙুর চাষের ক্ষেত্রে ডাল বা লতা ছাঁটাইয়ের কাজ সাধারণত জানুয়ারি মাসে করা হয়ে থাকে। ভাল স্বাস্থ্যের যথাযথ সংখ্যার কুঁড়ি বিশিষ্ট লতাগুলি বাদ দিয়েই এই কাজ করতে হয়। অর্থাৎ ১-২ টি কুঁড়ির লতাগুলিকে ছাঁটাই করা যেতে পারে। তবে আবহাওয়া বিচার করে এই ছাঁটাই বছরের বিভিন্ন সময়ে হতে পারে। ভারতে সাধারণত Bower পদ্ধতিতে Vine রোপণ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত ছায়ার কারণে খুব একটা আগাছা জন্মাতে পারে না। তবে Kniffin বা Head পদ্ধতিতে রোপণের ক্ষেত্রে আগাছা সমস্যা তৈরি করে। গাছের মাঝামাঝে জন্মানো আগাছা সাধারণত হাত দিয়েই তুলে ফেলা হয়। সারির মাঝের আগাছা দমনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে যন্ত্রের ব্যবহার করা যেতে পারে। পাশাপাশি আগাছা দমনের জন্য প্রয়োজন পড়লে প্রতি হেক্টর জমিতে প্রায় ২ কেজি Glyphosate বা ৭.৫ কেজি Paraquat নামক আগাছানাশক ব্যবহার করা যায়। আঙুর চাষের জমিতে অন্য কোনও সাথী ফসলের চাষ করা সম্ভব নয়। ভারতে আঙুর চাষের সময় সাধারণত Flea beetles, Thrips, Mealy bugs এবং Leaf hoppers রোগপোকাদের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া বেশ কিছু ক্ষতিকর রোগও আঙুর চাষে ব্যাঘাত ঘটায়। যেমন Anthracnose, Downy mildew, Powdery mildew ও Bacterial leaf spot সম্প্রতি Alternaria এই চাষে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। ০.৮% Bordeaux মিশ্রণ, ০.২৫% Copper oxychloride বা ০.১% Carbendazim প্রয়োগ করে Anthracnose প্রতিরোধ করা যেতে পারে। ১% Bordeaux মিশ্রণ, ০.২% Copper oxychloride, ০.২% Mancozeb, Metalaxyl বা Phosethyi-Al প্রয়োগ করে Downy mildew রোগ সংক্রমণ রোধ করা সম্ভব। Powdery mildew রোগের ক্ষেত্রে ০.০৭% Calaxin, ০.০৪% Karathane EC ছাড়া Myclobutanil, Triademifon বা Penconazol ছত্রাকনাশক ব্যবহার করে সুফল পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণে Streptocyclin, ০.৮% Bordeaux মিশ্রণ বা ০.১৫% Copper oxychloride ব্যবহার করা যেতে পারে।

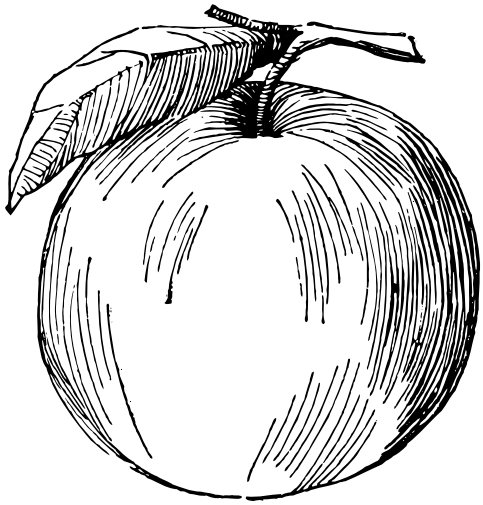
ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

বাগানের সব বেরী যখন পরিণত হয়ে যায় এবং একই রঙের হয়ে যায় একমাত্র তখনই আঙুর চাষে ফসল সংগ্রহ করা হয়। তবে অনেক সময় একসঙ্গে সব ফল না পাকলে বারেবারে হাত দিয়ে ফসল তোলা হয়ে থাকে। আঙুরের ক্ষেত্রে তার স্বাদই শেষ কথা। প্রথমে লতার গোড়ার দিকের ফলগুলি পাকে। এরপর একে একে লতার মাঝের ও সামনের দিকের বা অগ্রভাগের ফল পাকে। উত্তর ভারতে রোপণের ২ বছর পর থেকে আঙুর গাছে ফল আসতে শুরু করে। তাড়াতাড়ি ফল ধরে এমন জাতের গাছের ক্ষেত্রে বেরীগুলি মে মাসের শেষে পাকতে শুরু করে। যদিও বেশিরভাগ জাতের আঙুরের ক্ষেত্রে ফলের মাথার দিকের বর্ণ পালটাতে শুরু করলে বা তা মিষ্টি হলে ফল সংগ্রহ করতে শুরু করা হয়। সাধারণত দিনের শুরুতে গাছ থেকে আঙুর সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ফলন সব সময় জাত, জলবায়ু ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। Anab-e-Shahi এবং Bangalore blue জাতের আঙুরের ফলন প্রতি হেক্টরে ৪০-৫০ টন হয়। আবার বীজহীন জাতের ক্ষেত্রে এই উৎপাদন ২০ টন/হেক্টর হয়। স্বাভাবিকভাবে গড় উৎপাদন প্রতি হেক্টরে ২০-২৫ টন হয়ে থাকে। ফল সংগ্রহের পর তার আকার ও রং দেখে আঙুরের গ্রেডিং করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বেরীর আকার দেখা হয়, কখনই গুচ্ছের আকারকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলের গা থেকে মাঠের উষ্ণতা ও আর্দ্রভাব কমাতে এবং মজুত রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে তা সংগ্রহের ৬ ঘণ্টার মধ্যে ৪.৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রাখতে হয়। উপযুক্ত পরিবেশে ভারতে চাষ হওয়া বিভিন্ন জাতের আঙুরকে বিভিন্ন সময় ধরে সংরক্ষণ করে রাখা যায়। সাধারণভাবে ফলন সংগ্রহের পর গড়ে ৩০ দিন পর্যন্ত এই ফলকে সংরক্ষণ করা সম্ভব। গাছ থেকে পেড়ে সাধারণত ফল হিসাবেই আঙুর খাওয়া যায়। প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস ছাড়াও আঙুরে প্রায় ২০% সুগার থাকে। গোটা পৃথিবীতে যে পরিমাণ আঙুর উতপাদিত হয় তার ৮২% Wine তৈরির কাজে, ১০% Raisin তৈরি কাজে এবং বাকি ৮% ফল হিসাবে খাওয়া হয়। বর্তমানে অন্যান্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ব্যাপকভাবে এই ফল ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের দেশে ফল হিসাবেই আঙুর খাওয়ার চল সবচেয়ে বেশি। উৎপাদিত ফসলের খুব সামান্য অংশই মদ তৈরিতে বা Raisin জাতীয় ড্রাই-ফ্রুট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভারতে সবচেয়ে বেশি আঙুর উৎপাদিত হয় মহারাষ্ট্রে। তবে ঘরোয়া বাজারে চাহিদার তুলনায় এই ফলের উৎপাদন অনেক কম হওয়ার কারণে আঙুর চাষে ব্যাপক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

জাত পরিচিতি –

ভারতে বিভিন্ন জাতের আঙুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন Anab-e-shahi, Bangalore blue, Bhokri, Gulabi, Perlette এছাড়া Thompson ও অন্যান্য বীজহীন জাতও রয়েছে।

তথ্যসূত্র - www.nhb.gov.in, www.agrifarming.in, wikipedia



আপেল

পরিচয় –

আপেল গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Malus pumila, এটি Rosaceae গোত্রের মাঝারি উচ্চতার পর্ণমোচী শ্রেণীর একটি গাছ। কমলালেবু, কলা ও আঙুরের পর আপেল পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সমাদৃত চতুর্থ সমৃদ্ধ ফল হিসাবে পরিচিত। চিনে সবচেয়ে বেশি আপেল উৎপাদিত হয়। মনে করা হয়, ৪০০০ বছর আগে মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলি আপেল গাছের আদি বাসস্থান। ধীরে ধীরে তা ইউরোপ থেকে ফ্রান্সে বিস্তারলাভ করে। ১০৬৬ সালে ইংল্যান্ডবাসীদের সঙ্গে আপেল গাছের পরিচয় হয়। সাধারণত চাষ করলে পর্ণমোচী এই গাছটি উচ্চতায় ৬-১৫ ফুট হয় এবং জঙ্গলে স্বাভাবিক নিয়মে বেড়ে ওঠা গাছ ৩০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। তবে বীজ থেকে তৈরি গাছের উচ্চতা অনেক বেশি হয়। আপেল গাছের উপবৃত্তাকার পাতাগুলি গাঢ় সবুজ বর্ণের এবং বিপরীতমুখীভাবে বিন্যস্ত থাকে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৫০০-২৭০০ মিটার উঁচু জমিতে আপেল গাছ জন্মায়। আপেল গাছের বৃদ্ধির সময় ২১-২৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা চাষের পক্ষে অনুকূল। আপেল চাষের জন্য খুব বেশি বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয় না। বার্ষিক ১০০-১২৫ সেমি বৃষ্টিপাত এই চাষের উপযোগী। অতিরিক্ত বৃষ্টি বা কুয়াশায় আপেল চাষের ক্ষতি হয়। খুব দ্রুত গতিতে হাওয়া চলাচল করে, এমন জায়গা আপেল চাষের সহায়ক নয়। জৈব পদার্থে সমৃদ্ধ হালকা মাটি আপেল চাষের উপযুক্ত। মাটির অম্লতা-ক্ষারীয় মাত্রা ৫.৫-৬.৫ PH হওয়া বাঞ্ছনীয়। জমিতে নিকাশীর সুবন্দোবস্ত থাকা উচিত। আপেল গাছ জমা জল সহ্য করতে পারে না।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

বীজ থেকে আপেল গাছের কৃত্রিম প্রসারণ সম্ভব। তবে বাণিজ্যিকভাবে আপেল চাষের ক্ষেত্রে চাষীরা budding ও tongue grafting পদ্ধতিতে প্রসারণ ঘটিয়ে থাকেন। এভাবে তৈরি আপেল গাছের চারা অনুমোদিত নার্সারী থেকেই কেনা উচিত এবং রোপণের জন্য তা জমিতে নিয়ে আসার সময় বাড়তি সতর্কতা গ্রহণ করা উচিত। যে জমিতে প্রস্তাবিত বাগানটি হবে রোপণের আগে ভাল করে তার নকশা তৈরি করতে হয় এবং জমি আগাছা দমন করে চাষ দিয়ে নিতে হবে। তারপর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে জমিতে ১ X ১ X ১ মিটার আয়তনের গর্ত করে প্রতি গর্তে ৩০-৪০ কেজি জৈবসার (FYM), ৫০০ গ্রাম Single super phosphate এবং ৫০ Malathion চূর্ণ ভাল করে মিশিয়ে ভরাট করে দিতে হবে। এরপর সাধারণত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে গর্তগুলিতে চারা রোপণ করে সেচ প্রয়োগ করতে হয়। সাধারণত প্রতি হেক্টর জমিতে গড়ে ২০০-১২৫০ টি আপেল চারা লাগে। তবে জমিতে চারটি বিভিন্ন ঘনত্বে এই আপেল চারা রোপণ করা যেতে পারে। যেমন কম (প্রতি হেক্টরে ২৫০টি চারা), স্বাভাবিক (প্রতি হেক্টরে ২৫০-৫০০টি চারা), বেশি (প্রতি হেক্টরে ৫০০-১২৫০টি চারা) এবং খুব বেশি ঘনত্ব (প্রতি হেক্টরে ১২৫০টির বেশি চারা)। যদিও শেষমেশ কী দূরত্বে চারা রোপণ করা হবে তা নির্ভর করে তার জাত বা জন্ম পরিচয়ের উপর। উপত্যকা অঞ্চলে স্কোয়ার বা হেক্সাগোনাল পদ্ধতিতে এবং জমির ঢালে কন্টুর পদ্ধতিতে আপেল গাছের চারা রোপণ করা হয়ে থাকে।

পরিচর্যা –

বছরে আপেল গাছের ১১৪ সেমি জলের প্রয়োজন হয়, যা ১৫-২০ বার সেচ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রদান করা সম্ভব। গরমের সময় ৭-১০ দিন অন্তর এবং শীতকালে ৩-৪ সপ্তাহ অন্তর সেচ প্রয়োগ করতে হয়। এপ্রিল-অগাস্ট মাসে সঙ্কটের সময় কমপক্ষে ৮ বার সেচ দিতে হয়। অর্থাৎ গাছে ফল ধরার পরই সেচের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি হয়। বছরে গাছ প্রতি ১০ কেজি জৈবসার অন্যান্য সারের সঙ্গে মিশিয়ে আপেল গাছে দিলে ভাল হয়। আপেল বাগানের ক্ষেত্রে প্রতি বছর গাছ প্রতি ৭০: ৩৫ : ৭০ গ্রাম অনুপাতে NPK সার দেওয়া যেতে পারে। ১০ বছরের পর থেকে প্রতি বছর প্রতি গাছে ৭০০ : ৩৫০ : ৭০০ অনুপাতে NPK সার প্রয়োগ করতে হয়। বোরন, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ ও ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করতে যথাযথভাবে সার প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি। গাছের গোড়ায় মাটিতে আর্দ্রতা ধরে রাখতে শুকনো ঘাস বা ওক পাতা বিছিয়ে মালচিং করলে উপকার পাওয়া যায়। ভাল ফলন পেতে হলে সময়মতো আপেল গাছের ডাল ছাঁটাই করা যেতে পারে। বিশেষ করে চারা রোপণের ৬ বছর পর থেকে যথাযথ ডাল জরুরি। ডাল ছাঁটাই করলে গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধি ও ফল পরিণত হওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হয়, গাছে যেন পর্যাপ্ত আলো পড়ে। যথেষ্ট আলো পেলে ফলের রং ভাল হয় এবং অতিরিক্ত তুষারপাতের কারণে তৈরি হওয়া সমস্যাও দূর হয়। আপেল গাছের সঙ্গে চারা রোপণের পর পরই জমিতে বিন, সূর্যমুখী প্রভৃতি সবুজ সারের শস্য চাষ করা যেতে পারে। এরফলে মাটির পুষ্টিগুণও বৃদ্ধি পায়। আপেল গাছে সাধারণত San Jose Scale, White Scale, Wooly Apple Aphid, Blossom Thrips প্রভৃতি ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। ভাল rootstock-এর চারা রোপণ, যথাযথভাবে সাথী ফসলের চাষ এবং

Chloropyriphos, Fenitrothion, Carbaryl ইত্যাদি কীটনাশক স্প্রে করে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়া আপেল বেশ কিছু রোগের আক্রমণও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন Apple scab, Collar rot, Crown gall, Sclerotius blight, Cankers, Die-back ইত্যাদি। রোগ প্রতিরোধে সক্ষম আপেল চারা ব্যবহার করা উচিত। এছাড়া গাছের সংক্রমিত অংশগুলি দ্রুত ধ্বংস করে, Carbendazim, Copper oxichloride, Mancozeb ও অন্যান্য ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে। বিভিন্ন রোগপোকার আক্রমণ ছাড়াও আপেল গাছে বেশ কিছু অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়। তিনভাবে গাছ থেকে আপেল পড়ে যেতে দেখা যায়। যেমন অনিষিক্ত বা পরাগমিলনে ব্যর্থ ফুলের ঝরে পড়া, জুন মাসে আর্দ্রতাজনিত কারণে বা ফলের ভিড়ে ফল ঝরে পড়া এবং ফসল তোলার আগে ফল ঝরে পড়া। ১০ ppm-এ NAA (৪৫ লিটার জলে ১ মিলিমিটার Planofix) স্প্রে করে সুফল পাওয়া যায়।

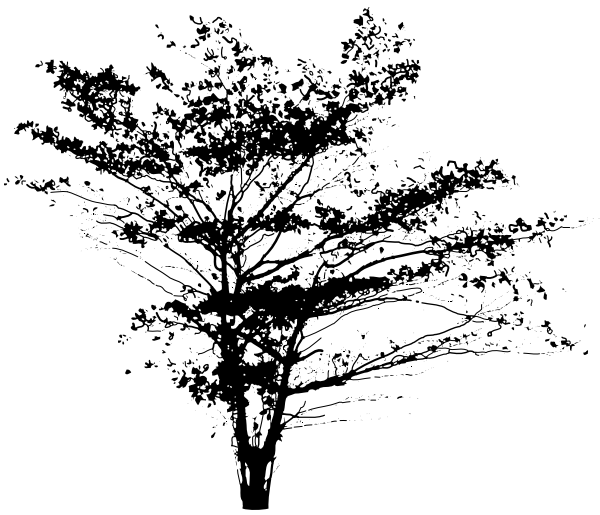
ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

৮ বছর বয়স থেকে আপেল গাছে ফল আসে। ৮-১৭ বছর বয়সে ফলন ক্রমশ বাড়ে। ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত এই উৎপাদন একই থাকে। টিলা থেকে টিলায় আপেলের উৎপাদনে ফারাক দেখা যায়। আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে আপেল গাছ সর্বোচ্চ ৪০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। পুরোপুরি পাকার আগেই গাছ থেকে আপেল সংগ্রহ করতে হয়। জম্মু-কাশ্মীর ও হিমাচল প্রদেশে চাষ হওয়া বিভিন্ন জাতের আপেলের গড় উৎপাদন প্রতি হেক্টরে প্রায় ১১-১৩ টন হয়ে থাকে। আবার আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলে আপেলের ফলন খুবই কম, প্রতি হেক্টরে মাত্র ৫-৬ টন। গাছ থেকে সংগৃহীত হওয়ার পর সাধারণত ফল হিসাবেই আমরা আপেল খেয়ে থাকি। তবে জুস, জেলি, ক্যানড্ স্লাইসেজ বা অন্যান্য জিনিস তৈরিতেও আপেল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ১০০ গ্রাম আপেলে ৫২ কিলো ক্যালরি শক্তি, ১৩.৮১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ১০.৩৯ সুগার, ২.৪ গ্রাম খাদ্যতন্তু, ০.১৭ গ্রাম ফ্যাট, ০.২৬ গ্রাম প্রোটিন ছাড়াও ৩ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন – A, ২৭ মাইক্রোগ্রাম বেটা-ক্যারোটিন, ০.০১৭ মিলিগ্রাম ভিটামিন – B1 , ভিটামিন – B2 ০.০২৬ মিলিগ্রাম, ভিটামিন – B3 ০.০৯১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন – B5 ০.০৬১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন – B6 ০.০৪১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন – B9 ৩ মাইক্রোগ্রাম, ৪.৬ মিলিগ্রাম ভিটামিন – C, ০.১৮ মিলিগ্রাম ভিটামিন – E ও ২.২ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন – K থাকে। এই পরিমাণ আপেলে জল ও ফ্লুয়োরাইড ছাড়াও বিভিন্ন অনুপাতে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ফসফরাস, পটাসিয়াম, সোডিয়াম ও জিঙ্কের মতো খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। প্রতিদিন এই ফল খেলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। বিশেষ করে আপেল আমাদের মস্তিষ্ক ভাল রাখে, হার্টের সমস্যা বা স্ট্রোক, টাইপ-২ ডায়বেটিস কিংবা ক্যানসারের আশঙ্কা কমায়। ফসল সংগ্রহের পর প্যাকেজিং-এর আগে হাওয়া চলাচল করতে পারে এমন ঠাণ্ডা জায়গায় আপেল রেখে দিতে হয়। এতে ফল থেকে জমির উষ্ণ ভাব চলে যায়। দেখতে হয়, গ্রেডিং, র‍্যাপিং ও প্যাকিং-এর আগে ওইসব আপেল যেন আর্দ্রতা থেকে দূরে থাকে। ফলের আকার বা ফল দেখতে কেমন এবং তার গুণগত মানের উপর নির্ভর করে আপেলের গ্রেডিং বা মান নির্ণয় করা হয়ে থাকে। সাধারণত AAA, AA ও A; A,B,C; বা extra fancy, fancy class I এবং fancy class II এইসব নামে আপেলের গ্রেডিং করা হয়। অন্যান্য ফলের চেয়ে আপেল অনেক বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায়। ফসল সংগ্রহের প্রায় ৪-৮ মাস পর্যন্ত এই ফল সংরক্ষণ করে রাখা যায়। প্রায় -১.১ থেকে ০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ৮৫-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় হিমঘরে আপেল রাখা যেতে পারে। প্রায় ১০-২০ কেজি ফল ধরে এমন কাঠের বাক্সে আপেল প্যাকিং করা হয়। তবে খাঁজকাটা ফাইবার বোর্ডের কার্টুনও প্যাকিং-এর কাজে ব্যবহৃত হয়। বাগান থেকে সংগ্রহ করা ফল স্থানীয় বাজারে নিয়ে যেতে ট্রাক ব্যবহার করা হয়। এছাড়া কমিশন এজেন্টদের মাধ্যমেও আপেল বাজারজাত করা হয়। ২০০১-০২ সালের হিসাব অনুযায়ী জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাঞ্চল, অরুণাচল প্রদেশ ও নাগাল্যান্ডের মোট ২৪১.৬ হেক্টর জমিতে আপেলের চাষ হয়। যেখানে মোট উৎপাদন ছিল ১১৫৮.৩ মেট্রিক টন। পৃথিবীতে যে পরিমাণ আপেল উৎপন্ন হয় তার মাত্র ২.০৫% উৎপন্ন হয় ভারতে। দেশে উৎপাদিত আপেলের প্রায় ১.৬% বিদেশে যায়। রফতানি বাড়াতে ইতিমধ্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। হিমাচলের কয়েকটি জেলা নিয়ে তৈরি হয়েছে এগ্রি-এক্সপোর্ট জোন। এছাড়া আপেল চাষ হওয়া রাজ্যের চাষীদের জন্য ন্যাশনাল হর্টিকালচার বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সরকার আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারেরও উদ্যোগ নিচ্ছে।

জাত পরিচিতি –

ভারতে চাষ হওয়া বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন জাতের আপেল পাওয়া যায়। যেমন Clonal rootstocks শ্রেণীর M9, M26, M7, MM11, MM106, Scab resistant শ্রেণীর Prima, Priscilla, sir Prize, Jonafree, Florina, Macfree, Nova Easy Grow, Coop 12, Coop 13 (Redfree), Nova Mac, Liberty, Freedom, Firdous, Shireen, Hybrids শ্রেণীর Lal Ambri (Red Delicious x Ambri), Sunehari (Ambri x Golden Delicious), Chaubattia Princess, Chaubattia Anupam (Early Shanburry x Red Delicious), Ambred (Red Delicious x Ambri), Ambrich (richared x Ambri), Ambroyal (Starking Delicious x Ambri), Low Chilling শ্রেণীর Michal, Schlomit, Anna, Tamma, Vered, Neomi, Tropical Beauty, Parlin's Beauty, Pollinizing শ্রেণীর Tydeman's early, Red Gold, Golden Delicious, Mc Intosh, Lord Lambourne, Winter Banana, Granny Smith, Starkspur Golden, Golden Spur

তথ্যসূত্র – www.agrifarming.in, nhb.gov.in, wikipedia



কাঠ বাদাম

পরিচয় –

বাংলা বাদাম বা কাঠ বাদামের বিজ্ঞানসম্মত নাম Terminalia catappa, এটি Combretaceae গোত্রের একটি গাছ।

কাঠ বাদামের আদি জন্মস্থান দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে। কাঠ বাদাম খুব বিখ্যাত ও শক্তিদায়ক ফল। বিশ্বের সর্বত্রই কাঠ বাদাম উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর মধ্যে প্রথম ১০টি কাঠ বাদাম উৎপন্নকারী দেশ হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, ইরান, মরক্কো, ইতালি, সিরিয়া, টিউনিশিয়া, তুর্কি, আলজেরিয়া, চিন।

ইংরেজিতে কাঠ বাদামকে বলা হয়, Almond বা Indian almond ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে স্থানীয় ভাষায় কাঠ বাদামকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। তেলেগুতে বাদাম পাপ্পু, তামিলে বাদাম পারাপ্পু, কোঙ্কনীতে বাদাম, ওড়িয়াতে বাদাম, হিন্দিতে বাদাম, অসমীয়ায় বাদাম, মারাঠীতে বাদাম, গুজরাটিতে কাঠ বাদাম, মালায়লমে বাদাম কায়ু, কন্নড়ে বাদামি এবং বাংলায় বলা হয় কাঠ বাদাম বা বাংলা বাদাম।

কাঠ বাদাম গাছ সাধারণত পর্ণমোচী প্রকৃতির হয় এবং উচ্চতায় প্রায় ১০ মিটার পর্যন্ত হয়। গাছের গুঁড়িটির বেড় প্রায় ৩০-৩৫ সেমি হয়। উদ্ভিদগতভাবে কাঠ বাদামের ফল প্রধানত ড্রুপ প্রকৃতির, বাদাম নয়। ফলের বাইরে একটা খোসা বা আবরণ থাকে। শক্ত খোলা সমেত বীজটি থাকে ভেতরে।

কাঠ বাদাম গাছ সাধারণত সমুদ্রতল থেকে ৮০০-৩,৫০০ মিটার উচ্চতায় জন্মায়। এই গাছ উষ্ণ- শুষ্ক গ্রীষ্ম এবং অল্প ভিজে শীতযুক্ত এলাকা, যেমন ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুতে ভাল জন্মায়। ১৫-৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জন্মায়। সুপ্ত অবস্থা থেকে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হতে ৭.২ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে ২৫০-৬০০ ঘণ্টা অতি তীব্র ঠাণ্ডার দরকার হয়। কাঠ বাদাম গাছ ঠাণ্ডায় ও তুষারপাতে খুবই স্পর্শকাতর। তাই যেসব অঞ্চলে তুষারপাত হয় সেই জায়গা কাঠ বাদাম চাষের জন্য উপযুক্ত নয়।

সব রকম মাটিতেই কাঠ বাদাম জন্মায়। তবে গভীর, ভাল নিকাশীযুক্ত, দোঁয়াশ মাটিতে এর বৃদ্ধি সব থেকে ভাল হয়। জল জমা ও বেশি জলযুক্ত মাটি কাঠ বাদাম চাষের জন্য উপযোগী নয়। উন্নতমানের বাদাম ও বেশি উৎপাদনের জন্য সেই ধরনের মাটি প্রয়োজন, যেখানে মাটির ক্ষারীয় মাত্রা ০.৭-৮.৫ থাকবে ।

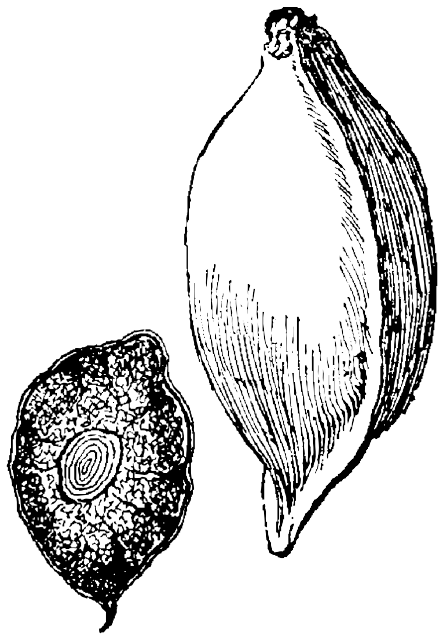
কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

বীজ থেকে বা অঙ্গজ জনন, দু'ভাবেই কাঠ বাদাম গাছের প্রসারণ সম্ভব। প্রসারণের জন্য চলতি মরসুমে অবশ্যই মিষ্টি বা কষটে (তেতো) বাদাম সংগ্রহ করতে হবে। বাদাম গুলিকে সরাসরি ভালভাবে তৈরি বেডে বপন করতে হবে। বপনের সময় ভাল অঙ্কুরোদ্গমের জন্য বাদামগুলি স্তরে স্তরে রাখতে হবে। বাদাম চাষের প্রথম ১০-১২ বছরে পীচ ফলকে Rootstock হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে Rootstock-এর আয়ু কম হওয়ার কারণে এর উপরে জন্মানো কাঠ বাদাম গাছ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। Shield budding পদ্ধতির দ্বারা মাটি থেকে ১০-১২ সেমি উপরে পেনসিলের মতো ঘন দূরত্বে কাঠ বাদামের চারাগুলি অবশ্যই মুকুলিত হবে।

দু'বারের বেশি জমি কর্ষণ করে এবং সমান করা হয়। জমিতে আগের কোনও ফসলের থেকে আগাছা থাকলে তা অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে। শেষ কর্ষণের সময় যথাযথ জৈব বস্তু মাটিতে যোগ করতে হবে। অঙ্গজ প্রসারণের ক্ষেত্রে মাটির চরিত্র, কলমের জন্য গাছের বিছিন্ন অংশের সজীবতা এবং সেচব্যবস্থার উপর নির্ভর করে ৫.৫–৭.৫ মিটার মাপের একটি বর্গাকার বা ষড়ভুজাকার জায়গা তৈরি করতে হবে। প্রত্যেক তৃতীয় সারিতে পরাগসংযোগকারী প্রজাতিই রোপণ করতে হবে। পরাগসংযোগকারী প্রজাতির ফুল ফোটার সময় প্রধান প্রজাতির ফুল ফোটার সময়ের সঙ্গে মিলে যাবে। সঠিক পরাগসংযোগের জন্য ফুল ফোটার সময় মাঠে ৫-১০টি মৌমাছির বাসা রাখতে হবে।

পরিচর্যা –

বাদাম গাছে সেচ দেওয়া নির্ভর করে মাটির ধরন এবং জলবায়ুর অবস্থার উপর। জলের ঘাটতি হলেই সেচ দেওয়ার দরকার হয়। জলের যথাযথ ব্যবহারের জন্য কাঠ বাদাম চাষে Drip irrigation দেওয়া যেতে পারে। ভারী বৃষ্টিপাতের বা বন্যার জন্য অতিরিক্ত জল জমে গেলে তা বের করে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত নিকাশীব্যবস্থা থাকতে হবে। জমা জলে কাঠ বাদাম গাছ খুব স্পর্শকাতর।



তবে Drip irrigation ব্যবহার করলে কিছু বিষয়ে উপর নজর রাখাটা জরুরি। প্রথাগতভাবে দুই সারিতে যে জায়গা দেওয়া থাকে পুরনো গাছগুলিকেও সেই একইভাবে রাখতে হবে, মাটির ধরন অনুযায়ী ১টি বা ২টি সারিতে নতুন চারাগুলি রোপণ করতে হবে, Dripper গুলির মধ্যে অনুমোদিত দূরত্ব ০.৫ মিটার রাখতে হবে, জল পড়ার মাত্রা থাকবে প্রতি ঘন্টায় ১.৬-২.৫ লিটার এছাড়া মাটির চরিত্র, গাছের বয়স ও জলবায়ু অনুযায়ী প্রত্যেক ২-৩ দিন অন্তর সেচ দেওয়া যেতে পারে।

মাটি তৈরির সময় ভাল করে পচানো ৪০০-৫০০ কেজি কৃষিক্ষেত্রের সার (FYM) মাটিতে মেশাতে হবে। গাছের যথাযথ পুষ্টির চাহিদা জানতে হলে, মাটি পরীক্ষা করা অবশ্যই প্রয়োজন। কাঠ বাদাম গাছ খুব বেশি খাবার খায় এবং সচেয়ে বেশি উৎপাদন পেতে হলে এর বৃদ্ধির সমস্ত সময়জুড়ে অবশ্যই সঠিক সার প্রয়োগ করতে হবে। বারেবারে (মোটামুটি ২-৩ মাত্রায়) নাইট্রোজেন (N) দিতে হবে। কাঠ বাদাম গাছ প্রস্ফুটিত হওয়ার সময়ে প্রথম অর্ধেক মাত্রা পটাসিয়াম (P) ও সোডিয়ামের (K) সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। তারপর দ্বিতীয় মাত্রা (পুরো মাত্রার ১/৪ ভাগ) প্রয়োগ করতে হবে ফল ধরার তিন সপ্তাহের পর এবং তৃতীয় মাত্রা (পুরো মাত্রার ১/৪ ভাগ) প্রয়োগ করতে হবে জুন বা জুলাই মাসে।

তাড়াতাড়ি প্রস্ফুটিত হওয়ার কারণে, বিশেষ করে মুকুল ধরার সময় কাঠ বাদাম গাছ তুষারপাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এমনকি ঋতু শেষের তুষারপাতেও ক্ষতি হয়। এই অবস্থায় তুষার থেকে রক্ষা করতে সেচের হার প্রতি ঘণ্টায় ৩.৫ মিলিমিটার রেখে প্রত্যেকটি গাছের জন্য সুপার নেট মাইক্রো স্প্রিংলার (Super net micro-springler) ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফলের বাগান সঠিকভাবে তৈরির জন্য ডাল ছাঁটাই ও প্রশিক্ষণের মতো অন্তঃসম্পর্কিত ব্যবস্থা ব্যবহার করা উচিত। রোপণের সময় মাটির স্তর থেকে অবশ্যই ১ মিটার উপরে কাঠ বাদাম গাছের সন্মুখভাগ থাকবে। গাছের প্রথম শাখা মাটির স্তর থেকে ০.৭ মিটারের নীচে থাকবে না। ৩-৪টি নির্মীয়মাণ শাখা রাখার মাধ্যমে একটা কেন্দ্রীয় প্রধান ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। যা থেকে একটা ভাল সামঞ্জস্যপূর্ণ গাছ জন্মাতে পারে। গাছের যে জায়গা থেকে শাখা বের হয়, এমন ৫০-৬০টি কোণা থেকে শক্ত নির্মীয়মান শাখা তৈরি করতে হবে। যদি গাছের ওই ডাল বেরোনোর জায়গায় ক্ষত তৈরি হয়, তবে শাখাগুলিকে সরু তারের সূতো দিয়ে বেঁধে দেওয়া দরকার। ডাল ছাঁটাই এমনভাবে করতে হবে যাতে নতুন পার্শ্বশাখা জন্মায় এবং তারমধ্যে যেগুলি বেশিদিন কাজে লাগবে না সেগুলিকে ক্রমাগত সরিয়ে দেবে। দেখতে হয়, গাছের গায়ে যেন শ্যাওলা না জন্মায় এবং গাছের রস টেনে নেওয়া শোষক সরিয়ে দিতে হবে।

কাঠ বাদাম গাছে প্রধানত brachycaudus amygdaliana, capnodis tenebrionis, cerambyx dux, eccoptogester amygdala, eurytoma amygdali, lymantria destituta, lyonetia clerkella, meloidogyne spp, mites, navel orange worm, twig borer প্রভৃতি পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা যায়।

এছাড়া এই গাছে Agrobacterium tumefaciens, brown rot, cercospora circumscissa, deplodea sp., nematodes, oak rot, polystigma ochraceum, pytophthora, rust on stone fruit, silver leaf, verticulium spp. প্রভৃতি প্রধান প্রধান রোগ দেখতে পাওয়া যায়।

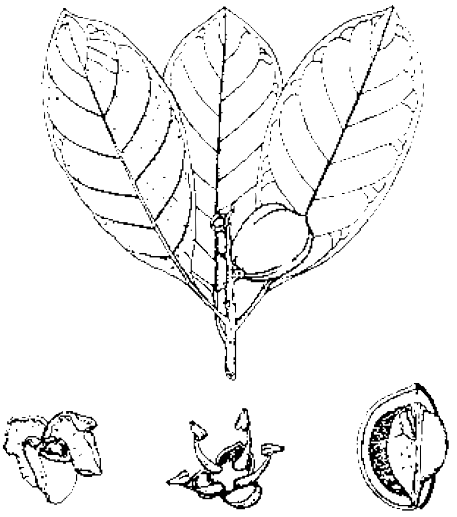
কাঠ বাদাম চাষে এই সকল রোগপোকা নিয়ন্ত্রণ করতে স্থানীয় হর্টিকালচার দফতরের বা যে কোনও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

যখন কাঠ বাদামের রং সবুজ থেকে হলুদ হয়ে যায়, ফলের উপর ভাঙা দাগ থাকে বা সব ফলের বাইরের আবরণ বা খোলাটা খুলে গিয়ে ভাঙতে শুরু করে তখনই বুঝতে হয় তা পেকে গেছে। গাছ ঝাঁকিয়ে ফল সংগ্রহ করা যায়। সংগ্রহ করা কাঠ বাদামগুলি ছাদনা বা মাথার উপর ঢাকা আছে, এমন জায়গায় শুকানোর জন্য কিছু সময় রাখা হয়।

কাঠ বাদামের উৎপাদন মাটির ধরন, সেচব্যবস্থা, সার প্রয়োগ, চাষ পদ্ধতি এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। তবে সাধারণত প্রতি হেক্টরে ১-২ টন ফল উৎপাদন হয়। কাঠ বাদাম চাষে সঠিক পদ্ধতি-প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে ভাল লাভ পাওয়ার সম্ভবনা থাকে।

গাছ থেকে সংগ্রহ করে কাঁচাই খাওয়া যায়। কাঠ বাদাম রান্নায় এবং তেল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কাঠ বাদাম দুধ, ময়দা, সিরাপ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।



কাঠ বাদাম প্রচুর ভিটামিন ও মিনারেলের উৎস। হাড় মজবুত করার ক্ষেত্রে কাঠ বাদাম খুব ভাল। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে ও হার্টের পক্ষে উপকারী। মানুষের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়াতে সাহায্য করে কাঠ বাদাম। ত্বকের ক্ষেত্রেও এই বাদাম খুব ভাল। কাঠ বাদামের মধ্যে শরীরের ঘায়ের জ্বালা-যন্ত্রণা প্রতিরোধকারী গুণ রয়েছে। উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণ করে কাঠ বাদাম। কোলন ক্যানসার ও মধুমেহ রোগকে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে কাঠ বাদাম। এছাড়া দেহের ওজন কমাতে ও কোষ্ঠকাঠিন্যের উপশমে কাঠ বাদাম খুবই উপকারী।

এর পুষ্টিগুণ, উপকারীতা এবং স্থানীয় বাজারে একই রফতানি মূল্যের জন্যও এশিয়ার দেশগুলিতে বাণিজ্যিকভাবে কাঠ বাদাম চাষ খুব সফলতা পেয়েছে। যথাযথভাবে সঠিক উন্নত জাতের কাঠ বাদাম চাষ করলে ভাল লাভ করা সম্ভব।

জাত পরিচিতি –

ব্যবহার ও স্বাদ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতের কাঠ বাদাম দেখা যায়। তবে কাঠ বাদামের মূলত দু'ধরনের প্রজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়, একটি নরম আবরণের (যা আমেরিকার ক্যালির্ফোণিয়াতে জন্মায়) এবং অপরটি শক্ত আবরণের (যেমন স্প্যানিশ প্রজাতি মাকোনা এবং ডেসমায়ো যা বেশিরভাগই পর্তুগালে জন্মায়)। এশিয়ার ইন্ডিয়ান কাঠ বাদাম বিখ্যাত প্রজাতিগুলির মধ্যে একটি। বিভিন্ন স্থানীয় অঞ্চলে অনেক উন্নত প্রজাতি পাওয়া যায়। বাণিজ্যিকভাবে বড় আকারের কাঠ বাদাম উৎপাদন করতে হলে উচ্চ ফলনশীল কাঠ বাদামের প্রজাতিকে বীজ সংগ্রহের জন্য নির্বাচন করা হয়।

শক্ত খোলার বা আবরণের প্রজাতি দুটি হল, Texas ও Buttei। নরম খোলার বা আবরণের প্রজাতিগুলি হল, Ruddy, Thomson, Carmel। সাধারণ খোলের বা আবরণের প্রজাতি হল, California Mission Neplus, Hanatziv, Um-el-Fahem, Be'eri, Greek, Marcona, এছাড়া মিষ্ট স্বাদের কাঠ বাদাম ও তিক্ত স্বাদের কাঠ বাদামও পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র – www.agrfarming.in



সুন্দরবনের কেওড়া

পরিচয় –

কেওড়া গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Sonneratia caseolaris, এটি Sonneratiaceae গোত্রের ম্যানগ্রোভ জাতীয় চিরহরিৎ উদ্ভিদ।

এই গাছটি ইন্দো-মালয়েশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ায় এবং চিন, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, কলম্বিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইনস্ প্রভৃতি দেশে দেখা যায়। ভারতের পশ্চিমঘাট অঞ্চলে এই জাতের কেওড়া গাছটি পাওয় যায়। আমাদের রাজ্যে মূলত সুন্দরবন অঞ্চলে এই গাছটিকে দেখা যায়। যে অঞ্চলগুলিতে জোয়ারের লবণাক্ত জল উঠে আসে, সেইসব জায়গায় এই উদ্ভিদের বিস্তার বেশি হয়।

এই ধরনের কেওড়া গাছের সাধারণ বা ইংরেজি নাম Pagatpat, অনেকে আবার একে Apple Mangroveও বলে।

কেওড়া ছোট আকারের বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ এবং এর সর্বোচ্চ উচ্চতা ৯ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। পাতাগুলি পুরু, লোমশ এবং গোড়ার দিকে বিস্তৃত হয়। বৃন্ত ছোট হয়, ৪–১০ সেমি লম্বা এবং ২-৪ সেমি চওড়া হয়। ক্ষুদ্রতম শাখাগুলি সংযুক্ত এবং চর্তুভূজাকৃতির হয়। ফুলগুলি একলিঙ্গ এবং বৃতি সবুজ বর্ণের। ২.৫-৩ সেমি দীর্ঘ এবং ৬-৮ টি কোণীয় ভাগে বিভক্ত থাকে যা বৃতির নলের তুলনায় লম্বা হয়। ফুলে সাধারণত ৬টি পাপড়ি থাকে। পাপড়িগুলি সরু ও গোলাপী বা সাদা বর্ণের হয়। অনেকগুলি লম্বা আকৃতির পুংকেশর থাকে। কেওড়া গাছের ফুলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, সন্ধ্যায় ফুলগুলি খোলা থাকে কিন্তু সকালের দিকে ফুলের পাপড়িগুলি বন্ধ হয়ে যায়। অসংখ্য বীজযুক্ত ফলগুলি মৃদু অম্ল স্বাদের, শক্ত, ৩-৪ সেমি ব্যাসযুক্ত গোলাকার হয়। ফলগুলির গোড়ার দিক বৃতি দ্বারা আবৃত থাকে।

মূলত ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় এই গাছটি বেশি জন্মাতে দেখা যায়। যে অঞ্চলের বার্ষিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস মধ্যে থাকে সেখানে এই গাছ সবচেয়ে ভাল হয়। যদিও ১০-৩৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে এই গাছের। বার্ষিক ১৫০০-২৫০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত এই গাছের পক্ষে উপযোগী। তবে ১০০০-৩০০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলেও কেওড়া গাছ হতে পারে।

কেওড়া গাছ সূর্যের আলো পছন্দ করে। যে কোনও মাটিতেই এই গাছ জন্মাতে পারে। তবে ভারী মাটি এই গাছের পক্ষে সহায়ক। উপকূলীয় লবণাক্ত মাটি এই গাছের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযোগী। মাটি অম্ল-ক্ষারীয় মাত্রা ৬.৭-৭.৩ PH কেওড়া গাছের অনুকূল হলে ৬৫-৭৫ PH মাত্রাতেও এই গাছ বেঁচে থাকতে পারে। কেওড়া গাছ ঝোড়ো, লবণাক্ত হাওয়া সহ্য করতে সক্ষম।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

স্বাভাবিকভাবে জঙ্গলে মথ, বাদুর ও পাখির দ্বারা এই গাছের প্রসারণ হয়ে থাকে। তবে অন্যান্য ম্যানগ্রোভ প্রজাতির উদ্ভিদের মতো বীজ থেকেও কেওড়া গাছ প্রসারিত হয়। তবে ৩ মাসের আগেই বীজের অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। এই বীজ থেকে নার্সারীতে চারা তৈরি করে বা সরাসরি উপযুক্ত জমিতে বপন করে কৃত্রিমভাবে এর প্রসারণ ঘটানো যেতে পারে।

পরিচর্যা –

যেহেতু উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ত মাটিতে কেওড়া গাছ স্বাভাবিক উদ্ভিদ হিসাবে জন্মায়, তাই এই গাছের জন্য সেভাবে আলাদা করে পরিচর্যার প্রয়োজন পড়ে না। নিয়ম করে সেচ বা সার প্রয়োগের কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে মানুষের কারণে অন্যান্য স্বাভাবিক ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের মতো এই গাছের পরিমাণও ক্রমশ কমছে, তাই IUCN (International Union for Conservation of Nature) এই গাছে তাদের লাল তালিকাভুক্ত করেছে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

গাছে সদ্য ধরা কেওড়া ফল শুধু শুধু বা সবজি হিসাবে রান্না করে খাওয়া যেতে পারে। অনেকটা চিজের মতন খেতে এই ফল টক স্বাদের হয়ে থাকে। এই কেওড়া ফলে পেকটিন থাকে।

কেওড়া গাছের ফল নানা খাদ্যের উপাদান হিসাবে ব্যবহার হয় এবং ভিনিগার প্রস্তুতিতে এর বহুল ব্যবহার রয়েছে।



কেওড়া গাছের নানান ঔষধি গুণ রয়েছে। এই গাছটিকে Haemostatic বলা হয়। এই গাছের গাঁজানো ফলের জুস রক্তক্ষরণ রোধ করে। হাত-পায়ের যন্ত্রণায়, শরীরের কোনও অংশ অস্বাভাবিকভাবে ফুলে গেলে বা কৃমি নাশ করতে এর চিরাচরিত ব্যবহারের কথা জানা যায়। পুরনো কেওড়া ফলের খোসা কৃমির চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। অর্ধেক পাকা কেওড়া ফল কফ্ প্রতিরোধে উপকারী। এই গাছের পাতার গুঁড়ো Haematuri এবং Smallpox রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। গাছের পাতার গুঁড়ো নুনের সঙ্গে মিশিয়ে কাটা ও পোড়া জায়গায় লেপ হিসাবে লাগালে উপকার পাওয়া যায়। মুত্রের সঙ্গে রক্ত পড়ার চিকিৎসায় কেওড়া গাছের ফুলের রস ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এই গাছের কাঠেরও বেশ কদর রয়েছে। উপকূলের জলা জায়গায় বসবাসকারী মানুষজনের কাছে কেওড়া গাছ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া এই গাছ ভূমিক্ষয় রোধে সাহায্য করে এবং বন্যপ্রাণীদের উপযুক্ত বাসস্থান তৈরিতেও খুব উপযোগী। তাই উপযুক্ত পরিবেশে বনসৃজনের কাজে এই গাছ রোপণ খুবই কার্যকর হতে পারে।

কেওড়া গাছের গোড়া থেকে মাটির উপর দিকে উলম্বভাবে যে মূলগুলি নির্গত হয় তা মাছ ধরার জালে বা জুতোর ভিতরকার সোল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কর্কের বিকল্প হিসাবে এই মূল ব্যবহার করা যেতে পারে। মুলগুলি ব্যবহারের আগে তা সিদ্ধ করে নিতে হয়। এই গাছের ছালে ট্যানিন থাকে। কেওড়ার ছালও চর্মশিল্পে ব্যবহৃত হয়। গাছের ভিতরের কাঠ খুব মজবুত ও নোনতা স্বাদের হয়। এই অংশের কাঠ কাণ্ডছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ রোধ করতে সক্ষম। এই কাঠ জাহাজ, সেতু, রেললাইন, বাড়ি বা বিদ্যুতের খুঁটি তৈরির কাজে খুব উপযোগী। এছাড়া আসবাব ও বাদ্যযন্ত্র তৈরিতেও কেওড়া গাছের কাঠ ব্যবহার হয়ে থাকে। কাঠের মান ভাল না হলে অনেক সময় তা জ্বালানির কাজেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

জাত পরিচিতি –

বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানীয় নামে কেওড়া গাছকে ডাকা হলেও এই গাছের চাষ হওয়া কোনও উন্নত জাতের উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

তথ্যসূত্র – www.flowersofindia.net, http://tropical.theferns.info



ফলসা

ফলসার বিজ্ঞানসম্মত নাম Grewia asiatica, এটি Malvaceae গোত্রের একটি বুনো ফল হিসাবে পরিচিত।

এই ফলটি প্রধানত দক্ষিণ এশিয়ার ফল। পাকিস্তান থেকে কম্বোডিয়া পর্যন্ত এই ফলের দেখা মেলে। এছাড়া বর্তমানে ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্যান্য দেশে ফলসার চাষ হচ্ছে।

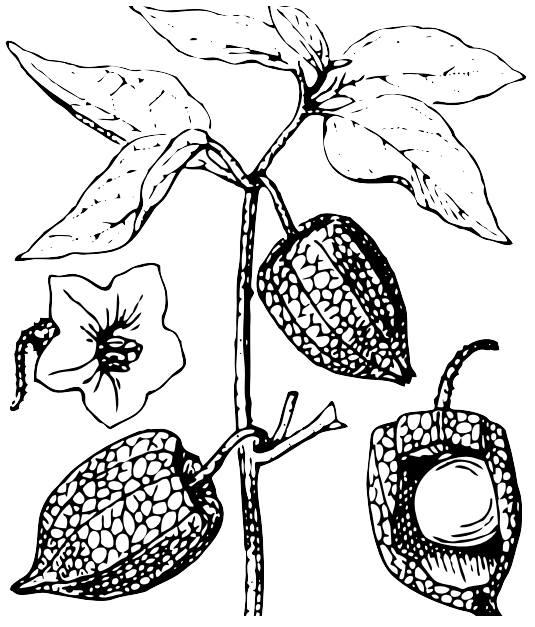
ফলসা মাঝারি আকৃতির পাতাঝরা গাছ। এই গাছ সাধারণত ৫-৮ মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। গাছের পাতাগুলি গোলাকার, খসখসে, রোমশ ও কিনারা দাঁতালো। পাতাগুলি লম্বায় ৫-১৮ সেমি পর্যন্ত হতে পারে। পত্রবৃন্তগুলি ১-১.৫ সেমি দীর্ঘ হয়। মার্চ-এপ্রিল মাসে গাছে হালকা হলদে রঙের ক্ষুদ্রাকৃতির ফুল ফোটে। আর ফল পাকতে শুরু করে মে-জুন মাসের দিকে। ফলগুলি ড্রুপ প্রকৃতির, দেখতে অনেকটা মটর দানার মতো, গোলাকার। ফলের কাঁচা রং সবুজ, তখন স্বাদে টক থাকে। পাকলে ফলগুলির রং কালচে বাদামি হয়, তখন স্বাদ হয় টক-মিষ্টি ধরনের হয়।

বিভিন্ন দেশে ফলসার চাষ খুব কম পরিমাণেই হয়ে থাকে। সাধারণত গ্রীষ্মকালে এই ফল বাজারে বিক্রি হতে দেখা যায়। এর কদর মূলত এর টক-মিষ্টি স্বাদের কারণে। গরমের সময় ফলসার শাঁসকে জলে গুলে চিনি মিশিয়ে সরবত বা স্কোয়াশ বানানো হয়। এই ফলের রস গরমে ক্লান্তিনাশক। প্রতি ১০০০ গ্রাম ফল থেকে ৭২৪ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষের বাতের চিকিৎসায় এই গাছের মূল ব্যবহার করে থাকেন। এই গাছের কাণ্ডের ছাল চিনি শোধন করতে, দড়ি তৈরি করতে প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়। ফলসা গাছের পাতা ব্রণ বা ফুসকুড়ি সারাতে খুব উপযোগী। ফলসার কুঁড়িও চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়।

একসময় আমাদের গ্রামেগঞ্জে প্রচুর পরিমাণে ফলসা গাছ দেখা গেলেও ইদানীং বেশ দুর্লভ হয়ে উঠেছে। বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটি করত পাখিরা। শহরে এই গাছ খুঁজে পাওয়া অনেকটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। কারণ এই ফল শিশুদের পাশাপাশি পাখিদেরও অনেক প্রিয়। সম্ভবত কাকই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। ফলসা পাকার মরসুমে সারাদিনই ওদের আনাগোনা চোখে পড়ে। হয়তো আরও অনেক প্রাণী এই ফল খেয়ে বেঁচে থাকে। শুধু ফলের কথা বাদ দিলেও ফলসা গাছ হিসেবেও অনন্য। বড় বড় পাতার এই গাছ ডালপালা ছড়িয়ে ছাতার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। সারা বছর তামাটে রঙের নতুন নতুন পাতা ফলসা গাছের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তথ্যসূত্র – Wikipedia, কৃষি ও সম্ভাবনা ডেস্ক (বাংলাদেশ)



বনটেপারি

বনটেপারির বিজ্ঞানসম্মত নাম Physalis minima, এটি Solanaceae গোত্রের আগাছাজাতীয় ফলের গাছ। ইংরেজিতে বনটেপারিকে সাধারণত Native gooseberry বলে। এছাড়াও এটি Wild cape gooseberry বা Pygmy groundcherry নামেও পরিচিত। বনটেপারি মূলত Pan-tropical জলবায়ু অঞ্চলের গাছ। পরিণত অবস্থায় গাছের উচ্চতা ২০-৫০ সেমি হয়ে থাকে।

বনটেপারিতে একটিমাত্র ফল হয়। ফল পাকলে লাল রঙের দেখতে হয়। বনটেপারি ফলের চারদিকে যে কাগজের মতো আবরণ থাকে ফল পাকলে তা বাদামি বর্ণের হয়ে যায়। পাকা ফল মাটিতে ঝরে পড়ে। আকৃতিগত সাদৃশ্যের কারণে বনটেপারি ফলের অপর নাম চায়নিজ ল্যান্টার্ন। ফলের ভেতরে অনেকগুলি ছোট ছোট বীজ থাকে। বনটেপারি ফল খেতে খুব সুস্বাদু। কিছুটা টক স্বাদের। চিনে স্যালাডে এই বনটেপারি ফল ব্যবহার করা হয়। এছাড়া এই ফলের ভেষজ গুণও রয়েছে।

তথ্যসূত্র – http://www.beshto.com



গাব

গাব গাছ সাধারণ দু'ধরনের হয়। বিলাতি গাব গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Diospyros blancoi বা Diospyros discolor, আর দেশি গাবের বিজ্ঞানসম্মত নাম Diospyros malabarica, উভয় ধরনের গাব গাছই Ebenaceae গোত্রের উদ্ভিদ।

ইংরেজিতে সাধারণভাবে গাবকে Mabolo, Korean mango বা Velvet-apple বলা হয়। তামিল ভাষায় গাবকে তুম্বিকা, সংস্কৃতে এর নাম তিন্দুকা এবং হিন্দিতে গাব বলে।

বিলাতি গাব গাছ বনে-জঙ্গলে আপনা-আপনি জন্মায়। গাছের সর্বোচ্চ ৩৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। এর কাণ্ড কালচে, যার ব্যাস ৭০ সেমি পর্যন্ত হতে পারে। এর পাতা ঘন-নিবিড়। পাতা লম্বা, বর্শার ফলার ন্যায় এবং চামড়া দৃঢ় হয়। পাতা ধীরে ধীরে পুরু হয়। সবুজ থেকে গভীর সবুজ হয়। পাতার আকার অনেকটা গরু-মহিষের জিভের মতো। শাখাবহুল মাঝারি ধরনের গাছটি পাতায় পাতায় নিবিড় হয়ে যায়। বোঁটা ছোট এবং বিন্যাস একান্তর। ফুল একলিঙ্গ, স্ত্রী ও পুরুষ গাছরা স্বতন্ত্র। পুরুষ ফুল স্ত্রী ফুলের চেয়ে ছোট। কিন্তু পুরুষ ফুলের মঞ্জরীতে ফুলের সংখ্যা বেশি হয়। ফুলে ৪টি পাপড়ি থাকে। নুগন্ধ বিশিষ্ট হয়। ফুল থেকে ফল হয়, বছরে একটি গাছে প্রায় ৪ হাজার ফল ধরে। কাঁচা গাবের রং ইঁটের গুঁড়োর মতো হয়। শ্রাবণ মাসে গাব পাকলে তার রং হলদে থেকে গাঢ় লাল রঙের হয়। খোসার উপরটা মখমলের মতো চকচকে ও মসৃণ হয়। ফলের ভেতরটা সাদা হয়। আপেলের আকারের এই ফলগুলি গোলাকার হয়। প্রায় ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা ও ২-৪ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত হয়। ওজনে ১০০-৫০০ গ্রাম পর্যন্ত হয়। আর দেশি পাকা গাবের ভেতরটা আঠালো ও চটচটে হয়।

আমাদের দেশে নিকাশীর সুবন্দোবস্তযুক্ত প্রায় সব ধরনের মাটিতেই গাব গাছ হয়। সাধারণত বীজ থেকে চারা তৈরি করে বা ৮-১২ মিটার দূরত্বে জমিতে সরাসরি বীজ বপন করে গাব গাছের চাষ করা যেতে পারে। বীজের গাছ থেকে ফল পেতে ৬-৭ বছর সময় লাগে। তবে গ্রাফটিং বা লেয়ারিং মাধ্যমে চারা তৈরি করে প্রসারণ সবচেয়ে উপযোগী। এভাবে তৈরি চারা জমিতে রোপণ করলে ৩-৪ বছরে ফল পাওয়া সম্ভব। তাছাড়া বীজের চারার ফলে মাতৃগুণ বজায় থাকে না।

বিলাতি বর্ষার শুরুতে ৭-৮ মিটার দূরে দূরে ১ X ১ X ১ মিটার আয়তনের গর্ত করে তাতে মাটির সঙ্গে ২০ কেজি কম্পোষ্ট, ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০০ গ্রাম এম.ও.পি. মিশিয়ে ভরাট করতে হয়। এর ১০-১২ দিন পর চারা রোপণের পর জলসেচ দিতে হয়। প্রথমের দিকে ১-২ দিন অন্তর এবং পরে ৫-৭ দিন অন্তর সেচ দিলে ভাল হয়। তবে মাটি শুকিয়ে গেলে প্রয়োজন বুঝে সেচের পরিমাণ বাড়াতে হয়।

ফেব্রুয়ারি, মে এবং অগাস্ট ও নভেম্বর মাসে গাছ প্রতি ২-৩ কেজি আবর্জনা পচা সার, ২৫ গ্রাম ইউরিয়া, ২৫ গ্রাম টি.এস.পি. ও ২৫ গ্রাম পটাশ সার দিলে গাছ খুব দ্রুত বাড়বে। গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে প্রতি বছর উল্লিখিত মাত্রায় সার পূর্ববর্তী বছরের সারের সঙ্গে যোগ করতে হবে। এতে গাছের বৃদ্ধি যেমন সুনিশ্চিত হয়, তাতে ফলও ধরে তাড়াতাড়ি।

দু'ধরনের গাবই গাছ থেকে পেড়ে ফল হিসাবে খাওয়া যেতে পারে। এছাড়া বিলাতি গাব দিয়ে জুস, ডেজার্ট, ফ্রুটকেক, ক্রীম ইত্যাদিও তৈরি করা হয়। ১০০ গ্রাম বিলাতি গাবে ৫০৪ ক্যালরি শক্তি, ০.৭৫ গ্রাম প্রোটিন, ০.২২-০.৩৮ গ্রাম ফ্যাট, ৫.৪৯- ৬.১২ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট ইত্যাদি থাকে।

বিলাতি গাব আমাদের শরীরের পক্ষে খুব উপকারী। ঠাণ্ডাজনিত বিভিন্ন অসুখে এই ফল বেশ উপযোগী। রক্তচাপ ও মধুমেহ রোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখে গাব। হৃদরোগ ও স্ট্রোক, অন্ত্রের বিভিন্ন রোগ এবং কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। গাবে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়ায়।

দেশি গাবের কষ যেখানে লাগে আর ছাড়তে চায় না। এর কষ কাপড়ে লাগলে আর ওঠে না। নৌকা ও জাল রাঙাতে গাবের ছালের কষ ব্যবহৃত হয়। এতে জাল ও নৌকা মজবুত হয়। ফলের ত্বক ট্যানিনের কাজে লাগে, শাঁস ও আঠা ব্যবহৃত হয়। ফলে অল্পবিস্তর পুষ্টি উপাদান রয়েছে। ফলের খোসার গুঁড়ো আমাশয় নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। অ্যাকজিমা ও চর্মরোগ, কৃমি প্রভৃতি নিরাময়ে এই ফল খুব উপকারী।

তথ্যসূত্র – www.toptropicals.com,www.pepeelika.com, Wikipedia

গোলাপ জাম



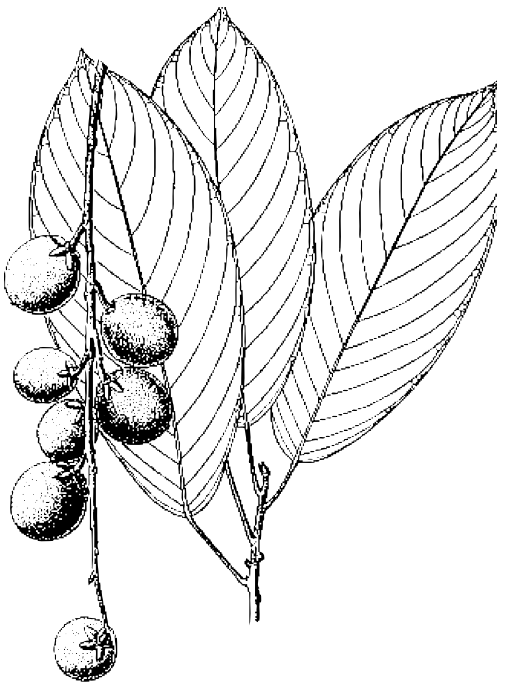
গোলাপ জামের বিজ্ঞানসম্মত নাম Syzygium jambos, এটি Myrtaceae গোত্রের একটি গাছ।

গোলাপ জাম বাংলার একটি মজাদার ফল। এই ফলের বিভিন্ন স্থানীয় নামগুলি হল, Malabar plum, Rose apple, Gulab jamun ইত্যাদি।

গোলাপ জাম গাছের আদি বাসস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও মালয়। সেখান থেকেই এই ফলটি ভারতীয় উপমহাদেশে বিস্তারলাভ করে। ভারত, বাংলাদেশ, ফিলিপাইনস্, চিন, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে গোলাপ জামের গাছ দেখা যায়।

খুব সুন্দর আকারের দেখতে এই ফল হালকা হলুদ কিংবা হালকা গোলাপী রঙের হয়। স্বাদে গোলাপ জাম মিষ্টি। ফলটি রসালো এবং গোলাপ ফুলের সুগন্ধযুক্ত হয়। এই ফলে প্রায় সব ধরনেরর পুষ্টি উপাদানই রয়েছে। মাঝারি আকারের এই ফল গাছ প্রায় ৫০-৬০ বছর পর্যন্ত বাঁচে। প্রায় ৪০-৫০ বছর ধরে গাছটি ফল উৎপাদন করতে পারে। গাছ লাগানোর ২-৩ বছর পর থেকেই ফল সংগ্রহ করা যায়। গোলাপ জাম গাছে মাঘ-ফাল্গুন মাসে ফুল আসে এবং জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ মাসের মধ্যে ফল পাকে ।

তথ্যসূত্র - http://www.wikibangla.net



লটকন

লটকনের বিজ্ঞানসম্মত নাম Baccaurea motleyana, এটি Phyllanthaceae গোত্রের একটি স্বল্প পরিচিত ফলের গাছ।

সাধারণত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্য জায়গায় এই স্বাভাবিকভাবে এই গাছটি জন্মায়। এছাড়া বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড এবং মালয়েশিয়ার কিছু অংশে লটকনের চাষ হয়।

এই গাছটি সাধারণভাবে Rambai বা Rambi নামে পরিচিত। বাংলায় একে লটকন বলা হয়ে থাকে।

লটকন গাছের উচ্চতা ৯-১২ মিটার হয়। গাছে একটি মুকুটের মতো অংশ থাকে। গাছের চিরহরিৎ পাতাগুলির উপরিভাগ চকচকে সবুজ রঙের হয়। পাতার তলার দিকটা রোম যুক্ত হয়। প্রতিটি পাতা লম্বায় ৩৩ সেমি এবং চওড়ায় ১৫ সেমি হয়ে থাকে। এই জাতের লটকন গাছটি উভলিঙ্গ প্রকৃতির, অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী ফুলগুলি গাছে আলাদাভাবে থাকে। প্রতিটি ফুল সুগন্ধ যুক্ত হয় এবং হলুদ রঙের বৃত্তাংশ থাকে। লটকন ফলগুলি ভেলভেটের মতো ও গোলাপী রঙের বা বাদামি ত্বকযুক্ত হয়। যার ভিতরে সাদা রঙের শাঁস ও ৩-৫টি বীজ থাকে। ফল পেকে গেলে ত্বক কিছুটা কুঁচকে যায়। ফলগুলি লম্বায় ২-৫ সেমি হয়। ফল মিষ্টি বা সামান্য টক স্বাদের হয়। ফল গাছ থেকে পেড়ে বা রান্না করে সবজি হিসাবেও খাওয়া যায়। লটকন জ্যাম বা ওয়াইন তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ছায়দানকারী গাছ হিসাবেও লটকন খুব উপযোগী। এই গাছের কাঠ নিম্নমানের হয়। ফল খেলে বমি বমি ভাব দূর হয় ও তৃষ্ণা নিবারণ হয়। শুকনো পাতার গুঁড়ো ডায়রিয়া ও মানসিক চাপ মুক্তির পক্ষে উপকারী।

বাংলাদেশে লটকন অতি সুপরিচিত অপ্রচলিত ফল। বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, চাষের জন্য ২০০৮ সালে বারি লটকন -১ জাতটিকে অনুমোদন করে। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে এই ফল পাকে। গাছ প্রতি ৩ হাজার ৩৩৪টি ফল পাওয়া যায়। এটি একটি নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ প্রতি ফলন ৪৫ কেজি (১২.৫০ টন/হেক্টর) হতে পারে। মাঝারি আকারের প্রতিটি ফলের গড় ওজন ১৪ গ্রাম। প্রতিটি ফলে ৪-৫টি ক্ষুদ্রাকারের বীজ থাকে এবং ফল গোলাকার, ফলের শাঁস রসালো, নরম এবং টক-মিষ্টি স্বাদ বিশিষ্ট। প্রতিটি ফলে ৪-৫টি কোষ থাকে।

নিকাশীর সুবিধাযুক্ত প্রায় সব ধরনের মাটিতেই লটকনের চাষ করা যায়। তবে বেলে দোয়াঁশ মাটি লটকন চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। লটকন গাছ স্যাঁতস্যাঁতে ও আংশিক ছায়াময় পরিবেশে ভাল জন্মায়। কিন্তু মাটিতে জল দাঁড়ালে এই গাছ সহ্য করতে পারে না।

জমিতে চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল ও আগাছা মুক্ত করে নিতে হবে। এরপর ১ মিটার চওড়া ও ১ মিটার গভীর গর্ত করে প্রতি গর্তে ১৫-২০ কেজি জৈব সার বা গোবর সার, ৫০০ গ্রাম টি.এস.পি. ও ২৫০ গ্রাম এম.ও.পি. সার গর্তের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে রাখতে হবে। এর ১৫-২০ দিন পর নির্বাচিত চারা গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগাতে হবে। চারা রোপণের পর জল দিতে হবে। প্রয়োজনে চারাটিকে সোজাভাবে দাঁড় করানোর জন্য খুঁটি দিতে হবে।

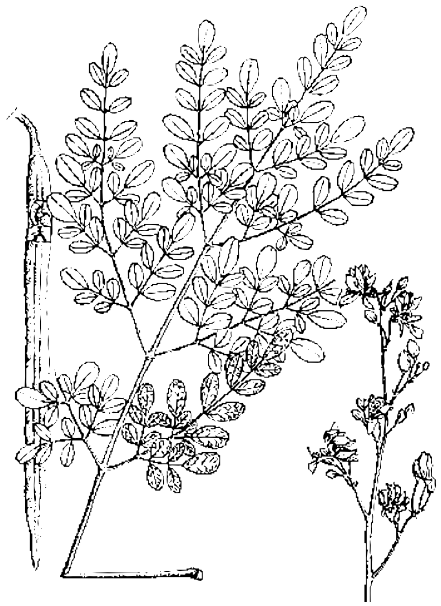
সাধারণত এপ্রিল-মে মাস (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে বর্ষার শেষের দিকে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর (ভাদ্র-আশ্বিন) মাসেও চারা রোপণ করা যেতে পারে।

পূর্ণবয়স্ক গাছে প্রতি বছর ১৫-২০ কেজি গোবর, ১ কেজি ইউরিয়া, ৫০০ গ্রাম টি.এস.পি. ও ৫০০ গ্রাম এম.ও.পি. সার সমানভাবে দু'বারে বর্ষার আগে ও পরে প্রয়োগ করা হতে পারে। চারা রোপণের প্রথম দিকে ঘনঘন সেচ দেওয়া দরকার। ফল ধরার পর শুকনো মরসুমে শীতের শেষে গাছে ফুল আসার পর দু'একটা সেচ দিতে পারলে ফলের আকার বড় হয় ও ফলনও বাড়ে।

গাছের মরা বা রোগপোকা আক্রান্ত ডাল ছাঁটাই করে দিতে হবে। শীতের শেষে গাছে ফুল আসে এবং ফল থাকে জুলাই-অগাস্ট মাস অবধি। লটকন ফলের রং হালকা হলুদ থেকে ধূসর বর্ণ ধারণ করলে বুঝতে হবে ফল সংগ্রহের উপযুক্ত সময় হয়েছে। কলমের গাছে সাধারণত ৫ বছর বয়স থেকে ফল আসা শুরু হয় এবং ১৮-২০ বছরের গাছ থেকে সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যায়। জায়গা ও গাছের বয়সের ওপর নির্ভর করে গাছ প্রতি ৪ কেজি (৪ বছরে) থেকে ১২০-১৩০ কেজি (১৮-২০ বছরে) পর্যন্ত ফলন পাওয়া সম্ভব।

তথ্যসূত্র – wikipedia, কৃষি ও সম্ভাবনা ডেস্ক, বাংলাদেশ

সবজি হিসাবে ব্যবহৃত ফলের গাছ



সজনে

পরিচয় –

সজনে গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Moringa oleifera, এটি Moringaceae গোত্রের বহুবর্ষজীবি দ্বিবীজপত্রী ছোট আকৃতির উদ্ভিদ। ভারতের উত্তর পশ্চিম হিমালয়ের পাদদেশে এই গাছের আদি জন্মস্থান। গাছটি নিম্ন হিমালয় পর্বতমালার মধ্য দিয়ে বয়ে আসা চীনাব নদীর পাশ্ববর্তী অঞ্চল থেকে শুরু করে উত্তরপ্রদেশে হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের অরণ্যের স্বাভাবিক উদ্ভিদ হিসাবে জন্মায়। বর্তমানে ভারতের বেশিরভাগ রাজ্যেই সবজি হিসাবে এর ফল (ডাঁটা), ফুল ও পাতা ব্যবহার হয়। সজনে চাষ রোপণের দ্বারা বিস্তার লাভ করেছে। পৃথিবীর উষ্ণ ও উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের বহু দেশে এই গাছ বিস্তারলাভ করেছে। জল পরিশোধনে জৈবপদার্থ হিসাবে সজনের খোল ব্যবহৃত হয়। তাই Natural Water Treatment প্রকল্পে এটিকে একটি মূল্যবান উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়। পৃথিবীর, বিশেষ করে আফ্রিকা মহাদেশের গরীব মানুষের কাছে সজনে একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর সবজি হিসাবে গণ্য হয়। সজনের বীজের তেল Ben Oil নামে পরিচিত। সজনে গাছকে ইংরেজিতে Drumstick বলে, সজনের Generic নাম Moringa শব্দটি এসেছে তামিল শব্দ থেকে। সংস্কৃতে সজনেকে সোভাঞ্জনা, হিন্দিতে সোয়ানজানা, তামিল ভাষায় মুরুনগাই, তেলেগুতে সজনা, মালায়লমে সিগ্রু এবং বাংলা ভাষায় সজনে বা সজনা নামে পরিচিত। সজনে গাছটি উচ্চতায় প্রায় ১২ মিটারের কাছাকাছি পর্যন্ত হতে পারে। কাণ্ডের ছাল ধূসর বাদামি রঙের হয়। কাণ্ডটি খসখসে ধরনের হয়। কাণ্ডের ক্ষতস্থান থেকে এক ধরনের আঠা নিসৃত হতে পারে। কাণ্ডের বেড় বেশি মোটা হয় না। ডালপালাও খুবই পলকা হয়। পাতাগুলি ত্রিপক্ষল যৌগিক প্রকৃতির হয়। লম্বায় ২৫-৬০ সেমি পর্যন্ত হয়ে থাকে। পত্রবৃন্তে গ্রন্থি থাকে, যা থেকে তরল জাতীয় একপ্রকার পদার্থ নিসৃত হয়। পত্রকগুলি ডিম্বাকার, উপবৃত্তাকার বা কিছুটা আয়তকার আকৃতির হয়। এগুলি একটু নরম-রোমশ প্রকৃতির ও কিনারা মসৃণ হয়। লম্বা-চওড়ায় ১-২ X ০.৫ – ১.২ সেমি আকারের হয়। ফুলগুলি ১০-৩০ সেমি লম্বা শাখাপ্রশাখা যুক্ত মঞ্জরীদন্ডের উপর সজ্জিত থাকে। ফুলগুলি সাদা বা ঘিয়ে রঙের হয়। ফুলগুলি বৃতি, দলমন্ডল, পুংকেশরচক্র ও গর্ভকেশরচক্র নিয়ে গঠিত। সজনের ফুল উভলিঙ্গ। তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট ক্যাপসুল, যা লম্বায় ২০-৫০ সেমি পর্যন্ত হয়ে থাকে। বীজও কোনাকৃতির, কিছুটা উপবৃত্তাকার। ০.৫-১ সেমি সাদা কাগজের মতো বা ডানাযুক্ত হয়। সাধারণত বছরের ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি মাসে সজনে গাছে ফুল আসে। তবে অনেক গাছে প্রধানত বছরে দু'বার ফুল ফল জন্মায়। সজনে গাছের উপযুক্ত তাপমাত্রা ২৫-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। তবে ৪৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রাও সহ্য করতে পারে। অল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত রুক্ষ ও শুষ্ক জলবায়ুতেও ভালভাবে জন্মাতে পারে। ২৫০-৩০০০ মিলিমিটার বার্ষিক বৃষ্টিপাত সজনে গাছের উপযুক্ত। সজনে গাছের গোড়ায় জল জমে গেলে এই গাছ তা সহ্য করতে পারে না। উন্নত নিকাশীর ব্যবস্থা যুক্ত উঁচু জমিতে সজনে গাছের চাষ করতে হয়। মাটির অম্লতা ও ক্ষারীয় মাত্রা ৬.৩-৭.০ PH এবং বালিযুক্ত দোঁয়াশ মাটিতে সজনে গাছ ভাল হয়। পাহাড়ের ঢালে যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, ঢাল বেয়ে জল দ্রুত নেমে যায় সেখানেও সজনে গাছ জন্মাতে পারে।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

সজনে গাছ বীজ থেকে স্বাভাবিকভাবে বিস্তারিত হতে পারে। এভাবেই অরণ্যের স্বাভাবিক উদ্ভিদ হিসাবে এই গাছ জন্মায়। তবে সজনে গাছের প্রসারণ সাধারণত ডাল কেটে রোপণ করেই করা হয়ে থাকে। বর্তমানে বীজ থেকে নার্সারীতে উন্নত পরিচর্চার মাধ্যমে চারা তৈরি করেও রোপণের মাধ্যমে এর বিস্তার ঘটানো হচ্ছে। সাধারণত বাড়ির আশেপাশের উঁচু জায়গায়, উঁচু পুকুর পাড় ইত্যাদি জায়গায় সজনে গাছ রোপণ করে বাড়ির প্রয়োজন মেটানো যায়। তবে বড় জমিতে বাণিজ্যিকভাবে সজনে চাষ করতে হলে প্রথমে লাঙল বা ট্রাক্টর দিয়ে চাষ দিয়ে জমির মাটি প্রস্তুত করে আগাছা ও ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে নিতে হয়। জমিতে ১ X ১ মিটার দূরত্বে ৩০ X ৩০ X ৬০ সেমি গভীর গর্ত করে তাতে হালকা মাটি ও জৈবপদার্থ ভর্তি করে জল দিয়ে ২ সপ্তাহ পর ১ সেমি গভীরে সঠিক ব্যবধানে ৪টি বীজ বপন করা হয়। বীজ বপনের আগে বীজগুলিকে ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রেখে বীজের খোসা ছাড়িয়ে বীজ বপন করলে দ্রুত অঙ্কুরোদ্গম ঘটে। সাধারণত বপনের পর ১৫ দিনের মধ্যে চারা গাছ জন্মায়। তিনভাগ মাটির সঙ্গে এক ভাগ বালি মিশিয়ে ১২ সেমি নার্সারীর উঁচু বেডে বীজ বপন করে চারা তৈরি করা হয় বা সরাসরি পলিথিন ব্যাগে মাটি ভর্তি করে তার মধ্যে বীজ বপন করেও উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে ৬-১২ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদ্গম ঘটিয়ে চারা তৈরি করা সম্ভব। তারপর ওই চারাগুলি ৬০-৯০ সেমি লম্বা হলে অন্যত্র রোপণ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে ডাল কেটে সজনে গাছ রোপণ একটি অতি সহজ ও চিরাচরিত

পদ্ধতি। সাধারণত ৪৫ সেমি - ১.৫২ মিটার লম্বা এবং কম-বেশি ১০ সেমি মোটা সজনের ডাল কেটে সরাসরি জমিতে গর্ত কেটে মাটিতে বালি মিশ্রিত করে ৫০ সেমি গভীরে রোপণ করা হয়। এরপর একটু জল দিয়ে ডালের গোড়ায় হাত দিয়ে চেপে মজবুত করে মাটি চাপা দিতে হয়। কারণ ডালটি নড়ে গেলে গাছটি নষ্ট হতে পারে। পাশাপাশি গাছের চারপাশে বেড়া দেওয়ারও প্রয়োজন হয়। নার্সারীতে কাটিংগুলি ফসফরাস মিশ্রিত মাটিতে রোপণ করা হয়, এতে দ্রুত মূল উৎপন্ন হয় এবং তা অন্যত্র রোপণের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। রোপণের সময় সঠিকভাবে চারার দূরত্ব বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে লাইন করে ৩ X ৩ মিটার দূরত্বে রোপণ করে সজনে গাছের চাষ করা যেতে পারে। অন্য ফসলের সাথে Agro forestry model বা Agri horticulture forestry model অনুযায়ী সজনে চাষের ক্ষেত্রে লাইনের মাঝের দূরত্ব ১০ মিটার রাখা হয়।

পরিচর্যা –

রোপণের আগে সজনে চাষের জমিতে চাষ দিয়ে সমস্ত আগাছা মুক্ত করে জমি প্রস্তুত করা হয়। তবুও গাছের চারপাশের সারিগুলির ফাঁকে আগাছা জন্মায়। গাছের গোড়ার চারদিকে খড় বা প্লাস্টিক পেপার চাপা দিয়ে একই সাথে আগাছা দমন ও মালচিং পদ্ধতিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণ করা যায়। এছাড়া সারির মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় কোদালের সাহায্যে কুপিয়ে বা লাঙল দিয়ে, অন্য ফসল যেমন, হলুদ, ডালশস্য, কলাগাছ, শাক-সবজি প্রভৃতি মিশ্র পদ্ধতিতে চাষ করা যায়। সজনে চাষে বেশি জলের প্রয়োজন হয় না। তবে শুষ্ক আবহাওয়ায় নিয়মিত জলসেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। বাণিজ্যিকভাবে সজনে চাষের ক্ষেত্রে Dripping System বা অন্য কোনও পদ্ধতিতে গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন গাছ প্রতি ১২-১৬ লিটার জলের প্রয়োজন হয়। যেখানে জলের অভাব রয়েছে সেখানে বালতি করে সপ্তাহে দু'বার জল প্রয়োগ করা হয়। সাধারণত বাড়ির আশেপাশে যে সজনে গাছ রোপণ করা হয়, তার জন্য কোনও সার প্রয়োগ করা হয় না। কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য প্রতিটি গাছের জন্য ৮-১০ কেজি জৈবসার রোপণের আগেই প্রয়োগ করতে হয়। প্রতি হেক্টর সজনের জমিতে বছরে ৫০ কেজি নাইট্রোজেন, ৫০ কেজি ফসফরাস সার রোপণের সময় এবং ৬ মাস অন্তর এই একই মাত্রায় সার প্রয়োগ করা হয়। সজনের ডাঁটা তোলার সময় গাছের ডাল কেটে নামিয়ে ফসল তোলা হয়। ডাঁটাগুলি সংগ্রহ করার পর মোটা ডালগুলি রোপণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে একদিকে ফসল সংগ্রহ ও অন্যদিকে ডাল ছাঁটাই একই সঙ্গে হয়ে যায়। সাধারণত ১ মিটার উপরের ৪-৫টি ডাল রেখে বাকি ডালগুলি কেটে দেওয়া হয়। সজনে গাছের ডাল কেটে দিলে প্রচুর পরিমাণে নতুন সতেজ ডালপালা গজায় এবং নতুন ডালের ফুল ও ফলের মানও ভাল হয়। ভারতে সজনে গাছে বিভিন্ন প্রকার শুয়োপোকার আক্রমণ দেখা যায়। যারা পাতা খেয়ে গাছের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। কীটনাশক বা জৈবকীটনাশক স্প্রে করে এইসব পোকার হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করা যেতে পারে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

কচি অবস্থাতেই সজনে গাছের ফল অর্থাৎ সজনের ডাঁটার প্রচুর চাহিদা থাকে। ডাঁটা বড় হয়ে গিয়ে মোটা হয়ে গেলে ডাঁটাগুলি শক্ত হয়ে যায়। সজনে ডাঁটা খুব তাড়াতাড়ি Mature হয়ে যায়। তাই গাছ থেকে ডাঁটা পেড়ে তা দ্রুত বাজারজাত করতে হয়। পাকা ডাঁটার চাহিদা কমে যায়। যদিও বীজ সংগ্রহ করার জন্য সজনে গাছের ফল বা ডাঁটা পাকানো হয় এবং শুকনো করে বীজ সংগ্রহ করা হয়। জাত ও আবহাওয়ার পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে সজনের উৎপাদন বিভিন্ন হতে পারে। তবে সাধারণত এক হেক্টর জমি থেকে ৫০-৫৫ টন সজনের ডাঁটা পাওয়া যেতে পারে। সজনে একটি অতি পুষ্টিকর ফসল। এর পাতার রসে বিটা ক্যারোটিনের পরিমাণ গাজরের চেয়েও বেশি। সজনেতে মটর ডালের থেকেও বেশি পরিমাণ প্রোটিন রয়েছে। রয়েছে কমলালেবুর থেকেও বেশি ভিটামিন - C, দুধের মধ্যে যতটা ক্যালসিয়াম আছে তার চেয়েও বেশি ক্যালসিয়াম রয়েছে এই সজনেতে। সজনেতে পটাসিয়াম এবং আয়রনের পরিমাণ যথাক্রমে কলা ও পালং শাকের থেকেও বেশি। সজনে পৃথিবীর অন্যতম দ্রুত বেড়ে ওঠা উপকারী একটি গাছ। উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের মানুষের পছন্দের খাদ্য। এর পাতা ফুল ও ফল বা ডাঁটা সবই স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল। পশুখাদ্য হিসাবে, ওষুধ তৈরির কাজে, রং তৈরি করতে এবং জল পরিশোধন করতেও এর ব্যবহার হয়ে থাকে। সজনের বিভিন্ন ঔষধি গুণাগুণ রয়েছে। গাছের মূল পক্ষাঘাত, মৃগী, বাতের রোগ ও হজমের গণ্ডগোল সারাতে এবং রক্ত চলাচলের সমস্যায় সাহায্য করে। মূলের ছাল হাঁপানী রোগের উপশমে ভাল কাজ করে। সজনের ফল অর্থাৎ ডাঁটা যকৃৎ ও প্লীহার রোগ সারাতে, যন্ত্রণানাশক ও পক্ষাঘাতে উপকারী। বসন্ত রোগের প্রতিষেধক হিসাবে ভাল কাজ করে সজনের ফুল। সজনের বীজের তেল বাতের ব্যথায়, দাঁত ও মাড়ির সমস্যায় ও যৌনরোগে রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হতে পারে। এমন বিবিধ গুণসম্পন্ন একটি গাছ, যে দেশে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি গরীব মানুষের বাস সেই দেশেই এই গাছটি বেশি জন্মায়। সচেতনতার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের মধ্যে সজনে চাষে উৎসাহিত করে সজনের চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটানো সম্ভব।

জাত পরিচিত –

সজনের কয়েকটি জাত হল রোহিত, কোয়েম্বাটোর-২, পিকেএম – ১, পিকেএম – ২ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তথ্যসূত্র – Wikipedia, Agrifarming.in, https://zestofhaiti.com/moringa-oleifera-tree/



পেঁপে

পরিচয় -

পেঁপে গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Carica papaya, এটি Caricacae গোত্রের নরম কাণ্ডের দ্বিবীজপত্রী বীরুৎ শ্রেণীর স্বল্প আয়ুর উদ্ভিদ।

পেঁপে গাছের আদি জন্মস্থান মেক্সিকো থেকে দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে। বর্তমানে সারা পৃথিবীর উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের সমস্ত দেশেই পেঁপে গাছ স্বাভাবিক উদ্ভিদরূপে বিস্তারিত হয়েছে।

ভারতের একটি তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৯৯১-৯২ সাল থেকে ২০০১-০২ সালের মধ্যে এদেশে ৪২.২ হাজার হেক্টর থেকে বেড়ে ৭৩.৭ হাজার হেক্টর জমিতে পেঁপের চাষ হয়েছিল। ওই হিসাব বলছে, সে সময়ে পেঁপে চাষের ৬৩% এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং উৎপাদন ৮ লক্ষ টন থেকে ২৬ লক্ষ টন হয়েছিল। ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, গুজরাট, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রে পেঁপের চাষ হয়।

ইংরেজিতে পেঁপেকে Papaya বলা হয়। হিন্দিত প্যাপায়া, তামিল ভাষায় প্যাপ্পাইয়া, তেলেগুতে বেপ্পাইয়া, মালায়লমে প্যাপ্পায়াম এবং বাংলায় এটি পেঁপে নামে পরিচিত।

পেঁপে একটি বীরুৎ শ্রেণীর গাছ। আঘাত পেলে পেঁপে গাছের কাণ্ড ও পাতা থেকে দুধের আঠা নির্গত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাণ্ড শাখাহীন হয়। তবে কখনও কখনও শাখা বের হতে দেখা যায়। কাণ্ডে পত্রবৃন্তের দাগ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এই গাছের পাতা সরল প্রকৃতির, সর্পিলভাবে কাণ্ডের উপর বিন্যস্ত থাকে। পাতাগুলি ৩০–৬০ সেমি লম্বা ও খাঁজকাটা। প্রতিটি খাঁজ পুনরায় বিভক্ত হয়ে বহুসংখ্যক খাঁজ তৈরি করে। খাঁজগুলির অগ্রভাগ ত্রিকোণাকৃতির, তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে। পত্রবৃন্ত ৪০-১০০ সেমি এবং ১-৩ সেমি ব্যাসের ফাঁপা পাইপের মতো কাণ্ডের গায়ে লেগে থাকে। পরিণত পাতা খসে গেলে কাণ্ডের গায়ে লেগে থাকে এবং কাণ্ড গোলাকার দাগ বা ছাপ রেখে যায়। পেঁপে গাছের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা গাছে স্ত্রী ফুল ও পুরুষ ফুল জন্মায়। আবার একই গাছে স্ত্রী ও পুরুষ ফুল জন্মাতে দেখা যায়। পেঁপে গাছের ফুল সুগন্ধ যুক্ত হয়। পুরুষ ফুলগুলি ৩০-১০০ সেমি লম্বা মঞ্জরীদণ্ডের উপর গুচ্ছাকারে পরের পর পুষ্পবিন্যাসে সজ্জিত থাকে। ফুলগুলি অবৃন্তক হালকা হলুদ রঙের হয়, ফুলগুলি লম্বায় ৩-৬ সেমি হতে পারে। পুরুষ ফুলের বৃতি ও দলমণ্ডলে ৫টি করে বৃত্তাংশ, ৫টি করে পাপড়ি এবং ১০টি পুংকেশর থাকে। স্ত্রী পেঁপে গাছে পাতার কক্ষে ২-৪ টি ফুল জন্মায়। কিন্তু একটি ফুল বাদে অন্য ফুলগুলি খসে যায়। ফুলের বৃন্তটি ১-২ সেমি লম্বা হয়। পুষ্পপত্রগুলি ১-২ সেমি লম্বা হয় ও শীঘ্রই খসে পড়ে। স্ত্রী ফুলের পুরু ও সবুজ রঙের ৫টি বৃতি থাকে। সাদা রঙের পাপড়িগুলি ৫-৭ সেমি লম্বা হয়। স্বপরাগযোগের কারণে স্ত্রী ফুলগুলি উভয় লিঙ্গ প্রকৃতির হয়। ফলগুলি বড়, গোলাকার হয়ে থাকে। ফলের আকার ২০-৩০ X ৮-১৫ সেমি হয়। পাকা পেঁপে হলদে রঙের হয়ে যায়। ফলে অসংখ্য কালো, কোঁচকানো বীজ থাকে। কাঁচা ফলের বীজের রং সাদা হয়।

পেঁপে উষ্ণ জলবায়ুর উদ্ভিদ হলেও উপক্রান্তীয় জলবায়ুতেও এই গাছ ভাল জন্মায়। ২৫-৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ১৫০০-২০০০ মিলিমিটার বার্ষিক বৃষ্টিপাত পেঁপে চাষের পক্ষে উপযুক্ত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০০০ মিটার উচ্চভূমিতেও পেঁপে গাছ দেখা যায়। তবে ৬০০ মিটার উচ্চতায় পেঁপে ভাল জন্মায়। ফল পাকার সময় শুষ্ক ও গরম আবহাওয়া ফলের গুণমান ভাল হয়।

পেঁপে গাছের মূল বা শিকড় জলে ডুবে থাকলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শিকড় নষ্ট হয়ে গাছের মৃত্যু ঘটে। তাই পেঁপে চাষের জন্য উঁচু ও উন্নত নিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত জায়গা নির্বাচন করতে হয়। নিকাশীযুক্ত গভীর বেলে দোঁয়াশ মাটি পেঁপে চাষের পক্ষে উপযুক্ত।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

সাধারণভাবে বীজের দ্বারাই পেঁপে গাছের প্রসারণ ঘটে থাকে। পাকা ফলের বীজ মাটিতে পড়ে আপনা থেকেই উপযুক্ত পরিবেশে স্বাভাবিক প্রসারণ হয় বা পেঁপে গাছ জন্মাতে দেখা যায়। এক হেক্টর জমির জন্য ২৫০-৩০০ গ্রাম উন্নত বীজের প্রয়োজন হয়। পেঁপে বীজের অঙ্কুরোদ্গমের হার শীঘ্রই(৪৫ দিনের মধ্যে) হ্রাস পায়। তাই পরিপক্ক সুস্থ পাকা ফল সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। বীজের উপর পিচ্ছিল বীজত্বক থাকে। পেঁপের বীজকে জলে ভিজিয়ে চটের থলিতে ঘষে বীজত্বকটি তুলে ছায়াযুক্ত নার্সারীর বেডে উপযুক্ত

জৈবসার মিশ্রিত মাটিতে বপন করলে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ভাল হয়। খুব ছোট অবস্থাতেই চারাগুলি তুলে পলিথিনের ব্যাগে বা পাত্রে রোপণ করা হয়। উপযুক্ত পরিচর্যায় চারাগুলি দু'মাসের মধ্যেই ১৫-২০ সেমি লম্বা হয়ে যায়, তখন তা নির্দিষ্ট জমিতে রোপণ করা হয়ে থাকে।



পেঁপে চাষের জন্য উপযুক্ত নিকাশী ব্যবস্থা রয়েছে এমন উঁচু জমির প্রয়োজন হয়। এই ধরনের জমির উপর দিয়ে জোরে ঝড়-ঝাপটা বয়ে যায়। তাই জমির চারদিকে বিভিন্ন শক্ত গাছ রোপণ করে ঝড়-ঝাপটা থেকে পেঁপে গাছকে রক্ষা করার আগাম ব্যবস্থা করতে হয়। তারপর জমিতে লাঙল বা ট্র্যাক্টরের সাহায্যে চাষ দিয়ে আগাছা মুক্ত করে জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে জৈবসার প্রয়োগ করে চারা রোপণের জন্য সারি টেনে উপযুক্ত করে তুলতে হয়।

সাধারণত ফেব্রুয়ারি–মার্চ মাসে বা বসন্তকালে, অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বা শরৎকালে পেঁপে চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। প্রতি হেক্টর জমিতে ১.২ X ১.২ মিটার দূরত্বে অতিঘন রোপণের ক্ষেত্রে ৬৪০০টি চারার প্রয়োজন হয়। ১.৮ X ১.৮ মিটার বা ১.৫ X ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে চারা রোপণ করে সাধারণভাবে পেঁপের চাষ করে উপযুক্ত পরিমাণ ফসল উৎপাদন করা যায়।

নির্দিষ্ট দূরত্বে ৬০ X ৬০ X ৬০ সেমি আয়তনের গর্ত করে তার মধ্যে ২০ কেজি জৈবসার(FYM), ১ কেজি নিম খোল ও ১ কেজি হাড়ের গুঁড়ো মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ১৫ দিন ফেলে রাখা হয়। এরপর ১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে জল দিয়ে মাটি ভিজিয়ে তার মধ্যে চারাগুলি রোপণ করা হয়ে থাকে।

পরিচর্যা -

শীতকালে ১৫ দিনে একবার এবং গ্রীষ্মকালে ১০ দিন অন্তর সেচের প্রয়োজন হতে পারে। অবশ্য মাটির আর্দ্রতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিতে হয়। কম বৃষ্টিপাতযুক্ত শুষ্ক অঞ্চলে Drip বা Sprinkler ব্যবস্থার মাধ্যমে সেচ দিলে বেশি ভাল ফল পাওয়া যায়।

পেঁপে চাষের জন্য বেশি মাত্রায় সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। চারা রোপণের সময় প্রাথমিক সার প্রয়োগ বাদে প্রতি গাছের জন্য ২০০-২৫০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ সার প্রয়োগ করে প্রচুর ফলন পাওয়া যায়। এছাড়া অনুখাদ্য হিসাবে ০.৫% জিঙ্ক সালফেট এবং ০.১% বোরিক অ্যাসিড জলে গুলে স্প্রে করলে আরও ভাল হয়।

গাছের গোড়ায় যাতে জল না জমে সারিগুলির মাঝে কোদাল দিয়ে গভীরভাবে মাটি কুপিয়ে গোড়ার মাটি উঁচু করে দিতে হয়। এরফলে গাছের চারপাশের আগাছাও পরিষ্কার হয়ে যায়। এছাড়া আগাছা দমনের জন্য ওষুধও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পেঁপে গাছের সারিগুলির মাঝে শিম্বজাতীয় বা অন্য প্রকার শাক-সবজির চাষ করা যেতে পারে। তবে গাছে ফুল এসে গেলে আর মিশ্র চাষ করা সম্ভব হয় না।

পেঁপে গাছের ক্ষতিকারক পোকাগুলি হল, Bactrocera cucurbitae, Poekilocerus pictus, Tetranychus cinnabarinus লাল মাকড়সা, গাছের কাণ্ডছিদ্রকারী পোকা Dasyses rugosellus, এইসব পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে ০.৩% Dimethoate অথবা ০.০৫% Methyl demeton স্প্রে করা যেতে পারে।

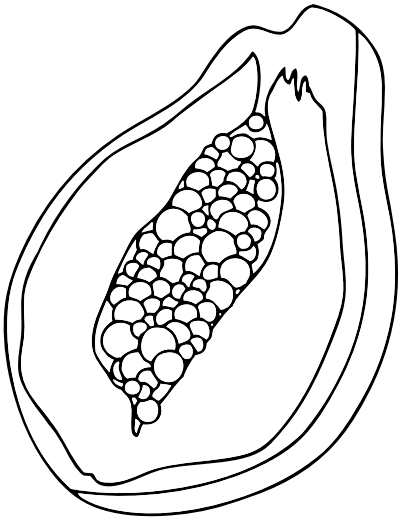
পেঁপে গাছের প্রধান রোগ হল, Powdery mildew, Oidium caricae, Anthracnose, Colletotrichum gloeosporioides, এই সমস্ত ছত্রাকঘটিত রোগ প্রতিরোধ করতে ১গ্রাম Wettable sulphur, ১ গ্রাম Carbendazim বা Thiophanate methyl এবং ২ গ্রাম Kavach বা Mancozeb প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব -

পেঁপে পেকে গেলে তার গায়ে টোকা দিলে বা দাগ কাটলে যে আঠা বের হয় তা জলের মতো পাতলা হয়। একমাত্র তখনই গাছ থেকে পেঁপে সংগ্রহ করতে হয়।

পেঁপে গাছ সাধারণত ৩-৪ বছর পর্যাপ্ত ফসল উৎপাদন করে। যদিও অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য কারণেও এর আগেও ফসল উৎপাদন কম হতে পারে। উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে প্রতি হেক্টর জমি থেকে ৭৫-১০০ টন পেঁপে উৎপাদন সম্ভব।

কাঁচা পেঁপে গাছ থেকে পেড়ে সবজি হিসাবে রান্না করে খাওয়া যায়। এছাড়া পেঁপের তৈরি চাটনী প্লাস্টিক চাটনী নামে বেশ জনপ্রিয়।



পাকা পেঁপে চলতি নিয়ম অনুযায়ী ফল হিসাবে খাওয়া হয়ে থাকে। পাকা ও কাঁচা দুই অবস্থাতেই পেঁপেকে রোগীর পথ্য হিসাবে দেওয়া হয়।

১০০ গ্রাম পেঁপের মধ্যে ৪৩ ক্যালরি শক্তি, ১০.৮২ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ৭.৮২ গ্রাম সুগার, ১.৭ গ্রাম ফাইবার, ০.২৬ গ্রাম ফ্যাট, ০.৪৭ গ্রাম প্রোটিন থাকে। এছাড়া পেঁপের মধ্যে থাকে বিভিন্ন ভিটামিন। ৬% ভিটামিন A, ৩% বিটা ক্যারোটিন, ২% ভিটামিন B1, ২% ভিটামিন B2, ৪% ভিটামিন B5, ১০% ভিটামিন B9, ৭৫% ভিটামিন C, ২% ভিটামিন E ও ২% ভিটামিন K রয়েছে। পাশাপাশি পেঁপেতে রয়েছে ২% ক্যালসিয়াম, ২% আয়রন, ৬% ম্যাগনেসিয়াম, ২% ম্যাঙ্গানিজ, ১% ফসফরাস, ৪% পটাসিয়াম, ১% সোডিয়াম এবং ১% জিঙ্ক।

এই সমস্ত খাদ্যগুণ থাকার পাশাপাশি পাকা পেঁপে তৃষ্ণা মেটায়, শরীরকে চাঙ্গা রাখে, হজমে সহায়ক, মূত্রঘটিত রোগের উপশমে সাহায্য করে এবং কাঁচা পেঁপে ও পেঁপের বীজ কৃমিনাশক হিসাবে যথেষ্ট উপকারী ও মহিলাদের ঋতু সমস্যার সমাধানে ব্যবহৃত হয়।

কাঁচা পেঁপের আঠা বা রস রূপচর্চায় ত্বকের দাগ মেলাতে সাহায্য করে।

পেঁপে পাতা শুকনো করে চায়ের মতো করে খেলে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুর মতো মশাবাহিত রোগের প্রতিরোধে সহায়ক বলে মনে করা হয়। কিন্তু এর স্বপক্ষে কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখনও মেলেনি।

গাছ থেকে পেঁপে সংগ্রহ করার পর প্রথমে ফলগুলির আকার এবং ওজন অনুযায়ী তা আলাদা করে বাছাই করা হয়। তারপর ফলগুলিকে ১-৩ সপ্তাহ কোল্ড স্টোরেজে ১০-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ৮৫-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় সংরক্ষণ করতে হয়। এরপর বাঁশের বাজরায় বা ঝুড়িতে শুকনো কলাপাতার কুশন করে তার উপর সাজিয়ে পেঁপে স্থানীয় বাজারে পাঠানো হয়। দূরবর্তী বাজারে পাঠানোর জন্য সড়ক পথে ট্রাক বা লরি, ভ্যান, ম্যাটাডোর ইত্যাদি যানবাহন ব্যবহার করা হয়।

সাধারণত চাষীরা স্থানীয় পাইকারি বিক্রেতা বা মধ্যবর্তী ফড়েদের কাছে তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে দেয়।

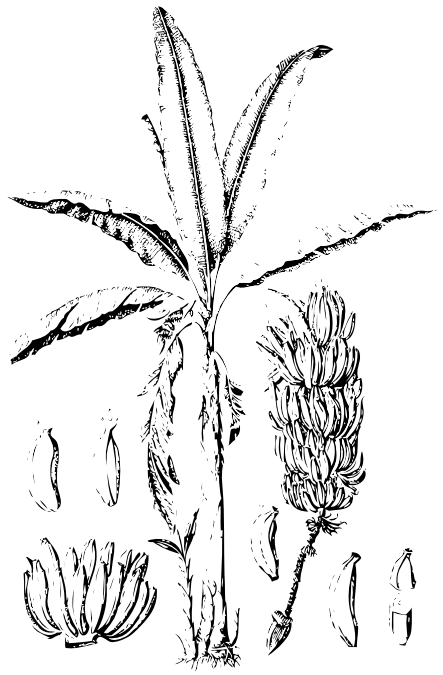
বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উচ্চ ফলনশীল পেঁপে চাষের জন্য উন্নত বীজ ও ড্রিপ সেচ ব্যবস্থা অবশ্যম্ভাবী। হিসাব করে দেখা গেছে, এক্ষেত্রে এক একর জমিতে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি সহ পেঁপে চাষে মোট খরচ হয় ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা এবং সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে ৩ বছরে গড়ে ১ লক্ষ আটাত্তর হাজার ১০০ টাকা লাভ করা সম্ভব। পাশাপাশি চাষের কারণে কিছু স্থায়ী সম্পদও তৈরি হয়।

২০১৪ সালে সারা পৃথিবীতে ১২.৭ মিলিয়ন টন পেঁপে উৎপাদন হয়েছিল। যার মধ্যে ৪০% পেঁপে উৎপাদিত হয়েছিল ভারতে।

জাত পরিচিতি -

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নানান জাতের পেঁপের চাষ হয়ে থাকে। যেমন, অন্ধ্রপ্রদেশে Honey Dew, Coorg Honey Dew, Washington, Solo, Co-1, Co-2, Co-3, Sunrise Solo ইত্যাদি, ঝাড়খণ্ডে Ranchi selection, Honey Dew, Puska Deliciun ও Push Naha, কর্ণাটক ও কেরালায় Coorg Honey, Coorg green, Pusha Deliciun ও Push Naha, পশ্চিমবঙ্গে Ranchi selection, Honey Dew, Washington ও Coorg green এবং ওড়িশায় Pusha Deliciun, Honey Dew, Push Naha, Washington ও Coorg green জাতের পেঁপের চাষ হয়।

তথ্যসূত্র – Publication of European Forest Institute (EFI)



কাঁচকলা

কাঁচকলার বিজ্ঞানসম্মত নাম Musa paradisiaca, কলা এবং কাঁচকলা একই Musaceae গোত্রের বা APG (Angiosperm Phylogeny Group) শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী Zingiberaceae গোত্রের একবীজপত্রী উদ্ভিদ।

ইংরাজিতে কাঁচকলাকে Dessert Banana বা Plantain বলা হয়। কলার সঙ্গে কাঁচকলার প্রধান পার্থক্য হল, কলা পাকা অবস্থায় খোসা ছাড়িয়ে খাওয়া হয় এবং এর স্বাদে মিষ্টি বা পেকে হলুদ হলে তবেই খাওয়া যায়। কলা একপ্রকার ফল।

কাঁচকলা রান্না করে সবজি হিসাবে খাওয়া হয়। মিষ্টি স্বাদের হয় না। কাঁচকলা কচি অবস্থা থেকে পরিণত অবস্থা পর্যন্ত রান্না করেই খাওয়া হয়ে থাকে। সাধারণভাবে কাঁচকলার রং সবুজ থাকে। পুরোমাত্রায় কাঁচকলা একপ্রকার সবজি।

কলার মতো কাঁচকলাও Musa acuminate এবং Musa balbisiana নামের আদিম কলা থেকে সংকরায়নের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে।

কাঁচকলা চাষের ইতিহাস কলা চাষের ইতিহাসের থেকে আলাদা নয়। ৫,০০০–৮,০০০ খৃষ্টপূর্বে ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পাপুয়া নিউগিনিতে দু'ধরনের কলারই চাষ শুরু হয়েছিল।

কলার সঙ্গে কাঁচকলা চাষের কোনও পার্থক্য নেই। কলার মতো একই ধরনের জলবায়ু ও মাটি প্রয়োজন কাঁচকলা চাষেও। কৃত্রিম প্রসারণ বা অন্যান্য পরিচর্যাও কলার মতোই। তবে কাঁচকলার গাছ আকারে সাধারণ খাওয়ার কলার চেয়ে বড় হয়।

ভারতে ব্যাপকভাবে কলা ও কাঁচকলার চাষ করা হয়। উভয় কলাই ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য অর্থকরী ফসল। পৃথিবীতে কলা উৎপাদনে ভারত প্রথম।

সবজি হিসাবে কাঁচকলার বিভিন্ন প্রকার তরকারি যেমন, শুক্তো, পাতলা ঝোল, ভাজা খাওয়ার জন্য, ভাতে, কাঁচকলার ডালনা, কাঁচকলার কোপ্তা ইত্যাদি রান্নায় ব্যবহৃত হয়।

কাঁচকলা সহজপাচ্য ও প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ একটি সবজি। ১০০ গ্রাম কাঁচকলাতে ১২২ ক্যালোরি শক্তি, ৩১.৮৯ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ১.৩০ গ্রাম প্রোটিন, ০.৩৭ গ্রাম ফ্যাট ও ২.৩০ মিলিগ্রাম খাদ্যতন্তু থাকে। এই পরিমাণ কাঁচকলায় ৩৭.৫% ভিটামিন A, ৩১% ভিটামিন C, ১% ভিটামিন E, ১% ভিটামিন K, ২৩% ভিটামিন B6, ৪% নিয়াসিন, ৪% রাইবোফ্ল্যাভিন, ৪% থিয়ামিন রয়েছে। এছাড়াও কাঁচকলায় ৪ মিলিগ্রাম সোডিয়াম, ৪০৯ মিলিগ্রাম পটাসিয়াম, ৩ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ০.৬০ মিলিগ্রাম আয়রন, ৩৪ মিলিগ্রাম ফসফরাস ও ০.১৪ মিলিগ্রাম জিঙ্ক থাকে।

কাঁচকলাতে যথেষ্ট পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট থাকায় তা লক্ষ লক্ষ মানুষের পুষ্টি ও খাদ্যের নিরাপত্তা দিতে সক্ষম। এর খাদ্যতন্তু

পেটের পক্ষে উপকারী, নিয়মিত বায়ু সঞ্চালন করে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। কাঁচকলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন A, B, C, E ও K থাকায় বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম। কাঁচকলা দেহের বৃদ্ধিতে, চোখের দৃষ্টি ঠিক রাখতে, চর্মরোগ ও ধমনীর রোগ প্রতিরোধ করে হার্টের ক্রিয়া সচল রাখতে সাহায্য করে। এর ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম শরীরে রক্তচলাচলে সাহায্য করে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং হার্টের পক্ষে উপকারী।

কাঁচকলার মোচা তিক্ত স্বাদের। তাই চুনের জলে ভিজিয়ে সিদ্ধ করে জলটা ফেলে দিয়ে মোচার ডালনা, মোচার চপ ইত্যাদি তৈরি করেও খাওয়া হয়। কাঁচকলার থোড় বিভিন্ন প্রকার তরকারি যেমন, থোড়ঘন্ট, থোড়ের ডালনা, থোড় পোস্ত ইত্যাদি রান্নায় ব্যবহার করা হয়। ভাজাক্কা উপেরী নামের কাঁচকলার চিপস্ কেরালার খুব জনপ্রিয় একটি খাবার।

কলার পাতা খাওয়ার থালা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এই পাতা গবাদিপশুকেও খাওয়ানো হয়।

তথ্যসূত্র - www.agroconnect.co.in



কাগজি বা পাতিলেবু

পরিচয় –

কাগজি বা পাতিলেবুর বিজ্ঞানসম্মত Citrus aurantifolia, এটি Rutaceae গোত্রের গুল্ম জাতীয় বা ছোট বৃক্ষ শ্রেণীর বহুবর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ।

এই ধরনের লেবুর আদি জন্মস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। সেখান থেকে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা বিভিন্ন দেশে, ভারতে, চিনে এবং আফ্রিকার কিছু অংশে বিস্তার ঘটে। খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের মাধ্যমে ইউরোপে কাগজি বা পাতিলেবুর প্রসার ঘটে। ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে এর রোপণ শুরু হয়েছিল।

Citrus aurantifolia, Citrus hystrix (যা Kaffir lime বা Makrut lime নামে পরিচিত), Citrus australia (অস্ট্রেলিয়ায় যা Finger lime নামে পরিচিত), Citrus australis (যা Australian lime বা Australian round lime নামে পরিচিত) এবং Citrus glauca (যা Desert lime নামে পরিচিত) । সংকরায়নের ফলে সৃষ্টি হওয়া এই সমস্ত প্রকার লেবুই বিভিন্ন দেশে পাতিলেবু বা কাগজিলেবুর মতো ব্যবহৃত হয়। Citrus aurantifolia অর্থাৎ কাগজিলেবুর সঙ্গে ওইসব লেবুর গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

কাগজি বা পাতিলেবুর ইংরেজি নাম Lime, কথাটি স্প্যানিশ বা ফরাসী শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। আরবে যাকে Lima ও পারস্য দেশে Limu বলা হত। এর থেকেই Lime শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। ভারতে এই লেবুকে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। হিন্দিতে নিম্বু, তেলেগুতে নিম্মা, মালায়লমে ইরিমি ছিনারাকম, তামিল ভাষায় ইলুমিছাইবা এবং বাংলায় লেবু বা কাগজি লেবু নামে পরিচিত।

Citrus aurantifolia গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। গাছটি লম্বায় ৪-৫ মিটার হয়। শাখাপ্রশাখার কক্ষে শক্ত ও সূঁচালো কাঁটা থাকে। পাতাগুলি সরল প্রকৃতির একান্তরভাবে শাখাপ্রশাখায় সজ্জিত থাকে। ডিম্বাকার বা উপবৃত্তাকার আকারের পাতাগুলি ২.৫ – ৯ সেমি লম্বা এবং ১.৫ – ৫ সেমি পর্যন্ত চওড়া হতে পারে। পাতার কিনারা সামান্য খাঁজকাটা, পত্রবৃন্তের সঙ্গে ডানার আকৃতির উপপত্র থাকতে পারে। পাতায় পাতায় তৈলগ্রন্থি থাকে। পাতাগুলি সুগন্ধ যুক্ত হয়। ফুলগুলি ১.৫-২.৫ সেমি হয়। সাদা রঙের ও সুগন্ধ যুক্ত হয়। শাখাপ্রশাখার কক্ষে থেকে একটি বা অনেকগুলি (একসঙ্গে ৬-৭টি) ফুল জন্মাতে দেখা যায়। ফলগুলি ডিম্বাকার বা গোলাকার আকৃতির হয়ে থাকে। ফলের ত্বক পরিণত হলে মসৃণ হয়ে যায়। ত্বকটি মোটা চামড়ার মতো এবং ত্বকের উপর সুস্পষ্ট তৈলগ্রন্থিগুলি দেখা যায়। পাকা ফল হালকা হলুদ বা সবুজাভ হলুদ রঙের হয় ফলের মধ্যে সাদা পর্দার মতো পদার্থ দিয়ে তৈরি অনেকগুলি প্রকোষ্ট থাকে। ফলের কেন্দ্র বরাবর শক্ত সাদা অক্ষের গায়ে বীজগুলি থাকে। ফলের মধ্যভাগের রসগ্রন্থির মধ্যে অম্ল স্বাদের রসে পরিপূর্ণ থাকে। সারা বছর ধরেই কম-বেশি পাতিলেবু জন্মায়। তবে সাধারণত ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে গাছে ফুল আসে এবং জুলাই-অগাস্ট মাসে ফল পাকে। কাগজিলেবুর সঙ্গে পাতিলেবুর পার্থক্য হল, পাতিলেবুর পাতাগুলি আকারে গোলাকার এবং ছোট। ফলগুলিও গোলাকৃতির হয়। অন্যদিকে কাগজিলেবু আকার লম্বাটে, বেলানাকার হয়ে থাকে।

উষ্ণ ও উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে কাগজি বা পাতিলেবু চাষ হয়ে থাকে। তবে ২৫-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গাছের বৃদ্ধি খুব ভাল হয়। ৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় অর্থাৎ অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ও তুষারপাতে পাতিলেবু গাছ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৭৫০– ২৫০০ মিলিমিটার বার্ষিক বৃষ্টিপাত কাগজি বা পাতিলেবু চাষের পক্ষে উপযুক্ত।

কাগজি বা পাতিলেবু গাছের জন্য উন্নত নিকাশীযুক্ত ১ মিটার পর্যন্ত গভীর দোঁয়াশ মাটি উপযুক্ত। তবে বালিযুক্ত দোঁয়াশ মাটিতেও এই গাছ ভালভাবে জন্মাতে পারে। মাটির অম্লতা ও ক্ষারীয় মাত্রা ৬.০-৬.৫ PH লেবু চাষের উপযুক্ত।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

কাগজিলেবু বা পাতিলেবুর চাষ পদ্ধতি একই রকম। উপযুক্ত পরিবেশে পরিণত বীজ থেকে কাগজি বা পাতিলেবু স্বাভাবিকভাবে জন্মাতে পারে। কিন্তু চাষের ক্ষেত্রে উপযুক্ত বীজ সংগ্রহ করে সঠিক পরিচর্যার বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঘটিয়ে কৃত্রিমভাবেও লেবু গাছের প্রসারণ ঘটানো হয়। বীজের গাছে ফল আসতে ৫-৬ বছর সময় লেগে যায়। তাই অঙ্গজ জনন অর্থাৎ গুটিকলম তৈরি গাছের দ্বারাই লেবুর চাষ করা হয়ে থাকে। গুটিকলমের গাছের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বছর থেকেই ফল উৎপাদন শুরু হয়ে যায়। গুটিকলমের জন্য পরিণত গাছের সুস্থ-সবল ডালের ছাল কেটে হরমোন প্রয়োগ করে পলিথিন কাগজে জৈবসার মিশ্রিত মাটি নিয়ে ওই অংশের উপর শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয় এবং প্রতিদিন জল স্প্রে করা হয়। গুটির মধ্যে শিকড় উৎপন্ন হলে ওই নির্দিষ্ট ডালটিকে সাবধানে



কেটে মাদার প্ল্যান্ট থেকে আলাদা করে পলিব্যাগ বা পাত্রে নার্সারীতে রেখে বড় করে তোলা হয়। তারপর তা নির্দিষ্ট জমিতে রোপণ করা হয়।

রোপণের আগে জমিতে লাঙল বা ট্র্যাক্টর দিয়ে একাধিকবার চাষ দিয়ে ও মই দিয়ে জমির ঢাল বজায় রেখে জমি প্রস্তুত করতে হয়। উঁচু-নিচু জমিতে বা ঢালু জমিতে ধাপ কেটে কোদাল দিয়ে মাটি তৈরি করা হয়ে থাকে।

জুন-অগাস্ট মাসে লেবুর চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। সাধারণভাবে ৪.৫ X ৪.৫ মিটার দূরত্বে ৬০ X ৬০ X ৬০ সেমি আয়তনের গর্ত করে প্রতি গর্তে ১০ কেজি জৈবসার (FYM), ৫০০ গ্রাম সুপার ফসফেট জমির উপরের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে জল দিয়ে দিন ১৫ দিন থেকে একমাস ফেলে রাখতে হয়। তারপর ওই গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে চারাগুলি রোপণ করতে হয়। এক হেক্টর জমিতে এভাবে রোপণের ক্ষেত্রে ৪৯৪টি চারার প্রয়োজন হয়। তবে উর্বর জমিতে ৮ X ৮ মিটার দূরত্বে অতি ঘনভাবেও চারাগুলি রোপণ করা যেতে পারে।

পরিচর্যা –

লেবু গাছে কম মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত সেচ দিতে হয়। কারণ বেশি পরিমাণে সেচ দিলে গাছের শিকড়ে ছত্রাকঘটিত রোগে লেবু গাছের প্রচুর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গাছের বয়স, মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় সেচ প্রয়োগের দ্বারা উৎপাদন ও ফলের আকারের বৃদ্ধি ঘটানো যায়।

মাটির উর্বরতা বিচার করে বছরে তিন দফায় উপযুক্ত মাত্রায় সার প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। ফেব্রুয়ারি, জুন ও সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণত এই সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। মূল রাসায়নিক সারের সঙ্গে পরিমিত মাত্রায় অণুখাদ্য প্রয়োগ করলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। প্রতিবার সার প্রয়োগের পর অবশ্যই সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। এক্ষেত্রে পরিমাণ মতো নিম খোল ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

লেবু গাছের সারির মধ্যেকার ফাঁকা জায়গায় লাঙল বা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে আগাছা দমন, মাটি আলগা করে দেওয়া এবং সাথী ফসল চাষের জন্য জমি প্রস্তুত একই সঙ্গে করা যেতে পারে। এইভাবে ২-৩ বছর লেবু চাষের জমিতে বিনস্, খেসারির ডাল, মটর কড়াই বা অন্য ধরনের শাক-সবজির চাষ করা যেতে পারে। যে সময়টা সাথী ফসলের চাষ করা যায় না, তখন Diuron, Terbasal, Simazine, Gramoxone ইত্যাদি প্রয়োগ করেও আগাছা দমন করা যেতে পারে।

কাগজি বা পাতিলেবুর গাছকে সঠিক আকৃতিতে বড় করে তুলতে হয়। কাণ্ডের ৪০-৫০ সেমি নীচের দিকের ডালপালা কেটে দিয়ে কাণ্ডটিকে সঠিকভাবে বড় করে কাণ্ডের চারিদিকের ডালগুলির বৃদ্ধিও নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। কারণ লেবু গাছে কাঁটা থাকে। তাই গাছ ফল তোলার সময় যাতে সারির মধ্য দিয়ে যাওয়া-আসার জায়গা থাকে ডাল ছাঁটাইয়ের সময় নজর রাখতে হয় সেদিকেও।

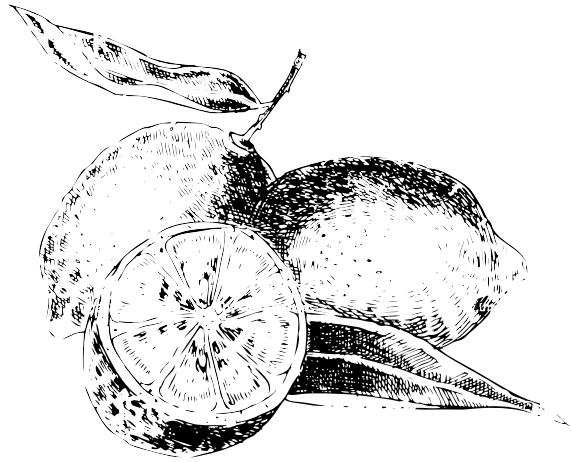
Citrus psyllid, Leafminer প্রভৃতি লেবু গাছের পোকা, পতঙ্গের লার্ভা, ফড়িং জাতীয় পোকা, কাণ্ডছিদ্রকারী পোকা ইত্যাদি লেবু গাছের প্রচুর ক্ষতি করে।

১.৫ মিলিমিটার Monocrotophos প্রতি লিটার জলে গুলে ১৫ দিনে ২-৩ বার করে স্প্রে করতে হবে। ০.০৫% Malathion, ০.০৫% Carbonyl, ১ মিলিলিটার Phosphomidon প্রভৃতি কীটনাশক প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করা যেতে পারে। এছাড়া নিম তেল বা অন্যান্য জৈব কীটনাশক ব্যবহার করে পোকামাকড়ের আক্রমণ রোধ করা সম্ভব।

লেবু গাছের প্রধান রোগগুলি হল, Tristeza, Citrus canker, Gummosis, Powdery mildew, Anthracnose প্রভৃতি। উন্নত প্রজাতির কলমের গাছের চাষ করে Tristeza নামক ছত্রাকঘটিত রোগকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়া Bordeaux mixture, Copper Oxifluoride Sulpher নামের ছত্রাকনাশক ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করে এইসব রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

কাগজি বা পাতিলেবু গাছ থেকে সাধারণত বছরে ৩ বার ফল তোলা যায়। গ্রীষ্মকালে, বর্ষার সময় ও শরৎকালে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বেশি পরিমাণে ফল উৎপন্ন হয়ে থাকে। সবুজ অবস্থায় বা হালকা সবুজাভ-হলুদ অবস্থায় ফলগুলি তুলে নিতে হয়। কারন বেশি পাকা অবস্থায় ফল সংগ্রহ করলে তা বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায় না, পচে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সবুজ অবস্থায় ফলের ত্বক মসৃণ হয়ে গেলে বুঝতে হবে ফল তোলার উপযুক্ত সময় হয়েছে। হাত বা আঁকশি দিয়ে দিয়ে ফল সংগ্রহ করতে হয়।



কলমের গাছে ২-৩ বছরের পর থেকে ফল উৎপাদন শুরু হয়ে যায়। পরিণত অর্থাৎ ৭-৮ বছরের গাছ থেকে বছরে গড়ে ৭০০টি পাওয়া যেতে পারে।

গ্রীষ্মকালে প্রতিদিনকার খাওয়ারের পাতে লেবু একটি অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। কাগজিলেবু বা পাতিলেবু গুরুত্বপূর্ণ একটি অর্থকরী ফসল। দেশের অর্থনীতিতে এর গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে। উদ্যান শিল্প হিসাবে ভারতে বহু বছর ধরে কাগজিলেবু বা পাতিলেবুর চাষ বিকশিত হয়েছে। বহু মানুষের জীবিকা লেবু চাষ ও তার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত।

লেবু বা সব Citrus ফলই ভিটামিন C সমৃদ্ধ। এছাড়া লেবুতে কার্বোহাইড্রেট, ফাইবার, পটাসিয়াম, ফোলেট, ক্যালসিয়াম, বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন B, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, কপার প্রভৃতি পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকায় বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে এটি খুবই উপকারী। গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, লেবুর মধ্যে ক্যানসার রোগ, হৃদরোগের সমস্যা, রক্তাল্পতা, চোখের সমস্যা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রয়েছে। লেবুতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট আছে যা হজমে, মেদ ঝরাতে বা শরীরের ওজন কমাতে সাহায্য করে। লেবুর রস কৃমিনাশক, খিদে বাড়ায়, শরীরের বিষক্রিয়া দূর করে, ফোঁড়া সারায়, গলা বা টনসিলের সমস্যা কমায়। এছাড়া সব ধরনের লেবুই জণ্ডিস, ছত্রাক বা ভাইরাসঘটিত রোগ বিশেষ করে ছুলি ও সর্দিকাশির পক্ষে উপকারী।

সরবত তৈরিতে ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে লেবু ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। আচার ও জুস তৈরিতেও লেবু ব্যবহার হয়।

পোকামাকড় তাড়ানোর জন্য ও খাওয়ার সংরক্ষণের জন্য লেবুর পাতা কাজে লাগে।

২০১৪ সালের হিসাব অনুযায়ী, সারা পৃথিবীতে ১৬.৩ মিলিয়ন টন লেবু উৎপাদিত হয়েছিল। পৃথিবীতে পাতিলেবু ও কাগজি লেবু উৎপাদনে ভারতের স্থান প্রথম। এছাড়া মেক্সিকো, চিন, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশ মোট উৎপাদনের ৫৯% অংশ পূরণ করে। ভারতে ২.৮ মিলিয়ান টন লেবু উৎপন্ন হয়। দেশের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, গুজরাট, রাজস্থান, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ লেবু উৎপাদনে প্রধান রাজ্য হিসাবে গণ্য হয়েছে। যদিও অন্যান্য রাজ্যেও কিছু কিছু লেবু উৎপন্ন হয়।

গাছ থেকে লেবু সংগ্রহ করার পর আকার অনুযায়ী সেগুলিকে বাছাই করে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতায় তা ৬-৮ সপ্তাহ সংরক্ষণ করা সম্ভব। এছাড়া মোমের প্রলেপ দিয়েও লেবুকে অনেকদিন সতেজ রাখা যায়। এরপর উপযুক্ত পরিবহণ ব্যবস্থার সাহায্যে দেশের বিভিন্ন অংশে ও বিদেশে রফতানি করা হয়।

জাতপরিচিতি –

কাগজিলেবুর বিভিন্ন উন্নত জাতগুলি হল, Pramalini, Vikram, Sai sarbati, এছাড়াও Phule sarbati, Balaji, Rasaraj, Seedless প্রভৃতি লেবুর জাতের উল্লেখ পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র - Wikipedia, Agrifarming.in, https://zestofhaiti.com/moringa-oleifera-tree



তেঁতুল

পরিচয় –

তেঁতুলের বিজ্ঞানসম্মত নাম Tamarindus indica, এটি Fabaceae গোত্রের উদ্ভিদ। তেঁতুল Caesalpiniaceae উপগোত্রের বহুবর্ষজীবী বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ।

উদ্ভিটির আদি জন্মস্থান আফ্রিকার উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে। বর্তমানে গাছটি পৃথিবীর উষ্ণ ও উপক্রান্তীয়, দুই জলবায়ু অঞ্চলেই বিস্তার লাভ করেছে। মনে করা হয়, পারস্যের মানুষের হাত ধরে ভারতে তেঁতুলের প্রবেশ। যদিও গাছটির বিজ্ঞানসম্মত নামের সঙ্গে specific নামটি Indica, তাই মনে হয় যেন ভারতই এর আদি জন্মস্থান। তেঁতুল গাছ এদেশের জলবায়ুতে স্বাভাবিক উদ্ভিদের মতোই বিস্তার লাভ করেছে। ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই তেঁতুল গাছ জন্মায় এবং এদেশে ব্যাপকভাবে তেঁতুলের চাষ হয়, ভারতে তেঁতুলের বার্ষিক উৎপাদন ২৭ লক্ষ ৫ হাজার ৫০০ টন। বিদেশের প্রায় ৫০টি দেশে আমাদের দেশ থেকে তেঁতুল রফতানি হয়। তেঁতুলকে হিন্দিতে ইমলি, গুজরাটিতে ইনিসিহানু, কর্ণাটকে তম্বুর, তেলেগু ভাষায় পুল্লি বা ছিন্তাপান্ডু, মারাঠীতে ছিন্তা, ওড়িয়াতে তেঁতুলি ও বাংলা ভাষায় এটি তেঁতুল নামে পরিচিত। ওড়িশা, বিহার, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশ প্রধান তেঁতুল উৎপাদক রাজ্য।

তেঁতুল গাছ বহুবর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী চিরহরিৎ বৃক্ষ। উচ্চতায় ৩০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এর পাতাগুলি পক্ষল যৌগিক প্রকৃতির, ৭-১৫ সেমি পত্রাক্ষের উপর পত্রকগুলি বিপরীতমুখী হয়ে সজ্জিত থাকে। সন্ধ্যায় তেঁতুলের পাতাগুলি মুদে যায় অর্থাৎ একত্রে জুড়ে যায়। সকালের আলোয় আবার খুলে যায়। তেঁতুলের ফুল ছোট মঞ্জরীদন্ডের উপর জন্মায়। ফুলগুলি হলুদের সঙ্গে গোলাপী ও খয়েরি ছোপ যুক্ত হয়। ফুলে বৃতির সংখ্যা ৪টি, যা শীঘ্রই খসে পড়ে। পাপড়ির সংখ্যা ৫টি, পুং কেশর ১০টি ও একটি গর্ভকেশর থাকে। ফল রসালো বা শুটি (Pod) জাতীয়। ফলের শাঁস টক স্বাদের হয়, কাঁচা অবস্থায় সবুজ বর্ণের হয় এবং পাকা অবস্থায় বাদামি বর্ণের। বাইরের খোলাটি হলদে-বাদামি বর্ণের হয়। বীজগুলি শাঁসের মধ্যে পরপর সজ্জিত থাকে, একটা ফলে সর্বাধিক ১২টি বীজ থাকে।

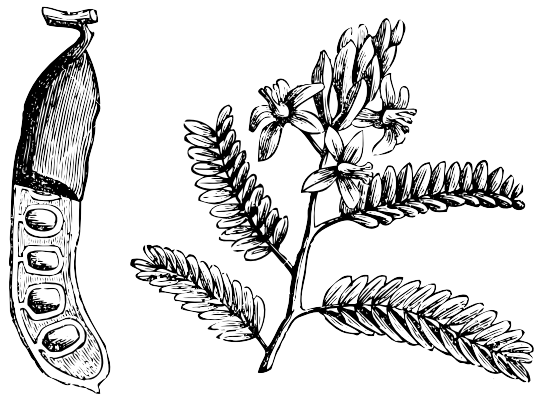
তেঁতুল উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের উদ্ভিদ। কিন্তু হিমালয় পর্বতমালায় অবস্থিত রাজ্যেও তেঁতুল গাছ জন্মায়। সেখানে অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় তেঁতুল পাকে না ও ফলও কম উৎপন্ন হয়। একটু শুষ্ক ও উষ্ণ, ২৫-৩৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতযুক্ত কিন্তু ভাল নিকাশীর সুবিধা রয়েছে এমন জায়গায় তেঁতুল ভাল জন্মায়। পলিযুক্ত গভীর মাটি তেঁতুল গাছের পক্ষে উপযুক্ত। অম্লতা ও ক্ষারীয় মাত্রা ৪.৫ -৯ PH যুক্ত মাটিতে তেঁতুল গাছ জন্মায়। ভূ-পৃষ্ঠের ১০০০ মিটার উচ্চতায় তেঁতুল গাছ জন্মায়।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

সাধারণত বীজ থেকে স্বাভাবিকভাবে তেঁতুল গাছ জন্মায়। তবে নার্সারীতে পলিথিন প্যাকেটে জৈবসারযুক্ত মাটি ভরে বীজ থেকে চারা তৈরি করা হয়। নির্দিষ্ট জমিতে ৩-৪ মাস বয়সের চারা রোপণ করে তেঁতুলের বিস্তার ঘটানো হয়। গুটিকলম পদ্ধতিতে গুটি বেঁধে কলমের গাছ তৈরি করে জমিতে রোপণ করেও তেঁতুলের বিস্তার ঘটানো হয়। এছাড়া এক বছর বয়সের বীজের তৈরি গাছের সঙ্গে budding পদ্ধতিতে জোড়কলম তৈরি করে সফলতার সঙ্গে তেঁতুলের বিস্তার সম্ভব হয়েছে। জমি প্রস্তুতির সময় থেকে আগাছা ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করে, জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জৈবসার প্রয়োগ করে ট্রাক্টর বা লাঙল দিয়ে মাটি তৈরি করে জমির ঢাল বজায় রেখে সমান করা হয়। জমিতে ১০ X ১০ মিটার দূরত্বে 1 X 1 X 1 মিটার আয়তনের গর্ত করা হয়। প্রতি গর্তে ১৫-২০ কেজি জৈবসার(FYM) প্রয়োগ করে ১০-১৫ দিন পর শুকনো হওয়ার পর গর্তের মাঝখানে চারাগুলি রোপণ করা হয়। চারাগুলি যাতে সোজা বা খাড়াভাবে থাকে তার জন্য বাঁশের কঞ্চি বা বাখারি পুঁতে চারাগাছের সঙ্গে বেঁধে সাপোর্ট দেওয়া হয়। রোপণের পর ঘন ঘন জলসেচের প্রয়োজন হয়। তেঁতুল গাছ রোপণের ৩-৪ বছর পর পর্যন্ত গাছের ফাঁকা জমিতে খেসারি, ছোলা, বিভিন্ন শাক-সবজি চাষ করা যেতে পারে, এর ফলে আলাদা করে সেভাবে আগাছা দমনের প্রয়োজন হয় না।

পরিচর্যা –

তেঁতুল গাছের কাণ্ডটি যাতে সোজাভাবে বেড়ে উঠতে পারে তার জন্য কাণ্ডের ১-১.৫০ মিটার উচ্চতার নিচের দিকের ডালগুলি কেটে দেওয়া হয়। অবাঞ্ছিত ও এলোমেলোভাবে উৎপন্ন ও শুকনো ডালপালাগুলি কেটে গাছটিকে নির্দিষ্ট আকার দেওয়া হয়। তবে প্রয়োজন হলে কোদাল বা নিড়ানীর সাহায্যে গাছের গোড়ার আগাছা পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়। প্রতিবার সার প্রয়োগের আগে আগাছা



দমনের প্রয়োজন হয়। খুব গ্রীষ্মে ও বসন্তের শুরু থেকেই বস্তা বা খড় বা প্লাস্টিক পেপার চাপা দিয়ে গাছের গোড়ার চারপাশ ঢেকে দিয়ে আর্দ্রতা সংরক্ষণ করে ফসল উৎপাদন বাড়ানো যায়। চারা রোপণের পর থেকে জমির আর্দ্রতা অনুযায়ী মাঝে মাঝে সেচ দিতে হয়। বর্ষার সময় বাদে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের পর থেকে গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত প্রয়োজন অনুসারে এক থেকে ৩-৪ বছরের চারা গাছে ৮-১০ দিন অন্তর ১০ লিটার জল প্রতি গাছে দিতে হয়। এরপর বড় গাছের জন্য জলের পরিমাণও বাড়িয়ে দিতে হয়। রোপণের ১ বছর পর প্রতি গাছে ১০ কেজি জৈবসার, ১০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ৫০ গ্রাম P2 O5 এবং ১০০ গ্রাম পটাশ সার প্রয়োগ করতে হয়। পূর্ণবয়স্ক ১০ বছরের গাছে, গাছ প্রতি ৫০ কেজি জৈবসার, ১ কেজি নাইট্রোজেন, ৫০০ গ্রাম P2 O5 ও ১ কেজি পটাশ দেওয়া যেতে পারে। এধরনের গাছে ফল আসার সময় (সেপ্টেম্বর মাসে) অতিরিক্ত ৫০০ গ্রাম হিসাবে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করতে হয়। সাধারণত তেঁতুল গাছে তেমন কোনও রোগপোকার আক্রমণ ঘটে না। যদিও Aonidiella orientalis, Aonidiella tamarini প্রভৃতি পতঙ্গের আক্রমণ ঘটে, যা কখনই খুব মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে না। অতিরিক্ত ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরত্ব –

বীজের গাছে ৬-৮ বছর পর থেকে এবং কলমের গাছে ৪ বছরের পর থেকে ফসল তোলা হয়। পেকে গেলে দু-একটা তেঁতুল গাছ থেকে খসে পড়তে শুরু করে। তখন গাছ ঝাকিয়ে ও লগি দিয়ে ফলগুলি পেড়ে সংগ্রহ করা হয়। এরপর ফলের খোলা ছাড়িয়ে ফাইবার বা শিরা তুলে বীজগুলি বের করে শুকিয়ে তা বহুদিন পর্যন্ত রাখা যায়। প্রয়োজন মতো বিক্রয় করা যেতে পারে। ফল পাকার পর ফলের খোলা ছাড়িয়ে ফেলে ফাইবার (শিরা) তুলে ফেলে বীজ কেটে শুধু কাই বা Pulp সংগ্রহ করা হয়। এরপরে রোদে শুকিয়ে বহুদিন পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়।

প্রতি হেক্টর জমি থেকে গড়ে ৩০ টন তেঁতুল উৎপাদন করা সম্ভব। তেঁতুল একটি অত্যন্ত অপরিহার্য টকজাতীয় ফল। ভারতীয় রান্নায় টক হিসাবে, চাটনি তৈরিতে, আচার তৈরিতে, স্স, ঝোল ও স্যুপ তৈরিতে, ডাল প্রভৃতিতে তেঁতুল ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ ভারতীয় রান্নায় তেঁতুলের গুরুত্ব অপরিসীম। তেঁতুলের কচি পাতা, ফুল, বীজ রান্না করে খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। বীজের পাউডার চর্মশিল্পে, বস্ত্রশিল্পে ও কাগজ শিল্পে ব্যবহার করা হয়। বীজের তেল ছাপার কাজে রং কারখানায় ব্যবহৃত হয়। গাছের কাঠ কৃষির যন্ত্রপাতি বা তার হাতল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। তেঁতুল গাছের কাঠ খুবই নিম্নমানের, কিন্তু খুব শক্ত। তবুও আজ এই কাঠ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া নির্মাণের কাজে তেঁতুলের কাঠ ব্যবহৃত হয়। পেটের রোগ, কোষ্ঠকাঠিন্য, জ্বর এবং অন্ত্রের ক্ষত বা ঘা (Peptic Ulcer) সারাতে তেঁতুলের ব্যবহার বহু প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে। গাছের ছাল এবং পাতা ক্ষত বা ঘা সারাতে খুবই উপকারী। আধুনিক গবেষণায় তেঁতুলের সাহায্যে নানান রোগ সারাবার প্রমাণ মিলেছে। তেঁতুলের মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট (Antioxident) ও পলিফেনল (Polyphenols) থাকে, যা হার্টের রোগ, ক্যানসার এবং ডায়াবেটিসের পক্ষে উপকারী।

১২০ গ্রাম তেঁতুলের কাই (Pulp)-এ ২৩৯ কিলো ক্যালরি শক্তি, ৬.২৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ৫৭.৪ গ্রাম শর্করা, চর্বিজাতীয় পদার্থ ০.৬ গ্রাম, খাদ্যতন্তু ৫.১ গ্রাম ২.৮ গ্রাম প্রোটিন ছাড়াও একাধিক ভিটামিন এবং বিভিন্ন খনিজ লবণ থাকে। পাশাপাশি এতে অ্যামাইনো অ্যাসিড ও অন্যান্য উপকারী পদার্থ থাকে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, তেঁতুলের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও ভাইরাস ধ্বংস করার ক্ষমতা আছে। এছাড়া তেঁতুলে ৮% Tartaric Acid থাকায়, তেঁতুল দিয়ে পেতল বা কাঁসার বাসন ও অন্যান্য ধাতব বস্তু পালিশ করা হয়। কাঁচা ফলের Pulp থেকে স্বত্ব (Tamarind Block) বানানো হয়। তেঁতুলের কাই ফুটিয়ে Preservative তৈরি করে বোতলে তা সংরক্ষণ করা যায়। তবে Tamarind Candy-তে অপরিমিতমাত্রায় সিসা থাকতে পারে, তাই শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে তা ক্ষতিকারক হতে পারে। প্রতি বছর ভারত থেকে বিভিন্ন দেশে লক্ষ লক্ষ টাকার তেঁতুল ও তেঁতুলজাত দ্রব্য রফতানি করা হয়। ২০১৬ সালে শুধুমাত্র অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ভারত থেকে ৫ কোটি টাকার তেঁতুল বিদেশে রফতানি হয়েছিল।

জাত পরিচিতি –

PKM, হচ্ছে উন্নতজাতের একটি তেঁতুল। জলদী জাতের এই প্রকার তেঁতুলের বার্ষিক উৎপাদন ২৭০-৩০০ কেজি। এই জাতের তেঁতুলের শাঁসের পরিমাণ ৪০%, এছাড়া মিষ্টি জাতের Urigam নামে আর এক জাতের তেঁতুলের চাষও হয়ে থাকে।

তথ্যসূত্র - wikipedia,indiagronet,http://agritech.tnau.ac.in/horticulture/horti_spice%20crops_tamarind.html, Zateba technologies & data services pvt.LTD.



দেশি জলপাই

পরিচয় –

জলপাই-এর বিজ্ঞানসম্মত নাম, এটি Elaeocarpaceae গোত্রের উদ্ভিদ। জলপাই একটি মাঝারি আকৃতির চিরহরিৎ বৃক্ষ, উচ্চতায় গাছটি ৮ থেকে ১৬ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। জলপাই গাছের পাতাগুলি আয়তকার ৬.৫–১৯ সেন্টিমিটার লম্বা এবং চওড়ায় ৩.৫–৮.৫ সেন্টিমিটার, পাতাগুলি পুরু কিনারা খাঁজ-কাটা। সুবৃন্তক, অর্থাৎ বোঁটা আছে। পাতার অগ্রভাগ সূচালো। এপ্রিল-মে মাসে জলপাই-এর ফুল আসে। এর ফুল সাদা রঙের হয়, বৃতি ও পাপড়ি বা দলমণ্ডলের ৫ টি করে বৃত্তাংশ ও পাপড়ি থাকে। পাপড়িগুলি সরু সরু ভাবে বিভক্ত। পুংকেশরে ২৫ টি পুংদণ্ড থাকে, ফুলগুলি মঞ্জরী দণ্ডের উপর পরপর সজ্জিত থাকে। জলপাই ফল রসালো ড্রুপ প্রকৃতির। ফলগুলি ছোট ২-৫ সেন্টিমিটার X ১.৫-২.৫ সেন্টিমিটার মাপের হয়, ফলে একটি মাত্র বীজ থাকে।



জলপাই সাধারণত বিভিন্ন জলবায়ুর অঞ্চলে জন্মাতে দেখা যায়। সমুদ্রতল থেকে ৯০০ মিটার উচ্চভূমি, যেখানে তাপমাত্রা অনেক কম আবার শ্রীলঙ্কা ও কেরালা, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকে যেখানে তাপমাত্রা অনেক বেশি, আবার বৃষ্টিপাত ২০০-৫০০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত অর্থাৎ জলপাই অধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চলে উষ্ণ জলবায়ুর উদ্ভিদ।

সমুদ্রতল থেকে ৯০০ মিটার উচ্চভূমিতেও জলপাই জন্মাতে পারে। জৈব পদার্থ যুক্ত দোঁয়াশ মাটিতে জলপাই ভাল জন্মায়, তবে মাটিতে জলনিকাশী ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা দরকার।

জলপাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উষ্ণ অঞ্চলের উদ্ভিদ। এর আদি জন্মস্থান শ্রীলঙ্কায়। ভারত, নেপাল, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, চিন, মায়ানমার, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে জলপাই জন্মায়। ভারতে কর্ণাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, মণিপুর, আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গে জলপাই হয়। শ্রীলঙ্কায় জলপাইয়ের স্থানীয় নাম ভেরাল্লু, কানাড়ি, মালায়লম ও তামিল ভাষায় একে 'ভেরালিক্কাই' বলে। মণিপুরীরা একে 'ছোরপোহন' বলে ডাকে, বাংলা ও আসামে জলপাই নামেই পরিচিত।



কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে পাকা জলপাই বীজ সংগ্রহ করা হয়। প্রতি কেজি বীজে ১২০০-১৩০০ বীজ পাওয়া যায়। জলপাই-এর বীজের ৩-৪ মাস পর্যন্ত অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা থাকে। উপযুক্তভাবে মাটি তৈরি করে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে বীজ বপন করা হয়। বীজ বপনের পর প্রতিদিন সকাল- বিকেল ঝারি করে জল দিতে হয়। ১৫-২০ দিন পর চারা জন্মাতে দেখা যায়। যদিও জলপাই বীজের অঙ্কুরোদ্গমের হার ৪০%-৫০%।

জল দাঁড়ায় না এরকম উঁচু জমিতে আগাছা দমন করে চাষ দিয়ে মাটি তৈরি করা হয়। জমিতে ৭ মিটার X ৭ মিটার দূরত্বে লাইন করে চারাগুলি লাগানো হয়। চারা গাছ লাগানোর ১৫-২০ দিন আগে নির্দিষ্ট দূরত্বে ১ মিটার X ১ মিটার X ১ মিটার মাপের গর্ত খোঁড়া হয়। প্রতি গর্তে ১৫-২০ কেজি গোবরসার, ৩০০-৪০০ গ্রাম ট্রিপল সুপার ফসফেট, ২৫০-৩০০ গ্রাম পটাশ, ২০০ গ্রাম জিপসাম ও ৫০ গ্রাম দস্তা গুড়ো দিয়ে ফেলে রাখা হয়। তারপর গর্তটির মাঝখানে চারাটি রোপণ করে লাঠি পুঁতে তার সঙ্গে চারা গাছটি বেঁধে দেওয়া হয়, যাতে গাছটি সোজাভাবে বেড়ে উঠতে পারে। চারা রোপণের পর থেকে ১-২ দিন অন্তর জল দিতে হয় এবং বেড়া দিয়ে গাছগুলিকে গবাদি পশুর হাত থেকে রক্ষা করা হয়।

পরিচর্যা –

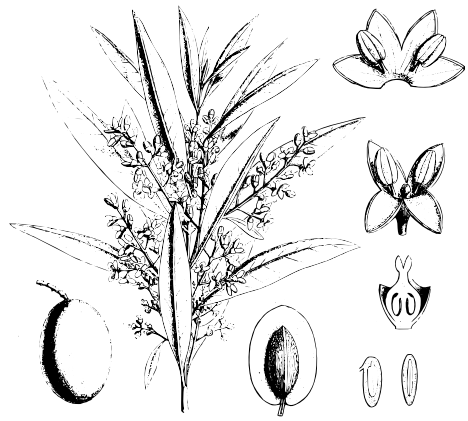
উন্নতমানের ফল ও ভাল ফলনের জন্য বছরে তিন দফায় জলপাই গাছে সার প্রয়োগ করতে হয়। গাছের বয়স অনুযায়ী, সারের পরিমাণ নিম্নরূপ -

জমির পরিমাণ বিঘায় -

গাছের বয়স	গোবরসার/ জৈবসার	ইউরিয়া	ফসফেট	পটাশ
১-৩ বছর	৩০০-৮৫০ কেজি	৯ কেজি	৯ কেজি	৯ কেজি
৪-৬ বছর	৬০০-৮৫০ কেজি	১২ কেজি	১২ কেজি	১২ কেজি
৭-১০ বছর	৬০০-৯০০ কেজি	১৮ কেজি	১৮ কেজি	১৮ কেজি

পরিণত গাছে সারের পরিমাণ গাছের আকার ও স্বাস্থ্যের হিসাবে বৃদ্ধি করতে হতে পারে। এইভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ সার বর্ষার আগে একবার, বর্ষার শেষে একবার এবং শেষ দফার সার শীতের শেষে প্রয়োগ করতে হবে। শীতকালে মাসে একবার এবং গ্রীষ্মকালে মাসে দু'বার সেচ দেওয়া হয়ে থাকে। বর্ষায় গাছের গোড়ায় যাতে জল না জমে থাকে তা দেখতে হয়।

কোদাল দিয়ে কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে মিশ্রচাষ করে একদিকে আগাছা দমন ও অন্যদিকে শাক-সবজি ও ডাল জাতীয় শস্য চাষ করে লাভবান হওয়া যায়। অথবা আগাছা দমনের ওষুধ প্রয়োগ করে আগাছা দমন করা হয়। ছোট অবস্থায় গাছগুলি যাতে সোজা ও লম্বা হয়ে বেড়ে উঠতে পারে তাই নিচের দিকের ডালগুলি ছেঁটে দেওয়া হয়। যাতে গাছের আকৃতি বেশি লম্বা না হয়, তার জন্য পরিণত গাছের অগ্রভাগের ডাল কেটে গাছের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করলে ফল পাড়তে সুবিধা হয়। খুব বেশি পরিচর্যা ছাড়াই জলপাই চাষ সম্ভব হয়। তবুও পোকামাকড়ের আক্রমণের হাত থেকে ফসল রক্ষা করতে ফুল আসার আগে ও ফল ধরার পর কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক ওষুধ স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।



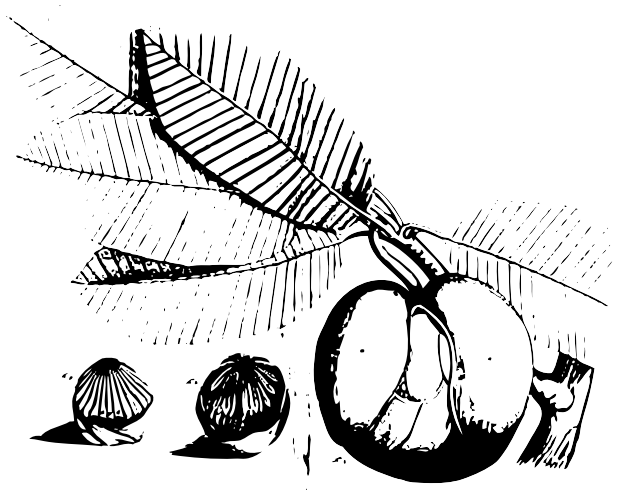
ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব -

বর্ষার সময় থেকে জলপাই তোলা শুরু হয়ে যায়, কারণ চাটনী খাওয়ার জন্য কচি জলপাই খুবই উপাদেয়। কাঁচা আম শেষ হওয়ার পর টক বা চাটনী রান্নার জন্য কোনও ফল থাকে না। সেই শূন্যস্থানে বাজারে জলপাই আমদানি হয় এবং বেশ ভাল দামেই তা বিক্রয় হয়। যদিও পাকা জলপাই নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ওঠে। গাছ নাড়িয়ে বা ঝাকা দিয়ে জলপাই পাড়লে অনেক ফল থেঁতলে নষ্ট হয়ে যায়। তাই গাছের নিচে জাল পেতে পাকা অবস্থায় জলপাই পাড়া হয়। পাকা জলপাই সবুজ বর্ণের হয় তাই ফল পেকেছে কিনা তা হাত দিয়ে চেপে দেখে নিতে হয়। ভাল যত্ন ও পরিচর্যার দ্বারা গাছ প্রতি ২০০-২৫০ কেজি ফল পাওয়া যায়। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২০১৩-১৪ সালে ৪১৫ একর জমিতে জলপাই চাষ হয়েছিল এবং বছরে উৎপাদন ছিল ১৫,৫২২ মেট্রিক টন। সাধারণত চাটনী, আচার, জেলি প্রভৃতি তৈরিতেই জলপাই ব্যবহৃত হয়। এই ফলে প্রচুর পরিমাণে শর্করা ও সুগার আছে, সামান্য পরিমাণ প্রোটিন ও আয়রনও আছে। জলপাই পেটের অসুখের পক্ষে উপকারী।

জাত পরিচিতি –

ভারতে এই ধরনের জলপাইয়ের অন্যান্য জাতের উল্লেখ না পাওয়া গেলেও বাংলাদেশে বারি নামে এর একটি জাত রয়েছে।

তথ্যসূত্র - wikipedia, bangladesh



চালতা

পরিচয় –

চালতা গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Dillenia indica, এটি Dilleniaceae গোত্রের একটি উদ্ভিদ।

প্রতিটি চালতার মধ্যে ২০টির মতো প্রকোষ্ঠ থাকে এবং প্রকোষ্ঠে ৪-৫টি বীজ থাকে।

ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় চালতা গাছ ভাল জন্মায়। বীজ বপন করে বা চারা রোপণ করে চালতার চাষ করা যেতে পারে। মে-জুন মাসে চালতা গাছে সাদা রঙের সুগন্ধযুক্ত ফুল ফোটে এবং শীতের শুরুতে ফল পাকতে শুরু করে। ডিসেম্বর মাসে ফল ছাড়িয়ে বীজ বের করে শুকিয়ে নিয়ে ফেব্রয়ারি-মার্চ মাসে তা জমিতে বপন করতে হয়।

অপ্রচলিত ফল বলে চালতাকে অবজ্ঞা করলেও বর্তমানে এর স্বাদ ও ঔষধিগুণে আকৃষ্ট হচ্ছেন অনেকেই। চালতা চাষে বাড়তি পরিশ্রম বা খরচ কোনওটাই লাগে না। একবার শুধু কষ্ট করে লাগাতে পারলেই প্রত্যেক মরসুমে নিয়মিত ফল পাওয়া যায়। পেয়ারা, আমড়া, জামরুল সহ অন্যান্য ফলের তুলনায় চালতার ফলন অনেক বেশি। তাছাড়া চালতা গাছে কোনও রোগ-বালাই নেই বললেই চলে। এমনকি পাখিতেও এই ফল নষ্ট করে না। দরকার হয় না কোনও পরিচর্যার। লাগে না কোনও সারও।

চালতা মানবদেহের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী একটি ফল। চালতা থেকে তৈরি আচার, চাটনী, জেলি, সরবত খেতে খুবই সুস্বাদু। চালতার রস চিনি ও জলের সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে সর্দি ও জ্বরে খুব উপকারী। শক্তিবর্ধক ওষুধ হিসাবেও চালতার রস ব্যবহৃত হয়। রক্ত আমাশয়ে পাকা চালতা খেলে উপকার পাওয়া যায়।

গ্রামাঞ্চলে অনেকেই বসত বাড়িতে অন্যান্য ফলের সঙ্গে চালতা গাছও লাগান। দরকার শুধু সংগঠিত উদ্যোগ। যাতে ঔষধি গুণে ভরপুর এই ফল চাষ করে গ্রামাঞ্চলের মানুষ আর্থিকভাবে আরও উপকৃত হতে পারেন।

তথ্যসূত্র - http://agrobangla.com/fruit



ব্রেডফ্রুট

পরিচয় –

ব্রেডফ্রুটের বিজ্ঞানসম্মত নাম Artocarpus altilis, এটি Moraceae গোত্রের উদ্ভিদ।

নিউগিনিয়াকে এই গাছটির আদি জন্মস্থান বলে মনে করা হয়। তবে ইন্দো-মালায়ন থেকে পশ্চিম মাইক্রোশিয়ান অঞ্চলে এই গাছ দেখা যেত। পরবর্তী সময়ে পলিনেশিয়ানদের হাত ধরে প্যাসিফিক অঞ্চলে এই গাছের বিস্তার ঘটে। আবার হাওয়াইয়ানরা মনে করেন দ্বাদশ শতাব্দীতে সামোয়ান দ্বীপ থেকে ব্রেডফ্রুট গাছের বিস্তার ঘটেছিল। এক কথায় কোন দেশ থেকে ঠিক কবে ব্রেডফ্রুট গাছের বিস্তার ঘটেছিল তা নিয়ে নানা মত রয়েছে। ভারতে বর্তমানে এই গাছের দেখা মিললেও তা খুব সীমিত। আমাদের দেশের মধ্যে কেরালা ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোঙ্কন উপকূলে ব্রেডফ্রুটের চাষ হচ্ছে।

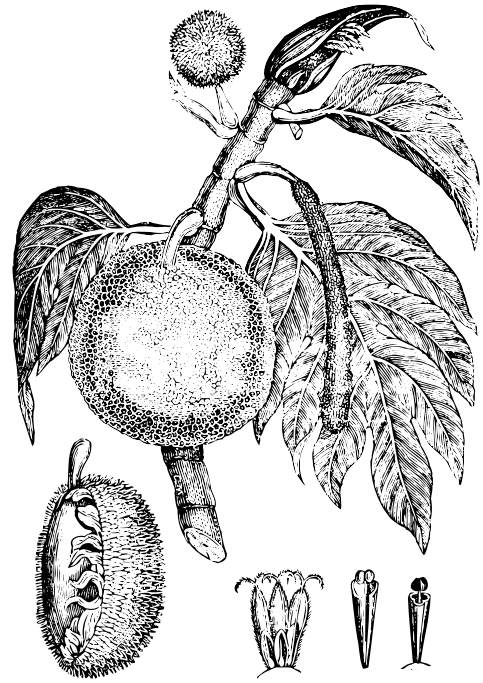
ইংরেজিতে একে Breadfruit বলে। হিন্দিতে ব্রেডফ্রুটকে বাকরি-চাঝর, মারাঠীতে নিরফানাস, তামিলে ইরপ্পা বা কাডাপিলা, কন্নড়ে গুজ্জেকাই, কোঙ্কনীতে জিভি কাডগি এবং সংস্কৃতে নাগাডামানি বলা হয়।

ব্রেডফ্রুট গাছ দেখতে খুব সুন্দর এবং খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়। লম্বায় এই গাছ ৮৫ ফুট বা ২৬ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। শুধু কাণ্ডটিই কখনও কখনও ২০ ফুট বা ৬ মিটার উঁচু হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে গাছের বেড় ২-৬ ফুট বা ০.৬-১.৮ মিটার হয়। ব্রেডফ্রুট গাছ অনেক লম্বা শাখাপ্রশাখা যুক্ত হয়। এই গাছের কিছু শাখাপ্রশাখা মোটা ও পার্শ্বীয় পত্রবিন্যাস যুক্ত হয়। বাকি শাখাপ্রশাখাগুলি লম্বা ও সরু হয়, যার শুধু অগ্রভাগে পাতাগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে। পাতাগুলি চিরহরিৎ না ক্ষণস্থায়ী হবে তা নির্ভর করে আবহাওয়ার উপর। পাতাগুলি বেশ বড় ডিম্বাকৃতির হয়। পাতার উপরিভাগ উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের ও খুব চকচকে হয়। পাতার উপরে হলদে রঙের শিরাগুলি সুস্পষ্ট থাকে। কিন্তু নিচের দিকটা হালকা হলদেটে ও রোমযুক্ত হয়। পুরু ও হলদে রঙের পত্রবৃন্তগুলি লম্বায় ৩.৮ সেমি হয়। ব্রেডফ্রুট গাছের ছোট ফুলগুলি গুচ্ছাকারে সজ্জিত থাকে। পুরুষ ফুলগুলি নিচের দিকে ঝুকে থাকে। নলাকার পুষ্পবৃন্তগুলি ১২.৫-৩০ সেমি লম্বা ও ২.৫-৩.৭৫ সেমি চওড়া হয়। প্রথম দিকে এই বৃন্তগুলি হলুদ থাকে, পরে তা বাদামি বর্ণের হয়ে যায়। এই বৃন্তগুলিতেই পুষ্পবিন্যাস থাকে। স্ত্রী ফুলগুলি বীজযুক্ত হয় এবং কখনও গোলাকার বা উপবৃত্তাকার হয়ে থাকে। এই ফুলগুলি পরিবর্তিত হয়ে ফলে পরিণত হয়। ফলগুলি আয়তকার, নলাকার, ডিম্বাকার, গোলাকার বা নাশপাতি আকৃতির হয়। লম্বায় এগুলি ৯-৪৫ সেমি এবং চওড়ায় ৫-৩০ সেমি পর্যন্ত হতে পারে। কিছু ফলের খোলা খুব মসৃণ হয়। আবার কিছু ফলের খোলা শিরীষ কাগজের ন্যায় খসখসে হয়ে থাকে। সাধারণত ফলের খোলাটি শুরুতে সবুজ রঙের হয়, পরে পেকে গেলে তার রং হলদে-সবুজ বা হলদেটে বাদামী বর্ণের হয়ে যায়। সবুজ অবস্থায় ফলগুলি শক্ত হয় এবং ভিতরের অংশ সাদা ও স্টার্চযুক্ত হয়। কিছু ক্ষেত্রে তা তন্তু যুক্তও হতে পারে। কিন্তু ফলগুলি যখন সম্পূর্ণ পেকে যায়, তখন তা অনেকটাই নরম হয়ে যায় এবং ভিতরের অংশ ক্রীম বা হলদে রঙের হয়। এসময় ফলের ভিতরের এই অংশ আঠালো ও মিষ্টি সুগন্ধ যুক্ত হয়। ব্রেডফ্রুটের বীজগুলি অনিয়মিতভাবে উপবৃত্তাকার আকৃতির হয়। যার একদিকটা গোলাকার এবং অন্য দিকটা সূঁচালো হয়ে থাকে। দাগযুক্ত হালকা বাদামী বর্ণের বীজগুলি লম্বায় ২ সেমি হয়। তবে কোনও কোনও ফলে বীজ থাকে না। সেক্ষেত্রে ফলের ভিতরে একটি নলাকার বা আয়তকার কোটরে রোমযুক্ত পাতলা, অঙ্কুরোদ্গমে ব্যর্থ বীজগুলি থাকে। যে বীজগুলি লম্বায় ৩ সেমি পর্যন্ত হয়। এক কথায় বলা যায়, ব্রেডফ্রুট ফল সাধারণত দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি সাধারণ জংলি ধরনের, যার মধ্যে অল্প শাঁস ও বীজ থাকে। অপরটি চাষ হওয়া ধরন, যা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও বীজহীন বলেই পরিচিত। তবে এই ধরনের ব্রেডফ্রুট গাছে কিছু ক্ষেত্রে অঙ্কুরোদ্গমে সক্ষম বীজও পাওয়া যেতে পারে। ব্রেডফ্রুট গাছের সব অংশেই, এমনকি কাঁচা ফলেও দুধের ন্যায় আঠালো ল্যাটেক্স থাকে।

ব্রেডফ্রুট চাষের জন্য উষ্ণ-আর্দ্র ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চল সবচেয়ে উপযুক্ত। এই গাছের জন্য বার্ষিক ১৫০-২৫০ সেমি বৃষ্টিপাত ও ২০-৩৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। রোপণের পর অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থায় আংশিক ছায়া এই গাছের বৃদ্ধির সহায়ক। পরবর্তী সময়ে সম্পূর্ণ সূর্যের আলোর প্রয়োজন হয়। ভারতের গরম উপকূল অঞ্চল এই গাছের পক্ষে খুব উপযুক্ত।

ভাল জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ নিকাশীর সুবন্দোবস্ত যুক্ত যে কোনও গভীর মাটিতেই জন্মাতে পারে।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –



অনেক ব্রেডফ্রুট ফলে বীজ থাকে বা থাকলেও তা অঙ্কুরোদ্গমে সক্ষম হয় না। তাই বীজের পাশাপাশি অঙ্গজ পদ্ধতিতে কাটিং করে এই গাছের কৃত্রিম প্রসারণ ঘটানো হয়। ২০ সেমি লম্বা ও ২৫ সেমি চওড়া মূল কেটে তা উলম্বভাবে মাটিতে রোপণ করে এই প্রসারণ করা যেতে পারে।

চাষের জন্য ব্রেডফ্রুট রোপণের সবচেয়ে ভাল সময় জুন-ডিসেম্বর মাস। তবে রোপণের আগে জমিতে একাধিকবার চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হয়। দেখতে হয় জমিতে যেন কোনও আগাছা বা আগে চাষ হওয়া শস্যের অপ্রয়োজনীয় আবর্জনা না থাকে। জমি তৈরি সময় মাটির উর্বরতা বাড়ানোর জন্য ভাল করে জৈবসার (FYM) প্রয়োগ করা যেতে পারে।

জমি তৈরি হয়ে যাওয়ার পর ১০-১২ মিটার দূরে দূরে ৬০ X ৬০ X ৬০ সেমি মাপের গর্ত করতে হয়। এরপর ওই গর্তে কাটিং বা তা থেকে তৈরি চারাগুলি রোপণ করা হয়।

পরিচর্যা –

রোপণের পর অবশ্যই সেচ দিতে হয়। পরবর্তী সময়ে কতদিন অন্তর সেচ দিতে হবে তা আবহাওয়া ও মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। তবে গরমের সময় অল্প সময়ের ব্যবধানে নিয়মিত সেচ প্রয়োজন হতে পারে। বর্ষার সময় জমিতে জল জমে গেলে তা দ্রুত বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়।

সাধারণত জৈবসার ছাড়া ব্রেডফ্রুট গাছে তেমন কোনও সার প্রয়োগের দরকার হয় না। রোপণের সময় গাছ প্রতি ২৫ কেজি জৈবসার দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া গাছের বয়সের উপর নির্ভর করে ৭ : ১০ : ৫ অনুপাতে গাছ প্রতি ১-২ কেজি NPK প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ব্রেডফ্রুট গাছে নানা ধরনের রোগপোকার আক্রমণের কথা জানা যায়। তবে আমাদের দেশে এখনও ব্যাপকভাবে এই গাছের প্রসার না ঘটায় শুধুমাত্র অতিরিক্ত জলের কারণে Fruit rot রোগই নজরে এসেছে। এই রোগের হাত থেকে বাঁচতে ১% Bordeaux মিশ্রণ গাছে স্প্রে করা যেতে পারে।

প্রয়োজন অনুভব করে ব্রেডফ্রুট চাষের সময় আগাছা দমন ও ডাল ছাঁটাইয়ের মতো পরিচর্যা করতে হতে পারে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

সাধারণত রোপণের ৩-৬ বছর পর থেকে ব্রেডফ্রুট গাছ ফল দিতে শুরু করে। গাছে ফুল ধরার ২-৩ মাস পর ফল সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। হাতের সাহায্যে বা আঁকশি দিয়ে এই ফল সংগ্রহ করা ভাল।

একটি পূর্ণবয়স্ক ব্রেডফ্রুট গাছ থেকে ৬০০-২০০০টি ফল পাওয়া যেতে পারে। ফলের ওজন ১-৫ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

গাছ থেকে পেড়ে ব্রেডফ্রুট ফল হিসাবে খাওয়া যায়। তবে ভারতে ফলের চেয়ে বেশি সবজি হিসাবেই ব্রেডফ্রুট রান্না করে খাওয়ার চল রয়েছে।

মধ্য আমেরিকা, মেক্সিকো, কলম্বিয়া, আফ্রিকা ও ভারতে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ চালিয়ে জানা গেছে, এই ফলের যে অংশ খাওয়া যায়, এমন ১০০ গ্রাম ব্রেডফ্রুটে ১০৫-১০৯ কিলো ক্যালরি শক্তি, ১.৩-২.২৪ গ্রাম প্রোটিন, ০.১-০.৮৬ গ্রাম ফ্যাট, ২১.৫-২৯.৪৯ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ১.০৮-২.১ গ্রাম তন্তু থাকে। এই ফলটিতে ০.০০৪ মিলিগ্রাম ক্যারোটিন, ০.০৮-০.০৮৫ মিলিগ্রাম থিয়ামিন, ০.০৩৩-০.০৭ মিলিগ্রাম রাইবোফ্ল্যাভিন, ০.৫০৬-০.৯২ মিলিগ্রাম নিয়াসিন ছাড়াও অ্যাসকরবিক আসিড ও অ্যামাইনো অ্যাসিড রয়েছে। এই পরিমাণ ব্রেডফ্রুটে ০.০৫ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ০.০৪ মিলিগ্রাম ও ০.৬১-২.৪ মিলিগ্রাম আয়রন থাকে।

দেখা গেছে যে, বীজহীন ব্রেডফ্রুট ফলে প্রোটিনের পরিমাণ অনেক কম থাকে। অন্যদিকে বীজযুক্ত ফলে খাদ্যগুণ অনেক বেশি থাকে।

এই গাছের ফুলেও ৪.০৫% প্রোটিন, ৭৬.৭০ কার্বোহাইড্রেট এবং ৩৩১ ক্যালরি শক্তি থাকে। এই খাদ্যগুণকে কাসাভা ফুলের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, প্রতি ১০০ গ্রাম কাসাভা ফুলে ১.১৬ প্রোটিন, ৮৩.৮৩ কার্বোহাইড্রেট এবং ৩৪৭ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়।

এই পুষ্টিগুণের কারণে ব্রেডফ্রুট ফল আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব উপকারী। হার্টের ক্ষেত্রে এই ফল খাওয়া খুব ভাল। এছাড়া ব্রেডফ্রুট

ফল বিভিন্ন সংক্রমণকে প্রতিহত করে, শরীরকে বাড়তি শক্তি জোগায়, হজমে সাহায্য করে, মধুমেহ রোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, দাঁতের ব্যাথার উপশমে সাহায্য করে, বিভিন্ন চর্মরোগে খুব উপকারী এবং চুলের যত্নেও খুব ভাল।

তাই সবজি হিসাবে রান্না করেই হোক বা ফল হিসাবেই হোক, ব্রেডফ্রুট ফলের অসামান্য খাদ্যগুণের কথা মাথায় রেখে আগামীদিনে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে বাণিজ্যিকভিত্তিতে আমাদের দেশের অন্যান্য অংশেও এই ফল চাষ করলে তা বেশ লাভজনক হয়ে উঠতে পারে।

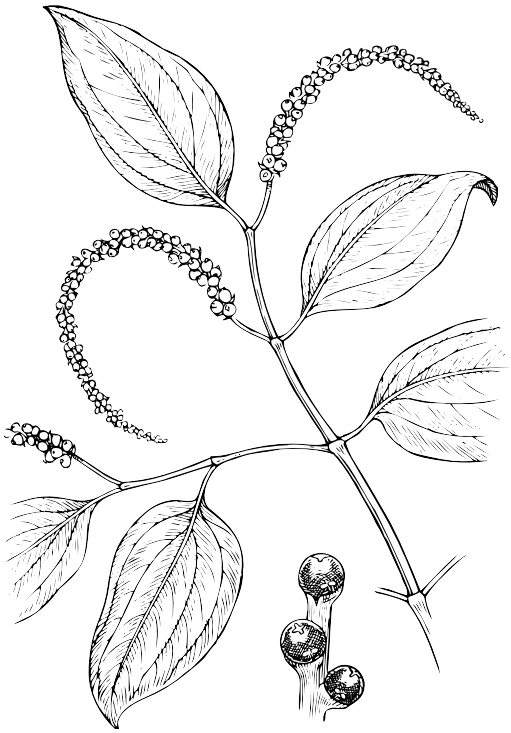


জাত পরিচিতি –

গবেষণায় জানা গেছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্রেডফ্রুট গাছের বিভিন্ন উন্নত জাত রয়েছে। তবে আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় ব্রেডফ্রুটের বিভিন্ন নাম থাকলে এখনও এই গাছের চাষ হওয়া কোনও উন্নত জাতের খোঁজ মেলেনি।

তথ্যসূত্র - Fruits of warm climates - Julia F. Morton, www,agrifarming.in

মশলা উৎপাদনকারী গাছ



গোলমরিচ

পরিচয় –

গোলমরিচের বিজ্ঞানসম্মত নাম Piper nigrum, এটি Piperacea গোত্রের লতানে উদ্ভিদ।

গোলমরিচের আদি জন্মস্থান দক্ষিণ ভারতে। পৃথিবীর উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে ব্যাপকভাবে গোলমরিচের চাষ হয়। গোলমরিচ উৎপাদনে বর্তমানে ভিয়েতনাম প্রথম স্থানে রয়েছে। পৃথিবীতে মোট উৎপাদিত গোলমরিচের ৩৪% ভিয়েতনামেই উৎপন্ন হয়। গোলমরিচ রফতানির ক্ষেত্রেও ভিয়েতনাম প্রথম।

গোলমরিচ গাছের ফল পাকলে গাঢ় লাল রঙের হয়, শুকনো হলে কালো হয়ে যায়। ইংরেজিতে গোলমরিচকে Black pepper বলা হয়। একে মশলার রাজা বলা হয়। মশলা হিসাবে পৃথিবীর সব দেশেই গোলমরিচ ব্যবহৃত হয়। কাঁচা অবস্থায় গোলমরিচ সংগ্রহ করে শুকিয়েও ব্যবহার করা হয়, একে গ্রীন পিপার বলা হয়। পাকা ফলের বীজকে White pepper বলা হয়। প্রাচীনকাল থেকেই গোলমরিচ মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এই মশলার ব্যবসা পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় মশলার ব্যবসায় পরিণত হয়েছে।

গোলমরিচের ইংরেজি নাম 'Pepper' শব্দটি গ্রীকশব্দ Peperi থেকে এসেছে। সংস্কৃতে এর নাম মরিচ, তামিল ভাষায় মিলাগু, মালায়লম ভাষায় কুরুমুলকা, তেলেগুতে মরিচমু, হিন্দি ও বাংলায় গোলমরিচ নামে পরিচিত।

গোলমরিচ বিরুৎ শ্রেণীর লতানে উদ্ভিদ। লতাটি লম্বায় ৪ মিটার পর্যন্ত হয়। গাছটি লতিয়ে বড় হয়, আবার গাছের ওপর উঠতে পারে। গাছটি মসৃণ ও নরম প্রকৃতির হয়। গোলাকার-ডিম্বাকার বা অবআয়তকার গোলমরিচের পাতাগুলি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ৫-১০ সেমি X ৩-৬ সেমি, পাতার অগ্রভাগ সূচাঁলো ও পাতার উভয়তলই মসৃণ হয়। পাতায় ৫-৭ টি শিরা বর্তমান। পাতার বোঁটার দিকটা হার্টের আকৃতির হয়। বৃন্তটি ২.৫৪ সেমি লম্বা হতে পারে। পুরুষ ফুল ও স্ত্রী ফুল আলাদা পুষ্পমঞ্জরীতে জন্মায়। পুরুষ ফুলের মঞ্জরীটি হলুদ রঙের হয়। স্ত্রী ফুলের মঞ্জরীদন্ডটি নরম ও মোটা হয়, লম্বায় ৭-১৫ সেমি পর্যন্ত হয়। যার উপর গোলাকার ফলগুলি জন্মায়। গোলমরিচ বেরী প্রকৃতির ফল। ফলের মধ্যে একটি মাত্র বীজ থাকে। জঙ্গলের গোলমরিচে অর্থাৎ Dioecious-এ স্ত্রী ফুল ও পুরুষ ফুল আলাদা আলাদা গাছে জন্মায়। কিন্তু উন্নতজাতের গোলমরিচ Cultivar-এ স্ত্রী ও পুরুষ ফুল একই গাছে জন্মায়। অর্থাৎ Monoecious

গোলমরিচ উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলে ভাল জন্মায়। ২৩-৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা গোলমরিচ চাষের উপযুক্ত। মাটির তাপমাত্রা ২৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস থাকলে মূলের বৃদ্ধি ভাল হয়। জুন-জুলাই মাসে ৬০-৯৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতা এর উপযুক্ত। ১৫০০-৪০০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে সাধারণত গোলমরিচ ভাল হয়।

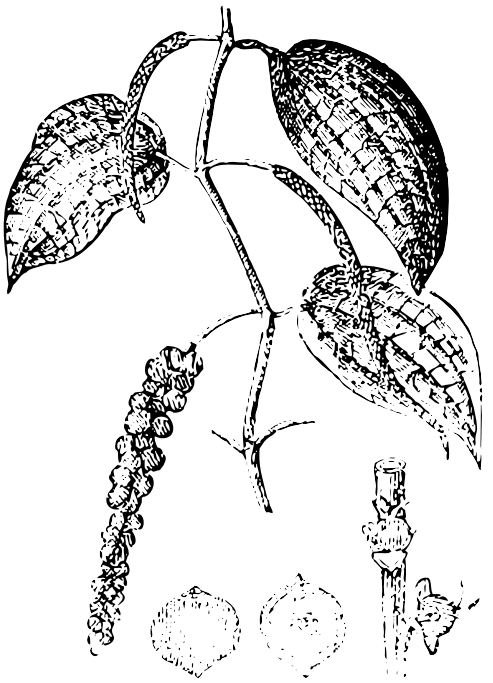
সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৫০০ মিটার উচ্চভূমিতে গোলমরিচ জন্মাতে পারে। তবে ৯০০ মিটার উঁচু জমিতে এটি ভাল জন্মায়। উপযুক্ত নিকাশীযুক্ত খুব ভিজেও নয়, আবার খুব শুকনোও নয়, এমন মাটি যার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব পদার্থ ও খনিজ পদার্থ বর্তমান সেখানে গোলমরিচ চাষ ভাল হয়।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

সাধারণত গোলমরিচ গাছ কাটিং (লতা কেটে) করে রোপণ করা হয়। ৪০-৫০ সেমি লম্বা গোলমরিচ গাছের ডগা কেটে মাটিতে রোপণ করে গাছের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয় বা মাচায় চড়িয়ে দেওয়া হয়। ২ মিটার দূরত্বে গাছগুলি বেঁধে দেওয়া হয়।

নির্দিষ্ট দূরত্বে লাগানো সুপারি গাছের বাগানে গোলমরিচ চাষ করা হয়। একটু বড় হলে গোলমরিচের লতাগুলি সুপারি গাছে তুলে দেওয়া হয়। সুপারি গাছে উঠে গোলমরিচ গাছগুলি শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে। ফলে এই বাগান থেকে একই সাথে গোলমরিচ ও সুপারি দুই-ই পাওয়া যায়।

পরিচর্যা –



ভাল আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রয়েছে এমন ছায়াযুক্ত স্থানে গোলমরিচ ভাল হয়। আশপাশের আগাছা লতাপাতাগুলি পরিষ্কার করে গোলমরিচ গাছের বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করে দিতে হয়। বছরে দু'বার গোলমরিচ গাছের অবাঞ্ছিত ডগাগুলি ছেঁটে দিতে হয়। গাছের গোড়া যাতে ভিজে থাকে তার জন্য লতাপাতা দিয়ে ঢেকে দিয়ে মাটির আর্দ্রতা রক্ষা করতে হয়। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে এই ব্যবস্থার (Mulching) প্রয়োজন হয়।

গাছের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী জৈবসার প্রয়োগ করতে হয়। গ্রীষ্মকালে দু-একদিন অন্তর জল বা সেচ দিতে হয়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব -

রোপণের তিন বছর পর থেকে গোলমরিচ গাছ ফল দিতে শুরু করে। চতুর্থ–পঞ্চম বছর থেকে ৭ বছর পর্যন্ত উৎপাদনের পরিমাণ বাড়তে থাকে। এরপর আবার নতুন করে রোপণের প্রয়োজন হয়। একটি পরিণত গাছের কাঁদিতে (Fruiting Spike) ২০-৩০ টি ফল জন্মায়। ফলগুলি পেকে গেলে কাঁদি সমেত সংগ্রহ করে রোদে শুকনো করা হয়। এরপর সেগুলি গরম জলে ধুয়ে বা সিদ্ধ করে শুকনো করলে ছত্রাক আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। ভালভাবে শুকনো করে না রাখলে ফলের গুণমানও নষ্ট হতে পারে। শুকনো গোলমরিচ এরপর স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা হয়। ক্রমে তা বিভিন্নভাবে ব্যবসায়ী সংস্থা মারফত বিদেশে রফতানি করা হয়। দেশীয় বাজারেও এর চাহিদা প্রচুর। গোলমরিচ বা গোলমরিচের গুঁড়োয় ১৩% বা ২৫৫ কিলো ক্যালরি শক্তি, ৪৯% কার্বোহাইড্রেট, ১৯.৫% প্রোটিন, ১১% ফ্যাট ও ৬৯% খাদ্যতন্তু থাকে। খনিজ লবণ হিসাবে গোলমরিচে ৩% সোডিয়াম ও ২৭% পটাসিয়াম থাকে। মিনারেলের মধ্যে ৪৪% ক্যালসিয়াম, ১২% কপার, ১০% আয়রন, ২৪% ম্যাগনেসিয়াম, ২৫% ফসফরাস ও ১৩% জিঙ্ক থাকে। গোলমরিচে ২% ক্লোরিন, ২.৫% ফলিক অ্যাসিড, ৭% নিয়োসিন, ২৬% রাইডক্সিন, ১৮% রাইবোফ্ল্যাভিন, ৯% থিয়ামিন, ১০% ভিটামিন–A, ৩৫% ভিটামিন – C, ১৩% ভিটামিন – K ও ৩০% ভিটামিন – E থাকে। এছাড়াও গোলমরিচে অন্যান্য ফাইটো নিউট্রিয়েন্টস্ বর্তমান।

মশলা হিসাবে সারা পৃথিবীতে গোলমরিচ ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন প্রকার রান্নায়, স্যালাডে, সরবতে, আচারে গোটা গোলমরিচ ও গোলমরিচের গুঁড়ো ব্যবহার করা হয়।

গোলমরিচের বীজের তেল হজম শক্তি বাড়ায়, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, বাতের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। জন্ডিস রোগে, গ্যাস অম্বলে ও জীবাণুনাশক হিসাবে এর ব্যবহার হয়ে থাকে।

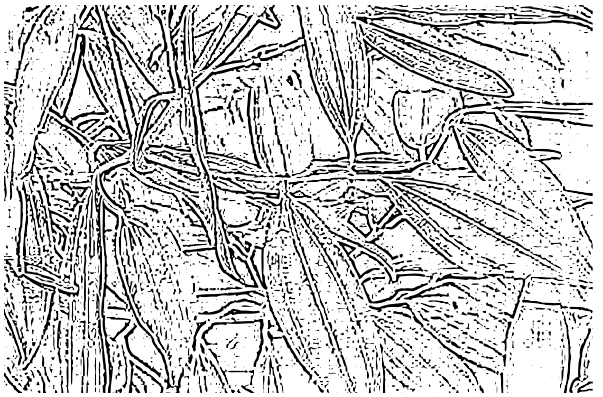
গোলমরিচে ভিটামিন - C থাকায় সর্দিকাশি, ব্রংকাইটিস রোগের পক্ষে খুবই উপকারী। প্রতিদিন অল্প করে গোলমরিচ খেলে পেটের সমস্যা, গ্যাসের সমস্যা, কোলন ক্যানসার, লিভার ক্যানসার প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

গোলমরিচ শরীরের অবাঞ্ছিত ক্যালরি ও ফ্যাটকে নষ্ট করে স্থূলতা রোগকে প্রতিহত করে। এছাড়া হতাশা দূর করতে, দাঁতের ও ত্বকের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে, বাতের ব্যথার যন্ত্রণা কমাতে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে, চুলের স্বাস্থ্য রক্ষায় ও খুসকি দূর করতে, কোচকানো (Wrinkles) ত্বক টানটান রেখে যৌবন ধরে রাখতে গোলমরিচ বা গোলমরিচের তেল ওষুধ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

জাত পরিচিতি –

গোলমরিচের গাছে ফলের কাঁদির (Fruiting Spike) সংখ্যা, কাঁদির দৈর্ঘ্য, কাঁদিতে ফলের সংখ্যার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন জাতের গোলমরিচ হয়। প্রায় ৪৪ রকম জাতের গোলমরিচের উল্লেখ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে কয়েকটি জাত হল, Kuthiravally (কাঁদি ১৭ সেমি লম্বা), Poonjaranmunda (কাঁদি ১৬.৪ সেমি লম্বা), Karimkotta (কাঁদি ১৫.৬ সেমি) ও Panniyur (কাঁদির দৈর্ঘ্য ১৪ সেমি)।

তথ্যসূত্র - http://www.agrifarming.in/black-pepper-farming/, wikipedia



তেজপাতা

পরিচয় –

ভারতীয় Bay Leaf বা তেজপাতার বিজ্ঞানসম্মত নাম Cinnamomum tamala, এটি Lauraceae গোত্রের বহুবর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী চিরহরিৎ উদ্ভিদ।

ভারতই তেজপাতা গাছের আদি জন্মস্থান। ভারত ছাড়া নেপাল, ভূটান, চিন, বাংলাদেশে তেজপাতা গাছ জন্মায়।

বিভিন্ন দেশে তেজপাতা রান্নায় মশলা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ভারতে মুঘল পূর্ববর্তী ও মুঘল শাসনকালে তেজপাতা রান্নার মশলা হিসাবে ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হত। ভূটানে 'তেশেরিংগমা' নামে একপ্রকার ভেষজ চা (Herbal Tea) পাওয়া যায়, যাতে তেজপাতা গাছের শিকড়ের ছাল অন্যতম উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

তেজপাতাকে ইংরেজিতে Bay Leaf বলে। সংস্কৃতে একে তমালকা, হিন্দিতে তেজপাতা, নেপালী, অসমীয়া ও বাংলা ভাষায় তেজপাতা, মালায়লম ভাষায় ভাজান্যায়লতা, তামিলে তলিশাপ্পাতিরি এবং তেলেগু ভাষায় তেজপাতা তলিশাপাত্রী নামে পরিচিতি।

তেজপাতা ছোট বা মাঝারি আকারের বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। তেজপাতা গাছের উচ্চতা ৮ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। কাণ্ডটি ধূসর বর্ণের হয়। কাণ্ডের বেড় ১৫০ সেমি পর্যন্ত মোটা হয়ে থাকে। পাতাগুলি বিপরীতমুখী হয়ে শাখাপ্রশাখায় সজ্জিত থাকে। পাতাগুলি ১০-১২ সেমি লম্বা এবং চওড়ায় বিভিন্ন মাপের হয়ে থাকে। পাতায় তিনটি শিরা দেখা যায়। শিরাগুলি পাতার নীচের পৃষ্ঠে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। পাতার উপরিভাগ মসৃণ ও চক্চকে। পাতার কিনারাও মসৃণ হয়ে থাকে। পাতার বৃন্তটি ছোট। পাতাগুলি উপবৃত্তাকার বা ডিম্বাকার আকৃতির হয়ে থাকে। ফুলগুলি শাখাযুক্ত পুষ্পমঞ্জরীতে সজ্জিত থাকে। ফুলগুলি সাদা রঙের হয়। বৃতি ও দলমণ্ডল মিলিত হয়ে একটি টিউব তৈরি করে। টিউবটি ছোট এবং ৬টি অসমান খন্ডে বিভক্ত, ৯টি পুংকেশর থাকে। পরাগধানী ৪টি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হয়ে থাকে। ফলগুলি উপবৃত্তাকার ও ছোট আকারের হয়ে থাকে। মে মাসে তেজপাতা গাছে ফুল আসে এবং জুন-জুলাই মাসে ফল জন্মায়।

উষ্ণ ও উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে গাছটিকে জন্মাতে দেখা যায়। সমুদ্রতল থেকে ৩০০-২৪০০ মিটার বা ২৪০০ মিটারেরও বেশি উঁচু জমিতে তেজপাতা গাছ জন্মাতে দেখা যায়।

জৈব পদার্থ পূর্ণ উপযুক্ত নিকাশীযুক্ত উর্বর মাটিতে তেজপাতা গাছ ভাল জন্মায়।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

নার্সারীতে উপযুক্ত পরিচর্যায় বীজ বপন করে চারা গাছ তৈরি করা যায়। এক মাস বা দেড় মাস পরে বীজের অঙ্কুরোদ্গমের ফলে নতুন চারা জন্মায়। ৪-৫ বছরের চারা নার্সারী থেকে অন্যত্র রোপণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

উপযুক্তভাবে মাটি কুপিয়ে বা লাঙল দিয়ে মাটি তৈরি করে ৩-৪ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে ছায়াযুক্ত স্থানে চারাগুলি রোপণ করা হয়।

পরিচর্যা –

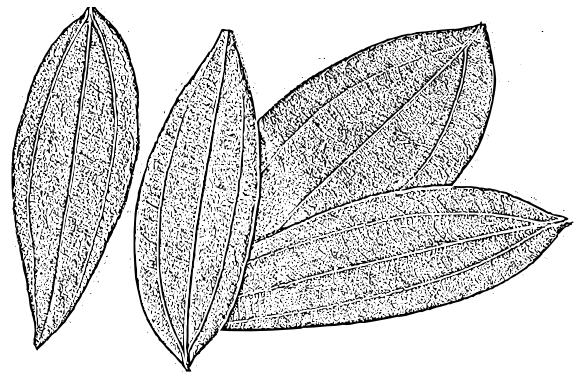
চারা রোপণের পর থেকে বৃষ্টি না হলে নিয়মিত চারা গাছের জল প্রয়োগ করে মাটির আর্দ্রতা রক্ষা করতে হয়। সাধারণত তেজপাতা গাছের জন্য কোনও সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। তবে জৈবসার ব্যবহার করলে তেজপাতা গাছের বৃদ্ধির পক্ষে ভাল হয়।

তেজপাতা গাছের গোড়ার চারদিকের আগাছাগুলি কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে, গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দেওয়া ও আগাছা দমন করা হয়ে থাকে।

গাছের কাণ্ডটিকে সোজাভাবে বড় করে তৈরি করার জন্য চারা গাছের নিচের দিকের মাটি থেকে ১ মিটার উচ্চতায় কোনও ডালপালা জন্মাতে দেওয়া হয় না, তা কেটে দেওয়া হয়। এছাড়া তেজপাতা গাছ বড় হওয়ার সাথে সাথে অর্থাৎ রোপণের পর থেকে ৮-৯ বছরের মধ্যে তেজপাতা গাছের ছায়া প্রদানকারী ডালপালাগুলি কেটে গাছের জন্য পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

Glomerella cingulata এবং Colletotrichum gloeosporioides নামক ছত্রাক তেজপাতা গাছের পাতায় দাগ ও ধ্বসা রোগ ঘটিয়ে প্রচুর ক্ষতিসাধন করতে পারে। এক্ষেত্রে ছত্রাকনাশক স্প্রে করে এই আক্রমণ প্রতিরোধ করা হয়ে থাকে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –



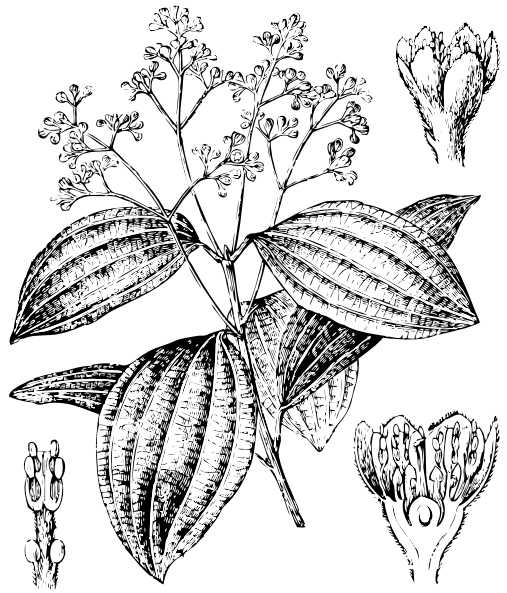
অক্টোবর-মার্চ মাসের মধ্যে তেজপাতা গাছের ফসল অর্থাৎ পাতা সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়। শুষ্ক আবহাওয়ায় গাছ থেকে এক বছর অন্তর পাতাগুলি সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ছোট ছোট ডালগুলি কেটে রোদে শুকনো করে পাতাগুলি আলাদা করে বেঁধে বাণ্ডিল করে বাজারজাত করা হয়।

পরিণত তেজপাতা গাছ থেকে বছরে ৪০-১০০ কেজি পর্যন্ত পাতা উৎপন্ন হতে পারে। তেজপাতা গাছ ১০০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে।

সারা ভারতে তেজপাতা রান্নার কাজে মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে উত্তর ভারতে এর ব্যবহার খুব বেশি। কাশ্মীরে তেজপাতা পানের বিকল্প হিসাবে খাওয়ার রেওয়াজ রয়েছে।

তেজপাতার বিভিন্ন ঔষধি গুণ রয়েছে। এই গাছের বিভিন্ন অংশ আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। পেট খারাপ সারাতে ও পেটের যন্ত্রণার উপশমে তেজপাতা খুবই উপযোগী। তেজপাতা থেকে যে Essential oil পাওয়া যায় তা বিভিন্ন ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। তাই ভারতের বাইরেও অনেক দেশে এই গাছের বিস্তার ঘটেছে। C. tamala -র বিভিন্ন Essential Oil-এ এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ থাকায় তা ছত্রাকনাশক তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া তেজপাতার Cinnamic aldehyde নামক Essential oil সাবানের সুগন্ধ বৃদ্ধি করতে ব্যবহৃত হয়।

তথ্যসূত্র - Agroforestry Database 4.0 (Orwa et al.2009)



দারচিনি

পরিচয় –

দারচিনির বিজ্ঞানসম্মত নাম Cinnamomum zeylanicum, এটি Lauracaeae গোত্রের চিরহরিৎ গাছ। দারচিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপ্রাচীন মশলা। দারচিনি গাছের বাকল বা ছাল থেকে মশলা দারচিনি তৈরি হয়। দারচিনির আদি বাসস্থান শ্রীলঙ্কা। আজও দারচিনিকে সিলোন দারচিনি বলে উল্লেখ করা হয়। বহুবছর ধরে কেবলমাত্র সিলোনে এর চাষ হয়েছে এবং পর্তুগীজ, ডাচ ও বৃটিশদের একছত্র অধিকারে ছিল এই দারচিনি। বর্তমানে দক্ষিণ ভারত, বার্মা, মালয়েশিয়ার কিছু অংশে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওঁ দক্ষিণ আমেরিকায় এর চাষ হয়।

ইংরেজিতে দারচিনিকে Cinnamon বলা হয়। হিব্রু ও আরবের amomon শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। যার অর্থ সুগন্ধযুক্ত মশলার গাছ। সংস্কৃতে দারুচিনি বা দারুশিলা, হিন্দিতে দালচিনি এবং বাংলা ভাষায় এটি দারচিনি নামে পরিচিত।

দারচিনি চিরহরিৎ শ্রেণীর একটি গাছ। উচ্চতায় গাছটি ৮-১৭ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। কাণ্ডের বাকলে ও পাতায় তীব্র গন্ধ থাকে। পাতা ডিম্বাকৃতির ও শাখার বিপরীত দিকে থাকে। ফুল কাণ্ডের কক্ষ বা শাখার অগ্রভাগে জন্মায়। ফুল হয় খুব ছোট হালকা হলুদ রঙের। ফুলে পাপড়ি থাকে না। পুংকেশর থাকে ৯টি, ৬টি থাকে বাইরের দিকে এবং ৩টি থাকে ভেতরে। ফল মাংসল কালচে রঙের ও বড় বৃতিযুক্ত।

দারচিনি চাষের জন্য উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ুর দরকার। দিন ও রাতের গড় তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস অর্থাৎ বেশি গরম বা বেশি ঠাণ্ডা নয়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০০-২৫০ সেমি-এর মধ্যে থাকে, এমন জলবায়ু দারচিনি চাষের জন্য সব থেকে ভাল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫০০ মিটার পর্যন্ত উঁচু জায়গায় দারচিনি ভাল হয়। তবে ১০০০ মিটার পর্যন্ত উঁচু জায়গাতেও দারচিনি চাষ করা সম্ভব। দারচিনি চাষে কৃত্রিম ছায়ার প্রয়োজন হয় না।

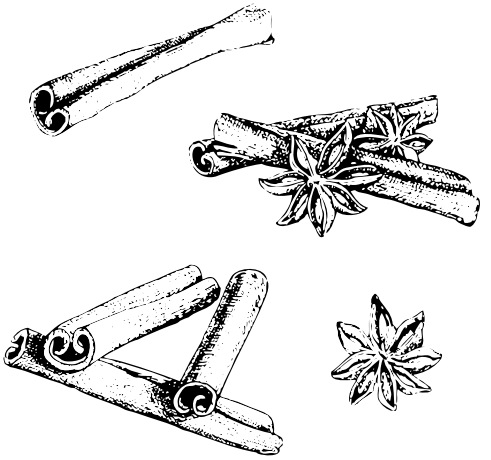
সাধারণত মাটির প্রকৃতির উপর দারচিনির বাকলের গুণগত মান নির্ভর করে। পাথুরে মাটিতে দারচিনি চাষ অনুপোযুক্ত। খুব মিহি সাদা বালি মাটিতে বাকলের গুণগত মান ভাল হয়। যে সব জমিতে জল দাঁড়ায় বা জলাভূমিতে দারচিনি গাছ লাগালে বাকলের স্বাদ তেতো হয়ে যায়, গন্ধও থাকে না। ভারতের পশ্চিম উপকূলে লাল কাঁকুরে মাটি বা অনুর্বর বালি মাটিতে দারচিনি চাষ ভাল হয়। প্রাকৃতিক বনভূমিতে জঙ্গল পরিষ্কার করে ১৫ মিটার দূরে দূরে বড় গাছ রেখে তার ছায়ায় দারচিনি চাষ করা যায়। এছাড়া নারকেল বাগানে গাছের ফাঁকা জায়গায় দারচিনি লাগানো যেতে পারে।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

দারচিনি দু'ভাবে লাগানো যেতে পারে। বীজ থেকে চারাগাছ তৈরি করে বা অঙ্গজ জনন পদ্ধতিতে গাছের কাণ্ড থেকে কাটিং বা কলম করে। বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য বীজ থেকে চারা তৈরি করে লাগানোই ভাল। দারচিনি গাছের ফল পাখি খেয়ে নেয়। তাই ফল ধরলেই ব্যাগ দিয়ে ফলগুলিকে ঢেকে রাখা দরকার। ফল পাকলে পাকা ফল সংগ্রহ করে এক জায়গায় স্তূপ করে রাখা হয়। ফলের খোসা ও বীজের বাইরের অংশ পচে নরম হলে বীজ পরিষ্কার করে ধুয়ে ছায়ায় শুকিয়ে রোপণের জন্য ব্যবহার করা হয়। এই সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যেন বীজ তাড়াতাড়ি বীজতলায় লাগানো হয়। দারচিনি বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সর্বোচ্চ অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা থাকে বীজ সংগ্রহের পর তৃতীয় দিনে বীজ লাগানো হলে। এরপর আস্তে আস্তে তা অনেকটাই কমে যায়। যদি এক সপ্তাহের মধ্যে বীজ লাগানো যায় তবে দেখা যায় ২০-২৫ দিনের মধ্যে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না, অঙ্কুরোদ্গম হতে ৩২-৪২ দিন সময় লেগে যায়।

বীজ থেকে চারা তৈরি করার জন্য প্রথমে বীজতলা তৈরি করতে হয়। বীজতলার জন্য এমন জায়গা নির্বাচন করতে হয় যেখানে জল দাঁড়ায় না এবং মাটি ঝুরঝুরে। মাটিতে যেন কোনও গাছের শিকড় বা কাঁকর না থাকে। এজন্য মাটি খুব ভাল করে বেছে নিতে হয়। ১ মিটার চওড়া, ১৫ সেমি উঁচু ও সুবিধামত দৈর্ঘের বীজতলা তৈরি করে তার মধ্যে গোবর বা আবর্জনা সার, বালি ও মাটি ২:১:১ অনুপাতে মিশিয়ে সারিতে বীজ বুনতে হয়।

রোগপোকা দমনের জন্য বীজ বোনার আগে বীজতলার মাটি শোধন করা হলে সুস্থ চারা তৈরি করা যায়। যে কোনও ছত্রাকনাশক ও রোগপোকা দমনের ওষুধ নির্দেশ অনুযায়ী পরিমাণ মতো জলে গুলে মাটিতে স্প্রে করে মাটি শোধন করা যায়। অতিরিক্ত সতর্কতা



হিসেবে বীজও কোনও ছত্রাক প্রতিরোধক ওষুধে মিশিয়ে শোধন করা উচিত। বীজ ও বীজতলার মাটি শোধন করার পর ২০ সেমি সারির দূরত্বে ১০ সেমি পরপর বীজ প্রায় ২.৫ সেমি গভীরে বপন করে হালকাভাবে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয় বীজতলায় মাটির আর্দ্রতা যেন বজায় থাকে। কচি পাতা যেন অতিরিক্ত রোদ-বৃষ্টিতে নষ্ট না হয় তারজন্য বীজতলায় কৃত্রিম ছাউনির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। গাছ যেন ছাউনির ফাঁক দিয়ে প্রয়োজনীয় আলো-বাতাস পায় সে দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। গাছ সবল হলে আস্তে আস্তে ছাউনি সরিয়ে দিতে হয়। চার থেকে ছয় মাসের মধ্যে চারাগাছ জমিতে লাগানোর উপযুক্ত হয়। এই সময় চারাগাছ তুলে জমিতে লাগানো যায়। বীজতলায় চারা তৈরি না করে ৩০ সেমি দৈর্ঘ X ১৫ সেমি প্রস্থ বিশিষ্ট পলিথিনের ব্যাগে মাটি মিশ্রণ ভরেও সরাসরি বীজ বুনে চারা তৈরি করা যায়।

দারচিনি চাষের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সূর্যের আলো থাকে এবং জল নিষ্কাশনের ভাল ব্যবস্থা রয়েছে এমন জমিই নির্বাচন করা উচিত। উঁচু জমি বা ছোট ছোট পাহাড়ের ঢালেও দারচিনি চাষ করা যায়। জমি নির্বাচনের পর প্রথমে জঙ্গল পরিষ্কার করে সারি থেকে সারি ৩ মিটার ও গাছ থেকে গাছ ৩ মিটার, এমন দূরত্ব বজায় রেখে ৫০ সেমি দীর্ঘ, ৫০ সেমি চওড়া ও ৫০ সেমি গভীর গর্ত করে গর্তের মাটির সঙ্গে কম্পোস্ট বা গোবর সার মিশিয়ে গর্ত ভর্তি করে রেখে দেওয়া হয়। এরপর মৌসুমী বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে বাংলার আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে দারচিনির চারা গর্তে লাগাতে হয়। চারা রোপণের পর গর্তের চারদিকে কৃত্রিম ছাউনির ব্যবস্থা করলে চারা তাড়াতাড়ি বড় হয়। কোনও কোনও অঞ্চলে বীজতলায় বীজ বপন করে চারা তৈরি না করে সরাসরি জমিতে গর্তের মধ্যে বীজ বপন করা হয়।

পরিচর্যা –

মাটির উর্বরতা বিচার করে দারচিনি গাছে সার প্রয়োগ করতে হয়। সাধারণত প্রথম বছর প্রতি গাছে ২০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ১৮ গ্রাম ফসফরাস ও ২৫ গ্রাম পটাশ সার প্রয়োগ করা হয়। সারের মাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করে ১০ বছর ও তার পরে গাছ প্রতি ২০০ গ্রাম প্রয়োগ করা হয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথমবার এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাসে দ্বিতীয়বার। দারচিনি গাছের বয়স ও জমির পরিমাণ অনুযায়ী ইউরিয়া, সুপার ফসফেট বা রক ফসফেট, মিউরিয়েট অফ পটাশ প্রভৃতি সার নির্ধারিত হারে প্রয়োগ করতে হয়।

দারচিনি গাছ প্রতিকূল আবহাওয়া সহ্য করতে সক্ষম। চারা লাগানোর পর প্রথম ২ বছর যত্ন ও পরিচর্যার মধ্যে প্রধান হল, গাছের গোড়ার আগাছা পরিষ্কার রাখা। এই দু'বছরে ৩-৪বার আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। তৃতীয় বছর থেকে বছরে ১০-১৫ সেমি মাটির উপর প্রধান কাণ্ড কেটে মাটি চাপা দেওয়া হয়।

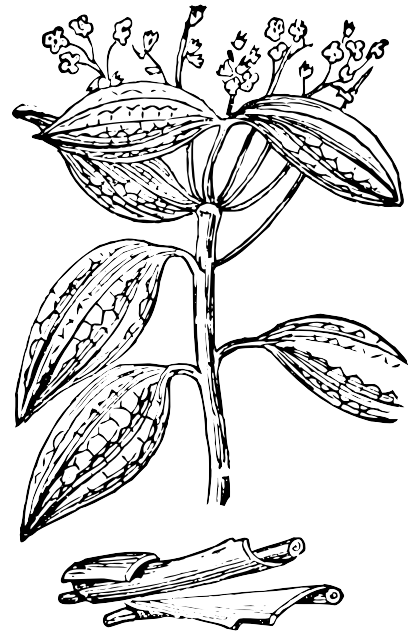
গাছ কাটার সময় লক্ষ্য রাখা দরকার, যেন প্রত্যেক গাছের গোড়ায় পাতা সমেত ১টি পার্শ্বশাখা মাটির উপর থাকে। তা না হলে গাছ মরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া প্রধান কাণ্ড সাবধানে কাটতে হয়। কখনই যেন গাছের গোড়া অযথা আঘাতে চিরে বা ফেটে না যায়। কাটা অংশে অবশ্যই বর্দো মলম (১০০গ্রাম কপার সালফেট: ১০০ গ্রাম চুন: ১ লিটার জল) লাগিয়ে দিতে হয়। গাছের প্রধান কাণ্ড কেটে মাটি চাপা দেওয়ার ফলে গোড়া থেকে অনেক শাখা-কাণ্ড বেরিয়ে আসে। এর মধ্যে থেকে সোজা, সবল, পুষ্ট ৪-৬টি শাখা-কাণ্ডকে আরও ২ বছর বাড়তে দেওয়া হয়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

দারচিনি গাছের গোড়া থেকে নির্গত শাখা-কাণ্ডগুলি যখন ১-১.২৫ মিটার লম্বা ও ১.৫ সেমি মোটা হয় তখন ফসল অর্থাৎ দারচিনির ছাল সংগ্রহ করতে হয়। এই সময় গাছের নতুন কচি লাল রঙের পাতা সবুজাভ হয়ে যায়। এই অবস্থায় কাণ্ডের বাকলের নিচে রস প্রচুর পরিমাণে থাকায় কাণ্ড থেকে ছাল ছাড়ানো সহজ হয়। শাখা-কাণ্ড কাটার আগে ২-৪ টি গাছ পরীক্ষামূলকভাবে কেটে দেখে নেওয়া দরকার, যে ছাল সহজে ছাড়ানো যাচ্ছে কিনা।

প্রথম বছর সংগৃহীত ছালের গুণগত মান বেশি ভাল হয় না। তবে পরবর্তী বছরগুলিতে ভাল মানের দারচিনি পাওয়া যায়। শাখা-কাণ্ড কাটার পর ছাল ছাড়ানোর জন্য তা আঁটি বেঁধে ঘরে নিয়ে আসা হয়। সাধারণত গাছের মধ্যবর্তী শাখা-কাণ্ড থেকে উন্নত মানের দারচিনি পাওয়া যায়। বাছাই করা শাখা-কাণ্ড কেটে নেওয়ার পর গাছের গোড়া থেকে পরিত্যক্ত শাখাপ্রশাখা কেটে পরিষ্কার করে প্রতিটি গাছের গোড়ায় চারপাশ থেকে গোলাকারে মাটি তুলে দিতে হবে। ঠিক মতো পরিচর্যা করা হলে প্রতি বছর নতুন শাখা-কাণ্ড বের হবে এবং ৮ বছরের মাথায় সর্বোচ্চ সংখ্যা পাওয়া যাবে।

দারচিনির ছাল সংগ্রহ করা বেশ কঠিন। এই কাজের জন্য দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। ছাল সংগ্রহের জন্য বিশেষ এক ধরনের



ছুরি ব্যবহার করা হয়। এই ছুরির মাথার দিকটা গোলাকার ও সামনের ধারালো অংশে একটি ছোট খাঁজ থাকায় সহজে ছালগুলিকে কাণ্ড থেকে আলাদা করা যায়। গাছ থেকে সংগ্রহ করা শাখা-কাণ্ডগুলির পাশের ও আগার পাতা, কুঁড়ি সব ছাড়িয়ে ছালের বাইরের খসখসে ত্বক প্রথমে হালকাভাবে চেঁছে পরিষ্কার করে মসৃণ করা হয়। এরপর একটি নিরেট পেতলের কাঠি দিয়ে ঘষে আরও মসৃণ করা হয় যাতে সহজে ছাল ছাড়ানো যায়। তারপর ছাল ছাড়ানোর ওই বিশেষ ছুরি দিয়ে শাখা-কাণ্ডের ছাল ও কান্ডের কাঠের মাঝে ছুরিটিকে ঢুকিয়ে উপর থেকে নীচের দিকে লম্বালম্বিভাবে আস্তে আস্তে সাবধানে টানলে সম্পূর্ণ ছাল কাণ্ড থেকে আলাদা হয়ে যায়। ছালগুলি এক রাত ঘরে শুকিয়ে পরপর চারদিন রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। রোদে শুকানোর সময় দারচিনির ছাল শুকিয়ে ছোট হয়ে হালকা পালকের মতো হয়ে যায়। ছোট ছোট শুকনো দারচিনিকে অপেক্ষাকৃত বড় ছালের মধ্যে ঢুকিয়ে পরপর সাজিয়ে রেখে সংরক্ষণ করা হয়। প্রতি হেক্টর জমিতে ভারতে দারচিনির গড় ফলন ৪৬০ কেজি।

দারচিনি গাছের ছাল বা বাকল মশলা হিসেবে খুবই জনপ্রিয়। বিশেষ গন্ধ ও ঝাঁঝের জন্য বিভিন্ন ধরনের রান্না, মদ তৈরি, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি তৈরির কারখানায়, সেই সঙ্গে টুথপেস্ট, সাবান ইত্যাদি তৈরি করতেও দারচিনি ব্যবহৃত হয়। স্পেনে চকোলেট তৈরি করার ক্ষেত্রেও দারচিনির গুঁড়ো ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন প্রসাধন সামগ্রী ও ধূপ তৈরি করার ক্ষেত্রেও দারচিনি ব্যবহৃত হয়। দারচিনির ছাল থেকে যে তেল তৈরি হয় তার মধ্যে বিভিন্ন রোগ-জীবাণু নষ্ট করার ক্ষমতা রয়েছে। তাই বিভিন্ন রোগ-জীবাণু দমনে দারচিনি সহায়ক। পেটের গণ্ডগোলে, গ্যাসট্রিক ইত্যাদিতে দারচিনির ছালের তেল খেলে উপকার পাওয়া যায়।

বিভিন্ন দেশের বাজারে বিভিন্ন মানের দারচিনি বিক্রি হয়। আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ প্রতিষ্ঠান এবং ভারতীয় মান নির্ধারণ প্রতিষ্ঠান দারচিনির ছালের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, পুরু ও রাসায়নিক গুণমান ইত্যাদির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন মান (গ্রেডের) চিহ্নিত করেছে। যেগুলি হল, কুইলস (সব থেকে লম্বা ভাঁজ করে ছাড়ানো দারচিনির ছাল বাজারে কুইলস নামে পরিচিত। এটিকে সবচেয়ে উন্নত মানের দারচিনি হিসাবে গণ্য করা হয়। এর ছাল ১ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়), কুইলিংস (গ্রেড করার সময় বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সময় কুইলস গ্রেডের দারচিনি অনেক সময় ভেঙে টুকরো হয়ে যায়। এই টুকরোগুলিকে এবং কুইলস গ্রেড বাছার সময় যে টুকরোগুলি থেকে যায় তাকে কুইলিংস গ্রেডে ফেলা হয়। এই গ্রেডের দারচিনির রাসায়নিক গুণমান কুইলসের মতো। কিন্তু দৈর্ঘ্যে ছোট বলে একে দ্বিতীয় শ্রেণীর দারচিনি হিসেবে গণ্য করা হয়।),

ফেদারইংস (দারচিনির ছালের ভেতরের দিকের যে হালকা খণ্ডগুলিকে গুচ্ছকারে রাখা সম্ভব হয় না বা কাঁচা শাখা-কাণ্ড থেকে সংগ্রহ করা হয় সেগুলিকে ফেদারইংস গ্রেডের দারচিনি হিসাবে বাজারজাত করা হয়। এগুলিকে কুইলস বা কুইলিংসের মতো স্বাভাবিক সোজা লম্বা করা সম্ভব হয় না। যদিও এর রাসায়নিক গুণগত মান কুইলস বা কুইলিংসের মতোই। বিকৃত আকারের জন্য এদেরকে তৃতীয় শ্রেণীর দারচিনি বলে গণ্য করা হয়।) এবং চিপস (এই শ্রেণীর দারচিনি সাধারণত মোটা কাণ্ড বা ডালপালা অথবা পুরনো গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। আবার যে সমস্ত শাখা-কাণ্ডের ছাল ছাড়ানো সম্ভব হয় না সেগুলিকে ফালি করে কেটে বা পিটিয়ে আলাদা করা হয়। এগুলিকেই চিপস বলা হয়। এই ধরনের দারচিনি খুবই নিকৃষ্ট মানের এবং এগুলির ভাল বাজারদর পাওয়া যায় না। তবে এগুলিকে গুঁড়ো করে মশলা হিসেবে বিক্রি করা হয়।

জাত পরিচিতি –

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্পাইসেস রিসার্চ (কালিকট) দুটি উন্নত জাতের দারচিনি তৈরি করেছেন। এই জাতগুলি হল, আই. আই. এস. আর. নভোশ্রী এবং আই. আই. এস. আর. নিত্যশ্রী। এছাড়া কালিকটের মশলা গবেষণা কেন্দ্রে দারচিনির ২৪২টি বিভিন্ন ধরনের জাত রাখা আছে।

তথ্যসূত্র - মশলা উৎপাদন প্রযুক্তি ও ঔষধি গুণ - ডঃ বিভূতি ভূষণ সরকার ও ডঃ শ্যামলী চক্রবর্তী (সিনিয়র এগ্রোনমিস্ট, স্টেট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ স্টেশন, অরুন্ধুতী নগর, ত্রিপুরা)



ছোট এলাচ ও বড় এলাচ

পরিচয় –

এলাচ গাছের শুকনো ফল বিশেষ গন্ধ ও স্বাদের জন্য মশলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এলাচের আকার ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

এলাচ গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Amomum aromaticum বা Aframomum species, Aframomum প্রজাতির অন্তর্গত এলাচ বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন মাদাগাস্কার এলাচ, কামেরুন এলাচ, কোরারিমা এলাচ, গিনি এলাচ ইত্যাদি। Amomum প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত Amomum aromaticum Bengal cardamom হিসেবে জনপ্রিয়। অন্য একটি প্রজাতি Amomum subulatum ভারতীয় বড় এলাচ বা নেপাল এলাচ নামে পরিচিত। আর একটি প্রজাতি Amomum cardamomum গোল এলাচ হিসেবে পরিচিত।

Amomum aromaticum বা বড় এলাচকে হিন্দিতে মোরাঙ্গ বা ইলাইচি, মারাঠীতে ভেলডোডা বলা হয়।

এই বড় এলাচ গাছ বীরুৎ শ্রেণীর উদ্ভিদ। উচ্চতায় ০.৬-০.৯ মিটার লম্বা হয়। এই গাছের আদি বাসস্থান পূর্ববঙ্গ, আসাম ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। বাংলা ও আসামের আর্দ্র অঞ্চলে হিমালয়ের পাদদেশে প্রচুর পরিমাণে এই গাছ পাওয়া যায়। ফল ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। ফলের মধ্যে প্রকোষ্ঠ থাকে এবং প্রকোষ্ঠের ভেতর অসংখ্য বীজ থাকে।

Amomum subulatum জাতের এলাচকে হিন্দি, পাঞ্জাবি ও উর্দু ভাষায় বড় ইলাইচি, তামিলে পেরিয়া ইয়ালাম, তেলেগুতে পেড্ডায়েলকি, মালয়লমে পিরেলাম এবং সংস্কৃত ভাষায় বৃহদেলা বলা হয়। এই এলাচ পূর্ব হিমালয়ের নেপাল, বাংলা, সিকিম ও আসামের পাহাড়ী ঝর্ণার ধারে ভেজা জায়গায় জন্মায় এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলে এই এলাচ একটি গুরুত্বপূর্ণ মশলা। এই এলাচের ফল গাঢ় বা কালচে বাদামী রঙের আয়তাকার, ৩টি নিরেট প্রকোষ্ঠ যুক্ত হয়। প্রতিটি প্রকোষ্ঠে অসংখ্য বীজ থাকে। বীজ আঠাঁলো ও মিষ্টি শাঁসযুক্ত হয়।

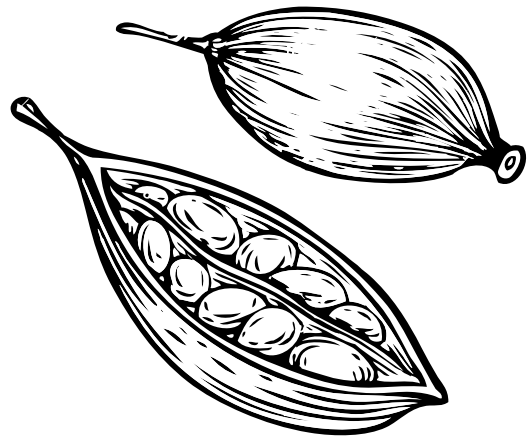
ছোট এলাচের বিজ্ঞানসম্মত Elettaria cardamomum, এটি Zingiberaceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। হিন্দিতে বলা হয় ছোটা ইলাইচি, গুজরাঠীতে ইলাইচি, মারাঠীতে ভেলচি, ওড়িয়ায় অ্যালাইচি, তামিলে ইলাক্কাই, তেলেগুতে ইলাক্কাআই, কন্নড়ে এলাক্কি, মালয়লমে ইলাথারি, সংস্কৃতে ইলা এবং বাংলা ভাষায় একে ছোট এলাচ বলা হয়।

ছোট এলাচ উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে ভারত, শ্রীলঙ্কা, গুয়েতেমালা ও থাইল্যান্ড, এই চারটি দেশ হল উল্লেখযোগ্য। ভারতের প্রধান এলাচ উৎপাদনকারী রাজ্যগুলি হল, কেরালা (চাষ হয় ৫৮.৮২% জমিতে, উৎপাদন হয় ৬৯.৯৮%), কর্ণাটক (চাষ ৩৩.৭৫% জমিতে, উৎপাদন ২২.৯৭%) এবং তামিলনাড়ু (চাষ হয় ৭.৪৩% জমিতে, উৎপাদন ৭.১১%)।

এই এলাচ গাছ বহুবর্ষজীবী বীরুৎ শ্রেণীর উদ্ভিদ। উচ্চতায় ২-৫ মিটার লম্বা। আসল কাণ্ড মাটির নিচের রাইজোম। এই মৃদ্গত কাণ্ড বহু শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট এবং এই গ্রন্থিকাণ্ড থেকে বহু পাতাযুক্ত খাড়া বায়বীয় কাণ্ড বের হয়। পাতা ঘন সবুজ, ভল্লাকার, দীর্ঘাগ্র। পত্রমূল কাণ্ডবেষ্টিত ও পত্রাবরণ যুক্ত। পত্রবিন্যাস একান্তর। দ্বি-সারি বিন্যাস। ফুল স্ববন্ধ্যা (self sterile)। লম্বা পুষ্পমঞ্জরী সোজা মূল ভাণ্ডার থেকে বের হয় এবং এরমধ্যে ফুলগুলি সাজানো থাকে। ফুল সাধারণত এপ্রিল মাসে ফোটে। পুষ্পমঞ্জরী জানুয়ারি মাসেই দেখা যায়। জুলাই-অগাস্ট মাস অবধি ফুল ফোটে। অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাস থেকে ফল পাকতে শুরু করে এবং ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সময় নেয়। ফল ঘিয়ে সাদা রঙের আয়তকার, ডিম্বাকার, নিরেট, ক্যাপসুলের ন্যায়। ফলত্বক আঁশযুক্ত কাগজের মতো। বীজ এক একটি প্রকোষ্ঠে একসঙ্গে লেগে থাকে। প্রতিটি বীজ হালকা লালচে বাদামী রঙের। বীজত্বক পাতলা ঝিল্লির মতো এরিল দিয়ে ঢাকা থাকে।

এলাচ প্রধানত গ্রীষ্ম মণ্ডলের ফসল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০০-১৫০০ মিটার উচ্চতায়, যেখানকার আবহাওয়া উষ্ণ-আর্দ্র, বৃষ্টিপাত সমানভাবে হয়, তেমন অঞ্চলের চিরহরিৎ অরণ্যে ভাল চাষ হয়। এলাচ গাছ অতিরিক্ত বাতাস বা খরায় খুবই সংবেদনশীল, অতিরিক্ত জল বা আর্দ্রতাও সমান ক্ষতিকারক। এলাচের চাষ ভাল হয় পাহাড়ের ঢালু খাঁজে, যেখানে জল নিকাশের ব্যবস্থা আছে। উর্বর হিউমাস সমৃদ্ধ দোঁয়াশ ও লাল কাঁকুড়ে মাটিতে অল্প ছায়াযুক্ত জায়গায় চাষ ভাল হয়। এলাচ চাষ কী পদ্ধতিতে হবে তা নির্ভর করে জায়গা ও অঞ্চলের উপর।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –



বীজ বা গ্রন্থিকাণ্ডের অংশ থেকে এলাচের বংশবিস্তার হয়। অঙ্গজ জননের মাধ্যমে এলাচ চাষ করলে গ্রন্থিকাণ্ড (rhizomes) নির্বাচন করে এমনভাবে ছোট ছোট টুকরো করা হয় যাতে প্রতিটি খণ্ডে একটি পুরনো এবং একটি নতুন পল্লব থাকে। এই পদ্ধতি খুবই সহজ। এরপর মূল জমিতে চাষ দিয়ে ৪-৫ মিটার দূরে দূরে গর্ত করে প্রতিটি গর্তে একটি করে খণ্ড লাগিয়ে দিতে হয়। গর্তের মাটির মধ্যে পরিমাণমত গোবর ও আবর্জনা সার দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে।

এই পদ্ধতিতে অনেকটা জায়গা নিয়ে বাগান করতে গেলে অসুবিধা হয়, কারণ পরিমাণমত গ্রন্থিকাণ্ড সংগ্রহ করা কঠিন। বড় জায়গা নিয়ে এলাচের বাগান করলে বীজ থেকে চারা করে চারা লাগিয়ে চাষ করা উচিত। এক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের বীজতলা তৈরি করতে হবে। চারা তৈরি হলে আবার বীজতলায় লাগিয়ে পরে মূল জমিতে লাগাতে হবে।

উর্বর মাটিযুক্ত জমি, যেখানে প্রয়োজনে ছায়ার ব্যবস্থা করা যাবে এবং জল সেচের ব্যবস্থা আছে এমন জমিতে বীজতলা তৈরি করতে হবে। ০.৯-১.২ মিটার চওড়া ও সুবিধামত দৈর্ঘ্যের এবং মাটি থেকে ১০-১৫ সেমি উঁচু বীজতলা তৈরি করতে হবে। এরপর বীজতলায় বীজ ছড়িয়ে হালকাভাবে মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে।

বোনার সময় নির্ভর করে জায়গার উপর। অগাস্ট-অক্টোবর মাস মহিশূরে ও ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস মাদ্রাজের জন্য। দেখা গেছে, সেপ্টেম্বরে বীজ বোনা হলে ভাল বৃদ্ধি হয় ও পরের বছর অগাস্ট মাসেই জমিতে লাগানোর উপযুক্ত উচ্চতা, অর্থাৎ ৪৫ সেমি লম্বা হয়ে যায়। অন্য সময় বীজ বোনা হলে রোপণের উপযুক্ত চারা তৈরি করতে দেড় বছর লেগে যায়। ৫ বছরের উপর বয়স হয়েছে, সুস্থ-সবল রোগমুক্ত গাছ যার ফলনও ভাল, তার পাকা ফল সংগ্রহ করে ফলের থেকে বীজ বের করে জলে ভাল করে ধুয়ে সঙ্গে সঙ্গে বীজতলায় ফেলা উচিত। চারা তুলে আবার বীজতলায় ১৫-৩০ সেমি দূরে সারিতে লাগানো হয়। সাধারণত প্রথমবার বীজ বোনার ৪-৬ মাসে আবার বীজতলায় লাগানো হয়। চারার বয়স দুই থেকে আড়াই বছর হলে মূল জমিতে লাগানো হয়। মূল জমিতে জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে চারা লাগানো হয়। বেশিরভাগ অঞ্চলে কফি, রাবার ইত্যাদি বাগানেই এলাচের চারা লাগানো হয়। চারা লাগানোর পর ছায়ার ব্যবস্থা করা খুবই জরুরি।

এলাচ চাষে মাটিতে জৈবসারের চাহিদা অত্যন্ত বেশি। এইজন্য গাছে প্রচুর পরিমাণে জৈবসার দিতে হয়। এছাড়া রাসায়নিক সার হিসাবে হেক্টর প্রতি ৪৫-৬৭ কেজি নাইট্রোজেন, ৩৪-৪৫ কেজি সুপার ফসফেট, ৩৪৫ কেজি পটাশ সারের প্রয়োজন হয়।

পরিচর্যা –

নিয়মিত আগাছা দমন, পুরনো ও মরে যাওয়া কাণ্ড পরিষ্কার করা, গাছের গোড়ার মাটি ঢেকে দেওয়া, আর্দ্রতা রক্ষার জন্য ছায়া নিয়ন্ত্রণ করা এবং মরে যাওয়া গাছ তুলে নতুন গাছ লাগানো ইত্যাদি পরিচর্যার প্রধান কাজ। প্রথম কয়েক বছর ঘনঘন আগাছা দমন করতে হয়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

চারা লাগানোর ৩ বছরের মাথায় গাছে ফল ধরতে শুরু করে। কিন্তু এই সময় ফলের আকার খুবই ছোট হয়। ভাল ফসল পাওয়া যায় ১০-১৫ বছরের মাথায়। ফল ধরলে প্রতি ৩০-৪০ দিন অন্তর অন্তর ফসল সংগ্রহ করা উচিত। ফল পুরোপুরি পেকে গেলে ফল ফেটে যেতে পারে এবং শুকিয়ে গেলে রং ভাল হয় না। এইজন্য সঠিক সময়ে ফল সংগ্রহ করতে হবে। ফল বিভিন্নভাবে শুকনো করা হয়। যেখানে অনেক ফল সংগৃহীত হয়, সেখানে একটি বিশেষ ঘরে ফল শুকনো করা হয়। অল্প ফল সংগ্রহ হলে মেঝে ও মাদুরে বিছিয়ে শুকানো হয়। গরম ঘরে শুকানো হলে সেই ঘরে বাইরে থেকে চুল্লির মাধ্যমে গরম হাওয়া ঢোকানো হয়। সাধারণত ইট বা পাথরের দেওয়াল গেঁথে ঘর তৈরি করা হয়। ঘরের ভেতর লম্বা ট্রে সাজানো থাকে। এই ট্রেতে এলাচ সাজিয়ে খুব সতর্কতার সাহায্যে শোকানো হয়। এলাচের গড় ফলন প্রায় ৪৫০ কেজি হেক্টর প্রতি।

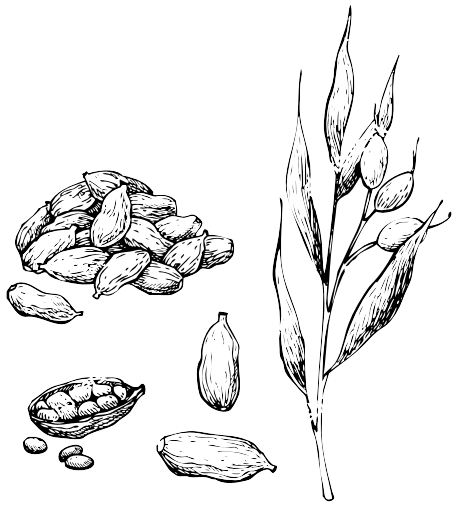
জায়গা ও ফলের বয়সের উপর বীজের উপাদান নির্ভর করে। শতাংশের হিসাবে বীজের উপাদানে ৭-১০% আর্দ্রতা, ৫.৫-১০.৫% উদ্বায়ী তেল, ৬.৭-১২.৮% তন্তু, ৭.০-১৪.০% প্রোটিন, ৩৯.০-৪৯.৯% শর্করা, ০.৩% ক্যালসিয়াম, ০.২১% ফসফরাস, ০.০১% সোডিয়াম, ১.২% পটাসিয়াম, লোহা ছাড়াও ভিটামিন B1, B2, A, C ও নিয়াসিন পাওয়া যায়।

এলাচের প্রধান ব্যবহার মশলা হিসেবে। কারি পাউডার, মাংস, মিষ্টি, পায়েস, পোলাও ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরিতে

এলাচের ব্যবহার জনপ্রিয়। আচার, চাটনি প্রভৃতিতে ও মদ জাতীয় পানীয় তৈরিতে এলাচের তেল দেওয়া হয়। কোষ্ঠবদ্ধতায়, হঠাৎ হাই তুললে, হাসলে বা ভারী জিনিস তুলতে গেলে শিরায় টান পড়লে বা শরীরের কোনও জায়গায় যন্ত্রণা হলে ২টি বড় এলাচ বেটে ২০০ মিলিলিটার গরম জলে গুলে ছেঁকে নিয়ে পরিষ্কার জল ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় খেলে উপকার পাওয়া যায়।

গায়ের দুর্গন্ধ দূর করতে ও চুলকানি সারাতে বড় এলাচ বাটা গায়ে মেখে স্নান করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। বলকারক হিসাবে ও পাকস্থলীর বায়ুনাশক ওষুধরূপে একে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও বড় এলাচ নিয়মিত খেলে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়, দাঁতের মাড়ি শক্ত করে, বমিভাব কাশি ও শিরপীড়া, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি শারীরিক সমস্যা উপশমে কাজ দেয়।

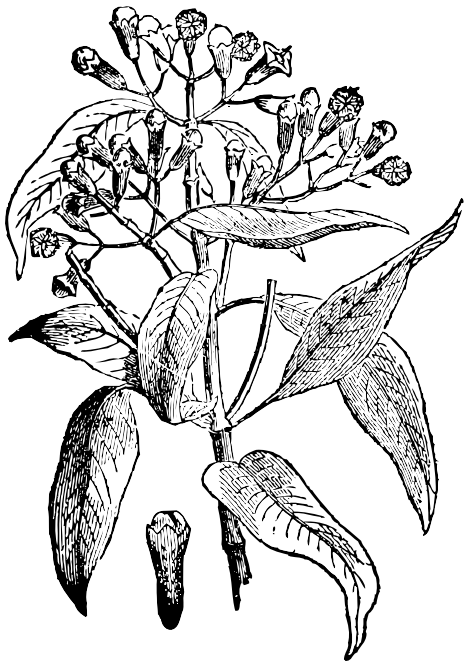
ছোট এলাচ নিয়মিত খেলে মুখ ও ঘামের দুর্গন্ধ দূর হয়। মনে প্রফুল্লতা আসে। হৃৎপিণ্ড সবল হয়। শ্বাসকষ্ট, কাশি, অর্শ, বায়ুজনিত পেটের যন্ত্রণা সারাতে সাহায্য করে।



জাত পরিচিতি –

এলাচের কয়েকটি উন্নত জাত হল, মালাবার, মহীশূন, সিলোন, মুনজেরাবাদ, বীজাপুর, নদন, মুদিগ্রি-১, পি.ডি. -১, সি. সি. এস.-১, আই. সি. আর. আই.-১, আই. সি. আর. আই.-২। ভারতের প্রধান পাঁচটি মশলার মধ্যে ছোট এলাচের স্থান দ্বিতীয়। গোলমরিচকে যেমন মশলার রাজা বলা হয়, তেমনি ছোট এলাচকে বলা হয় মশলার রানি। এই এলাচ পৃথিবীর দামী মশলার মধ্যে অন্যতম।

তথ্যসূত্র - মশলা উৎপাদন প্রযুক্তি ও ঔষধি গুণ - ডঃ বিভূতি ভূষণ সরকার ও ডঃ শ্যামলী চক্রবর্তী (সিনিয়র এগ্রোনমিস্ট, স্টেট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ স্টেশন, অরুন্ধুতি নগর, ত্রিপুরা)



লবঙ্গ

পরিচয় –

লবঙ্গ গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Eugenia caryophyllus বা Syzyglum aromaticum, এটি Myrtaceae গোত্রের ছোট আকারের চিরহরিৎ উদ্ভিদ।

পৃথিবীর প্রাচীন ও জনপ্রিয় মশলা হিসেবে লবঙ্গের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লবঙ্গের আদি বাসস্থান Moluccas বা মালুকু দ্বীপকে (যা Spice island নামেও পরিচিত) মনে করা হয়, যা এখন পূর্ব ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, লবঙ্গ গাছ খ্রীস্টপূর্ব ২০০-২০৬ শতাব্দীতে যখন হূণ সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি ছিল সেই সময় চিন দেশে আসে। পরে ধীরে ধীরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লবঙ্গের চাষ ব্যাপকহারে শুরু হয়। ইউরোপে ১২৬৫ খ্রীস্টাব্দে প্রথম লবঙ্গের চাষ শুরু হয়। ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগীজরা যখন ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চলে Moluccas বা Maluku দ্বীপ আবিষ্কার করে তখন লবঙ্গের আদি জন্মস্থান সম্পর্কে নতুন তথ্য সামনে আসে। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সের গভর্নর পিয়ারী পোডরে ডাচ আইল্যান্ড থেকে মরিশাস দ্বীপে গাছের চারা নিয়ে আসতে সক্ষম হন এবং মরিশাসে লবঙ্গের চাষ শুরু হয়। সেখান থেকে জাঞ্জিবারে এর চাষ ছড়িয়ে পড়ে। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে ভারতবর্ষে প্রথম লবঙ্গের প্রবেশ ঘটে। এখন বিশ্বের প্রধান লবঙ্গ উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে জাঞ্জিবার অন্যতম। সেই কারণে লবঙ্গকে জাঞ্জিবারও বলা হয়। ভারতের নীলগিরি পর্বত, তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারিকা, কেরালার কোট্টায়াম ও কুইলনে প্রায় ২০০ একর জমিতে লবঙ্গের চাষ হয়।

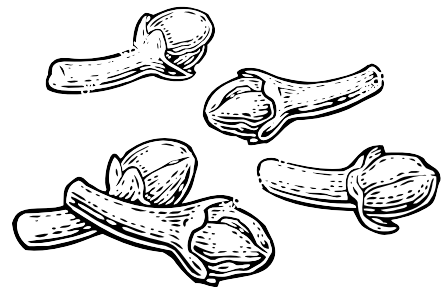
ফরাসি ভাষায় Clow শব্দের অর্থ পেরেক (বা Nail)। শুকনো লবঙ্গের আকৃতি অনেকটা পেরেকের মতো বলে এই Clove শব্দের উৎপত্তি। ইংরেজি ভাষায় লবঙ্গকে Cloves বলে। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় লবঙ্গের বিভিন্ন নাম রয়েছে। হিন্দিতে লবঙ্গ, লঙ, বাংলায় লবঙ্গ, গুজরাঠিতে লভঙ্গ, ওড়িয়ায় লবঙ্গ, পাঞ্জাবিতে লঙ, মারাঠীতে লুভাঙ্গ, তামিলে কিরামভু, তেলেগুতে লভাঙ্গালু, কন্নড়ে লভঙ্গ, মালায়লমে গ্রাম্ভু এবং সংস্কৃতেও এই মশলাটি লভঙ্গ নামে পরিচিত।

লবঙ্গ গাছ আকারে ছোট, চিরহরিৎ। গাছটি লম্বায় ১২-১৫ মিটার হয় এবং ছোট অবস্থায় কোণের আকৃতির হয়ে থাকে। আস্তে আস্তে বড় হলে গাছটি নলাকৃতির হয়ে যায়। গাছ খুব ঘন হয়, এজন্য গাছের নীচের দিকের শাখা মরে যায় বা নীচের দিকে ভাল লবঙ্গ উৎপন্ন হয় না। পাতা সরল, চকচকে ও গন্ধযুক্ত। পুষ্পবিন্যাস মঞ্জরী প্রশাখার আগায় থাকে। ফুল উভলিঙ্গ, রসালো, বৃত্তিযুক্ত (Hypanthum)। যার চারদিকে পাপড়িগুলি সাজানো থাকে। বৃত্তি নলাকৃতির। লবঙ্গ প্রকৃতপক্ষে ফুলের কুঁড়ি এবং অনেকটা নখের মতো দেখতে। একটি কুঁড়ি পুষ্পবৃন্ত, ৪টি ত্রিভুজাকৃতির বৃত্যাংশ, ৪টি গাঢ় লাল রঙের অবিকশিত পাপড়ি, অসংখ্য পুংকেশর ও একটি কেন্দ্রীয় স্তম্ভাকার গর্ভদণ্ড নিয়ে তৈরি। কুঁড়ি থেকে ফুল ফুটে গেলে পরাগসংযোগের ফলে ফল হয়। ফল ড্রুপ প্রকৃতির। লম্বায় ২.৫ সেমি এবং চওড়ায় ১ সেমি হয়। এই ফলকে লবঙ্গের জননী (বা Mother of cloves) বলা হয়। বীজ নরম, আয়তাকার, একদিকে বাঁকানো থাকে।

লবঙ্গ চাষের জন্য আর্দ্র-উষ্ণ জলবায়ু দরকার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮০০-৯০০ মিটার উঁচু জায়গায় ও যে সমস্ত জায়গার গড় বৃষ্টিপাত ১৫০-২৫০ সেমি হয় সেখানে লবঙ্গ চাষ করা যেতে পারে। ২৪-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা লবঙ্গ চাষের উপযুক্ত। জৈব পদার্থে পরিপূর্ণ দোয়াঁশ বা কালচে দোয়াঁশ মাটিতে লবঙ্গের চাষ ভাল হয়। প্রখর সূর্যের আলোয় বা সম্পূর্ণ ছায়ায় লবঙ্গের চাষ ভাল হয় না।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

অঙ্গজ জননের মাধ্যমে লবঙ্গের চারা তৈরি করা খুবই কঠিন। বহুবার চেষ্টা করা হলেও, তা কখনই সফলতা পায়নি। এজন্য লবঙ্গ গাছের বীজ থেকে চারা তৈরি করে লবঙ্গ চাষ করা হয়। নিয়মিত পর্যাপ্ত পরিমাণে ফুলের কুঁড়ি হয় এমন গাছকে মাতৃগাছ (Mother plants) হিসেবে নির্বাচন করে সেই গাছ থেকে পাকা ফল (Mother cloves) সংগ্রহ করা হয়। ফল সংগ্রহ করার পর ফল জলে ভিজিয়ে খোসা ছাড়িয়ে বীজ বের করা হয়। এই বীজ থেকে চারা তৈরি করা হয়। সাধারণত আর্দ্র আবহাওয়ায় বা বর্ষাকালে চারা রোপণ করা উচিত। যাতে চারা রোপণের পর তা অন্তত একমাস বৃষ্টি পায়। মৌসুমি বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে মে-জুন মাস থেকে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত লবঙ্গের চারা লাগানো যেতে পারে।



প্রথমে জমির মাটি গভীরভাবে চাষ দিয়ে ১ মিটার চওড়া, সুবিধামত দৈর্ঘের ও ১৫ সেমি উঁচু বীজতলা তৈরি করতে হয়। ভাল পুষ্ট জলপাই রঙের বীজ নিয়ে সারিতে ২.৫ সেমি গভীরে ও ১৫ সেমি দূরত্বে পরপর বীজগুলি লাগাতে হবে। বীজ বোনার পর প্রথম দিকে বীজতলায় ছায়ার ব্যবস্থা করা দরকার। জমির আর্দ্রতার মাত্রা সঠিক রাখার জন্য নিয়মিত হালকা সেচ দেওয়া প্রয়োজন। বীজ বোনার এক থেকে দেড় বছর পর চারা মূল জমিতে রোপণের উপযুক্ত হয়ে যায়। শিকড়ের মাটি সমেত গাছ তুলে মূল জমিতে রোপণ করা উচিত, যাতে গাছের শিকড় সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকে।

মূল জমিতে সারি থেকে সারি ও গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৬ মিটার রাখতে হয়। চারা রোপণের এক মাস আগে এমনভাবে পরপর ৬০ সেমি গভীর, ৬০ সেমি লম্বা এবং ৬০ সেমি চওড়া গর্ত করতে হবে। গর্তের মধ্যে পোড়ামাটি, আবর্জনা সার ও জমির ওপরের স্তরের মাটি (Top soil) দিয়ে ভর্তি করতে হবে। এরপর এক মাস পরে প্রতিটি গর্তে একটি করে চারা রোপণ করতে হবে। চারা লাগানোর পর প্রয়োজন মতো ছায়ার ব্যবস্থা করা দরকার ও বৃষ্টি না হলে জলসেচের ব্যবস্থাও করতে হবে।

পরিচর্যা –

মূল জমিতে চারা রোপণের ১-১৫ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন অনুপাতে লবঙ্গ গাছে জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। রাসায়নিক সার হিসাবে মূলত নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ দেওয়া হয়ে থাকে। জৈবসার অর্থাৎ গোবর বা আবর্জনা এসব সাধারণত বছরের মে-জুন মাসে প্রয়োগ করা উচিত। রাসায়নিক সার অর্থাৎ নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ সার দু'ভাগে ভাগ করে প্রথম ভাগ মে-জুন মাসে জৈবসারের সঙ্গে মিশিয়ে এবং দ্বিতীয় ভাগ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে গাছের গোড়া থেকে ১-১.৫ মিটার দূরে ১০-১৫ সেমি গভীর বৃত্তাকার নালা করে তার মধ্যে প্রয়োগ করে হালকাভাবে মাটি চাপা দিয়ে দিতে হয়।

লবঙ্গ বাগান প্রতিষ্ঠা করার পর প্রথম অবস্থায় যে অসুবিধা বা সমস্যা বেশি দেখা যায় তা হল, Imperata cylindrica নামের এক ধরনের আগাছা এবং উইপোকা (Termite)। আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। আগাছা পরিষ্কার করার সময় সতর্ক থাকতে হয় যাতে গাছের শিকড় আঘাত না পায়। এই আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য আগাছানাশক ব্যবহার করা ভাল। প্রথমবার আগাছানাশক স্প্রে করলে আবার দেড় থেকে দু'মাস পরে দ্বিতীয় স্প্রে করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

চারা থেকে ভাল গাছ হওয়ার জন্য লবঙ্গ চাষে প্রথম ২-৩ বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় সঠিক যত্ন ও পরিচর্যা না করলে গাছের ক্ষতি হতে পারে। চারা লাগানোর পর প্রথম কয়েক বছর প্রখর সূর্যালোক ও দমকা হাওয়া থেকে গাছকে রক্ষা করার জন্য ছায়াদানকারী ও হাওয়া প্রতিরোধক গাছ লাগিয়ে দেওয়া দরকার। এই সময় লম্বা জাতের কলাগাছ লাগানো সবচেয়ে ভাল। লবঙ্গের চারা লাগানোর আগেই গর্ত থেকে ২ মিটার দূরে দূরে কলা গাছ লাগালে লবঙ্গ গাছ রক্ষাও করা যায়, আবার লবঙ্গ তোলার আগে বাগান থেকে বাড়তি আয়ের সুযোগও তৈরি হয়। তবে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রতিটি কলার ঝাড়ে ২-৩টির বেশি গাছ না থাকে। এর বেশি গাছ থাকলে লবঙ্গ চারার উপকারের চেয়ে অপকার বেশি হতে পারে। কলা ছাড়াও লবঙ্গের বাগানে ছায়া প্রদানকারী গাছ হিসেবে গ্লিরিসিডিয়া গাছ লাগালে ভাল ফল পাওয়া যায়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এই গাছগুলো লবঙ্গ গাছ থেকে অন্তত ২ মিটার দূরত্বে থাকে। লবঙ্গ গাছ বড় হলে চারার গোড়ার চারপাশে অন্তত ১.৫ মিটার ব্যাস যুক্ত জায়গার আগাছা পরিষ্কার রাখা দরকার।

লবঙ্গ গাছের ডালপালা ছাঁটতে হয় না। এমনকি ফসল সংগ্রহ করার সময়েও লক্ষ্য রাখতে হয় ডালপালা যেন না ভাঙে। কারণ ডালপালা ভাঙলে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় সেইখানে গাছের ক্ষতিকারক রোগ বিশেষ করে ডগা শুকনো রোগের জীবাণু এসে গাছের ভেতর ঢুকে যেতে পারে। চারার বয়স ৪ বছরের বেশি হলে বছরে ২বার হালকাভাবে মাটি কুপিয়ে গর্তের মাটি ঝুরঝুরে করা দরকার। গাছের শুকনো ঝরে যাওয়া পাতা গাছের গোড়ায় পড়ে মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। তবে দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হলে বা শুখা মরশুমে প্রয়োজন অনুসারে গাছের গোড়ায় জলসেচ দেওয়া দরকার।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

সাধারণত গাছ লাগানোর ৭-৮ বছরের মাথায় গাছে ফুলের কুঁড়ি আসতে পারে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ৪-৫ বছরের মধ্যেই গাছে কুঁড়ি আসে। তবে গাছের বয়স ২০ বছর না হলে স্থিতিশীল ফলন পাওয়া যায় না। গাছ সুস্থ সবল হলে এবং সঠিক যত্ন পেলে ৫০ বছর ধরে ফলন পাওয়া যায়। অর্থাৎ গাছ লাগানোর পর প্রায় ৭০-৮০ বছর ফসল তোলা যায়। সাধারণত দেখা যায় যে, প্রতি বছরই ফলন আশানুরূপ হয় না। দেখা যায়, প্রতি ৪-৫ বছর পরপর ১ বছর ফলন খুব বেশি হয় এবং বাকি বছরগুলিতে ফলন মাঝারি বা কম পাওয়া যায়। এছাড়াও পরপর ২ বছর ফলন কখনই বেশি হয় না। কারণ যে বছর ফলন বেশি হয় সে বছর ফসল সংগ্রহের সময় শাখাপ্রশাখার বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পরবর্তী বছরে ফলন কমে যায়।

লবঙ্গ ফুলের কুঁড়ির থোকা হাত দিয়ে তুলে সংগ্রহ করা হয়। ফুল প্রস্ফুটিত হওয়ার আগে যখন কুঁড়ি লালচে বা গোলাপী রঙের হয় তখনই লবঙ্গ তোলার সঠিক সময়। যদি গাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে কুঁড়ি থাকে, তবে সেই গাছ থেকে একজন দক্ষ শ্রমিক দিনে ৫০ কেজি পর্যন্ত টাটকা কুঁড়ি সংগ্রহ করতে পারে। টাটকা লবঙ্গের কুঁড়ি সংগ্রহ করার পর সিমেন্টের মেঝে বা বাঁশের চাটাইয়ের ওপর রোদে হালকাভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। রোদ পড়ে গেলে এক জায়গায় স্তূপ করে রাখা হয়। এইভাবে ৪-৭ দিন রোদে শুকিয়ে যখন কুঁড়ির রঙ গাঢ় বাদামী হয় তখন বাজারজাত বা গুদামজাত করা যায়।

আকৃতি ও প্রকৃতি যাচাই করে শুকনো লবঙ্গকে বিভিন্ন মানে ভাগ করা হয়। সাধারণত ৮-১০টি লবঙ্গের ওজন ১ গ্রাম। উচ্চমানের লবঙ্গের রঙ হয় গাঢ় বা কালচে বাদামি এবং কুঁড়ির মাথার আকৃতি সমান, শক্ত ও মসৃণ। এই ধরণের লবঙ্গে ১২% বেশি আর্দ্রতা থাকে না। গাছ প্রতি গড়ে ৩-৪ কেজি ফলন হলেও যে বছর ভাল ফলন পাওয়া যায় সে বছর ১৫-২০ কেজি লবঙ্গ পাওয়া যায়। একটা গাছ থেকে সর্বাধিক ১০০ কেজি ফলনেরও রেকর্ড রয়েছে। টাটকা লবঙ্গ কুঁড়ি রোদে শুকিয়ে যাওয়ার পর ওজন প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস পায় অর্থাৎ টাটকা লবঙ্গের তিন ভাগের এক ভাগ ওজনের শুকনো লবঙ্গ পাওয়া যায়।

লবঙ্গের উপাদান জল, হাওয়া, স্থান, গুদামজাত করার পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। তাই উপাদানের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। প্রতি শতাংশে আর্দ্রতা ৫.৪, প্রোটিন ৬.৩, উদ্বায়ী তেল ১৩.২, চর্বি ১৫.৫, তন্তু ১১.১, শর্করা ৫৭.৭, ক্যালসিয়াম ০.৭, ফসফরাস ০.১১, আয়রন ০.০১, সোডিয়াম ০.২৫, পটাসিয়াম ১.২, ভিটামিন B1, B2, নিয়াসিন, ভিটামিন C এবং ভিটামিন A পাওয়া যায়। ক্যালরি মান প্রতি ১০০ গ্রামে ৪৩০ ক্যালরি।

লবঙ্গের প্রধান ব্যবহার মশলা হিসেবে, আস্ত বা গুঁড়ো করে ব্যবহার করা হয়। আচার, নানা ধরনের রান্না, সস্, কেচাপ ইত্যাদিতে স্বাদ ও বিশেষ গন্ধ আনার জন্য লবঙ্গ ব্যবহার করা হয়। জাভাতে বিশেষ ধরনের সিগারেট তৈরি করতে লবঙ্গ দেওয়া হয়। পুডিং, কেক, মিষ্টি, চকোলেট ইত্যাদিতে বিশেষ গন্ধ ও ঝাঁঝের জন্য লবঙ্গ ব্যবহার করা হয়। গাছের ফুলের কুঁড়ি বা লবঙ্গ থেকে যে উদ্বায়ী তেল পাওয়া যায় তা আতর, সাবান, টুথপেস্ট ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। লবঙ্গ গাছের শুকনো অপ্রস্ফুটিত ফুলের কুঁড়ি লবঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করা হয় বিশেষ গন্ধ ও স্বাদের জন্য। চিন দেশে সম্রাটের সঙ্গে কথা বলার সময় মুখ ও নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য লোকেরা লবঙ্গ ব্যবহার করতেন। লবঙ্গের তেলে ৪০-৯২% ইউজিনল থাকে। যা উচ্চমানের ভ্যানিলিন বা ভ্যানিলা তৈরিতে কাজে লাগে। বিভিন্ন ধরনের ওষুধ, বিশেষ করে দাঁতের ব্যাথার ওষুধ তৈরিতে লবঙ্গের তেল কাজে লাগে। লবঙ্গের তেলে অ্যান্টিসেপ্টিক ও অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়ার গুণ থাকায় অনেক ওষুধ তৈরিতে লবঙ্গের তেল ব্যবহার করা হয়। মুখের দুর্গন্ধ নাশ করতে লবঙ্গ ব্যবহার করা হয় এবং চুইংগাম তৈরিতেও লবঙ্গের তেল ব্যবহৃত হয়।

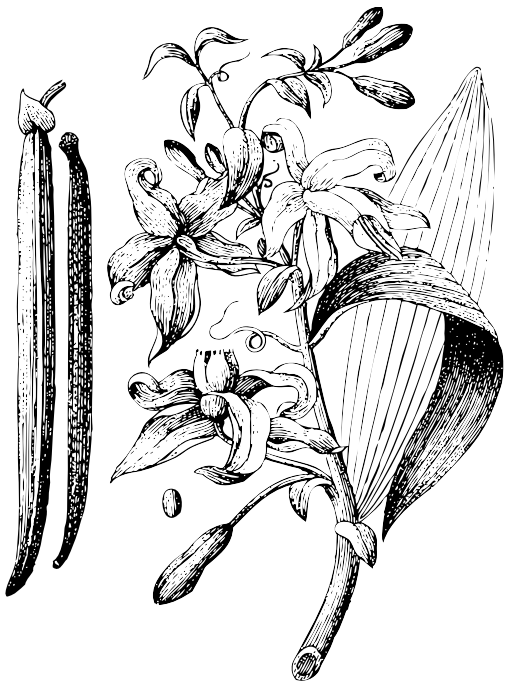
প্রাচীনকাল থেকেই ঔষধি গুণের জন্য বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে লবঙ্গ ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। লবঙ্গের তেল বাতের ব্যাথা, মাথা ব্যাথা, দাঁতের ব্যাথা ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাথায় বাহ্যিকভাবে প্রয়োগ করলে ব্যাথার উপশম হয়। ২-৩টি লবঙ্গ জলে ভিজিয়ে রেখে সেই জল দিয়ে চোখে ঝাপটা দিলে চোখ ওঠার কষ্টের ক্ষেত্রে উপশম হয়। লবঙ্গ গুঁড়ো করে নিয়মিত খেলে অম্ল, অজীর্ণ ও অরুচি, পেট ব্যাথা, বমিভাব, পেট ফাঁপা, কাশি, অসুস্থতার জন্য অতিরিক্ত পিপাসা ইত্যাদি নিরাময়ে সাহায্য করে। লবঙ্গের মধ্যে ইউজিনল থাকায় ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে। তাই খাদ্য সংরক্ষণেও লবঙ্গের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।

জাত পরিচিতি –

বেশিরভাগ লবঙ্গের গাছ প্রায় একই রকমের, তাই লবঙ্গের তেমন আলাদা জাত নেই। তবে উৎপাদন স্থান ও গুণগত মান হিসেবে লবঙ্গের নানা ভাগে ভাগ কার হয়। এই হিসেবে পেনাঙ (Penang) লবঙ্গ জাঞ্জিবার লবঙ্গ থেকে অনেক উৎকৃষ্ট। আবার জাঞ্জিবার লবঙ্গ, মাদাগাসকার লবঙ্গ থেকে উন্নতমানের। পেনাঙ ও জাঞ্জিবার লবঙ্গ বড়, চকচকে, ঝাঁঝ বেশি। সে তুলনায় মাদাগাসকার লবঙ্গ আকারে ছোট দেখতে এবং নিম্নমানের। শুকনো লবঙ্গের গুণগত মান নির্ভর করে আকৃতি, বাহ্যিক সৌন্দর্য, গন্ধ ও উদ্বায়ী তেলের পরিমাণের ওপর। এই বৈশিষ্ট্যগুলি আবার নির্ভর করে ফসল সংগ্রহ করা, শুকানো করা, বাছাই করা, গুদামজাত করার ব্যবস্থা ইত্যাদির উপর। লবঙ্গ দীর্ঘদিন গুদামজাত করে রাখা হলে উদ্বায়ী তেল বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ার ফলে উবে যায়। ফলে গুণগত মান কমতে থাকে।

খোকার লবঙ্গ (Khoker cloves) - রোদে কুঁড়ি শুকিয়ে নেওয়ার সময় যদি ঠিকমতো না শুকনো হয়ে কুঁড়ি গাজিয়ে (fermantation) গেলে তাকে খোকার লবঙ্গ বলে। হালকা বাদামী রঙ দেখে এই লবঙ্গ চেনা যায়। জননী লবঙ্গ (Mother cloves) -এই লবঙ্গ আসলে গাছের ফল। কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হয়ে ফুল ফুটলে পরাগসংযোগের ফলে গর্ভাধান হয় এবং ফল সৃষ্টি হয়। ফলের রঙ গাঢ় বাদামী। মাথাহীন লবঙ্গ (Headless) - যে লবঙ্গের মাথায় বলের মতো আকৃতির অপ্রকাশিত ফুলের কুঁড়ি থাকে না তাদের এই শ্রেণীতে ফেলা হয়।

তথ্যসূত্র – মশলা উৎপাদন প্রযুক্তি ও ঔষধি গুণ - ডঃ বিভূতি ভূষণ সরকার ও ডঃ শ্যামলী চক্রবর্তী (সিনিয়র এগ্রোনমিস্ট, স্টেট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ স্টেশন, অরুন্ধুতী নগর, ত্রিপুরা)



ভ্যানিলা

পরিচয় –

ভ্যানিলার বিজ্ঞানসম্মত নাম Vanilla fragrans বা Vanilla planifolia, এটি Orchidaceae গোত্রের একটি একটি বহুবর্ষজীবী গুল্মজাতীয় লতানো শ্রেণীর উদ্ভিদ।

মধ্য আমেরিকার জঙ্গলে বুনো লতানে গাছ হিসাবে ভ্যানিলা প্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং আদি বাসস্থান হিসেবে দক্ষিণ মেক্সিকো থেকে ব্রাজিল পর্যন্ত আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলবর্তী স্থানকে মনে করা হয়। আমেরিকা আবিষ্কারের পরে আস্তে আস্তে বিভিন্ন দেশে এর চাষ ছড়িয়ে পড়ে। ভ্যানিলা উৎপাদনকারী দেশগুলি হল, মাদাগাসকার, মেক্সিকো, তাহিতি, কোমোরো ও ইন্দোনেশিয়া। ১৮৩৫ সালে ভারতে প্রথম ভ্যানিলার প্রবেশ ঘটে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ভারতে তেমনভাবে এর চাষের প্রচলন হয়নি। বর্তমানে ভারতের শুধুমাত্র কেরালার উইনাদ ও তামিলনাড়ুর নীলগিরি পর্বতে ভ্যানিলার চাষ সীমাবদ্ধ। ভারতে বাংলা ও হিন্দিতে এটি ভ্যানিলা নামেই পরিচিত।

ভ্যানিলা গাছ মাংসল গুচ্ছমূলের সাহায্যে প্রায় ১০-১৫ মিটার উঁচু পর্যন্ত উঠতে পারে। মূল লম্বা বায়বীয়, পাতার বিপরীত দিকে বের হয় এবং যে গাছকে আশ্রয় করে ভ্যানিলা গাছ ওঠে সেই গাছকে শক্তভাব আঁকড়ে ধরতে সাহায্য করে। এর কাণ্ড মাংসল শাখাযুক্ত, নলাকৃতি, পাতা চ্যাপ্টা, বড় ও মাংসল, সরু এবং অগ্রভাগ সূচালো হয়। ফুল হালকা সবুজ ও হলুদ বর্ণের হয়। কাণ্ডের কক্ষ থেকে পুষ্পমঞ্জরী বের হয়। ফুল আকারে বড় ও আকর্ষণীয় হয়। ফল সরু শুঁটি জাতীয়। সাধারণত বছরে একবার ফুল ফোটে ও প্রায় স্থায়ী হয়। আবহাওয়া ও প্রকৃতি অনুযায়ী মার্চ-মে মাস পর্যন্ত ফুল ফুটতে দেখা যায়।

ভ্যানিলা আর্দ্র ও উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের অর্কিড গাছ। যেসব অঞ্চলের গড় বৃষ্টিপাত ১৫০-৩০০ সেমি সেখানে ভ্যানিলার চাষ ভাল হয়। ভ্যানিলা চাষের জন্য সাধারণত প্রাকৃতিক বনাঞ্চল বা ফল বাগানের ভেতরে বড় গাছের ডালপালা কেটে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয় যাতে সূর্যের আলো সরাসরি গাছের উপরে না পড়ে, অথচ গাছের ফাঁক দিয়ে আলো এসে আলোছায়া সৃষ্টি করতে পারে। যদি প্রাকৃতিক বনাঞ্চল না পাওয়া যায় তবে কৃত্রিমভাবে ছায়াপ্রদানকারী গাছ লাগিয়ে আলোছায়া পরিবেশ সৃষ্টি করেও ভ্যানিলা চাষ করা সম্ভব। উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়া ও যেখানে ঘনঘন হালকা বৃষ্টি হয় সেই অঞ্চলে ভ্যানিলা গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। অঙ্গজ বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে ফুল আসার জন্য ভ্যানিলা চাষে বছরে ২ মাস শুকনো আবহাওয়ার প্রয়োজন হয়। ঝুরঝুরে বেলে লাল দোঁয়াশ মাটি বা লাল কাঁকুড়ে মাটি ভ্যানিলা চাষের উপযুক্ত। তবে মাটির উপরের স্তরে পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব পদার্থ থাকা দরকার।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

ভ্যানিলা গাছ লাগানোর পর তৃতীয় বছর থেকে গাছে ফুল ফুটতে শুরু করে। সাধারণত মার্চ মাসে কাণ্ডের কক্ষ ও পাতার বোঁটার সংযোগস্থল থেকে থোকায় থোকায় ফুল ফোটে। কখনও দেখা যায় যে, কেবলমাত্র কিছু পাতার অঙ্গজ বৃদ্ধি হয় ও সচরাচর ফুল ফোটে না। সেক্ষেত্রে লতার আগা ও পার্শ্ব মুকুল কেটে দিলে ফুলের কুঁড়ি আসে।

ভ্যানিলা গাছে ফুল ফুটলেও কৃত্রিমভাবে পরাগসংযোগ না করা হলে ফল ধরে না এবং গাছের ফুল ঝরে পড়ে যায়। কৃত্রিমভাবে পরাগসংযোগের সময় সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত। ফুল ফোটার পর এক হাতে সাবধানে ফুল ধরে অন্য হাতে পর্দার মতো পাতলা অংশ সরিয়ে পুংকেশরের পরাগরেণুবাহী অংশটি আলতোভাবে স্ত্রীকেশরের গর্ভকেশরের গর্ভমুণ্ডে লাগিয়ে দিলে পরাগসংযোগ হয়ে যায়। কৃত্রিমভাবে পরাগসংযোগে ৫০-৮৫% ফুলের পরাগসংযোগ সফল হয়।

পরাগসংযোগ সফল হলে ধীরে ধীরে সবুজ রঙের ফল বা শুঁটি তৈরি হয়। এই পদ্ধতিতে ভ্যানিলার পরাগসংযোগ কষ্টকর। আজকাল হরমোন স্প্রে করে পরাগসংযোগকে সহজসাধ্য করা হয়।

ভ্যানিলা লতা থেকে চাষ হয়। শিকড় সমেত ৬০ সেমি লম্বা ভ্যানিলা লতা কাটিং তৈরি করে রোপণের জন্য ব্যবহার করা হয়। কাটিং বা বীচন যত লম্বা হয়, তত তাড়াতাড়ি ফুল আসে। গাছ থেকে গাছ ও সারি থেকে সারির দূরত্ব রাখা হয় ২৭০ সেমি ও ১৮০ সেমি। এই দূরত্ব বজায় রেখে ৪০ সেমি দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও গভীর গর্ত তৈরি করে কাটিং লাগানো হয়। আশ্রয়দাতা গাছে ১৩৫ সেমি উচ্চতায় আড়াআড়িভাবে দুটো গাছের মধ্যে মুলি বাঁশ বেঁধে ভ্যানিলার লতা বাইয়ে দেওয়া হয় যাতে গাছের বৃদ্ধির সুবিধা হয়।



বাণিজ্যিকভাবে কাণ্ডের কাটিং থেকে ভ্যানিলার চাষ করা হয়। বীজ থেকে কেবলমাত্র প্রজননের জন্য চারা করা হয়, যা খুবই দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য পদ্ধতি। দূরত্ব কম রেখে ভ্যানিলা লতা লাগিয়ে দেখা গেছে যে, প্রথম পর্যায়ে ফলন পাওয়া গেলেও পরবর্তী পর্যায়ে পর্যাপ্ত অন্তর্বর্তী পরিচর্যা ও রোগ দমন করতে খুবই অসুবিধা হয়।

নির্বাচিত জমির আগাছা পরিষ্কার করে ভ্যানিলা গাছের লতা আশ্রয় করে বাড়তে পারে এমন গাছ প্রথমে জমিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে লাগাতে হবে। ভ্যানিলার আশ্রয়দাতা গাছ হিসাবে যে গাছগুলি বেশি ব্যবহৃত হয় তা হল, Plumeria alba, Erythrina lithosperma এবং Jatropha curcas। এই গাছগুলির বৃদ্ধি এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাতে ১৩৫-১৫০ সেমির বেশি উঁচু না হয়। এছাড়া কফি, কাঁঠাল, কাজুবাদাম, মালবেরি ইত্যাদি গাছকে আশ্রয় করেও ভ্যানিলা বাড়তে পারে।

পরিচর্যা –

ভ্যানিলা লতার শিকড় মাটির বেশি গভীরে প্রবেশ করে না এবং মাটির ভেতর শিকড় কোনও আঘাতও সহ্য করতে পারে না। তাই আগাছা নিয়ন্ত্রণ করার সময় কোদাল দিয়ে শুধুমাত্র মাটির উপরের স্তর চেঁছে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। ভ্যানিলার কাটিং লাগানোর পর মাটির গভীরে কোদাল দিয়ে কোপানো যাবে না। বছরে দু'বার গর্তের মাটি হালকাভাবে তুলে দিতে হবে। প্রাক মৌসুমী বৃষ্টির পর ভ্যানিলার বীচন বা কাটিং রোপণ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

শুঁটি তোলার উপযুক্ত হতে ৯-১১ মাস সময় লাগে। শুঁটির মাথা হলুদ হতে শুরু করলেই শুঁটি সংগ্রহ করতে হবে। শুঁটি বেশি পেকে গেলে ফেটে যায় এবং ফলন কম হয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভ্যানিলা তৈরি করা হয়। ফসল তোলার ১ সপ্তাহের মধ্যেই শুঁটি বা ফলকে সকালবেলা কাঠের তক্তা বা সিমেন্টের মেঝের উপর ছড়িয়ে রাখা হয়। রোদ পড়ে গেলে শুঁটিগুলিকে কম্বলে ছড়িয়ে রাখা হয় যাতে গরম থাকে। রাতে শুঁটিগুলিকে কম্বল জড়ানো অবস্থায় বায়ু নিরোধক বাক্সে ঢুকিয়ে রাখা হয়। এই পদ্ধতিতে ১০-১৫ দিন ক্রমাগত শুকনো করার পর শুঁটিগুলি শক্ত ও গাঢ় বাদামী রঙের হয়ে যায়। এই সময় আস্তে আস্তে ভ্যানিলার দানা স্ফটিকের মতো গুটির উপর জমাতে থাকে। ভ্যানিলিন তৈরি শেষ হলে রোদে শুকনো হওয়া শুঁটির রঙ কালচে হয়ে যায়। এই অবস্থায় শুঁটি সহজে ফাটে না। এরপর শুঁটির দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ছোট, বড় ও মাঝারি আকারে ভাগ করে আলাদা আলাদা আঁটি করে রাখা হয়। এই পদ্ধতিতে ৩.৫-৪ কেজি সবুজ ভ্যানিলা শুঁটি থেকে প্রায় ১-২ কেজি ভ্যানিলিন সমৃদ্ধ শুঁটি পাওয়া যায়। ভ্যানিলা তৈরির জন্য শুঁটির গুণগত মান নির্ভর করে শুঁটির দৈর্ঘ্য, গন্ধ, রঙ, নমনীয়তা, চাকচিক্য ও রোগপোকার আক্রমণ ইত্যাদির উপর। সাধারণত শুঁটি ১৭-২৫ সেমি লম্বা, তীব্র গন্ধযুক্ত, গাঢ় বাদামী রঙের মাংসল, মসৃণ, তেল-চকচকে ও রোগপোকা আক্রমণ মুক্ত হলে সর্ব্বোচ্চ গুণগত মানের বলে গণ্য করা হয়। এছাড়াও এই গুণগত মান ভ্যানিলিনের পরিমাণ, জলবায়ু, ফসল তোলার সময় ও ভ্যানিলিন তৈরির প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। এর ফলন নির্দিষ্ট নয়। খুব ভাল ভ্যানিলা বাগান থেকে ৭ বছর পর্যন্ত প্রতি বছর হেক্টর প্রতি ৫০০-৮০০ কেজি শোধন করা শুঁটি পাওয়া যেতে পারে।

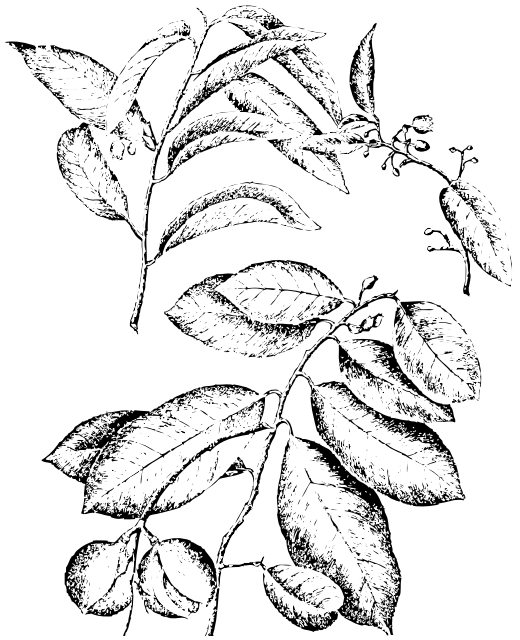
ভ্যানিলার শুঁটিতে শতকরা আর্দ্রতা ২০-৩৯%, প্রোটিন ২.৫-৫%, শর্করা ৭-৯%, তন্তু ১৫.২৭-১৯.৬%, ভ্যানিলিন ১.৪৮-২.৯০%, রেজিন ১.৫-২.৬%, ক্যালসিয়াম ১৯.৭%, পটাসিয়াম ১৬.২%, সোডিয়াম ৬.৭%, ফসফেট ৯.৫% ও ০.৩% আয়রন থাকে।

বিভিন্ন খাবারে গন্ধ তৈরির জন্য প্রধানত ভ্যানিলা ব্যবহৃত হয়। পাউডার ও তরল দ্রবণ, দু'ভাবেই ভ্যানিলা ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয় মিষ্টি জাতীয় খাবারে সুন্দর গন্ধ আনার জন্য ভ্যানিলা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কেক, বিস্কুট, চকোলেট, মিষ্টি, আইসক্রীম, ইত্যাদি তৈরির কারখানায় ব্যাপকভাবে ভ্যানিলা ব্যবহৃত হয়। মদ তৈরিতে বিশেষ করে সস্তার ব্রযান্ডি তৈরিতে, হুইস্কি তৈরিতেও ভ্যানিলা দেওয়া হয়। প্রসাধন তৈরিতে বিশেষ করে ডিওডোরেন্ট তৈরিতেও ভ্যানিলা দেওয়া হয়। ভিটামিন জাতীয় ওষুধ তৈরি করতে ভ্যানিলা ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ওষুধের কারখানায় বিভিন্ন ওষুধে গন্ধ আনতে ভ্যানিলা ব্যবহৃত হয়। ভ্যানিলা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে বলে ভিটামিন B2 (রাইবোফ্ল্যাবিন)-এর দ্রবণ তৈরিতে ভ্যানিলা দেওয়া হয়।

জাত পরিচিতি –

ভ্যানিলার অন্য দুটি জাতেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। জাত দুটি হল, Vanilla pompona (ভ্যানিলা পম্পোনা) ও Vanilla tahitensis (ভ্যানিলা তাহিতেনসিস)।

তথ্যসূত্র - মশলা উৎপাদন প্রযুক্তি ও ঔষধি গুণ - ডঃ বিভূতি ভূষণ সরকার ও ডঃ শ্যামলী চক্রবর্তী (সিনিয়র এগ্রোনমিস্ট, স্টেট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ স্টেশন, অরুন্ধুতী নগর, ত্রিপুরা)



জায়ফল ও জয়িত্রী

পরিচয় –

জায়ফল ও জয়িত্রী একই গাছে একই ফল থেকে তৈরি সম্পূর্ণ আলাদা জাতের দুটি মশলা যা বিশেষ ধরনের গন্ধের জন্য বিভিন্ন ধরনের খাবারে স্বাদ ও গন্ধের জন্য ব্যবহৃত হয়।

জায়ফল ও জয়িত্রী গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Myristica fragrans, এটি Myristicaceae গোত্রের চিরহরিৎ গাছ।

মনে করা হয়, এই গাছের আদি বাসস্থান মলাক্কাস। সেখান থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে উষ্ণ অঞ্চলের দেশসমূহে যেমন মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি দেশে এর চাষ বিস্তারলাভ করে। এখনও পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া জায়ফল ও জয়িত্রী উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে প্রধান। চাহিদা অনুযায়ী এই দেশ থেকে বিভিন্ন দেশে এই মশলা রফতানি হয়ে থাকে। ভারতের তামিলনাড়ু, কেরালা, আসাম ও অন্যান্য কিছু রাজ্যে এর চাষ হয়। তামিলনাড়ু, নীলগিরি পর্বত, কোয়েম্বাটুর, সালেম, কন্যাকুমারী, মাদুরাই, কেরালার উইনাদে ব্যাপকহারে এর চাষ হলেও তাতে ভারতের নিজস্ব চাহিদা পূরণ করা যায় না। প্রতি বছর প্রায় ৭০-৮০ মেট্রিক টন জায়ফল বা জয়িত্রী বাইরের থেকে আমদানি করতে হয়। তাই ভারতে এই মশলা চাষের বিস্তারের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

জায়ফলকে ইংরেজিতে Nutmeg বলে। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এটি বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন সংস্কৃতে জাতিফল, হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠী, পাঞ্জাবী ও উর্দু ভাষায় জায়ফল, কাশ্মীরিকে একে বলে জাফল, তামিলে জাথিকাই, তেলেগুতে জাজিকাই, মালায়লমে জাথিক্কা, কন্নড়ে জায়িকি এবং বাংলায় জায়ফল বলে।

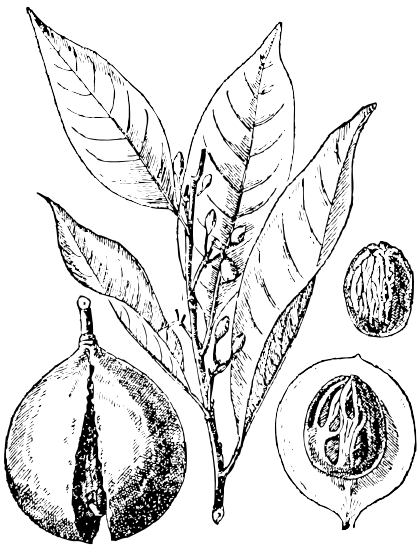
জয়িত্রী ইংরেজিতে Mace নামে পরিচিত। সংস্কৃতেও জয়িত্রীকে জাতিফল বলে। এছাড়া হিন্দি ও গুজরাটিতে জয়িত্রী, মারাঠীতে জায়ভিত্রী, জাপাত্রী, জত্রী, পায়াপত্রী, কাশ্মীরে জাবভাতুর, ওড়িয়াতে জইত্রী, পাঞ্জাবীতে জয়পত্রী, জয়ভত্রী, জায়ফল, তামিলে জোদ্দিপাত্তিরী, তেলেগুতে জাপাত্রী, মালায়লমে জাথিপাথরি এবং বাংলায় জয়িত্রী বলে।

জায়ফল ও জয়িত্রীর গাছটি লম্বায় ৯-১২ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। কখনও কখনও ২০ মিটার পর্যন্তও হতে পারে। স্ত্রী ও পুরুষ গাছ আলাদা। কোনও কোনও সময় একই গাছে স্ত্রী ও পুরুষ ফুল পাওয়া যায়। ফুল না আসা পর্যন্ত গাছ একলিঙ্গ না উভলিঙ্গ তা বোঝার উপায় থাকে না। স্ত্রী ও পুরুষ পুষ্পবিন্যাস প্রায় একইরকম। ফুল হালকা হলুদ রঙের, চকচকে ও মাংসল। স্ত্রী ফুলের থেকে পুরুষ ফুল আকারে ছোট। পুরুষ ফুলে ৮-১০টি পুংকেশর থাকে। গর্ভমুণ্ডটি দ্বিখন্ডিত। ছোট ছোট পতঙ্গের দ্বারা পরাগসংযোগ হয়। ফল নাশপাতির মতো। পাকলে ফল ফেটে যায়। ফলের ভিতরে বীজ থাকে । বীজের বাইরে লালচে হলুদ রঙের জালের মতো পাতলা আকর্ষণীয় আবরণ থাকে। এই আবরণকে শুকিয়ে জয়িত্রী তৈরি করা হয়। আস্ত শুকনো বীজকে জায়ফল বলা হয়। গাছের সমস্ত অংশেই সুগন্ধ রয়েছে।

উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়াযুক্ত অঞ্চল, যেখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৫০-৩০০ মিলিমিটার সেই জায়গা এই চাষের উপযুক্ত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭৫০ মিটার পর্যন্ত উঁচু জায়গায় এই চাষ করা যায়। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী নিচু উপত্যকা, যেখানে জল দাঁড়ায় না বা নদীতীরের সমতল জায়গার ঝুরঝুরে দোঁয়াশ মাটি এই চাষের পক্ষে অনুকূল।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

সাধারণত বীজ থেকে চারা তৈরি করে এই মশলার চাষ করা হয়। সম্পূর্ণ পাকা ফল গাছে ফেটে গেলে ফলের মাংসল অংশ ও বীজের আবরণ পরিষ্কার করে বীজ সংগ্রহ করতে হয়। বীজ সংগ্রহ করেই সঙ্গে সঙ্গে বপন করা উচিত। যদি কোনও কারণে দেরি হয়, তবে অবশ্যই বীজগুলিকে ঝুড়ির মধ্যে ভেজা মাটির স্তর দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। না হলে বীজের অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষমতা চলে যায়। সাধারণত ছায়াযুক্ত ঠাণ্ডা জায়গায় বীজতলা করা ভাল। ১ মিটার চওড়া ১৫ সেমি উঁচু ও সুবিধামত দৈর্ঘ্যের বীজতলা তৈরি করতে হয়। বীজতলার মাটি তৈরির সময় তিনভাগ বাগানের মাটি ও একভাগ বালি মিশিয়ে নিয়ে প্রথমে ১২ সেমি উঁচু প্রথমস্তর তৈরি করতে হয়। পরে উপরের স্তরে ৩ সেমি শুধু বালির স্তর দিয়ে বীজতলা করে ২ সেমি গভীরে ১২ সেমি দূরত্বে পরপর সারিতে বীজ বপন করা হয়। বীজ বোনার ৩০-৪৫ দিনের মাথায় বীজের অঙ্কুরোদ্গম শুরু হয়। অঙ্কুরোদ্গমের পর বীজপত্রের দু'পাশে যখন দুটো লম্বা পাতা বের হয় তখন চারাগুলিকে বীজতলা থেকে সাবধানে তুলে মাটি ভর্তি পলিথিনের ব্যাগে লাগাতে হবে। ৮ মিটার



দূরে দূরে সারিতে ৯০ সেমি লম্বা, চওড়া ও গভীর গর্ত করে তাতে পরিমাণমতো আবর্জনা সার বা গোবর সার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গর্তে চারা লাগাতে হয়।

পরিচর্যা –

গাছের সঠিক বৃদ্ধি ও অধিক ফলনের জন্য নিয়মিত সার প্রয়োগ করা দরকার। গাছ প্রতি সারের মাত্রা প্রতি বছর নির্দিষ্ট অনুপাতে বাড়াতে হয়। সারগুলি হল, গোবর সার বা আবর্জনা সার, ইউরিয়া, সুপার ফসফেট, রক ফসফেট, মিউরিয়েট অফ পটাশ ইত্যাদি। প্রতি বছরের বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ গোবর বা আবর্জনা সারের অর্ধেক পরিমাণ ইউরিয়া, সুপার বা রক ফসফেট ও মিউরিয়েট অফ পটাশের সঙ্গে মে-জুন মাসে গাছের গোড়ায় দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। বাকি অর্ধেক পরিমাণ সার সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে প্রয়োগ করা উচিত।

চারা রোপণের ৫-৭ বছর পর এই গাছে ফুল আসে। সেই সময় পুরুষ গাছ দেখে তুলে ফেলে দিতে হয়। পরিবর্তে গর্তে ৩টি করে চারা লাগানো হয়। ফুল এলে শুধুমাত্র ১টি স্ত্রী গাছ রেখে অন্য গাছগুলি তুলে ফেলতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয়, যেন প্রতি ১০টি স্ত্রী গাছের অনপাতে ১টি করে পুরুষ গাছ থাকে। সার দেওয়ার আগে অর্থাৎ বছরে দু'বার গাছের চারদিকের ঘাস ও আগাছা পরিষ্কার করা উচিত।

যেহেতু এই গাছ ছায়াযুক্ত জায়গায় তাড়াতাড়ি বাড়ে, তাই বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগিয়ে কৃত্রিম ছায়া তৈরি করা দরকার। গাছ যখন ছোট থাকে তখন কলাগাছের ছায়ায় গাছ লাগানো যেতে পারে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

১৫-২০ বছরের মধ্যে গাছে সর্বোচ্চ ফল ধরে এবং প্রায় ৩০-৪০ বছর পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। প্রায় সারা বছর ধরেই গাছ থেকে জায়ফল তোলা যায়। তবে বেশিরভাগ ফল অগ্রহায়ণ-পৌষ থেকে বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাসের মধ্যে হয়, যখন ফল পেকে যায়। ফল সম্পূর্ণভাবে পেকে গেলে বাইরের খোসা ফেটে যায় ও ফল ঝরে যায়। পাকা ফল, গাছ থেকে বা গাছের নিচ থেকে সংগ্রহ করা হয় ও খোসা ছড়িয়ে বীজের আবরণ বা মেস আলাদা করে শুকিয়ে নেওয়া হয়। ১০-১৫ দিন লাগে এই আবরণ বা মেস শুকোতে। তারপর জায়ফল অর্থাৎ ফলের বীজ এক থেকে দেড় মাস ধরে শুকিয়ে রাখতে হয়, যতক্ষন না পর্যন্ত ফলের ভেতরের শাঁস নড়ে ঝুমঝুমির মতো শব্দ হয়।

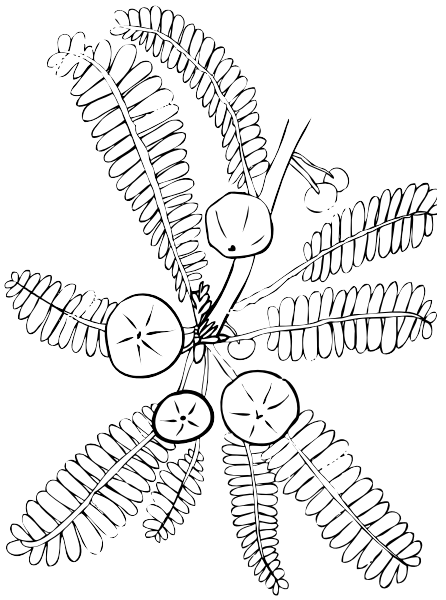
প্রধানত মূল্যবান মশলা হিসাবেই জায়ফল ও জয়িত্রীর ব্যবহার হয়ে থাকে।

জায়ফল বা বীজে শতকরা ১৪.৩% আর্দ্রতা, ৭.৫% প্রোটিন, ২৮.৫% শর্করা, ১১.৬% তন্তু, ০.১২% ক্যালসিয়াম, ০.২৪% ফসফরাস ও প্রতি ১০০ গ্রামে ৪.৬ মিলিগ্রাম আয়রন থাকে। এছাড়া জায়ফল থেকে এক ধরনের উদ্বায়ী তেলও পাওয়া যায়। জয়িত্রীতে শতকরা হিসাবে ১৫.৭% আর্দ্রতা, ৬.৫% প্রোটিন, ৪৭.৮% শর্করা, ৩.৮% তন্তু, ১.৬% খনিজ পদার্থ, ০.১৮% ক্যালসিয়াম, ০.১০% ফসফরাস ও প্রতি ১০০ গ্রামে ১২.৬ মিলিগ্রাম আয়রন থাকে। মেলে উদ্বায়ী তেলও। এছাড়া জায়ফল ও জয়িত্রীতে ভিটামিন A, B1, B2, C ও নিয়াসিন আছে। জায়ফল ও জয়িত্রীর উদ্বায়ী তেলে অ্যামাইলোডেক্সট্রিন থাকার কারণে তীব্র গন্ধযুক্ত হয়।

ঔষধি গুণের কারণে জায়ফল বিভিন্ন রোগের উপশমে সাহায্য করে। জায়ফল বলকারক, উত্তেজক কামোদ্দীপক, অজীর্ণ, ওলাওঠা ইত্যাদি রোগে ব্যবহৃত হয়, তেষ্টার উপশমে জায়ফল খেলে ভাল ফল পাওয়া যায়। দাঁতের ব্যথায়, মাথা ব্যথায় জায়ফল ঘষে লাগালে উপকার পাওয়া যায়। পক্ষাঘাত সারানোর জন্য মালিশের কাজে জায়ফলের তেল ব্যবহৃত হয়। মুখে কালচে দাগ পড়লে দাগের ওপর জায়ফলের প্রলেপ দিলে দাগ মিলিয়ে যায়। জায়ফল গুঁড়ো ঈষৎ উষ্ণ গরম জলসহ খেলে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়। জয়িত্রী ও জায়ফল কফ, বমি, কৃমি সারাতে খুবই কার্যকরী। কুষ্ঠরোগের প্রাথমিক চিকিৎসায়ও জায়ফল ও জয়িত্রী উপকারী। মুখের দুগর্ন্ধ দূর করতে জয়িত্রী ব্যবহার হয়। আমাশা ও পেটের বিভিন্ন গন্ডগোলে জায়ফল ও জয়িত্রী কাজ লাগে। ম্যালেরিয়া, পেটের ব্যথার ওষুধ তৈরি করতে জায়ফল ও জয়িত্রী ব্যবহার করা হয়। জায়ফলের তেল প্রসাধন সামগ্রী, দাঁতের মাজন, সাবান, মদ তৈরি ও বিভিন্ন খাবারে গন্ধ আনতে ব্যবহার করা হয়। জেলী, আচার ইত্যাদি তৈরি করতে জায়ফলের রসালো অংশ ব্যবহৃত হয়।

তথ্যসূত্র - মশলা উৎপাদন প্রযুক্তি ও ঔষধি গুণ - ডঃ বিভূতি ভূষণ সরকার ও ডঃ শ্যামলী চক্রবর্তী (সিনিয়র এগ্রোনমিস্ট, স্টেট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ স্টেশন, অরুন্ধুতী নগর, ত্রিপুরা)

ঔষধি গুণসম্পন্ন গাছ



আমলকি

পরিচয় –

আমলকির বিজ্ঞানসম্মত নাম Phyllanthus emblica, এটি Phyllanthaceae গোত্রের ছোট বা মাঝারি আকারের উদ্ভিদ। এই গাছটির অপর সুপরিচিত বিজ্ঞানসম্মত নাম হল Emblica officinalis এবং Euphorbiaceae গোত্রের উদ্ভিদ।

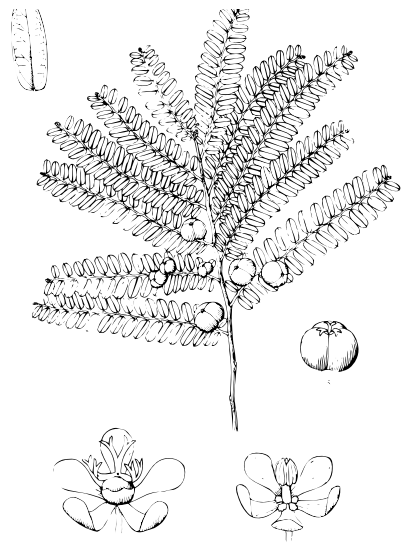
আমলকি গাছটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের উদ্ভিদ। প্রকৃতপক্ষে মধ্য ভারত বা দক্ষিণ ভারত এর আদি জন্মস্থান। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও চিনের দক্ষিণে গাছটি জন্মায়। পৃথিবীর উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে বর্তমানে আমলকি গাছের বিস্তার ঘটেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধদের কাছে আমলকি একটি পবিত্র উদ্ভিদ। ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমার আগে 'আমলকি একাদশী'-তে হিন্দুরা আমলকি গাছের পুজো দেয়। ছট পুজোতে সূঁতো জড়িয়ে এই গাছকে পুজো করা হয়। ভগবান বিষ্ণু এই গাছের নিচে বাস করেছিলেন। দেবাসুরের যুদ্ধের সময় অমৃতভাণ্ড থেকে কয়েক ফোঁটা অমৃত এই গাছের উপর পড়েছিল। কথিত আছে, তাই আমলকি ফল গুণে সমৃদ্ধ। সম্রাট অশোক বর্তমান পাটনার কাছে আমলকি স্তুপ নামে একটি বৌদ্ধস্তুপ নির্মাণ করেছিলেন। আমলকি গাছের ইংরেজি নাম Indian goosebery ও Myrobalan Amla, সংস্কৃতে অমালিকা, আমলা বা আমলকি, হিন্দিতে আমলা, তামিল ও মালয়ালম ভাষায় নেল্লী, তেলেগু ভাষায় উরিরিকাই ও আমলকামু, গুজরাটিরা একে আমবালা, ওড়িয়ায় অনোলা, পাঞ্জাবীতে আওনালা ও বাংলা ভাষায় একে আমলকি বলে। আমলকি পর্ণমোচী শ্রেণীর মাঝারি আকৃতির দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। গাছটি উচ্চতায় কম-বেশি ১৮ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। গাছটির কাণ্ডের বেড় কম-বেশি ৩৫ সেমির কাছাকাছি হয়। আমলকি গাছের পাতাগুলি যৌগিক প্রকৃতির মতো। পাতাগুলি সরু সরু ও খুব ছোট আকারের হয়। পাতার থেকে ৬-১০টি ছোট ছোট ফুল গুচ্ছাকারে জন্মায় ও নীচের দিকে ঝুলে থাকে। একই সঙ্গে স্ত্রী ফুল ও পুরুষ ফুলগুলি জন্মায়। পুং ফুলের থেকে স্ত্রী ফুলের বৃন্তগুলি লম্বায় বড় হয়। সাধারণত মৌমাছির দ্বারা ফুলের পরাগমিলন ঘটে। আমলকি ফল ২-১২ সেমি ব্যাসের হয়। আকারে গোলাকার, স্বচ্ছ, হালকা সবুজ রঙের হয়। ফলে তিনটি প্রকোষ্ঠ থাকে, প্রতি প্রকোষ্ঠে ২টি করে বীজ থাকে। সাধারণত শীতকালে পাতা ঝরে যাওয়ার পর প্রায় একই সাথে ফুল ও নতুন পাতাগুলি গজাতে থাকে। ফল সাধারণত নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে পুষ্ট হয়। ফলের মাঝখানে শাঁসের মধ্যে নীলবর্ণের একটি পাথুরে খোলের মধ্যে বীজগুলি থাকে। আমলকি উষ্ণ ও উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের উদ্ভিদ। আমলকি গাছের উপযুক্ত তাপমাত্রা ২০-২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৬৬০-৮০০ মিলিমিটার। তবে ৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করেও আমলকি গাছ বেঁচে থাকে। ক্যালসিয়াম যুক্ত পাথুরে মাটিতে আমলকি ভাল জন্মায়। নিকাশীযুক্ত বেলে, দোঁয়াশ বা কাদা মাটিও আমলকির পক্ষে ভাল। মাটির অম্লতা ও ক্ষারীয় মাত্রা ৬-৮ PH আমলকির পক্ষে উপযুক্ত।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ -

আমলকি ফলের মধ্যে থাকা নীলবর্ণের শক্ত প্রকোষ্ঠ কেটে বীজগুলি সংগ্রহ করা হয়। পরিণত ও পুষ্ট বীজগুলি নার্সারীর বেডে বা সরাসরি জমিতে বপন করলে চারাগাছ জন্মায়, পরে নার্সারীর চারাগুলি ৪-৬ মাস পরিচর্যা করে বড় করে রোপণ করা হয়। নার্সারীতে পলিথিন ব্যাগে ৬-৮ মাস বয়সের চারার সঙ্গে উন্নতজাতের Scion ডগার veener grafting বা side grafting বা cleft grafting পদ্ধতিতে জোড়কলম তৈরি করে উপযুক্ত পরিচর্যায় কলমের গাছ তৈরি করা হয়। পরে তা রোপণের উপযুক্ত হয়। আমলকি গাছের গুটি বেঁধেও কলমের গাছ (air layering) তৈরি করা যায়। আমলকি চাষের জন্য একটু উঁচু জমি নির্বাচন করতে হয়। যে জমিতে বর্ষায় জল জমে থাকে সেখানে আমলকি গাছের চাষ করা যায় না। জমিকে আগাছা মুক্ত করে কোদাল দিয়ে বা লাঙল দিয়ে ভালভাবে চাষ দেওয়া হয়। এরপর ৪.৫ X ৪.৫ মিটার দূরত্বে ১ X ১ X ১ মিটার আয়তনের গর্ত কেটে তাতে ১০-১৫ কেজি জৈবসার, ১ কেজি নিম খোল ও ৫০০ গ্রাম হাড়ের গুঁড়ো মিশ্রিত করে ১৫-২০ দিন ফেলে রেখে রোদ খাইয়ে তারপর জুন-জুলাই মাসে গর্তের মাঝখানে রোপণ করতে হয়। চারা রোপণের সময় অবশ্যই গাছে জল দিতে হয়।

পরিচর্যা –

আমলকির গাছের চারপাশে মাটি কুপিয়ে শিম্ব গোত্রের গাছ লাগালে, একদিকে আগাছা দমন হয় ও অন্যদিকে মিশ্র পদ্ধতির চাষ



করে কিছু আর্থিক লাভ করা যায়। তবে বছরে দু'বার কোদাল দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি কুপিয়ে মাটি আলগা করে দিলে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। গ্রীষ্মকালে সপ্তাহে দু'বার গাছে জল দিতে হয়। শীতকালে শুষ্ক জমিতে প্রতিদিন প্রতি গাছে ২৫-৩০ লিটার করে জল দেওয়ার প্রয়োজন হয়। Drip irrigation পদ্ধতিতে সেচ দিলে জলের অপচয় কম হয়। ক্ষারযুক্ত মাটিতে প্রতি গাছে ৫-৬ কেজি জিপসাম প্রয়োগ করতে হয়। সাধারণভাবে বছরে দু'দফায় প্রতি গাছে ১০ কেজি জৈবসার (FYM), ১০০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ৫০ গ্রাম ফসফেট, ১০০ গ্রাম পটাশ সার প্রয়োগ করতে হয়। প্রতি ক্ষেত্রেই সার প্রয়োগের সময় সেচের প্রয়োজন হয়। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে আমলকি গাছের অবাঞ্ছিত ডালপালা কেটে দিলে গাছটিকে নির্দিষ্ট আকারে বড় করা যায়। এছাড়া শুকনো ও রোগগ্রস্ত ডালগুলি কেটে দিলে গাছের নতুন ডালপালা গজিয়ে বৃদ্ধি ভাল হয়। বসন্তকাল ও গ্রীষ্মকালে গাছের গোড়ার চারপাশে, শুকনো লতাপাতা, খড় বা প্লাস্টিক, বস্তা চাপা দিয়ে জমির আর্দ্রতা সংরক্ষণ করাকে Mulching বলা হয়। এতে আগাছার বৃদ্ধি রোধ হয় এবং গাছের পক্ষে উপকারী হয়। আমলকি গাছের ফল যেহেতু খুবই উপকারী ও ঔষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, তাই Bio-pesticide প্রয়োগে রোগপোকা আক্রমণ প্রতিহত করা উচিত। নিম তেল, নিমের পাতা, ফল ইত্যাদি সহযোগে তৈরি কীটনাশক স্প্রে করলে রোগপোকার আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। গোমূত্র, ধুতরার ফল ইত্যাদি থেকে তৈরি জৈব কীটনাশক ব্যবহার উপযুক্ত। আমলকি গাছের পাতা যেহেতু সরু সরু তাই এই গাছের ফাঁকা জায়গায় তেমন ছায়া পড়ে না। তাই মিশ্র পদ্ধতিতে ২-৩ বছর বা তারও বেশি আমলকির জমিতে শাক-সবজির চাষ করা যায়। সাথী ফসল হিসেবে আদা, হলুদ, ডালশস্য চাষ করা যেতে পারে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

আমলকির সব ফল একসঙ্গে পাকে না। ফলের রঙ সবুজ থেকে ঘিয়ে বা সাদাটে রঙের হলে জাল পেতে আঁকশি দিয়ে বা হাত দিয়ে পেড়ে সংগ্রহ করলে ফলের আঘাতজনিত ক্ষতি কম হয়। দু'-এক দিন অন্তর ফল পাড়তে হয়। ফল সংগ্রহ করে শীঘ্রই ফল বাজারজাত করা উচিত, কারণ ফল বেশিদিন রেখে দিলে তার মান ও উপকারীতা কমে যায়। সাধারণত বীজের আমলকি গাছে ৬-৮ বছর পর থেকে ফল ধরতে শুরু করে। কলমের গাছ ৩-৪ বছর পর থেকে ফল দিতে শুরু করে। পরিণত গাছ থেকে ২০০ কেজি পর্যন্ত ফল উৎপাদন সম্ভব হয়। প্রতি হেক্টর জমি থেকে ১৫ থেকে ২০ টন ফল উৎপাদন হতে পারে। প্রাচীনকাল থেকেই আয়ুর্বেদ ও ইউনানী চিকিৎসায় আমলকির ব্যবহার হয়ে আসছে। আয়ুর্বেদ মতে, মানবদেহের রোগের প্রধান কারণ বায়ু, পিত্ত ও কফ্। আমলকির ফলে ও পাতায় ওই তিনপ্রকার রোগের চিকিৎসার উপাদান রয়েছে। আমলকিতে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রয়েছে। আমলকি 'বীর্যবর্দ্ধক, পরিপাকে সাহায্য করে গ্যাস-অম্বল দূর করে, বায়ু ও পিত্তরোগ সারায়, সর্দিকাশি সারায়। আমলকি হৃতযৌবন ফিরিয়ে জীবনীশক্তি বাড়ায়, কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation) কাটায়, রক্ত পরিষ্কার করে (Purify Blood) হার্টের শক্তি বৃদ্ধি করে, চুলের পক্ষে উপকারী এবং বুদ্ধি বা স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে মেধার বিকাশ ঘটায়। আয়ুর্বেদ পদ্ধতিতে তৈরি কিছু প্রাচীন ওষুধ চ্যবনপ্রাশ, আমলাতেল ও শ্যাম্পু তৈরিতে ত্রিফলাচূর্ণ সকলের কাছে বহু পরিচিত। বহেড়া ও হরতকি ছাড়া যেখানে তৃতীয় উপাদান হল আমলকি। দেশে ও বিদেশে আমলকির ব্যবহার প্রচুর। ১০০ গ্রাম আমলকিতে ৪৬ কিলো ক্যালরি শক্তি, ০.৫ গ্রাম চর্বিজাতীয় পদার্থ, ১ গ্রাম প্রোটিন, ১০ গ্রাম গ্রাম শর্করা, ৮৬ গ্রাম জল, ৩০১২.৫ গ্রাম গ্যালিক অ্যাসিড ও ৫ গ্রাম খাদ্যতন্তু থাকে। আমলকিতে ভিটামিন -A ২৯০ IU, ভিটামিন – C ৪৭৮ মিলিগ্রাম, ভিটামিন - E ২৪৫০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন - B3 – ০.৩ মিলিগ্রাম, ভিটামিন - B6 ০.১ মিলিগ্রাম, ফলেট ৬ মিলিগ্রাম, Pentothatic Acid ০.৩ মিলিগ্রাম। এছাড়াও ক্যালসিয়াম ২৫ মিলিগ্রাম, আয়রন ০.৯ মিলিগ্রাম, কপার ০.১ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ২৭ মিলিগ্রাম, সোডিয়াম ১ মিলিগ্রাম, পটাসিয়াম ১৯৮ মিলিগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ১০ মিলিগ্রাম, ম্যাঙ্গানিজ ০.১ মিলিগ্রাম, জিঙ্ক ০.১২ মিলিগ্রাম, সেলিয়াম ০.৬ মিলিগ্রাম প্রভৃতি খনিজ লবণ থাকে। আমলকি ফলের আচার একটি উপকারী খাদ্য। কাঁচা আমলকি ও শুকনো (কেটে টুকরো করে) আমলকি প্যাকেট করে ট্রেনে-বাসে বিক্রি হয়। সর্দিকাশি ও হজমি হিসাবে আমলকি ব্যবহৃত হয়। অন্ধ্রপ্রদেশে আমলকির কচি ফলের ডাল মোরব্বা করে খাওয়ার চল রয়েছে। আমলকির গুণাগুণ নিয়ে আরও গবেষণা চলছে। এই উপকারী গাছ থেকে আমরা স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য দুই-ই ফিরে পেতে পারি।

জাত পরিচিতি -

প্রধানত তিনটি জাতের ও তাদের থেকে সৃষ্ট Variety -র আমলকির চাষ করা হয়। যথা Baranasi Francis (স্থানীয় নাম হাতিঝোলা) এবং Chakaiya Kanchan (NA4), (NA6), (NA7) ইত্যাদি আমলকির কয়েকটি পরিচিত জাত।

তথ্যসূত্র - https://en.wikipedia.org/http://www.agrifarming.in/amla-farming



নিম

পরিচয় –

নিম গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Azadirachta indiaca, এটি Meliaceae গোত্রের বৃক্ষ শ্রেণীর উদ্ভিদ।

নিম গাছের আদি জন্মস্থান ভারত। পৃথিবীর উষ্ণ ও উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের প্রায় ৫০টি দেশে এই গাছ জন্মায়। নিম গাছ হিন্দু ও বৌদ্ধদের কাছে একটি অতি পবিত্র উদ্ভিদ। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নববর্ষের দিন নিমপাতা ও নিমের রস গুড় সহযোগে খাওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। সারা বছর শরীরের উপর যাতে কোনও হানিকারক প্রভাব না পড়ে, তাই বছরের শুরুতেই এমন প্রথার প্রচলন। হিন্দু দেবদেবীর আরাধনায় নিমের পাতা ও নিম ফুলের ব্যবহার করা হয়। পুরীর জগন্নাথ দেবের মূর্তি নিমকাঠ দিয়েই নির্মিত হয়। ভগবান বুদ্ধও নাকি নিম গাছের তলায় বসে সাধনা করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গেও নিম গাছের সম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়।

নিমগাছ এমনই একটি উপকারী বৃক্ষ, যার ব্যবহারের Patent কে পাবে তা নিয়ে আমেরিকার একটি সংস্থার সঙ্গে আদালতে মামলাও হয়।

সংস্কৃতে নিম গাছকে নিম্ব, তামিল, তেলেগু ও মালায়লমে নিম গাছ ভেপা নামে পরিচিত এবং হিন্দি ও বাংলায় নিম নামেই পরিচিত।

নিম গাছ একটি বৃক্ষশ্রেণীর বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। উচ্চতায় এই গাছ ১৫-৪০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। ক্রান্তীয় অঞ্চলে নিম একটি চিরহরিৎ বৃক্ষরূপে এবং উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে এর পাতা শীতে ঝরে যায় এবং বসন্তে লাল রঙের কচি পাতা জন্মায়। নিম গাছের পাতা যৌগিক প্রকৃতির। পত্রাক্ষগুলি ২০-৩০ সেমি পর্যন্ত লম্বা হয়। এর উপর ৩-৮ সেমি লম্বা ২০-৩১টি খাঁজকাটা কিনারাযুক্ত গাঢ় সবুজ বর্ণের পত্রকগুলি অবস্থান করে। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে নিম গাছে ফুল আসে। ফুলগুলি ২০ সেমি পর্যন্ত লম্বা শাখাপ্রশাখাযুক্ত মঞ্জরীদন্ডের উপর সজ্জিত থাকে। ফুলগুলি সুন্দর গন্ধযুক্ত সাদা রঙের হয়। একই পুষ্পাক্ষে পুরুষ ও উভলিঙ্গ ফুল জন্মায়। নিমের ফুল ড্রুপ প্রকৃতির। ফলের মধ্যে সাধারণত একটি বীজ থাকে। বীজের চারদিকে রসালো শাঁসযুক্ত Mesocarpটি থাকে। ফল পাকলে তা হলুদ বর্ণের হয়ে যায়। পরিণত ফল ১.৪-২.৮ X ১.০-১.৫ সেমি আকারের হয়। ফলের বাইরের ত্বক মসৃণ সবুজাভ-হলুদ রঙের হয়।

নিম গাছ উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের উদ্ভিদ। অতিরিক্ত ছায়ায় ও ঠাণ্ডায় নিম গাছ হয় না। ২৫-৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা নিম গাছের সহায়ক। ৫০-৫২ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রাও নিম গাছ সহ্য করতে পারে। বছরে ৩৫০-১২০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে নিম গাছ ভাল হয়। বিভিন্ন প্রকার মাটিতে নিম গাছ জন্মাতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণ মৃত্তিকায় এই গাছ সব থেকে ভাল হয়। জলের অভাব রয়েছে এমন পাথুরে মাটিতেও নিম গাছ জন্মাতে পারে। নিম গাছ মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে এবং অম্লযুক্ত মাটির অম্লতাকে প্রশমিত করে।

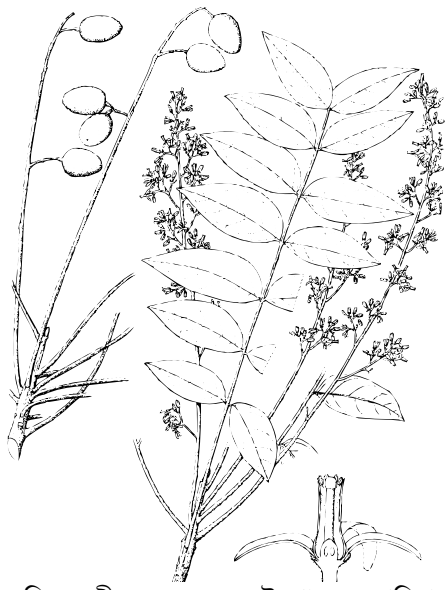
কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

সাধারণত বীজের দ্বারাই নিম গাছের বিস্তার ঘটে। যদিও Root cutting বা শিকড় কেটে তা রোপণের মাধ্যমেও চারা তৈরি করা সম্ভব। নিম গাছের জন্য জমিটিকে প্রথমে লাঙল দিয়ে দু-তিনবার ভাল করে চাষ দিয়ে মাটি তৈরি করতে হয় এবং আগাছা দমন করে গাছ লাগানোর জন্য গর্ত খনন করা হয়। তবে বর্ষার আগেই এই জমি প্রস্তুতির কাজ সেরে ফেলা ভাল।

পাকা নিম ফল সংগ্রহ করে বীজগুলি ধুয়ে পরিষ্কার করে শুকিয়ে রাখতে হয়। এরপর ঠাণ্ডা জলে একদিন ভিজিয়ে রেখে নার্সারীর বেডে বা সরাসরি নির্দিষ্ট জমিতে বপন করে অথবা নার্সারীর চারাগুলি ১০-৩০ সেমি লম্বা হয়ে গেলে তা রোপণ করলে ভাল হয়। চারাগুলি সাধারণত ৩০ X ৩০ X ৩০ সেমি গর্তের মাঝখানে রোপণ করা হয়। ৩ X ৩ মিটার দূরত্বে গাছগুলি রোপণ করা হয়।

পরিচর্যা –

নিম গাছের জন্য খুবই অল্প সেচের প্রয়োজন হয়। চারাগুলি জমিতে লাগানো হয়ে গেলে এবং তা বেঁচে গেলে তেমন আর সেচের দরকার পড়ে না। সূর্যের আলো ও উত্তাপ নিম গাছের বেড়ে ওঠার পক্ষে সহায়ক। খুব কম বৃষ্টিপাতযুক্ত (গড়ে ২০০-৫০০ মিলিমিটার) অঞ্চলেও নিম গাছ ভাল জন্মাতে পারে।



নিম গাছে অনেক সময় VAM (Vesicular Arbuscular Mycorriza) নামক এই মিথোজীবী ছত্রাকটি দেখা যায়। গাছ প্রতি ৫০ গ্রাম VAM, ২০ গ্রাম Azhospirillum এবং ২০ গ্রাম হিসাবে Phosphobacteria নিয়মিত প্রয়োগ করলে নিম গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়।

কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা, চা গাছের মশা প্রভৃতি নিম গাছের ক্ষতিকারক পোকা। যা চারা গাছের ও ছোট নিম গাছের ক্ষতিসাধন করে। এছাড়া নিম গাছে Pulvinaris maxima এবং Heliothrips haemorrhoidalis নামের দু'প্রকার পোকার আক্রমণ ঘটে। ছত্রাকজনিত কারণে ধসা, পাতায় বাদামী দাগ লক্ষ্য করা যায়। এই প্রকার রোগপোকার আক্রমণ প্রতিহত করতে রাসায়নিক কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক ব্যবহার করে রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে। অথবা Bio-pesticide ও Bio-fertilizer ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

৪-৫ বছর বয়সে নিম গাছে ফল আসতে শুরু করে। ১০-১২ বছরের গাছে প্রচুর ফল উৎপাদন হয়। প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি গাছ থেকে ১০-২৬ কেজি নিম বীজ উৎপন্ন হতে পারে। ১০ বছর বয়সের গাছ থেকে ৩৫-৫০ কেজি বীজ পাওয়া যায়। নিমের বীজ থেকে তেল উৎপাদনের পরিমাণ বীজের পরিপুষ্টতা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, জমির উর্বরতা প্রভৃতির তারতম্যের উপর নির্ভরশীল।

একটি নিম গাছের ১৫০-২০০ বছর পর্যন্ত উৎপাদন ক্ষমতা থাকে। স্থানীয় বাজারে প্রতি কেজি নিমের বীজ ৬-১০ টাকা দরে বিক্রি করা যায় অথবা এর চেয়ে কিছু বেশি দামে ওষুধ প্রস্তুকারক সংস্থার কাছে সরবরাহ করা যেতে পারে।

নিম এমন এক গাছ যার পাতা, ছাল, বীজ থেকে ওষুধ তৈরি হয়। ফুল, ফল ও শিকড় বা মূলও বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। পুরাতন নিম গাছের কাঠও খুব দামী, যা আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহার হয়।

হার্টের রোগ, কুষ্ঠ, চোখের রোগ, লিভারের সমস্যা, মধুমেহ, জন্ম নিয়ন্ত্রণে, পেটের অসুখ, চর্মরোগ, কৃমি নাশ করতে, নাক দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ করতে, মাড়ির ক্ষত প্রভৃতির চিকিৎসায় যে সমস্ত ওষুধ তৈরি হয়, তাতে নিমের পাতা ব্যবহার হয়। বসন্ত রোগের প্রতিষেধক হিসাবে নিমের পাতা খাওয়া হয়। নিম গাছের ছাল থেকে ম্যালেরিয়া, খাদ্যনালী ও পাকস্থলীর আলসার (ঘা), জ্বর, যন্ত্রণা ও চর্মরোগের ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। নিম গাছের ফুল বায়ুনাশক, কফ্নাশক ও কৃমিনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। নিমের ফুলের মধুও স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী।

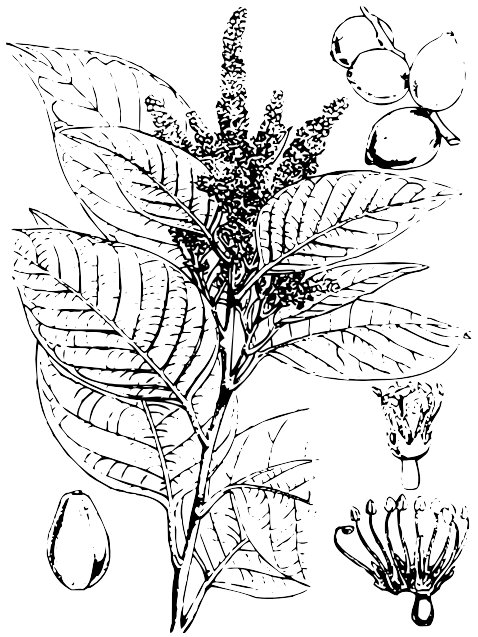
অর্শ থেকে রক্তপাত বন্ধ করতে, কৃমি নাশ করতে, মূত্রনালীর রোগ সারাতে, ঘা ও কুষ্ঠ রোগ সারাতে নিমের ফল ব্যবহৃত হয়। পাকা ফলের স্বাদ একটু তিক্ত হলেও তা খুব উপকারী। দাঁতের মাজন, সাবান, শ্যাম্পু, তেল, ক্রীম প্রভৃতি তৈরিতে নিমের তেল ব্যবহৃত হয়। প্রাচীনকাল থেকে নিমের ডালকে দাঁতন করে তা দিয়ে দাঁত মাজার প্রথা রয়েছে, যা দাঁত, মাড়ি ও মুখ গহ্বরের স্বাস্থ্য রক্ষা করে।

ভারতের অধিকাংশ রাজ্যেই কচি নিমের পাতা ও ফুল ভেজে ও তরকারিতে ব্যবহার হয়ে থাকে। ওষুধ ও প্রসাধনীর পাশাপাশি নিমের বীজের তেল কীটনাশক তৈরিতেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। নিমের খোল বিভিন্ন ফুল, ফল, সবজি সহ অন্যান্য ফসল চাষে একটি পরিবেশবান্ধব উপকারী জৈবসার। নিম গাছের কাণ্ড থেকে নিসৃত আঠা নিম গ্লু নামে পরিচিত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

জাত পরিচিতি –

কেরালা সরকারের কৃষি দফতর উন্নত জাতের নিম নিয়ে গবেষণার স্বার্থে বিভিন্ন জায়গা থেকে বীজ সংগ্রহ করছে। ওই দফতর Ramnagar – H নামের একটি নিম গাছের সন্ধান পেয়েছে, যার বীজের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ১৬.৭ X ৬.৫ মিলিমিটার। এই ধরনের ১০০টি বীজের ওজন ৩৭৪ গ্রাম। এছাড়া Hosakote নামে আরও এক ধরনের বীজ কেরালার কৃষি দফতর সংগ্রহ করেছে, যা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ১৪.১ X ১০.৯ মিলিমিটার এবং ১০০টি এই বীজের ওজন ৩৫৪ গ্রাম। এই বীজগুলি থেকে তারা উন্নত জাতের নিম গাছ তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে।

তথ্যসূত্র - http://www.agrifarming.in/neem-cultivation/,http://www.oilseedcrops.org/wp-content/uploads/2012/11/Indian-Neem-Growth.pdf



হরিতকী

পরিচয় –

হরিতকী গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Terminalia chebula, বহেড়ার মতো এটিও Combretaceae গোত্রের বহুবর্ষজীবী, দ্বিবীজপত্রী, পর্ণমোচী শ্রেণীর উদ্ভিদ।

হরিতকী গাছের আদি জন্মস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। ভারত, শ্রীলঙ্কা, ভূটান, নেপাল, বাংলাদেশ, মায়ানমার, কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে হরিতকী গাছ জন্মাতে দেখা যায়। এছাড়া পরবর্তীকালে অন্যান্য কিছু দেশেও রোপণের এই গাছের বিস্তার ঘটেছে। ভারতে হিমালয়ের পাদদেশে ও তার ১৫০০ মিটার উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে এই গাছ জন্মাতে দেখা যায়। উত্তর-পূর্ব ভারতের জঙ্গলে হরিতকী স্বাভাবিক অরণ্যের উদ্ভিদ (Wild) হিসাবে জন্মায়। পশ্চিমবঙ্গে ও আসামের জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে হরিতকী গাছ দেখতে পাওয়া যায়। ভারতে হাজার হাজার বছর ধরে বংশপরম্পরায় হরিতকী ব্যবহার হয়ে আসছে। প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে হরিতকীর ব্যবহার করে সুস্থ থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রাচীন আয়ুর্বেদে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় তিব্বতীদের চিকিৎসা পদ্ধতিতে পরম্পরাগতভাবে ধারাবাহিক হরিতকীর ব্যবহারের উল্লেখ আছে। গ্রীসে হরিতকীকে সব রোগের রক্ষাকারী দেবী, 'Panacea'-র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

হিন্দু ধর্মের মানুষের কাছে হরিতকী একটি পবিত্র ফল হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। সব ধরনের পূজা-অর্চনায়, বরণডালায় হরিতকী একটি অতি আবশ্যকীয় সামগ্রী।

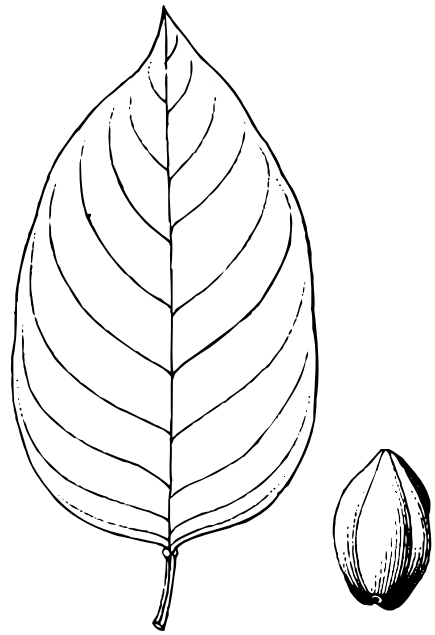
ইংরেজিতে এর নাম চেবুলিক মাইরোব্যালান। সংস্কৃত ও বাংলায় এই ফলটি হরিতকী নামে পরিচিত। হিন্দিতে হারা, কন্নড়ে এলালে ও ওরডো, গুজরাটিতে হরদি ও হারদে, মালায়ালমে কাটুক্কা, মারাঠীতে হিরদা, ওড়িয়ায় কারাধা, তামিলে কাটাক্কে, তেলেগুতে কারাকা এবং অসমীয়া ভাষায় হরিতকী সিলিখা নামে পরিচিত।

হরিতকী গাছ একটি মাঝারি বা বড় ধরনের বৃক্ষ শ্রেণীর উদ্ভিদ । উচ্চতায় ২৫ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। কাণ্ডের বেড় ১ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এই গাছের পাতাগুলি কিছুটা একান্তরভাবে বা কিছুটা বিপরীতমুখীভাবে সজ্জিত হয়ে ডালপালার অগ্রভাগে পাতাগুলি গুচ্ছাকারে (Clustered) সজ্জিত থাকে। পাতাগুলি লম্বা ও চওড়ায়৭-৮ সেমি X ৪.৫-১০ সেমি হতে পারে। পত্রবৃন্তের দৈর্ঘ্য ১-৩ সেমি লম্বা হয়ে থাকে। পত্রবৃন্ত ও পত্রফলকের সংযোগস্থলে পত্রবৃন্তের দুই দিকে দুটি গ্রন্থি বা gland থাকে। পাতাগুলি উপবৃত্তাকার-ডিম্বাকার আকৃতির হয়ে থাকে, পত্রাগ্র সূচালো (acute) এবং পাতার নীচের দিক base heart shaped অর্থাৎ হার্টের আকৃতির (cord ate at base) হয়ে থাকে। পাতার কিনারা মসৃণ হয়। হরিতকী গাছের ফুলগুলি ডাল বা শাখা-প্রশাখার অগ্রভাগের মঞ্জরীদণ্ডের উপর জন্মায়। মঞ্জরীদণ্ডটি শাখা-প্রশাখা (branched panicles) যুক্ত হয়ে থাকে। ফুলগুলি ঘোলাটে সাদা (Dull white) বা হালকা হলুদ রঙের হয়ে থাকে এবং ফুলগুলি বাজে গন্ধযুক্ত হয়। ফুলে ৫টি বৃতি বা Calyx থাকে, ফুলের কোনও পাপড়ি বা Petals থাকে না। পুংকেশরচক্রে ১০টি পুংকেশর বৃতির দ্বারা গঠিত টিউব বা Calyx tube-এর মধ্যে সংযুক্ত থাকে। গর্ভাশয়টি এক প্রকোষ্ যুক্ত , গর্ভদণ্ডটি লম্বা হয়। ফল ডিম্বাকার বা বিভিন্ন আকারের (size)হয়ে থাকে। ফল ড্রুপ প্রকৃতির, ফলে একটি মাত্র বীজ থাকে। বীজগুলি খুব শক্ত হয়। ফলের আকার ও ফলের উপর শিরাগুলি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। ফলের আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্যযুক্ত হরিতকী গাছ দেখা যায়।

ক্রান্তীয় ও উষ্ণ ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের ১৫০০-২০০০ মিটার উঁচু জমিতে এই গাছ জন্মায়। যে অঞ্চলের বার্ষিক তাপমাত্রা ২২-৩৫ ডিগী সেলসিয়াস সেখানে এই গাছ ভাল হয়। তবে ৫-৪৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। ঠাণ্ডা সহ্য করার ক্ষমতা থাকলেও -৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় হরিতকী গাছ বাঁচতে পারে না। ৭৫০-৩৩০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতেও এই গাছ বেড়ে উঠতে পারে, তবে ১০০০-১৭০০ মিলিমিটার বার্ষিক বৃষ্টিপাত এই গাছে পক্ষে উপযোগী। নতুন গাছ ছায়া সহ্য করতে পারলেও, সাধারণভাবে এই গাছ রোদ পছন্দ করে।

জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থাযুক্ত যে কোনও সাধারণ উর্বর বালি মিশ্রিত কাদা মাটিতে হরিতকী গাছ জন্মাতে পারে। তবে মাটিতে অম্ল-ক্ষারের মাত্রা ৫.৫-৬.৫PH থাকলে ভাল হয়। যদিও এই মাত্রা ৫-৭.৫ PH হলেও হরিতকী গাছ বেঁচে থাকতে পারে।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –



stump-এর দ্বারা হরিতকী গাছের কৃত্রিমভাবে প্রসারণ ঘটানো যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অঙ্কুরিত বীজগুলি থেকে পলি টিউব বা লম্বা পলিব্যাগে চারা তৈরি করে নার্সারীতে ১২-১৫ মাস ধরে পরিচর্যা করে চারার মূলগুলিকে লম্বায় বৃদ্ধি ঘটিয়ে stump গুলিকে ৪৫ X ৪৫ X ৪৫ সেমি কিউবিক সেমি পিট বা গর্ত কেটে বা Crow bar holes কেটে নির্দিষ্ট দূরত্বে রোপণ করে হরিতকী গাছের বিস্তার ঘটানো হয়ে থাকে।

সমান জমিতে লাঙল বা ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ দিয়ে এবং মই দিয়ে ঢাল বজায় রেখে বা আগাছা, ঝোপঝাড় কেটে ফেলে এবং ঢালু জমিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে গর্ত কেটে মাটি তৈরি করে রাখা হয়। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে জমির সীমানা নির্দিষ্ট করে, বাবলা, খয়ের বা বনকমলির বেড়ার গাছ তৈরি করে জমি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

জুন-জুলাই মাসে অর্থাৎ বর্ষার ঠিক আগে চারাগুলি জমিতে রোপণের উপযুক্ত সময়। সমান জমিতে ২ X ২.৫ মিটার দূরত্বে লাইন করে stump-এর চারাগুলি রোপণ করতে হয়। এসময় লক্ষ্য রাখতে হয়, চারাগুলির লম্বা মূলে যেন কোনও আঘাত না লাগে।

পরিচর্যা –

জমির আর্দ্রতা অনুযায়ী চারাগাছে নিয়মিত জল দিয়ে পরিচর্যা করতে হয়। গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে প্রয়োজন মতো সেচ দিয়ে চারা গাছগুলিকে বড় করে তোলা হয়।

চারা গাছ রোপণ বা বীজ বপনের আগে জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈবসার প্রয়োগ করে রাখা হয়। প্রতি গর্তে ২৫ গ্রাম করে বছরে ২ বার N.P.K সার প্রয়োগ করতে হয়। গাছের বয়স অনুসারে বন দফতরের পদ্ধতি মেনে সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। N.P.K সার গাছের কাণ্ডের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

হরিতকী গাছ রোপণের বা বপনের প্রথম বছরে তিনবার গাছের গোড়া থেকে মাটি কুপিয়ে, আগাছা দমন করা হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে বন দফতরের তথ্য অনুসারে, ১ হেক্টর জমিতে প্রথমবার আগাছা দমনের জন্য ১৬ জন, দ্বিতীয়বার আগাছা দমনের জন্য ১৪ জন এবং তৃতীয়বার আগাছা দমনের জন্য ১২ জন করে শ্রমিকের প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে। শুকনো ডালপালা বা খড় কিংবা শুকনো ঘাস বিছিয়ে গাছের গোড়ার আর্দ্রতা রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এতে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়।

সমতল জমিতে চারা রোপণে পর ৩-৪ বছর পর্যন্ত হরিতকী গাছের সারির ফাঁকে শিম্ব গোত্রের ডালশস্য, শাকসবজি বা স্বল্প আয়ুর ফলের গাছ লাগানো যেতে পারে।

কাঠবিড়ালী, ইঁদুর, সজারু, খরগোশ, ময়ূর ও অন্যান্য প্রাণীরা হরিতকী ফল খায়। কীটনাশক দিয়ে এই সমস্ত প্রাণীদের মারা নিষিদ্ধ। বন দফতরের নির্দেশিকায় প্রতি হেক্টর জমিতে বিভিন্ন প্রকার কাঠ বা ভেষজ উদ্ভিদের রোগপোকাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য কীটনাশকবাবদ খরচের হিসাব দেওয়া রয়েছে। পরিবেশবান্ধব জৈব কীটনাশক বা জৈব ছত্রাকনাশক ব্যবহার করলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকে এবং উপকারী কীটপতঙ্গের ক্ষতিও হয় না। রোগপোকা দমনের ব্যবস্থা করার জন্য কৃষি দফতরের বা বন দফতরের পরামর্শ মেনে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

৭-৮ বছর বয়সে হরিতকী গাছে ফল ধরা শুরু হয়। ১০ বছর বয়সের গাছে পরিমাণ মতো উৎপাদন শুরু হয়। ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত হরিতকী গাছের উৎপাদন ঠিক থাকে। গাছ ঝাঁকিয়ে বা গাছের তলা থেকে ফল কুড়িয়ে তা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ডিসেম্বর-মার্চ মাস পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ফল পুরোপুরি পাকার আগে তা সংগ্রহ করলে ফলের গুণগত মান ভাল থাকে। পরের দিকের ফলগুলির গুণগত মান হ্রাস পেতে থাকে। সংগ্রহ করা ফল শুকনো করে সংরক্ষণ করা হয়।

একটি ১০-১৫ বছরের হরিতকী গাছ থেকে ৩০-৩৫ কেজি শুকনো ফল পাওয়া যায়। প্রতি হেক্টর জমি থেকে ৩-৪ টন শুকনো হরিতকী উৎপাদন হতে পারে। প্রতি কেজি শুকনো ফলের বাজারমূল্য ৩০ টাকা।

খাদ্যগুণের নিরিখে হরিতকীকে অনেক সময় আপেলের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। এতে আপেলের চেয়ে বেশি ভিটামিন – C ও প্রোটিন থাকে। এছাড়া এই ফলের অসীম ভেষজ গুণ রয়েছে। গবেষণায় জানা গেছে, হরিতকীতে থাকা বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক



পদার্থ ক্যানসার আক্রান্ত কোষের মৃত্যু ঘটিয়ে ক্যানসার প্রতিরোধ করতে সক্ষম। এছাড়া প্রাচীনকাল থেকেই মধুমেহ, দাঁতের সমস্যা, মুখগহ্বর ও ঠোঁটের ক্ষতের চিকিৎসায়, চর্মরোগে, ঘা সারাতে, মূত্রথলির পাথরের চিকিৎসায়, অর্শ ও মাড়ির রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে, সর্দিকাশি, অ্যাজমার চিকিৎসায় হরিতকী ব্যবহার হয়ে আসছে। এছাড়া পেট পরিষ্কার করতে, পেটের অসুখ সারাতে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করতে, যন্ত্রণার উপশমে, চোখ ভাল রাখতে, শরীর ও মনকে ঠাণ্ডা রাখতে হরিতকী ব্যবহৃত হয়। এই গাছের ছাল হার্টের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এইসব ভেষজ ও ঔষধি গুণাগুণ বিচার করে আজ সারা পৃথিবীতে এর প্রতি মানুষের আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে। তাই হরিতকী চাষের উদ্যোগ আজ সময়োচিত একটি পদক্ষেপ।

হরিতকী ফলের শাঁসে ৩০-৩৫% ট্যানিন (Tannin) থাকে। হরিতকী ফল থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এই Tannin নিষ্কাশন করে জল ও পেট্রোলিয়াম পরিশোধনে, কালি তৈরিতে, শ্লেট (Slate) পাথরে রং করতে, এবং চর্মশিল্পে এর ব্যবহার হয়ে থাকে।

হরিতকী গাছের কাঠ নিম্নমানের আসবাব তৈরিতে এবং জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

প্রতি হেক্টর জমিতে হরিতকী চাষ করার জন্য ১০ বছরে (চারা রোপণ থেকে বাণিজ্যভিত্তিক উৎপাদন পর্যন্ত) মোট খরচ ৩০ হাজার টাকা। ওই জমিতে শুকনো ফলের উৎপাদন ৩.৫ টন। যার বাজারদর ৩০ টাকা প্রতি কেজি। সুতরাং বিক্রি থেকে মোট আয় ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। অর্থাৎ মোট লাভ ৭৫ হাজার টাকা প্রতি হেক্টরে। গাছের ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত এই লাভের পরিমাণ অক্ষুন্ন থাকে।

জাত পরিচিতি –

ফলের আকার ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বিচার করে বিভিন্ন জাতের হরিতকী পাওয়া যায়। যেমন, সুরভী, রঙ্গরী, বালা হরিতকী, জাভা হরিতকী, বিজয়া, রোহিণী, পুতানা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী, চেতকী।

তথ্যসূত্র - http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Terminalia+chebula



বহেড়া

পরিচয় –

বহেড়া গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Terminalia bellirica, এটি Combretaceae গোত্রের বহুবর্ষজীবী, দ্বিবীজপত্রী, পর্ণমোচী শ্রেণীর উদ্ভিদ।

বহেড়ার আদি জন্মস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মায়নামার, চিন, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া,পাকিস্তান, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশের স্বাভাবিক উদ্ভিদ হিসাবে বিস্তারলাভ করেছে। রোপণের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই গাছ ছড়িয়ে পড়েছে।

বহেড়া গাছ বেশ বড় আকারের বৃক্ষ। লম্বায় গাছটি ২০-২৫ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। অনেক সময় কাণ্ডের গোড়ায় কাণ্ডের প্রসারিত বাট্রেসেস্ (Buttresses) থাকতে পারে। কাণ্ডের ছাল (Bark) ছাই রঙের বা ধূসর বর্ণের হয়ে থাকে, কাণ্ডে লম্বালম্বি ফাটা দাগ থাকতে পারে। ছালের ভিতরের দিক হলুদ রঙের হয়। পাতাগুলি সরল, একান্তরভাবে শাখাপ্রশাখায় সজ্জিত থাকে। পাতার ফলক মসৃণ, চওড়া, উপবৃত্তাকার বা Obviate elliptical, ৪-২৪ সেমি X ২-১১ সেমি হয়ে থাকে। পত্রবৃন্ত ২.৫-৯ সেমি লম্বা, কচিপাতা লালচে বর্ণের হয়। পাতাগুলি শাখাপ্রশাখার প্রান্তে গুচ্ছাকারে (clustered) থাকে। ফুলগুলি পাতার কক্ষে মঞ্জরীদণ্ডের উপর সজ্জিত থাকে। ফুলগুলি ঘিয়ে বা ক্রীম সাদা, সবুজাভ রঙের হয় এবং একইসঙ্গে নতুন পাতার সঙ্গে জন্মায়। ফুলে মধুর মতো গন্ধ থাকে। ফুলের পরাগমিলন মৌমাছি বা পতঙ্গের দ্বারা ঘটে। হরিতকী ড্রুপ প্রকৃতির ফল, কিছুটা গোলাকার, ২-৪ X ১.৮-২.২ সেমি আকারের হয়ে থাকে। ফলের ত্বক খুব রোমশ হয়ে থাকে, হালকা হলুদ রঙের বা বাদামী বর্ণের হয়ে থাকে। বীজ গোলাকার, তবে বীজ ৫ কোণা লতি বা lobe বিশিষ্ট হয়ে থাকে।

ইংরেজিতে বহেড়া Belliric myrobalan নামে পরিচিত। সংস্কৃতে এই ফলকে বহিড়া, হিন্দি ও বাংলায় বহেড়া, তামিল ভাষায় অক্কম, তেলেগুতে তন্দ্রা, মালায়লাম ভাষায় তুশম এবং অসমীয়া ভাষায় এটিকে হুলুচ বলা হয়। ভারতের কোথাও কোথাও বহেড়ার নাম ভিভিতকা। এসব ছাড়াও এই ফলের আরও অনেক স্থানীয় নাম রয়েছে।

বহেড়া গাছের জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা ২২-২৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস। কিন্তু পাহাড়ী অঞ্চলের কম তাপমাত্রা সহ্য করেও বহেড়া গাছ বেঁচে থাকতে পারে। আবার ৪৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতাও বহেড়া গাছের রয়েছে। ৯০০-৩০০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত বহেড়া গাছের পক্ষে উপযুক্ত। সমুদ্রতল থেকে ১০০০ মিটার উচ্চভূমিতেও বহেড়া গাছ জন্মাতে দেখা যায়।

নিকাশীযুক্ত উর্বর দোঁয়াশ মাটিতে এই গাছ ভাল জন্মায়। যদিও অনুর্বর জমিতেও বহেড়া গাছ জন্মায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে গাছের বৃদ্ধি ও ফলের উৎপাদনে তারতম্য ঘটে।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

বহেড়া গাছে এপ্রিল-মে মাসে ফুল ফোটে এবং মে-জুন মাসে ফল জন্মায়। ফল পেকে পরিণত হয়ে যায় নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি মাসে। সাধারণভাবে বাদুড় বা কাঠবিড়ালী, খরগোশ, সজারু, ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীর দ্বারা এর ফলের বিস্তার ঘটে।

এছাড়া বনভূমিতে বহেড়া গাছের বীজ থেকে চারা জন্মায় ও স্বাভাবিক প্রসারণ ঘটে।

হরিতকীর মতো বহেড়া গাছের প্রসারণ বীজ থেকে, মূল কাণ্ডের কাটিং এবং স্টাম্প তৈরি করে রোপণের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। বীজের অঙ্কুরোদগম করানোর জন্য পরিণত পুষ্ট ফলের থেকে শাঁস বের করে ধুয়ে, শুকিয়ে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এক বছর পর্যন্ত বীজগুলির অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ৪০-৫০ শতাংশ হয়ে থাকে।

বীজগুলিকে ২৪ ঘণ্টা গরম জলে ভিজিয়ে বা গোবর জলের মধ্যে এক সপ্তাহ ভিজিয়ে রাখলে বীজের অঙ্কুরোদগমের লক্ষণ দেখা যায়। বীজগুলিকে নার্সারীর বেডে বা জমিতে সরাসরি বসিয়ে চারা তৈরি করা হয়। ১০-৪০ দিনের মধ্যে বীজের অঙ্কুরোদগম হয়ে যায়। ৬৫-৭০ শতাংশ বীজের অঙ্কুরোদগম হয়। বীজের থেকে চারাগাছগুলিকে Poly tube বা লম্বা পলিব্যাগে রোপণ করে নার্সারীতে পরিচর্যার মাধ্যমে বীজের চারা থেকে লম্বা মূলযুক্ত stump গুলিকে ১২-১৫ দিন ধরে বড় করা হয়। কৃত্রিমভাবে বহেড়া গাছের root - shoot কাটিং দ্বারা ও অঙ্গজ জনন পদ্ধতির মাধ্যমেও চারা তৈরি করা হয়ে থাকে।



পরিচর্যা –

মূল জমির সীমানা নির্দিষ্ট করে জমি প্রস্তুত করার পর বাবলা, খয়ের বা বনকলমি গাছের বেড়ার গাছ বপন বা রোপণ করে, সমান জমিতে লাঙল বা ট্র্যাক্টর দিয়ে এবং অসমান উঁচু-নিচু জমিতে কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে ও ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করে ভাল করে চাষ ও মই দিয়ে জমির ঢাল বজায় রেখে জমি প্রস্তুত করা হয়। রোপণের ২-৩ মাস আগেই অর্থাৎ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে জমির প্রস্তুতি সেরে ফেলা হয়।

চাষ দেওয়া জমিতে স্টাম্পের চারাগাছগুলি রোপণের জন্য ৪৫ × ৪৫× ৪৫ সেমি কিউবিক মাপের গর্ত কেটে বা Crowbar – holes পদ্ধতিতে গর্ত কেটে সাবধানে স্টাম্পের লম্বা মূলটি সযত্নে গর্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে ২ X ২.৫ মিটার দূরত্বে লাইন করে চারাগাছগুলি রোপণ করা হয়ে থাকে।

জমির আর্দ্রতা অনুযায়ী চারাগাছ রোপণের সময় ও তারপর থেকে প্রতিদিন জল প্রয়োগ করতে হয়। গ্রীষ্মকালে এবং শীতকালে প্রয়োজন মতো সেচ দিয়ে গাছগুলিকে বড় করে তোলা হয়।

চারা গাছ রোপণের আগে জৈবসার (FYM) ও গর্ত প্রতি ২৫ গ্রাম N.P.K মাটিতে মিশিয়ে গাছ রোপণের আগে গর্তের চারিদিকে প্রয়োগ করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের বন দফতরের নিয়ম অনুযায়ী, বছরে গাছ প্রতি ২৫ গ্রাম হিসাবে ২ বার N.P.K. সার প্রথম বছরে, এর পরবর্তী সময়ে গাছের বয়স অনুযায়ী সারের পরিমাণের বৃদ্ধি করে গাছের বৃদ্ধি ঘটানো হয়।

বহেড়া গাছে বিভিন্ন প্রকার কাণ্ডছিদ্রকারী বা উইপোকার আক্রমণ ঘটে থাকে। পোকাগুলির নাম Macalla caborifera, Thamnurgides indicus, T. opacifrons & Trabala vishnoy প্রভৃতি। তবে জৈব কীটনাশক প্রয়োগ করে পোকামাকড়ের নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। যদিও তেমন কোনও মারাত্মক ক্ষতিকারক পোকামাকড়ের আক্রমণ এক্ষেত্রে ঘটে না। কাঠবিড়ালী, সজারু, খরগোশ, বাদুড়, ইঁদুর প্রভৃতি পশুপাখি বহেড়ার ফল খেয়ে ক্ষতিসাধন করে থাকে, কিন্তু পরিবেশগত কারণে তাই কীটনাশক ব্যবহার বন দফতরের পরামর্শ মেনে করা উচিত।

এছাড়া বহেড়া গাছে Cercospora terminaliae, Trametes Lactinea প্রভৃতি ছত্রাকের আক্রমণ ঘতে থাকে। অন্যান্য কিছু ছত্রাকের আক্রমণে বহেড়ার চারা বা ছোট গাছের প্রচুর ক্ষতি হয়। এমনকি গাছের মৃত্যুও ঘটে। তাই পরামর্শ অনুযায়ী রাসায়নিক ছত্রাকনাশক বা জৈব ছত্রাকনাশক বা প্রতিকারক ব্যবস্থার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

নভেম্বর-মার্চ মাসের মধ্যে বহেড়া ফল পেকে যায়। গাছের ডাল ঝাঁকিয়ে মাটি থেকে কুড়িয়ে ফল সংগ্রহ করা হয়। ফলগুলি রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়। হরিতকীর থেকেও একটি ১০-১৫ বছরের পরিণত বহেড়া গাছ থেকে অনেক বেশি ফল পাওয়া যায়।

বহেড়া ফলের বীজে ৩৮.৬% fatty oil থাকে, যা সাবান তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। যদিও এককভাবে বহেড়ার তেল থেকে উন্নতমানের সাবান তৈরি হয় না, অন্য তেলের সঙ্গে ব্যবহার করে Toilet soap তৈরি করা হয়। হরিতকীর মতো বহেড়াতেও ট্যানিন (Tanin) থাকে, যা চর্মশিল্পে ব্যবহার হয়। এছাড়া কাপড় রং করতে ও কালি তৈরি করতেও এটি ব্যবহৃত হয়।

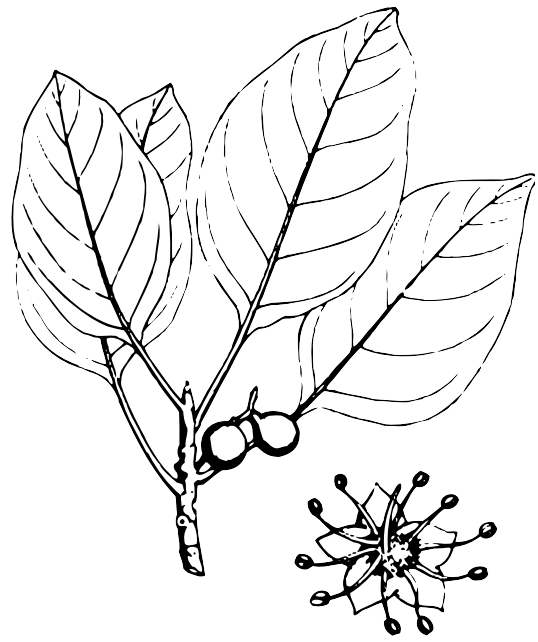
এই ফলের বীজের মধ্যে Gallic acid নামক Phenolic compound-এ অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট থাকায় এটি স্থূলতা রোগ এবং ক্যানসার প্রতিরোধের ক্ষমতা সম্পন্ন।

ভারতীয় আয়ুর্বেদে হরিতকীর সঙ্গে একসঙ্গে আমলা অর্থাৎ আমলকির নাম উচ্চারিত হয়। বহেড়ার ফল ত্রিফলা তৈরির একটি অত্যাবশকীয় উপাদন। পেটের সমস্যা ও পেট পরিষ্কারে ত্রিফলা ব্যবহৃত হয়। এই ফলে রোগ-জীবাণুনাশক পদার্থ থাকায় শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। নব যৌবন লাভ করতে ও চুলের বৃদ্ধিতে বহেড়া খুবই উপকারী। গাঁটের ফোলা ও বাতের ব্যাথার উপশমে বহেড়ার বীজের তেল খুব কার্যকর। চোখের রোগেও এই ফলের কাথ ব্যবহৃত হয়। বহেড়া ফলের চূর্ণ ক্ষুধামন্দা, গ্যাসের সমস্যা, অর্শ রোগের ক্ষেত্রে উপকারী ওষুধ। বমি করাতেও এই ফল ব্যবহার করা হয়। বহেড়া ফলের রস উত্তেজক এবং মূত্রঘটিত রোগে (Renal diseases) এটি ব্যবহৃত হয়। ফুসফুসের, পিত্ত ও কফের সমস্যার নিরাময়ে বহেড়া খুবই উপকারী। গাছের ছাল হার্টের সমস্যায় ব্যবহৃত হয়। বীজের শাঁস (Kernel) সুপারির সঙ্গে খেলে নেশা হয়। ভেড়ায় মাদকজাতীয় পদার্থ (Narcotic) বর্তমান। বহেড়া ফলে যক্ষা ও এইডস প্রতিরোধক ক্ষমতা রয়েছে।

এইসব বিভিন্ন ভেষজ গুণের কারণে দিন দিন বহেড়া গাছের চাহিদা বেড়েই চলেছে। তাই বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে Agro forestry,

Social forestry প্রভৃতি প্রকল্পে সরকার, স্থানীয় প্রশাসন (Panchayet বা বেনিফিসিয়ারি কমিটি গঠন করে) বনাঞ্চলের বাসিন্দাদের অংশীদারীত্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে একদিকে বনসৃজন ও অরণ্য বৃদ্ধি বা Aforrestation-এর লক্ষ্যে ও অন্যদিকে অরণ্যে বসবাসকারী মানুষের আর্থিক উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়া বহেড়া গাছের পাতায় ৯-১৪% ক্রুড প্রোটিন রয়েছে, যা সিল্কমথ (Anthora mylitta) পালনে ব্যবহৃত হয়। এই গাছের কাঠ উন্নত আসবাবপত্র তৈরি করার উপযুক্ত নয়। তবে নৌকা ও সাধারণ মানের আসবাবপত্রে তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। উপযুক্তভাবে season করতে পারলে এই কাঠ দীর্ঘস্থায়ী হয়। যদিও বহেড়া গাছের কাঠ জ্বালানীর পক্ষে খুব উন্নত। প্রতি কেজি কাঠ থেকে ৫ হাজার কিলো ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায় এবং এই কাঠ চারকোল তৈরির উপযুক্ত।



জাত পরিচিতি –

বহেড়ার কোনও হর্টিকালচারাল জাতের (Variety) উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন অরণ্য বিশেষে ফলের আকারে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

তথ্যসূত্র - http://www.worldagroforestry.org/treedb/AFTPDFS/Terminalia_bellirica.PDF, http://cropsfordrylands.com/wp-content/uploads/Propagation-Techniques-of-Commerciall



অ্যালোভেরা

পরিচয় –

ঘৃতকুমারীর বিজ্ঞানসম্মত নাম Aloe vera, অতীতে ঘৃতকুমারীকে Aloeceae গোত্রের উদ্ভিদ হিসাবে গণ্য করা হত। কিন্তু বর্তমানে এই উদ্ভিদকে Asphodelaceae গোত্রের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আবার ব্যাপক অর্থে এটি হল Liliaceae গোত্রের উদ্ভিদ। Agave Americana নামের উদ্ভিদ, যাকে অনেক সময় 'আমেরিকান অ্যালো' বলা হয়। যা আবার নামের ভিন্ন Asparagaceae একটি গোত্রের উদ্ভিদ।

এই উদ্ভিদের বাংলা নাম ঘৃতকুমারী হলেও, অ্যালোভেরা নামটিও আজ সুপরিচিত। আর এই অ্যালোভেরা নামটি এসেছে লাতিন ভাষা থেকে। ইংরেজিতে একে Medicinal aloe বা Burn plant বলে। অ্যালোভেরা পৃথিবীর রুক্ষ, উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের একটি রসালো প্রজাতির বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। এর আদি জন্মস্থান আফ্রিকার মরুভূমি অঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে অবস্থিত দ্বীপ মাদাগাস্কার। কথিত রয়েছে, মিশরের রানি ক্লিওপেট্রার সৌন্দর্য্যের গোপন রহস্য ছিল এই ছোট সবুজ উদ্ভিদ। মিশরের লোককথায় এর উল্লেখ রয়েছে।

অ্যালোভেরা দেখতে অনেকটা আনারস গাছের মতো। গাছের পাতাগুলি পুরু। দু'ধারে করাতের মতো কাঁটা থাকে। ভেতরে লালার মতো এক ধরনের পিচ্ছিল শাঁস থাকে। একে অ্যালোভেরা জেল বলা হয়। এটি উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের উদ্ভিদ হওয়ায় নিয়মিত সেচের প্রয়োজন হয়। তবে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হয় কখনই যেন গাছের গোড়ায় জল না জমে। ছায়াযুক্ত জায়গায় অ্যালোভেরা জন্মায় না, কারণ এই গাছের জন্য দিনভর রোদের প্রয়োজন হয়। সাধারণত সব ধরনের মাটিতেই অ্যালোভেরা চাষ সম্ভব। তবে দোঁয়াশ ও অল্প বালি মিশ্রিত মাটিতে এই গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। যদিও লবণাক্ত ও খুব বেশি অম্লীয় মাটিতে অ্যালোভেরা ভাল হয় না। এঁটেল মাটিতে এর চাষ না করাই ভাল।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

সাধারণত শিকড় থেকে গজানো নতুন পাতা থেকে এই গাছের বংশবৃদ্ধি হয়। ঘৃতকুমারী চাষ করতে হলে জমি প্রথমে ভাল করে পরিষ্কার করে চাষ দিয়ে নিতে হয়। চাষের সময় প্রতি হেক্টর জমিতে ১০-১২ টন গোবর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। এছাড়া এসময় প্রতি হেক্টর জমিতে ২২৫-২৫০ কেজি TSP ও ৭৫-১০০ কেজি MOP সার দিতে হবে। অ্যালোভেরা চাষীরা সাধারণত বেশি করে গোবর সার দিয়ে ব্যবহার করেই চাষ করেন। খুব কম চাষীই এই চাষে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করেন। অনেকে আবার প্রচুর ছাই ব্যবহার করে থাকেন। তবে কেউ কেউ বিঘা প্রতি ২৫-৩০ কেজি TSP (ট্রিপল সুপারফসফেট) এবং ১০ কেজি MOP (পটাসিয়াম ক্লোরাইড) সার জমি প্রস্তুতের সময় ব্যবহার করেন। সার মেশানোর পর জমিতে চারা লাগানোর জন্য বেড তৈরি করতে হবে। বেড হবে ১.৫-২.২৫ মিটার চওড়া। প্রতি দুটি বেডের মাঝে ৪০-৫০ সেমি নালা তৈরি করতে হবে। মূলত তিনভাবে ঘৃতকুমারীর চারা রোপণ করা যেতে পারে। যেমন, গাছের গোড়া থেকে গজানো পাতা কেটে, গাছের গোড়ার অংশ পুরোটা কেটে বা Root sucker পদ্ধতিতে। তবে বাণিজ্যিকভাবে চাষের ক্ষেত্রে Root sucker পদ্ধতি খুব একটা সহজ বা লাভজনক নয়। পুরনো গাছের গোড়া থেকে গজানো পাতাকে মূল গাছ থেকে আলাদা করে প্রথমে একখণ্ড জমিতে বা বেডে লাগানো হয়। সেখানে এসব চারা ২-৩ মাস লালন-পালন করে বড় করা হয়। পরে চাষ দেওয়ার পর ওই চারাগুলিকে মূল জমিতে লাগানো হয়। এই পদ্ধতিতে তৈরি চারা খুব ভাল হয়। তবে এভাবে রোপণ করলে পাতা তোলার জন্য ৬ মাস অপেক্ষা করতে হয়। তাই বাণিজ্যিকভাবে চাষের ক্ষেত্রে চাষীরা পুরনো গাছের অংশ পুরোটা কেটে লাগানোটাই বেশি পছন্দ করেন। এতে দ্রুত পাতাও তোলা যায়। এভাবে গাছ লাগালে ৩ মাসের মাথায় পাতা তোলা যায়। অনেকদিন জমিতে থাকার পর একই গাছ থেকে উপর্যুপরি পাতা তোলার পর গাছের গোড়া যখন লম্বা হয়ে যায় এবং গাছ যখন খাড়া থাকতে পারে না, তখন গাছ কেটে ২-৩টি পাতা কেটে রোপণ করা যেতে পারে। তবে চারা হিসাবে লাগানো পাতাগুলি যেন সুস্থ-সবল হয় সে দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

চারা সাধারণত সারি করে লাগানো হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৭ ইঞ্চি হয় এবং প্রতি সারিতে ৬ ইঞ্চি দূরত্বে চারাগুলি লাগানো হয়। ১.৫ মিটার চওড়া বেডে দুটি সারিতে ও ২.২৫ মিটার চওড়া বেডে তিনটি সারিতে চারা রোপণ করা হয়। এক বিঘা জমিতে প্রায় ৩৬০০টি চারা রোপণ করা যায়। বছরের যে কোনও সময় ঘৃতকুমারীর চারা লাগানো যায়। ইংরেজির জুন মাস বা বাংলার আষাঢ় মাসের শুরুতে গাছ লাগালে তার বৃদ্ধি সবচেয়ে দ্রুত হয়। তবে শীত ও বর্ষাকালে চারা না লাগানোই ভাল। সাধারণত

কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে চারা সবচেয়ে বেশি লাগানো হয়। কারণ ওই সময় চারা লাগালে শীত থাকতে থাকতে গাছ মাটিতে ভালভাবে লেগে যায়। আর শীতের সময় বাজারে অ্যালোভেরার চাহিদাও খুব একটা থাকে না। এরপর বসন্তকালে গাছ যখন নতুন পাতা ছাড়তে শুরু করে, তখন শুরু পাতা সংগ্রহ করা। এইভাবে চারা রোপণ করলে বেশি পাতা পাওয়া যায়।



পরিচর্যা –

অ্যালোভেরা চাষে সাধারণত কোনও রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয় না। রাসায়নিক সারের পরিবর্তে খোল বা নিমের খোলের মতন জৈবসার ব্যবহার করা যেতে পারে। জমি প্রস্তুত করে নিয়ম অনুযায়ী, ঘৃতকুমারী চাষ করতে হয়। সাধারণত ভেজা মাটিতে এই গাছে বৃদ্ধি খুব ভাল হয়। যদি ইউরিয়া সার দিতে হয়, তাহলে বছরে একবার সব ইউরিয়া সার জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে জমিতে ছিটিয়ে দিলেই চলে। সার ছিটানোর পর আগাছা নিড়িয়ে মাটির সাথে সার মিশিয়ে দিতে হয়। আবার বেশি ইউরিয়া সার দিলে রোগের আক্রমণ ও প্রকোপ বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে নিয়মিত সেচ লাগলেও, নজর রাখতে হয় জমিতে যেন জল না জমে যায়। শুষ্ক মরসুমে জমিতে প্রয়োজন মাফিক সেচ দিতে হবে। ঘৃতকুমারী গাছ জমিতে প্রায় দু'বছর থাকে। তাই দ্বিতীয় বছরেও প্রথম বছরের মতো একই হারে জমিতে সার ও সেচ প্রয়োগ করতে হয়।

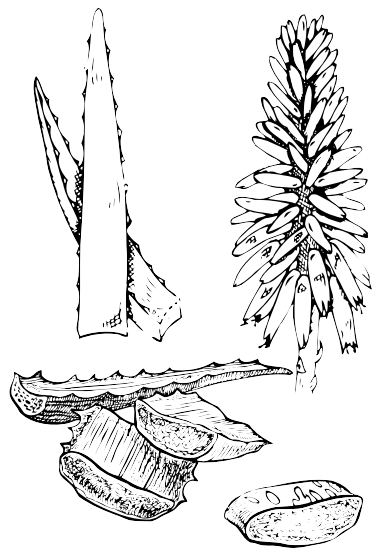
পাতায় দাগ পড়া ঘৃতকুমারী গাছের ক্ষেত্রে এক প্রধান সমস্যা। শীতকালে এই রোগ কম থাকে। কিন্তু শীত শেষে ফাল্গুন মাসে আবার এই রোগের প্রকোপ বেড়ে যায় এবং পাতার ব্যাপক ক্ষতি হয়। এই রোগের আক্রমণে পাতার অগ্রভাগে আলপিনের মাথার মতো ক্ষুদ্র এক বিন্দুর মতো দাগ দেখা যায়, সেখান থেকে আঠার মতো এক ধরনের রস বের হয়। ওই আঠা শুকিয়ে পাতায় বাদামি দাগের সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে পাতার ওই দাগ বড় হতে থাকে ও দাগের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। মনে করা হয়, ব্যাকটেরিয়া জনিত কারণে এই রোগ হয়। তাই এক্ষেত্রে ছত্রাকনাশক স্প্রে করে তেমন সুফল পাওয়া যায় না। এই রোগের কারণে পাতা এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে, তার বাজারমূল্য কমে যায়। তবে যে চাষীরা বাণিজ্যিকভাবে ঘৃতকুমারী চাষ করেন, ১৫ দিন পরপর জলে চুন গুলে স্প্রে করে থাকেন। এছাড়া গোড়া পচা রোগের কারনে ঘৃতকুমারী গাছের গোড়া পচে যায়। পরে গাছটি মরে যায়। বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় জল জমে থাকলে বা ভেজা থাকলেও গোড়া পচা রোগ হতে পারে। ছত্রাকনাশক স্প্রে করলে এই রোগের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। তবে এই গাছে সাধারণত কোনও পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা যায় না। তবে মাঝেমাঝে ছাতরা পোকা, জাব পোকা, স্কেল পোকা, লাল মাকড় ইত্যাদির আক্রমণ হতে পারে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

ঘৃতকুমারী চারা লাগানোর ২-৩ মাস পর থেকেই পাতা তোলা শুরু করা যায়। সারা বছর ধরেই গাছে নতুন পাতা জন্মায়। সাধারণত ১৫ দিন অন্তর একটি করে নতুন পাতা বের হয়। তবে বছরে ৯-১০ মাস পাতা তোলা যায়। একটি গাছ থেকে ৬০-৭০টি পর্যন্ত পাতা সংগ্রহ করে বিক্রি করা যায়। মাসে নির্দিষ্ট কোনও একটি গাছ থেকে ১-২টি পাতা তোলা যায়। তবে বৃদ্ধি যদি খুব ভাল হয় তবে এক্ষেত্রে ২টি পাতা তোলা যায়। শীতকালে এই গাছ থেকে পাতা তোলা বন্ধ থাকে। পাতা তোলার পর তা জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে ছায়ায় শুকিয়ে আঁটি বেঁধে বাজারে বিক্রি করা যায়। অ্যালোভেরা একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভেষজ ঔষধি গাছ। এই গাছে ২০ ধরনের খনিজ পদার্থ রয়েছে। এছাড়া মানবদেহের অতি প্রয়োজনীয় ২২টি অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে ৮টি এতে রয়েছে। পাশাপাশি অ্যালোভেরায় ভিটামিন – A, ভিটামিন – B1, ভিটামিন – B2, ভিটামিন - B6, ভিটামিন - B12, ভিটামিন – C ও ভিটামিন – E রয়েছে।

এই গাছ অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, অ্যান্টি-ফ্লামেটরি, অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল ও অ্যালোমিনের মতন ঔষধি উপাদানে সমৃদ্ধ। যা শরীরের পাশাপাশি ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্যরক্ষায় খুবই উপকারী। ত্বকের সুরক্ষার বাজারে অনেক ক্রীম, লোশন প্রভৃতি রয়েছে, যার অন্যতম প্রধান উপাদান অ্যালোভেরা। এছাড়া ব্রণ নিরাময়ের ক্রীম, দাগের ওষুধ হিসাবে ভিটামিন – ক্যাপস্যুলের সঙ্গে অ্যালোভেরা মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়। নিয়মিত অ্যালোভেরার সরবত পান করলে অনেকাংশে চুল পড়া ও খুসকি কমে। চুল লম্বা করতেও সাহায্য করে অ্যালোভেরা। এতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকায় এটি শরীরের ওজন কমায়। অ্যালোভেরা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, পাকস্থলী ভাল রাখে ও শরীরকে ঠাণ্ডা রাখে। শিশুদের অ্যালোভেরা খাওয়া উচিত নয়। কিশোর বয়স থেকে এটি খাওয়া যেতে পারে। তবে কী পরিমাণে খাবেন, কখন খাবেন, কতদিন খাবেন তা অবশ্যই চিকিৎসকের থেকে জেনে নিতে হবে।

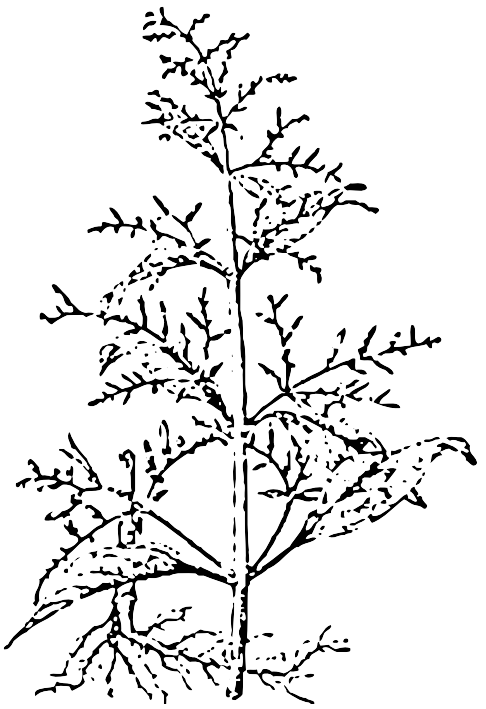
এক বিঘা জমিতে অ্যালোভেরা চাষে বছরে প্রায় ৬০-৮০ হাজার টাকা খরচ হয়। বাজারজাত করার জন্য ৫০-৫৫ কেজি ওজনের অ্যালোভেরার পাতার বাণ্ডিল করা হয়ে থাকে। এধরনের ৬টি বাণ্ডিলের বাজার দর ১৮০০-২০০০ টাকা। এই হিসাব অনুযায়ী, এক বিঘা জমি থেকে ১.৫-২ লাখ টাকার পাতা বিক্রি করা সম্ভব।



জাত পরিচিতি –

বিভিন্ন জাতের অ্যালোভেরার উল্লেখ পাওয়া যায়। Kokoerbom aloe, Gold tooth, Orange aloe, Red aloe, Dorian black এবং Yellow teeth পৃথিবীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জাতের অ্যালোভেরা।

তথ্যসূত্র – https://en.wikipedia.org/wiki/Aloe_vera, www.agrifarming.in এবং www.bari.gov.bd



কালমেঘ

পরিচয় –

কালমেঘ গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Andrographis paniculata, এটি Acantaceae গোত্রের একটি তৃণ জাতীয় পর্ণমোচী উদ্ভিদ।

কালমেঘ ভারতের একটি দেশজ উদ্ভিদ। গাছটি মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং কেরালায় দেখা যায়। মধ্যপ্রদেশে ব্যাপকভাবে কালমেঘের চাষ হয়।

কালমেঘ অতি সহনশীল প্রজাতির উদ্ভিদ এবং প্রাচীনকাল থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ ঔষধি গাছ হিসাবে ব্যবহার হয়ে আসছে। এই উদ্ভিদটি ওয়েস্ট ইন্ডিজে রাইস বিটার নামে এবং ইংল্যান্ডে কিং অফ বিটার ও চিরেত্তা নামে পরিচিত। কালমেঘের তাজা ও শুকনো পাতা ভারতেও ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কালমেঘ গাছ একটি তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ, উচ্চতায় ৩০-১১০ সেমি হয়। শাখাগুলি চতুর্ভূজ আকৃতির এবং সামনের অংশ ছোট হয়। গাছের পাতাগুলি কিছুটা সূঁচালো হয়। পাতাগুলি লম্বা-চওড়ায় ৫-৮ সেমি ও ১-১.২৫ সেমি হয়। ফুলগুলি ছোট ছোট একলিঙ্গ হয় এবং গোলাপী বর্ণের লোমশ দলমণ্ডল দ্বারা আবৃত থাকে। সাধারণত অক্টোবর-মার্চ মাসে কালমেঘ গাছে ফুল আসে। ফলগুলি ২০ মিলিমিটার দীর্ঘ এবং ৩ মিলিমিটার চওড়া হয়। ফলগুলি রৈখিক-আয়তাকার এবং দু'প্রান্ত তীক্ষ্ণ হয়।

কালমেঘ গাছে অক্টোবর-মার্চ মাসে ফল আসে। একটি ফলে হলদে-বাদামি বর্ণের অনেকগুলি মসৃণ বীজ থাকে।

উষ্ণ এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল কালমেঘ চাষের জন্য উপযুক্ত। শীতল আবহাওয়া এবং ভাল বৃষ্টিপাত কালমেঘে জন্য আদর্শ। তবে কালমেঘ আর্দ্র, ছায়াময় স্থান এবং শুষ্ক অঞ্চলেও বেড়ে ওঠে।

বিভিন্ন ধরনের মাটিতে কালমেঘ চাষ করা যেতে পারে। ফসলের বৃদ্ধির জন্য জৈবসারযুক্ত এঁটেল এবং বেলে-দোয়াঁশ মাটি উপযুক্ত। চাষের জমিতে ভাল জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকা উচিত।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

জমিতে সরাসরি বীজ বপন করে কালমেঘের চাষ করা যেতে পারে। বীজ বপনের সময় প্রতিটি খাঁজে ৩-৪টি বীজ দিতে হয়। দেখতে হয় প্রতিটি গাছের মধ্যে যেন কমপক্ষে ১৫ সেমি দূরত্ব বজায় থাকে।

নার্সারীতে ১ : ১ : ১ অনুপাতে মাটি, বালি ও জৈবসারের মিশ্রণ দিয়ে পলিথিন প্যাকেটে মাটি ভরে বীজ বপন করা হয়। এরপর ওই প্যাকেটগুলিতে প্রতিদিন জল দিতে হয়।

নার্সারীতে চারা তৈরি হওয়ার আগে ভাল করে চাষ দিয়ে মূল জমিটিকে প্রস্তুত করতে হয়। শেষবার জমিতে চাষ দেওয়ার সময় হেক্টর প্রতি ২৫ টন জৈবসার ভাল করে মাটিতে মিশিয়ে চাষ দিতে হবে।

অঙ্কুরোদগমের পর নার্সারীতে চারাগুলির বয়স ৪৫-৫০ দিন হলে তা প্যাকেট থেকে তুলে মূল জমিতে রোপণ করতে হবে। চারাগুলি অন্যত্র স্থানান্তরের ক্ষেত্রে দুটি চারার অর্ন্তবর্তী দূরত্ব ৩০ X ১৫ সেমি বা ১৫ X ১৫ সেমি করা যেতে পারে। তবে চারাগুলির অন্তর্বর্তী দূরত্ব ১৫ X ১৫ সেমি রাখলে তা সবচেয়ে উপযোগী হয়।

জুন মাস কালমেঘ চাষের উপযুক্ত সময়। প্রতি হেক্টর জমিতে কালমেঘ চাষের জন্য ৪০০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন।

পরিচর্যা –

কালমেঘ একটি বর্ষাকালীন ফসল। তাই এই চাষে খুব বেশি সেচের প্রয়োজন হয় না। প্রাথমিক পর্যায়ে ৩-৪ দিন অন্তর সেচ দিতে হয়। পরবর্তী পর্যায়ে সপ্তাহে একবার সেচ দেওয়া যেতে পারে, তবে অবশ্যই আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে।

কালমেঘ চাষে জমিতে সার প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। প্রতি হেক্টর জমিতে ২৫ টন জৈবসারের সঙ্গে ৭৫ কেজি নাইট্রোজেন, ৭৫ কেজি ফসফরাস অক্সাইড এবং ৫০ কেজি পটাসিয়াম অক্সাইড মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। এই পরিমাণ সারের



৫০% নাইট্রোজেন এবং সম্পূর্ণ পরিমাণ ফসফরাস পেন্টা-অক্সাইড (P205) এবং (K20) প্রাথমিক ধাপে প্রয়োগ করতে হয়। বাকি ৫০% নাইট্রোজেন বীজ বা চারা রোপণের ৩০ দিন পর জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

আগাছা দমন সাধারণভাবে হাতের সাহায্যেই করা হয়ে থাকে। রোপণের ২০-৩০ দিন পর প্রথম আগাছা দমন করা হয়। ৬০ দিন পর ১-২ বার আগাছা দন্নের প্রয়োজন হয়। তবে প্রতিবার ফসল তোলার পর অবশ্যই আগাছা দমন করতে হয়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

গাছের সমগ্র অংশটাই আমাদের নানান প্রয়োজনে লাগে। তাই গোটা কালমেঘ গাছটি ফসল হিসাবে বিবেচিত হয়।

বীজ বপনের বা চারা রোপণের পর ৯০-১২০ দিন পর কালমেঘ থেকে প্রথমবার ফসল পাওয়া যায়। ফসল তোলা বলতে, গোটা কালমেঘ গাছটি কেটে নেওয়া অথবা নীচ থেকে ১০-১৫ ছেড়ে রেখে উপরের বাকি অংশটি কেটে নেওয়া।

প্রতি হেক্টর জমি থেকে ২-২.৫ টন কালমেঘের শুকনো ওষুধ প্রস্তুত হতে পারে।

তাজা কালমেঘ পাতার রস কলেরা নিরাময়ে ভাল কাজ করে। এই গাছের শুকনো পাতা ফোটানো জল খেলে কৃমি নিরাময় হয়। যায়। শরীরের দুর্বলতা কমাতে কালমেঘ খুব উপকারী। এছাড়া উচ্চ রক্তচাপ কমাতে, রক্তাল্পতা ও কুষ্ঠ রোগের প্রতিরোধে কালমেঘ ব্যবহৃত হয়। কালমেঘ গাছের কাণ্ড খুব শক্তিশালী টনিক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। গাছের ছালের গুঁড়ো লিভার ও ত্বকের সমস্যার সমাধানে খুব কার্যকরী। ভারতে পুরো কালমেঘ গাছটি সাপের কামড়ের চিকিৎসায় ব্যবহার হয়ে থাকে।

কালমেঘের টাটকা ও শুকনো শিকড় একসঙ্গে আঁটি বেঁধে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে লেগে থাকা মাটি ঝেড়ে নেওয়া হয়। এরপর শুষ্ক ওই শিকড়ের আকার, আয়তন বা কতটা টাটকা তা বিচার করে আলাদা আলাদা ভাগে ভাগ করা হয়।

মূলগুলি সব সময় শুষ্ক জায়গায় রাখা উচিত। শুকনো শিকড় দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষণ করা যায়। এক্ষেত্রে অ্যালুমিনিয়ামের বাক্স ব্যবহার করা ভাল।

সাধারণত কৃষকরা গরুর গাড়ি বা ট্র্যাক্টর ব্যবহার করে উৎপাদিত দ্রব্য নিকটবর্তী বাজারে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। বাজার থেকে লরি বা ট্রাক করে দূরবর্তী বাজারে পাঠানো হয়।

তথ্যসূত্র – wikipedia and others



চন্দন

পরিচয় –

চন্দন গাছের (শ্বেত চন্দন) বিজ্ঞানসম্মত নাম Santalum album,এটি Santalaceae গোত্রের দ্বিবীজপত্রী বহুবর্ষজীবী চিরহরিৎ বৃক্ষ।

ভারতই এই গাছের আদি জন্মস্থান। ভারতীয় উপমহাদেশের কিছু দেশে চন্দন গাছ জন্মাতে দেখা যায়। বর্তমানে চিন, নেপাল, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনস্ দ্বীপপুঞ্জ, পাকিস্তান ও উত্তর অস্ট্রেলিয়ায় এই গাছ রোপণ করা হয়েছে। ভারতে কেবলমাত্র কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে এই গাছ স্বাভাবিকভাবে জন্মায়। ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও রোপণের মাধ্যমে এই গাছের বিস্তার ঘটানো শুরু হয়েছে।

International Union for The Conservation of Nature (IUCN) চন্দন গাছকে অবলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। নির্বিচারে অতিরিক্ত চন্দন গাছ কেটে ফেলা, বিদেশে রফতানি এবং জঙ্গল থেকে চোরা পথে পাচারের ফলে চন্দন গাছ বর্তমানে এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। অতি মূল্যবান এই চন্দন কাঠকে কেন্দ্র করে চন্দন চাষের রাজ্যগুলিতে ব্যাপকভাবে আইনশৃঙ্খলাজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার আইন সংশোধন করে ব্যক্তিগতভাবে চন্দন গাছ চাষ করে বিদেশে চন্দন কাঠ রফতানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এছাড়া চন্দন কাঠ চুরি বা পাচার রুখতে জামিন অযোগ্য ধারায় আইন প্রণয়ন করে এই মূল্যবান গাছটির অস্তিত্বরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চন্দনকে সংস্কৃত, কন্নড়ে ও মালায়লমে চন্দনম, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় চন্দন, তামিল ভাষায় ইঙ্গাম এবং তেলেগুতে চন্দনমু বলা হয়। এছাড়া এই গাছ সফেদ চন্দন স্যান্ডাল (Sandal), শ্রীগন্ধা, অনিন্দিতা, অরিস্থা, ভদ্রশ্রয়া, সর্পভাসা, চন্দ্রকান্তা, গন্ধসারা নামেও পরিচিত।

চন্দন গাছ একটি ছোট আকৃতির চিরহরিৎ বৃক্ষ। উচ্চতায় ২০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। কাণ্ডের বেড় ২-৪ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। কাণ্ডের ছাল বা ত্বক গাঢ় বাদামি, ধূসর অথবা কালচে রঙের হয়ে থাকে। কাণ্ডের ত্বক ফাটাফাটা ও অমসৃণ হয়। গাছের পাতাগুলি সাধারণত বিপরীতমুখীভাবে সজ্জিত থাকে। পাতাগুলি ডিম্বাকার বা আয়ত-ডিম্বাকার, লম্বা-চওড়ায় ৩-৮ X ৩.৫ সেমি হয়ে থাকে। পাতাগুলি হালকা সবুজ বর্ণের ও মসৃণ হয়। পাতাগুলির ৫-১৫ সেমি লম্বা বৃন্ত থাকে। ফুলগুলি ছোট, লালচে বাদামি রঙের হয়। ৪-৬ মিলিমিটার লম্বা হয়। ফুলগুলি শাখাপ্রশাখার অগ্রভাগ থেকে শাখাপ্রশাখা যুক্ত মঞ্জরীদণ্ডের উপর জন্মায়। ফলগুলি গোলাকার ও নরম ড্রুপ প্রকৃতির। ফলগুলি কাঁচা অবস্থায় সবুজ রঙের হয়, পাকলে কালচে লাল বর্ণের হয়ে যায়। ফলের আকার ১ সেমি ব্যাসের হয়ে থাকে। ফলগুলি প্রায় বৃন্তহীন, ফলে একটি মাত্র বীজ থাকে।

চন্দন গাছের জন্য আর্দ্রতাযুক্ত গরম জলবায়ুর প্রয়োজন হয় চন্দন গাছের জন্য ১২-৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা উপযুক্ত। সমুদ্রতল থেকে ৬০০-১০৫০ মিটার উচ্চভূমিতে চন্দন গাছ জন্মাতে দেখা যায়।

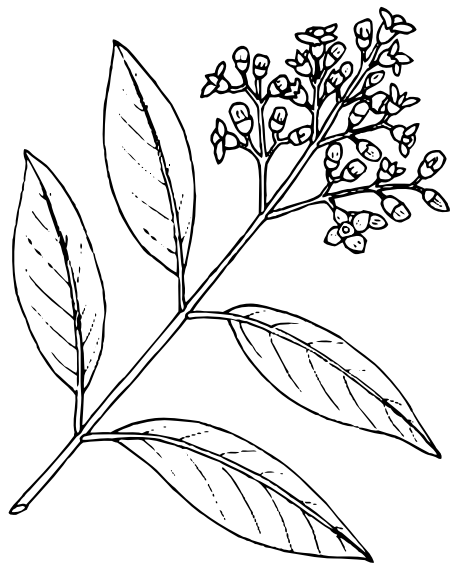
উন্নত নিকাশীযুক্ত, জৈব পদার্থ মিশ্রিত সব ধরনের মাটিতে চন্দন গাছ জন্মাতে পারে। বালি মিশ্রিত লাল দোঁয়াশ মাটিতে চন্দন গাছের বৃদ্ধি দ্রুত হয়। বাণিজ্যিকভাবে চন্দন গাছের চাষ করতে হলে মাটি পরীক্ষা করে তবেই চাষ করা উচিত। চন্দন গাছ অল্প ক্ষার মৃত্তিকাতেও ভাল জন্মায়। মাটির অম্লতা ও ক্ষারীয় মাত্রা ৬.৫–৭.৫ PH চন্দন গাছের পক্ষে উপযুক্ত।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

সাধারণত বীজের দ্বারাই চন্দন গাছের প্রসারণ ঘটানো সম্ভব। এক্ষেত্রে ১৫–২০ বছর বয়সের চন্দন গাছের থেকে পাকা ফল সংগ্রহ করা হয়। নার্সারীর বেডে উপযুক্ত মাটি তৈরি করে মাটিতে জৈবসার মিশ্রিত করে জমির থেকে একটু নিচু বেডে বা জমির লেভেল থেকে কিছুটা উঁচু করে বেড বানিয়ে বীজ বপন করা হয়। নিয়মিত পরিচর্যা, পরিমাণ মতো জল স্প্রে করে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঘটানো হয়। চারাগাছগুলি নার্সারীতে উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে ৭-৮ মাস পরে অন্যত্র রোপণের উপযুক্ত হয়ে যায়। পলিব্যাগের মধ্যে বীজ বপন করে চারাগুলি তৈরি করে পরিচর্যা করলে তা দূরবর্তী স্থানে নিয়ে গিয়ে রোপণ করার পক্ষে সুবিধাজনক হয়।

চন্দন গাছ চাষের জন্য নির্দিষ্ট জমিতে আড়ে ও লম্বায় মই দিয়ে মাটি গুঁড়িয়ে এবং জমির ঢাল বজায় রেখে জমি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। জমিতে ঝোপঝাড় চাষ করার আগেই কেটে ফেলতে হয়।

সাধারণত ৩ মিটার দূরত্বে ৪৫ X ৪৫ X ৪৫ সেমি আয়তনের গর্ত কেটে ২-৪দিন রোদে শুকিয়ে ফেলে রাখা হয়। গর্তের মধ্যে



বৃষ্টির জল যাতে না জমে সেই দিকে খেয়াল রাখতে হয়। গর্তের মাটির সঙ্গে জৈবসার (FYM), নিম খোল, পাতা পচা সার ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়।

নার্সারীর বেডের বা পলিব্যাগের চারাগুলি ৭-৮ মাসে ৩০-৪০ সেমি লম্বা হয়ে গেলে নির্দিষ্ট দূরত্বে তৈরি করা গর্তের মধ্যে রোপণ করা হয়। চারাগাছগুলিকে লাঠি বা কঞ্চির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়, যাতে সোজাভাবে থাকে। বছরের যে কোনও সময় চন্দন গাছের চারা রোপণ করা যায়। রোপণের পর যতদিন না গাছগুলি মাটির সঙ্গে ভালভাবে ধরে যায় ততদিন গাছের গোড়ায় অল্পঅল্প জল দিতে হয়।

পরিচর্যা –

বর্ষাকাল বাদে চন্দনের বাগানে ২-৩ সপ্তাহ ছাড়া জমির আর্দ্রতা অনুযায়ী সেচ দিতে হয়। বেশি জলসেচ চন্দন গাছের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাই ড্রিপ ইরিগেশনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় জলসেচ গাছের পক্ষে উপকারী হতে পারে। চন্দন গাছে জৈবসার যেমন, FYM, নিম খোল, পাতা পচা সার, ভার্মি কম্পোষ্ট প্রভৃতি প্রয়োগ করা হয়।

চন্দন গাছের বাগানে নিয়মিতভাবে মাটি কুপিয়ে আগাছা পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়। গাছটিকে সোজাভাবে লম্বায় বড় করে তোলার জন্য কাণ্ডের নীচের দিকের অবাঞ্ছিত ডালপালা ছাঁটাই করে দিতে হয়।

Hyposidra talaca (মথের লার্ভা), Eumeta crameri (মথ জাতীয় পতঙ্গ), Tajuria cippus (প্রজাপতি জাতীয় পতঙ্গ), Teratodes monticollis (ফড়িং জাতীয় পতঙ্গ), Toxoptera aurantii (পোকা) সহ চন্দন গাছে বিভিন্ন ধরনের প্রায় ১২-১৩টি কীটপতঙ্গ সনাক্ত করা গেছে যেগুলি চন্দন গাছের পাতা খেয়ে পাতা ও কাণ্ডের ক্ষতিসাধন করে। সাধারণভাবে জৈবকীটনাশক প্রয়োগ করে এগুলি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। চন্দন গাছের পাতায় কালো দাগ, ছত্রাকঘটিত রোগ, Phytoplasma নামে একপ্রকার ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগের আক্রমণ এবং Phellinus noxius বা শিকড়ে পচন সৃষ্টিকারী ছত্রাকের আক্রমণ ঘটতে পারে। এই প্রকার ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগের প্রতিকারের জন্য জৈব ছত্রাকনাশক স্প্রে করে রোগের প্রতিরোধ করা হয়। বন দফতরের বা কৃষি গবেষণাগারের পরামর্শ অনুযায়ী এক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া যাতে পারে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

সাধারণত ৩০ বছর বয়সের চন্দন গাছ থেকে উৎকৃষ্ট মানের চন্দন কাঠ ও চন্দন তেল পাওয়া যায়। চন্দন গাছের শিকড় সমেত উপড়ে কাঠ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। কারণ মূল বা শিকড়ের কাঠও সুগন্ধযুক্ত হয়। চন্দন গাছের কাণ্ডের নরম কাঠ তুলে ফেলে কেন্দ্রস্থলের কাঠ টুকরো করে কেটে মেশিনে পাউডার বানানো হয়। ৪৮ ঘণ্টা এই পাউডার জলে ভিজিয়ে পাতন পদ্ধতিতে চন্দন তেল উৎপন্ন করা হয়।

পরিণত চন্দন গাছের কাণ্ড, ডাল, শিকড় কেটে টুকরো করে চন্দন পেস্ট বা চন্দন বাটার কাঠ হিসাবে ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করা হয়।

গাছের বয়স ও কাণ্ডের বেড়ের উপর চন্দন গাছের কাঠের বা হার্ট উডের উৎপাদন নির্ভর করে। একটি ৫০ বছর বয়সের গাছের কাণ্ডের বেড় যখন ৫৫ মিটার হয় তখন ওই গাছটি ৩০ কেজি হার্ট উড উৎপাদনে সক্ষম হয়। যদিও মাটি, গাছের পরিচর্যা ও জলবায়ু ভেদে এই উৎপাদনে তারতম্য ঘটতে পারে।

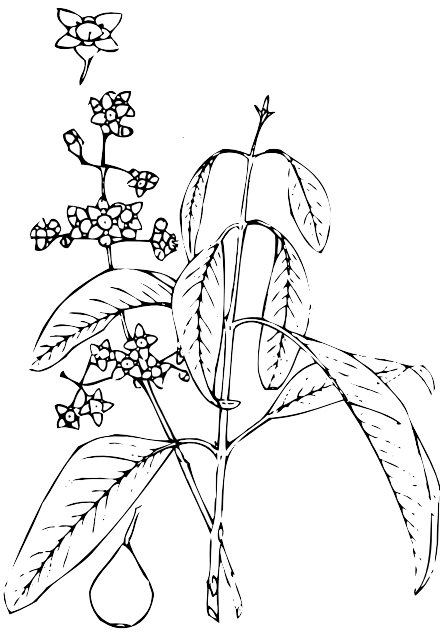
হিন্দু ধর্মের সমস্ত দেবদেবীর পুজোয়, প্রতিটি শুভ অনুষ্ঠানে যেমন জন্মদিন, অন্নপ্রাশন, ভাইফোঁটা, বিবাহ এমনকি মৃত্যু পরবর্তী ক্রিয়া সম্পাদনেও চন্দন কাঠের প্রয়োজন হয়। এছাড়া বৌদ্ধ, জৈন, সুফি, চাইনিজ, জাপানি, পারসিকদের ধর্মাচরণে চন্দন ব্যবহৃত হয়।

চন্দন পেস্ট বা লেই ও চন্দন তেল জ্বালাযন্ত্রণা কমায়। চন্দন তেল মানসিক অস্থিরতা দূর করে, রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণ করে, ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে এবং ত্বকের ক্ষত ও ত্বকে বয়সের ছাপ পড়াকে রোধ করে। শরীরের দুর্গন্ধ দূর করে। শিশুদের টনিক তৈরিতে চন্দনের তেল ব্যবহার করা হয়।

সুগন্ধী দ্রব্য তৈরিতে, প্রসাধনী ক্রিম ও সাবান তৈরিতে, চন্দন তেল তৈরিতে চন্দন কাঠ ব্যবহৃত হয়। ধূপ এবং পাউডার তৈরিতেও এর ব্যবহার হয়ে থাকে।

আজ নতুন করে দক্ষিণ ভারত ও দেশের অন্য রাজ্যগুলিতে চন্দন গাছ রোপণে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বর্তমানে এই মহামূল্যবান

চন্দন গাছ চাষের যে সুযোগ তৈরি হয়েছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে চন্দন কাঠের অভাব কিছুটা হলেও দূর হবে এবং চন্দন কাঠ রফতানি করে প্রচুর বিদেশি মুদ্রা অর্জন করাও সম্ভব হবে। হিসাব বলছে, জমির দাম ও উৎপাদন খরচ নিয়ে এক একর জমিতে ১৫ বছর ধরে চন্দন গাছের চাষ করতে মোট ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এক্ষেত্রে ১৫-২০ বছর পর ওই জমি থেকে ৫ হাজার কেজি কাঠ উৎপাদন সম্ভব হলে এবং প্রতি কেজি কাঠের দাম ৬ হাজার টাকা ধরলে মোট ৩ কোটি টাকা আয় হয়। অর্থাৎ মোট লাভ দাঁড়াবে ২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা।



জাত পরিচিতি -

Santalum album বা শ্বেত চন্দনের কোনও উন্নত জাত পরিচিতির তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে Santalum- গণের অনেকগুলি আলাদা প্রজাতির গাছ আছে, যা থেকে চন্দনের মতো সুগন্ধ পাওয়া যায়। যেমন, S. ellipticum, S. austrocaledonicum, S. acuminatum, S. lanceolatum, ইত্যাদি।

এছাড়া Leguminosae গোত্রের তিনটি গাছ চন্দন নামে পরিচিত। যেমন, Adenanthera pavonina, Baphia nitida এবং Pterocarpus santalinus (রক্ত চন্দন)।

তথ্যসূত্র – www.agrifarming.in

কাঠের গাছ



শাল

পরিচয় –

শাল গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Shorea robusta, এটি Dipterocarpaceae গোত্রের বৃক্ষ শ্রেণীর উদ্ভিদ।

শাল গাছের আদি জন্মস্থান ভারতে। ভারতীয় উপমহাদেশের উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের অনেক দেশেই শাল গাছ জন্মায়। ভারতের শিবালিক পর্বতমালার পশ্চিম দিকে যমুনা নদীর পূর্বদিকে, পূর্বঘাট পর্বতমালায়, বিন্ধ্যপর্বত ও সপ্তপুরা পর্বতের নিচু ধাপে শাল গাছ জন্মায়। মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, আসাম, ছত্তিশগড় ও পশ্চিমবঙ্গে শাল গাছ জন্মায়। অনেক দিন থেকে মানুষের ব্যবহারের জন্য শাল গাছ কাটা হয়ে আসছে। নগরায়ণ ও রেলপথ নির্মাণে, বিদ্যুৎ সরবরাহের খুঁটি, জাহাজ ও কারখানার শেড নির্মাণ প্রভৃতি কাজে ব্যাপকভাবে শাল গাছ ব্যবহারে এই গাছের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন হতে বসেছে।

International Union For Conservation Nature (ICUN) শাল গাছকে অবলুপ্ত হতে পারে এমন গাছের তালিকায় (Red data book) স্থান দিয়েছে। স্বাভাবক শাল-জঙ্গলে শাল গাছের সঙ্গে অনেক রকম গাছের ও প্রাণীর অস্তিত্বের সম্পর্ক রয়েছে, তাই শাল গাছের বিস্তার ও সংরক্ষণ অবশ্যই প্রয়োজন।

কথিত আছে, বৌদ্ধ ধর্মের ২৪তম তীর্থঙ্কর মহাবীর এই শাল গাছের নিচে বসে তপস্যা করেছিলেন। হিন্দুদের কাছেও শাল গাছ পবিত্র একটি গাছ। পুরাণ মতে, এই গাছ ভগবান বিষ্ণুর অতি পছন্দের ছিল। ভারতের বিভিন্ন উপজাতির মানুষেরা (সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি) তাদের বিভিন্ন উৎসব বা পার্বণে মাথায় শাল ফুলের মঞ্জরী লাগান।

সংস্কৃত ভাষায় শাল-অ, হিন্দি ও বাংলায় শাল, তামিল ভাষায় কুঞ্জিলিয়াম, তেলেগুতে সরজাকামু, মালায়লম ভাষায় মুলাপ্পুমারুতু নামে পরিচিত।

শাল গাছ একটি বিশাল গাছ। উচ্চতায় শাল গাছের কাণ্ড ৪০ মিটার পর্যন্ত এবং এর বেড় ২-২.৫ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। কাণ্ডের ছাল লালচে-বাদামি বর্ণের হয়। ছালটি কাঁটাযুক্ত হয় এবং পাতাগুলি সবৃন্তক ও একান্তরভাবে সজ্জিত, যা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ১০-৪০ X ৫-২৪ সেমি পর্যন্ত হয়। পাতাগুলি ডিম্বাকার বা আয়তকার। পাতাগুলি শক্ত ও চামড়ার মতো হয়। শাল গাছের পাতায় ছোট লম্বাকৃতির উপপত্র থাকে। পাতার উপরের ত্বক চকচকে মসৃণ ও নিচের দিকের পত্রশিরাগুলি সুস্পষ্ট হয়। শাখাপ্রশাখাযুক্ত পুষ্পমঞ্জরীতে ফুলগুলি জন্মায়। ফুলগুলি হালকা হলুদ বা ক্রীম রঙের হয়। ফুলের মাঝখানে গোলাপী বর্ণের দাগ থাকে। এর পুষ্পপত্রগুলি শীঘ্রই খসে পড়ে। বৃতিগুলি অসমান এবং ফলের সঙ্গে থেকে যায়। ৫টি বৃতির মধ্যে ৩টি বড় এবং ২টি ছোট। ফুলের পাপড়িগুলি প্যাঁচালো ধরনের হয় এবং রোমযুক্ত অসংখ্য পুংকেশর থাকে। ফলটি বাদাম আকৃতির ৫ X ১২ মিলিমিটারের হয়। শাল গাছে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ফুল আসে এবং মে-জুলাই মাসে ফল পুষ্ট হয়।

শাল গাছ উষ্ণ জলবায়ুর উদ্ভিদ। ভূপৃষ্ঠের ২০০০ মিটার উচ্চভূমিতেও শাল গাছ জন্মাতে দেখা যায়। ২৮-৩৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা শাল গাছের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু -১ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করেও শাল গাছ বেঁচে থাকতে পারে। শালের উপযুক্ত বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৫০০-৩৫০০ মিলিমিটার, আবার ৪-৮ মাস শুষ্ক জলবায়ুতেও বেঁচে থাকতে পারে।

উপযুক্ত নিকাশীর ব্যবস্থাযুক্ত উর্বর খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ মাটিতে শাল গাছ ভাল হয়। মাটিতে অম্লতা ও ক্ষারের মাত্রা ৫-৬.৭ PH এই গাছের পক্ষে উপযুক্ত। কিন্তু ৪.৫-৭.৫ PH বিশিষ্ট মাটিতেও এই গাছ জন্মাতে পারে।

শাল গাছের মূলের গোড়া থেকে চারা গাছ (শালফোঁড়) বের হয়। এগুলি মূল গাছের চারদিকে বেড়ে উঠতে থাকে। ৩০-৪০ বছর পর এগুলি কাটা যেতে পারে। একইভাবে এরপর আবার শালফোঁড় উৎপন্ন হতে থাকবে।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

কৃত্রিম পদ্ধতিতে শালের চারা তৈরি করে রোপণ করা খুব কঠিন। কারণ বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা অতি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। তাই

অতিরিক্ত যত্ন সহকারে নার্সারীতে শালের চারা তৈরি করতে হয়।



জুন মাসে পরিণত বীজ সংগ্রহ করে নিয়ন্ত্রিত গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় তাদের অঙ্কুরোদ্গম ঘটানো হয়। এরপর ওই বীজগুলিকে পলি ব্যাগের বালি মিশ্রিত মাটিতে রোপণ করা হয়। ৭-১০ দিনের মধ্যে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়ে চারা বের হয়। চারার মূলগুলি যেন পাকিয়ে না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রতিদিন জল স্প্রে করে পরিচর্যা করতে হয়। এক বছরের মধ্যে চারাগুলি মাটিতে রোপণের উপযুক্ত হয়ে যায়।

বর্ষার ঠিক পরেই শালের চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে তার আগে অবশ্যই জমির আগাছা-ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে মাটি কুপিয়ে ৪৫ X ৪৫ X ৪৫ সেমি আয়তনের গর্ত কাটতে হয়। প্রতি গর্তে ২ কেজি জৈবসার ও ১০০ গ্রাম নিম খোল প্রয়োগ করে চারদিক বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে। এরপর এক বছর বয়সের চারাগুলি ২-২.৫ মিটার গর্তের মাঝখানে দূরত্ব বজায় রেখে রোপণ করা হয়।

পরিচর্যা –

বেড়ার মধ্যে চারা গাছটির চারদিকে জন্মানো আগাছা নিড়ানীর সাহায্যে মাটি আলগা করতে করতে আগাছা পরিষ্কার করতে হয়।

একদিন অন্তর ঝারি করে পাতা ধুইয়ে জল স্প্রে করলে রোগপোকার আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। আবার গাছেও জল দেওয়া হয়। প্রতি গাছে প্রায় ২৫০ মিলিলিটার করে জল দেওয়ার প্রয়োজন হয়। গ্রীষ্মকালে প্রতি গাছে একদিন অন্তর ৫০০ মিলিলিটার জল দিতে হয়, রোপণের পর থেকে দু'বছর পর্যন্ত গাছে জল দিতে হয়। এরপর আর জল সেচের প্রয়োজন পড়ে না। শুধু সামান্য পরিচর্যা এই গাছের জন্য যথেষ্ট যেমন, প্রয়োজন হলে ডাল ছাটা, পোকামাকড় লাগলে কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করা ইত্যাদি।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

শাল গাছ কাটা যেহেতু বন দফতরের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে তাই বন বিভাগের নিয়ম অনুযায়ী, ১০ বছর অন্তর গাছ কাটা হয়। যদিও ৭০ সেমি ব্যাসের কম মোটা গাছ কাটা যায় না। জঙ্গলের নতুন গাছ, যাদের বেড় ১০-২০ সেমি হয়েছে এমন গাছের সংখ্যা ৪৪টি হলে একমাত্র তবেই ৩টি গাছ কাটা যেতে পারে।

সাধারণত প্রতি ১০ বছর অন্তর প্রতি হেক্টর জমি থেকে ৫৯০৫ কিউবিক মিটার কাঠ পাওয়া যায়। আমাদের রাজ্যে ১ কিউবিক মিটার শাল কাঠের দাম কম-বেশি ১৮ হাজার টাকা।

শাল গাছের ফল ভেজে খাওয়া যায়। তরকারি হিসাবে অন্য সবজির সঙ্গে একে রান্না করেও খাওয়া যায়। কেক তৈরিতেও এই ফল ব্যবহার হয়। শালের বীজ থেকে যে তেল বের করা হয় তাকে 'শাল-বাটার' বলা হয়, যা ঘি-এর বিকল্প হিসাবে ব্যবহার হতে পারে। শাল বীজ গুঁড়ো করে ময়দার মতো যে পদার্থ পাওয়া যায় তা দিয়ে রুটি বানানো যায়।

শালের বীজে ১০.৮% জল, ৮% প্রোটিন, ৬২.৭% কার্বোহাইড্রেট, ১৪.৮% তেল, ১.৪% তন্তু এবং ২.৩% ছাই থাকে।

পেটের রোগ সারাতে শাল গাছের পাতা খুবই উপযোগী। এছাড়া এই পাতা গরম জলে সিদ্ধ করে ব্যথা বা ফোলা জায়গায় লাগালে উপকার পাওয়া যায়।

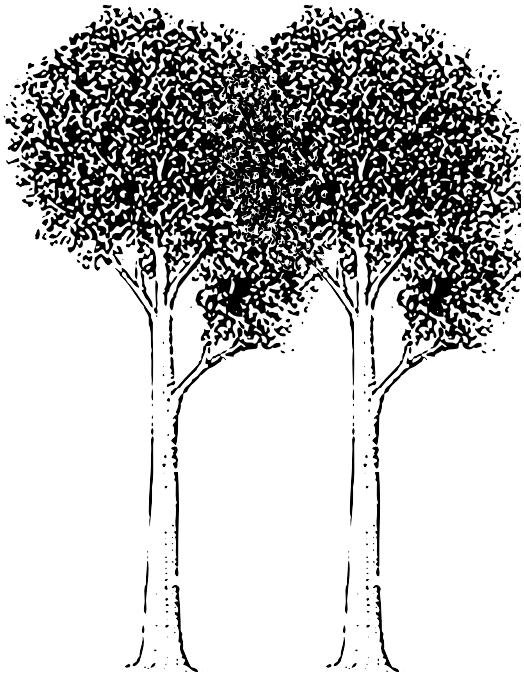
শাল গাছের কাণ্ড থেকে একপ্রকার রেজিন বা আঠা বের হয়, যা ধূনো হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া শাল পাতার থালা, বাটি প্রভৃতি তৈরি করা হয়।

শালের কাঠ দীর্ঘস্থায়ী, শক্ত ও মজবুত। দরজা-জানালার ফ্রেম, ঘরের কাঠামো, জাহাজ, নৌকা, রেলের শ্লিপ্ট তৈরির জন্য বহুদিন ধরেই এই কাঠ ব্যবহার হয়ে আসছে। ইলেকট্রিক পোস্ট, টেবিল-চেয়ার, অন্যান্য আসবাবপত্রের ফ্রেম বানাতে শাল কাঠের ব্যবহার হয়। এছাড়া চাষের সরঞ্জাম, শালবল্লা প্রভৃতি শাল কাঠ দিয়েই হয়।

জাত পরিচিতি –

শাল গাছেরও Cultivated variety এখনও গবেষণার স্তরে রয়েছে। তবে ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে আবহাওয়া অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের শাল গাছ দেখা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র – www.ecoindia.com/flora/trees/sal-tree.html wikipedia



সেগুন

পরিচয় –

সেগুন গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Tectona grandis, এটি Verbenaceae গোত্রের উদ্ভিদ। বর্তমানে APG (Angiosperm Phylogeny Group) System of Classification অনুযায়ী, এটি Lamiaceae গোত্রের বহুবর্ষজীবী, দ্বিবীজপত্রী, পর্ণমোচী শ্রেণীর বৃক্ষ।

ভারতে ১৮০০ সাল থেকে সেগুন গাছ লাগানো শুরু হয়েছে। পৃথিবীর Tropical অঞ্চলে ও আমেরিকাতে প্রায় ১০০ বছর ধরে সেগুনের Plantation হয়ে আসছে। তবুও চাহিদা মেনে ভাল মানের সেগুন চাষ আজও অত্যন্ত প্রয়োজন। ২০০২ সালের হিসাব অনুযায়ী, পৃথিবীর ৫.৭ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে সেগুন চাষ বিস্তার লাভ করেছে।

সেগুনের আদি জন্মস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। সেগুন প্রধানত ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ, মায়ানমার প্রভৃতি দেশের স্বাভাবিক উদ্ভিদ। বর্তমানে এই গাছ আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে স্বাভাবিকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি দেশে সেগুন গাছ ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীর বৃহত্তম সেগুন গাছটি রয়েছে কেরালায়, যা উচ্চতায় ৪৭.৫ মিটার এবং ৭.৬৫ মিটার বেড় বিশিষ্ট।

সংস্কৃতে সেগুনকে সকা, হিন্দিতে সাগুয়ান, তামিল ভাষায় টিক্কু, তেলেগুতে টেক্কা, কন্নড়ে তেগা, অসমীয়ায় ছিংভ্যাগু ও বাংলায় এই গাছ সেগুন নামে পরিচিত।

সেগুন গাছ উচ্চতায় সাধারণত ৪০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। কাণ্ডের এবং ডালপালা ধূসর বা সাদাটে ধূসর বর্ণের হয়, কাণ্ডের বেড়ও বেশ মোটা হয়।

সেগুন গাছের পাতাগুলি বেশ বড়, সাধারণত উপবৃত্তাকার হয়। ১৫-৪৫ X ৮-২৩ সেমি মাপের পাতাগুলি ২-৪ সেমি লম্বা বৃন্তের উপর থাকে। পাতাগুলি খসখসে এবং এর কিনারা মসৃণ হয়।

সেগুনের ফুল ২৫-৪২ সেমি লম্বা ও ৩০ সেমি বিস্তৃত শাখাপ্রশাখা যুক্ত পুষ্পমঞ্জরীতে জন্মায়। ফুলগুলি মিষ্ট গন্ধযুক্ত, সাদা রঙের হয়। ফুলের পাপড়িগুলির কিনারা ঢেউ খেলানো। সেগুন গাছে সাধারণত জুন-অগাস্ট মাসে ফুল আসে। সেগুন গাছের ফুলের পরাগসংযোগ বাতাসের দ্বারা বা বিশেষ এক গোত্রের মৌমাছির দ্বারা হয়ে থাকে। এছাড়া কিছু কীটপতঙ্গও পরাগমিলন ঘটাতে সাহায্য করে।

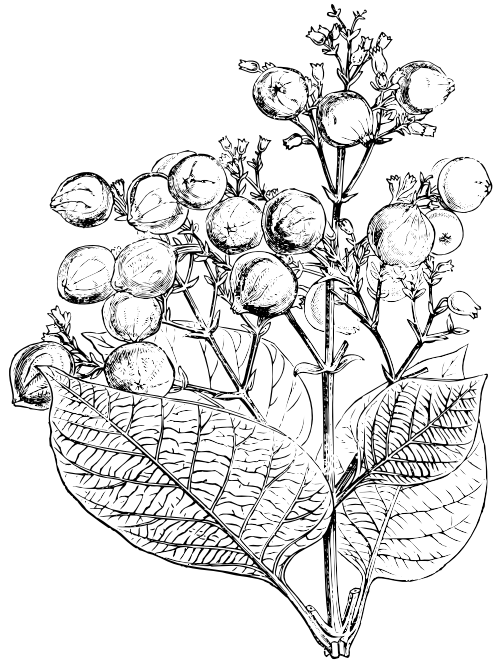
ফলগুলি গোলাকার ও ১.২ - ১.৮ সেমি ব্যাসের হয়। ফলের চারটি প্রকোষ্ঠ থাকে, প্রতি প্রকোষ্ঠে ১টি করে বীজ থাকে। কিন্তু বেশিরভাগ ফলের ক্ষেত্রে ২-১টি প্রকোষ্ঠে পরিণত বীজ পাওয়া যায়।

সাধারণত ভাল জাতের টিম্বার বা কাঠ উৎপাদনের জন্য সেগুন গাছের চাষ করা হয়। বিভিন্ন ধরনের জায়গায় সেগুন গাছ জন্মালেও, জায়গা ও গাছের বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে কাঠের মানের তারতম্য ঘটে। তাই সেগুন চাষের উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন অত্যন্ত জরুরি।

সেগুন সাধারণত উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের উদ্ভিদ। তবে উপক্রান্তীয় (Subtropical) বা নাতিশীতোষ্ণ (Temperate) জলবায়ুতেও এই গাছ জন্মাতে পারে। সেগুন গাছের উপযুক্ত তাপমাত্রা ২৬-৩৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস। তবে ২ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে কিংবা ৪৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রাতে সেগুন জন্মাতে পারে না। ৮০০-৩৫০০ মিলিমিটার বার্ষিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে সেগুনের বৃদ্ধি ভাল হয়, শুষ্ক মাটি ও জলবায়ু সেগুন চাষের উপযুক্ত নয়। সূর্যালোকের প্রভাবে সেগুন গাছের বৃদ্ধিতে তারতম্য ঘটে। ছায়াযুক্ত জায়গায় সেগুন গাছের বৃদ্ধি ভাল হয় না।

সাধারণত বালিযুক্ত পলিমাটিতে সেগুন ভাল জন্মায়। মাটিতে অম্লতা ও ক্ষারের অনুপাত ৬.৫ – ৭.৫ PH -এর মধ্যে থাকলে এবং উপযুক্ত নিকাশীযুক্ত গভীর উর্বর পলি মাটিতে সেগুনের বৃদ্ধি ভাল হয়। অগভীর, শক্ত পাথুরে মাটি, অম্লযুক্তমাটি, ল্যাটেরাইট মাটি ও কৃষ্ণমৃত্তিকা, শুষ্ক বালিমাটি ও জলা জমি সেগুন চাষের উপযুক্ত নয়। ভাল উর্বর মাটি, যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফেট,

পটাসিয়াম, নাইট্রোজেন, জৈবপদার্থ রয়েছে তা সেগুন চাষের সবচেয়ে উপযুক্ত জমি। জমিতে ক্যালসিয়ামের পরিমাণকে সেগুন চাষের সূচক হিসাবে গণ্য করা হয়। ৭০০ মিটার উচ্চভূমি সেগুন চাষের উপযুক্ত। তবে ভূপৃষ্ঠের ১২০০ মিটার উচ্চভূমিতেও সেগুন গাছ জন্মাতে পারে।



কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

সেগুন গাছের বিস্তারের জন্য উৎকৃষ্ট মানের যথেষ্ট পরিমাণ বীজের অভাব রয়েছে। এতদিন যেভাবে সেগুন গাছ ব্যবহার হয়ে এসেছে তাতে সারা পৃথিবীতে উন্নতমানের অর্থাৎ ৫০-৬০ বছরের পুরাতন গাছের সংখ্যা দারুণভাবে কমে গেছে। বিগত কয়েক দশক ধরে সেগুন গাছ রোপণের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাতেও উচ্চমানের কাঠ উৎপাদনের সঙ্গে চাহিদার বিস্তর ফারাক থেকে যাচ্ছে। তাই প্রয়োজন হয়েছে উন্নত প্রযুক্তির দ্বারা সেগুনের বিস্তার করা। সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় ৪.৫ মিলিয়ন সেগুনের চারা রোপণের জন্য নানান প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে, ভারতেও সেগুন রোপণের জন্য বীজের অঙ্কুরোদ্গমের হার বৃদ্ধি ও কলমের বা cutting চারা তৈরির জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন রয়েছে।

বীজের দ্বারাও কৃত্রিম পদ্ধতিতে সেগুন গাছের বিস্তার ঘটানো যায়। পুরাতন বা পরিণত ৪০-৫০ বছর বয়সের গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়। প্রায় প্রতি গাছ থেকে ৩ কেজি ফল পাওয়া যায়। প্রতি কেজি ফলে ১১৫০-২৮০০ টি বীজ পাওয়া যায়। বীজগুলি পলিব্যাগে ভরে স্রোতযুক্ত জলে বা Tap water-এর জলে ১২ ঘন্টা ভেজানো হয়, আবার ১২ ঘন্টা ধরে রোদে শুকনো করা হয়। এক সপ্তাহ ধরে এই প্রক্রিয়ার পর নার্সারীর বেডে অঙ্কুরোদগমের জন্য বীজগুলি বপন করে খড় বা শুকনো পাতা চাপা দিয়ে দু'বেলা জল স্প্রে করতে হয়। ১৫-৪৫ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদগম হয়ে যায়।

সেগুনের বীজের অঙ্কুরোদগমের হার খুব কম। ৩৫-৫০% বীজ অঙ্কুরিত হয়। তাই নার্সারীতে উপযুক্ত পরিচর্যার দ্বারা বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটানো হয়। বীজের অঙ্কুরোদগমের পর নার্সারীর বেডে (জমিতে) উপযুক্ত পরিচর্যায় তা বড় করে, ১) স্টাম্প (Stump) পদ্ধতিতে বা চারাগুলির কাণ্ড ৬-৮ সেমি লম্বা হলে এবং মূলগুলি লম্বায় ১৫-২০ সেমি হলে তা নার্সারীর বেড থেকে তুলে সমস্ত পাতাগুলি ছেঁটে এবং প্রধান মূলের শাখামূলগুলিকে কেটে সংগ্রহ করে উপযুক্ত জমিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে রোপণ করা হয়।

২) দ্বিতীয় পদ্ধতি – অঙ্কুরিত বীজগুলি পলিথিন ব্যাগে জৈবসারযুক্ত মাটি ভরে তার মধ্যে উপযুক্ত পরিচর্যায় বড় করা হয়। তারপর ৬-৭ মাস বয়সের চারাগুলি পলিথিন ব্যাগটি খুলে উপযুক্ত দূরত্ব বজায় রেখে গর্তের মধ্যে রোপণ করা হয়।

সফলতার সঙ্গে Laboratory বা নার্সারীতে সেগুন গাছের Root cutting, Stem cutting, জোড়কলম করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া bud grafting নামক জোড়কলম করেও সেগুন গাছের চারা তৈরি করা হয়।

সেগুন চাষের জন্য উপযুক্ত জমি নির্বাচন করে জমিতে ট্রাক্টর দিয়ে চাষ দিয়ে ও লেভেল করে ২ X ২ মিটার, ৩ X ৩ মিটার spacing করে ৩ X ৪ মিটার pit কাটা হয়। প্রতি গর্তের মধ্যে জৈবসার ভর্তি করে ভালভাবে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর চারাগুলি গর্তের মাঝখানে রোপণ করা হয়। সাধারণত মে-জুন মাসে চারাগুলি রোপণ করা হয়। প্রথম দিকে প্রতিদিন চারা গাছে জল দেবার প্রয়োজন হয়। তবে বর্ষায় সেচের প্রয়োজন হয় না।

Stump রোপণের জন্য চাষ দেওয়া জৈবসারযুক্ত জমিতে গর্ত না কেটে শাবল বা ওই ধরনের গর্ত করার কোনও যন্ত্র দিয়ে মাটিতে stumpগুলি রোপণ করা হয়। সেগুন গাছে বর্ষাকালেই একবার কাণ্ডের বৃদ্ধি হয় ও নতুন পাতা বের হয়, তাই বর্ষার আগে রোপণ করলে আগাম বৃদ্ধির সুযোগ হবে।

পরিচর্যা –

সাধারণত এক বছর বয়সের গাছের জন্য ডাল ছাঁটার প্রয়োজন হয় না, তবে সেগুন গাছের আসল মূল্যবান অংশটি হল গাছের কাণ্ড। এই কাণ্ড সোজাভাবে ও সরলরেখায় বেড়ে ওঠে এবং টিম্বার উৎপাদন করে। তাই গোড়ার দিকে কোনও প্রকার ডালপালা গজালে তা অবশ্যই ছেঁটে দিতে হয়। প্রতি বছর ডাল ছেঁটে গাছটিকে লম্বাভাবে বড় করা হয়।

এক থেকে তিন বছরের চারাগাছগুলিকে সুস্থ সবলভাবে বড় করার জন্য নিয়মিত আগাছা দমন প্রয়োজন। মাটি কুপিয়ে সার প্রয়োগের আগে আগাছা দমন করলে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়।



চারাগাছগুলি জমিতে লাগানোর পর তা বেঁচে গেলে ৬ মাস পর প্রতিটি গাছের গোড়ার অল্প দূরে ৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০ গ্রাম সুপার ফসফেট, দু'বছর অন্তর প্রতি গাছে ৭৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ৬০ গ্রাম সুপার ফসফেট প্রয়োগ করলে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। বেশি পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রয়োগে গাছের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটানো যেতে পারে, কিন্তু এরফলে কাঠের গুণমান খারাপ হয়ে যায়।

Drip irrigation পদ্ধতিতে সেচের ব্যবস্থা করা গেলে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয় ও জলের অপচয় রোধ করা যায়। ৩-৪ বছর বয়স পর্যন্ত গ্রীষ্মকালে নিয়মিত সেচের ব্যবস্থা রাখতে হয়।

১.৮ X ১.৮ মিটার ২ X ২ মিটার দূরত্বে রোপণ করা সেগুন গাছের ক্ষেত্রে প্রথম Thinning করা হয় রোপণের ৫ বছর পরে। এর পরের Thinning করা হয় ১০ বছরের মাথায়। গাছ কাটার ক্ষেত্রে বন দফতরের (Forest Department) নিয়ম অনুযায়ী, Rotation পদ্ধতিতে Thinning করে গাছ কেটে নতুন গাছ লাগিয়ে অরণ্যের পরিমাণ ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা হয়।

সেগুন গাছে steam borer বা কাণ্ডছিদ্রকারী পোকা Zeuzera coffeae, পাতা নষ্টকারী Hyblaca purea, Eutectona machaerails প্রভৃতি পোকা সেগুন গাছের বৃদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটায়। প্রতিকার হিসাবে Monochrotophos বা endosulfan ০.০৫ - ০.৭৫ % জলে গুলে স্প্রে করা যেতে পারে বা Neemazol ১% ১২-১৫ দিন জলে গুলে স্প্রে করে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব -

গড়ে প্রতি হেক্টর জমিতে সেগুন চাষের ক্ষেত্রে ৫৩ বছর Rotation-এ প্রত্যেক বছর ২.৮৫ কিউবিক মিটার এবং ৪০ – ৯০ বছর Rotation–এ প্রত্যেক বছর প্রতি হেক্টরে ২.৯১ কিউবিক মিটার কাঠ উৎপন্ন হয়। উপযুক্ত পরিচর্যার করলে ২৫ বছরের Rotation সবচেয়ে বেশি লাভজনক হয়। সঠিক পরিচর্যায় ১২ বছরের Rotation-এর গাছের এবং পরিচর্যাহীন ২০ বছরের Rotation-এর গাছের কাঠের বৃদ্ধির মান একই রকম হয়।

বন দফতরের মডেল অনুযায়ী, Agrisilviculture Model (মিশ্র চাষের মাধ্যমে সেগুন চাষ করা যেতে পারে)।

মডেল ১ – সেগুন + ক্যাসুরিনা + ভূট্টা + তুলো + হলুদ + টমেটো ও লঙ্কা

মডেল ২ – Agrisilvi culture Model – সেগুন+নারকেল +হলুদ +শাক-সবজি +ভূট্টা +তুলো

মডেল ৩ – Silvi +horticulture Model – সেগুন + পেয়ারা + আতা বা সেগুন + Napier-এর চাষ, সেচযুক্ত জমিতে করা যেতে পারে।

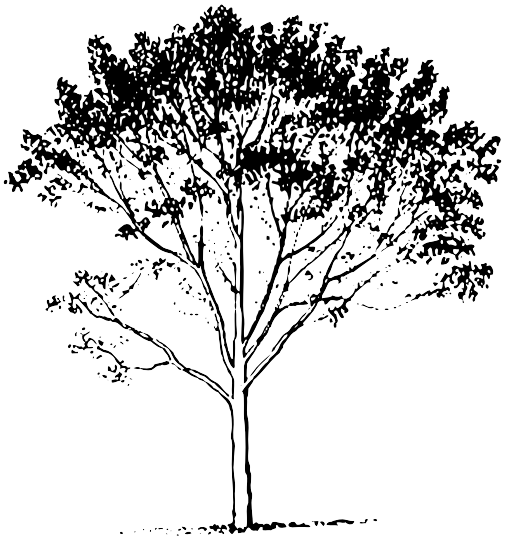
আসবাবপত্র, খাট, আলমারি, দরজা, জানালা, চেয়ার, টেবিল ও গৃহস্থলীর প্রয়োজনীয় ক্যাবিনেট, পালঙ্ক প্রভৃতি তৈরিতে সেগুন কাঠের ব্যবহার অত্যন্ত মর্যাদা লাভ করেছে। এক কথায় আসবাবপত্র শিল্পে সেগুন কাঠ একটি মহামূল্যবান উপাদান। বর্তমানে সেগুন কাঠের Ply wood তৈরি হচ্ছে, যাকে Teak ply বলে।

তবে বিভিন্ন গবেষণায় জানা গেছে, পরিবেশে সেগুন গাছের বেশ কিছু ক্ষতিকর প্রভাবও রয়েছে। যেমন সেগুনের মূল মাটি আলগা করে ভূমিক্ষয় ঘটায়। সেগুনের জঙ্গল বন্যপ্রাণীর চারণভূমির ক্ষতি করে, কারণ এই গাছের নিচে ঘাসপাতা ভাল জন্মায় না, তাছাড়া বন্যপ্রাণীরা ছায়ার ঘাস পছন্দ করে না। ভিন্ন মতে, আধুনিক জীবনযাত্রায় সেগুনের ভূমিকার কাছে এইসব যুক্তি টেকে না। তাই আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে সেগুনের বিস্তার ও উৎপাদন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

জাত পরিচিতি –

মূলত ভৌগোলিক অবস্থানের নিরিখে সেগুনের মতো কাঠ উৎপাদনকারী গাছের প্রকারভেদ করা যেতে পারে, তবে সেভাবে আলাদা জাতের উল্লেখ পাওয়া যায় না। যেমন, বার্মা টিক-এর তৈরি আসবাব মানুষের মধ্যে এখনও আভিজাত্যের প্রতীক। ভারতের মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, নাগপুরের সেগুন, যা CP (Central Provinces)- Teak নামে পরিচিত তার গুণমান খুবই উন্নত ধরনের। দক্ষিণ ভারতের 'নীলাম্বুর' সেগুনের প্রচুর সুখ্যাতি রয়েছে।

তথ্যসূত্র – wikipedia,w.agrifarming.in/teak-wood-farming



গামার

পরিচয় –

গামার গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Gmelina arborea, এটি Verbenaceae গোত্রের উদ্ভিদ। বর্তমানে APG (Angiosperm Phylogeny Grouping) পদ্ধতির শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী, Lamiaceae গোত্রের বহুবর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী পর্ণমোচী বৃক্ষ শ্রেণীর উদ্ভিদ।

গামারের আদি জন্মস্থান ভারত। স্বাভাবিক উদ্ভিদ হিসাবে ভারতের বেশিরভাগ জায়গায় এই গাছটি জন্মায়। থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া, মায়ানমার, ভিয়েতনাম ও চিনের দক্ষিণাঞ্চলে গামার স্বাভাবিক উদ্ভিদ হিসাবে জন্মায়। গাছটি মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশে পরীক্ষামূলকভাবে বাগানে ও রাস্তার ধারে Avenue tree হিসাবে রোপণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯০ সাল থেকে গামার গাছের বিস্তারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বন দফতর থেকে পঞ্চায়েত স্তরে গামার গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছিল। রাস্তার ধারে ও সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পে গামার গাছ ব্যাপকভাবে রোপণ করা হয়েছিল। বর্তমানে আবার গামার গাছ ভাল জাতের কাঠ উৎপাদনের জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে।

গামার গাছটি উচ্চতায় প্রায় ১৫ মিটারের কাছাকাছি হতে পারে। কাণ্ডটি ধূসর বাদামি বর্ণের হয়। শাখাপ্রশাখা, পত্রবৃন্ত ও পুষ্পমঞ্জরী হলুদ রঙের ঘন রোমযুক্ত হয়। কচি শাখাপ্রশাখাগুলি প্রথমে চারকোণা, পরবর্তীকালে গোলাকার হয়ে যায়। কাণ্ডের উপর পাতা খসে যাওয়ার দাগগুলি স্পষ্ট থাকে। পাতাগুলি একফলক, পত্রফলক পুরু, পাতার আকার চওড়া-ডিম্বাকার এবং ৮-১৯ X ৪.৫-১৫ সেমি মাপের হয়। পাতার বৃন্তটি ৩.৫-১০ সেমি লম্বা হয়। পুষ্পমঞ্জরীটি লম্বায় ১৫-৩০ সেমি হয়। পুষ্পমঞ্জরীতে হলুদ রঙের ফুলগুলি এককভাবে বা গুচ্ছাকারে সজ্জিত থাকে। প্রতিটি ফুলের বৃতি ও দলমন্ডলে ৫টি করে বৃত্তাংশ ও ৫টি করে পাপড়ি থাকে। উপরের দিকে দুটি এবং নীচের দিকে ৩টি ওষ্ঠের আকারে গঠিত। এর ফলগুলি উপবৃত্তাকার বা উলটো ডিম্বাকৃতির হয়। ১৫-২ সেমি লম্বা হয়। গামার গাছে ফুল আসে এপ্রিল-মে মাসে এবং গাছে ফল ধরে মে-জুলাই মাসে।

গামার উষ্ণ ও উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের উদ্ভিদ। গামার গাছের উপযুক্ত তাপমাত্রা ২৮-৩৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস। গাছটির বৃদ্ধির জন্য প্রচুর সূর্যালোকের দরকার হয়। ছায়ায় এই গাছের বৃদ্ধি ভাল হয় না। গামার চাষের জন্য বার্ষিক ৭৫০-৪৫০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়।

নিকাশীযুক্ত উর্বর, ৬০-১০০% আপেক্ষিক আর্দ্রতাযুক্ত বেলে বা দোঁয়াশ মাটি গামার চাষের উপযুক্ত। ভারী এঁটেল মাটি, জলাজমি বা অনুর্বর শুষ্ক মাটিতে গামার গাছ হয় না। গামার গাছের জন্য মাটির অম্লতা ও ক্ষারের মাত্রা ৫-৮ PH উপযুক্ত। সমুদ্রতল থেকে ১২০০ মিটার উচ্চভূমিতেও গামার গাছ দেখা যায়।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

সাধারণত উপযুক্ত পরিবেশে বীজ থেকে স্বাভাবিক চারা জন্ম নিয়ে নতুন গাছ হতে পারে। এছাড়া নির্দিষ্ট জমিতে সরাসরি সারি তৈরি করে ৩.০ X ৩. ৫ মিটার দূরত্বে বীজ বপন করে গামার গাছের বিস্তার করা যেতে পারে। আবার নার্সারীর নিকাশীযুক্ত বালি মিশ্রিত মাটিতে ৭.৫ X ৭.৫ সেমি দূরত্বে ১-২ সেমি গভীরে বীজ বপন করে. প্রয়োজন অনুযায়ী, প্রতিদিন বা একদিন অন্তর জল স্প্রে করে ২০-২৫ দিনের মধ্যে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঘটানো সম্ভব। এরপর পলিথিন ব্যাগে জৈবসারযুক্ত মাটি ভরে তাতে অঙ্কুরিত বীজগুলি রোপণ করা যেতে পারে বা নার্সারীর বেডে চারাগুলি লম্বায় ১০-১৫ সেমি হলে অন্যত্র রোপণ করা হতে পারে। বীজের অঙ্কুরোদ্গমে আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা বেশি থাকা প্রয়োজন।

কাটিং ও জোড়কলম তৈরি করে কলমের গামার গাছ পাওয়া যেতে পারে। গাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য কলমের গাছ উপযুক্ত।

গ্রীষ্মের আগেই অর্থাৎ এপ্রিল-মে মাসে জমিতে ট্রাক্টর বা লাঙল দিয়ে চাষ দিয়ে জমির মাটি তৈরি করে রাখতে হয়। জমিতে অবাঞ্ছিত ঝোপঝাড় ও আগাছা মুক্ত করে রাখা হয়। জমি প্রস্তুতির পর ৩ X ৩.৫ মিটার বা ৪ X ৪ মিটার দূরত্বে ৪৫ X ৪৫ X ৪৫ সেমি আয়তনের গর্ত কেটে তাতে জৈবসার(FYM) ও মাটি মিশিয়ে ভর্তি করে কয়েকদিন রোদে শুকিয়ে তারপর ওই গর্তের মাঝখানে ঠিক বর্ষার আগে জুন-জুলাই মাসে চারাগুলি রোপণ করা হয়। চারা গাছ রোপণের সময় ও রোপণের পর থেকে নিয়মিত প্রতিদিন ঝারি দিয়ে জল দেওয়া প্রয়োজন হয়।

পরিচর্যা –



সাধারণভাবে বছরে দু'বার আগাছা পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়, বর্ষার আগে ও বর্ষার পরে। তবে কৃষ্ণ মৃত্তিকা যেখানে বেশি আগাছা জন্মায় সেখানে বছরে চারবার নিড়ানী দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

গাছ লাগানো হয়ে যাওয়ার পর সপ্তাহে একবার সেচ দিতে হয়। গ্রীষ্মকালে ও শুষ্ক আবহাওয়ায় প্রয়োজন অনুসারে সেচ বাড়াতে হতে পারে। রোপণের ২-৪ বছর পর্যন্ত গাছে সেচের প্রয়োজন হয়। এরপর সাধারণত আর সেচের প্রয়োজন হয় না। প্রতিটি গাছে ৫ কেজি হিসাবে জৈবসার, ১০ গ্রাম N.P.K. (নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশের মিশ্রণ) ও ১০ Borax চারা রোপণের পরের বছর থেকে বছরে দু'বার প্রয়োগ করলে গাছের বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দ্রুত গতিতে গাছের বৃদ্ধি অতিরিক্ত হলেও গুণগতমান কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

গামার গাছের কাণ্ড, যা থেকে উন্নত মানের Timber উৎপন্ন হবে সেই কাণ্ডটিকে সোজাভাবে বড় করে তোলার জন্য কাণ্ডের নিচের দিকের ডালগুলি ছেঁটে দিতে হয়। শুকনো বা রুগ্ন ডালগুলি কেটে দিলে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। অ্যাগ্রো ফরেস্টি মডেলে গামার গাছের সঙ্গে চিনাবাদাম, তরমুজ, ডাল জাতীয় শস্য, ভূট্টা, কলা এসবের চাষ করা যায়। মান্টিটায়ার মডেল পদ্ধতিতে গামার গাছের সঙ্গে কলা ও গোলমারচের চাষ করা হয়। এহ দু'ভাবে মিশ্র চাষ করে বিভিন্ন উৎপাদন থেকে আর্থিক লাভ সম্ভব। গামার গাছের নার্সারীতে Sooty mould নামের একপ্রকার ছত্রাকঘটিত রোগ দেখা যায়। এর আক্রমণে চারা গাছের প্রচুর ক্ষতি হয়, গাছ শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। উপযুক্ত ছত্রাকনাশক স্প্রে করে একে প্রতিরোধ করা সম্ভব। এছাড়া গামার গাছে পাতা নষ্টকারী পোকা দেখা যায়। এরা গাছের পাতা ও কচি কাণ্ডের মুকুল খেয়ে বৃদ্ধি ব্যাহত করে। Biological নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে বা Bio-pesticide ব্যবহার করে এই পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

গামার চাষের জমিতে গাছের ঘনত্ব অনুসারে ৪-৫ বছর অন্তর Thinning করে কিছু গাছ কেটে দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে দুর্বল গাছগুলি কেটে অন্য গাছগুলির বৃদ্ধির সুযোগ করে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে ৪-৫ বছরের গাছগুলিকে কাগজ তৈরির মণ্ড তৈরির কাজে ব্যবহার করা যায়।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী, বার্ষিক বৃদ্ধি ৩০ কিউবিক মিটার প্রতি হেক্টর হলে, প্রতি হেক্টর জমি থেকে ৫-৮ বছরের Rotation-এ উৎপাদন ২০-৩৫ কিউবিক মিটার। স্থানীয় বাজারে প্রতি টন ভাল কাঠের মূল্য ৮ হাজার টাকা (২০০২ সালের দাম)। বর্তমানে গামার কাঠের দাম অন্যান্য কাঠের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে এবং গামার চাষ একটি লাভজনক অর্থকরী চাষে পরিণত হয়েছে। গামার গাছের কাঠ উন্নতমানের ও দীর্ঘস্থায়ী। যদিও সেগুনের চেয়ে এর স্থায়ীত্ব কম, তবুও ফার্নিচার ও প্লাইউড শিল্পে ইদানীং এর ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। পরিবেশ রক্ষায় এই গাছের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

এই কাঠ আসবাবপত্র তৈরির উপযুক্ত, জানলা-দরজার পাল্লা, টেবিল-চেয়ার ও অন্যান্য সামগ্রী তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। কাগজ শিল্পে উন্নতমানের মণ্ডের কাঁচামাল হিসাবে এই কাঠ খুবই মূল্যবান, প্লাইউড কারখানায় গামার কাঠ খুব দামী উপাদান। এছাড়া দেশলাই কারখানায় ব্যাপকভাবে গামার কাঠ ব্যবহৃত হয়। গামারের মূল ও গাছের ছাল পাকস্থলীর বা পেটের রোগ সারাতে, মাতৃদুগ্ধ বাড়াতে, পেট পরিষ্কার করতে, কৃমিনাশক হিসাবে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করতে, ধাতুরোগের প্রতিকার করতে ব্যবহার হয়ে থাকে। এই গাছের পাতার রস মাথার যন্ত্রণা কমাতে, ক্ষতস্থান পরিষ্কার করতে ব্যবহৃত হয়। বিষাক্ত পোকামাকড়ের কামড়ের যন্ত্রণা কমাতে এই রস ব্যবহার করা যায়।

গামারের ফুল রক্ত শোধন করতে ও মৃগী রোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্বেদে গামারের ফল মূত্রবর্দ্ধক, উত্তেজক ও টনিক হিসাবে ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। চুলের সমস্যা ও টাক পড়ার চিকিৎসায়ও এর ব্যবহার হয়ে থাকে। এছাড়া বাতের রোগ, স্ত্রীরোগ, রক্তাল্পতা, কুষ্ঠরোগ ও আলসার রোগে গামার গাছের ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে।

তথ্যসূত্র – wikipedia,Agro-techniques of Selected Medicinal Plants: Volume - III Ref:hort purdue edu



মেহগনি

পরিচয় –

মেহগনি গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Swietenia mahagoni, এটি Meliaceae গোত্রের বৃক্ষ শ্রেণীর উদ্ভিদ। Meliaceae গোত্রের অনেকগুলি উদ্ভিদকে মেহগনি নামে গণ্য করা হয়। মূলত সবকটি গাছ থেকেই উন্নত মানের কাঠ (Timber) পাওয়া যায়। Meliaceae গোত্রের মেহগনি নামে পরিচিত অন্য গাছগুলি হল, Swietenia humilis, Swietenia macrophylla (বড়পাতা মেহগনি), Khaya senegalenia (আফ্রিকার মেহগনি), Entandrophuragma exceisum (এটিও আফ্রিকার মেহগনি), Dysoxylum spectabile (নিউজিল্যান্ডের মেহগনি), Toona sinensis (চিনের মেহগনি), Toona sureni (ইন্দোনেশিয়ার মেহগনি), Toona ciliata (ভারতীয় মেহগনি) ইত্যাদি।

তবে এর মধ্যে Swietia mehagoni থেকেই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের কাঠ (Timber) পাওয়া যায়। সারা পৃথিবীতে এই গাছটির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ছোট পাতার এই গাছই আসল মেহগনি নামে পরিচিত।

এই মেহগনি গাছটির আদি জন্মস্থান ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে খুব দ্রুত সারা পৃথিবীতে এই গাছ বিস্তার লাভ করে। উদ্ভিদবিজ্ঞানী Dr. William Roxburgh-এর উদ্যোগে ১৭৫৯ সালে West Indies থেকে S. mehagoni (ছোট পাতার বা আসল মেহগনি)-র চারা আনা হয় এবং কলকাতার কোম্পানির বাগানের (বর্তমানে A.J.C. Bose Indian Botanic Garden) রোপণ করা হয়েছিল। উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও কোম্পানির বাগানের তদানীন্তন অধিকর্তা Sir George KIng (১৮৪০ – ১৯০৯)-এর উদ্যোগে এই বাগানে হান্ডুরম মেহগনি অর্থাৎ S. macrophylla বা বড় পাতার মেহগনি গাছ রোপণ করা হয়। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রায় সব ধরনের মেহগনি গাছের বিস্তার ঘটেছে।

দিনে দিনে বাণিজ্যিকভাবে মেহগনি গাছের মূল্যবান কাঠ যত জনপ্রিয় হয়েছে ততই বেড়েছে এই গাছ কাটার পরিমাণ। ১৯০৭ সালের এক হিসাব থেকে জানা যায়, পশ্চিম আফ্রিকা থেকে ১ লক্ষ ২১ হাজার ৭৪৩ টন মেহগনি কাঠ কাটা হয়েছিল। মেহগনি গাছ কাটায় নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও, ২০০০ সালে প্রায় ৫৭ হাজার মেহগনি গাছ কাটা হয়েছিল। এই হিসাব থেকেই আজ মেহগনি গাছ রোপণের প্রয়োজনীয়তা অনুমান করা যায়। ১৯৭৩ সালে International Union for Conservation of Nature (IUCN), ১৯৭৫ সালের ১লা জুলাই Convention on International Trade in Endangered Species of World Founa & Flora প্রভৃতি পরিবেশ নিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠিত হয় এবং মেহগনি গাছের আদি জন্মস্থানে এই গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণ করে বিলুপ্তির হাত থেকে মেহগনিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা হয় এবং পৃথিবীতে অন্যত্রও মেহগনি গাছ রোপণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিশেষ করে, এশিয়া মহাদেশের ভারত, বাংলাদেশ ইন্দোনেশিয়া, ফিজি প্রভৃতি দেশে সফলভাবে মেহগনি চাষ শুরু হয়। কয়েক বছর আগেও মেহগনি গাছের প্রসারের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গে একটি কথা প্রচলিত ছিল, ২টি মেহগনি গাছ লাগিয়ে বড় করতে পারলে সেই গাছ বিক্রি করে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার খরচ উঠে আসে।

ছোট পাতার এই মেহগনি গাছটি লম্বায় ২৫-৩০ মিটার এবং কাণ্ডের বেড় ৪ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। গাছের গোড়ার দিকের কাণ্ডটির Rootbuttressed থাকতে পারে। গাছের ছাল কিছুটা চোক্‌লা (Flex) ওঠা ও ধূসর বাদামী বর্ণের হয়। পাতা যৌগিক প্রকৃতির এবং একান্তরভাবে শাখা-প্রশাখায় সজ্জিত থাকে। পত্রাক্ষটি লম্বায় ৩৫ সেমি পর্যন্ত হতে পারে। পত্রাক্ষের গোড়ার দিকটি মোটা হয়। পত্রাক্ষে ১০-১৬ X ৪-৬ সেমি আকারের ৮-১২টি পত্রক থাকতে পারে। পাতাগুলি গাঢ় সবুজ বর্ণের অল্প রোমযুক্ত হয়ে থাকে। পাতাগুলির আকৃতি কিছুটা বেঁকা (elliptic) হয়ে থাকে।

মেহগনি গাছে মিশ্র ধরনের পুষ্পবিন্যাস দেখা যায়। ফুলগুলি ৬-১৫ সেমি লম্বা মঞ্জরীদণ্ডের উপর সজ্জিত থাকে। মঞ্জরীগুলি পাতার কক্ষ (axillary) থেকে উৎপন্ন হয়। ফুলগুলি ছোট সবুজাভ সাদা রঙের হয়। পুংকেশরগুলি মিলিত হয়ে একটি নালি বা Staminal tube গঠন করে। পুংকেশরে ১০টি পরাগধানী বা anther থাকে। গর্ভকেশরটি কোণাকৃতির বা ডিম্বাকৃতির হয়। গর্ভদণ্ডটি গর্ভাশয় অপেক্ষা লম্বা হয়। ফল ক্যাপসুল প্রকৃতির ডিম্বাকৃতির বাদামি বর্ণের হয়। ,লম্বায় ৮-১০ সেমি। কলুমেলা নামক লম্বা কর্কের মতো অক্ষের উপর পরপর লালচে বাদামি বর্ণের পক্ষযুক্ত ফলগুলি সাজানো থাকে। বীজের যে দিকটায় শস্য বা Endosperm থাকে, সেই দিকটা একটু মোটা চ্যাপটা ও অপর দিকটি পাতলা হয়। মেহগনি গাছে মে-জুন মাসে ফুল আসে এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ফল ফেটে বীজগুলি বাতাসে ভেসে বিস্তারিত হয়।



মেহগনি গাছ উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলের উদ্ভিদ। মেহগনি ২৪-৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় (দিনের বেলায়) ভাল জন্মায়। কিন্তু ১৬-৩৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করেও এই গাছ বেঁচে থাকতে পারে। ১০০০-২০০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত মেহগনি গাছের ভাল বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত। তবে ৮০০-২৫০০ মিলিমিটার বার্ষিক বৃষ্টিপাত অঞ্চলেও মেহগনি গাছ ভালভাবে জন্মাতে পারে। যদিও ১০০০-১৫০০ মিলিমিটার বার্ষিক বৃষ্টিপাত মেহগনি গাছের বৃদ্ধির পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। এছাড়া মেহগনি গাছের বৃদ্ধির জন্য প্রচুর সূর্যালোক যুক্ত, উন্মুক্ত জায়গা আবশ্যক।

গভীর, উর্বর, উপযুক্ত নিকাশীযুক্ত বালি মিশ্রিত মাটিতে মেহগনি গাছ ভাল হয়। মাটির অম্লতা ও ক্ষারীয় মাত্রা ৬-৭ PH এই গাছের পক্ষে উপযুক্ত। তবে ৫.৫-৮ PH যুক্ত মাটিতেও মেহগনি গাছ বেড়ে উঠতে পারে।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

মেহগনি গাছের ফল ৫টি অংশে বিভক্ত হয়ে ফেটে যায়। বীজগুলি বাতাসের সাহায্যে বিস্তারিত হয়ে অনুকূল পরিবেশে চারা তৈরি করতে পারে। যদিও এই স্বাভাবিক প্রসারণের হার খুবই কম।

পরিণত মেহগনি ফল পেড়ে রোদে শুকনো করলে ফল ফেটে বীজগুলি বের হয়ে যায়। উপযুক্ত পুষ্ট বীজগুলি নার্সারীর বেডে (বালি মিশ্রিত মাটিতে) অঙ্কুরোদগম ঘটানোর জন্য বপন করা হয়। নার্সারীর বেডে শেড (ছায়াযুক্ত) দিয়ে নিয়মিত পরিচর্যা করলে ১৫ দিনের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়ে চারা গাছের জন্ম হয়। চারাগাছগুলি ৩-৪ সপ্তাহ পর রোদযুক্ত স্থানে রাখা হয়। এরপর ৩-৪ সপ্তাহের চারাগুলি পলিথিন ব্যাগে রোপণ করে উপযুক্ত পরিচর্যায় নার্সারীতে বড় করে তুলে নির্দিষ্ট জমিতে রোপণ করা হয়ে থাকে। সাধারণত ৩ বছর বয়সের গাছ থেকে কলমের চারা তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু বীজের চারার গাছই কাঠ উৎপাদনে সবচেয়ে উপযুক্ত।

মেহগনি গাছ রোপণের জন্য আলো-বাতাস যুক্ত উন্মুক্ত জায়গার প্রয়োজন হয়। ছায়াযুক্ত জমিতে এই গাছের বৃদ্ধি ঠিকমতো হতে পারে না। জমিকে আগাছামুক্ত করে চাষ দিয়ে বা মাটি কুপিয়ে মেহগনি তা রোপণের উপযুক্ত করে তুলতে হয়।

মেহগনি বিশাল আকারের গাছ। তাই বাড়ির আশেপাশে লাগানোর সময় বাড়ি থকে ৪.৫৭ মিটার বা ১৫ ফুট দূরে তা রোপণ করতে হয়। কারণ গাছে পার্শ্বমূল বাড়ির ক্ষতি করতে পারে। রাস্তার পাশেও রোপণ করলে রাস্তা থেকে ২.৪৩ মিটার বা ৮ ফুট দূরত্ব বজায় রাখা উচিত। গাছগুলির মধ্যে ব্যবধান (spacing) ১৫ ফুট বা ৪.৫৭ মিটার হওয়া উচিত। গাছ রোপণের জন্য ৫০.৮ X ৫০.৮ X ৫০.৮ সেমি আয়তনের গর্ত কেটে তাতে জৈবসার ও গর্তের উপরের উর্বর মাটি মিশ্রিত করে জৈব কীটনাশক স্প্রে করে মাটি শোধন করা হয়। এর ফলে চারাগাছের মূলের রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। চারাগাছের গোড়া থেকে পলিথিন ব্যাগটি বা পাত্রটি সরিয়ে চারার গোড়ার মাটি সমেত গর্তের মধ্যে রোপণ করা হয়। এরপর জল দিয়ে ও গাছের গোড়ায় আরও মাটি দিয়ে ভরাট করে গাছটিকে শক্ত-সোজা কিছুর সঙ্গে বেঁধে খাড়া করে রাখার ব্যবস্থা করা হয় এবং বেড়া দিয়ে গরু-ছাগলের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে হয়।

পরিচর্যা –

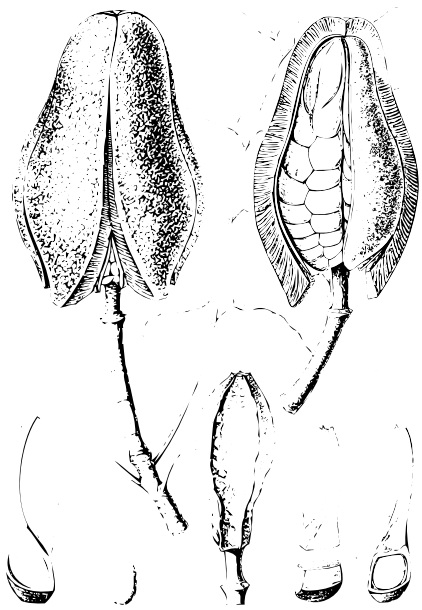
গ্রীষ্মকালে প্রতি সপ্তাহে মাটির আর্দ্রতা অনুযায়ী সেচের ব্যবস্থা করতে হয় অথবা প্রতিদিন অল্প করে জল দিয়ে গাছের গোড়ার আর্দ্রতা রক্ষা করা যেতে পারে। গাছ মাটিতে ভাল করে লেগে যাওয়ার পর জলসেচের প্রয়োজন হয় না। মেহগনি গাছ কিছুটা খরা সহ্য করতে পারে। তবে খুব গ্রীষ্মে, সপ্তাহে ১-২ বার সেচ দিলে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। আবার সার প্রয়োগের পরও সেচের প্রয়োজন হয়।

প্রতিটি ১-২ বছর বয়সী চারাগাছের গোড়া থেকে একটু দূরে চারপাশে স্বল্পমাত্রায় (১০০-২০০ গ্রাম) নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। গাছ লাগানোর সময় গর্তের মধ্যে যদি উপযুক্ত পরিমাণে জৈবসার দেওয়া থাকে তবে রাসায়নিক সারের পরিমাণ কম হলেও চলে যায়। রাসায়নিক সার ও জৈবসার বছরে তিন দফায় প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। যদিও প্রতিবার সার প্রয়োগের পর জলসেচের ব্যবস্থা করতেই হয়।

মেহগনি চারা রোপণের ২ বছর পর থেকে ৮ বছর পর্যন্ত গাছের অবাঞ্ছিত ডালপালা কেটে দিতে হয়। যাতে গাছের কাণ্ডটি সোজা ও লম্বাভাবে বেড়ে ওঠতে পারে। আবার রুগ্ন ও শুকনো ডালগুলিও কেটে দিলে মূল কাণ্ডটি বেশি লম্বা হতে পারে।

প্রতি বছর ১-২ বার মাটি কুপিয়ে গাছের গোড়ায় উঁচু করে মাটি দিয়ে dressing করে দিতে হয়। এরফলে গাছের গোড়া চারিদিকের

আগাছা দমন হয়, গাছের জল জমতে পারে না এবং গাছটিকে মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে ঝড়-ঝাপটা সামলে বেড়ে উঠতে পারে। প্রতিবার সার প্রয়োগের আগে আগাছা দমনের ব্যবস্থা করেই সার প্রয়োগ করা উচিত।



মেহগনি গাছে কয়েকটি সাধারণ পোকামাকড় হল কান্ডছিদ্রকারী পোকা, পাতা নষ্টকারী ফড়িং জাতীয় পোকা এবং মথ জাতীয় পোকা দেখা যায়। তবে এরা গাছের তেমন কোনও ক্ষতি করতে পারে না। তাই কেবলমাত্র ২-৫ বছর বয়সের ছোট গাছে কীটনাশক স্প্রে করে এসব নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে উপযুক্ত পরিমাণ জৈব ও রাসয়নিক সার প্রয়োগ, যথাযথ সেচ এবং ভাল পরিচর্যা করলে স্বাস্থ্যবান গাছ নিজেই রোগপোকার আক্রমণ প্রতিহত করে বেড়ে ওঠতে পারে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

উন্নত মানের আসবাবপত্র তৈরিতে মূল্যবান এই মেহগনি কাঠের কোনও বিকল্প নেই। এছাড়া বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও জাহাজ নির্মাণের কাজে এই কাঠ ব্যবহৃত হয়।

মেহগনি গাছের বৃদ্ধি প্রধানত উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলে ভাল হয়। বিভিন্ন দেশে এখন মেহগনি রোপণ করা হয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন দেশের জলবায়ুর উপর নির্ভর করে এই গাছের বৃদ্ধি বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। কাণ্ডের Diameteral Breast Height (DBH) অর্থাৎ বুক সমান উচ্চতায় কাণ্ডের বেড়ের মাপ নির্ণয় করে গাছটি কাটার উপযুক্ত কিনা তা ঠিক করা হয়।। ৪০ বছরের গাছের DBH ৫৯ সেমি ও উৎপাদন ১.৮ কিউবিক মিটার(প্রতি হেক্টরে ৬৪ কিউবিক মিটার), ৫৩ বছরে DBH হয় ৭৪ সেমি ও কাঠ উৎপাদন হয় ২.৭ কিউবিক মিটার(প্রতি হেক্টরে ৯৪ কিউবিক মিটার) এবং ৬৪ বছরের মেহগনি গাছের DBH হয় ৮৮ সেমি ও কাঠ উৎপাদনের পরিমাণ হয় ৩.৯ কিউবিক মিটার(প্রতি হেক্টরে ২০০ কিউবিক মিটার)।

সুতরাং ফসল (কাঠ) সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে গাছ কাটলে উন্নতমানের কাঠ পাওয়া যাবে। মেহগনি কাঠ বিক্রি করে লাভের পরিমাণ হিসাব করেই গাছ কাটা উচিত। যদিও বন দফতরের অভিজ্ঞ আধিকারিকগণই অনেক সময় জঙ্গলের গাছ কাটার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। ব্যক্তিগত গাছ কাটার ক্ষেত্রেও প্রশাসনের অনুমোদন নিয়েই এই গাছ কাটতে হয়।

প্রতি কিউবিক মিটার মেহগনি কাঠের দাম ২৫০-৪৬০ মার্কিন ডলার। যা ভারতীয় মুদ্রায় ১৫ হাজার ৯৯১ টাকা থেকে ২৯ হাজার ৪২৩ টাকা হতে পারে। তবে সব সময় টিম্বারের দাম তাঁর দৈর্ঘ্য ও গুণমানের উপর নির্ভর করে।

এছাড়া ওষুধ হিসাবে এই গাছের ব্যবহারের কথা জানা যায়। মেহগনি গাছের ছালের রস বিভিন্ন ক্ষত সারাতে ব্যবহৃত হয়।

মেহগনি পাতায় অনেক প্রকার Limonoids থাকায় তা রক্তাল্পতা, মূত্রাশয়ের সমস্যা, পেটের সমস্যা ইত্যাদি রোগ সারাতে সাহায্য করে। যদিও বাণিজ্যিকভাবে মেহগনি কাঠই মেহগনির পরিচয়। আর তাই সারা পৃথিবীতে এখন সব ধরনের মেহগনি গাছের অবস্থা এইরকম। গাছের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকায় Timber wood এর যোগানও কমতে শুরু করেছে। তবে আশার কথা এটাই যে, পৃথিবীজুড়ে এখন নতুন করে মেহগনি গাছ রোপণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শুধু ব্যাণিজিক কারণে নয়, পরিবেশগত কারণেও আজ মেহগনি চাষ বাস্তবসম্মত এক প্রয়াস।

জাত পরিচিতি –

মেহগনি গাছের বিজ্ঞানসম্মত জাত (Variety) পরিচিতি সংক্রান্ত কোনও তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তবে আলাদা প্রজাতির অনেক প্রকার মেহগনি গাছের উল্লেখ পরিচয় পর্বে করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র - http://tropical.theferns.info, www.alibaba.com (for timber price), www.ecoindia.com, http://www.ecoindia.com/flora/trees/indian-mahogany-tree.html, wikipedia, www.fsc.org



শিশু

পরিচয় –

শিশু গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Dalbergia sissoo, এটি Fabaceae বা Liguminosae বহুবর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী মাঝারি থেকে বড় বৃক্ষ শ্রেণীর উদ্ভিদ। শিশু গাছের Generic name বা গণের নামটি সুইডেনের উদ্ভিদবিজ্ঞানী ভ্রাতৃদ্বয় (Nils ও Cart) Dalberg- এর নামে রাখা হয়েছে।

শিশু গাছের আদি জন্মস্থান ভারতীয় উপমহাদেশের হিমালয়ের পাদদেশ থেকে ইরানের মধ্যে অবস্থিত। শিশু গাছের উন্নত, মজবুত, ও উৎকৃষ্টমানের পালিশযোগ্য Timber-এর জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর বিস্তার ঘটেছে। ভারতের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের বন দফতরের হাত ধরে ও সরকারি উদ্যোগে সমাজভিত্তিক বনসৃজনের মাধ্যমে বনভূমিতে, রাস্তার ধারে, খাল বিলের বাঁধের উপর প্রচুর পরিমাণে শিশুগাছ রোপণ করা হচ্ছে।

াশশু গাছের াবভন্ন নাম থাকলেও আমাদের দেশে হংরোজতে এই গাছটি North Indian Rosewood নামে পরিচিত। সংস্কৃতে সিংগ্সুপা, হিন্দিতে শিশম ও শিশু, তেলেগুতে সিংসুপা, তামিলে ও বাংলা ভাষায় এই গাছকে শিশু গাছ বলে।

শিশু গাছ কোনও কোনও অঞ্চলে চিরহরিৎ। আবার কোথাও এই গাছটি পর্ণমোচী প্রকৃতির হয়ে থাকে। গাছটি উচ্চতায় ২৫-৩০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। ফাঁকা জায়গায় গাছটি একটু এঁকেবেঁকে বড় হয়। কিন্তু ঘনভাবে রোপণ করলে কাণ্ড সোজা হয় ও লম্বায় ভাল বৃদ্ধি পায়। কাণ্ডটি ধূসর বর্ণের, কাণ্ডের ছাল উপরে-নিচে ফাটা ও অমসৃণ হয়ে থাকে। কাণ্ডটির বেড় ১.২ মিটার পর্যন্ত মোটা হতে পারে। পাতাগুলি যৌগিক প্রকৃতির, পত্রাক্ষের উপর ৩-৫টি হালকা সবুজ, উপবৃত্তাকার বা ডিম্বাকারের উপপত্রগুলি (Leaflets) একটু এঁকেবেঁকে (Zigzag) সজ্জিত থাকে। প্রতিটি উপপত্র ২.৫–৩.৫ সেমি ব্যাসার্ধের হয়ে থাকে। পাতার বৃন্তগুলি লম্বা হয় । উপপত্রগুলির ফলকের পত্রাগ্র (Apex) সরু বা Acuminal হয় এবং বৃন্তের দিকেও ক্রমশ সরু হয়ে থাকে। পাতার কিনারা মসৃণ হয়ে থাকে। ছোট অবস্থাতেই শিশু গাছে ফুল এসে যায়। ফুলগুলি ছোট ও শাখাযুক্ত মঞ্জরীদণ্ডের উপর জন্মায়। ফুলের বৃতি ঘণ্টাকৃতির ৫টি বৃত্যাংশ নিয়ে গঠিত। পাপড়িগুলি বৃতির থেকে বেশি লম্বা হয়। সাধারণত সাদা ও হালকা গোলাপী রঙের হয়ে থাকে। ফুলগুলি উভলিঙ্গ (bisexual) প্রকৃতির । ফুলের পরাগমিলন মৌমাছি ও কীটপতঙ্গের দ্বারা হয়ে থাকে। ফলগুলি একসঙ্গে গুচ্ছাকারে জন্মায়। পাতলা কলার ৫-৭ X ০.৮-১.২ সেমি আকারের হয়ে থাকে। ফলের মধ্যে ১-৪টি বীজ থাকতে পারে। বীজগুলি ৪-৫ মিলিমিটার ব্যাসার্ধের কিডনির আকৃতির এবং বাদামি কালো রঙের হয়ে থাকে।

সমুদ্রতল থেকে ১৫০০ মিটার উচ্চভূমিতেও (Altitude) শিশু গাছ জন্মাতে দেখা যায়। এই গাছ ৪৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস থেকে -৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে এই গাছের। তবে ১৮-২৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা শিশু গাছের বৃদ্ধির পক্ষে উপযুক্ত। ৫০০–৪৫০০ মিলিমিটার বার্ষিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে শিশু গাছ জন্মায়। তবে ১০০০-১৭০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত এই গাছের উপযুক্ত।

উন্নত নিকাশীযুক্ত মাটি শিশু গাছের পক্ষে সহায়ক। বালিযুক্ত পলি মাটিতে এর বৃদ্ধি ভাল হয়। অনুর্বর মাটিতে বা কাদাযুক্ত ভারী মাটিতে শিশু গাছের বৃদ্ধি ধীর গতিতে হয়ে থাকে।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

সাধারণভাবে শিশু গাছের বীজের অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষমতা শীঘ্র কমতে থাকে। তবে বায়ুরোধক অবস্থায় সংরক্ষণ করতে পারলে ৪ বছর পর্যন্ত এই বীজ সক্রিয় থাকে। স্বাভাবিকভাবে শিশু গাছের গোড়ার চারপাশ থেকে চারাগাছ উৎপন্ন হয় না। গাছের থেকে দূরে এর স্বাভাবিক প্রসারণ হয়ে থাকে। কৃত্রিমভাবে প্রসারণের জন্য সংগ্রহ করা বীজ ঠাণ্ডা জলে ২৪-৪৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে বীজতলায় বা নার্সারীর বেডে বপন করলে এক সপ্তাহ পরে থেকেই অঙ্কুরোদগম হয়ে বীজ থেকে চারাগাছ জন্মাতে শুরু করে। চারাগাছগুলি লম্বায় ১০ সেমি হয়ে গেলে পলিথিন ব্যাগে ১২-১৬ মাস পরিচর্যা মাধ্যমে এর stump-এর চারা তৈরি করে নির্দিষ্ট জমিতে রোপণ করা হয়। বীজ সাধারণত মার্চ-এপ্রিল মাসে বপন করা হয়ে থাকে। এছাড়া গাছের গোড়ার চারিদিকে মাটির নিচের কাণ্ডের অংশ থেকে বা মূল বা শিকড় থেকে চারাগাছ জন্মায়। এই চারাগাছগুলি কেটে সঠিক পরিচর্যায় বড় করে অন্যত্র রোপণ করেও শিশু গাছের প্রসারণ ঘটানো যায়। শিশু গাছের ডালের কাটিং করেও নতুন চারাগাছ তৈরি করা যেতে পারে।



যে জমিতে এই গাছ রোপণ করা হবে প্রথমে সেই জমিতে লাঙল বা ট্রাক্টরের সাহায্যে ভালভাবে চাষ দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে মই দিয়ে জমির ঢাল বজায় রেখে জমি প্রস্তুত করতে হয়। বীজ বপন বা চারা রোপণের জন্য ১.৫ মিটার দূরত্বের নালা (Trench) কেটে মাটি ক'দিন ফেলে রেখে শুকনো করা হয়। তারপর সেচ দিয়ে নালার মাটি ভিজিয়ে তার মধ্যে বীজ বপন করা হয়ে থাকে। মার্চ মাসের প্রথমের দিকে বীজ বপন বা চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

Stump-এর চারাগাছগুলি নালা বরাবর বা রাস্তার ধারে, খালের পার্শ্ববর্তী ঢালু জমিতে রোপণের জন্য নির্দিষ্ট দূরত্বে উপযুক্ত আয়তনের গর্ত কেটে মাটি শুকিয়ে গর্তের মধ্যে জল দিয়ে চারা রোপণ করা হয়ে থাকে।

চারাগুলি সাধারণত ১.৮ × ১.৮ মিটার থেকে ৪ × ৪ মিটার দূরত্বে রোপণ করা হয়ে থাকে। ঘনভাবে রোপণ করলে কাণ্ড লম্বা ও সোজাভাবে বেড়ে ওঠে এবং উন্নতমানের কাঠ (Timber) পাওয়া সম্ভব হয়।

পরিচর্যা –

বীজ বপন বা চারা রোপণের পর মাটির আর্দ্রতা অনুযায়ী, সেচ প্রদান করে শিশু গাছের চারাগুলিকে বড় করে তোলা হয়। 'Wealth of India'-তে বলা হয়েছে, সেচ ব্যবস্থা ছাড়া শিশু গাছের চাষের থেকে সেচ ব্যবস্থার সহযোগে চাষ করলে কাঠের গুণগত মান এবং উৎপাদন দুই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

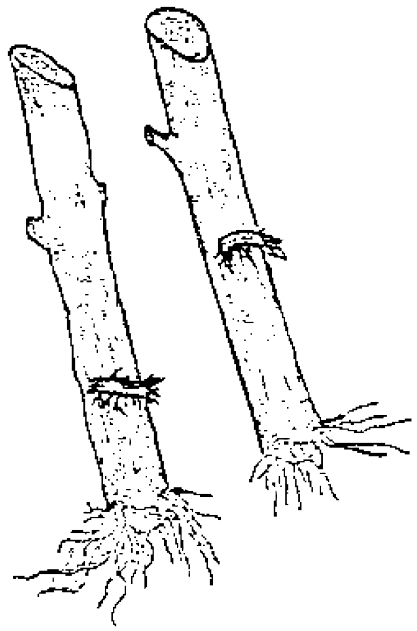
শিশু গাছ শিম্ব গোত্রের উদ্ভিদ। এর শিকড়ের মধ্যে রাইজোবিয়াম ব্যাকটিরিয়া থাকে, যা বাতাস থেকে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে। বেশিরভাগ উদ্ভিদের কাণ্ডের ও মূলের বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। শিম্ব গোত্রের উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও মূল, কাণ্ড এবং তাতে যে ব্যাকটিরিয়া থাকে তাদের বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্যও N.P.K সারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আলাদাভাবে গাছ প্রতি N.P.K পরিমাণ কী হবে তার কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। তাই শিশু চাষ করতে হলে জমির মাটি পরীক্ষা করে, সরকারি কৃষি গবেষণাগার বা বন দফতরের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে সার প্রয়োগ করতে হবে।

রোপণের পর গাছগুলি জমিতে ভালভাবে লেগে যাওয়ার ৩-৪ মাসের পর একবার এবং পরে ৪-১০ মাস পর আর একবার মাটি কুপিয়ে আগাছা দমন করা হয়ে থাকে। যদিও কিছু মিশ্র চাষ করা সম্ভব হলে আলাদা করে আগাছা দমনের প্রয়োজন হয় না। অধিক দূরত্বে রোপণ করা শিশু গাছের মাঝে পেঁপে, কলা বা অন্যান্য শাক-সবজির চাষ করা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে বন বিভাগ অরণ্যের স্বাভাবিক উদ্ভিদ যেমন, খয়ের ইত্যাদির সঙ্গে শিশু গাছের চাষ করে থাকে। এছাড়া অন্য কোনও মিশর ফসলের জমিতে Wind breaker হিসাবে জমির সীমানার চারদিকে, চা-কফির বাগানে ছায়াপ্রদানকারী ও মাটিতে নাইট্রোজেন জোগানোর জন্য শিশু গাছ লাগানো হয়ে থাকে।

অতি ঘনভাবে শিশু গাছের বীজ বপনে বা চারা রোপণে জমিতে সঠিকভাবে আলো-বাতাস চলাচলে অসুবিধা হয় এবং গাছগুলিও সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না। তাই এক্ষেত্রে কাণ্ডের গোড়া থেকে গাছের ১/৩ ভাগ উচ্চতা পর্যন্ত সমস্ত ডাল ছেঁটে দেওয়া হয়। ৬-৭ বছর পর একবার ৩০-৪০% গাছ থিনিং করে কেটে জমির বাকি(প্রায় ৬০%) সুগঠিত কাণ্ডযুক্ত গাছগুলিকে Timber উৎপাদনের জন্য রেখে দেওয়া হয়। থিনিং-এর গাছগুলি সরু কাঠ হিসাবে কাগজ কলের মণ্ড তৈরির কাজে এবং জ্বালানীর কাঠ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

শিশু গাছে সাধারণত Plecoptera reflexa, Dichomeris eridans, Brachytrupes portentosus এবং উঁইপোকা গাছের পাতা খসিয়ে, পাতা জুড়ে দিয়ে বা নার্সারীতে থাকা চারাগাছের ক্ষতিকারক পোকা। এছাড়া কিছু পরাশ্রয়ী গাছ যেমন, Loranthus sp. শিশু গাছের বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটায়।

কিছু ছত্রাকঘটিত রোগের কারণে শিশু গাছের শিকড় বা মূলে ও পাতায় প্রচুর ক্ষতির সম্ভবনা থাকে। Cercospora sissoo গাছের পাতায় কালো দাগ সৃষ্টিকারী এক ধরনের ছত্রাক। Colletotrichum Sissoo ছত্রাকটি পাতার ধ্বসা রোগ ঘটায়। Fusarium Solon, Fomes durissimus প্রভৃতি ছত্রাক কাণ্ডের ও মূলের পচন রোগ ঘটায়। এরফলে শিশু গাছের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে জৈবসার বা জৈব কীটনাশক ব্যবহার করেও রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে। প্রয়োজন হলে কৃষি বা বন দফতরের পরামর্শ নিতে হবে।



ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

সাধারণত বন দফতরের নিয়ম মেনে Thinning ও Rotation–এর মাধ্যমে শিশু গাছের ফসল সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

শিশু গাছের ফসল বলতে এর কাঠ। সেগুন গাছের পরেই কাঠ (Timber) উৎপাদনে শিশু গাছের স্থান। ভারতের উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে প্রচুর পরিমাণে শিশু গাছের চাষ করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশের উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে এই কাঠের চাহিদা সবচেয়ে বেশি।

'Wealth of India'-র তথ্য থকে জানা যায় যে, নদীর তীরবর্তী বা খালের ধারে রোপণ করা শিশু গাছের বেড় ২৫ বছরে ১–২ মিটার হয়ে থাকে এবং ২০ মাস বয়সের চারাগাছ লম্বায় ৭ মিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে। ১০ বছরের Rotation–এর শিশু গাছের উৎপাদন ১০ কিউবিক মিটার, ২০ বছরের Rotation-এ ১০০ কিউবিক মিটার, ৩০ বছরের Rotation-এ ২১০ কিউবিক মিটার, ৪০ বছরের Rotation-এ ২৮০ কিউবিক মিটার, ৫০ বছরের Rotation-এ ৩৭০ কিউবিক মিটার এবং ৬০ বছরের Rotation-এ প্রতি হেক্টরে ৪৬০ কিউবিক মিটার হয়।

উন্নতমানের আসবাবপত্র তৈরির জন্য শিশু গাছের কাঠ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। জানালা, দরজা, ক্যাবিনেট, শৌখিন জিনিসপত্র তৈরি করার জন্য শিশু কাঠ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্লাইউড ও কাগজ শিল্পের প্রয়োজনে মণ্ড তৈরি করতে শিশু কাঠ অতি প্রয়োজনীয়। মজবুত এই কাঠ যন্ত্রপাতির হাতল, লেদ কারখানার টেবিল, করাত কলের টেবিল প্রভৃতিতে নির্ভরযোগ্য কাঠ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

জ্বালানী হিসাবে শিশু কাঠ খুব উন্নত ধরনের। কাঠ ছাড়াও এই গাছের ডালপালা ও শিকড় বা মূলও জ্বালানীর কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রতি হেক্টর জমিতে ১০ বছরের Rotation-এ ৫১০ টন কাঠ (Timber), ২৩১ টন ডালপালা এবং ২৪৪ টন পাতা ও সরু ডাল উৎপন্ন হতে পারে।

শিশু গাছের পাতায় ৩২–৪৮% শুষ্ক পদার্থ এবং ২.৭ -২৪.১% ক্রুড প্রোটিন বর্তমান। তাই এই পাতা উত্তম পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শিশু গাছের ফুল থেকে মৌমাছিরা মধু সংগ্রহ করে।

শিশু গাছের থেকে পাতা, কাণ্ড, মূলের মধ্যে একপ্রকার পদার্থ থাকে। যা পোকামাকড়ের লার্ভা দমন করতে কীটনাশক হিসাবে নিম খোলের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

শিশু গাছের বীজের তেল এবং কাঠের গুঁড়ো চর্মরোগ প্রতিরোধে ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে, ভূমিক্ষয় রোধ করতে, শহরাঞ্চলে রাস্তার ধারের শোভাবর্ধনের জন্য এই গাছ রোপণ করা হয়ে থাকে।

তথ্যসূত্র - wikipedia, The bio...Roxbury.exDC. by Kamal Hussain, Tanta University...Botany



আকাশমণি

পরিচয় –

Acacia auriculiformis (Benth) A. Cunn, আকাশমণি গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম A. auriculiformis, এটি Leguminosae গোত্রের Mimosaceae উপগোত্রের বহুবর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী চিরহরিৎ বৃক্ষ শ্রেণীর উদ্ভিদ।

আকাশমণি গাছের আদি জন্মস্থান অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং পাপুয়া নিউগিনিয়া। পরবর্তীকালে রোপণের মাধ্যমে আমেরিকা, কম্বোডিয়া, ক্যামেরুন, চিন, কঙ্গোদেশ, ভারত, জাপান, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনস্, থাইল্যান্ড, উগান্ডা, তানজিনিয়া, জিম্বাবোয়ে, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশে বিস্তারলাভ করে। আমাদের রাজ্যে ১৯৪৬ সালে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চলে রোপণের মাধ্যমে ভারতে আকাশমণি গাছের পদার্পণ ঘটে। ১৯৭০ সালে দক্ষিণ ভারতে এই গাছের রোপণ শুরু হয়।

ইংরেজি আকাশমণি গাছকে জাপানীস (Acacia) বা অস্ট্রেলিয়ান ওয়াটেল বলে। বাংলায় এই গাছটি আকাশমণি বা সোনাঝুরি নামে পরিচিত। হিন্দিতে এটি সোনাঝুরি, কাশিয়া, আকাশমণি এবং নর্দান ব্ল্যাক ওয়াটেল বলে।

আকাশমণি একটি মাঝারি আকৃতির উদ্ভিদ। লম্বায় ১৫-৩০ মিটার উঁচু হতে পারে। কাণ্ডের বেড় ৫০ সেমি পর্যন্ত হয়ে থাকে। কাণ্ডের ত্বকে লম্বা ফাটা দাগ দেখা যায়। কাণ্ডটি একটু বাঁকাভাবে বেড়ে ওঠে।গাছের মূলতন্ত্র অগভীরভাবে বিস্তৃত থাকে। এই গাছের পাতা জন্মানোর পরই খসে পড়ে যায়। তাই সহজে নজরে পড়ে না। পত্রবৃন্ত রূপান্তরিত হয়ে লম্বা-চওড়ায় ১০-১৬ সেমি ১০-১৬ সেমি X ১.৫-২.৫ সেমি সবুজ রঙের ফাইলোডটির সৃষ্টি হয়। ফাইলোড বা পাতাগুলি একান্তরভাবে সজ্জিত থাকে। ফাইলোডটি কাস্তের মতো বেঁকানো আকৃতির পুরু এবং এতে ৩-৪টি সমান্তরাল শিরা দেখতে পাওয়া যায়।

আকাশমণি গাছের ফুলগুলি শাখাপ্রশাখার অগ্রভাগের প্রতিটি পাতার কক্ষ থেকে একজোড়া করে ৮-১০ সেমি লম্বা পুষ্পমঞ্জরীর উপর ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে সজ্জিত থাকে। ফুলগুলি অবৃন্তক, কমলা বা হলুদ রঙের হয়ে থাকে। ফুলগুলিতে অসংখ্য পুংকেশর দেখতে পাওয়া যায়, বৃতি বা দলমণ্ডল দেখা যায় না। আকাশমণি গাছের ফলগুলি চ্যাপটা এবং প্যাঁচানো আকারের হয়। পরিণত হয়ে গেলে ফলের প্যাঁচ আরও বেড়ে গিয়ে ফেটে যায় এবং কালো রঙের হয়ে যায়। বীজের সঙ্গে কমলা সুতোর মতো শাঁস লেগে থাকে।

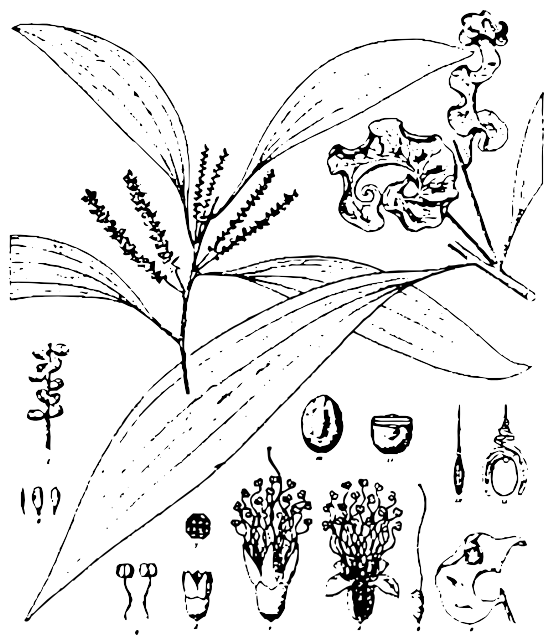
আকাশমণি গাছ সমুদ্রতল থেকে ৪০০ মিটার উচ্চভূমিতে জন্মাতে পারে। তবে ৮০ মিটার উচ্চতায় ভাল জন্মায়। ৭০০-২০০০ মিলিমিটার বার্ষিক বৃষ্টিপাত এই গাছের জন্য উপযুক্ত। যদিও ৭ মাস বৃষ্টিহীন শুষ্ক আবহাওয়ায় বেঁচে থাকতে পারে। শীতকালে ১৭-২২ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং গ্রীষ্মকালে ৩২-৩৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা আকাশমণি গাছের পক্ষে উপযুক্ত।

বিভিন্ন প্রকার মাটিতে আকাশমণি গাছ জন্মাতে পারে। মাটির অম্ল ও ক্ষারের মাত্রা ৪.৩-৯ PH হলে ভাল হয়। ক্ষারীয় মৃত্তিকা ও নোনা মাটিতে, যেমন চুনাপাথর মিশ্রিত মাটি প্রভৃতিতে এই গাছ জন্মাতে পারে। দোঁয়াশ মাটি, কৃষ্ণ ও ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা, বেলে-দোঁয়াশ মাটি আকাশমণি চাষের উপযুক্ত।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

সাধারণত বীজের দ্বারাই এই গাছের স্বাভাবিক প্রসারণ ঘটে থাকে। তবে কৃত্রিমভাবে প্রসারণের জন্য নার্সারীর বেডে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঘটিয়ে চারা তৈরি করা হয়। পুষ্ট আকাশমণি বীজ সংগ্রহ করে রাখা হয়। বীজকে শোধন করার পর ৩-৪ মিনিট গরম জলে ভিজিয়ে তারপর ২৪ ঘণ্টা ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে নার্সারীর বেডে বপন করে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঘটিয়ে অঙ্কুরিত বীজগুলি উপযুক্ত জৈবসার (FYM) মিশ্রিত মাটি দিয়ে ভর্তি পলিব্যাগে স্থানান্তরিত করা হয় বা সরাসরি পলিব্যাগে পরিশোধিত বীজ বপন করেও চারা তৈরি করা যেতে পারে। নার্সারীতে পরিচর্যায় ৩-৪ মাসের মধ্যে চারাগুলি লম্বায় ২৫-৩০ সেমি বেড়ে ওঠে। এরপর চারাগুলি নির্দিষ্ট জমিতে রোপণ করা হয়ে থাকে।

রোপণের আগে জমিতে চাষ দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে মাটি প্রস্তুত করা হয়। আকাশমণি গাছের ছোট চারাগুলি ছায়াযুক্ত স্থানে ভাল জন্মায়। পরে অবশ্য এর বৃদ্ধির জন্য ৭০% সূর্যের আলোর প্রয়োজন হয়। সেইমতো জমিতে চারাগাছ রোপণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।



বর্ষার ঠিক আগে চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে সেচের ব্যবস্থাযুক্ত স্থানে বর্ষার পর অক্টোবর–নভেম্বর মাসের যে কোনও সময়েও চারাগাছ রোপণ করা যেতে পারে। ঘনভাবে রোপণের জন্য ২ X ২ মিটার ব্যবধানে বা বর্গাকারে রোপণের জন্য ৪ X ৫ মিটার ব্যবধানে ৪৫-৫০ সেমি আয়তনের কিউবিক পিট বা গর্ত কেটে চারা রোপণের উপযুক্ত করে রাখা হয়। ঘনভাবে রোপণের জন্য জমিতে নালা কেটে তারমধ্যে চারা রোপণ করা হয়। অথবা ৪ মিটার লম্বা ও ০.৫০ মিটার চওড়া এবং ০.৫০ মিটার গভীরভাবে ট্রেঞ্চ বা পরিখা কেটে ধাপ তৈরি করে ৫ মিটার ব্যবধানে পাহাড়ী ঢালু জমিতে কিংবা অসমান জমিতে চারা রোপণ করা হয়ে থাকে। অতি ঘনভাবে রোপণের গাছ জ্বালানী কাঠের প্রয়োজনে। মাঝারি ঘন রোপণের গাছে কাণ্ড কাগজের মণ্ডের জন্য এবং বেশি দূরত্বের গাছকে টিম্বার বা কাঠ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

চারাগাছ রোপণের পর জমিতে চারাগাছ ধরে যাওয়া বা লেগে যাওয়া পর্যন্ত জাল দিয়ে পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। রোপণের পর শক্ত লাঠি বা কঞ্চির সঙ্গে গাছগুলি বেঁধে দিলে তা সোজাভাবে গাছের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

পরিচর্যা –

আকাশমণি গাছ প্রচুর খরা সহ্য করতে পারে। তাই বৃষ্টির জলই এই গাছের বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট, আলাদা করে সেচের প্রয়োজন হয় না। আকাশমণি গাছের Nitrogen fixation করার ক্ষমতা থাকায় এবং গাছের তলায় প্রচুর পরিমাণে পাতা, ফল ইত্যাদি ঝরে পড়ায় তা থেকে যে Biomas তৈরি হয় তা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ঘটিয়ে সার হিসাবে কাজ করে। আলাদা করে সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।

কিছু কীটপতঙ্গ আকাশমণি গাছের কাণ্ডের ক্ষতি করে। ফলে প্রধান কাণ্ডের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ডালপালার বৃদ্ধি বেশি হয়ে যাওয়ায় কাঠের উৎপাদন কমে যায়। সাধারণত Sinoxylon প্রজাতির পতঙ্গের আক্রমণে কাণ্ডের ক্ষতি হয়। Ganoderma Lucidum নামে একপ্রকার ছত্রাকের আক্রমণে আকাশমণি গাছের মূলের পচন (Root rot) রোগ হয়ে থাকে। বন দফতরের পরামর্শ অনুযায়ী, ব্যবস্থা গ্রহণ করে রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

গাছের গোড়ার চারপাশের আগাছা পরিষ্কার করে আগাছা দমন করা যেতে পারে। তবে এই গাছ সাধারণভাবে আগাছা অতিক্রম করে বেড়ে উঠতে পারে বলে আলাদা করে আগাছা পরিষ্কার না করলেও চলে। রোপণের পর আকাশমণি গাছের সঙ্গে Kenaf (Hibiscus cannabinus) ধান, চিনা বাদাম ইত্যাদির চাষ করা যেতে পারে। বনাঞ্চলে আকাশমণি গাছের সঙ্গে Cassia siamea, Dalbergia sissoo, ইউক্যালিপটাস, বাবলা ইত্যাদি গাছ রোপণ করা হয়ে থাকে।

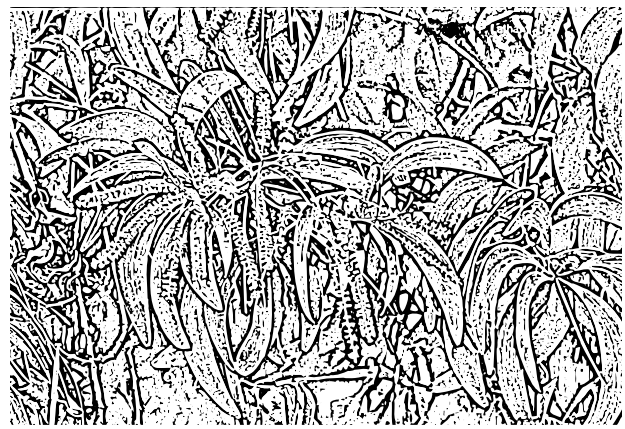
রোপণের ৩-৪ বছর পর থেকে আকাশমণি গাছের জমি থেকে কিছু গাছ কেটে গাছের ঘনত্ব কমালে অবশিষ্ট গাছগুলি সঠিকভাবে বাড়তে পারে। এছাড়া ১০ বছর পর থেকে Rotation-এর মাধ্যমে গাছ কেটে অন্য গাছগুলিকে কাঠের জন্য উপযুক্তভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দেওয়া হয়। একইসঙ্গে ফাঁকা জায়গায় নতুন গাছ রোপণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে অরণ্যের বৃদ্ধির হার ঠিক রাখা যেতে পারে।

আকাশমণি গাছের কাণ্ডটিকে সোজাভাবে বড় করে তোলার জন্য নিচের দিকের ডালপালাগুলি কেটে দিলে লম্বায় দ্রুত লম্বায় বৃদ্ধি ঘটানো যায়। আবার কাণ্ডের বেড়ের (মোটা করে) বৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট উচ্চতায় গাছের মাথা–ডগা কেটে দেওয়া হয়ে থাকে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

আকাশমণি গাছ থেকে সরাসরি জ্বালানি, কাঠের মণ্ড ও মাঝারি মানের আসবাবপত্র তৈরির কাঠ পাওয়া যায়। জ্বালানি কাঠের ক্যালরি মূল্য ৪৫০০-৮৯০০ ক্যালরি প্রতি কেজি এবং এর থেকে উন্নতমানের চারকোল বা কাঠ কয়লা উৎপন্ন হয়। প্রতি কিউবিক মিটারে আকাশমণি কাঠের ঘনত্ব ৫০০-৬০০ কেজি। আসবাবপত্র যন্ত্রপাতির হাতল, খেলনা, ক্যারামের ঘুঁটি ইত্যাদি তৈরি উপযুক্ত।

বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক পরিবেশে (মাটি ও বৃষ্টিপাত) আকাশমণি গাছের কাঠ উৎপাদন বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরের আড়াবাড়ীতে ১০০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতযুক্ত লালমাটিতে ১৬ বছরের গাছের কাণ্ডের বেড় ৩৬ সেমি এবং উচ্চতায়

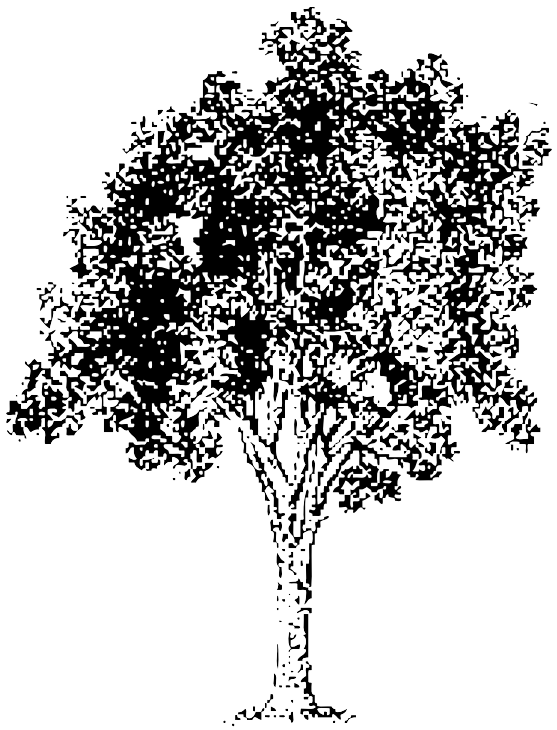


১০.২ মিটার। আবার এরাজ্যের গড়বেতায় ১২০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত ও ল্যাটেরাইট মাটিতে ১০ বছরের গাছের বৃদ্ধি ৮.৫ মিটার ও কাণ্ডের বেড় ২৮ সেমি হতে পারে।

প্রতি হেক্টর জমি থেকে ৫ বছরে ১৫-২০ কিউবিক মিটার কাঠের উৎপাদন সম্ভব। এরপর প্রতি বছরে কাঠের ২-৫ কিউবিক মিটার বৃদ্ধি ঘটে। ২০০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলের উর্বর মাটিতে কাঠ উৎপাদনে ১৫-২০ কিউবিক মিটার বৃদ্ধি ঘটতে পারে। তবে অনুর্বর জমিতে প্রতি হেক্টরে গাছের কাঠের বৃদ্ধি ৮-১২ কিউবিক মিটার হয়ে থাকে।

কাঠ ছাড়া আকাশমণি গাছের পাতা গবাদিপশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই গাছের ফুল থেকে মৌমাছি উৎকৃষ্ট মানের মধু উৎপন্ন করে। কাগজশিল্পে আকাশমণি গাছের কাণ্ড মণ্ড তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। আকাশমণি গাছের ছালে ১৩-২৫% ট্যানিন এবং ৬-১৪% প্রাকৃতিক রং তৈরির উপাদান পাওয়া যায়। যা বস্ত্রশিল্পে ব্যবহারের পক্ষে উপযুক্ত। এই গাছের গোড়ার মাটিতে পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি খসে পড়ে প্রতি বছর প্রতি হেক্টর জমিতে ৯.১৭ কেজি নাইট্রোজেন, ৪.২০ কেজি ফসফেট, ২০.১৮ কেজি পটাশ, ৪৪.৫১ কেজি ম্যাগনেসিয়াম ও ১৭.৬৫ কেজি ক্যালসিয়াম সরবরাহ করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। ফলে পতিত বা চাষের অযোগ্য জমি উর্বর জমিতে পরিণত হতে পারে। তাই অনুর্বর জমিতে এই গাছ রোপণ করা যেতে পারে। আকাশমণি গাছের অগভীরভাবে বিস্তৃত শিকড় ভূমিক্ষয় রোধে সাহায্য করে। আকাশমণি গাছের শাখাপ্রশাখায় বিপুল পরিমাণে পাতা জন্মায়, যা ছায়াদানের জন্য উপযুক্ত। বনভূমির প্রাকৃতিক উদ্ভিদকে রক্ষা করার জন্য ও সারা বছর বনভূমিকে সবুজ রাখার জন্য এবং পরিত্যক্ত অনুর্বর জমির উর্বরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য আজ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বনসৃজনে আকাশমণি গাছকে বেছে নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া রাস্তার ধারের সৌন্দর্যায়ন বৃদ্ধিতে এই গাছ খুবই উপযোগী। বর্তমানে শহর ও শহরতলিতে রাস্তার ধারে ব্যাপকভাবে আকাশমণি গাছ রোপণ করা হচ্ছে। এককভাবে বা সুবাবুল, শিশু, Cassia sericea, ইউক্যালিপটাস, Casuarina equisetifolia প্রভৃতি গাছের সঙ্গে একত্রেও এই গাছ রোপণ করা হচ্ছে। এক কথায়, এই গাছের নানান গুণাগুণ ও ব্যবহার বিবেচনা করে ভারতে ক্রমশ এর চাহিদা বা কদর বাড়ছে।

তথ্যসূত্র – World Agro Forestry Database



লম্বু

পরিচয় –

লম্বু গাছের বিজ্ঞানসম্মত Khaya anthotheca, এটি Meliaceae গোত্রের দ্বিবীজপত্রী বহুবর্ষজীবী চিরহরিৎ বিশাল লম্বা আকৃতির উদ্ভিদ। Khaya nyasica এবং Garretia anthotheca লম্বু গাছের অপর দুটি বিজ্ঞানসম্মত নাম।

লম্বু গাছ আফ্রিকান মেহগনি নামে পরিচিত। আফ্রিকা মহাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে এবং পর্বতের পাদদেশের নিকাশীযুক্ত ঢালু পার্বত্য ভূমিতে লম্বু গাছ স্বাভাবিক (Natural) উদ্ভিদ হিসাবে জন্মায়। আফ্রিকার উষ্ণ-জলবায়ু (Tropical) অঞ্চলে Khaya গনের ৪টি এবং মাদাগাসকারের কোমোরো দ্বীপে Khaya গনের আরও দুটি প্রজাতির, সব মিলিয়ে মোট ৬টি প্রজাতির গাছ জন্মায় যা আফ্রিকান মেহগনি নামে পরিচিত। যেমন, Khaya anthotheca (ইষ্ট আফ্রিকান মেহগনি), Khaya ivorensis (লাগোস মেহগনি), Khaya senegalensis (সেনেগাল মেহগনি), Khaya grandifoliola (বড় পাতার মেহগনি বা বেনিম মেহগনি বা সেনেগাল মেহগনি) ও Khaya madagascariensis (মাদাগাসকার মেহগনি)। হংরোজতে লম্বু গাছকে East African mahogany বলে। এছাড়া এই গাছটি Nyasaland mahogany, Red mahogany, White mahogany, Uganda mahogany ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত। তবে বাংলায় এই গাছটি লম্বু নামেই সুপরিচিত।

ভারতে ঠিক কবে লম্বু গাছ প্রথম রোপণ করা হয়েছিল তার কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে দু'দশক আগে বাংলাদেশের নার্সারীগুলিতে এক ধরনের দ্রুত বৃদ্ধির লম্বা আকৃতির গাছ রোপণ শুরু হয়েছিল, যা লম্বু নামে পরিচিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে লম্বু গাছ দেখতে পাওয়া যায়।

লম্বু গাছ (Khaya anthotheca) লম্বায় ৬০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। কাণ্ডের বেড় ২ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। পুরনো গাছের কাণ্ডের গোড়ার দিকে Root Buttressed জন্মায়। কাণ্ডের প্রায় ৩০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত শাখাহীন থাকে। কাণ্ডের ত্বক ধূসর বাদামী, কিন্তু মসৃণ হয়ে থাকে। পুরনো কাণ্ডের গোড়ার দিকে ত্বক থেকে চোকলা (Flace) জন্মাতে পারে। লম্বু গাছের পাতাগুলি কাণ্ডের উপর বা শাখাপ্রশাখার উপর একান্তরভাবে বা সর্পিলভাবে সজ্জিত থাকে। পাতাগুলি পক্ষল যৌগিক প্রকৃতির। পত্রাক্ষে ৩-৭ জোড়া উপপত্র থাকে। উপপত্রগুলি ২-২০ সেমি পর্যন্ত লম্বা পত্রাক্ষের উপর বিপরীতমুখী হয়ে জন্মায়। উপপত্রগুলি অসম আকৃতির, মসৃণ। পাতার কিনারা সমান হয়ে থাকে। উপপত্রগুলি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৫-২০ সেমি X ২-১০ সেমি আকারের হয়। শাখাপ্রশাখার অগ্রভাগে এবং পাতার কক্ষে শাখাপ্রশাখা যুক্ত ৩০-৪০ সেমি লম্বা পুষ্পমঞ্জরীতে ফুলগুলি জন্মায়। ফুল সাদা রঙের এবং সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত হয়ে থাকে। ফুলে বৃতি ও পাপড়ির সংখ্যা ৪-৫টি হয়ে থাকে। ফুলগুলি ১০ মিলিমিটার ব্যাসের হয়ে থাকে। পুরুষ ফুল ও স্ত্রী ফুল আলাদা হয়, কিন্তু একই গাছে জন্মায়। পুং ফুলে ৮-১০ পুংকেশর সংযুক্ত হয়ে স্ট্যামিনাল টিউব গঠন করে এবং স্ত্রী পুংকেশরগুলি দুর্বল এবং অপরিণত হয়ে থাকে। গর্ভাশয়টি ৪-৫টি প্রকোষ্টযুক্ত হয়। গর্ভদণ্ডটি ১ মিলিমিটার লম্বা হয়ে থাকে। সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফুলগুলি ফোটে। ওই সময় পতঙ্গের দ্বারা ফুলের পরাগসংযোগ ঘটে। ফলগুলি ৮-১০ সেমি ব্যাসের বা আকারের হয়। এটা শক্ত, কাষ্ঠল, ডিম্বাকার বা ক্যাপসুল প্রকৃতির। ফলে অনেকগুলি বীজ থাকে। বীজগুলি গোলাকার বা চারকোণা এবং পাতলা ডানাযুক্ত হয়। ফলটি ৪-৫ভাগে বিভক্ত হয়ে ফেটে যায় এবং বাতাসের দ্বারা বীজের প্রসারণ ঘটে। মার্চ–সেপ্টেম্বর মাসে ফল পরিণত হয়।

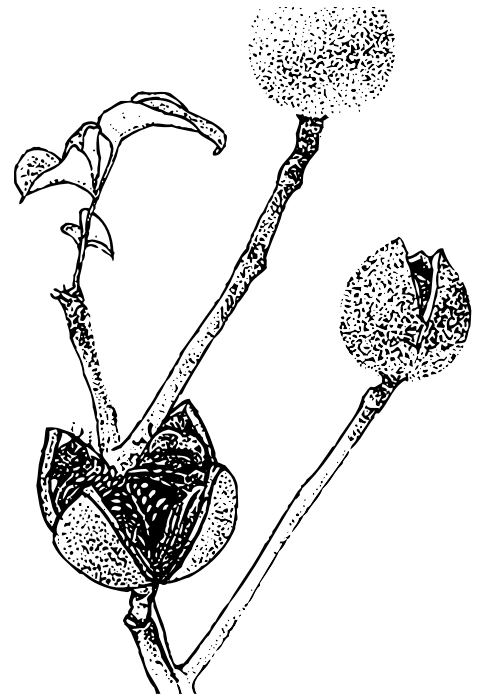
২১-২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা লম্বু গাছের পক্ষে উপযুক্ত। সমুদ্রতল থেকে ১৫০০ মিটার উচ্চভূমিতে লম্বু গাছ জন্মাতে দেখা যায়। এই গাছ ২-৩ মাস বৃষ্টিপাতহীন জলবায়ু সহ্য করতে পারে। ১৬০০-২৫০০ মিলিমিটার বার্ষিক বৃষ্টিপাত লম্বু গাছের পক্ষে উপযুক্ত। ছোট অবস্থায় লম্বু গাছ একটু ছায়াযুক্ত জায়গায় জন্মায়। খুব ঠাণ্ডা জলবায়ু ও তুষারপাত লম্বু গাছের পক্ষে ক্ষতিকারক।

উত্তম নিকাশীযুক্ত আর্দ্র উর্বর পলিমাটিতে লম্বু গাছ ভাল জন্মায়। নদীর তীরবর্তী পলিমিশ্রিত ঢালু জমিতে লম্বু গাছের বৃদ্ধির পক্ষে উপযুক্ত।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

জঙ্গলের মধ্যে বীজের স্বাভাবিক বিস্তারের ফলে প্রচুর চারাগাছ জন্মায়। কিন্তু বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক

চারাগাছই বেঁচে থাকে।



জমিতে সরাসরি বীজ বপন করে বা নার্সারীতে বীজের চারা তৈরি করে এবং পরিচর্যার দ্বারা বীজের চারা থেকে Stamp তৈরি করে রোপণের মাধ্যমে সাধারণত লম্বু গাছের কৃত্রিম প্রসারণ ঘটানো হয়ে থাকে।

পুষ্ট পরিপক্ক লম্বু গাছের ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হয়। রোদে শুকিয়েও এই বীজ বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায় না কারণ শীঘ্রই বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত (৩ মাসের মধ্যে) হয়। নার্সারীর বীজ জলে ভিজিয়ে নার্সারীর ছায়াযুক্ত বেডে বপন করা হয়। ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে বীজ থেকে চারাগাছ জন্মে যায়। চারাগাছগুলি পরিচর্যার মাধ্যমে লম্বায় ৩০ সেমি বড় হলে এবং এর যৌগিকপত্র জন্মালে তা অন্যত্র রোপণ করা যেতে পারে। তবে ছোট চারাগাছগুলিকে নার্সারীতে পলিব্যাগে রোপণ করে লম্বায় ১-২ মিটার বড় করে জমিতে রোপণ করা হয়ে থাকে। রোপণের আগে পাতাগুলি কেটে দেওয়া হয়। বেশি পাতাযুক্ত গাছ রোপণ করলে Transpiration-এর মাধ্যমে অতিরিক্ত বাষ্পীভবন হলে গাছের রস শুকিয়ে চারাগাছের মৃত্যুর হার বেশি হতে পারে। এছাড়া চারাগাছগুলিকে নার্সারীতে ছাঁটাই করে মূলের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে ২বছর পরিচর্যার মাধ্যমে Stamp তৈরি করেও রোপণ করে লম্বু গাছের কৃত্রিম প্রসারণ ঘটানো হয়।

লম্বু গাছের জন্য নির্দিষ্ট জমিতে লাঙল বা ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে মই দিয়ে জমির মাটি সমান করে এবং জমির ঢাল বজায় রেখে জমি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। পাহাড়ের বা ঢালু জমিতে কোদালের সাহায্যে বা স্টাম্প বা চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরি করে জমিকে উপযুক্ত করে তোলা হয়। বর্ষার আগে জমি প্রস্তুত করা থাকলে বর্ষা শুরুর ঠিক আগে অর্থাৎ এপ্রিল-মে মাসে চারাগুলি রোপণ করা যায়। আমাদের দেশে লম্বু গাছের চাষ ব্যবস্থার বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। দক্ষিণ আফ্রিকায় ৫ X ৫ মিটার দূরত্বে এবং Puerto Rico দ্বীপে বা আফ্রিকা মহাদেশের অন্য দেশে ২.৪ X ২.৪ মিটার দূরত্বে রোপণের মাধ্যমে লম্বু গাছের চাষ হয়ে থাকে। বর্ষার ঠিক আগে ১ X ১ X ১ মিটারের নির্দিষ্ট দূরত্বে বা চারাগাছের দৈর্ঘ্য অনুসারে গর্ত করে তার মাঝখানে লম্বু গাছের চারাগুলি সোজাভাবে পুঁতে গাছের গোড়ায় উপরের মাটি দিয়ে ঢালু করে লেভেল করে দেওয়া হয়। যাতে বর্ষায় গাছের গোড়ায় জল না জমতে পারে। যেহেতু চারাগাছগুলি কম-বেশি ২ মিটার লম্বা হয়, তাই চারাগাছ রোপণের পর লম্বা লাঠি বা বাঁশ বেঁধে দেওয়া হয়। এতে চারাগাছটি সোজাভাবে থাকতে পারে।

পরিচর্যা –

লম্বু গাছ রোপণের পর প্রতিদিন নিয়মিত মাটির আর্দ্রতা অনুযায়ী জল দেওয়ার প্রয়োজন হয়। চারাগাছগুলি জমিতে লেগে যাওয়ার পর বা বর্ষাকালে জলসেচের প্রয়োজন হয় না। বহুদিন বৃষ্টি না হলে, ১৫-২০ অন্তর প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দেওয়া যেতে পারে।

প্রতিটি গাছের জন্য বছরে ১০০-২০০ গ্রাম ওজনের NPK (নাইট্রোজেন, ফসফেট এবং পটাশ) সার গাছের গোড়া থেকে কিছুটা দূরত্বে মাটি খুঁড়ে বৃত্তাকারে প্রয়োগ করলে গাছের বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়ে থাকে।

লম্বু গাছের Seedling চারাগুলিতে কাণ্ডছিদ্রকারী পোকা Tragocephala variegata এবং Hypsipyla robusta-র আক্রমণ দেখা যায়। এরা প্রধান কাণ্ডের মধ্যে ছিদ্র করে লম্বায় গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত করে। এরফলে টিম্বার বা কাঠ উৎপাদন ক্ষে যায়। প্রতিকার হিসাবে মিশ্রচাষ, পার্শ্বশাখা কেটে দেওয়া বা অন্যান্য পরিচর্যার মাধ্যমে এই পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। মিশ্র পদ্ধতিতে লম্বু গাছের সঙ্গে বিভিন্ন দানাশস্য বা মটরশুটি বা শিম্বগোত্রের অন্য উদ্ভিদ চাষ করে আগাছা দমন, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, আর্দ্রতা সংরক্ষণ প্রভৃতি একই সঙ্গে করা যেতে পারে। যেখানে সাথীফসল চাষ করা সম্ভব হয় না, সেখানে সুবাবুল গাছ রোপণ করে বা বপন করে লম্বু গাছের জন্য প্রয়োজনীয় ছায়াদানের ব্যবস্থা, আগাছা দমন ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

লম্বু গাছ প্রথম থেকেই শাখাহীনভাবে লম্বায় ২৫-৩০ মিটার পর্যন্ত বেড়ে ওঠে তাই কোনও প্রকার ডালছাঁটায়ের দরকার হয় না। কিন্তু ছায়াপ্রদানকারী গাছের ডাল ছাঁটাই করে লম্বু গাছকে বেড়ে ওঠার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জায়গার ব্যবস্থা করে দিতে হয়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

লম্বু খুব দ্রুত বৃদ্ধির একটি গাছ। বছরে লম্বায় ১.৫ মিটার বাড়তে পারে। অর্ধপর্ণমোচী অরণ্যে ১০ বছরে কাণ্ডের বৃদ্ধি লম্বায় ১২ মিটার এবং কাণ্ডের বেড় ১৮ সেমি হতে পারে। লম্বু গাছের চাষ করে একটি ৩০ বছরের গাছ থেকে মোটামুটি উন্নতমানের ও

ব্যবহারযোগ্য কাঠ উৎপাদন সম্ভব। প্রতি হেক্টরে ২-৪ কিউবিক মিটার কাঠ পাওয়া যেতে পারে ।

লম্বু গাছ কাটার পর বেশিদিন ফেলে রাখলে এক ধরনের পোকার আক্রমণে কাঠের ক্ষতি হতে পারে এবং কাঠের মধ্যে ফাটল দেখা দিতে পারে। তাই তাড়াতাড়ি জলে ফেলে রেখে তারপর Sowing করলে ভাল কাঠ পাওয়া যায়।

Khaya গনের অন্যান্য প্রজাতির লম্বু গাছের কাঠও একই নামে বিদেশে রফতানি (Export) করা হয়। লম্বু গাছের মূল্যবান কাঠ সমস্ত প্রকার আসবাবপত্র, জানালা-দরজার ফ্রেম ও প্যানেলের কাজের জন্য উপযুক্ত, কাঠের মেঝের পক্ষেও এই কাঠ ব্যবহৃত হয়, জাহাজের কাজে, নৌকা তৈরিতে, গাড়ির কাঠামোয়, প্লাইউড কারখানায় এবং কাগজের মণ্ড তৈরির কারখানায় এই কাঠ ব্যবহৃত হয়। গাছের ডালপালা জ্বালানী হিসাবে এবং চারকোল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

এই গাছের কাণ্ডের ছাল অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা রোগ সারাতে এবং কৃমিনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। স্বাভাবিক অরণ্যে লম্বু গাছের Rotation বা গাছ কাটার জন্য ৬০ সেমি ব্যাসের কাণ্ডগুলিকে বেছে নেওয়া হয়। আফ্রিকার বিভিন্ন অরণ্যে ৮০ সেমি ও ১১০ মিটার বেড়ের কাণ্ডের গাছগুলি কাটা হয়ে থাকে।

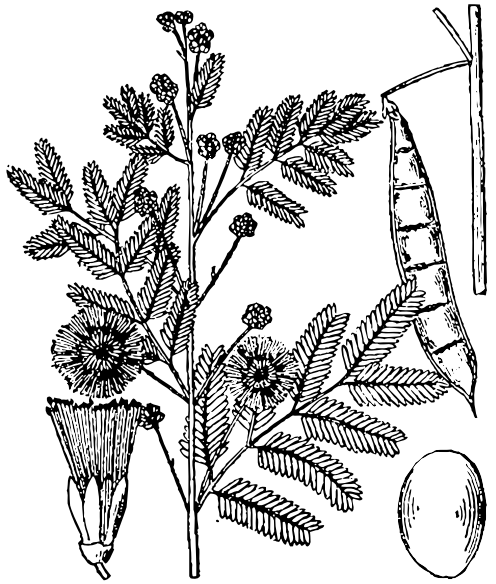
ঘন বা অতি ঘন রোপণের লম্বু গাছের Rotation থিনিং অর্থাৎ গাছ কেটে গাছের ঘনত্ব পাতলা করে অবশিষ্ট গাছগুলিকে মোটা করে বেড়ে ওঠার ব্যবস্থা করে করা হয়। লম্বু গাছগুলির কাণ্ড যখন লম্বায় ১৫ মিটার এবং কাণ্ডের বেড় ১৫ সেমি হয় তখন প্রথম থিনিং করা হয়ে থাকে। এই সময় প্রতি হেক্টরে ১০০০টি গাছের মধ্যে থেকে ৪০০-৫০০টি গাছ রেখে বাকিগুলি কেটে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় থিনিং করা হয়, যখন কাণ্ডটি লম্বায় ২০ মিটার ও কাণ্ডের বেড় ২০ সেমি হয়। এই সময় অবশিষ্ট ৪০০-৫০০টি গাছের মধ্যে থেকে ২০০-২৫০টি গাছ রেখে বাকি গাছগুলি কেটে ফেলা হয়। তৃতীয় ধাপে গাছের দৈর্ঘ্য যখন ২৫ মিটার ও কাণ্ডের বেড় ২৫ সেমি হয় তখন প্রতি হেক্টরে ১২৫-১৫০টি গাছ রেখে বাকি গাছগুলি কেটে দেওয়া হয়। এরপর কাণ্ডের বের যখন ৩০ সেমি ব্যাসের হয় তখন চথুর্থবার থিনিং করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে ৭৫-১০০টি গাছ রেখে বাকি গাছগুলি কেটে ফেলা হয়। এইভাবে থিনিং করার পর লম্বু চাষের জমিতে যে খালি জায়গা তৈরি হয় তখন আবার তাতে মিশ্র পদ্ধতিতে ধান, ভুট্টা, মটরশুটি ইত্যাদির চাষ করে বাড়তি আর্থিক লাভ করা সম্ভব হয় বা নতুন করে বনসৃজন করা যায়।

International Union for Conservation of Nature (IUCN) লম্বু গাছকে তার আদি জন্মস্থানে অবলুপ্ত প্রায় প্রজাতির গাছের তালিকায় (Red data Book) অন্তর্ভূক্ত করেছে এবং Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)-এর তালিকায় লম্বু গাছের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাই পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আজ রোপণের মাধ্যমে লম্বু গাছের প্রসার ঘটানো জরুরি হয়ে পড়েছে।

জাত পরিচিতি –

Khaya anthotheca কোনও প্রকার জাত পরিচিতির তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে প্রাকৃতিকভাবে Khaya গণের বিভিন্ন প্রজাতির গাছগুলি আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জন্মায়। আবার গাছগুলির আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের কারণে আলাদা প্রজাতি হিসাবে নাম দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন দেশের নামেও যেমন, সেনেগাল, মাদাগাস্কার, উগান্ডা, ইস্ট আফ্রিকা নামের সঙ্গে মেহগনির নাম যুক্ত হয়ে এর বাণিজ্যিক প্রসার ঘটেছে।

তথ্যসূত্র - Lambu Plant Resources of Tropical Africa,wikipedia



বাবলা

পরিচয় –

বাবলা গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Acacia nilotica, এটি Leguminosae গোত্রের Mimosaceae উপগোত্রের গুল্ম বা ছোট আকৃতির বহুবর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। বাবলা গাছের অতি পরিচিত অপর একটি বিজ্ঞানসম্মত নাম Acacia arabica ভারতে বাবলা গাছের অনেকগুলি উপ-প্রজাতির উদ্ভিদ জন্মায়।

বাবলা গাছের আদি জন্মস্থান ভারতীয় উপমহাদেশে এবং ট্রপিকাল আফ্রিকা, বার্মা (মায়ানমার), শ্রীলঙ্কা, সৌদি আরব, মিশর এবং সুদানের পূর্ব থেকে পশ্চিম অংশ। ভারতের মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা এবং কর্ণাটকে বাবলা গাছের স্বাভাবিক অরণ্য দেখা যায়।। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি, কাশ্মীর বাদে প্রায় ভারতের সব রাজ্যেই স্বাভাবিক ও বিচ্ছিন্নভাবে বাবলা গাছ জন্মাতে দেখা যায়। ভারতের অনেক রাজ্যেই রাস্তার ধারে, সামাজিক বনসৃজনের মাধ্যমে এবং অন্যান্য জায়গায় বাবলা গাছ রোপণ করা হয়ে থাকে।

বাবলা গাছ হিন্দিতে কিকর, সংস্কৃতে বাবুলা, মালায়লমে ফারু ভেলুম, তেলেগুতে নাল্লাটুম্বা, তামিল এবং বাংলা ভাষায় বাবলা বা বাবুল নামে পরিচিত।

বাবলা গাছ একটি মাঝারি আকৃতির কাঁটা জাতীয় উদ্ভিদ। উচ্চতায় ১.২–১৮ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। কাণ্ডটি কালচে ধূসর বর্ণের হয়ে থাকে। কাণ্ডের ছাল ফাটাফাটা অমসৃণ ও ধূসর বর্ণের হয়। পত্রাক্ষের গোড়ায় কচি ডালপালা ধূসর বা সাদাটে বর্ণের হয়। একজোড়া করে ২৫ সেমি লম্বা কাঁটা থাকে। পরিণত বা পুরনো কাণ্ডের কাঁটাগুলি খুব ছোট হয়ে যায় এবং কালচে বর্ণের হয়ে থাকে। পাতাগুলি যৌগিক প্রকৃতির। প্রধান পত্রাক্ষের উপর ২-১১ জোড়া ০.৫-৩.৫ সেমি লম্বা পিপায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৭-২৫ জোড়া পত্র সজ্জিত থাকে। পত্রাক্ষের কক্ষ থেকে এককভাবে বা অনেকগুলি একসঙ্গে বের হয়। লম্বা মঞ্জরীদণ্ডের মাথায় পুষ্পাক্ষের উপর অনেকগুলি ফুল একসঙ্গে জন্মায়। এই প্রকার পুষ্পবিন্যাস হেড্‌স নামে পরিচিত। গোলাকার হেড্‌স ৬-১২ মিলিমিটার ব্যাসের হয়। বৃতি ও পাপড়ি বা দলমণ্ডল খুবই ছোট, ফুল ফুটলে হলুদ রঙের অসংখ্য পুংকেশরগুলিকে দেখা যায়। গাছের ফল লম্বা, মালার মতো হয় অথবা বীজের সংখ্যা অনুযায়ী খাঁজযুক্ত হয়। ফলগুলি লম্বায় ৪-২২ সেমি পর্যন্ত এবং ১.৩-২.২ সেমি চওড়া হয়ে থাকে। ফলের উপরিভাগ মোলায়েম রোমযুক্ত হয়। ফলে ৮-১২টি বীজ থাকে। বীজগুলি কালচে বাদামি রঙের হয়। মসৃণ, গোলাকার ও চ্যাপটা ধরনের হয়। আকারে ৭-৯ X ৬-৭ মিলিমিটার আয়তনের হয়।

বাবলা গাছ উষ্ণ জলবায়ু এবং উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে জন্মায়। বাবলা গাছ ৪০-৪৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারে। বার্ষিক ২০০-১২৭০ মিলিমিটার গড় বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে বাবলা গাছ দেখতে পাওয়া যায়। ৬০০ মিলিমিটারের কম বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত গাছের বৃদ্ধির পক্ষে উপযুক্ত নয়। তুষারপাত বাবলা গাছের পক্ষে ক্ষতিকারক।

বাবলা গাছের বৃদ্ধির পক্ষে হালকা এবং গভীর মাটি উপযুক্ত। বাবলা গাছের মূল মাটির অনেক গভীর পর্যন্ত বর্ধিত হয়। তাই নিকাশীযুক্ত গভীর পলিমাটিতে বাবলা গাছ সবচেয়ে ভাল জন্মায়। সমান জমি, উঁচু-নিচু জমি বা নদী বা খালবিলের উঁচু পাড়ের জমি বাবলা চাষের পক্ষে উপযুক্ত। লবণাক্ত আর্দ্র মাটিতে, এমনকি ক্ষারযুক্ত মাটিতেও এই গাছ জন্মায়। বন্যা কবলিত অঞ্চল, যেখানে বেশ কিছুদিন জল জমে থাকে সেখানেও বাবলা গাছ জন্মায়।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

গবাদিপশু বা পাখি বাবলা ফল খেয়ে থাকে। পশু-পাখিরা ফল খেলেও বীজ হজম করতে পারে না। তাই মলের সঙ্গে তা মাটিতে পড়ে বিস্তারিত হয় এবং অঙ্কুরিত হয়ে স্বাভাবিক প্রসারণ ঘটায়। আবার হালকা পলিমাটিতে বীজের অঙ্কুরোদ্গমের ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণে চারাগাছ জন্মায়। এভাবেই বাবলা গাছের স্বাভাবিক প্রসারণ ঘটে থাকে।

বাবলা গাছের বীজ ফলের মধ্য থেকে স্বাভাবিকভাবে বিদারিত হতে পারে না। তাই পরিণত বাবলা ফল সংগ্রহ করে তার থেকে বীজ বের করে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। বিশেষ ধরনের ব্যাগে, বাক্সের মধ্যে বায়ুচলাচল যুক্ত ব্যবস্থার মধ্যে শুষ্ক এবং ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে বীজ সংরক্ষণ করা হয়।

বীজগুলির অঙ্কুরোদ্গম ঘটিয়ে চারা তৈরির জন্য প্রথমে বীজগুলিকে ৪৮ ঘণ্টা ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। এরপর ৮০ ডিগ্রী

সেলসিয়াস তাপমাত্রা যুক্ত গরম জলে ৩০ মিনিট রেখে তারপর আবার ঠাণ্ডা বা স্বাভাবিক তাপমাত্রার কলের জলে বা পুকুরের জলে বীজগুলিকে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে চাষ দেওয়া জমিতে সরাসরি লাইনের বা সারির মধ্যে বপন করে বাবলা গাছের চাষ করা হয়ে থাকে। জুন মাসের মধ্যেই বীজ বপন করার উপযুক্ত সময়। সাধারণত বীজ বপনের মাধ্যমেই সফলতার সঙ্গে বাবলা গাছের চাষ হয়ে থাকে।



একইভাবে জলে ভেজানো বীজগুলি নার্সারীর বেডে বা পলিথিনের প্যাকেটের মধ্যে উপযুক্ত জৈব পদার্থ মিশ্রিত মাটিতে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঘটিয়ে উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে চারাগাছগুলিকে ৩০-৪০ সেমি লম্বায় বড় করে নির্দিষ্ট জমিতে রোপণ করেও বাবলা গাছের কৃত্রিম প্রসারণ ঘটানো হয়ে থাকে। রোপণের ক্ষেত্রে গাছের মধ্যে দূরত্বে ৪ X ৪ মিটার এবং ৪৫ X ৪৫ X ৪৫ সেমি গর্তের মধ্যে চারাগাছগুলি লাগানো হয়।

মিস্ট চেম্বারের মধ্যে বাবলা গাছের ডালের কাটিং-এ হরমোন প্রয়োগের দ্বারা শিকড় বা মূল উৎপাদন করে নার্সারীর পরিচর্যায় সফলভাবে বাবলা গাছের কলমের চারাও তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া টিস্যু কালচার পদ্ধতিতেও বাবলা গাছের কৃত্রিম প্রসারণ ঘটানো হয়েছে।

পরিচর্যা –

নার্সারীতে চারাগাছ তৈরি করার জন্য নিয়মিত জল স্প্রে করা হয়ে থাকে। বীজের অঙ্কুরোদ্গমের পর সপ্তাহে ২-৩ বার জল স্প্রে করা আবশ্যক হয়। নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় জল স্প্রে করা বাবলা গাছের পক্ষে উপযুক্ত। নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় জল প্রয়োগের দ্বারা বাবলা গাছের চারাগুলিকে জলকষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বড় করে তুললে রোপণের পর চারাগাছের মৃত্যুর হার অনেক কম হয়।

বীজবপনের মাধ্যমে বাবলা গাছের চাষে আগাছা পরিষ্কার বা নিড়ান দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। ২-৩ মাস অন্তর নিড়ান দিয়ে ঘাস ও অন্য গাছের চারাগুলিকে পরিষ্কার করে বাবলা গাছের পরিচর্যা করা হয়। রোপণের ক্ষেত্রে ৩০-৪০ সেমি লম্বা চারাগাছ রোপণ করা হয়। ফলে আগাছার দমন করা বা নিড়ান দেওয়ার কাজটা সহজেই করা যায়। রোপণের প্রথম বছর ৩বার নিড়ান দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

গাছগুলিকে সোজাভাবে বড় করে তোলার জন্য নিয়মিতভাবে ডাল ছাঁটাই করা হয়ে থাকে। খুব ঘনভাবে জন্মানো চারাগাছগুলিকে নির্দিষ্ট দূরত্বের ব্যবধানে বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত গাছগুলিকে কেটে পাতলা করে দেওয়া হয়।

শুষ্ক জলবায়ু অঞ্চলে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে এবং গ্রীষ্মকালে মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণ করার জন্য খড়, শুকনো ঘাস-পাতা চাপা দিয়ে বাবলা গাছের গোড়ার মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণ করা গাছের বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক।

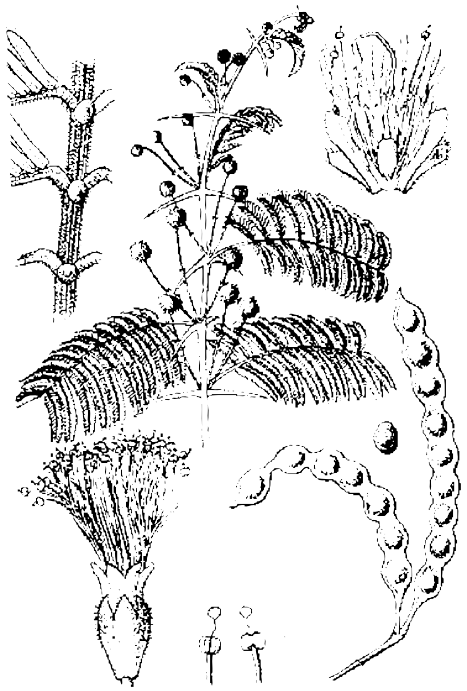
বাবলা গাছের ক্ষতিরকারক কীটপতঙ্গগুলি হল, Coleoptera, Lepidoptera, Hemiptera এবং Orthoptera এছাড়া Celosterna scabrator, Oxyrachis tarantula, Drosicha stebbingi (আমগাছের পোকা) বাবলা গাছের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে থাকে।

Deuteromycetes গ্রুপের ছত্রাকের আক্রমণের ফলে ও বাবলা গাছের সাধারণ ছত্রাকঘটিত রোগগুলি হল, মূলের পচন রোগ, কাণ্ডের রোগ, পাতার ধসারোগ প্রভৃতি। এই গাছে আক্রমণকারী Ganoderma lucidum, Polyporus gilvus, Fusarium sp. Fornes badius, Ravenelia acacia arabica প্রভৃতি ছত্রাকগুলিকে চিহ্নিত করা গিয়েছে।

এইসব কীটপতঙ্গ বা পোকামাকড় ও ছত্রাকঘটিত রোগের প্রতিকার হিসাবে Malathion, Savin, Endosulfan, Monocrotophos এবং Rogor b/w ০.০১ – ০.১% প্রভৃতি কীটনাশক স্প্রে করা যেতে পারে অথবা বন দফতরের সুপারিশ অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। অথবা জৈব কীটনাশক ব্যবহার করে পোকামাকড় দমন করা যাতে পারে। ছত্রাকঘটিত রোগ প্রতিরোধ করার জন্যও জৈব ছত্রাকনাশক বা বন দফতরের বা কৃষি বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

প্রধানত বাবলা গাছের ফসল বলতে এর কাঠকেই বোঝায়। ৫ বছর অবস্থা থেকেই বাবলা গাছের কাণ্ড ও ডালপালা জমিতে অন্য ফসলের বেড়া দেওয়ার জন্য এবং জ্বালানী হিসাবে বা কাগজের মণ্ড তৈরিতে কারখানার প্রয়োজনে থিনিং পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদন শুরু হয়। যদিও ৩০-৪০ বছরের Rotation-এ যে কাঠ উৎপাদিত হয় তা খুবই শক্ত মজবুত ও উন্নতমানের। ১ হেক্টর বাবলা চাষের জমি থেকে ৫৩৮টি বাবলা গাছ রাখা যেতে পারে। ৫ বছরের পর থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত (৫,১০,১৫,২০ ও ২৫ বছরে) থিনিং করে যথাক্রমে ১০.১৯, ২২.০৮, ৩৫.৫৩, ৪৫.৪৯ ও ৫০.৩৬ কিউবিক মিটার বাবলা কাঠ (টিম্বার) উৎপাদন করা সম্ভব। অর্থাৎ



২৫ বছরে মোট ১৬৩.৬৫ কিউবিক মিটার কাঠ উৎপাদন করা যাবে।

বাবলা গাছ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ। এর ছাল থেকে উৎপন্ন ট্যানিন ও আঁঠা এবং কাণ্ডের থেকে উৎপন্ন মণ্ড, চর্মশিল্প, আঁঠা তৈরির কারখানা এবং কাগজ শিল্পে লাগে। এর কাঠ খুব শক্ত ও মজবুত কৃষি যন্ত্রপাতি (লাঙল, জোয়াল, মই) গরুর গাড়ির চাকা এবং বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতির হাতল প্রভৃতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

বাবলা কাঠের টিম্বার মাঝারি মানের আসবাবপত্র, খেলার সরঞ্জাম, দরজা-জানালার ফ্রেম ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। আগে ধান ভাঙার ঢেঁকি তৈরিতে বাবলা কাঠের ব্যবহার হত। এই কাঠ খুব টেকসই, তাই নৌকার কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে খুব উপযোগী।

বাবলা কাঠ খুবই উন্নতমানের জ্বালানী সামগ্রী। কাঁচা অবস্থাতেই এই কাঠ জ্বলতে পারে। গ্রামাঞ্চলের বেশিরভাগ অঞ্চলে মরা পোড়ানোর জন্য বাবলা কাঠ ব্যবহার করা হয়। এর থেকে উন্নতমানের চারকোলও তৈরি করা যায়। যার প্রতি কেজিতে ৪৭৯৩–৪৯৪৬ ক্যালোরি তাপশক্তি পাওয়া যায়।

বাবলা গাছের শিকড় বা মূল চোখের, কানের এবং অন্ডকোষের টিউমার এবং ক্যানসার রোগের প্রতিরোধ করতে পারে। এছাড়া যকৃত, প্লীহা ও যক্ষারোগের চিকিৎসায়ও ব্যবহৃত হয়।

বাবলা গাছের কচি পাতা অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল। যা ক্যানসার প্রতিরোধে, পেটের অসুখে সারাতে, খাদ্যনালীর আলসার সারাতে, জ্বালা-যন্ত্রণা কমাতে এবং অ্যালজাইমার রোগ সারাতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এতে উত্তেজক ঔষধিগুণ রয়েছে।

বাবলা গাছের আঁঠা astringent থাকে। যা ত্বকের আর্দ্রতা সংরক্ষণ করে, দাঁতের পাইরিয়া রোগ সারাতে সাহায্য করে এবং অ্যাজমা রোগের পক্ষে উপকারী।

বাবলা গাছের ছালের চূর্ণে ০.৮৬% গ্যালিক অ্যাসিড এবং বিভিন্ন প্রকার Polyphenols রয়েছে, যা ডায়াবেটিস ও ক্যানসার রোগের পক্ষে উপকারী। এর অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ক্যানসার প্রতিরোধক, কৃমিনাশক, উত্তেজক, টনিক, দাঁতের যন্ত্রণায়, জ্বালা, বসন্ত রোগের চিকিৎসায়, চর্মরোগের চিকিৎসায়, ব্রঙ্কাইটিস, ঠাণ্ডা লাগা, ডায়রিয়া, রক্ত আমাশা, অর্শ, গ্যাসের সমস্যার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

বাবলা গাছের বীজ ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধক এবং মাংসপেশীর যন্ত্রণার উপশমে সাহায্য করে।

বাবলা গাছের ফল উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যথা-যন্ত্রণা ও ডায়রিয়া সারাতে উপযোগী। HIV রোগ প্রতিরোধ করে এবং রক্তের প্লেটলেটের সমস্যা কমায়।

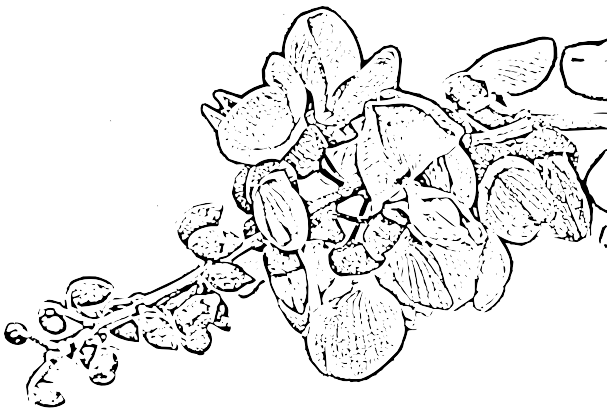
জাত পরিচিতি –

বাবলা গাছের উন্নত জাতের কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে বাবলা গাছের প্রধান বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমান বৈশিষ্ট্য যুক্ত অথচ কিছু ভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্যের একই প্রজাতির (A. nilotica) কয়েকটি Sub-species বা উপ-প্রজাতির উদ্ভিদ ভারতে পাওয়া গেছে। সেগুলি হল, A. indica, A. adstringens, A. cupressiformis ও A. Subalata

ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, ছোটনাগপুর অঞ্চল, বিহার প্রভৃতি স্থানে নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত A. nilotica প্রজাতির Sub-species উপ-প্রজাতির গাছগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে। সারা পৃথিবীতে A. nilotica প্রজাতির আরও অনেক Sub-species-এর খোঁজ পাওয়া গেছে।

তথ্যসূত্র - Kalaivani & Mathew 2010, Baravkar & 2088, Agrawletal 2010, Gilanietal 1999, Asresetal 2005, Singhetal 2009, Acacia Nilotica: A Plant of Multipurpose Medicinal uses, Atif Ali by Naveed Akhtar, Barkal Ali Khan, Md. Shoaib Khan et al Dept. pharmacy & alternative Medicine, The Is lamia University Bahawalpur PAKISTAN 26.10.2011

তেল উৎপাদনকারী গাছ



করঞ্জ

পরিচয় –

করঞ্জ গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Pongamia pinnata, এটি Fabaceae গোত্রের, Papiolionaceae উপগোত্রের বহুবর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী পর্ণমোচী বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ।

এশিয়া মহাদেশের উষ্ণ ও ঠাণ্ডা জলবায়ু অঞ্চল উদ্ভিদটির আদি জন্মস্থান। ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্র এই গাছ জন্মায়। এছাড়া চিন, জাপান, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়াতে এই উদ্ভিদটি বিস্তারলাভ করেছে।

গাছটিকে হিন্দিতে করঞ্জ, সংস্কৃতে নক্তমাল, তামিল ভাষায় পুঙ্গু, তেলেগুতে করমুগা, মালায়লম ভাষায় পুন্নু এবং বাংলায় করঞ্জা বা করঞ্জ বলে।

১৯৯৭ সালে এই গাছটিকে নিয়ে Indian Institute of Science-এ গবেষণা শুরু হয়। গবেষণার ফলস্বরূপ, এই গাছের বীজ থেকে উৎপন্ন তেল, ডিজেলের পরিবর্তে জেনারেটর, কৃষিকাজের ব্যবহৃত পাম্প চালানোর কাজে ব্যবহার করা গেছে। SUTRA নামে একটি NGO কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের গ্রামীণ এলাকায় সফলভাবে এর ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সংস্থা দেশের বিভিন্ন জায়গায় বাতাসে গ্রীনহাউস গ্যাসের অপকারিতা এড়াতে জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার বন্ধ করে করঞ্জ তেলের ব্যবহার বাড়ানো নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করে চলেছে। ২০০৩ সাল থেকে হিমালয়ান ইনস্টিটিউট যোগা সায়েন্স এবং ফিলোজফি (Himalayan Institute Of Yoga Science and Philosophy) গ্রামীণ এলাকায় Bio-diesel বা Bio-fuel তৈরির জন্য গ্রামীণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি ও করঞ্জ চাষে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গাছটির সুন্দর গন্ধযুক্ত ও দৃষ্টিনন্দন ফুলগুলি গাছের তলায় পড়ে থাকে। তাই রাস্তার ধারে, খালের পাড়ে Avenue tree হিসাবেও এই গাছ রোপণ করা হয়।

করঞ্জ গাছের উচ্চতা ১৫-২০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। গাছের চূড়াটি শাখাপ্রশাখা নিয়ে বিশালভাবে বিস্তৃত। গাছের কাণ্ডের বেড় ৫০-৮০ সেমি পর্যন্ত হতে পারে। কাণ্ডটি সোজা বা কিছুটা বেঁকে থাকে। নতুন শাখাগুলিও প্রথমের দিকে কিছুটা নিচের দিকে ঝুলে থাকে। কাণ্ডের ছাল ধূসর বাদামি বর্ণের হয়। পাতাগুলি যৌগিক প্রকৃতির ও একান্তরভাবে সজ্জিত থাকে। প্রতিটি পত্রাক্ষে ৫টি বা ৯টি পত্রক বিপরীতমুখীভাবে অবস্থিত থাকে। পত্রাক্ষের অগ্রভাগের পত্রকটি আকারে বড়। পত্রকগুলি ডিম্বাকার, মসৃণ, রোমহীন হয় ও ৬-১০ সেমি আকারের হয়। হালকা সবুজ থেকে বর্ণ থেকে পরিণত হলে এগুলি গাঢ় সবুজ বর্ণের হয়।

করঞ্জ ফুলের বৃতিগুলি কাপ (Cup) আকৃতির হয়। ৩-৪ বছর বয়সের পর থেকে গাছে ফুল ফোটা শুরু হয়। সাধারণত সারা বছর ধরে ফুল ফোটে, তবে বর্ষাকালে এই গাছে বেশি ফুল ফোটে। ফুলগুলি সাদা, গোলাপী বা লালচে মিশ্রিত রঙের হয়। ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ রয়েছে। ফুলগুলি লম্বায় ১৫-১৮ মিলিমিটার হয়। পুষ্পমঞ্জরীদন্ডের শাখায় ২-৪টি ফুল একসঙ্গে গুচ্ছাকারে থাকে। ফুলের পাপড়িগুলি গোলভাবে পুষ্পবৃন্তের উপর জন্মায়। ফুলে ১০টি পুংকেশর এবং একটি সুতোর মতো গর্ভকেশর থাকে। মৌমাছির দ্বারা ফুলের পরাগমিলন ঘটে। ফলের অগ্রভাগ বেঁকানো ও শুটি (Pod) প্রকৃতির। বীজ ফলের মধ্যেই দীর্ঘদিন থাকে। ফলত্বক পচে গেলে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়, ফলত্বক থেকে নিজে বীজ বের হয় না। ফল ছাড়িয়ে বীজ বের করতে হয়। ফল পরিণত হতে ১০-১১ মাস সময় লেগে যায়। কচি ফল ও পরিণত ফল একই সময় গাছে ঝুলতে দেখা যায়। ফলগুলি শুকনো হলে হলুদ বাদামি বা সবুজাভ রঙের হয়। বীজগুলি ১.৫-২.৫ সেমি ও তিক্ত স্বাদের হয়। প্রতিটি ফলে সাধারণত ১টি করে বীজ থাকে। কিন্তু ২টি বা ৪টি বীজযুক্ত ফলের সন্ধানও মিলেছে।

সাধারণত উষ্ণ ও উপক্রান্তীয় আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলে সমুদ্রতল থেকে ১২০০ মিটার উচ্চভূমিতে করঞ্জ গাছ জন্মাতে পারে। কিন্তু হিমালয়ান পর্বতমালার ৬০০ মিটারের বেশি উচ্চতায় করঞ্জ দেখা যায় না। ০-৫০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এই গাছ জন্মাতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত তাপমাত্রা হল ২৭-৩৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস ও বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৫০০-২৫০০ মিলিমিটার। বিভিন্ন প্রকার মাটিতে করঞ্জগাছ জন্মাতে পারে যেমন, বেলে মাটি, পাথুরে মাটি ও লবণাক্ত মাটি। তবে শুষ্ক মাটিতে এই গাছ ভাল হয় না। উপযুক্ত নিকাশীযুক্ত আর্দ্রতা মাটি, এই গাছের জন্য সবচেয়ে ভাল পরিবেশ।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –



বীজ থেকে এবং Root sucker থেকে স্বাবাভিকভাবেই এই গাছ বিস্তারলাভ করে। জলে ভেসে ফলগুলি দূরবর্তী স্থানে চলে যায়, সেখানে মাটিতে ঠেকে ফলত্বক পচে গেলে বীজ থেকে চারা গাছ জন্মায়। এইভাবে করঞ্জ গাছের স্বাভাবিক প্রসারণ ঘটে।

পরিণত ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়। বীজত্বক শক্ত হওয়ার কারণে বীজের অঙ্কুরোদ্গম শীঘ্র হতে চায় না, তাই সালফিউরিক আসিডে বীজগুলি ৪ মিনিট ভিজিয়ে তারপর ৮০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জলে ৪ মিনিট ডুবিয়ে ধুয়ে নিতে হয়। এরপর ঘন্টাখানেক রোদে শুকিয়ে বীজগুলি বপন করা হয়। সরাসরি জমিতে বপন করার জন্য প্রতি হেক্টর জমিতে ৩-৪ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। পলিথিন ব্যাগে জৈবসারযুক্ত বালিমিশ্রিত মাটি ভরে তার মধ্যে বীজ বপন করে প্রতিদিন ঝারি দিয়ে জল স্প্রে করে চারা উৎপন্ন করা হয়। চারা তৈরির উপযুক্ত সময় ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস। দেড় থেকে তিন মাসের মধ্যে চারাগুলি থেকে ৬-৮টি পাতা বের হলে তা নির্দিষ্ট জমিতে রোপণের উপযুক্ত হয়ে যায়।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণের জন্য Grafting করে কম সময়ের মধ্যে উচ্চফলনশীল গাছের বিস্তার সম্ভব। এই কাজে হিমালয়ান ইনস্টিটিউট যোগা সায়েন্স এবং ফিলোজফি (Himalayan Institute Of Yoga Science and Philosophy) ভারত সরকারের আর্থিক সাহায্যও লাভ করেছে। এই প্রকল্প ২০০৩ সাল থেকে শুরু হয়েছে, ২০ মিলিয়ন (১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ, ২০ X ১০ = ২০০ লক্ষ; ২০০,০০০০০) বা ২ কোটির বেশি করঞ্জ গাছ রোপণ করা হয়েছে। এই কাজে ৪৫ হাজার কৃষক যুক্ত হয়েছেন। Himalayan Institute of Yoga Science and Philosophy আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ও মরুভূমি সংলগ্ন অঞ্চলে করঞ্জ চাষে উদ্যোগী হয়েছে। অস্ট্রেলিয়াতেও করঞ্জ নিয়ে চলছে গবেষণা। বর্তমানে কৃত্রিম পদ্ধতিতে এই গাছের প্রসারণের জন্য ডালের কলম ও জোড়কলম তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। যা ৯৫% সফলতা পেয়েছে। এই কলমের গাছ রোপণে অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। বীজের গুণমান বজায় রেখে অধিক তেল তৈরির লক্ষ্যে গবেষণা চলছে, যাতে Bio-diesel প্রকল্প সফলতা লাভ করতে পারে।

জমিতে ভালভাবে চাষ দিয়ে আগাছা মুক্ত করে জৈবসার (FYM) প্রয়োগ করে নির্দিষ্ট ঢাল বজায় রেখে ১.২৭ X ১.২৭ মিটার (৬২০০টি গাছ প্রতি হেক্টরে), ২ X ২ মিটার (২৫০০টি গাছ প্রতি হেক্টরে), ৩ X ১ মিটার (২২২২টি গাছ প্রতি হেক্টরে) বা ১.৫ X ১.৫ মিটার (৪৪৪৫টি গাছ প্রতি হেক্টরে) হিসাবে জমির উর্বরতা অনুযায়ী দূরত্ব (Spacing) নির্দিষ্ট করে রোপণ করা হয় তবে ভাল ফল পাওয়া যায়। যেহেতু খুব ছোট চারা রোপণ করা হয়, তাই বড় করে গর্ত কাটার প্রয়োজন হয় না। পরিমাণ মতো জৈবসার মিশ্রিত মাটি দিয়ে চারাগুলি নির্দিষ্ট দূরত্বে রোপণ করা হয়।

করঞ্জ চাষের জন্য তিন প্রকার পদ্ধতিতে চারা সংগ্রহ করা হয় –

১. জমিতে সরাসরি বীজ বপন করে চারা উৎপাদন করে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে বাকি বা অতিরিক্ত চারা গাছ তুলে নিয়েও রোপণ করা যায়।

২. নার্সারীতে পলিথিনের ব্যাগের মধ্যে পরিচর্যার মাধ্যমে চারা তৈরি করে তা রোপণ করা যায়।

৩. করঞ্জ গাছের আশেপাশে স্বাভাবিকভাবে জন্মানো চারাগাছ সংগ্রহ করে তাও নির্দিষ্ট জমিতে রোপণ করা যেতে পারে।

পরিচর্যা –

সাধারণত বর্ষার আগে মে-জুন মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তাই রোপণ বা বপনের পর নিয়মিত জলসেচের প্রয়োজন হয়। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে চারা রোপণ করলে স্বাভাবিক বর্ষায় চারাগুলিতে সেচ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। প্রতি হেক্টর জমিতে ২৫০ কেজি DAP, ইউরিয়া ২০০ কেজি, করঞ্জ খোল ৯০০ কেজি করঞ্জ চাষের জন্য প্রয়োজন হয়ে থাকে। করঞ্জ খোল একদিকে সারের কাজ করে অন্যদিকে Bio-pesticide হিসাবেও কাজ করে। বছরে একবার মাটি কুপিয়ে গাছের গোড়া থেকে আগাছা পরিষ্কার করা অত্যন্ত জরুরি। গাছের ও মূলের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা খুবই উপকারী। রাস্তার ধারে Avenue tree হিসাবে রোপণ করা গাছের গুড়িটি যাতে সোজা হয়ে বাড়তে পারে তার জন্য নিচের দিকের ডাল ছেঁটে দেওয়া দরকার। গাছের পাতায় দাগ ধরা রোগও এর দ্বারা প্রতিরোধ করা সম্ভব। করঞ্জ গাছে Leaf spot বা পাতায় সাদাটে বাদামি দাগ থাকে যা, Colletorichum glocosprioides নামক ছত্রাকের দ্বারা ঘটে। সঠিক বীজ নির্ণয় করে ও ঠিক মতো ডাল ছাঁটাই করে এই রোগকে প্রতিহত করা যায়। করঞ্জ গাছের বীজের তেল ও পাতা গুঁড়ো করে জলে গুলে গাছে স্প্রে করে অন্যান্য রোগও প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব -

১. করঞ্জের পাতা ও তেল জৈবসার হিসাবে ও জৈব কীটনাশক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মশা বা পোকা তাড়াতেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

২. করঞ্জ তেল ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। চর্মরোগ, বাতের রোগে এর ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। অল্প পরিমাণ করঞ্জ তেল খাইয়ে বমি করানো যায়। তাই বমি করিয়ে পাকস্থলী থেকে বিষ বের করার ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার হয়।

৩. পশু চিকিৎসায়, বিশেষ করে গরু, মহিষের শরীরের ঘায়ে করঞ্জ তেল ব্যবহার করা হয়।

৪. করঞ্জ গাছের মূল পার্শ্ব দিকে বিস্তারিত হয় এবং এই পার্শ্বমূল থেকে চারা গাছ জন্মায় যা প্রধান মূলতন্ত্র বিস্তার করে, ফলে মাটির ক্ষয়রোধ করার ক্ষেত্রে করঞ্জ গাছে ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

৫. লাক্ষা পোকার host plant হিসাবে করঞ্জ গাছ ব্যবহৃত হয়। এধরনের আরও host plant রয়েছে। তবু করঞ্জ গাছ লাক্ষা উৎপাদনে পরোক্ষ সাহায্যকারী একটি উদ্ভিদ।

৬. কচি ডাল দাঁতন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৭. Bio-fuel বা bio-diesel হিসাবে ব্যবহার করে স্থানীয় কর্মসংস্থান, বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে Aforrestation করা ও পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষায় এর ব্যবহার Save Tree, Save Environment এই উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবে।

২০০২ সালের ৩১ ডিসেম্বর দিল্লি থেকে অমৃতসর রেলপথে Bio-diesel-এর সাহায্যে একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলেছিল। যেখানে Diesel দ্বারা রেল চালাতে বছরে ৩৪০০ কোটি টাকা খরচ হয়, সেখানে Bio-diesel-এ এই খরচ ৩০০-৪০০ কোটি টাকায় নামানো সম্ভব। অর্থাৎ বছরে ৩০০০ কোটি টাকা বাঁচানো যাবে। কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশে ট্রাক্টর, পাম্প, মোটরভ্যানে 'হোঙ্গে'(করঞ্জ তেলের স্থানীয় নাম) তেল ব্যবহার হচ্ছে। করঞ্জ গাছের ফলগুলি ডাল ঝাকিয়ে বা লগার সাহায্যে পাড়া হয়। পাকা ফলের সঙ্গে কচি ফলও গাছে থাকতে পারে। তাই খেয়াল রাখতে হয় যাতে কাঁচা ফল না পড়ে যায়।

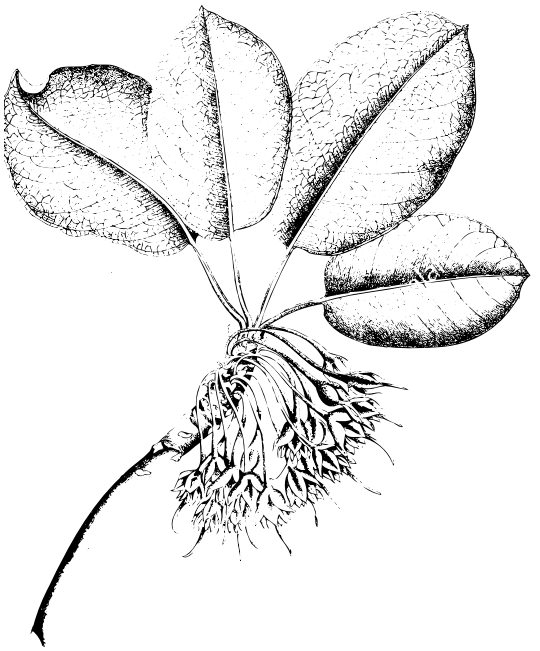
কর্ণাটকে ২০০১ সালে এক হেক্টর জমি থেকে ১০ টন করঞ্জ বীজ উৎপন্ন হওয়ার নজির রয়েছে। যার বাজার দর ছিল আনুমানিক ৪০ হাজার টাকা। এক্ষেত্রে শুষ্ক-পতিত জমিতে চাষ করে ওই পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হয়েছিল। তাই ভাল উর্বর জমিতে পরিচর্যার মাধ্যমে চাষ করলে আরও বেশি উৎপাদন সম্ভব। অন্য একটি হিসাব থেকে দেখা যায়, প্রতিটি গাছ থেকে ৯-৯০ কেজি ফল উৎপন্ন হয় (অপরিণত বা পরিণত) এবং কম-বেশি ৮.২ কেজি বীজ পাওয়া যায় অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে ১৫ হাজার টাকা। প্রতি হেক্টর চাষে ইউরিয়া লাগে ১০০ কেজি, খোল ৯০০ কেজি ও DAP লাগে ২০০ কেজি। করঞ্জ চাষের প্রধান উদ্দেশ্য হল Bio-energy বা জৈবশক্তির বিকাশ ঘটানো, জীববৈচিত্র্য (Biodiversity) সংরক্ষণ এবং সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়ন (Community Development)।

১০০ বছর আগে পৃথিবীতে যে শক্তি ব্যবহৃত হত বর্তমানে তা ১০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শক্তি ব্যবহারের হার প্রতি বছর ২.৩% করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই শক্তির প্রধান উৎস জৈব জ্বালানী বা Fossil fuel যেমন, কয়লা ও পেট্রলজাত পদার্থ। এইভাবে চলতে থাকলে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে খনিজ পদার্থগুলি শেষ হয়ে যাবে, পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে আসবে। নষ্ট হবে পরিবেশের ভারসাম্যতা। গ্রীন হাউস গ্যাসের মাত্রারিক্ত প্রভাবে পৃথিবীর উষ্ণায়ন (Global Warming), ওজন স্তরের ক্ষতিসাধন, অ্যাসিড বৃষ্টি, সমুদ্রের জলের উচ্চতা বৃদ্ধি প্রভৃতি নানান ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে যাবে। সমস্ত উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে তাই বিকল্প শক্তির আবিষ্কার ও তার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে ও তার পরিবেশকে রক্ষার উদ্দেশ্যে গবেষণা চলছে। এই বিকল্প পথের সন্ধানে করঞ্জ বীজ থেকে তেল তৈরি করে ডিজেলের পরিবর্তে ব্যবহার তাই একটি সময়োপযোগী ব্যবস্থা। ইউরোপ ও আমেরিকাতে প্রথম Bio-diesel উৎপন্ন হয়। এখন সারা পৃথিবীতে এর মাত্র ৩% ব্যবহৃত হয়। হিসাব অনুযায়ী, যেখানে ২০০০ সালে উৎপাদন ছিল ৪.৮ মিলিয়ন গ্যালন, ২০০৭ সালে তা ১৬.০ মিলিয়ন গ্যালনে পৌঁছায়। আরও অনেক প্রকার তেল থেকে বায়োডিজেল উৎপন্ন করা যায় কিন্তু করঞ্জ যেহেতু আমাদের দেশজ উদ্ভিদ এবং খুব প্রান্তিক জমিতে এটি জন্মায় তাই এক্ষেত্রে এই গাছের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি।

জাত পরিচিতি –

করঞ্জ গাছের সেভাবে আলাদা জাতের উল্লেখ পাওয়া না গেলেও, ২০০৭ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কিছু উন্নত বৈশিষ্ট্য যুক্ত করঞ্জ ফলের সন্ধান মিলেছে। যাতে একটি বীজের পরিবর্তে ২-৫ টি বীজ পাওয়া গেছে। গবেষণা চালিয়ে এর থেকে উন্নত জাত তৈরির চেষ্টা চলছে।

তথ্যসূত্র - https://www.researchgate.net/.../225255623_Development_of_Pongamia_pinnata_as



মহুয়া

পরিচয় –

মহুয়া গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Madhuca longifolia, এটি Sapotacea গোত্রের বহুবর্ষজীবী, দ্বীবীজপত্রী ও পর্ণমোচী শ্রেণীর উদ্ভিদ।

ভারতের উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চল মহুয়ার আদি জন্মস্থান। এদেশের ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, মধ্যপ্রদেশ, কেরালা, গুজরাট, উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ী ও মালভূমি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে মহুয়া গাছ জন্মায়। ভারত ছাড়া শ্রীলঙ্কা, চিন, মায়ানমার ও নেপালে মহুয়ার বিস্তার ঘটেছে।

ইংরেজিতে মহুয়া গাছকে Butter tree বা Honey tree বলা হয়। হিন্দিতে মাহয়া বা মোহয়া, সংস্কৃতে মাধুকাহ, মারাঠীতে মহুদা, তেলেগুতে ইল্লাগুড্ডু, তামিলে ইলুপ্পেই, মালায়লমে পুনম ও ইলুপা, ওড়িয়ায় মায়ল এবং বাংলায় মহুয়া নামে পরিচিত।

মহুয়া গাছ একটি দ্রুত বৃদ্ধির (First growing tree) উদ্ভিদ। গাছটি উচ্চতায় ১৫-১৮ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। কাণ্ডের বেড় ৪০ সেমি পর্যন্ত হতে পারে। কাণ্ডটি ধূসর বর্ণের হয়। কাণ্ডে আঘাত করা হলে একপ্রকার সাদা আঠা (Latex) নিঃসৃত হয়। কাণ্ডের ত্বক বা ছাল (bark) উপর নীচে ফাটা দাগ থাকতে পারে। পাতাগুলি একান্তরভাবে শাখা-প্রশাখায় সজ্জিত থাকে। কিন্তু শাখাপ্রশাখার অগ্রভাগে পাতাগুলি চক্রাকারে (whorl) সজ্জিত থাকে। পাতাগুলি সরল (simple), লম্বা-চওড়ায় ১০-২৫ সেমি X ৬-১২ সেমি হয়ে থাকে। কচি পাতা গোলাপি বা লালচে বাদামি রঙের হয়। পাতাগুলি পুরু, কিছুটা আয়তাকার হয়ে থাকে। পাতার ছেঁড়া হলে তার বোঁটা থেকে সাদা দুধের মতো আঠা (Latex) নিঃসৃত হয়।

শাখা-প্রশাখার অগ্রভাগে (terminal) গুচ্ছকারে ১০-১২টি ফুল একসঙ্গে জন্মায়। ফুলের বৃতিগুলি (Calyx) সংখ্যায় ৪-৫টি এবং বাদামী রঙের প্রচুর রোমযুক্ত হয়। পাপড়িগুলি (Petals) রসালো, গোলাকার ঘিয়ে রঙের হয়। ফুলের পাপড়িগুলি মাত্র এক রাত থাকার পরই খসে যায়। পরাগসংযোগের পর ফুল থেকে ফল উৎপন্ন হয়, ফলগুলি রসালো বেরি প্রকৃতির হয়। কাঁচা অবস্থায় সবুজ রঙের হয়। ফলটি ৩-৫ সেমি লম্বা হয়ে থাকে। ফলে ১-৪টি চকচকে বা মসৃণ বাদামি রঙের বীজ থাকে। সাধারণত ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল মাসে মহুয়া গাছে ফুল আসে এবং মে-জুলাই মাসে ফল পরিণত হয়।

শুষ্ক উষ্ণজলবায়ু অঞ্চল ও ক্রান্তীয় উষ্ণজলবায়ু অঞ্চলে মহুয়া গাছ ভাল জন্মায়। ৫৫০-১৫০০ মিলিমিটার বার্ষিক বৃষ্টিপাত ও ২-৪৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এই গাছ ভাল বেড়ে ওঠে।

সমুদ্রতল থেকে ১২০০ মিটার উচ্চ ভূমিতেও মহুয়া গাছ জন্মাতে পারে। উন্নত নিকাশীযুক্ত গভীর বেলে-দোয়াঁশ মাটিতে মহুয়া গাছ ভাল জন্মায়। তবে পাথুরে অনুর্বর জমিতেও জন্মাতে পারে।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

পরিণত পাকা মহুয়া ফল গাছ জুলাই–অগাস্ট মাসে গাছ থেকে মাটিতে পড়ে। বন্যপ্রাণীরা ওই ফল খেয়ে বীজের বিস্তার ঘটায়। উপযুক্ত পরিবেশে বীজের অঙ্কুরোদগমের ঘটিয়ে মহুয়া গাছের বিস্তার ঘটানো সম্ভব। তবে বেশিরভাগ চারাগাছই নানান প্রতিকূল পরিবেশের কারণে নষ্ট হয়ে যায়।

গাছের থেকে পাকা ফল সংগ্রহ করে প্রথমে তার মধ্য থেকে বড় ফলগুলি বাছাই করে নিতে হয়। তারপর হাত দিয়ে ঘসে ঘসে বীজের উপর থেকে ফলের শাঁস বের করে জল ও ছত্রাকনাশকে (০.২% Bavistin) ধুয়ে সংরক্ষণ করা হয়।

মে-জুন মাসে জমির আগাছা ও ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করে ফেলতে হয়। তারপর লাঙল বা ট্রাক্টর দিয়ে চাষ দিয়ে জমি প্রস্তুত করা হয়। পাহাড়ী উঁচু-নীচু জমিতে বীজ বপন বা চারা রোপণের জন্য ১ X ১ X ১ মিটার আয়তনের গর্ত করে মাটি প্রস্তুত করতে হয়।

সরাসরি বীজ বপনের জন্য জমিতে সারি তৈরি করা হয়। সারির মধ্যে ৯ মিটার দূরত্বের ব্যবধানে ১.৫-২ সেমি গভীর মাটির মধ্যে এক-একটি গর্তে ৪-৫ টি করে বীজ বপন করা হয়।

বালি ও জৈব পদার্থ মিশ্রিত মাটিতে নার্সারীর বেডে বা পলিথিনের ব্যাগের মধ্যে কিংবা অন্য কোনও পাত্রে বীজ বপন করে প্রতিদিন



ঝাঁরির সাহায্যে জল দিয়ে ১০-১৫ দিনের মধ্যে বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটিয়ে বীজ থেকে চারা তৈরি করা সম্ভব। চারাগুলি বড় হলে এক বছর পর জমিতে স্থানান্তর করা হয় বা জোড়কলমের জন্য ব্যবহৃত হয়। বীজের থেকে উৎপন্ন মহুয়া গাছে ফল জন্মাতে ১৫-২০ বছর সময় লেগে যায়। তাই বীজের তৈরি চারার সঙ্গে উন্নত জাতের (Scion) মহুয়া গাছের কচি ডালের সঙ্গে পলি এম্ব্রায়োনিকম চারার (Rootstock) সঙ্গে পার্শ্বজোড় (Veneer) পদ্ধতিতে চারাগাছ তৈরি করা হয়। কলম তৈরির উপযুক্ত সময় জুলাই মাস। যদিও গুটিকলম cutyting বা কলমের গাছের সফলতার হার খুব কম।

মহুয়া চাষের জন্য নির্বাচিত জমির মাটি কুপিয়ে লাঙল ব ট্রাক্টর দিয়ে ভালভাবে চাষ দিয়ে আগাছা নির্মূল করে এপ্রিল-মে মাসে জমি প্রস্তুত করে রাখা হয়। মহুয়া চারা রোপণের উপযুক্ত সময় জুলাই-সেপ্টেম্বর মাস। বীজের চারা রোপণের জন্য ৯ মিটার দূরত্বের ব্যবধানে ১ X ১ X ১ মিটার আয়তনের গর্ত কেটে উপরের মাটি দিয়ে (Top soil) ৬ সেমি উঁচু করে জল দিয়ে গর্তের মাটির আর্দ্রতা ধরে রেখে গর্তের মাঝখানে চারাগাছটি রোপণ করতে হয়। কলমের চারাগাছ একই পদ্ধতিতে রোপণ করা হয়ে থাকে। কেবলমাত্র সারির (Row) দুটি গাছের মধ্যে দূরত্ব ৮ মিটার রাখা হয়।

পরিচর্যা –

বীজ বপন বা চারাগাছ রোপণের পরই প্রয়োজন অনুযায়ী সপ্তাহে দু'বার জলসেচের ব্যবস্থা করতে হয়। বেসিন পদ্ধতিতে সেচ দিলে সব গাছে সমানভাবে জল দেওয়া যায়। চারা রোপণের পর ও সার প্রয়োগের পর অবশ্যই সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আবার পাতা ঝরার সময় জলসেচ বন্ধ রাখার প্রয়োজন হয়। কারণ এই সময় জলসেচের প্রভাবে গাছের পাতা, শাখা-প্রশাখার বৃদ্ধি (Vegetative growth) বেশি হলে Reproductive growth অর্থাৎ ফুল-ফল জন্মানোর পরিমাণ কমে যায়।

এক বছরের প্রতি গাছে ১০ কেজি জৈবসার (FYM), ১০০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ৫০ গ্রাম ফসফেট এবং ৭৫ গ্রাম পটাশ সার প্রয়োগ করতে হয়। প্রতি বছর প্রতিটি গাছে সারের মাত্রা কিছুটা বাড়িয়ে প্রয়োগ করতে হয়। ১০ বছর বয়সের গাছ অর্থাৎ পরিণত গাছে সারের মাত্রা হল, গাছ প্রতি ১০০ কেজি জৈবসার (FYM), ১ কেজি নাইট্রোজেন, ০৫ কেজি ফসফেট সার ও ০.৭৫ কেজি পটাশ । উক্ত পরিমাণ সারের অর্ধেক পরিমাণ গাছে ফুল আসার আগে এবং বাকি অর্ধেক ফল ধরে যাওয়ার পর প্রয়োগ করতে হয়। মহুয়া গাছের ভাল বৃদ্ধির জন্য জিঙ্ক ঘটিত ধাতব প্রয়োগ করা যেতে পারে।

মহুয়ার চারা রোপণের পর একই সঙ্গে সবুজসার হিসাবে শিম্ব গোত্রের ডাল শস্য বা ক্যারোন্ডা ফলের গাছ চাষ করা যেতে পারে। মহুয়া গাছের পাতা বেশ বড় হয়। তাই ৫-৬ বছর পর থেকেই গাছের ফাঁকা জায়গায় ছায়া হয়ে যায়। ফলে পরে এই চাষ করা সম্ভব হয় না।

মহুয়া গাছের সারিগুলির মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় এবং গাছের গোড়ার চারপাশে মাটি কুপিয়ে বা লাঙল দিয়ে চাষ দিয়ে আগাছা দমন করতে হয়।

মহুয়া গাছের কাণ্ডটিকে সোজাভাবে লম্বায় বড় করার জন্য ডাল ছাঁটাই করা আবশ্যিক একটি পরিচর্যা। কাণ্ডের ৯০ সেমি উচ্চতার নীচের ডালগুলি কেটে দিয়ে অবাঞ্ছিত ডালপালা ছেঁটে একটি সুনির্দ্দিষ্ট আকারে গাছটিকে গড়ে তোলার জন্য এই ব্যবস্থা জরুরি। মহুয়া গাছে Loranthaceae গোত্রের কিছু পরগাছা (epiphyte) জন্মায়, যা গাছের মারাত্মক ক্ষতি করে। ডাল ছাঁটাইয়ের সময় এই সমস্ত পরগাছা যুক্ত ডালগুলিকেও কেটে দিতে হয়।

মহুয়া গাছ সাধারণভাবে রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম। পোকামাকড়ে এই গাছের তেমন কোনও ক্ষতি করতে পারে না। তবে ছত্রাকঘটিত, পাতা খসা, ফুল ঝরে যাওয়া, ধসা রোগের লক্ষণ দেখা যায়। ছত্রাকনাশক ওষুধ স্প্রে করে তা প্রতিরোধ করা হয়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

মহুয়া গাছ ১০-৬০ বছর বয়স পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে ফসল উৎপাদনে সক্ষম। মহুয়ার ফসল হল এর ফুল ও ফল। তাই মার্চ-এপ্রিল মাসের আগেই প্রতিটি গাছের গোড়ার চারিদিক সুন্দর করে লেভেল করে পরিষ্কার করে রাখা হয়। কারণ ফুল ফোটার পর থেকেই গাছের গোড়ার ফুলের পাপড়িগুলি খসে পড়তে শুরু করে। প্রায় একমাস ধরে গাছের চারপাশে তা পড়তে থাকে। প্রতিদিন এই পাপড়িগুলি সংগ্রহ করতে হয় এবং তা পলিথিন শিট বা চাটাইয়ে মেলে রোদে শুকনো করা হয়। ভালভাবে শুকনো না করলে ফুলগুলি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই বেশ কয়েকদিন রোদে উলটে-পালটে ফুলগুলিকে শুকনো করে সংরক্ষণ করা হয়। প্রতি পরিণত গাছ থেকে প্রায় ১০০ কেজি-১৫০ কেজি ফুল সংগ্রহ করা হয়। মহুয়া ফুলে ৭৩% sugar থাকে, যা মহুয়া Liquire তৈরির কাজে



ব্যবহৃত হয়। কাঁচা ফুল সুগন্ধ যুক্ত হওয়ায় বিভিন্ন প্রকার রান্নায়, বিশেষ করে পায়েস রান্নায় ব্যবহার করার উল্লেখ আছে। টাটকা ফুল মিষ্টি স্বাদের হয় বলে তা শুধুও খাওয়া যায়।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে মহুয়ার বহু প্রকার ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে। মহুয়ার টাটকা ফুলের রস শুকনো কাশি সারাতে, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে, পিত্ত দোষ দূর করতে, মাথা ধরা, চোখের জ্বালা দূর করতে ব্যবহৃত হয়। বাণিজ্যিকভাবে শুকনো মহুয়া ফুল অ্যালকোহল (Alchohol) বা মদ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। শুকনো মহুয়া ফুল দুধের সঙ্গে ফুটিয়ে (boil) খেলে স্নায়ু রোগের উপশম হয় ও শরীরের দুর্বলতা দূর হয়। পুরুষদের বলবর্ধক টনিক হিসাবে এবং বীর্য (Sperm) উৎপাদনে এই ফল সাহায্য করে এবং মহিলাদের period-এর সমস্যা দূর করে। এছাড়া কোষ্ঠকাঠিন্য ও অর্শ রোগের উপশমে মহুয়া বেশ উপকারী।

ফলগুলি গাছ থেকে পেড়ে এবং গাছের তলা থেকে কুড়িয়ে সংগ্রহ করা হয়। ফলের শাঁস fermentation করে মদ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। মহুয়া গাছের কাণ্ডের ছাল ও শুকনো ফুল দুধের সঙ্গে ফুটিয়ে ৩০-৪০ মিলিলিটার মাত্রায় খেলে শরীরের বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা দূর হয়। জ্বর, মূত্রঘটিত রোগ এবং শরীরের জ্বালা-যন্ত্রণার কমাতে সাহায্য করে। মহুয়া গাছের ঔষধি গুণ (Medicinal Property) নিয়ে বর্তমানে নানান গবেষণা চলছে। ভবিষ্যতে হয়তো মহুয়ার আরও অনেক গুণাগুণের কথা আমরা জানতে পারব।

ফলের খোসা ছাড়িয়ে বীজগুলি সংগ্রহ করতে হয়। প্রতিটি গাছ থেকে প্রায় ৬০-৮০ কেজি বীজ সংগ্রহ করা যায়। বীজ শুকনো করে পলিব্যাগে ভরে তা তেল উৎপাদনের জন্য Oil mill-এ পাঠানো হয়। মহুয়া বীজে প্রায় ৫০% তেল থাকে। প্রথমে বীজগুলিকে ভেঙে বীজের মধ্য থেকে চাপ দিয়ে Karnelগুলি (প্রতিটি বীজে ২ টি করে Karnel থাকে) বের করা হয়। Kernel গুলি ভাল করে রোদে শুকনো করে সংগ্রহ করা হয়। Kernel গুলি ভালভাবে শুকিয়ে সংগ্রহ না করলে ছত্রাক ও পোকার আক্রমণে তা নষ্ট হয়ে যায় এবং তেলের গুণগত মান কমে যায়। টুকরো টুকরো করা বীজগুলি ৬৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ভাপিয়ে oil mill- এ পেষাই করে তেল নিষ্কাশন করা হয়। মহুয়ার বীজের তেল বনস্পতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বায়ো-ডিজেল (Biodiesel) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তেল নিষ্কাশনের পর বীজের অবশিষ্ট অংশটি মহুয়া খোল হিসাবে জমিতে সার হিসাবে বা পুকুরে মাছ চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়।

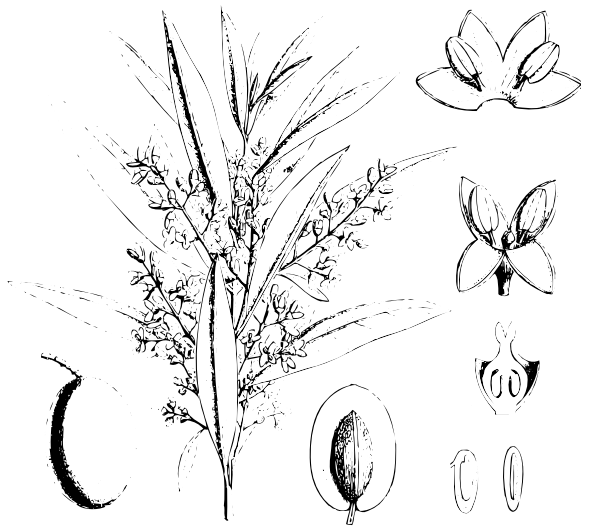
মহুয়ার বীজের তেল Biodiesel হিসাবে ব্যবহার করে পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব হবে। মহুয়া গাছের বহুদূর প্রসারিত অগভীর মূলতন্ত্র (Rootsystem) ভূমিক্ষয় রোধ করে। মহুয়া গাছের মূলে একপ্রকার ছত্রাকের মিথোজীবিতার সম্পর্ক রয়েছে। তাই শিম্বজাতীয় গাছের মতো Nitrogen fixation মাধ্যমে মহুয়া মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। মহুয়া অনুর্বর ল্যাটেরাইট মাটির উর্বরতাও বৃদ্ধি করতে সক্ষম।

মহুয়া আমাদের দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের একটি স্বাভাবিক উদ্ভিদ। সাধারণত শুষ্কপাতা ঝরা জঙ্গলে শাল, পলাশ গাছের সঙ্গেই এই গাছ জন্মায়। আদিবাসী মানুষদের প্রতিটি সামাজিক ক্রিয়াকর্মে ও উৎসবে মহুয়া ফুলের তৈরি পানীয় (মদ) অপরিহার্য সামগ্রী।

জাত পরিচিতি –

ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর পার্থক্যের কারণে মহুয়া গাছ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তবে পরিকল্পিত ফলের বাগানের জন্য এখনও পর্যন্ত এই গাছের কোনও উন্নত জাতের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদের এন. ডি. ইউনিভার্সিটি অফ এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি কিছু গাছকে চিহ্নিত করেছে। যেগুলি হল, NM2, NM4, NM7 ও NM8 (Bassia latifolia)।

তথ্যসূত্র – wikipedia, www.feedipedia.org, www.svlele.com www.fruitipedia.com/mahua.htm



বিলাতি জলপাই

পরিচয় –

তেল বা Olive oil উৎপাদনকারী জলপাই গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Olea europaea, এটি Oleaceae গোত্রের বহুবর্ষজীবী ছোট আকৃতির চিরহরিৎ উদ্ভিদ। বাংলায় জলপাই নামের আরও একটি উদ্ভিদ পাওয়া যায়। যার বিজ্ঞানসম্মত নাম Elaeocarpus serratus এবং Elaeocarpaceae গোত্রের অন্তর্ভূক্ত। তবে এই ফলটি টক স্বাদের। মূলত সবজি হিসাবে বা চাটনী রান্নাতে এটি ব্যবহৃত হয়।

এখানে মূলত তেল উৎপাদনকারী জলপাই গাছের বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ইতালি ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের তীরবর্তী দেশে জলপাই গাছের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের গবেষণায় জানা যায় যে, জলপাই গাছের চাষ বহু প্রাচীন প্রায়, ৭০০০ বছর আগে ব্রোঞ্জ যুগে হয়েছিল। মিশর, টিউনিশিয়া, এশিয়া মাইনর, ইরাক, ইজরায়েল, জর্ডন লেবানন, তুরস্ক, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে বহুপ্রাচীন কাল থেকেই এই গাছের চাষ করে আসছে।

ভারতে ২০০৭ সালে রাজস্থানে প্রথম এর চাষ শুরু হয়। বর্তমানে জম্মু-কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ ও গুজরাটে সরকারি সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদের উৎসাহিত করে জলপাই গাছের চাষ শুরু হয়েছে। সরকারি এবং ব্যক্তিগত মালিকানার জমিতে কিছু বড় বড় কোম্পানির সঙ্গে কৃষকের অংশীদারের মাধ্যমে রাজস্থানে প্রায় ৮০০ হেক্টর জমিতে জলপাই চাষ বিস্তারলাভ করেছে।

ইংরেজিতে সাধারণভাবে এই গাছ Olive tree নামেই পরিচিতি। হিন্দিতে একে জয়তুন বা জলপাই, কন্নড়ে অলিভ ও জুলাইপ, গুজরাটিতে অলিভ, তামিল ভাষায় সাইডুন, মালায়লমে অলিভু অয়েল এবং বাংলা জলপাই বলে।

জলপাই মাঝারি আকৃতির বহু শাখাপ্রশাখাযুক্ত চিরহরিৎ উদ্ভিদ। উচ্চতা ১৫ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। পাতাগুলি শাখাপ্রশাখায় বিপরীতমুখীভাবে সজ্জিত থাকে। একটি পর্ব থেকে অন্য পর্বের সঙ্গেও বিপরীতভাবে পাতাগুলি সজ্জিত থাকে। পাতাগুলি লম্বা- চওড়ায় ৩-৭ X ০.৮-২.৫ সেমি মাপের হয়ে থাকে। পাতাগুলির উপরের দিক ধূসর সবুজ রঙের এবং নীচের দিক রূপালী বা সোনালি-বাদামি রঙের আঁশযুক্ত হয়। পাতার অগ্রভাগ সূঁচালো এবং একটু বেঁকানো কাঁটাযুক্ত থাকে এবং পাতার কিনারা সমান হয়। পাতার উপরের দিকের শিরাবিন্যাস সুস্পষ্ট এবং নিচের দিকের শিরাবিন্যাস প্রায় অস্পষ্ট হয়। ফুলগুলি শাখাপ্রশাখা যুক্ত মঞ্জরীতে সজ্জিত থাকে। পুষ্পবিন্যাসটি ৫০-৬০ সেমি, ফুলের বৃতি ৪টি বৃত্যাংশে বিভক্ত এবং প্রতিটি বৃত্যাংশ ১ মিলিমিটার লম্বা হয়। ফুলের পাপড়িগুলি সাদাটে সবুজ বা ঘিয়ে রঙের হয়। পাপড়ির নলাকার অংশটি ১-২ মিলিমিটার লম্বা এবং পাপড়ির উপরের অংশটি উল্টো দিকে বেকানো এবং কম-বেশি ৩ মিলিমিটার লম্বা হয়। পুংকেশরচক্রে দুটি পুংকেশর সংযুক্ত হয়ে অবস্থান করে। বসন্তকালে জলপাই গাছে ফুল জন্মায়। ফলগুলি ড্রুপ প্রকৃতির, গোলাকার বা উপবৃত্তাকার। ১৫-২৫ মিলিমিটার লম্বা এবং ৬ মিলিমিটার ব্যাসার্ধের হয়। ফলগুলি শাঁসালো, চকচকে, মসৃণ। পাকা অবস্থায় কালচে বেগুনী বা কালচে লাল রঙের হয়।

জলপাই চাষের জন্য উষ্ণ থেকে উপক্রান্তীয় জলবায়ু প্রয়োজন হয়। সমুদ্রতল থেকে ১৫০০ মিটার উচ্চ পার্বত্য ভূমিতে এই গাছ জন্মাতে পারে। জলপাই চাষের জন্য উপযুক্ত ১৫-২০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ১০০ সেমি বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত উপযুক্ত।

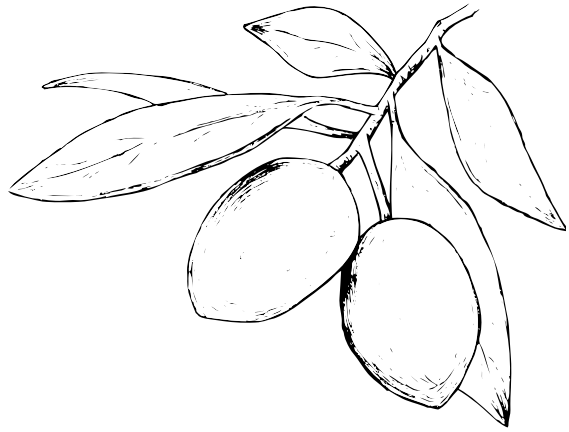
বিভিন্ন ধরনের মাটিতে জলপাই গাছ জন্মাতে পারে। গভীর উর্বরতা সম্পন্ন উত্তম নিকাশীযুক্ত দোঁয়াশ মাটি বা কাদা যুক্ত দোঁয়াশ মাটি জলাপাই চাষের উপযুক্ত। মাটির অল্পতা ও ক্ষারীয় মাত্রা ৬-৭.৫ PH এক্ষেত্রে উপযুক্ত।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

সাধারণত বীজের দ্বারা, কাটিং করে বা টিসু কালচারের মাধ্যমে জলপাই গাছের বিস্তার ঘটানো হয়ে থাকে।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে আধপাকা ফল সংগ্রহ করে বীজের উপরের শাঁসালো অংশ ভাল করে ১০% কস্টিক সোডা দিয়ে ধুয়ে বা কলের জলে ধুয়ে নার্সারীর বেডে ১৫ সেমি ব্যবধানে সারি তৈরি করে এবং বীজ থেকে বীজের ৫ সেমি দূরত্ব বজায় রেখে উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঘটিয়ে চারা তৈরি করা হয়।

জলপাই গাছের কলমের চারা তৈরি করার ক্ষেত্রে গাছের ৩-৪ টি পর্বযুক্ত পেনসিলের মতো মোটা ডাল ১০-১৫ সেমি লম্বা মাপে কেটে NAA বা ন্যাপথলিন অ্যাসিটিক অ্যাসিড (৫০০ PPM) এবং IBA বা ইন্ডোল বুটানোয়িক আসিড (৩০০০ PPM) প্রয়োগ করে মিস্ট চেম্বারে (Mist chamber) রোপণ করা হয়। কাটিং-এ মূল বা শিকড় জন্মানোর জন্য ২২–২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস নিয়ন্ত্রিত



তাপমাত্রা ও ৭৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় Mist chamber-এ সংরক্ষণ করলে ৭-৮ সপ্তাহের মধ্যে কাটিংয়ে যথেষ্ট পরিমাণ শিকড় উৎপন্ন হয়ে যায়। এরপর Mist chamber-এর বাইরের আবহাওয়া সহ্য করিয়ে নার্সারীর পরিচর্যায় রেখে উপযুক্ত সময়ে জমিতে রোপণ করতে হয়।

চারা রোপণের আগে জলপাই চাষের জন্য নির্দিষ্ট জমিতে লাঙল বা ট্র্যাক্টর দিয়ে ভালভাবে চাষ দিয়ে জমি প্রস্তুত করা হয়। জমিতে চাষ দেওয়ার আগে ঝোপঝাড় কেটে আগাছা পরিষ্কার করে তারপর জমিতে চাষ দেওয়া হয়। বর্গাকার পদ্ধতিতে রোপণের জন্য ৬ X ৫ মিটার দূরত্বে অথবা ৮ X ৫ মিটার দূরত্বে উর্বর জমিতে রোপণের জন্য ৮ মিটার দূরত্বে এবং খর্বাকার প্রকৃতির কলমের গাছের জন্য ৬-৭ মিটার দূরত্বে ৬০ X ৬০ সেমি বা ৯০ X ৯০ সেমি আয়তনের গর্ত কেটে যথেষ্ট পরিমাণ জৈবসার (FYM) ও রাসায়নিক সার (ফসফেট) মাটির সঙ্গে মিশ্রিত করে রোপণের জন্য গর্তগুলি প্রস্তুত করা হয়।

সেচযুক্ত এলাকায় জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে, অসেচ এলাকায় জুলাই-অগাস্ট মাসে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতযুক্ত জায়গায় বর্ষার পরে চারাগাছ রোপণ করা হয়ে থাকে। রোপণের আগে চারাগাছের গোড়ার মাটিতে ১% কপার সালফেট দ্রবণে ভিজিয়ে এবং জোড়কলমের গোড়া অংশটি মাটির উপর ২২-২৫ সেমি উপরে রেখে রোপণ করা হয়। চারাগাছের সংখ্যা ৮ মিটার দূরত্বে রোপণ করলে প্রতি হেক্টরে ১৫০টি গাছ, ৬ X ৭ মিটার দূরত্বে ২৫০–৩০০টি এবং ৬ X ৫ মিটার দূরত্বে বা ৮ X ৫ মিটার দূরত্বে ২৫০-৩৩০টি চারাগাছের প্রয়োজন হয়।

পরিচর্যা –

জলপাই গাছ রোপণের পর প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়মিত জল দিয়ে চারাগাছগুলিকে পরিচর্যা করে জমিতে লেগে যেতে বা ধরে যেতে সাহায্য করা হয়।

জলপাই চাষের জন্য ১০০ সেমি বৃষ্টিপাত যথেষ্ট। তবে দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হলে মাঝেমধ্যে সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। গাছে ফুল আসার আগে একবার এবং ফল ধরার পর ফলের বৃদ্ধির জন্য আর একবার সেচ দিতে হয়। জলপাই গাছের জন্য বেশি সেচের প্রয়োজন হয় না।

জলপাই চাষে প্রতি গাছের (১ বছর বয়সী) জন্য ১০ কেজি জৈবসার (FYM) প্রয়োগ করতে হয়। প্রতি বছর ৫ কেজি করে এই সারের পরিমাণ বাড়াতে হয়। প্রতি বছর ৭৫ : ৫০ : ৫০ গ্রাম অনুপাতে প্রতি গাছে NPK (নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম) দিতে হয়। এছাড়া ৩০০ গ্রাম সুপার ফসফেট, ৩০০ গ্রাম ক্যালসিয়াম আমোনিয়াম নাইট্রেট এবং ৮০ গ্রাম মিউরিয়েট অফ পটাশ ১০ বছর পর্যন্ত প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। বর্ষাকাল জলপাই গাছে সার প্রয়োগ করার উপযুক্ত সময়। এছাড়া Borax Phosphate ও পটাশ সার মাটির ১৫ সেমি গভীরে প্রয়োগ করলে তা খুবই কার্যকরী হয়। নাইট্রোজেন সার সাধারণত ৩টি কিস্তিতে প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়। প্রথমবার অর্ধেক পরিমাণ বাকি অর্ধেক পরিমাণ সার সমান ভাগে দু'ভাগ করে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তিতে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। প্রতিবার সার প্রয়োগের পর সেচ দিতে হয়।

জলপাইয়ের প্রতিটি চারাগাছের সঙ্গে একটি বাঁশ বা কোনও গাছের সঙ্গে চারাটিকে বেঁধে গাছগুলিকে সোজাভাবে বড় করা হয় এবং এরফলে ঝড়ের হাত থেকেও গাছগুলিকে রক্ষা করা সম্ভব। জলপাই গাছের গোড়ার দিকে মাটির থেকে ৪০-৪৫ সেমি উচ্চতায় কোনও ডালপালা থাকলে তা কেটে একটি করে ডানদিকে একটি করে ও বাঁ দিকে একটি করে ডাল রেখে গাছগুলিকে বড় করা হয়। ফল সংগ্রহের ঠিক পরে গাছের ডালপালা ছাঁটাই করে শুকনো-রুগ্ন ডালপালাগুলিকে ছেঁটে নতুন ডালপালা গজানোর ব্যবস্থা করে দিয়ে ফল উৎপাদন বাড়ানো হয়।

নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার এবং মালচিং-এর মাধ্যমে জমির আর্দ্রতা সংরক্ষণের মাধ্যমে ফলের উৎপাদন এবং ফলের গুণমান বাড়ানো সম্ভব। মাটিতে চাষ দিয়ে বা আগাছা দমনের ওষুধ স্প্রে করে আগাছা দমন করা হয়ে থাকে। বছরে ২-৪ বার পরপর Simazine ও Diuron-এর মিশ্রণ প্রতি হেক্টরে ২কেজি স্প্রে করে আগাছা দমন করা যায়। এছাড়া ২-৩ লিটার Gramoxone প্রতি হেক্টর জমিতে স্প্রে করে ও শক্ত ধরনের আগাছা দমন করা হয়ে থাকে।

এছাড়া জমিতে জলপাই গাছের সারির খালি জায়গায় গম, বার্লি, ওটস্, গম জাতীয় শস্য চাষ করে একইসঙ্গে আগাছা দমন ও আর্দ্রতা সংরক্ষণ করে বাড়তি শস্য উৎপাদন করা যায়।

জলপাই গাছের নিয়মিত পরিচর্যা, ডাল ছাঁটাই ইত্যাদি করে পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে গাছকে অনেকটাই বাঁচানো সম্ভব। এছাড়া



জলপাই গাছের শিকড়ের পচন রোগ, পাতায় দাগ, ধসা রোগ ও নানা প্রকার ছত্রাকঘটিত রোগের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন সরকারি দফতরের উপযুক্ত পরামর্শ অনুযায়ী ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করে রোগপোকা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

উপযুক্ত সময়ে পরিণত জলপাইয়ের ফল সংগ্রহ করলে ফল ও তেলের উৎপাদন এবং গু মান ঠিক থাকে। গাছে ফুল ধরার ২৭-৩০ সপ্তাহ পর ফলগুলি পরিণত হয়ে যায়। পরিণত ফলগুলি কালচে লাল রঙের হয়ে গেলে গাছ থেকে হাত দিয়ে বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ফল সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। প্রতিটি পরিণত জলপাই গাছ থেকে গড়ে ৩০ কেজি ফল উৎপন্ন হয়ে থাকে। ফলের থেকে ২২-২৫% তেল উৎপন্ন হতে পারে।

জলপাই একটি ঔষধিগুণ সম্পন্ন ভোজ্য তেল উৎপাদনকারী গাছ। জলপাই তেলের শতকরা ৯০% শতাংশই রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া অন্যান্য কাজেও এই তেল ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

জলপাই তেলে ৮৮৪ ক্যালরি শক্তি থাকে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ফ্যাট যেমন, ১৪ গ্রাম Saturated fat, ১১ গ্রাম Poly unsaturated fat ও ৭৩ গ্রাম Mono unsaturated fat থাকে। এতে কোলেস্টেরল থাকে না। তবে জলপাই তেলে ২ মিলিগ্রাম সোডিয়াম ও ১ মিলিগ্রাম পটাসিয়াম পাওয়া যায়।

ভোজ্য তেল হিসাবে এই তেল ব্যবহার করলে শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়া পাকস্থলীর ক্যানসার, খাদ্যনালীর আলসার, ডায়াবেটিস, অ্যালজাইমার, প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। জলপাই তেল আর্থ্রাইটিস বা বাতের ব্যথার উপশমে ব্যবহার করা যায়। এছাড়া গবেষণায় জানা গেছে, স্ট্রোকের সম্ভাবনা কমাতে এই তেল খুব উপকারী। জলপাই তেলে Mono unsaturated fat (যা Oleic acid নামে পরিচিত) থাকায় তা ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়ক এবং শরীরের যন্ত্রণা কমাতে উপযোগী। এই তেলে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকায় কোলেস্টেরলের মাত্রাকে কম করে হার্টের পক্ষে উপকারী। এছাড়া ত্বক, চুল ও নখের স্বাস্থ্য রক্ষায় এই তেল বেশ কার্যকর। প্রসাধনী শিল্পেও জলপাই তেলের বিভিন্ন ব্যবহার রয়েছে। জলাপাই গাছের কাঠ ভাল মানের মজবুত আসবাবপত্র তৈরি সহায়ক।

জলপাই চাষের পর কৃষকদের থেকে অধিকংশ ফলই সরকার কিনে নেয়। ফলের গুণগতমান হিসাবে ফলের দাম ঠিক করা হয়। রাজস্থান কৃষি দফতরের তথ্য অনুযায়ী, প্রতি হেক্টর জমিতে সঠিক পরিচর্যায় জলপাই চাষ করে ১০-১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লাভ করা সম্ভব। ভারতীয় Agri farming-এর তথ্য অনুযায়ী, প্রতি হেক্টর জমিতে গম চাষ করে যে পরিমাণ লাভ পাওয়া যায়, ওই একই পরিমাণ জমিতে জলপাই চাষ করে গমের চেয়ে ৫গুণ বেশি লাভ করা সম্ভব। ভারতে জলপাই চাষ একটি অর্থকরী কৃষিজ ফসল হিসাবে পরিচিতি পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

জাত পরিচিতি –

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতের জলপাই চাষ করা হয়ে থাকে। যেমন, Manzanilla, Picholine, Kalamata, Nicoise, Liguria, Ponentine, Gaeta, Lugano এবং Sevillano এছাড়া Agriculture farming –এও কিছু জাতের জলপাইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, Mission, Cornicabra, Ascolana, Grosseune, Picholine ইত্যাদি। এছাড়া তেলের নিরিখে Coratima, Canino, Aglandeau, Frantoio, Carolea Pendolino, Ascolanaterena ইত্যাদি বিভিন্ন জাতের জলপাই দেখা যায়।

তথ্যসূত্র – wikipidia



কোকুম (ভেরেন্ডা)

পরিচয় –

ভেরেন্ডা বা কোকুমের বিজ্ঞানসম্মত নাম Garcinia Indica, এটি Clusiaceae পরিবার বা গোত্রের অর্ন্তভুক্ত।

এই গাছটি মূলত ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের প্রায় অব্যবহৃত একটি অখ্যাত ফল। আমাদের দেশজুড়ে এই গাছ দেখা যায়। ভারতের পশ্চিমঘাট অঞ্চলের কোঙ্কণ, গোয়া, কেরালা ও দক্ষিণ কর্ণাটকের ক্রান্তীয় বনাঞ্চলে এই গাছটি বিস্তৃতভাবে জন্মায়। এছাড়া মহারাষ্ট্র, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে খুব বেশি পরিমাণে ভেরেন্ডা গাছ দেখা যায়।

ইংরেজিতে এই গাছকে Cambodge, Malabar Tamarind বা Kokam বলে। এছাড়া হিন্দিতে কোকুম, মারাঠীতে কোকুম, ভেরান্ডা, ভিরান্ডা, কোকাম্বা, কোকাম্বি বা রাতাম্বা, তামিলে মুরগাল, মালায়লমে কাট্টাম্পি, কোক্কাম বা কুদাম্পুলি, কন্নড়ে মুরগিনা বা পুনারপুলি, গুজরাটিতে কোকাম, ওড়িয়ায় তিন্তালি এবং বাংলায় কোকুম নামে পরিচিত।

গরম-আর্দ্র জলবায়ুতে এই গাছ ভাল জন্মায়। ৭০% আর্দ্রতা, ২০-৩৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ২৫০৪০০ সেমি-এর ভাল বার্ষিক বৃষ্টিপাত ভেরেন্ডা গাছের বৃদ্ধির পক্ষে উপযুক্ত।

কাঁকুরে, বেলে, কাদা ও দোয়াঁশ মাটিতে এই গাছ জন্মায়। তবে ভাল আর্দ্রতা ধরে রাখে এমন ভাল ঘন মাটিতে এই গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। এই গাছ কিছু মাত্রায় খরা ও জমা জল সহ্য করতে সক্ষম। ভেরেন্ডা চাষের জন্য উষ্ণ ও মাঝারি আর্দ্রতা খুব কার্যকরী।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

ভেরেন্ডা বা কোকুম চাষ বীজ থেকে ও অঙ্গজ জনন পদ্ধতির মাধ্যমে হতে পারে। যেহেতু বীজ থেকে প্রসারণ সময়সাপেক্ষ, তাই অঙ্গজ জনন পদ্ধতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

১-২ বার ভালভাবে জমিতে লাঙল দিতে হয়, জমির মাটিকে ভাল করে ওলট-পালট করার জন্য। এরফলে জমির আগাছা মুক্ত করাও সম্ভব হয়। ৬০ X ৬০ X ৬০ সেমি মাপের গর্ত করে উপরের মাটির সঙ্গে জৈবসার (FYM) মিশিয়ে ভরাট করা হয়। রোপণ সাধারণত বর্ষার প্রারম্ভেই করা দরকার। রোপণের পরে গর্তে মূলের চারাপাশে মাটি চেপে দেওয়া হয় এবং কলমকে গোঁজ দেওয়ার জন্য দড়ি ও দুটো শক্ত খোঁটা ব্যবহার করা হয়। গাছের ও সারির মধ্যে ৫-৬ মিটার দুরত্ব রেখে কলম বসাতে হয়। ৪ X ৪ মিটার আয়তনে কোকুমের চারা বসানো যেতে পারে।

পরিচর্যা –

ভেরেন্ডা চাষের ক্ষেত্রে জমিতে চারা রোপণের পর খুব তাড়াতাড়ি সেচ দিতে হয়। মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখার ক্ষমতা ও আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে নিয়মিত সেচ দেওয়ার কাজটি করতে হয়। শুষ্ক ও উষ্ণ জলবায়ুতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ৭-১০ বার সেচ দেওয়া দরকার। বর্ষাকালে জল জমে থাকলে এই গাছের ক্ষতি হতে পারে। এক্ষেত্রে Drip irrigation পদ্ধতি ব্যবহার করে জলের ব্যবহার কম করা যায়।

মাটির উর্বরতা বাড়াতে জমি তৈরির সময় ভাল করে পচানো সার সহায়ক হিসাবে মেশানো হয়। রোপণের প্রথম বছরে প্রত্যেক গাছে ২ কেজি পরিমাণে জৈবসার (FYM) ও ৫০ : ২৫ : ২৫০ গ্রাম অনুপাতে নাইট্রোজেন, পটাসিয়াম, সোডিয়ামের (NPK) মিশ্রণ প্রয়োগ করতে হয়। প্রতি বছর এই সারের পরিমাপ বাড়াতে হয় এবং দশ বছরের পর থেকে প্রতি গাছে ২০ কেজি কৃষিক্ষেত্রে পচানো সার (FYM), ৫০০ গ্রাম নাইট্রোজেন (N), ২৫০ গ্রাম পটাসিয়াম (P) ও ২৫০ গ্রাম সোডিয়াম (K) প্রয়োগ করা হয়। অগাস্ট মাসে এই রাসায়নিক সার রিং পদ্ধতিতে কোকুম গাছের আচ্ছাদনের নিচে অবশ্যই প্রয়োগ করা দরকার।

সাধারণত হাত দিয়ে গাছের তলা পরিষ্কার করে আগাছা মুক্ত করা যায়। ধানের খড় বা নারকেলের পাতা দিয়ে মালচিং করে মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও গাছের গোড়ায় আগাছার বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। জলে পচা কচি ডাল (water shoots), রুটস্টক স্প্রাউট (rootstock sprout), ক্রীস ক্রস (criss cross) এবং নিচের শাখাগুলি একটা সময় অন্তর সরিয়ে ফেলা Intercultural operation –এর একটা অংশ।

ভেরেন্ডা চাষের ক্ষেত্রে রোপণের ৫-৬ বছর পর এই গাছের সঙ্গে অর্ন্তবর্তী ফসলের চাষ করা যায়। অর্ন্তবর্তী ফসল হিসাবে রাঙা আলু, শাক-সবজি, ফুল ও স্টাইলো ঘাস লাগানো যায়। নারকেল বাগানে ৬ X ৬ মিটার আয়তনের জায়গায় অর্ন্তবর্তী ফসল হিসাবে এই ভেরেন্ডা বা কোকুম চাষ করা যেতে পারে।



এক্ষেত্রে তেমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ কীটপতঙ্গ ও রোগের আক্রমণ দেখা যায় না। পাতা ছিদ্রকারী Leaf miner ও Mealybugs কচি পাতা নষ্ট করে। গাছে ০.০৩% Phosphamidon বা ০.০৩% Dimethoate ছড়িয়ে দিলে এই পোকাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

বীজ থেকে তৈরি চারার গাছে ফল আসতে ৭-৮ বছর সময় লাগে। তবে কলমের গাছে মাত্র ৪-৫ বছরের ফল আসতে শুরু করে। সাধারণত হাত দিয়েই গাছ থেকে ফলগুলি সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

কোকুম বা ভেরেন্ডার উৎপাদন নির্ভর করে গাছের জাত, মাটির চরিত্র, আবহাওয়া ও পরিচর্যার উপর। আর এসব যথাযথ থাকলে প্রতি বছরে প্রতি গাছ থেকে ৪৫–৬০ কেজি ফল উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে।

টাটকা ফল চিনি সহযোগে সংরক্ষণ করা যায়। যা থেকে উজ্জল লাল রঙের স্কোয়াশ তৈরি করা যায় এবং জলে গুলে বোতলে রেখে দেওয়া যায় বা পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা যায়। মহারাষ্ট্রে এই ফলের নির্যাসের সঙ্গে নারকেলের দুধ মিশিয়ে এক ধরনের খাবার তৈরি করা হয়ে থাকে।

ভেরেন্ডা আমাদের শরীরের পক্ষে খুবই উপকারী। এই ফল হার্ট ভাল রাখে, দেহের ওজন কমায়, হজম শক্তি বাড়ায়, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

এছাড়া কোকুমের বীজ থেকে এক ধরনের তেল (২৩-২৬%) পাওয়া যায়। গাছ থেকে ফল সংগ্রহের পর লাঠি দিয়ে মেরে ফল থেকে বীজগুলিকে আলাদা করা হয়। এরপর বীজগুলিকে পুরোপুরি আর্দ্রতা মুক্ত করার জন্য ভাল করে শুকনো করা হয়। তারপর ওই শুকনো বীজগুলি থেকে কোকুমের তেল নিষ্কাশন করা হয়। একে কোকুম বাটারও বলা হয়। যা দেখতে হালকা ঘিয়ে বা হালকা হলদে রঙের দেখতে। ভাল করে এই তেলকে পরিশোধন করলে এটি বনস্পতি ঘি-এর সমতুল্য হয়ে যায়।

কোকুম তেলে ৬০-৬৫% Saturated fatty acid থাকে। তাই ঘরের সাধারণ তাপমাত্রায় এটি জমে যায়। আর তাই এই তেলকে কোকুম বাটার বা কোকুম ফ্যাটও বলা হয়। এই তেলে ৮০% stearic-oleic-stearic (SOS) triglycerides থাকে। তবে ত্বকের সংস্পর্শে এলে এই কোকুম বাটার গলে যায়। এই তেলে ২.০-৮.০% Palmitic acid, ৫৫-৬৫% Stearic acid, ৩০-৪৪% Oleic acid এবং ০-৮% Linoleic acid থাকে। এই তেলে triglycerides থাকার কারণে কোকো বাটারের বিকল্প হিসাবে এটি ব্যবহৃত হয় এবং ত্বকে দিলে খুব তাড়াতাড়ি তা শুষে নেয়। এতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন – E থাকে।

কোকুমের তেল কনফেকশনারি, ওষুধ ও প্রসাধনী তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি এই ফল থেকে hydroxycitric acid (HCA) নিষ্কাশনের জন্য আলাদা শিল্প গড়ে উঠেছে।

এছাড়া এই তেল পা মালিশ করতে বা পুড়ে যাওয়ার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

জাত পরিচিতি –

ভারতে সাধারণত দু'ধরনের কোকুমের জাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলি হল, Konkan Amruta(S-8) এবং Konkan Hatis তবে এই দুটি ছাড়াও এদেশের বাজারে দ্রুত ফল ধরে এবং উচ্চফলনশীল বেশ কিছু জাতের কোকুম রয়েছে। এমন উচ্চফলনশীল জাতগুলি হল, Pednem Keri 1, Kasarpal 5, Kharekhazan 1, Borim 2 এবং Parashte 3

আর Gola 17, Savoi Kamini 1, Mashem 4, Hedode 1, Parashte 3 Pednem Keri 1 এবং Hedode 1 হল দ্রুত ফল উৎপন্নকারী জাত।

তথ্যসূত্র – www.agrifarming.in, http://en.wikipedia.org/wiki/kokum_oil, http;//en.wikipedia.org/wiki/ Garcinia_indica

শিল্পের সহায়ক গাছ



লেমন গ্রাস

পরিচয় –

লেমন ঘাসের বিজ্ঞানসম্মত নাম Cymbopogon flexuosus, এটি Poaceae গোত্রের বা পরিবারের অর্ন্তভুক্ত একটি বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ।

লেমন ঘাসের আদি জন্মস্থান ভারত ও অন্যান্য জায়গায়। ভারতে বাণিজ্যিকভাবে গন্ধযুক্ত গাছের চাষের মধ্যে লেমন অন্যতম। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক জায়গায় এই ঘাস জন্মায়। ভারতে সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশে পাহাড়ের পাদদেশ ছাড়াও পশ্চিমঘাটের কেরালা, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, আসাম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য অংশে এবং কর্ণাটকে এই লেমন ঘাস জন্মায়। বর্তমানে ভারতের পশ্চিম অংশেও এই ঘাস জন্মায়।

ইংরাজিতে এটি Lemon Grass নামে পরিচিত। হিন্দিতে এই ঘাসকে গন্ধতৃণা, গুজরাটিতে লিলিচা, মারাঠীতে গাভাটি চাহা, তেলেগুতে নিমা গাড্ডি, তামিলে ইলুমিচাই-ইনাই-পুল্লু, কন্নড়ে নিমব হুল্লু, মালায়লমে কোচিন গ্রাস বা মালাবার গ্রাস বা ভাসানা পুল্লু বলা হয়। লেমন গ্রাস জন্মানোর জন্য পুরোমাত্রায় সূর্যের আলোর প্রয়োজন হয়। সারা বছর ধরে ২০০-২৫০ সেমি-র ভাল বৃষ্টিপাত সহ উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ু এর পক্ষে উপযোগী। তবে কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে বিকল্প সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমেও লেমন ঘাসের চাষ করা সম্ভব।

বিভিন্ন ধরনের মাটিতে এই ঘাস ভালভাবে বেড়ে ওঠে। উর্বর দোয়াঁশ মাটি থেকে লাল কাঁকুরে মাটি, সর্বত্রই লেমন ঘাস হতে পারে। কিন্তু ভাল নিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত জৈব পদার্থে সমৃদ্ধ বেলে-দোয়াঁশ মাটি ও লালমাটি লেমন ঘাস চাষের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। জল জমে এমন মাটি এই চাষের পক্ষে একেবারেই উপযোগী নয়।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

বীজের দ্বারা নার্সারিতে চারা তৈরি করে লেমন ঘাসের ভাল প্রসারণ ঘটানো সম্ভব। এক হেক্টর জমিতে রোপণের জন্য ২.৫-৩ কেজি সতেজ বা টাটকা বীজ থেকে চারা তৈরি করা হয়। এক হেক্টরে লেমন ঘাস চাষ করতে ২.৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

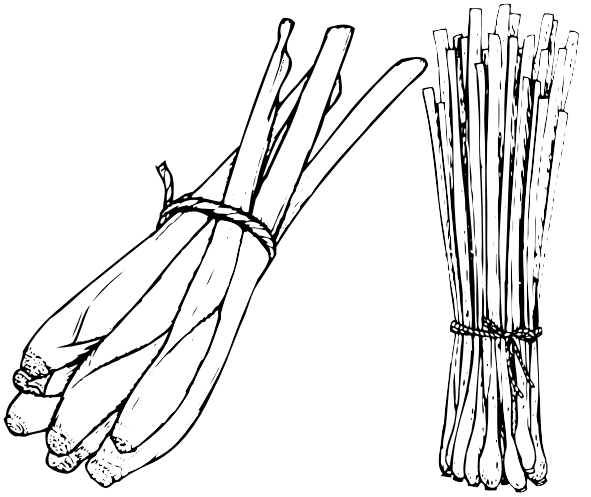
এছাড়া গাছের ঝাড়গুলো ভেঙ্গে ফেলে নতুন ডাল তৈরির মাধ্যমে লেমন ঘাসের অঙ্গজ প্রসারণও ঘটানো যায়। ৬০ সেমি X ৮০ সেমি আয়তন জায়গা রেখে এগুলি রোপণ করা হয়। এক হেক্টর জমির জন্য ২৫ হাজার চারা লাগে।

জমি খনন বা কর্ষণ করে তারপরে জমি সমান করা হয়। ৩০ সেমি অন্তর ৩০-৩৫ সেমি চওড়া অগভীর গর্ত কাটতে হয়। কৃষিক্ষেত্রে ভাল করে পচানো সার ওই গর্তের মাটিতে মেশানো হয়। ২টি সারিতে ২০ সেমি দুরত্ব অন্তর ২০-৩০ দিন বয়সের চারাগুলি রোপণ করা হয়। বর্ষাকালে উঁচু মাটির বেডে চারা রোপণ করা হয়। সাধারণত মে মাসের শেষ সপ্তাহে অথবা জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে লেমন ঘাসের চারাগুলি রোপণ করা হয় । চারা রোপণের আগে মূল জমিকে ভাল করে তৈরি করা হয় এবং ৬ সেমি X ৬ সেমি আয়তনের বেড তৈরি করা হয়। মাটির পটাশ ও ফসফরাসের অভাব সম্পূর্ণটা পূরণ করতে হয়। একমাত্র অক্টোবর-নভেম্বর মাস ছাড়া উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থায় বছরের যে কোনও সময়ে লেমন ঘাসের চারা রোপণ করা যায়। ৬টি সমান ভাগে বা মাত্রায় মাটিতে নাট্রোজেন প্রয়োগ করা হয়। প্রথম মাত্রায় অবশ্যই রোপণের সময়। পরের মাত্রাটি এর ৪ সপ্তাহ পরে দেওয়া হয়। আর অবশিষ্ট মাত্রাগুলি প্রত্যেকবার ফলনকাটার পর দেওয়া হয়। সব পুরনো মূলগুলিকে কেটে নুতন পত্রী তৈরি করা হয় ও সব পাতাগুলিকে সরিয়ে ফেলা হয় এবং ৬০ সেমি দূরত্বে আলগুলি তৈরি করা হয়। তারপর ৬০ সেমি X ৬০ সেমি আয়তনের দূরত্ব রেখে ওই নতুন পত্রীগুলিকে আলের ঢালের দিকে প্রায় অর্ধেক নিচের অংশে রোপণ করা হয়।

পরিচর্যা –

আবহাওয়া ও মাটির ধরন অনুযায়ী প্রতি একদিন অন্তর ৪ সপ্তাহ ধরে এবং তারপর সপ্তাহে একবার করে গাছে সেচ দেওয়া হয়। বর্ষাকালে সেচের প্রয়োজন হয় না। তবে মাটিতে ভাল নিকাশী ব্যবস্থা থাকা দরকার।

প্রতি একরে লেমন ঘাস চাষ করতে ১০ হাজার এবং প্রতি হেক্টরে ২৫ হাজার নতুন চারা লাগে। প্রতি হেক্টরে ৪ টন কৃষি জমিতে পচানো সার (জৈবসার) লাগে। নাইট্রোজেন প্রতি একরে লাগে ২০০ কেজি, প্রতি হেক্টরে ৪৫০ কেজি। পটাসিয়াম অক্সাইড (P2O5) প্রতি একরে লাগে ৪০ কেজি, প্রতি হেক্টরে লাগে ১০০ কেজি। সোডিয়াম অক্সাইড (K2O) প্রতি একরে লাগে ৫০ কেজি এবং প্রতি হেক্টরে লাগে ১২৫ কেজি।



লেমন ঘাসে তেমন কোনও অতি ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণের কথা জানা যায়নি।

জমিতে লেমন ঘাস রোপণের প্রথম ৩-৪ মাস জমিকে আগাছামুক্ত রাখা হয়। অনুরূপভাবে প্রত্যেকবার ফসল সংগ্রহের পর ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত নিড়ানীর সাহায্যে আগাছা পরিষ্কার করা হয়। সাধারণত বছরে ২-৩ বার আগাছা পরিষ্কারের প্রয়োজন হয়। সারিতে বসানো গাছ, আন্তঃচাষ প্রক্রিয়া অবশ্যই হাত নিড়ানী বা ট্রাক্টর টানা দিয়ে করা হয়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

লেমন ঘাস বহুবর্ষজীবী। প্রায় ৫ বছর পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। মাটির উপর স্তর থেকে ১০ সেমি উঁচুতে গাছ কেটে ফসল সংগ্রহ করা হয়। রোপণের প্রথম বছরে ৩০ বার কাটা হয় ও পরের বছরগুলিতে ৫–৬ বার কাটা হয়। প্রথম ফসল কাটা হয় গাছ রোপণের মোটামুটি ৩ মাস পর থেকে এবং পরবর্তীতে ৪৫-৬০ দিন অন্তর কাটা হয়।

তেলের উৎপাদনে ও গুণগত মানে যাতে কোনও খারাপ প্রভাব না পড়ে তারজন্য পাতাগুলি সংগ্রহ করে ঢাকা জায়গায় ৩দিন ধরে রেখে শুকনো করা হয়। পরিশোধনের পূর্বে সেগুলিকে টুকরো টুকরো করে নেওয়া হয়।

প্রত্যেক ফলনে ১৫ টন করে ফসল উৎপাদিত হয়। সজীব বা টাটকা লেমন ঘাস থেকে ০.৫% তেল উৎপাদিত হয়। দ্বিতীয় বছর থেকে প্রতি হেক্টর থেকে প্রায় ৪০০ কেজি তেল উৎপাদিত হয়। উৎপাদন নির্ভর করে বীজের প্রজাতি ও শস্য ব্যবস্থাপনার উপর।

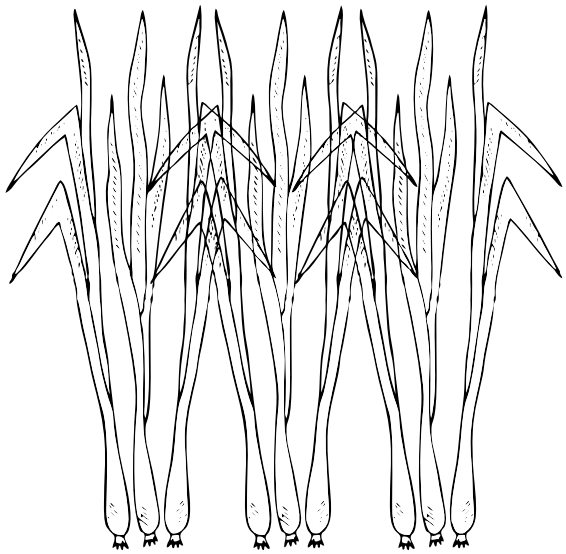
লেমন ঘাসের একাধিক ঔষধি গুণ থাকায় স্বাস্থ্যের পক্ষে এটি খুব উপকারী। লেমন ঘাসের ক্যানসার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রয়েছে। পেশীর যন্ত্রণা উপশমে লেমন ঘাসের তেল ব্যবহার করা হয়। জ্বর ও সর্দিকাশি রুখতে লেমন ঘাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে লেমন ঘাস। মানসিক চাপকে কমাতে, উচ্চরক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে এই ঘাস। শরীরের টক্সিক (বিষাক্ত) পর্দাথ বের করে শরীর পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া কিডনী, প্যাংক্রিয়াস, লিভার, ব্লাডার প্রভৃতি পরিষ্কার রাখতেও সক্ষম এই লেমন ঘাস। পাচননালীকে পরিষ্কার রাখে, ঋতুস্রাবের সমস্যা সমাধানে, ব্রণ ও ফুসকুড়ি সারাতে সাহায্য করে।

সুগন্ধের জন্য লেমন ঘাস প্রতিদিন চায়ের মতো পান করা যায়। লেমন ঘাসের পাতা ও ফুলের অগ্রভাগ থেকে যে তেল নিষ্কাশন করা হয় তাতে বেশিমাত্রায় Citral থাকায় তেলে একটা উগ্র লেবুর মতো গন্ধ থাকে। এই গন্ধের জন্য লেমন ঘাসের তেল ভেষজ সামগ্রী, ডিটারজেন্ট, গন্ধযুক্ত সাবান এবং পোকামাকড় তাড়ানোর ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। লেমন ঘাসের তেলে এই Citral থাকায় সুগন্ধী, কস্‌মেটিকস্‌ ও বেভারেজ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

জাত পরিচিতি –

বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য লেমন ঘাসের কয়েকটি প্রজাতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলি হল, সুগন্ধী (Sugandhi), প্রমাণ (Praman), পি.আর.এল. – ১৬ (PRL–16), সি.কে.পি.-২৫ (CKP -25), ও.ডি. – ৪০৮ (OD-408), আর.আর.এল.– ৩৯ (RRL–39), প্রগতি (Pragati) ও কাবেরী (Kaveri)।

তথ্যসূত্র - www.agrifarming.in



সিট্রোনেলা

পরিচয় –

সিট্রোনেলার বিজ্ঞানসম্মত নাম Cymbopogon winterianus jowitt, এটি Poaceae গোত্রের একটি বহুবর্ষজীবী ঘাস জাতীয় একটি উদ্ভিদ।

সম্ভবত দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলঙ্কা সিট্রোনেলার আদি জন্মস্থান। ১৯০০ সালের আগেই জাভায় এর চাষ হয় এবং ১৯০০ সাল নাগাদ জাভায় ব্যাপকভাবে এই ঘাসের উৎপাদন ও পাতনের সরঞ্জাম নিয়ে কাজ শুরু হয়। বর্তমানে পৃথিবীর ক্রান্তীয় জলবায়ুর অঞ্চল জুড়ে এর চাষ হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামে এবং ব্রাজিলে বেশ কিছু অংশে, চিন, ঘানা, গুয়েতেমালা, হাইতি, হন্ডুরাস ও ভারতে এই ঘাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই গাছ লম্বায় প্রায় ২ মিটার হয়। কাণ্ডের রং কালচে বেগুনী বর্ণের। পাতাগুলি লম্বা ও সবুজ রঙের হয়।

ক্রান্তীয় ও উষ্ণক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে এই ঘাসটি ভাল জন্মায়। এই গাছের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে আর্দ্রতা ও সূর্যের আলোর প্রয়োজন হয়। বছরে প্রায় ২৫০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত সিট্রোনেলার বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে এবং ফলন ও তেলের গুণগত মান বেড়ে যায়। তবে যে সব এলাকায় বৃষ্টিপাতের হার কম সেখানে বিকল্প হিসাবে সেচ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

বিভিন্ন ধরনের মাটিতে সিট্রোনেলা হতে পারে। তবে জৈবসার সমৃদ্ধ অতিরিক্ত আর্দ্র ও হালকা বালি মাটি এর পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। মাটির PH-এর মাত্রা ৬.৬-৮.০ মধ্যে থাকা এই ঘাসের পক্ষে আদর্শ। তবে মাটির ভাল জল ধারণের ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন এবং মাটিতে জল নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত থাকা দরকার। জমিতে ক্ষারযুক্ত জল জমে থাকলে এই গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

সাধারণত Clumss-এর দ্বারা অঙ্গজ জনন পদ্ধতিতে এই ঘাসের কৃত্রিম প্রসারণ ঘটানো সম্ভব। দেখা গেছে, এক একর জমিতে হওয়া Java Citronella ১০ একর জমিতে রোপণের জন্য প্রয়োজনীয় Slip উৎপাদনে সক্ষম। টানা ৫ বছর জমিতে এই ঘাস থাকতে পারে। তবে এক্ষেত্রে মাটির উর্বরতা সমানভাবে রক্ষা করে যেতে পারে। সাধারণত দেখা যায়, এক বছর বয়সী Clump থেকে গড়ে ৫০টি Slips পাওয়া যায়। এরপর জুন-জুলাই মাসে এই Slips জমিতে রোপণ করা হয় এবং বর্ষায় এগুলি ভালভাবে মাটিতে দাঁড়িয়ে যায়।

রোপণের আগে জমি ভাল করে লাঙল দিয়ে এবং কুপিয়ে নিতে হয়। সাধারণত রোপণের আগে প্রতি হেক্টর জমির জন্য ৮-১০ টন জৈবসার ৪০ কেজি P205 (ফসফরাস পেন্টোক্সাইড) ও ৪০ কেজি K20 (পটাসিয়াম অক্সাইড) ভালভাবে মিশিয়ে মাটিতে প্রয়োগ করতে হয় এবং জমিতে সেচনালা সহ ৬ X ৬ মিটার মাপের বেড তৈরি করতে হয়। রিজের ঢালের উপরের দিকে ৬০ X ৪৫ সেমি দূরত্ব বজায় রেখে রোপণ করলে প্রতি হেক্টর জমিতে প্রায় ১৮০০০টি Slips লাগানো সম্ভব। তবে রোপণের আগে অবশ্যই Slips-এর পুরনো শিকড় এবং পাতাগুলি তুলে ফেলতে হয়।

পরিচর্যা –

প্রতি হেক্টর জমির জন্য ৭৫ কেজি নাইট্রোজেন ৩ বারে অর্থাৎ Slips রোপণের ৩ মাস, ৬ মাস ও ৯ মাস পর সমানভাবে প্রয়োগ করতে হয়। তবে যদি রোপণের ১ মাস পর থেকে নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা হয়, সেক্ষেত্রে ৫ বারে এই পরিমাণ সার ব্যবহার করতে হয়। প্রতিবার ফসল তোলার পর বাকি ৪ বার এই সার প্রয়োগ করা দরকার। প্রয়োজনে নির্দিষ্ট অনুপাতে ফসফরাস পেন্টোক্সাইড ও পটাসিয়াম অক্সাইডও দেওয়া যেতে পারে।

রোপণের পর একমাস সময়কাল সপ্তাহে দু'বার এবং এরপর ৫ দিনে একবার সিট্রোনেলা চাষের ক্ষেত্রে সেচ দিতে হয়। সাধারণত ভাল ফলনের জন্য শীতকালে ১৫ দিন অন্তর এবং গ্রীষ্মে ১০ দিন অন্তর একবার সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

যতদিন না পুরো ফসল পাওয়া যায় ততদিন পর্যন্ত জমির আগাছা ভাল করে নির্মূল করে যেতে হয়। রোপণের ৪ মাস পর মাটি ওলট-পালট করতে হয় এবং প্রতিবার ফসল তোলার অন্তত একবার করে এই পদ্ধতি জারি রাখতে হয়।



সিট্রোনেলায় সাধারণত leaf blight ও arithracnose-এর আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। Dithane M-45 বা Z-78 ১৫-২০ দিন অন্তর স্প্রে করলে leaf blight-এর আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। আর Dithiocarbamate স্প্রে করে arithracnose কে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। এছাড়া এই গাছে কখনও কখনও red spider mite বা শোষক পোকার আক্রমণ দেখা যায়। সেক্ষেত্রে প্রতিকারস্বরূপ Dimethoate প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যায়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

সাধারণভাবে রোপণের ৯ মাস পর প্রথম ফসল তোলা যায়। যখন দেখা যায়, নীচ থেকে ষষ্ঠ পাতাটি খুব ভাল রুষ্টপুষ্ট হয়েছে তখন বুঝতে ফস্ল তোলার সময় এসেছে। এরপর ৩ মাস পরপর ফসল সংগ্রহ করা হয়। কাস্তে দিয়ে মাটি থেকে ২০-৪৫ সেমি উপরের ঝোপ কেটে এই গাছের ফসল তোলা হয়। বছরে প্রতি হেক্টর জমি থেকে প্রায় ২০-৩০ টন ঘাস জাতীয় ফসল পাওয়া যায়। ফসল তোলার পর এর পাতাগুলিকে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে পাতন ঘটাতে হয়। তবে তা কখনই ফসল সংগ্রহের ২৪ ঘণ্টা পরে নয়। এরপর একদিন ছায়াযুক্ত জায়গায় শুকিয়ে তা থেকে তেল নিষ্কাশন করা হয়। প্রথম বছর প্রতি হেক্টর জমি থেকে প্রথম বছরে ৫০-১০০ কেজি, দ্বিতীয় বছরে ১০০-১৫০ কেজি এবং ২৫০-৩০০ কেজি পর্যন্ত তেল পাওয়া যায়। পাতার কিনারায় বেশি তেল থাকে।

সিট্রোনেলার তেল বিভিন্ন গুণে সমৃদ্ধ। ভারতের বাজারে এই তেলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এই তেলে Citronellol থাকে, যা সুগন্ধি এবং মশা বা অন্যান্য পোকামাকড় প্রতিরোধক তৈরি করতে লাগে। Rose oxide তৈরির কাঁচামাল হিসাবেও Citronellol ব্যবহার হয়। এছাড়া এতে Geraniol নামে যে উপাদানটি থাকে তা অনেকটা গোলাপের মতো গন্ধযুক্ত। তাই সিট্রোনেলার তেল এইসব কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে। বিভিন্ন Aroma chemical তৈরির কাজেও সিট্রোনেলার তেল ব্যবহার করা হয়। যা সুগন্ধি সাবান ও Deodorants ও mosquito repellant cream তৈরির কাজে লাগে।

জাত পরিচিতি –

উন্নত জাতের সিট্রোনেলা বলতে প্রথমেই বলতে হয়, Bio-13, মঞ্জুষা ও মন্দাকিনীর কথা। এই তিনটি জাতের সিট্রোনেলার ফলন খুব বেশি হয়। এছাড়া এই ঘাস জাতীয় উদ্ভিদটির আরও কয়েকটি জাতের উল্লেখ পাওয়া যায় যেমন, Java citronella, Java-2, Jorlab-2 এবং Ceylon citronella

তথ্যসূত্র - www.agriinfo.in, www.horticulture.kar.nic.in, www.agritech.tnau.ac.in এবং http://tropical. theferns.info



বাঁশ

পরিচয় –

বাঁশ গাছ একটি বহুবর্ষজীবী একবীজপত্রী চিরহরিৎ ঘাস গোত্রের অর্থাৎ Poaceae গোত্রের এবং Bambusoideae উপগোত্রের উদ্ভিদ। গোটা ভারতে বাঁশ গাছের ১৮ টি গণ (Genera) ও ১৩৪টি প্রজাতির (Species) উল্লেখ পাওয়া যায়। 'Gamble in flook.f.F1.Brit.India VII:376-420 1897' বইটি থেকে জানা যায়, বর্তমানে ভারতে এরমধ্যে ১৪টি গণ (Genera) ও ৬২-৭০টি প্রজাতির বাঁশ গাছ জন্মায়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, Bambusa tulda (তলদাবা বাঁশ), Bambusa balcooa (বোরো বাঁশ), B. vulgaris (সোনালী বাঁশ) বা B. teres (বেসিনি বাঁশ) । এছাড়া অন্য প্রজাতির বাঁশগুলি হল, B. nutans (মাকলা বাঁশ), B. bambos (কাঁটা বাঁশ), Dendrocalamus hamiltonii (ছাওয়া বাঁশ), D. giganteus (কোকো বাঁশ), Melocanna baccifera (মূলী বাঁশ) ।

বাঁশ গাছের আদি জন্মস্থান এশিয়া মহাদেশে। চিন, ভারত, জাপান, কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, মায়ানমার, ফিলিপাইনস্, মালয়েশিয়া, নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশ ও অন্যান্য অনেক দেশে বাঁশ গাছ জন্মায়।

বাঁশ গাছের উচ্চতা বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। উচ্চতায় ২০-৫০ সেমি থেকে ২০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের একধরনের বাঁশ গাছ অন্য গাছের উপর দিয়ে বেড়ে ১২০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। বাঁশের কাণ্ড ভূগর্ভস্থ রাইজোম (Rhizome) থেকে জন্মায়। কাণ্ডের নিচের পর্বগুলির মধ্যবর্তী ফাঁপা অংশ উপরের দিকের পর্বমধ্য অপেক্ষা কম হয়ে থাকে। তাই বাঁশের গোড়ায় অংশগুলি বেশি শক্ত ও মজবুত হয়। কাঠামোর কাজে এই অংশ দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়ে থাকে। বাঁশের বেশিরভাগ প্রজাতির নিচের দিকের পর্ব থেকে ছোট ছোট শাখা বের হয় এবং বাঁশের মধ্যবর্তী অংশের পর্বগুলি থেকে বেশি লম্বা ও মোটা শাখাপ্রশাখাযুক্ত কঞ্চি বের হয়।

বাঁশের ভূগর্ভস্থ কাণ্ডটিকে রাইজোম বলা হয়। মাটির মধ্যে এর বৃদ্ধির ফলে বাঁশ ঝাড়ের বিস্তার ঘটে থাকে। পুরনো রাইজোম থেকে নতুন নতুন রাইজোম উৎপন্ন হয়। রাইজোমের মূল মাটিতে বিস্তারিত হয়ে ঝাড়টিকে শক্ত ও মজবুতভাবে ধরে রাখে। মে-জুন মাসে রাইজোম থেকেই বাঁশের কাণ্ডগুলি জন্মায়। কচি বাঁশের কাণ্ডটি Culm sheath বা কাণ্ড আবরণকারী খোলা দিয়ে আবৃত থাকে। লম্বায় বাঁশের বৃদ্ধি এই অবস্থাতেই সম্পন্ন হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে বাঁশের Sheath বা খোলগুলি খসে যায়। বাঁশের খোলগুলির আকার ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বাঁশ চিহ্নিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেহেতু বাঁশের ফুল-ফল পাওয়া যায় না তাই বাঁশের চিহ্নিতকরণ অন্যান্য শরীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। অনেক প্রকার রাইজোম মাটির মধ্যে ৭০ মিটারেরও বেশি গভীর পর্যন্ত বর্ধিত হয়ে বাঁশের কাণ্ড উৎপন্ন করে। ফলে বাঁশের ঝাড়টি অনেকটা জায়গা জুড়ে বিস্তারলাভ করে।

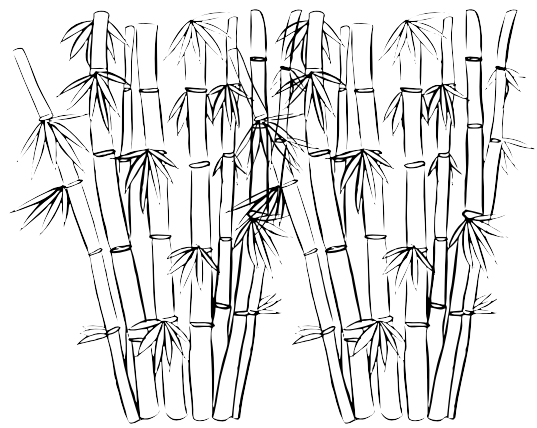
বাঁশের প্রতিটি অঙ্গ Sheath দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। কচি কঞ্চিও এই প্রকার Sheath বা খোল দ্বারা আবৃত থাকে। কঞ্চিগুলির বৃদ্ধির সাথে সাথে এই ছোট ছোট খোলগুলি খসে পড়ে। বাঁশ গাছের পাতাগুলি বল্লমাকৃতির হয়ে থাকে । লম্বায় এগুলি ৭-৫০ সেমি এবং চওড়াতে ১-৮ সেমি পর্যন্ত হতে পারে। পাতার আকার, আকৃতি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ও বাঁশকে চিনতে সাহায্য করে। যেহেতু বাঁশ গাছের ফুল ও ফল জন্মাতে দেখা যায় না বা ৬৫-১২০ বছর পর ফুল-ফল জন্মে বাঁশ ঝাড়ের ধ্বংসের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাই বাঁশের ফুল ও ফলের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। ফুলগুলি বাঁশের অগ্রভাগের শাখাপ্রশাখায় থোকা থোকা ভাবে জন্মায়। ফুলগুলি ঘাস জাতীয় অন্যান গাছের ফুলের মতো। বাঁশের ফুলেও Spikelet, Gluu, Lemma, Palea ও পুংকেশর, গর্ভকেশর ইত্যাদি থাকে এবং পরাগমিলনে ফলে জন্ম হয়।

বাঁশ উষ্ণ ও উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে এবং নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে ভাল জন্মায়। ২০-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ৯০০-৪০০ মিলিমিটার বার্ষিক বৃষ্টিপাত বাঁশের পক্ষে উপযুক্ত।

সমুদ্রতল থেকে ৫০০-৪০০০ মিটার উঁচু পর্বতেও বাঁশ গাছ দেখা যায়। আবার নিকাশীর সুবিধাযুক্ত অল্প অম্ল (pH ৪.৫-৬.০),বেলে দোঁয়াশ মাটি বাঁশ চাষের উপযুক্ত। তবে বিভিন্ন প্রকার মাটিতেই বাঁশ গাছ জন্মাতে পারে।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

যদিও ভারতে বাঁশের ১৮টি গণ (Genera) এবং ১৩৪টি প্রজাতির (Species) উল্লেখ পাওয়া যায়, তা সত্ত্বেও মাত্র ২০টি প্রজাতির বাঁশের বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয়ে থাকে।



বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশের উৎপাদন তাদের বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে। অতএব বাঁশ গাছ রোপণের আগে প্রজাতিগুলির উপযুক্ত ভৌগোলিক অবস্থান ও রোপণের উপযুক্ত মাটি পরীক্ষা করে তবেই রোপণ করা উচিত। এছাড়া বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য বাঁশ কাটার, উপযুক্ত পরিবহণ ব্যবস্থার বিষয়টি মাথায় রেখেও রোপণের জায়গা নির্বাচন করা প্রয়োজন।

নির্বাচিত জমিতে প্রথমে আশপাশের গাছের ডালপালা কেটে জমির আগাছা ও ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করে উত্তর-দক্ষিণে সারি নির্ণয় করে মেশিনের সাহায্যে বা কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে জমি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। বাঁশ উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করতে হয়। তাই জমিতে যথাযথ দূরত্বে গর্তগুলি করে রাখা হয়।

বাঁশ একটি অতি প্রয়োজনীয় বনজ সম্পদ। নিজেদের বিভিন্ন প্রয়োজনে গ্রামের মানুষ বাড়ির আশপাশে, পুকুর পাড়ে বা পড়ে থাকা অব্যবহৃত জমিতে চিরাচরিত পদ্ধতিকে বাঁশ ঝাড়ের গোড়ার মাটি খুঁড়ে Rhizome কেটে অন্যত্র রোপণের মাধ্যমে বা ৫-৭ ফুট লম্বা বাঁশের গোড়ার অংশ রাইজোম সমেত উপড়ে গর্তের মধ্যে পাঁকমাটি ভর্তি করে এবং বাঁশের উপরের কাটা অংশে কাদার প্রলেপ দিয়ে বাঁশঝাড় তৈরি করে থাকেন।

এছাড়া বাঁশের কঞ্চির কাটিং করে তার থেকে চারা উৎপাদন করা অত্যন্ত সহজ। এভাবে কম পরিশ্রমে বহু সংখ্যায় চারা তৈরি সম্ভব। বাঁশের গা থেকে নির্গত কঞ্চি ৪৫ ডিগ্রী কোণে ধারালো ছুরি বা করাত দিয়ে কেটে নিতে হয়। দেখতে হয় ২৫.৪ সেমি মাপের শক্ত সবল ওই কঞ্চিগুলিতে যেন দুটি পর্ব থাকে। এরপর খুব সাধারণ ও ঘরোয়াভাবে বালির বেডে তা রোপণ করে বাঁশের চারা তৈরি করা যেতে পারে। অথবা ওই কঞ্চিগুলির গোড়ার দিকটা আলাদা আলাদা পাত্রে প্রস্তুত করে রাখা মূল বৃদ্ধিকারক হরমোনের লেই-এ (৩০ গ্রাম) ডুবিয়ে রেখে পরে অগ্রভাগে মোমের প্রলেপ দিয়ে দিতে হয়। তারপর জৈব পদার্থ মিশ্রিত Pot soil ভর্তি বড় প্লাস্টিকের ট্রেতে বাতাস মুক্ত করে মাটি চেপে ঘনভাবে কঞ্চিগুলি রোপণ করা হয়। রোপণের পর প্রতিদিন ঝারি দিয়ে জল দিতে হয় এবং উপরে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের আচ্ছাদন দিতে হয়। এভাবে যত্ন করলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে কঞ্চির গোড়া থেকে মূল বা শিকড় উৎপন্ন হয়। এরপর বাঁশের চারাগুলি অন্য পাত্রে রেখে বড় করে নির্দিষ্ট জমিতে রোপণ করা হয়। ২০০৬-০৭ সালে বন দফতর ১৮,৬৫০টি কাটিং-এর চারা দার্জিলিং ডিভিশনে রোপণের জন্য বিতরণ করেছিল। এইভাবে কার্শিয়াঙ ডিভিশনে হাজার হাজার চারা বিতরণের মধ্যে দিয়ে বাঁশ চাষের প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশের চারা রোপণের জন্য আলাদা আলাদা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। যেমন সমান জমিতে বাঁশের চারা রোপণের সঙ্গে পাহাড়ের ঢালে, নদী তীরবর্তী জায়গায়, উঁচু-নিচু জায়গায়, রাস্তা বা বাঁধের ধারের জমিতে রোপণের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। নার্সারীতে কাটিং-এর চারাগুলি ১ বছর বয়সের হলে তা রোপণের উপযুক্ত হয়ে যায়। সাধারণত ৪৫ সেমি X ৪৫ সেমি X ৪৫ সেমি মাপের গর্তে বা ৬০ X ৬০ X ৬০ সেমি মাপের গর্তে অথবা ১ X ১ X ১ মিটার মাপের গর্তে বাঁশের চারা রোপণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া ১ মিটার চওড়া ০.৫ মিটার উঁচু বাঁধের মতো করে মাটি কেটে তার মধ্যে গর্ত করেও চারা রোপণ করা যায়। অনুর্বর মাটিতে চারা রোপণের আগে প্রতি গর্তে জৈব বা রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

১৯৯৯-২০০০ সালে এ. কে. রাহার (আই.এফ.এস./প্রিন্সিপাল/চিফ কনজারভেটর অফ ফরেস্ট, পশ্চিমবঙ্গ) উদ্যোগে তুকরিয়া ঝাড়ে ১০ হেক্টর জমিতে বাঁশ গাছের কাটিং-এর চারা রোপণ করা হয়েছিল। এছাড়া National Bamboo Mission বাঁশের ৫০ হাজার কার্টিং-এর চারা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন ল্যাবোরেটরি বা কৃষি গবেষণাগারে টিসুকালচার পদ্ধতির সাহায্যে বাঁশ গাছের চারাগাছ উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

পরিচর্যা –

জমি প্রস্তুত করার সময় বা চারা রোপণের পরে উর্বর বা অনুর্বর জমিতে সার প্রয়োগ করলে বাঁশের বৃদ্ধি ভাল হয়। প্রতি একর জমিতে ৩০০-৪০০ কেজি চুন প্রয়োগের পাশাপাশি উপযুক্ত পরিমাণে নাইট্রোজেন ও পটাসিয়াম সার প্রয়োগে বাঁশের স্বাস্থ্য ও উৎপাদন ভাল হয়।

শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে এবং সার প্রয়োগের পর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করতে হয়। জলের অপচয় রোধ করার জন্য Drip Irrigation পদ্ধতি ব্যবহার করলে তা লাভজনক হয়। দেখতে চারা গাছের আশেপাশে যাতে কোনও আগাছা না জন্মায় এবং তার সঙ্গে মাটির আর্দ্রতাও যেন বজায় থাকে। আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য খড় বিছিয়ে Mulching-এর ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়।

কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে বাঁশ ঝাড়ের গোড়া উঁচু করে দেওয়ার পাশাপাশি আগাছা দমন করা ভাল। বাঁশের ঝাড়ে মাটি দেওয়ার

প্রয়োজন না থাকলে আগাছা দমনের ওষুধ ব্যবহার করেও আগাছা দমন করা যেতে পারে।

বাঁশের ঝাড়টিকে সঠিকভাবে বড় করে তোলার জন্য নিচের দিকের কঞ্চিগুলি কেটে পরিস্কার করে দেওয়া জরুরি। তা না করলে পরবর্তীকালে ঝাড়ে ঢুকে বাঁশ কাটা ও বাঁশ টেনে বের করতে অসুবিধা হয়।

ছায়াযুক্ত স্থানে জন্মাতে ভালবাসে এমন গাছ যেমন হলুদ, আদা, কাঁচালঙ্কা ইত্যাদি সাথী ফসল হিসাবে চাষ করা হয়ে থাকে।

কাণ্ডে শোষক পোকার আক্রমণের পাশাপাশি প্রায় সব ধরনের বাঁশ গাছে সাধারণত Fusarium moniliforme, Intermedium, Fusarium equiseti এবং Culms blight রোগ দেখা যায়। উপযুক্ত ছত্রাকনাশক ও কীটনাশক প্রয়োগ করে এইসব রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

রোপণের ৩-৪ বছর পর থেকে বাঁশ ঝাড় থেকে বাঁশ কাটা যেতে পারে। প্রতি বছর যে বাঁশগুলি জন্মায় তা ৩ বা ৫ বছর বয়সের হলে তবেই তা কাটার পক্ষে উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

বাঁশের বার্শিক উৎপাদন সাধারণত বাঁশের জাত ও পরিচর্যার উপর নির্ভর করে। তবে প্রতি একর জমি থেকে ৯.৫–১০ বাঁশ উৎপাদন হতে পারে। ৯ বছরের পর থেকে প্রতি একরে ১৪.৫ টন পর্যন্ত বাঁশ পাওয়া সম্ভব। পরিণত একটি বাঁশের ওজন গড়ে ১০ কেজি হতে পারে।

বাঁশ এমন এক ফসল যা এক পুরুষের পরিশ্রমে ঝাড়ের আকার ধারণ করে এবং পরের প্রজন্ম বংশানুক্রমিকভাবে বিনা পরিশ্রমের সেই ফসল ভোগ করে যেতে পারে। মানুষের জন্মের সময় থেকে মৃত্যুর পর পর্যন্ত বাঁশের ব্যবহার হয়ে থাকে। আদিকালে শিশুর জন্মের সময় বাঁশের ধারালো ছাল দিয়ে তার নাড়ি কাটার চল ছিল। মানুষের মৃত্যুর পর তার প্রাণহীন দেহ বাঁশের চৌদাল বা খাটে শুইয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। পুরাণ মতে, ভগবান কৃষ্ণের বাঁশি বা প্রাচীন সময়ে লেখার কলম বাঁশ দিয়েই তৈরি হত।

বাঁশকে গরিবের টিম্বার বলা হয়। কারণ বাসস্থানের জন্য গরিব মানুষেরা বাড়ি তৈরির কাঠামো থেকে দেওয়াল (দড়মা) সবই বাঁশ দিয়ে তৈরি করেন। খাটিয়া ও জিনিসপত্র রাখার চুপড়ি, ঝুড়ি, চ্যাঙরি কুলো, ধুকুনি, চালনা ইত্যাদি গৃহস্থালীর নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাঁশ দিয়েই তৈরি করা হয়। চাষের জমিতে বেড়া দিতে গেলে বা ধান ঝাড়বার আগোড় মই, কৃষির যন্ত্রপাতি তৈরিতেও বাঁশের ব্যবহার হয়। যদিও সমস্ত প্রকার বাঁশ একই কাজে ব্যবহার করা যায় না।

এক কথায় বাঁশ চাষের প্রধান উদ্দেশ্য হল, ঘবাড়ি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কাঠামো তৈরি, কাগজ শিল্পে মণ্ড তৈরির অন্যতম উপাদানের জোগান, খাদ্যের জন্য (Bamboo shoot), বেড়া দেওয়ার প্রয়োজনে, বায়ো-এনার্জি প্রস্তুত করতে, ঘর সাজানোর শৌখিন সামগ্রী, বিভিন্ন হস্ত ও কুটির শিল্পজাত জিনিস এবং সর্বোপরি প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় ও অন্যান্য পশুপাখির আশ্রয় দিতে বা তাদের খাদ্যদান করতে। এছাড়া গবেষণায় জানা গেছে, বাঁশ গাছ বাতাসে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন ছাড়ে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ করে। তাই পরিবেশ দূষণ রুখতে বাঁশ গাছের ভূমিকা অসীম।

বাঁশ উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। প্রথম চিন। ভারতে বছরে ৩.২৩ মিলিয়ন টনের বেশি বাঁশ উৎপন্ন হয়। বন দফতরের হিসাব অনুযায়ী, আমাদের দেশে ৮.৯৬ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে বাঁশের চাষ হয়ে থাকে। যা সমগ্র বনভূমির ১২.৮% শতাংশ জায়গায় বিস্তারিত হয়েছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ২৮%, মধ্যপ্রদেশে ২০.৩%, মহারাষ্ট্রে ৯.৯%, ওড়িশায় ৮.৭%, অন্ধ্রপ্রদেশে ৭.৪%, কর্ণাটকে ৫.৫% এবং বাকি পরিমাণ বাঁশ দেশের অন্যত্র মিলিতভাবে বিস্তৃত রয়েছে।

জাত পরিচিতি –

ভারতে বাঁশের ১৪ টি গণের ও ১৩৪ টি প্রজাতির বাঁশের উল্লেখ পাওয়া যায়। আচার্য জগদীশচন্দ্র ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানেও বিভিন্ন দেশ থেকে ২৬টি প্রজাতির বাঁশ গাছ নিয়ে এসে বিস্তার করা হয়েছে। যদিও মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে কেবলমাত্র কয়েকটি প্রজাতির বাঁশই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রোপণ করা হয়ে থাকে। যেগুলি হল, Bambusa balcooa (ব্যাম্বুসা ব্যালকোয়া), Bambusa bambos (ব্যাম্বুসা ব্যাম্বোস), Bambusa nutans (ব্যাম্বুসা নিউট্যান্স), Bambusa pallida (ব্যাম্বুসা প্যালিডা), Bambusa polymorpha (ব্যাম্বুসা পলিমর্ফা), Bambusa tulda (ব্যাম্বুসা টাল্ডা), Bambusa vulgaris (ব্যাম্বুসা ভালগারিস), Dendrocalamus asper (ডেন্ড্রাক্যালামাস অ্যাস্পার), Dendrocalamus brandisii (ডেন্ড্রাক্যালামাস ব্র্যান্ডিসি), Dendrocalamus giganteus (ডেন্ড্রাক্যালামাস জাইগ্যান্টিয়াস), Dendrocalamus stoksii(ডেন্ড্রাক্যালামাস স্টকসী), Dendrocalamus strictus (ডেন্ড্রাক্যালামাস স্টিক্টাস), Melocanna baccifera(মেলনোক্যানা ব্যাসিফেরা), Ochlandra travancorica (অচল্যান্ড্রা ট্রাভেনকোরিয়া) Thyrsostachys oliveri(থিরসোস্ট্যাচিস অলিভেরী)। উপরি উক্ত ১৫ টি জাতের বাঁশ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে রোপণ করা হয়ে থাকে। প্রতি প্রকার বাঁশেরই চাষের পদ্ধতি বা ব্যবহার বিভিন্ন হয়ে থাকে।

তথ্যসূত্র – www.bambooselect.com, http://www.ntfpwestbengal.in/, http://nbm.nic.in/, www.krishisewa.com



চা

পরিচয় –

চা গাছের বিজ্ঞানসম্মত Camellia sinensis, এটি Thiaceae গোত্র বা পরিবারের অর্ন্তভুক্ত।

আমাদের দেশে চা গাছের চাষ একমাত্র আসামেই (Upper Assam) হত। পরে নিম্ন আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং দার্জিলিং চা-এর চাষ শুরু হয়। শুধুমাত্র আসামেই ৩৫টি চা চাষের ক্ষেত্র রয়েছে। পরে দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পাহাড়, হিমালয়ের পাদদেশের তরাই অঞ্চল সহ হিমাচল প্রদেশে ও মেঘালয়ের কিছু অংশে এর চাষ শুরু হয়।

চা গাছ জন্মানোর জন্য মাঝারি ধরনের আর্দ্র ও উষ্ণ জলবায়ুর দরকার। এই আবহাওয়ায় চা গাছ ভালভাবে বেড়ে ওঠে। জলবায়ুর প্রভাব অনুযায়ী, চা-এর ফলন ও গুণগত মান নির্ভর করে। চা চাষের জন্য ন্যূনতম ২০-৩৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা উপযুক্ত। তবে ১০ ডিগ্রী সেলসিয়াসে নিচের তাপমাত্রা চা চাষের ক্ষতি করে। সারা বছরে ধরে ১৫০৩০০ সেমি ভাল বৃষ্টিপাত চা চাষের জন্য প্রয়োজন। চা গাছ ছায়াচ্ছন্ন জায়গা ভালবাসে এবং বড় গাছের ছায়ায় যখন এই গাছ রোপণ করা হয়, তখন চা গাছের বৃদ্ধি খুব ভাল হয়।

ভাল নিকাশীযুক্ত ও গভীর, ভঙ্গুর দোঁয়াশ মাটিতে চা গাছ ভাল জন্মায়। কখনও চাষ হয়নি এমন বনের মাটি, যা জীবাশ্ম ও লোহাপূর্ণ সেই ধরনের মাটি চা চাষের পক্ষে সচেয়ে উপযোগী। মূল মাটিতে পটাশ ও ফসফরাস বেশি পরিমাণে থাকায় দার্জিলিঙের চা-এ বিশেষ গন্ধ তৈরি হয়। মাটিতে অম্ল ও ক্ষারের মাত্রা অবশ্যই ৪.৫-৫.৫PH -এর মধ্যে থাকা দরকার।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

নার্সারীতে চা বীজ অঙ্কুরোদগমের ঘটিয়ে চা গাছের চারা তৈরি প্রসারণ ঘটানো সম্ভব। চা গাছের চারা রোপণের প্রক্রিয়াটি বেশ সংবেদনশীল। ভালভাবে পরিকল্পনা ও সঠিক দেখভালের প্রয়োজন দরকার হয়। সাধারণত নার্সারী থেকে কমপক্ষে ১২টি পূর্ণবয়স্ক পাতা এবং পেনসিল (০.৫ সেমি ঘনত্ব) সমেত ৪০-৬০ সেমি লম্বা সুস্থ-সতেজ চারা রোপণের জন্য নেওয়া হয়। ৯ -১২ মাস বয়সের চারাগাছগুলি এই ধরনের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। নিম্নমানের গাছ অবশ্যই বাতিল করা উচিত। নার্সারী থেকে চারা তোলার আগে তাদেরকে একটানা সূর্যের আলোয় শক্ত করে নিতে হয়।

এরপর সঠিকভাবে তোলা চারা মাটি সমান করার পর তাড়াতাড়ি বাগানে রোপণ করতে হয়। সাধারণত এপ্রিল–জুন এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর অথবা সেপ্টেম্বর–অক্টোবর এবং নভেম্বর- ডিসেম্বর জমিতে সেচ দিয়ে গাছের চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। অতিরিক্ত বৃষ্টির সময় কখনই চা-এর চারা রোপণ করতে নেই।

রোপণ যথাযথ হলে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয় ও তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ কুঁড়ি পাওয়া যায়। অন্যদিকে রোপণের সময় সামান্য ভুল হলে গাছের মৃত্যুর হার খুব বেশি হয় বা গাছের চিরস্থায়ী ক্ষতি হয়ে যায়।

দু'ধরনের পদ্ধতিতে বাগানে চা গাছের চারা রোপণ করা যায়। পিট পদ্ধতি এবং ট্রেঞ্চ পদ্ধতি।

পিট পদ্ধতিতে খুব একটা অসুবিধা ছাড়াই প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা সঠিক মাপের পিট খনন করার জন্য গাছের মধ্যে অনেকটা জায়গা ফাঁকা রাখতে হয়। পিটগুলি অবশ্যই প্রায় ৪৫ সেমি চওড়া ও ৪৫ সেমি গভীর, গোলাকৃতি এবং সোজা দেওয়ালযুক্ত হতে হয়। ছোট পিট মূলের বৃদ্ধি হতে দেয় না এবং কাণ্ডেরও বৃদ্ধি ঘটায় না। খোঁড়া মাটিতে খুব ভাল করে পচানো ৪-৫ কেজি গোবর অথবা ১৫০ -২০০ কেজি পচানো অয়েল কেক ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে। রোপণের সময় একমাত্র ৩০ গ্রাম রক ফসফেট ও ৩০ গ্রাম এস.এস.পি ছাড়া অন্য কোনও সার ব্যবহার করা যাবে না।

ট্রেঞ্চ পদ্ধতি ভারী মাটিতে খুব কম জায়গা ফাঁক রেখে করা হয়। সারি বরাবর ৩০ সেমি চওড়া ও ৪৫ সেমি গভীর নালি কাটতে হয়। খোঁড়া মাটিকে পিটের মতন করে তৈরি করে ট্রেঞ্চ-এ মিশিয়ে সরাসরি চারাগাছ রোপণ করতে হয়।

এছাড়া নার্সারী থকে চারাগাছ তুলে রোপণের আরও দুটি পদ্ধতি আছে। ভেটি পদ্ধতি এবং স্টাম্প পদ্ধতি। ভেটি পদ্ধতিতে নার্সারী থেকে চারাগাছ তোলার সময় মূলকে একইরকম রেখে দেওয়া সম্ভব হয়। পলিথিন প্যাকেটে চারা তৈরি করলে এমনটা করা খুব সহজ। এক্ষেত্রে মূলের ক্ষতি রোধ করা যায় এবং বেঁচে থাকা চারা সংখ্যাও বেশি হয়। পলিথিনকে লম্বালম্বিভাবে চিরে সাবধানে সরিয়ে ফেলে মাটি সমেত চারাগুলি (ভেটি) সংগ্রহ করা হয়। এরপর ভেটিগুলি নির্দিষ্ট পিটে রোপণের আগে নিচে ৩০ গ্রাম রক ফসফেট দিতে হবে এবং পিটটি যথেষ্ট পরিমাণে মাটি দিয়ে ঠেসে দিতে হবে। যাতে জমা জলে চারাটি ডুবে না যায়। প্রায় ৫ সেমি

গভীরে ৩০ গ্রাম এস.এস.পি. ভেটির চারধারে দিতে হবে এবং পিটটিতে গাছের গলা পর্যন্ত মাটি দিয়ে পূর্ণ করতে হবে। পরবর্তীকালে গাছের বৃদ্ধির জন্যও এই একই পদ্ধতিতে মাটি ঠেসে দিতে হয়। যদিও স্টাম্প পদ্ধতিতে নার্সারীর বেড থেকে মূলের চারপাশের মাটি ছাড়াই চারাটিকে তুলে নেওয়া হয়। গাছের গলার কাছ থেকে ১৫–২০ সেমি কাণ্ডের অংশ কেটে নেওয়া হয় এবং তা পিটে বসানোর আগে কাণ্ডের অতিরিক্ত অংশ ছেঁটে দেওয়া হয়। তবে ভেটি পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতিতে চারার বেঁচে থাকার হার অনেক কম।



বাগানে চা গাছের চারা রোপণের সময় দুটি সারির মধ্যে ১০৫–১১০ সেমি দূরত্ব বজায় রাখতে হয়। আর চারা থেকে চারার দূরত্ব ৬০-৭৫ সেমি থাকা প্রয়োজন। এভাবে চাষ করলে প্রতি হেক্টরে প্রায় ১৪-১৬ হাজার চারার (পাহাড়ী এলাকার ক্ষেত্রে প্রায় ১৭ হাজার) প্রয়োজন হয়। প্রতি সারিতে একটি বা দুটি লাইনে চারা রোপণ করা যেতে পারে।

পরিচর্যা –

যেখানে আগে থেকেই বড় ছায়দানকারী গাছ রয়েছে এমন পরিষ্কার পাহাড়ের ঢালে সাধারণত চা বাগান তৈরির উপযুক্ত। উত্তর-পূর্ব ভারতে চা চাষের ক্ষেত্রে স্প্রিঙ্কলার সেচ খুব বেশি ব্যবহৃত হয়। শুধুমাত্র চা বাগানের (Seed bari) ক্ষেত্রে ড্রিপ সেচ হয়ে থাকে।

চা চাষে বাগানে সার হিসাবে বিভিন্ন জৈব ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সার হিসাবে প্রায়শই অয়েল কেক ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও উপযুক্ত নাইট্রোজেন যুক্ত সার যেমন, অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করা দরকার।

চা বাগানে নিয়মিত নিড়ানী দেওয়া ও আগাছা পরিষ্কার করা হয়, যাতে কোনও বাধা ছাড়াই চা-ঝোপ বেড়ে ওঠে।

চা চাষে ডাল ছাঁটাই একটি গুরুত্বপূর্ণ কজায়।এরফলে চায়ের ঝোপকে ১ মিটার লম্বা ও প্রায় ১ মিটার ব্যাসার্ধের করে বড় করা যায়। তবে চায়ের ক্ষেত্রে ডাল ছাঁটাইয়ের মূল উদ্দেশ্য হল, যাতে আরও বেশি বেশি করে নরম পাতাসহ নতুন ডালপালা পাওয়া এবং সহজে মাটি থেকে চা পাতা তোলা।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

সারা পৃথিবীতে চা-এর কী ব্যবহার বা এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব কতটা, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। জনপ্রিয় গরম পানীয় হিসাবে চা-এর কোনও বিকল্প নেই।

চা গাছ থেকে চা পাতা তোলার জন্য পরিশ্রমী, মনোযোগী ও দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। তাই এই কাজে সস্তায় অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করলে ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

চা শুধুমাত্র একটি উদ্দীপক পানীয় নয়। আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষেও চা খুব উপকারী। চা-এর মধ্যে প্রচুর পরিমানে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে। কফির তুলনায় চা-এ ক্যাফিনের পরিমাণ কম থাকে। চা হার্ট অ্যাট্যাক বা স্ট্রোকের আশঙ্কাকে কমায়। মানুষের স্বাভাবিক রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়াতেও সাহায্য করে চা। ক্যানসার প্রতিরোধেও চা-এর ভূমিকা রয়েছে বলে জানা যায়।

তথ্যসূত্র – www.agrifarming.in



কফি

পরিচয় –

কফির বিজ্ঞানসম্মত নাম Coffea arabica ও Coffea robusta, এটি Rubiaceae গোত্রের অন্তর্ভূক্ত।

কফি একপ্রকার ফুলের গাছ এবং এই গাছটি চাষ করা হয় তার বীজের জন্য যা "কফি বীনস" নামে বহুল পরিচিত। বিভিন্ন কফিজাত দ্রব্য ও পানীয় কফি গাছ থেকে প্রাপ্ত এই দানা বা বীজ থেকেই তৈরি করা হয়। পরিণত অবস্থায় এই গাছটি খুব একটা বড় হয় না।

কফি গাছ মূলত এশিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা মহাদেশের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে দেখা যায়। ভারতে ১৯৩৬ সালে কর্ণাটকের চিমাঙ্গলুরের নিকটবর্তী অঞ্চলে এই গাছ প্রথম দেখা যায়। কফি অন্যতম একটি জনপ্রিয় পণ্য এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে এক প্রধান ভূমিকা পালন করে। কফি উৎপাদনের নিরিখে সারা বিশ্বের ব্রাজিলের স্থান সর্বপ্রথম। বাণিজ্যিক দিক থেকে, বিশ্বব্যাপী বহু দেশ সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কফি রফতানি করে। সারা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন প্রজাতির কফির চাষ দেখা যায়। তবে বিশ্বের ৮০% উৎপাদন হয় Coffea arabica বাকি ২০% হল Coffea robusta (এই ধরনের কফি উৎপাদন হয় Coffea canephora প্রজাতির গাছ থেকে)।

পৃথিবীতে প্রথম ১০টি কফি উৎপাদনকারী দেশ হল, ব্রাজিল, ভিয়েতনাম, কলম্বিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইথিওপিয়া, ভারত, হন্ডুরাস, উগান্ডা, মেক্সিকো ও গুয়াতেমালা। ভারতে প্রধান প্রধান কফি উৎপাদনকারী রাজ্যগুলি হল, কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশা।

কফি গাছের ফল চেরী ফলের ন্যায় দেখতে হয় এবং বেগুণী বা লাল বর্ণের হয় যার ভিতর কফির বীজ থাকে। কফির এই বীজটিকে কফি বীন বলে। কফি গাছ বৃক্ষ বা গুল্ম প্রজাতির হয় এবং এর সর্বাধিক উচ্চতা ১২ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। কফিগাছের ফুলে এক চমৎকার সুবাস থাকে এবং সাধারণত সাদা রঙের হয়। একবার কফি বাগান স্থাপন করলে তা থেকে ৫৫-৬০ বছর পর্যন্ত ফসল পাওয়া যায়। বপনের সাধারণত ৩-৪ বছর পর থেকে কফির বীজ উৎপাদন শুরু হয় (বিশেষতঃCoffea arabica প্রজাতির ক্ষেত্রে)। কফি গাছ বাড়ির পেছনের উঠোনে এমনকি টবেও করা যেতে পারে। বাণিজ্যিকভাবে কফি চাষ একটি চমৎকার ব্যবসা এবং সুসংহতভাবে কফি চাষ করলে ভাল লাভ পাওয়া সম্ভব।

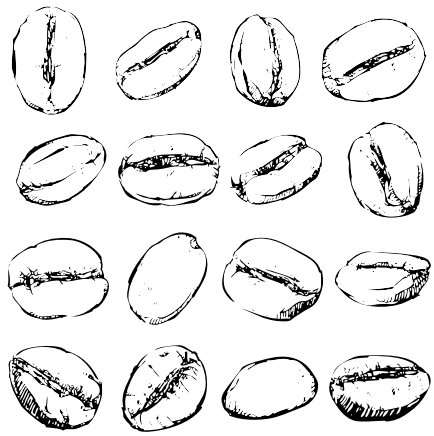
কফি গাছের বৃদ্ধির জন্য আবহাওয়া প্রধান ভূমিকা পালন করে। Coffea arabica প্রজাতি সমুদ্রপৃষ্ঠের ৯০০-১৬০০ মিটার উচ্চতায় চাষ করা যেতে পারে। তবে এর থেকে কম উচ্চতায় ও এই প্রজাতির চাষ ভাল হতে পারে। অধিক উচ্চতায় কফি চাষের প্রধান অসুবিধা হল বিলম্বিত পরিপূর্ণতা প্রাপ্তি এবং ফসল কুয়াশা, শিশির ও অধিক বায়ুপ্রবাহজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বার্ষিক সমপরিমাণ ২২০০-২৩০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত কফি চাষের জন্য উপযুক্ত। উচ্চ বৃষ্টিপাত এই ফসলের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক এবং এরফলে কফি গাছের পাতা পচা ও ছত্রাকঘটিত রোগ দেখা যায়। গাছের ভাল বিকাশ এবং ফলনপ্রাপ্তির জন্য আদর্শ তাপমাত্রা হল ১০-২৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস। উচ্চ তাপমাত্রাযুক্ত অঞ্চলে কফির বীজতলা ছায়াযুক্ত স্থানে করা প্রয়োজন।

বিভিন্ন প্রকার মাটিতে কফির চাষ করা যেতে পারে। যদিও পাহাড়ের ঢাল বা সমতল ভূমির অকর্ষিত হালকা দোঁয়াশ মাটির সঙ্গে জৈবসার মিশ্রণ করা হলে তা কফি চাষের পক্ষে আদর্শ। মাটি এবং জলের ভারসাম্য সর্বদা বিবেচনায় রাখতে হবে। কারণ এই ভারসাম্য কফি চাষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেসব চাষীরা বাণিজ্যিকভাবে কফি চাষ করেন তাদের অবশ্যই মাটি পরীক্ষা করে নিতে হবে। কফি বাগান শুরু করার আগে চাষের জমিতে মাটির পুষ্টির ঘাটতি থাকলে তা সম্পূরক পদার্থ দিয়ে পূরণ করে নিতে হবে। উচ্চ ফলন এবং উচ্চ গুণগত মান সম্পন্ন ফসল উৎপাদনের জন্য মাটির PH অবশ্যই ৫.০–৬.০ এর মধ্যে হতে হবে।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

কফি গাছের প্রসারণ বীজ এবং কাটিং-গ্রাফটিং দ্বারা হয়। কফি উৎপাদনে সুস্থ এবং পরিণত বীজ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বীজ বাছাইয়ের সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে বীজ যেন ভারী, প্রশস্ত এবং নৌকা আকৃতির হয়। হাতের মাধ্যমে বীজ থেকে খোসা ছাড়িয়ে ফেলতে হবে এবং ছাই দিয়ে ঘষে ঘষে বীজের আঠালো অংশ তুলে ফেলতে হবে। এরপর কফি বীজ ছায়াযুক্ত স্থানে শুকিয়ে নিতে হবে। সাধারণত এক হেক্টর জমিতে ৪০০০-৫০০০টি কফি বীজ প্রয়োজন হয়। বপন করা দুটি কফি বীজের মধ্যে কমপক্ষে

২.৫ সেমি দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। বপন করা বীজ থেকে বীজতলায় বা নার্সারীতে মাদার বেডে বীজ অঙ্কুরিত হতে প্রায় ৩০-৪০ দিন সময় লাগে। পরবর্তী পর্যায় অঙ্কুরিত কফি চারাগুলি পলিথিন প্যাকেটে বা নার্সারী বেডের মধ্যে ২৫ সেমি দূরত্বে প্রতিস্থাপিত করা উচিত।



Coffea arabica প্রজাতির গাছগুলি স্বপরাগযোগ পদ্ধতির মাধ্যমে বংশবিস্তার করে এবং সাধারণত এই প্রজাতির গাছগুলি এইভাবেই খাঁটি চারা সৃষ্টি করে। বীজ বপনের সময় অ্যাজোস্পিরিলাম এবং ফসফোব্যাকটেরিয়াম দ্বারা বীজ পরিশোধন করা হয়।

কাটিং-গ্রাফটিং পদ্ধতিতে সর্বদা রোগমুক্ত এবং অধিক ফলনশীল ডালগুলি কলম প্রস্তুতির জন্য ব্যবহার করা উচিত। মনে রাখা দরকার যে, কাটিংগুলি সংগ্রহ করতে রোগমুক্ত এবং পাতা পচা রোগ প্রতিরোধসম্পন্ন গাছের ডালকে বেছে নেওয়া হয়।

উন্নতমানের কফি বাগান প্রস্তুতির জন্য, চাষের জমি খুব ভালভাবে ৪-৫বার চাষ দিয়ে মাটি খুব ভাল করে ঝুরঝুরে করে ফেলতে হবে। মাটি প্রস্তুতির সময় মাটিতে থাকা পাথর, আবর্জনা এবং পূর্ববর্তী ফসলের আগাছা সব পরিস্কার করে ফেলতে হয়। যেসব চাষীরা বাণিজ্যিকভাবে কফির চাষ করবে তারা যেন অবশ্যই মাটির উর্বরতা এবং উপযুক্ততা পরীক্ষা করে নেন। মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে যদি কোনও রকম সম্পূরক নিউট্রিয়েন্ট বা মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্ট চাষের জমিতে প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় তাহলে তা চারা রোপণ করার আগেই তা জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। চাষের জমিতে ফসফরাস ও চুনের মতো সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে জমিতে চাষ দেওয়ার সময়টাকে বেছে নিতে হবে এবং এই সারযুক্ত জমিতে চারা বপন করা উচিত।

দুটি চারা রোপণের অর্ন্তবর্তী দূরত্ব সাধারণত নির্ভর করে চাষের জমির উর্বরতা এবং অঞ্চলের ভূ-সংস্থানগত অবস্থার উপর। তবে সাধারণত Coffea arabica প্রজাতির চারা জমিতে রোপণ করার সময় দুটি চারার অর্ন্তবর্তী দূরত্ব থাকে ২ X ৩ মিটার এবং Coffea robusta ক্ষেত্রে এই দূরত্ব হয় সাধারণত ৩ X ৩ মিটার জমিতে চারা রোপণ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে চারাগুলি যেন পূর্ব-পশ্চিম অভিমূখে সোজাসুজি সারি করে বসানো হয়।

কফি চারা সাধারণত বসন্তকালে বা বর্ষার ঠিক আগে চাষের জমিতে রোপণ করা হয় কারণ ভাল কফি গাছের উপযুক্ত বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন ঠাণ্ডা আবহাওয়া এবং আর্দ্রতাযুক্ত মৃত্তিকা। উন্নতমানের কফি চারা উৎপাদনের জন্য চাষের জমিতে দুটি সারির মধ্যে দূরত্ব রাখা উচিত ১৫–২০ সেমি এবং প্রতি সারিতে দুটি বীজের অর্ন্তগত দূরত্ব কমপক্ষে ৩-৫ সেমি থাকতে হবে ও বীজগুলি মাটির ভিতর ০.৫–১ সেমি গভীরে বপন করতে হবে।

পরিচর্যা –

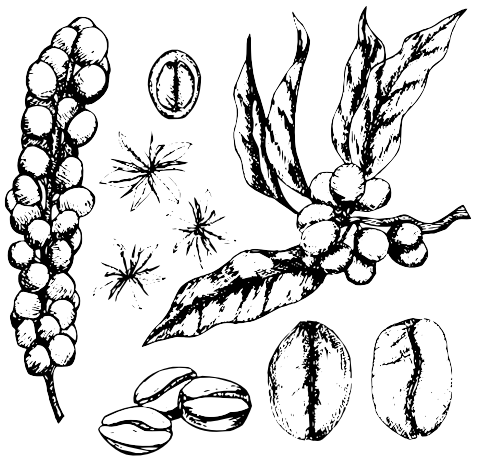
মাটির প্রকৃতি, মাটির আর্দ্রতা, গাছের বয়স এবং আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে সেচ দেওয়া হয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সেচ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় যেমন, ড্রিপ ইরিগেশন, স্প্রিংকলার ইরিগেশন, মাইক্রো জেট এবং বেসিন ইরিগেশন। তবে ড্রিপ ইরিগেশন পদ্ধতি হল সর্বোত্তম সেচ পদ্ধতি যার মাধ্যমে জল এবং সারের উপযুক্ত ব্যবহার হয়। এই সেচ পদ্ধতিতে কফি গাছের আগাছা নিয়ন্ত্রণও হয়। মূল জমিতে চারা বপন করার আগে প্রতি গাছ পিছু ৫০–৫৫ মিলিমিটার জল দিতে হবে এবং বপন করার পরে ৮–১০ দিন অন্তর অন্তর এমনভাবে সেচ দিতে হবে, যাতে প্রতি গাছ কমপক্ষে ২৫ মিলিমিটার করে জল পায়। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে জমির মাটি আর্দ্র থাকে। তবে মাটি যেন অতিরিক্ত আর্দ্রতাসম্পন্ন না হয়ে যায়। কারণ অতিরিক্ত জল প্রয়োগে গাছে ধ্বসা এবং ছত্রাকজনিত রোগ লাগতে পারে। কফি চাষের ক্ষেত্রে সেচের মূল নিয়ম হল গ্রীষ্মকালে সপ্তাহে ২বার সেচ দেওয়া উচিত এবং শীতকাল বা অন্যান্য সময়ে সপ্তাহে একবার সেচ দেওয়া প্রয়োজন।

চারা রোপণের পর প্রথম সেপ্টেম্বর মাসে জমি থেকে আগাছা তুলে ফেলে দিতে হবে। পরবর্তী ধাপে নভেম্বর, ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসে পুনরায় একই পদ্ধতিতে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আগাছা নিয়ন্ত্রণ চারা রোপণ করার পর প্রথম কয়েক বছর করতে হয়। ঘাস নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ডালাপনের মতো কিছু রাসায়নিক আগাছা নিয়ন্ত্রক ব্যবহার করা যেতে পারে। চওড়া পাতা সম্পন্ন আগাছা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অ্যামিনো লবণ ২, ৪-ডি ব্যবহার করা যেতে পারে।

শুকনো, মৃতপ্রায় এবং অস্বাস্থ্যকর ডালগুলিকে ছেঁটে দিতে হয়। ৪ বছরে একবার এই ছাঁটাই অতি আবশ্যক। কারণ এর মাধ্যমেই গাছগুলি উত্তম আকৃতি ধারণ করে এবং অপ্রয়োজনীয় ডালপালাগুলি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মনে রাখতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে, ফসল তোলা হয়ে গেলেই ছাঁটাই পদ্ধতি সম্পন্ন করতে হবে।

মালচিং-এর মাধ্যমেও আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। মাটির আর্দ্রতা রক্ষা করতে ও মাটির ক্ষয়রোধ করতে সহায়তা করে এই

ব্যবস্থা। মালচিং মাটিকে সমৃদ্ধ করে, মাটির অতিরিক্ত তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং জমিকে উন্নত করে। বেশিরভাগ সময়ে যে সব বস্তুগুলি মালচিং-এর জন্য ব্যবহার হয় সেগুলি ভাল জৈবসারে পরিবর্তিত হয়ে যায়।



প্রখর সূর্যালোকসম্পন্ন অঞ্চলে কফি গাছের জন্য পার্শ্বিক আচ্ছাদনের প্রয়োজন দরকার। তাই এই ক্ষেত্রে মূল চাষের জমিতে বিভিন্ন ধরনের ছায়াপ্রদানকারী গাছ যেমন, সিলভার ওক, গ্লিরিসিডিয়া, অ্যালবিজি প্রভৃতি গাছগুলি কফি গাছের ছায়াপ্রদানের জন্য লাগানো যেতে পারে।

বছরের বিভিন্ন সময়ে কফি গাছের বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন অনুপাতে NPK সার প্রয়োগ করা হয়। তবে Coffea arabica ও Coffea robusta, এই দুই জাতের কাফি গাছে এই সার প্রয়োগের পরিমাণ আলাদা আলাদা হয়।

কফি গাছের প্রধানত কফি বেরি মথ, মিলিবাগ, সাদা বর্ণের কাণ্ডছিদ্রকারী পোকা, লিফ মাইনার ও অ্যান্টেশসিয়া স্টিঙ্ক পোকা দেখা যায় এবং গাছের প্রধান রোগগুলি হল, ট্র্যাকিওমাইকোসিস উইল্ট, কফি বেরী রোগ, আমেরিকান পাতা ছোপ রোগ, রোজেল্লিনিয়া বুনোডেস, আর্মিল্লারিয়া মিলি ও গাছের শিকড় পচা রোগ।

ভৌগোলিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় হর্টিকালচার দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এই রোগ ও পোকা দমনের পদ্ধতি জেনে নিলে ভাল হয়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

ফ্লাই পিকিং পদ্ধতিতে অক্টোবার–নভেম্বর মাসে পাকা ফলগুলি তোলা হয়। সাধারণত ছোট চাষীরা এমনটা করেন। তবে ডিসেম্বর মাসে পরিণত ও পরিপক্ক কফি বীনসগুলি মেইন পিকিং পদ্ধতিতে তোলা হয়। এটিই ফসল তোলার আদর্শ পদ্ধতি। স্ট্রিপিং এই পদ্ধতিতে কাঁচা ও পাকা সব ফলগুলি তুলে নেওয়া হয়। এছাড়া ফসল তোলার সময় যে ফলগুলি মাটিতে পড়ে যায় সেগুলিকে ক্লিনিংস পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা।

কফি চারা রোপণ করার কমপক্ষে ৩ বছর পর থেকে উৎপাদন দিতে শুরু করে। সুস্থ এবং সর্বোত্তম মানের ফসল উৎপাদন হয় পঞ্চম বছর থেকে। কফি চাষে সব থেকে ভাল দিক হল ৫০–৫৫ বছর পর্যন্ত একটি কফি বাগান থেকে উৎপাদন পাওয়া যায়।

উৎপাদন বিভিন্ন বিষয় যেমন, মাটির প্রকৃতি, জলবায়ু ও আবহাওয়া, সেচ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে। তবে আদর্শ এবং অনুকূল পরিবেশে হেক্টর প্রতি ৪০০-৭০০ কেজি Coffea arabica এবং ৩৫০-৭০০ কেজি পর্যন্ত Coffea robusta উৎপাদন সম্ভব।

সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয় পানীয় হিসাবে কফির পরিচিতি। কফির উপকারিতাও অসীম। মানসিক চাপ ও হতোদ্যম দূরীকরণে কফি পান এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। কফি প্রাকৃতিক অ্যান্টি–অক্সিডেন্টের উৎকৃষ্ট উৎস।

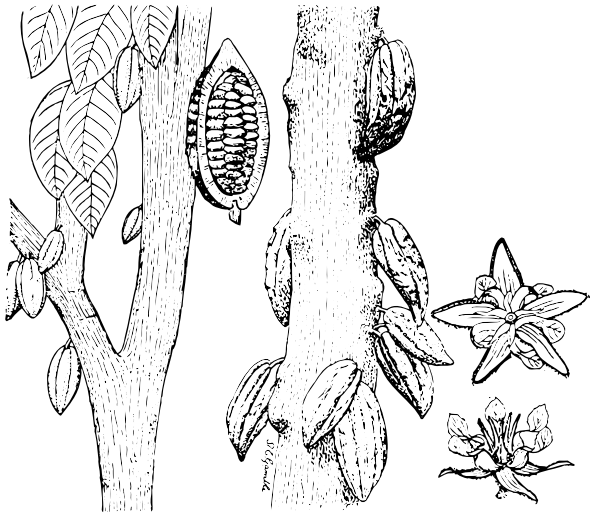
কফি পানে টাইফয়েড ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমে। কফি হার্টকে সুস্থ ও সবল রাখতে সাহায্য করে এবং নিয়মিত কফি পান করলে হার্টের রোগ এবং স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। কফি পান অ্যালজাইমার রোগের সম্ভাবনা কমায় এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যকৃতকে ভাল রাখতে কফি এক অসাধারণ পানীয়। নিয়মিত কফি পানে যকৃত কোষের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে। পারকিনসন রোগ থেকে শরীরকে রক্ষা করতে কফি এক উপযুক্ত পানীয়। শরীরকে গাউট রোগের হাত থেকে সুরক্ষা দিতে কফি হল এক উত্তম সুরক্ষা প্রদানকারী কবচ। নিয়মিত কফি পানে বিভিন্ন প্রকার স্ক্লেরোসিস রোগের ঝুকি কমে এবং নানা ধরনের ক্যানসার থেকে শরীরকে রক্ষা করতে সহায়তা করে।

তাজা কফি বীনস তোলার পর তা সূর্যালোকে বা ছায়াযুক্ত স্থানে রেখে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে গরম বায়ু দ্বারা শুকনো করা হয়।

এরপর ঘূর্ণায়মান যন্ত্রের দ্বারা কফি বীনস-এর আকার এবং আকৃতির উপর নির্ভর করে মান অনুসারে কফি বীনসগুলিকে আলাদা করা হয়।

প্রক্রিয়াকরণের পর কফি বীনসগুলি বায়ুনিরোধক বাক্সে প্যাকিং করা হয়। আর্দ্রতাযুক্ত জায়গায় কফি বীনস কখনই সংরক্ষণ করা উচিত নয়। সংরক্ষণাগার অবশ্যই শুকনো, পরিস্কার এবং বায়ু চলাচলযুক্ত হতে হবে। মান অনুসারে আলাদা কর কফি প্যাকিং করে বাক্সগুলি ট্রাকের মাধ্যমে কফি রোস্টিং মিলে পাঠানো হয়।

তথ্যসূত্র – www.agrfarming.in



কোকো

পরিচয় –

কোকো গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Theobroma cacao, এটি Malvaceae পরিবার বা গোত্রের অর্ন্তভুক্ত।

কোকোকে Cacaoও বলা হয়, যা স্প্যানিশ শব্দ থেকে এসেছে। কোকো প্রধানত দানা। এর থেকেই কঠিন কোকো বাটার নিষ্কাশন করা হয়। কোকো বীনস্ গাছের আদি জন্মস্থান আমাজন বেসিন এবং দক্ষিণ আমেরিকা ও মধ্য আমেরিকার নিরক্ষীয় অঞ্চল। ভারতে কোকো গাছের চাষ হয় সাধারণত কেরালা, তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটকে। দেশের অন্য রাজ্যেও কিছু পরিমাণে কোকো দানার চাষ হয়।

কোকোর সাধারণ নাম কোকো গাছ, কোকো, চকলেট গাছ, কাকাও গাছ ও দেবতার খাবার নামে পরিচিত। ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে কোকোকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। যেমন হিন্দিতে বলা হয় কোকো, মারাঠীতে কোকাও এবং বাংলায় বলা হয় কোকো। কোকো প্রধানত নিরক্ষীয় অঞ্চলের বহুবর্ষজীবী গাছ। সর্বাপেক্ষা ভাল বৃদ্ধি এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১১৫০ মিটার উচ্চতায় কোকো দানার গাছ ভাল জন্মায়। বছরে গড়ে ১০০০-২০০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত এবং ৮০ ৮৫% আর্দ্রতা দরকার হয়। অধিকতম ও ন্যূনতম তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস ও ১৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। কোকো গাছ বিস্তৃত ধরনের মাটিতে জন্মায়। কোকো গাছ প্রধানত লাল কাঁকুরে মাটিতে ভাল জন্মায়। এই গাছ ভাল নিকাশীযুক্ত বেলে-দোয়াঁশ মাটি যার PH ৬.৫–৭.০ তেমন মাটি পছন্দ করে। জল ধরে রাখে এমন মাটিতে এই গাছের বৃদ্ধি ও উৎপাদন খুব বেশি হয়।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

কোকো গাছের প্রসারণ বীজ ও অঙ্গজ জনন উভয় থেকেই হতে পারে। বীজ থেকে কোকোর প্রসারণ করতে হলে বীজ অবশ্যই ছাই বা চুন দিয়ে শোধন করতে হয়। কোকো বীজ পলিথিন ব্যাগে বপন করতে হয়। এই বীজ নার্সারী বেডে বড় করতে হলে ছায়ার প্রয়োজন হয়। বীজ পরিশোধনের পর শীঘ্রই বপন করা হয়। ৬০ সেমি উচ্চতার চারাগাছ জমিতে রোপণের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ভাল অঙ্কুরদগমের জন্য সেই বীজ বপন করা হয় যার বীজপত্রের খোসা ১ সেমি থেকে কম ঘন হবে এবং শুকনো দানার ওজন ১ গ্রামের থেকে বেশি হবে। কোকা গাছের অঙ্গজ প্রসারণ হয় ডাল কেটে, কলম থেকে ও জোড়কলম থেকে করা হয়। অঙ্গজ প্রসারণ থেকে ৯০% মূল পেতে গেলে ১-২টি পাতা সমেত ৩-৪ সেমি কাটিং IBA ব্যবহার করে সমান ভাগে পচা তালের তন্তু ও বালির মাধ্যম ব্যবহার করে রোপণ করতে হয়। সাধারণত ১৫ সেমি লম্বা গাছের কাটিং যেখানে ৪টি প্রান্তিক পাতা রয়েছে সেটাকে NNA + IBA -তে ডুবিয়ে পলিব্যাগে রোপণ করতে হয়। একমাস পরে এখান থেকে ৬৫–৭৫% মূল বের হয়। কোকো রোপণ নির্ভর করে চাষী ও তার চাষ পদ্ধতির উপর।

পরিচর্যা –

সঠিক সেচ কোকো গাছের ভাল বৃদ্ধি ও উৎপাদনকে সুনিশ্চিত করে। ধারাবাহিকভাবে আর্দ্রতা রক্ষা করা দরকার। কারণ কোকো গাছ খরা সহ্য করতে পারে না। গ্রীষ্মকালে এবং গরম বা শুষ্ক জলবায়ুতে ৩দিন অন্তর কোকো গাছে সেচ দেওয়া প্রয়োজন। বর্ষাকালে জল দেওয়ার দরকার হয় না। যদি বর্ষায় বন্যা বা অতিরিক্ত বৃষ্টি হয় তা হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জল বার করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। জলকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য ড্রিপ সেচ ব্যবহার করা হল ঠিক পদ্ধতি। এমনকি ড্রিপ পদ্ধতির মাধ্যমে সার দিলে তাতে সারের সর্বাপেক্ষা ভাল ব্যবহারও হয় এবং আগাছা জন্মানো নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

কোকো গাছ জৈবসার ও রাসায়নিক সারে ভাল হয়। মাটি বা জমি তৈরির সময় খাদ্য বা অণুখাদ্যের অভাব অবশ্যই পূরণ করতে হয়। প্রতি বছর গড়ে প্রত্যেক কোকো গাছে ৮-১০ কেজি মাঠের পচানো (FYM) সার, ১০০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ৪০ গ্রাম পটাসিয়াম অক্সাইড (P2O5), ও ১৪০ গ্রাম সোডিয়াম অক্সাইড (K2O) মিশিয়ে দিতে হবে। এই সার বছরে ২টি ভাগে দিতে হয়। একবার এপ্রিল–মে মাসে, আর একবার অগাষ্ট–সেপ্টেম্বর মাসে। জৈবসার প্রথম বছরে প্রয়োগ করতে হয়। সারের ১\৩ পরিমাণ দিতে হয় প্রথম বছরে, ২\৩ পরিমাণ দ্বিতীয় বছরে এবং তিন বছর থেকে পুরোমাত্রায় দিতে হয়। কোকো চাষের সঙ্গে অর্ন্তবর্তীকালীন ফসল হিসাবে চাষ করার জন্য অনুমোদিত ফাঁক রাখার কথা বলা হয়েছে। মূলত কোকো গাছ ছায়া পছন্দ করে। তাই প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম ছায়া তৈরি করা দরকার। বিশেষ করে এর চারাগাছ তৈরি এবং বৃদ্ধির সময়। কোকো বৃদ্ধির শেষ সময়ের অপেক্ষা বৃদ্ধির শুরুর

সময়ে ছায়া বেশি পছন্দ করে। যেখানে নারকেলের সঙ্গে কোকো চাষের জন্য ৭.৫ মিটার X ৭.৫ মিটার আয়তনে এক হেক্টরে ৫০০টি কোকো গাছ লাগানো যায়। সুপারি গাছের সঙ্গে কোকো চাষ করলে ২.৭ মি X ২.৭ মিটার আয়তনে প্রতি হেক্টরে ৬৮৬টি কোকো গাছ লাগানো যায়। পাম তেলের গাছের সঙ্গে কোকো গাছ লাগাতে ৪.৫ মি X ৪.৫ মিটার আয়তনে এক হেক্টর জমিতে ৪০০টি কোকো গাছের প্রয়োজন হয়।

যে কোনও বাণিজ্যিক ফসলের চাষের জন্য ভাল ও স্বাস্থ্যবান গাছ নির্বাচন করা দরকার। রোপণের জন্য কোনও নামকরা বা সার্টিফায়েড নার্সারী থেকে বৃদ্ধি ও উৎপাদন বেশি হয় এমন চারা নির্বাচন করা দরকার। ৪-৫ মাসের চারাগাছ বা কলম বা জোড়কলম গাছ নেওয়া উচিত। কোকোর চারা বা কলমের গাছ বা জোড়কলমের গাছ পাত্রের মাঝখানে বসানো প্রয়োজন। ডাল ছাঁটাই পদ্ধতি হল শাখাপ্রশাখাগুলি ঘন করা ও পুরনো ও মরা ডালগুলিকে সরিয়ে ফেলা। এই পদ্ধতি আবশ্যিক, কারণ এরফলে গাছটি ভালভাবে সূর্যের আলো পেয়ে বেড়ে উঠতে পারে। কোকো গাছের ডাল ছাঁটাই বছরে দু'বার করা হয়। ডাল ছাঁটাই গাছের গঠনকে বেড়ে উঠতে দেয় এবং সূর্যের আলো পেতে উচ্চতাকে বাড়ায়। বর্ষার ঠিক আগে প্রধান ফসল সগ্রহের পরে প্রথম ডাল ছাঁটাই করা হয়। আর দ্বিতীয়বার ডাল ছাঁটাই করা হয় প্রথম ডাল ছাঁটাইয়ের ঠিক ৬ মাস পরে। যে কোনও নিচের শাখাপ্রশাখা এবং মরা ডালপালা অবশ্যই সরিয়ে ফেলা দরকার। ভালভাবে সূর্যের আলো পাওয়ার জন্য ৪-৫টি শাখা রেখে দেওয়া দরকার। রোগাক্রান্ত ডালগুলিকে সরানোর পরে পুড়িয়ে দিতে হয়।

কোকো চাষে যে যে পোকা ও রোগ দেখা যায় সেগুলি হল, মিলিবাগ, এফিডস, প্লান্ট হপারস, শুঁয়োপোকা, মশা, কোকা পড বোরার ও কাণ্ডছিদ্রকারী পোকা। এছাড়া কোকো চাষে সাধারণত গোড়া পচে যাওয়া, চারাগাছে ক্ষত, কালো কালো ক্ষত, witches broom, Frosty pod, Stem canker এবং Wilt ইত্যাদি রোগ দেখা যায়। এই সকল পোকা ও রোগের প্রতিকারের জন্যও স্থানীয় উদ্যান বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করা ভাল।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

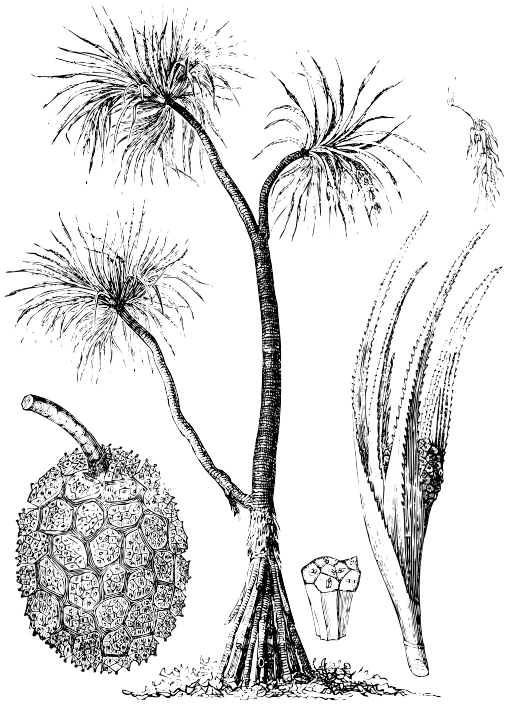
কোকো গাছের রোপণের বা বপনের তৃতীয় বছর থেকে গাছে ফুল হতে শুরু করে। ঠিকমতো অর্থনৈতিকভাবে আয়ের জন্য উৎপাদন শুরু হয় বপনের বা রোপণের ৫বছর পর থেকে। কোকোর ফল ৫–৬ মাসে পরিণত হয়। সাধারণত কোকো বছরে দু'বার ফসল দেয়। সাধারণভাবে কোকোর ফলে রঙের পরিবর্তন দেখে ফলের পরিণত অবস্থা ঠিক করা হয়। সবুজ ফল যখন পরিণত হয় তখন ফলের রং সবুজ থেকে হলুদ হয় এবং ১০-১২ দিন অন্তর ফসল সংগ্রহ করাকে নিশ্চিত করে। ফলগুলিকে অতিরিক্ত পাকতে দেওয়া যাবে না। কঠিন বা শক্ত জায়গায় আঘাত করে বা কাঠের ছোটো হাতুড়ি দিয়ে ফলটিকে ফাটানো হয়। একবার ফল সংগ্রহ হয়ে গেলে ফলকে গাঁজানোর কাজ করা হয়। তারপর ফল ফেটে যায়। এইভাবে একটা ফল থেকে ৩০–৩৫ টি ভিজে দানা পাওয়া যায়। এই দানাগুলি গাঁজানোর এবং শুকানোর মধ্য দিয়ে তৈরি করা হয়। শুকনো কোকোর দানা ভাল মানের হয় এবং প্যাকেট করে সংরক্ষণ করা হয়। কোকোর ফসল উৎপাদন নির্ভর করে অনেকগুলি বিষয়ের উপর। যেমন, জাতের বা চাষের পদ্ধতি, মাটির ধরন, গাছের বয়স এবং ফার্মের অন্যান্য ব্যবস্থাপনার উপর। গড়ে প্রতি বছরে প্রতি গাছ থেকে ৫০–৬০টি ফল আশা করা যেতে পারে। অঙ্গজ প্রসারণে উৎপাদনের সঙ্গে বীজ থেকে প্রসারণের দ্বারা উৎপাদনের তুলনা করা যেতে পারে। বীজের ক্ষেত্রে এক হেক্টর জমি থেকে ২০০ কেজি শুকনো দানা পাওয়া যায় এবং অঙ্গজ প্রসারণে এই পরিমাণ ৫০০–৮০০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

কোকো দানা প্রধানত চকলেট, কোকো পাউডার আর কোকো মাখন তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। কোকো মাখন প্রসাধনী সামগ্রী তৈরির শিল্পে ব্যবহার হয়। কোকো উচ্চ রক্তচাপকে কমাতে সাহায্য করে ও রক্তজালিকাগুলির স্থিতিস্থাপকতাকে উন্নত করে। কোকো দানায় অসাধারণ অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট গুণ রয়েছে। মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যরক্ষায় কোকো খুব ভাল। কোকো রক্তে ক্লোরেসটেরল কমায়। ইনস্যুলিনের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, যা ডায়াবেটিক রোগীদের পক্ষে খুব ভাল। কোকো নিউরো-ডিজেনারেটিভ অসামঞ্জস্যতাকে প্রতিরোধ করে। ফুসফুসজনিত রোগ যেমন হাঁপানিতে কোকো উপকারী। অতিরিক্ত মেদজনিত রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে কোকো। হার্টের রোগের পক্ষে কোকো খুবই উপকারী। এর মধ্যে তন্তু থাকায় কোষ্টকাঠিন্যকে রোধ করে। শরীরে তামা ও ম্যাগনেসিয়ামের অল্পতা রোধে কোকো সাহায্য করে। কোকো ক্রনিক অবসাদকে প্রতিরোধ করে এবং ত্বকের পক্ষে খুবই ভাল। এছাড়াও কোকো খাবারে, ভেষজ ওষুধে, প্রসাধনে, পীট মাল্‌চেও ব্যবহৃত হয়।

জাত পরিচিতি –

কোকোর বিভিন্ন জাত পাওয়া যায়। Criollo, Forastero ও Trintario, মূলত এই তিন ধরনের জাতের কোকোর চাষ বেশিরভাগ অঞ্চলে হয়ে থাকে। ভারতীয় কৃষি-জলবায়ু অবস্থায় Forastero জাতটি ভাল হয়। কিছু উচ্চফলনশীল জাতও ভারতে পাওয়া যায়। যেমন CCRP-1, CCRP-2, CCRP-3, CCRP-4, CCRP-5, CCRP-6, CCRP-7 এবং সংকরজাত VTLCH1, VTLCH2, VTLCH3 এবং VTLCH4, CCRP-8, CCRP-9, CCRP-10

তথ্যসূত্র – www.agrifarming.in



কেওড়া

পরিচয় –

কেওড়া গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Pandanus odoratissimus L., এটি Pandanaceae গোত্রের বা পাইন পরিবারের গুল্ম জাতীয় একটি অ্যারোমেটিক উদ্ভিদ।

Pandanus গণের গাছগুলির আদি জন্মস্থান সাধারণত এশিয়ার উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চল, অস্ট্রেলিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল। দক্ষিণ ভারতের পূর্ব থেকে তাইওয়ান ও জাপানের দক্ষিণে এবং ইন্দোনেশিয়ার দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত এই গাছটির দেখা পাওয়া যায়। ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, ওড়িশা, গুজরাট এবং আন্দামানের দ্বীপে কেওড়া গাছটি সহজলভ্য।

ইংরেজিতে কেওড়া গাছটি Umbrella tree, Screw pine বা Screw tree নামে পরিচিত। হিন্দিতে কেওড়াকে কেবড়া, কেওড়া বা পুষ্প চামর, মারাঠীতে কেতকী, কেবড়া বা কেগদ, ওড়িয়াতে কিয়া এবং বাংলায় কেওড়া বলা হয়।

এই প্রজাতির কেওড়া অত্যন্ত কঠিন এবং খুব ঘন ডালপালাযুক্ত গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। পরিণত কেওড়া গাছ উচ্চতায় ৬মিটার পর্যন্ত হতে পারে। পাতাগুলি হালকা-সবুজ রঙের হয়। লম্বায় ০.৯-১.৫ সেমি এবং চওড়ায় ৪সেমি হয়। পাতার ধারে এবং পাতার মধ্যশিরা বরাবর কাঁটা থাকে।কেওড়া গাছে অসংখ্য ফুল হয়। ফুলগুলি ২৫-৫০ সেমি দীর্ঘ ও নলাকার স্পাইকযুক্ত। স্পাইকগুলি ৫-১০ সেমি দীর্ঘ হয়। সাধারণত মে-অক্টোবর মাসে গাছে ফুল আসে।

কেওড়া গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ। সাধারণত জুন-অগাস্ট মাসে এই চাষ করা হয়ে থাকে। এই গাছের জন্য বেশি বৃষ্টিপাত প্রয়োজন হয়। কেওড়া গাছ অতিমাত্রায় তুষারপাত সহ্য করতে পারে।

কেওড়া শক্ত প্রজাতির একটি উদ্ভিদ। বালিমাটি, লবণাক্ত মাটি ও সাধারণ মাটিতে এই গাছের চাষ করা যায়। তবে ভাল চাষের জন্য উর্বর ও সুষম মাটির প্রয়োজন হয়।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

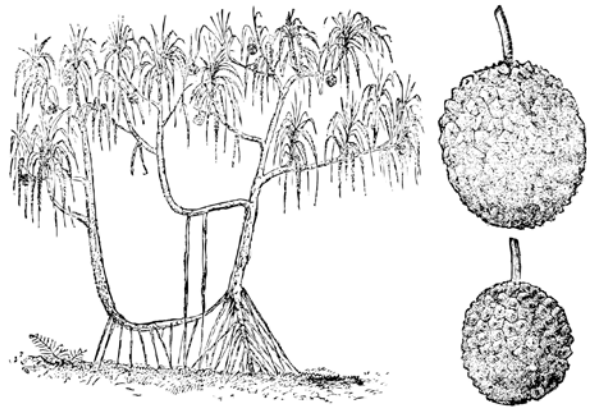
নার্সারীতে চারা তৈরি করে কেওড়া গাছের কৃত্রিম প্রসারণ ঘটানো সম্ভব। এরজন্য প্রথমেই ভাল বেড যুক্ত একটি নার্সারী তৈরি করতে হবে। বেডগুলি যেন আলো-ছায়া যুক্ত হয়। চারা তৈরির জন্য প্রায় ২০-৩০ সেমি লম্বা এবং ৮-১০ সেমি পুরু ডালের প্রয়োজন হয়। ডালগুলি গাছের যে সব শাখায় ফুল হয় না এবং পুরনো Stump থেকে তৈরি হতে হবে। বেডে নিয়মিত জলসেচ দিতে হয়। প্রায় ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে নার্সারীর বেডে রোপণ করা ডালগুলি থেকে নতুন পাতা বের হয়। এরপর নার্সারী থেকে চারাগুলি তুলে নির্দিষ্ট জমিতে রোপণ করতে হয়।

রোপণের আগে জমিটিকে ২-৩ বার ভাল করে চাষ দিয়ে প্রস্তুত করতে হয়। জমির মধ্যে ৬০ X ৬০ X ৬০ সেমি মাপের গর্ত তৈরি কাটতে হয়। চারাগুলি জমির মধযে লাইন করে লাগাতে হয়। দুটি লাইন বা সারির মধ্যে ১ X ১ মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হয়। চারা থেকে চারার দূরত্ব ৩-৭ মিটার হওয়া দরকার। গর্তে চারাগুলি রোপণের পর গর্তগুলি জৈবসার এবং গুঁড়ো মাটি দিয়ে ভরাট করে দিতে হয়।

পরিচর্যা –

কেওড়া চাষের জন্য প্রচুর পরিমাণে জল প্রয়োজন। তাই নিয়মিত সেচ দেওয়া আবশ্যক। তবে নদী তীরবর্তী অঞ্চলে এবং ভারী বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে সেচের প্রয়োজন হয় না।

জমিতে কেওরা গাছের চারা রোপণের সময় ভালভাবে প্রস্তুত জৈবসার প্রতি হেক্টরে ২০ টন প্রয়োগ করা উচিত। উদ্ভিদের সঠিক বৃদ্ধির জন্য ৪০ : ২০ : ৪০ কেজি অনুপাতে প্রতি হেক্টর NPK প্রয়োগ করতে হয়। এই উদ্ভিদটি অতি সহনশীল উদ্ভিদ তাই আলাদা করে আগাছা নিয়ন্ত্রণের তেমন প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র চাষের প্রথম পর্যায়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন।



কেওড়া গাছে ছোট পাতার রোগ দেখা যায়। এই রোগ দেখা দিলে গাছের নিচের দিকের পাতার ধারগুলিতে ছোট ছোট, বিক্ষিপ্ত, তৈলাক্ত লালচে দাগ দেখা দেয়। ধীরে ধীরে দাগগুলি বড় হয় এবং পাতাগুলি শুকিয়ে যায়। ৩ গ্রাম Cepton এবং ৩ মিলিমিটার ক্যালফোমিনের ১.৫ আউন্স দ্রবণ দিয়ে কাণ্ডটি ধুয়ে দিলে বা ০.২% Metacid স্প্রে করলে এই রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

এই গাছের ফসল হল গাছের ফুল। রোপণের ৫ বছর পর থেকে কেওড়ার ফুল পাওয়া যায়। ফুল উৎপাদন সাধারণত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে। মে মাসে এই ফুল উৎপাদন শুরু হয়, পাওয়া যায় জানুয়ারি মাস পর্যন্ত। তবে ফুলের উৎপাদন সবচেয়ে বেশি থাকে জুলাই-অক্টোবর মাসে। ভোরের দিকে গাছ থেকে ফুল হাত দিয়েই তোলা উচিত।

তাজা ও টাটকা ফুলগুলিকে বিভিন্ন পদার্থ নিষ্কাশনের জন্য আলাদা করে নিতে হয়। কখনই ক্ষতিগ্রস্ত ফুলগুলি এরজন্য বাছা হয় না। এরপর ভাল ফুলগুলিকে পাতন প্রক্রিয়ার জন্য পাঠানো হয়।

পাতন ইউনিটে এই পাতন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কেওড়া তেল, কেওড়া আতর, কেওড়া জল এই পাতন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়। এই ৩ ধরনের পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রায় ১০ মিলিয়ন মঞ্জরী ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কেওড়ার আতর পাকা মঞ্জরী ও জলের পাতন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা হয়। ১-১০ হাজার ফুল থেকে ১ কেজি আতর পাওয়া যায়। এছাড়া ১ হাজার ফুল থেকে প্রায় ১৮ লিটার কেওড়া জল পাওয়া যেতে পারে।

কেওড়া সুগন্ধী দ্রব্য, পান মসলা, ফুলের তোড়া, তামাক, চুলের তেল, প্রসাধনী, সাবান এবং ধূপকাঠি তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়। কেওড়ার জল মিষ্টি, সিরাপ এবং নরম পানীয়তে ব্যবহার করা হয়।

এছাড়া কেওড়ার ফুল থেকে যে তেল পাওয়া যায়, ৬৬.৬৮% Phenyl alchohol, ১৬.২৪% Dipentene, ১৯.১৬% D-linaloo, ৪.৬৫% Phenylethyl acetate, Ester of phthalic acid, ১.৮২% Citral এবং Steropentene থাকে। এই তেল মাথা ব্যাথা ও Rheumatism রোগের ক্ষেত্রে Antispasmodic ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কেওড়া গাছের পাতা ঘর ছাওয়ার কাজে, টুপি, ঝুড়ি এবং কাগজ তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

এর দীর্ঘ বায়বীয় মূল থেকে নানা প্রকার দড়ি এবং ঝুড়ি তৈরি হয়। এছাড়া কুষ্ঠ, বসন্ত, খিঁচুনি, এবং লিউকোডার্মা অসুখের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও কেওড়ার পাতা ব্যবহৃত হয়।

সাধারণত ফসল সংগ্রহের পর কৃষকেরা তা নিকটবর্তী পাইকারি বাজারে পাঠায়। সেখান থেকে এই ফসল লরি বা ট্রাকে করে দূরবর্তী স্থানে পাঠানো হয়।

তথ্যসূত্র - http://gernot-katzers-spice-pages.com/eng



শিউলি

শিউলি গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Nyctanthes arbor-tristis, এটি Nyctanthaceae বা Oleaceae গোত্রের বড় গুল্ম বা ছোট বৃক্ষ জাতীয় দ্বিবীজপত্রী বহুবর্ষজীবী একটি উদ্ভিদ।

এই গাছটির আদি বাসস্থান দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এই গাছ বিস্তারলাভ করেছে।

Nyctanthes arbor-tristis বা Night-flowering Jasmine সাধারণভাবে Parijat নামে পরিচিত, যা Nyctanthes গণের একটি প্রজাতি। থাইল্যান্ডের কাঞ্চনাবুড়ি প্রদেশে বেশি দেখা যায় বলে সেদেশে শিউলি ফুলকে Kanchanaburi নামে ডাকা হয় এবং এই ফুল থাইল্যান্ডে রাষ্ট্রীয় ফুলের মর্যাদা পেয়েছে। সুন্দর ফুলের এই গাছ নিয়ে অন্য মতও রয়েছে। শিউলি সন্ধ্যায় ফোটে আর দিনে ঝরে যায় বলে লাতিন ভাষায় Nyctanthes-এর অর্থ হচ্ছে 'সন্ধ্যায় ফোটা' এবং arbor-tristis-এর মানে হচ্ছে 'বিষণ্ন গাছ'। আবার যেহেতু দিনের বেলায় এই ফুলের উজ্জ্বলতা কমে যায় তাই অনেক সময় এই গাছকে 'Tree of Sorrow' বা 'দুঃখের গাছ' বলা হয়ে থাকে। এমন যাই নাম থাকুক না কেন, বাঙ্গালির বিশেষ ঋতু শরতের সঙ্গে এই ফুলের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। যা জায়গা পেয়েছে কবির সৃষ্টিতেও। বিশেষ মর্যাদা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ফুলকে সরকারি ফুলের আসনে বসিয়েছে।

সংস্কৃতে শিউলি ফুলকে নালাকুমকুমাকা, হারসিঙ্গারাপুষ্পক, সুকলাঙ্গি, রাজানিহাসা, মালিকা, অপরাজিতা, বিজয়া, নিসাহাসা, প্রহার্ষিনী, প্রভোলানালিকা, বাথারি, ভুথাকেশি, সীতামাঞ্জারি, সুবাহা, নিশিপুষ্পিকা বা প্রযক্তা, তামিলে পাভাঝা মাল্লি বা পাভালা মাল্লি, মণিপুরীতে সিঙ্গারেই, অসমিয়ায় শেওয়ালি (শেৱালি),ওড়িয়ায় গঙ্গা শিউলি এবং বাংলাতে শিউলি বা শেফালি নামে পরিচিত।

উচ্চতায় শিউলি গাছ ১০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। বড় আকারের গুল্ম শ্রেণীর এই গাছটি শাখাপ্রশাখা যুক্ত হয়। গাছের ছাল স্তর বিশিষ্ট ধূসর বর্ণের হয়। গাছের পাতাগুলি বিপরীতভাবে সজ্জিত থাকে। পাতাগুলি লম্বায় ৬-১২ সেমি এবং চওড়ায় ২-৬.৫ সেমি হয়ে থাকে।

ভাল নিকাশী যুক্ত উর্বর মাটি শিউলি গাছের জন্য উপযুক্ত। এই গাছে মাসে একবার সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। শিউলি গাছ ছায়া সহ্য করতে পারে। সাধারণত শিউলি গাছের প্রসারণ বীজ বা কাটিং থেকে করা হয়ে থাকে। শীতকালে এই গাছ জাতে একটু উষ্ণতা পায় তার ব্যবস্থা করতে হয়।

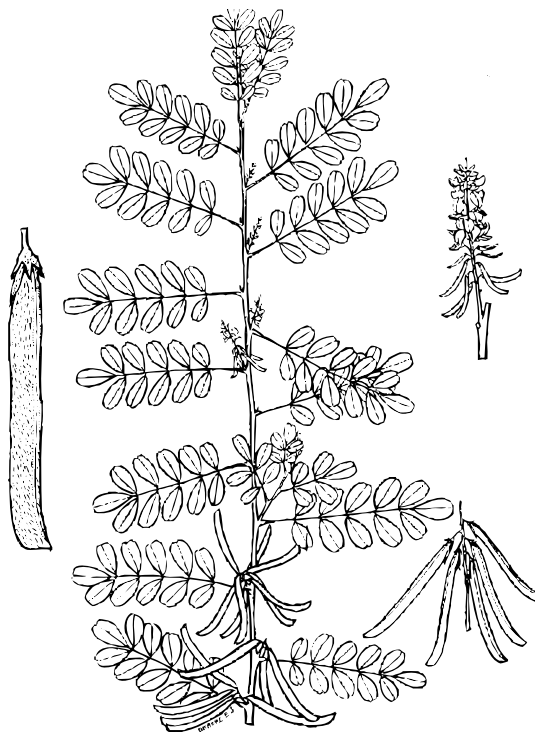
সকলের কাছে এই গাছের ফুল বা তার ব্যবহারই বেশি প্রাধান্য পায়। তবে এই ফুল থেকে গেরুয়া-হলদে বর্ণের ডাই পাওয়া যায় তা বিভিন্ন খাওয়ারে রং হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

এছাড়া শিউলি ফুল থেকে হলুদ রং তৈরি হয় এবং ফুলের বোঁটাগুলি শুকিয়ে গুঁড়ো করে পাউডারের মতো করে গরম জলে মেশালেও চমৎকার রং পাওয়া যায়।

শিউলি গাছের বিভিন্ন ঔষধি গুণাগুণ রয়েছে। Immunostimulant, Hepatoprotective, Antileishmanial, Antiviral এবং Antifungal ওষুধ তৈরি করতে এই গাছের বীজ, পাতা ও ফুল ব্যবহার করা হয়। এছাড়া sciatica, arthritis, fevers, নানারকম যন্ত্রণাদায়ক সমস্যার চিকিৎসার জন্যে ঔষধ বা বড়ির মত করে আয়ুর্বেদিক ঔষধ তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়। আয়ুর্বেদ চিকিৎসাতেও শিউলির বিভিন্ন ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। Sciatica, Arthritis, Fever ইত্যাদি নানান সমস্যায় এই গাছের পাতা ব্যবহার হয়ে থাকে। চুলের খুসকি দূর করতে শিউলির বীজ খুবই উপকারী। এই গাছের ছাল ট্যানিং-এর কাজে ব্যবহৃত হয়।

তথ্যসূত্র – Wikipedia,wikipedia.org/wiki/Nyctanthes_arbor-tristis, iloveindia.com,http://tropical.theferns.info

নীল



নীল গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Indigofera tinctoria, এটি Fabaceae গোত্রের একটি বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ।

Indigofera-গণের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে Indigofera tinctoria প্রজাতিটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কারণ এর থেকে সব থেকে উতকৃষ্ট মানের নীল পাওয়া যায়। ভারত, মধ্য আমেরিকা ও চিনে এই প্রজাতির নীল গাছ জন্মায়। ইংল্যান্ডে জন্মানো নীল গাছ বা Woad (Isatis tinctoria) গাছের রসেও নীল রং থাকে। প্রায় ৪ হাজার আগে থেকে মানুষ নিজের প্রয়োজনে নীল গাছের চাষ করে আসছেন। প্রাচীনকালে মিশর, গ্রীস ও রোমের লোকেরাও নীলের কথা জানত। মিশরের ১৮তম রাজ বংশের মমিগুলি নীল রাঙা কাগজ দিয়ে মোড়া থাকত। প্রকৃতিক ডাই-এর কারণেই নীল গাছের কদর। নীলকে তাই King of dyes বলা হয়। সম্ভবত এই গাছটির আদি বাসস্থান মালয়েশিয়া। বর্তমানে প্যান-ট্রপিক্যাল জলবায়ু অঞ্চলের সব দেশেই এই গাছের বিস্তার ঘটেছে। ইংরেজিতে নীলকে Indigo বা Indian Indigo বলে। এছাড়া হিন্দিতে একে নীলা, তেলেগুতে নিলিমান্ডু চেট্টু, আভীরি বা নীলা চেট্টু, তামিলে নীলম, আভুরি বা আমারি, মালায়লমে লিতা বা লীলা এবং বাংলায় নীল নামে পরিচিত। নীল সোজাভাবে বেড়ে ওঠা একটি ঝোপ জাতীয় একটি গাছ।

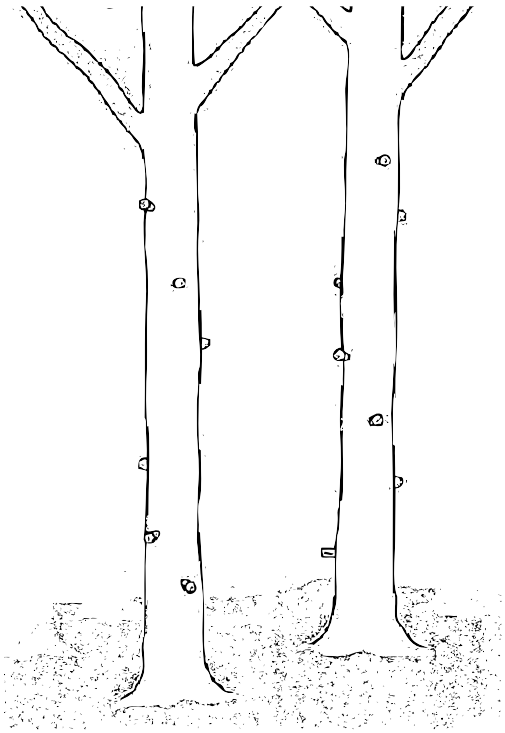
উচ্চতায় এই গাছটি ১.২-১.৮ মিটার লম্বা হয়ে থাকে। মঞ্জরীগুলি পাতার চেয়ে ছোট হয়ে থাকে। পাতা যতটা লম্বা প্রায় ততটাই চওড়া হয়। জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে নীল গাছে ফুল ফোটে। ফুল ছোট এবং ফলগুলি বাঁকা হয়ে থাকে।

নীল গাছ চাষের জন্য পুরোমাত্রায় সূর্যালোকের প্রয়োজন হয়। ৭০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত এই গাছের জন্য উপযুক্ত। তবে ৬৪০-৩০০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতও এই গাছ সহ্য করতে পারে। ভাল নিকাশীযুক্ত উর্বর মাটিতে নীল চাষ করা যায়। মাটির অম্ল-ক্ষারের মাত্রা ৬-৭ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে ৪.৩-৮.৭ PH সহ্য করার ক্ষমতা এই গাছের রয়েছে। বীজ থেকে নীল গাছের প্রসারণ সম্ভব। এক্ষেত্রে বীজগুলিকে এক রাত গরম জলে ভিজিয়ে রেখে আংশিক ছায়াযুক্ত বেডে বা জমিতে বপন করতে হয়। বীজের অঙ্কুরোদ্গম হতে প্রায় ৪ দিন সময় লাগে। এছাড়া Root cutting করেও নীল গাছের কৃত্রিম প্রসারণ ঘটানো যেতে পারে। মাটির কিছু ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে নীল গাছের মিথোজীবী সম্পর্ক রয়েছে। এইসব ব্যাকটেরিয়াগুলি গাছের শিকড়ে nodules তৈরি করে এবং বাতাসে থাকা নাইট্রোজেনকে ধরে রাখে। যে নাইট্রোজেনের কিছুটা অংশ ওই গাছের বৃদ্ধিতে এবং বাকি অংশ কাছাকাছি থাকা অন্যান্য গাছের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

মূলত প্রাকৃতিক ডাই তৈরির কারণেই বহুদিন থেকে বাণিজ্যিকভাবে নীল চাষ করা হচ্ছে। সাধারণত গাছে ফুল ধরলে গাছ থেকে ফলন সংগ্রহ করা হয়। বছরে মোট ৩বার নীল গাছ থেকে ফলন(ডাল সহ পাতা) সংগ্রহ করা যায়। প্রতি হেক্টর জমি থেকে ফলন সংগ্রহ করার পর তা প্রায় ১৩০ কেজি ওজনের এক-একটি বান্ডিল করা হয়। তারপর ওই বান্ডিলগুলিকে ডাই ফ্যাক্টরিতে পাঠানো হয়। প্রতি হেক্টর জমি থেকে ১.৬-৫.৪ টন ডাই পাওয়া যায়। গাছ থেকে প্রাপ্ত এই নীল জলে দ্রাব্য। এতে গ্লুকোসাইড নামে একধরনের রাসায়নিক থাকে। ফলন সংগ্রহের পর গাছের পাতাগুলি গাঁজানো হয়। এরপর বড় কড়াইতে জলের মধ্যে প্রায় ১২ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখলে সবুজ রঙের এক নির্যাস বের হয়। তারপর অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসতে পারে এমন একটি পাত্রে রেখে তা অনেকক্ষণ ধরে কাঠি দিয়ে নাড়তে হয়। অদ্রাব্য নীলের তলানি ধীরে ধীরে পাত্রের নিচে জমতে থাকে এবং শেষে তা পৃথক করে শুকিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটা হয়। এই নীলের টুকরোগুলিতে ইন্ডিগোটিন ছাড়াও নানা পদার্থ থাকে। এরমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইন্ডিরুবাইন বা ইন্ডিগো রেড, ইন্ডিগো গ্রীন ও ইন্ডিগো ব্রাউন। টুকরো আকারে প্রাপ্ত ওই নীল এরপর বস্ত্রশিল্পে নানাভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নীল গাছের ছোট কচি ডাল টুথব্রাশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া গাছের পাতা থেকে গাঢ় নীল বর্ণের ডাই কখনও কখনও শুষ্ক চিনির হালকা হলুদ রং ছাড়াতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নীল গাছের পাতার দুধ বা মধুর সঙ্গে মিশিয়ে তর্কা এবং স্নায়ু রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এছাড়া অ্যাজমা, ব্রঙ্কাইটিস, জ্বর, যকৃতের সমস্যা, লিভার, কিডনি ইত্যাদির সমস্যায় এই পাতা খুবই উপকারী। এই পাতা বিভিন্ন বিভিন্ন চর্মরোগ, কাটা জায়গার চিকিৎসা ইত্যাদি প্রতিরোধে মলম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

কখনও কখনও অন্য শস্যের চারধারে বেড়া দিতে বা সবুজ সার তৈরি করতে নীল গাছ রোপণ করা হয়ে থাকে।

তথ্যসূত্র - https://easyayurveda.com/Wikipedia/tropical.theferns.info



আগর

পরিচিতি –

আগর গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Aquilaria agallocha, এটি Thymelaeaceae গোত্রের একটি চিরহরিৎ বৃক্ষ শ্রেণীর উদ্ভিদ।

পৃথিবীতে আগর গাছের আদি জন্মস্থান কোথায় বা কবে এর রোপণ শুরু হয়েছে তার সঠিক ইতিহাস এখনও অজানা রয়েছে। তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রেইন ফরেস্ট আগর গাছের আদি জন্মস্থান হিসেবে ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে। পরে তা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

ইংরেজিতে আগর গাছ Aloe wood বা Eagle wood বলে পরিচিত। আরবিতে বলে উদ, দক্ষিণ এশিয়ায় পরিচিত নাম গাডরউদ, মালয়েশিয়ান ভাষায় গাহারু, আয়ুর্বেদিক ইউনানি চিকিৎসায় এর নাম উদহিন্দ এবং আয়ুর্বেদিক পরিভাষায় অগুরু বলে পরিচিত ও সমাদৃত। বাংলা, আরবি এবং ফারসি সহ বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে অপভ্রংশ হয়ে আগর নামটির উৎপত্তি হয়েছে। সংস্কৃতে এই গাছকে আগুরু বা কৃষ্ণগুরু, হিন্দিতে আগর, তামিলে আগর বা আগালিকান্দানাম কৃষ্ণগুরু, তেলেগুতে কৃষ্ণগুরু, কন্নড়ে কৃষ্ণগুরু, মালায়লমে আকিল বা কারাকিল এবং বাংলায় আগর বলে। আগর শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, উৎকৃষ্ট বা সুগন্ধ বিশিষ্ট কাঠ।

আগর গাছ লম্বায় প্রায় ১৫-৪০ মিটার এবং এর বেড় ০.৬-২.৫ মিটার ব্যাসযুক্ত হয়। শাখাপ্রশাখবিহীন সোজা লম্বা গাছটি দেখতে অনেকটা শাল বা গজারি গাছের মতো। এই গাছে সাদা রঙের ফুল হয় এবং ফলগুলি ক্যাপসুল আকৃতির হয়। আগর গাছের পাতা দেখতে অনেকটা লিচু গাছের পাতার মতো। অনেকেটা বকুল গাছের পাতার মতোও বলা যেতে পারে। সাদা রঙের আগর কাঠ খুব নরম হয়। ফলে আতর উৎপাদনের উপকরণ সংগ্রহ ও জ্বালানি কাঠ ছাড়া এই গাছ আর কোনও কাজে ব্যবহৃত হয় না।

পৃথিবীর উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের নিচু ও আর্দ্র জায়গায় আগর গাছ ভাল বেড়ে ওঠে। ২০০-৭০০ মিটার উঁচু জমিতে এই গাছ দেখা যায়। বার্ষিক ১৫০০-৬৫০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত এবং তাপমাত্রা ২২-২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এই গাছের পক্ষে উপযোগী।

আগর গাছ পাথর থেকে সৃষ্ট ভারী মাটি পছন্দ করে। তবে হালকা বালি মাটিতেও আগর গাছ জন্মাতে পারে।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

স্কুল, কলেজ, রাস্তা দু'পাশে আগরের চারা রোপণ করা যায়। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিতেও আগর গাছ লাগানো যেতে পারে। এছাড়া বাড়ির আঙিনায়, পতিত জমি, টিলা বা পাহাড়ে, টিলার ঢালে এমনকি পরিত্যক্ত জায়গায় আগর গাছ লাগানো যায়। পাহাড় বা টিলা জমিতে আগর গাছ ভালো জন্মে। তবে সব জমিতেই কমবেশি জন্মে।

আগর গাছের প্রসারণের জন্য প্রথমেই গাঢ় বাদামি বর্ণের ৩.৮১-৫.০০ সেমি (১.৫-২ ইঞ্চি) লম্বা ক্যাপসুল জাতীয় ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়। প্রতি ফলে দুটি বীজ হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা খুব অল্প সময়ের জন্য থাকে। সাধারণত ৭-১০ দিন পর্যন্ত অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা স্থায়ী থাকে। বীজ থেকে চারা তৈরি করা হয়। বীজ বপনের উৎকৃষ্ট সময় মার্চ-এপ্রিল মাস। চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়। প্রথমে বালির বেডে বীজগুলি বিছিয়ে দিয়ে তার উপরে আবার বালি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এখানে বীজগুলি অঙ্কুরিত হয়। প্রায় ২০-২৫ দিন পরে পলিব্যাগে চারা স্থানান্তরিত করা হয়। চারা গজানোর জন্য অস্থায়ী শেডের প্রয়োজন হয়। চারায় নিয়মিত জল সেচের ব্যবস্থা রাখতে হয়।

বর্ষার মরসুম আগর গাছের চারা রোপণের উৎকৃষ্ট সময়। রোপণের সময় প্রতিটি গর্তে জৈবসার-কম্পোস্ট সার, টি.এস.পি., এম.ও.পি, জিপসাম সার গাছের বয়স অনুযায়ী প্রয়োগ করা যেতে পারে। রোপণের সময় সারি থেকে সারির দূরত্ব ১.৫২-১.৮২ মিটার (৫-৬ ফুট) এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৯১.৪৪ সেমি থেকে ১.২২ মিটার (৩-৪ ফুট) বজায় রাখলে সবচেয়ে ভাল হয়। সাধারণত ১-২ বছর বয়সী আগরের চারা লাগানো হয়। একক বাগানের ক্ষেত্রে কম দূরত্ব এবং মিশ্র বাগানের ক্ষেত্রে একটু বেশি দূরত্ব বজায় রাখা উচিত। অন্যান্য গাছের মতো চারা রোপণের আগে দৈর্ঘ্যে ৫০ সেমি, প্রস্থে ৫০ সেমি এবং গভীরতায় ৫০ সেমি আকারের গর্ত তৈরি করে পচা গোবর ও সার প্রয়োগ করলে ভাল হয়।



পরিচর্যা –

খরায় আগর গাছে জল সেচ দিতে হয়। চাষের সময় প্রয়োজনমতো আগাছা দমন করতে হবে। তাছাড়া নিয়ম করে কিছু রাসায়নিক সার দিলে গাছের বৃদ্ধি দ্রুত হয়। এক্ষেত্রে নতুন আগর গাছের বাগানে কোনও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হয় না। আগর গাছের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সার ব্যবহার করা যায়। একবার বর্ষার আগে এবং একবার বর্ষার পরে অর্থাৎ বছরে দু'বার সার প্রয়োগ করলে ভাল।

সাধারণত প্রথম ৩-৫ বছর পর্যন্ত আগর গাছের জমিতে কিছু মিশ্র ফসল যেমন, শাক-সবজি ও ডাল জাতীয় ফসল চাষ করা যায়। পরবর্তীতে কয়েক বছর ছায়া পছন্দকারী সর্পগন্ধা গাছের চাষ করা যেতে পারে। এভাবে আদা বা হলুদও লাগানো সম্ভব। তাছাড়া সুপারি, কফি, রবার, পাম সহ অধিকাংশ বনজ গাছ আগর গাছের সঙ্গে মিশ্র ফসল হিসেবে চাষ করা যায়। অন্যান্য দেশে আগর গাছের সঙ্গে এলাচও চাষ করা হয়।

আগরে তেমন কোনও রোগ হয় না। তবে মাঝেমধ্যে গোড়া পচা রোগ এবং ডাইব্যাক রোগে গাছের ডালপালা শুকিয়ে যায়। প্রয়োজনীয় ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করে এক্ষেত্রে ভাল ফল পাওয়া যায়। আগর চাষের ক্ষেত্রে বিছা পোকা পাতা ঝাঁঝরা করে দেয়। সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক ব্যবহার করে বিছা পোকার আক্রমণ কমানো যায়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

প্রাকৃতিকভাবে আগর গাছে আগর কাঠ পেতে ২৫-৩০ বছর সময় লেগে যায়। তবে কৃত্রিমভাবে ৫-৬ বছর বয়সী আগর গাছে পেরেক মেরে ওইসব গাছ ১৫-১৬ বছর হলেই তা থেকে আগর কাঠ সংগ্রহ করা যায়। আগর কাঠ সংগ্রহের জন্য গাছটি কাটার উপযোগী হয়েছে কিনা তা বিবেচনা করা হয় মূলত গাছ কতটা রুগ্ন হয়েছে তা বিচার করে। গাছের বয়স, গাছের বৃদ্ধি ও গাছের শরীরবৃত্তিয় পরিপক্কতা বিবেচনা করে আগর গাছ কাটা হয় না বরং গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাওয়া, দৃশ্যমান ক্ষতযুক্ত কাঠ, কাঠের বিকৃতি, ক্ষুদ্র পাতা, মূল কাণ্ড ও শাখার উপর মরা লক্ষণ, এসব দেখেই আগর কাঠ সংগ্রহ করার জন্য গাছ কাটা হয়। সারা বছরই আগর কাঠ সংগ্রহ করা গেলেও জানুয়ারি-এপ্রিল মাসই আগর কাঠ সংগ্রহের উৎকৃষ্ট সময়। এ সময় গাছ সুপ্ত অবস্থায় থাকে বলে আগর কাঠে আতর বা তেলের পরিমাণ বেশি থাকে বা তার গুণগত মানও ভাল হয়।

প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কাঠ সংগ্রহের জন্য কখনও ৫০ বছরও সময় লেগে যেতে পারে। এক্ষেত্রে গাছের বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্নভাবে কালো হয়ে যায়। দেখতে ছোপ ছোপ আকারের অনেকটা সারি কাঠের মতো হয়। তবে সারি কাঠ যেমন অনেকটা বা পুরোটা অংশজুড়ে কালো হয়, এক্ষেত্রে ঠিক তেমনটা হয় না। আগর গাছে নির্দিষ্ট জায়গা এমন কালো হতে শুরু হলে তা পূর্ণ হতে প্রায় ৪-৬ বছর লেগে যায়। এটিই প্রাকৃতিক পদ্ধতি। গাছের এই কালো অংশকেই বলা হয় আগর বা আগর কাঠ।

এক ধরনের ছেদক পোকা আগর গাছে ছিদ্র তৈরি করে। পরে ওই ছিদ্রে ছত্রাকের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে জৈবনিক প্রক্রিয়ায় আগর গাছের ক্ষতস্থানের চারপাশে বাদামী-কালো রঙের আস্তরন তৈরি হয়, যা আগর উৎপাদনের মূল উপকরণ। এই ধারণাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ কৃত্রিমভাবে গাছে পেরেক মেরে ক্ষত সৃষ্টি করে, ফলে সেখানে আগর সঞ্চিত হয়। এই পদ্ধতিতে খুব কম সময়ে আগর গাছ থেকে আতর তৈরির কাঁচামাল সংগ্রহ করা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে ১০-১২ বছরের ১০-১২ ইঞ্চি পরিধির আগর গাছের গায়ে ৪-৫ ইঞ্চি পরপর সারিবদ্ধভাবে গাছের নীচ থেকে উপর পর্যন্ত পেরেক (বা তারকাঁটা) গেঁথে দেওয়া হয়। সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, ২.৫৪-৫.০০ সেমি (১-২ ইঞ্চি) পরপর সারিবদ্ধভাবে ৩.৮১-৫.০০ সেমি বা ১.৫-২.০ ইঞ্চি মাপের তারকাঁটা ৪-৫ বছর বয়সী গাছে লাগানো হয়েছে। তারকাঁটা লাগানোর সময় একটা কৌশল হিসেবে অর্ধেক পরিমাণ তারকাঁটা গাছের কাণ্ডে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, একটু আড়াআড়িভাবে লাগানো পেরেকের বাইরের অংশটুকু গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ডের ভেতরে ঢুকে যায় গাছের তারকাঁটা গাঁথা অংশে কৃত্রিমভাবে আঘাতের ফলে সহজেই ছত্রাকের আক্রমণ ঘটে। ফলে তারকাঁটার চারপাশের কাঠে ৫-৬ বছরের মধ্যেই বাদামী-কালো রঙের আস্তরণ তৈরি হয়। পরে সেই গাছগুলি কেটে কাঠ বা আগর-আতর উৎপাদনের কাঁচামাল সংগ্রহ করা হয়। সাধারণত গাছ কতটা পুরু হয়েছে বা তার আকারের উপর নির্ভর করে গাছে তারকাঁটা লাগানো হয়। এক্ষেত্রে গাছের বয়স মুখ্য নয়। একটি পূর্ণবয়স্ক আগর গাছ থেকে ২০-২৫ কেজি আগর কাঠ পাওয়া যায়।

আগর কাঠকে বলা হয় ঈশ্বরের কাঠ। পূর্ব এশিয়া ও জাপানে আগর কাঠ পুজোর অর্ঘ্য উপকরণ। মধ্যপ্রাচ্যে আগর কাঠের ব্যবসা ও সমাদর হাজার বছরের প্রাচীন। আগরের সুগন্ধ প্রশান্তিদায়ক, অনেকেই শরীরের শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হিসেবে আগর কাজে লাগান। নানাবিধ ওষুধ, পারফিউম, পারফিউম জাতীয় দ্রব্যাদি, সাবান, শ্যাম্পু এসব প্রস্তুতে আগর তেল ব্যবহার করা হয়। সাধারণত



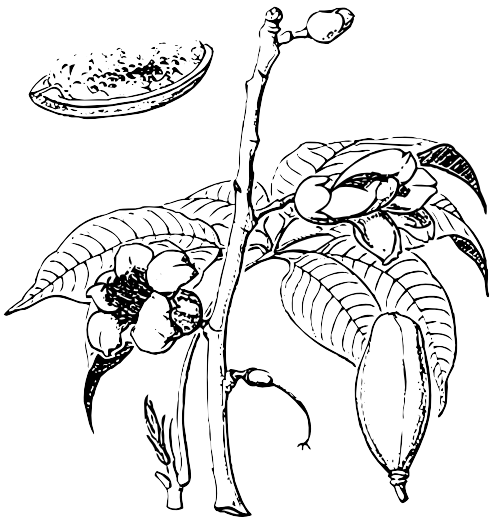
বাড়িতে, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে সুগন্ধি ছড়ানোর জন্য আগর-আতর ব্যবহার করা হয়। আগর আতরের পাশাপাশি আগর কাঠের গুঁড়ো বা পাউডার ধূপের মতো প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং মুসলিম ধর্মালম্বী মানুষেরা আগর আতর ও আগর কাঠের গুঁড়ো ব্যবহার করেন। আগর আতর বাংলাদেশে তরল সোনা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

জমি থেকে পূর্ণবয়স্ক আগর গাছ কেটে প্রথমে তা টুকরো টুকরো করে (স্থানীয় ভাষায় লগ) কেটে আলাদা করা হয়। এই টুকরোগুলিকে দু'ভাগে আলাদা করা হয়। এক ভাগে ঘন কালো, হালকা কালো, তামাটে, অল্প তামাটে বর্ণের কাঠের টুকরা এবং অন্য ভাগে ধূসর, প্রায় সাদা বর্ণের কাঠের টুকরোগুলি রাখা হয়। হালকা কালো, তামাটে ও অল্প তামাটে রঙের আগর কাঠের লগগুলিকে লম্বালম্বিভাবে চেরা হয়। এদেরকে ফালি বলা হয়। ফালিগুলি থেকে সাবধানে প্রথমে তারকাঁটাগুলিকে সরিয়ে ফেলা হয়। এরপর ফালিগুলিকে কুচিকুচি করে কাটা হয়। তারপর কুচিকুচি করে কাটা টুকরোগুলি একটি পাত্রে বা জলের ট্যাঙ্ক, ড্রাম বা বড় হাঁড়িতে ১০-১৫ দিন পর্যন্ত ভিজিয়ে রাখা হয়। ভিজিয়ে রাখা কাটা কাঠগুলি তুলে চালনির সাহায্য জল ঝরিয়ে ঢেকি দিয়ে গুঁড়ো করা হয়। গুঁড়োকে আবারও কমপক্ষে ৮-১০ দিন ভিজিয়ে রাখতে হয়। উল্লেখ্য যে, ভিজিয়ে রাখার প্রক্রিয়া অনেকে দু'বার আবার অনেকে একবারও করে থাকেন। গুঁড়ো খুব ভালভাবে পচে গেলে জল থেকে তুলে নিয়ে অপর একটি জল ভর্তি স্টিলের তৈরি বিশেষ পাত্রের মধ্যে রেখে পরবর্তীতে নীচ থেকে আগুনের তাপ দিতে হয়। পাত্রের চারিদিক খুব ভাল করে বন্ধ রাখতে হয়, অনেকটা এয়ারটাইটের মতো। এইভাবে অনবরত ১০-১২ দিন তাপ প্রয়োগ করতে হয়। পাত্রের উপরের দিকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় একটা নল সংযুক্ত করা হয় এবং নলটির অপরপ্রান্ত আরেকটি পাত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা থাকে। নলটি অন্য একটি ঠাণ্ডা জল ভর্তি স্টিলের তৈরি নলের মধ্য দিয়ে পরিচালিত করে অন্য পাত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। এখানে স্টিলের তৈরি পাত্রটিতে ঠাণ্ডা জল ভর্তি থাকে, ফলে নলের মধ্য দিয়ে ভেসে আসা বাষ্প ঠাণ্ডা জলের সংস্পর্শে এসে সহজেই ফোটা ফোটা জলে পরিণত হয়। ফোটা ফোটা জল নলের অপর প্রান্তে রাখা পাত্রে জমা হয়। আগুনের তাপে কাঠের গুঁড়ো সিদ্ধ হয়ে বাষ্পাকারে উপরের নলে প্রবেশ করে এবং ওই বাষ্প ঘনীভূত হয়ে অপর প্রান্তের পাত্রের মধ্যে ফোটার আকারে পড়তে থাকে। ঘনীভূত বাষ্প জল হয়ে নির্দিষ্ট পাত্রে জমতে থাকে এবং তার উপর তেলের আস্তরণ পড়ে। তেলের এই আস্তরণই আগর আতর তেল। পরবর্তীতে জলের উপর থেকে তেলের অংশটিকে সংগ্রহ করা হয়। এটি মূলত বাষ্পীভবন-শীতলীকরণ পদ্ধতির বিশেষ পাতন প্রক্রিয়া। একসঙ্গে একটি পাত্রে ৭৪.৬৫-১১২.০০ কেজি পরিমাণ আগর কাঠের টুকরো ভর্তি করা যায়। এই বিশেষ ধরনের পাত্রে কাঠের গুঁড়ো জাল দিয়ে ৮-৯ তোলা আতর পাওয়া যায়। এক তোলা আতর প্রায় ১২ গ্রামের সমান। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, আতর বের করার পর উচ্ছিষ্টগুলি আগর বাতির ফ্যাক্টরিতে বিক্রি করা হয়। তাছাড়া উচ্ছিষ্ট অংশগুলি রফতানি করা হয়ে থাকে।

প্রায় ১৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের আগর আতর বিশ্বের বাজারে রফতানি করার সুযোগ রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে আগর উড চিপস্ ও আতরের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশে আগর কাঠের বিভিন্ন প্রকার মানের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, ডবল সুপার, আগর প্রপার, কলাগাছি আগর, ডোম আগর। আগর আতর শিল্প থেকে দেশি ও বিদেশি অনেক আতর তৈরি হয়। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, জান্নাতুল নাঈম, জান্নাতুল ফেরদাউস, শাইখা, হাজরে আসওয়াদ, সুলতান, উদ, কিং হোয়াইট, আল ফারেজ, কুল ওয়াটার ইত্যাদি, যা গোটা বিশ্বেই সমাদৃত। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি কেজি আগর দাম ৫-১০ হাজার ডলার। তবে গুনগত মান অনুযায়ী এই দাম কম-বেশি হতে পারে। গুণগত মানের উপর নির্ভর করে এক তোলা আতর ৫-১৫ হাজার টাকায় পর্যন্ত বিক্রি হয়। তাছাড়া আগর গাছের ডাস্ট বা উচ্ছিষ্টগুলিও রফতানি যোগ্য। বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, সৌদি আরবসহ অন্যান্য দেশে এইসব ডাস্ট প্রক্রিয়াজাত করে ২০-২২টি পণ্য উৎপাদন করা হয়। তবে এইসব দাম মূলত ঠিক হয় আগর কাঠের মান ও উৎপাদনকারী দেশের উপর। আবার কোনও আগর কাঠের চেয়ে আগর আতর বেশি প্রসিদ্ধ। যেমন, মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতে আগর কাঠের তেল থেকে প্রাপ্ত গন্ধ বা সুরভী মুখ্য উৎপাদিত দ্রব্য হিসেবে বিবেচিত হয়। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুর আগর ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র। প্রধান প্রধান উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া অন্যতম।

এক কথায় আগর চাষ অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা হতে পারে। অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে বেশি মুনাফা করা সম্ভব। এক কেজি কালো কাঠের মূল্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা। একটি আগর কাঠসমৃদ্ধ প্রাপ্তবয়স্ক গাছের মূল্য ৫-১০ লক্ষ। এমনকি ২০-২৫ লক্ষ পর্যন্ত হতে পারে।

তথ্যসূত্র – http://www.ayushveda.com/herbs/aquilaria-agallocha, কৃষি তথ্য সার্ভিস (বাংলাদেশ)



শিমূল

পরিচয় –

শিমূল গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Bombax ceiba, Syn. নাম Salmalia malabarica, গোত্র Bombacaceae। বর্তমানে A.P.G (Angiosperm Phylogenic Group)-র শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী এই গাছটিকে Malvaceae গোত্রের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

শিমূল গাছ অর্থাৎ Silk cotton গাছের আদি জন্মস্থান সম্বন্ধে সঠিক কোনও তথ্য, পাওয়া যায়নি। তবে দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চিনের দক্ষিণ অংশে, তাইওয়ান শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশ, পাপুয়া নিউগিনিয়া, উত্তর অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইনস্ দ্বীপপুঞ্জে ও ভারতে এই গাছটি বহু বছর ধরে স্বাভাবিকভাবে বিস্তারিত হয়েছিল। তাই ঠিক কোন দেশে এর আদি জন্মস্থান তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়নি।

ভারতে বিশেষ করে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্রিশগড় ও উত্তরপ্রদেশের কিছু উপজাতি ও সাধারণ গ্রামীণ মানুষের মধ্যে শিমূল গাছ সম্বন্ধে বেশ কিছু কুসংস্কার রয়েছে। আবার কিছু মানুষের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে শিমূল গাছ অতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে আছে। কিছু উপজাতি শিমূল গাছকে 'যমদ্রুম' (Yamadrum) অর্থাৎ যমদূতের প্রতীক হিসাবে মনে করেন এবং অমঙ্গলের আশঙ্কায় এই গাছটিকে এড়িয়ে চলেন। আবার ছত্রিশগড়, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের কোনও কোনও অংশে হোলি উৎসবে এই গাছকে 'হোলি কা ধন' বলা হয় বলে রোপণও করা হয়। এইভাবে গাছটি অনেকদিন থেকেই স্বাভাবিকভাবে এদেশে সংরক্ষিত হয়ে আসছে। আবার গাছটির ঔষধি গুণের কারণে, উৎকৃষ্ট মানের তুলোর জন্য, দেশলাই শিল্পের প্রয়োজনে ছাড়াও বসন্তকালে ফুলে ভরা পাতাহীন শিমূল গাছের রূপ সকলকে আকৃষ্ট করে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। এই সমস্ত কারণে কাশ্মীর ও হিমাচল প্রদেশের কিছু অংশ ছাড়া ভারতের প্রতি রাজ্যেই শিমূল গাছ বিস্তারলাভ করেছে বা রোপণ করা হয়েছে।

ইংরেজিতে শিমূল গাছকে Cotton tree বা Red cotton tree, Silk cotton বা Red silk-cotton tree বলে। সংস্কৃতে সালমিলি, হিন্দিতে সিমল, কন্নড়ে পুলু বা বুরাগা, মালায়ালম ও তামিল ভাষায় গুল্লা বা মুল্লিলাড়ু, ওড়িয়ায় শিমিলিকোপ্টা ও বাংলা ভাষায় এটি শিমূল গাছ নামে পরিচিত।

শিমূল একটি বৃক্ষ শ্রেণীর উদ্ভিদ। উচ্চতায় প্রায় ৪৫ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। কাণ্ডটি সোজা, কাঁটাযুক্ত হয়। কাণ্ডের পুরু ছালে উপর-নীচে প্রসারিত ফাটা দাগ দেখা যায়। ছালের রঙ ধূসর লালচে বা গোলাপী ধূসর রঙের হয়। কাণ্ডের গোড়ায় প্রসারিতভাবে ৩-৫টি Root buttreses কাণ্ডের গোড়ার চারিদিকে মাটিতে কম-বেশি ১-২.৫ সেমি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে কাণ্ডের গোড়া থেকে উপর পর্যন্ত প্রসারিত থাকে। শিমূল গাছের পাতাগুলি হাতের তালুর আকারের যৌগিক প্রকৃতির হয়। পাতাগুলি একান্তরভাবে শাখাপ্রশাখায় সজ্জিত থাকে। যৌগিকপত্রের বৃন্তটি ১২-২৫ সেমি লম্বা হতে পারে, বৃন্তের অগ্রভাগকে কেন্দ্র করে ৫-৭টি পত্রকগুলি সজ্জিত থাকে। পত্রকগুলি লম্বা চওড়ায় ১০-২০ X ২.৬ সেমি মাপের হয়ে থাকে। গাছের পাতা ঝরে পড়ার পর ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে বড় মোটা, খয়েরী লাল রঙের ফুলগুলি জন্মায় এবং বনভূমিকে এক অপরূপ রঙে রাঙিয়ে দেয়। ফুলগুলি ঘণ্টা আকৃতির, লম্বায় ৬-৭ সেমি, ভারী। বৃতিটি সবুজাভ মেরুন রঙের এবং কাপের আকারের ও তিনটি লতিযুক্ত হয়। পাপড়িগুলি পুরু, খয়েরী বা লাল রঙের হয়, সংখ্যায় ৫টি। পুংকেশরের সংখ্যা ৬০টির বেশি। এগুলি ৫টি গুচ্ছে ফুলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। গর্ভাশয়টি ৫টি প্রকোষ্টযুক্ত গর্ভাশয় এবং গর্ভদণ্ডটি লম্বায় পুংকেশরের চেয়ে লম্বা হয়। গর্ভদণ্ডের মাথায় ৫টি গর্ভমুন্ড থাকে। কাক, বাদুড়, কাঠবিড়ালী ও অন্য কিছু প্রকার পোকামাকড়ের দ্বারা শিমূল ফুলের পরাগমিলন ঘটে। শিমূল গাছের ফল লম্বায় ৮-১০ X ৩ সেমি বেলনাকার আকৃতির হয়। এপ্রিল-মে মাসে ফলগুলি শুকিয়ে বাদামী বা কালো রঙের হয়ে যায় এবং ফলটি ৫টি ভাগে ফেটে গিয়ে তুলোর সঙ্গে যুক্ত বীজগুলি বাতাসের সাহায্যে উড়ে গিয়ে আপনা থেকেই প্রসারিত হয়।

শিমূল গাছ আর্দ্রতাযুক্ত উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের উদ্ভিদ। ২৮-৪২ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা শিমূল গাছের বৃদ্ধির জন্য আদর্শ। কিন্তু ৫-৪৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করেও এই গাছ বেঁচে থাকতে পারে । ৭৫০-৪৫৭০ মিলিমিটার বৃষ্টপাত শিমূল গাছের পক্ষে উপযুক্ত। যদিও দীর্ঘ অনাবৃষ্টি ও মরুভূমির মতো রুক্ষ আবহাওয়াতেও শিমূল গাছ বেঁচে থাকে। তবে ভাল বৃদ্ধির জন্য অধিক বৃষ্টিপাত প্রয়োজন হয়।

উপযুক্ত নিকাশীযুক্ত বালি মিশ্রিত পলিমাটি শিমূল গাছের পক্ষে উপযুক্ত। উপত্যকা অঞ্চলের ঢালু, অসমান জমিতেও শিমূল গাছ ভাল জন্মায়। সমুদ্রতল থেকে ১২০০ মিটার উঁচু জমিতে শিমূল গাছ জন্মাতে দেখা যায়। মাটির অম্লতা ও ক্ষারীয় মাত্রা ৪.৯ -৭.২

শিমূল চাষের উপযুক্ত। অন্যত্র শিমূল গাছ জন্মালেও মাটির তারতম্য অনুযায়ী শিমূল গাছের বৃদ্ধির ফারাক লক্ষ্য করা যায়।



কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

সাধারণত মার্চ-মে মাসে শিমূল গাছের ফলগুলি ফেটে ৫টি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এরপর বীজগুলি বাতাসে বা ঝড়ে উড়ে গিয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং উপযুক্ত পরিবেশে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে নতুন চারা গাছ জন্ম নেয় এবং শিমূলের স্বাভাবিক প্রসারণ ঘটে থাকে।

মার্চ-মে মাসে পাকা ফলগুলি ফেটে যাওয়ার আগে গাছ থেকে সংগ্রহ করে রোদে শুকনো করলে ফলগুলি ভাগে ভাগে ফেটে যায়। তখন তুলো সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে বীজগুলিও সংগ্রহ করা যায়। ১ কেজি শিমূল বীজে প্রায় ২১ হাজার থেকে ৩৮ হাজার ৫০০টি বীজ পাওয়া যায়। বীজগুলি ভাল করে শুকিয়ে টিনের কৌটো বা ব্যাগে সংগ্রহ করা হয়। ২ বছর পর্যন্ত বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বজায় থাকে। তবে শীঘ্র বপন করতে অঙ্কুরোদ্গমের হার বেশি (১৪-৭৫%) হয়।

প্রথমে জমি প্রস্তুত করে বর্ষার আগে (মে-জুন মাসে) প্রতি সারিতে ৩.৭ X ৩.৭ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে একসঙ্গে ৫-৬টি বীজ এক একটি গর্তে (১-২ সেমি) বপন করে শিমূল চাষ করা যেতে পারে। এছাড়া ৭.৪ X 7.5 মিটার ব্যবধানে সারিতে বপন করে জমিতে সাথী ফসল চাষ করা সম্ভব ।

মে-জুন মাসে নার্সারীর বেডে বা পলিব্যাগে বীজ বপন করে প্রতিদিন ঝাঁঝরির সাহায্যে জল স্প্রে করেও চারা তৈরি করা হয়। উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে চারাগুলি বড় করে ১ বছর পর Stump Planting (৪ সেমি লম্বা কাণ্ড ও ৩০ সেমি লম্বা মূল বিশিষ্ট চারা বা তাঁর stump গুলিকে বর্ষার পর ৩০ X ৩০ সেমি দূরত্বে উপযুক্তভাবে তৈরি করা জমিতে রোপণ করা) করেও শিমূল গাছের চাষ করা যায়। বা ২ বছর পর গোটা চারাটিকেই নির্দিষ্ট জমিতে রোপণ করে শিমূলের কৃত্রিম প্রসারণ ঘটানো যায়।

জমিতে শিমূল গাছ রোপণের ক্ষেত্রে ৬.৭ X ৬.৭ মিটার দূরত্ব বজায় রাখলে প্রতি হেক্টরে ২২৫টি চারা লাগে। তবে ১৩.৪ X ১৩.৪ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে চারা রোপণ করা সবচেয়ে ভাল। কারণ এভাবে রোপণ করলে ওই জমিতে ২-৩ বছর পর্যন্ত অন্য ফসলের চাষ করা সম্ভব।

পরিচর্যা –

জমিতে সরাসরি বীজ বপন করেই হোক বা চারা তৈরি করে রোপণ করেই হোক, শিমূল চাষের জন্য নিয়মিত সেচের প্রয়োজন হয়। বীজ বপনের সময় মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণ আর্দ্রতা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। আর সেই জন্য সেচ দিতে হয়। যদিও বর্ষায় চারা লেগে গেলে (বা শক্তপোক্ত হয়ে বেঁচে থাকলে) সেচ প্রয়োগ সম্পর্কে বিশেষ কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

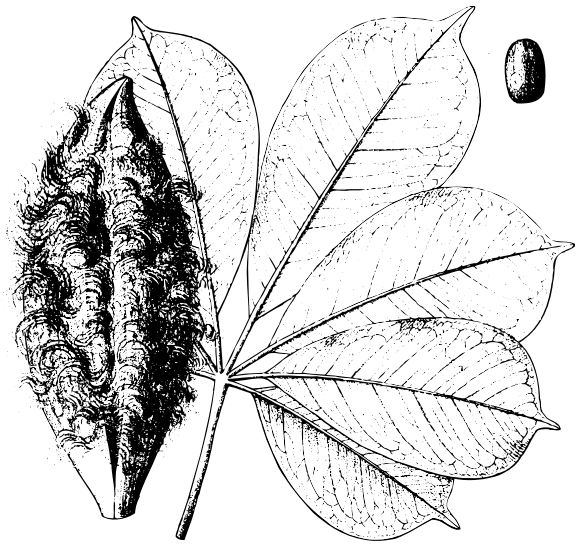
শিমূল চাষের ক্ষেত্রে সার প্রয়োগের তেমন কোনও নজির পাওয়া যায়নি। তবে জৈবসার ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। শিমূল একটি অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া গাছ। তাই রোপণের বা বপনের পর ১-২ বছর গাছের গোড়ার আগাছা পরিষ্কার ও লতাপাতা কেটে সামান্য পরিচর্যাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট। বপনের বা রোপণের পর অতিরিক্ত চারা উপড়ে বা কেটে ফেলে প্রতি হেক্টরে ৫৫টি গাছ রেখে দেওয়া হয়।

Thinning করে ৬.৭ × ৬.৭ মিটার দূরত্বের গাছের শীঘ্র Rotation করে কিছু গাছ কেটে ফেলা হয়। যাতে বাকি গাছগুলি ভালভাবে আলো-বাতাস পেয়ে বেড়ে উঠতে পারে। শিমূল গাছের শাখাগুলি চক্রাকারে কাণ্ডের বিভিন্ন উচ্চতায় জন্মায়। নিচের দিকের ডালগুলি কেটে দিলে গাছটি লম্বায় ভাল বৃদ্ধি পায়।

শিমূল গাছে সাধারণত যে ধরনের রোগপোকার আক্রমণ ঘটে, তা শিমূল গাছ নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতায় প্রতিহত করতে পারে। তাই এক্ষেত্রে কোনও তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব -

পাকিস্তানের পাঞ্জাবের এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির কয়েকজন গবেষক ২০০৩ সালে একটি গবেষণা করেন। বিষয় ছিল, শিমূল গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে শিমূল কাঠের দামের সম্পর্ক। গবেষণায় তাঁরা দেখিয়েছেন যে, ২ বছরে শিমূল গাছের বৃদ্ধি ৪.৪ মিটার এবং ১০ বছরে ১৩.১২ মিটার লম্বা অর্থাৎ ১০ বছরে গাছের ৭৩% বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এরপর ১৫ বছর বয়সের পর থেকে লম্বায়



গাছটি বাড়ে না। ১০ বছর বয়সে শিমূল গাছের কাণ্ডের DBH বা ডায়ামিটার ব্রেস্ট হাইট (DBH) ৪৪.৮৬ সেমি অর্থাৎ ৮৬%। বাকি ১৪% বৃদ্ধি সারা জীবন ধরে অর্থাৎ শিমূল গাছ আর যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিনে হবে। দাম হিসাবে তাঁরা দেখিয়েছেন, ১০ বছরে গাছের DBH ৪৪.৮৬ সেমি হওয়া সত্ত্বেও গাছের কাঠ শুধুই জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তাই দামও খুব কম হয়। ১৩-১৪ বছরে শিমূল গাছের কাণ্ডের DBH ৪৪.৮৬ সেমির বেশি হয়ে যায় এবং গাছটি প্লাইউড কারখানায় আসবাবপত্র তৈরির কাঠ হিসাবে উপযুক্ত হয়ে যায়। এই অবস্থায় প্রতিটি গাছের দাম (২০০৩ সালের হিসাব অনুযায়ী) হয় ৫ হাজার টাকা। অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে ২২৫ × ৫০০০ টাকা = ১১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার ফসল উৎপাদন সম্ভব। বর্তমান বাজার দরে যা কয়েকগুণ বেশি এবং খরচ নিতান্তই কম।

শহরাঞ্চলে কেবলমাত্র Avenue plantation হিসাবে অল্প কিছু শিমূল গাছ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু আগে গ্রামেগঞ্জে প্রচুর শিমূল গাছের দেখা যেত। দেশলাই শিল্পে বা অন্য শিল্পে অতিরিক্ত ব্যবহারে শিমূল গাছ ভীষণভাবে কমে গেছে। তবে এখন দেশলাইয়ের বিকল্প হিসাবে লাইটার ব্যবহার বাড়ায় অনেক শিমূল গাছ রক্ষা পাচ্ছে। তবে প্লাইউড শিল্পে শিমূল কাঠ অতি উত্তম উপাদান। শিমূল তুলো বা সিল্ক শিমূল তুলো বালিশ, কুশন, লেপ তৈরির জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। Airconditioning-এর insulation হিসাবে, Refrigerator এ ব্যবহৃত হয়। জল নিরোধক প্যাকিং-এর কাজে, শব্দ নিরোধক করার কাজে ব্যবহৃত হয়। শিমূল গাছের নরম মূল বলবর্ধক ও মূত্ররোগের ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কলেরা, ফিসচুলা, সর্দিকাশি, পেটের যন্ত্রণায় ও ধ্বজভঙ্গ রোগের চিকিৎসায় এর ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে। এই গাছের কাণ্ডের আঠা Astringent ও Tonic হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই আঠা রক্ত আমাশয়, টিউমার, যক্ষা, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং Menorrhagia রোগ সারাতে ব্যবহৃত হয়। শিমূল গাছের চারা অন্যান্য ভেষজ উদ্ভিদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পাইরিয়া, কার্বাঙ্কল ও Hematochezia রোগ সারাতে ব্যবহৃত হয়। এই গাছের কাণ্ড থেকে এর কাঁটা সংগ্রহ করে ঘষে পেষ্ট বা লেই তৈরি করে মুখের দাগ ও ব্রণ সারাতে ও ত্বকের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। শিমূল গাছের ছাল প্লুরেসী, দাঁতের যন্ত্রণায়, দংশন রোগের চিকিৎসায় অন্য গাছের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। গাছের পাতার রস hypotensive এবং hypoglycaemic শিমূল কাঠের গুঁড়ো অন্ত্রের ঘা, মাড়ির ঘা, সিফিলিস, পোকামাকড়ের কামড়ে যন্ত্রণা উপশমে, অন্য গাছের সঙ্গে মিশিয়ে ওষুধ তৈরির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অতএব ২০০৩ সালের হিসাব অনুযায়ী, প্রতি হেক্টরে শিমূল গাছের চাষ করে ২২৫টি গাছ থেকে ১১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার কাঠ ছাড়াও জ্বালানি ও তুলো পাওয়া যায়। যার বাজারমূল্য হিসাব করলে লাভের অঙ্কটা আরও বেশি হবে।

তাই জঙ্গলের ফাঁকা জমিতে বনবাসী মানুষকে সঙ্গে নিয়ে শিমূল গাছ লাগানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করলে বনভূমির উন্নতির পাশাপাশি ওই পিছিয়ে থাকা মানুষদের আর্থিক লাভও সম্ভব হতে পারে।

এছাড়া বনভূমির বিভিন্ন পাখি, কীটপতঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষা হবে এবং বিভিন্ন গাছপালার মধ্যেকার পরিবেশগত সম্পর্ক বজায় থাকবে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে, বিগত কয়েক বছর ধরে শিমূল গাছের সংখ্যা ভীষণভাবে কমে গেছে। এই গাছের অবলুপ্তির সঙ্গে আবার শকুনের (Vulture) অবলুপ্তিরও সম্পর্ক রয়েছে। তাই শুধু বাণিজ্যিক কারণে নয়, আজ জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে শিমূল গাছ রোপণ করা অত্যন্ত জরুরি।

তথ্যসূত্র - Glossary of Indian medicinal plants, Assessment of credibility of some folk medicinal of claims of B. ceiba



কুসুম

পরিচয় –

কুসুম গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Schleichera oleosa, এটি Sapindaceae গোত্রের বহুবর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী পর্ণমোচী শ্রেণীর বৃক্ষ। এই গাছের অন্য কয়েকটি পরিচিত বিজ্ঞানসম্মত নাম (বা Synonyms) হল, Cussambium oleosum, Pistacia oleosa, Schleichera trijuga কুসুম গাছের গণের (Genus) নামটি Swis bofauist J.C. Schlerihera-এর নামে করা হয়েছে এবং প্রজাতি নামটি Oleosa নামে কুসুম বীজের যে তাল পাওয়া যায়, তার ল্যাটিন শব্দ Oleum অর্থাৎ oil থেকে এসেছে।

কুসুম গাছের আদি জন্মস্থান এশিয়া মহাদেশের উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের দেশগুলিতে। ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশের শুষ্ক-পর্ণমোচী জঙ্গলে ও পর্ণমোচী ও চিরহরিৎ মিশ্র প্রকৃতির জঙ্গলে কুসুম গাছকে জন্মাতে দেখা যায়। আমাদের দেশের হিমালয় পর্বতের পাদদেশে সুতলেজ নদী থেকে ছোটনাগপুর পর্বতের পার্বত্য অঞ্চলের ঝাড়খন্ড, বিহার, ছত্রিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশে কুসুম গাছ জন্মায়। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অরণ্যে বিচ্ছিন্নভাবে কুসুম গাছ জন্মাতে দেখা যায়।

ইংরেজিতে কুসুম গাছকে Ceylon oak বা Lac tree বা Gum lac tree বলা হয়ে থাকে। হিন্দি ও বাংলায় কুসুম, মারাঠী ও গুজরাটিতে কুসুম্ব, তামিল ভাষায় কুম্বাডিরি, মালায়লমে কুট্টিলাই, কন্নড়ে ক্যাকোটা এবং তেলেগু ভাষায় পুস্কু, বুসী, কোমাঙ্গী প্রভৃতি নামে নামে ডাকা হয়।

কুসুম ৩০ মিটার পর্যন্ত উচ্চতার একটি বড় গাছ। এই গাছের মোটা গোড়া থেকে হালকা আকারের root buttress বের হয়। যেগুলি কাণ্ডের বেড়ের উপর পর্যন্ত প্রসারিত থাকে। কুসুম গাছের পাতা অচূড়পক্ষল যৌগিক প্রকৃতির। পত্রাক্ষটি ২০-৪০ সেমি পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। পত্রাক্ষে ২-৩ জোড়া উপপত্র থাকে। তবে ৪ জোড়া পাতাও দেখা যায়। লম্বা-চওড়ায় পাতাগুলি ২.৫-২৫ X ২-১০ সেমি হতে পারে। পাতাগুলি একান্তরভাবে শাখাপ্রশাখায় সজ্জিত থাকে। উপপত্রগুলি পত্রাক্ষের উপর বিপরীতমুখী হয়ে সজ্জিত থাকে। পাতাগুলির নীচের দিকের উপপত্রগুলি আকারে ছোট হয়। পত্রাক্ষের উপরের বা প্রান্তীয় উপপত্র জোড়াটি সব থেকে বড় আকারের হয়ে থাকে। পাতাগুলি আয়তকার-উপবৃত্তাকার পত্রাগ্র বা কিছুটা গোলাকার বা কিছুটা সূঁচালো হতে পারে। পাতাগুলি পুরু, মসৃণ বা অল্প রোমযুক্ত হয়। পাতার কিনারা সমান ঢেউ খেলানো বা অল্প খাঁজকাটা হতে পারে। পাতাগুলি প্রায় বৃন্তহীন হয়ে থাকে। পাতার শিরাবিন্যাস সুস্পষ্ট। শীতকালে এই গাছের পাতা ঝরে পড়ে। বসন্তকালে গাছ লাল রঙের কচি পাতায় ভরে যায়। পাতার এই অপরূপ সৌন্দর্য্যের জন্য রাস্তার ধারের শোভা বর্দ্ধনের জন্য কুসুম গাছ রোপণ করা হয়। কুসুম গাছের ফুলগুলি হলদেটে সবুজ রঙের হয়। পাতার কক্ষ থেকে অল্প শাখাযুক্ত পুষ্পমঞ্জরীটি জন্মায়। পুষ্পমঞ্জরীটি ৫-১০ সেমি লম্বা হয়ে থাকে। ফুলের বৃতি খুব ছোট, পাপড়ি থাকে না। ফলগুলি কিছুটা গোলাকার বা ডিম্বাকার বেরী জাতীয়। ফল খুব শক্ত কাঁটাযুক্ত হয়ে থাকে, আয়তনে ১৫ X ১৩ মিলিমিটার হয় এবং ফলে একটি মাত্র বীজ থাকে। এর বীজ কিছুটা গোলাকার। ১২ X ১০ মিলিমিটার আকারের হয়। মার্চ মাসে বা বসন্তকালে নতুন পাতার সঙ্গেই ফুল জন্মায় এবং জুলাই-অগাষ্ট মাসে ফল পাকে।

কুসুম গাছ শুষ্ক জলবায়ুতে ভাল জন্মায়। একে শুষ্ক-চিরহরিৎ-পর্ণমোচী উভয় প্রকার বৃক্ষের মিশ্রিত অরণ্যে জন্মাতে দেখা যায়। ৯০০-১২০০ মিটার উচ্চভূমিতে কুসুম গাছ দেখতে পাওয়া যায়। কখনও আবার স্যাঁতস্যাঁতে আর্দ্র জঙ্গলে এই গাছ জন্মাতে পারে। ৭৫০-২৮০০ মিলিমিটার বার্ষিক বৃষ্টিপাত এবং ৩৫-৪৭.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা কুসুম চাষের জন্য উপযুক্ত।

ভাল নিকাশীযুক্ত পাথুরে মাটি বা কাঁকর মিশ্রিত দোঁয়াশ মাটি বা অল্প অম্ল মাটি কুসুম চাষের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

কুসুমের বীজই নতুন চারা তৈরির প্রধান উৎস। বীজ সংগ্রহ করে তাড়াতাড়ি বপন করলে অঙ্কুরোদ্গমের হার অনেক বেশি হয়। বীজ সংগ্রহ করে শুকিয়ে বাতাস-নিরোধকভাবে সংরক্ষণ করলে ১-২ বছর পর্যন্ত বীজগুলিকে সক্রিয় রাখা যায়। দ্রুত বীজের অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই নার্সারীতে উপযুক্ত পরিচর্যায় হেজ বেডে সারিবদ্ধভাবে বপন করে চারাগাছ তৈরি করা হয়। হেজ বেডে উপযুক্ত পরিচর্যায় ১ বছরের চারাগাছের উচ্চতা ৭৭.৪ সেমি পর্যন্ত হতে পারে। বীজ ছাড়াও root suckers থেকে কুসুম গাছের স্বাভাবিক প্রসারণ ঘটে থাকে।



কুসুম গাছের যথেষ্ট পরিমাণ উপযুক্ত পরিণত বীজের অভাব রয়েছে। তাই কৃত্রিমভাবে অঙ্গজ জনন পদ্ধতিতে ক্লোন তৈরি, কাটিং-এর দ্বারা কলমের গাছ তৈরি করে কুসুম গাছের প্রসারণ ঘটানো হয়ে থাকে। অঙ্গজ জনন পদ্ধতিতে কুসুম গাছের কাটিং-এর চারাগাছ তৈরি করার জন্য ১.৮ মিটার লম্বা X ১ মিটার চওড়া এবং ৬০ সেমি উচ্চতাযুক্ত কাঠের ফ্রেম (Propagator) তৈরি করে তার মধ্যে ১০ সেমি পুরু ভিজে কাঠের গুঁড়ো, কাঁকর মিশিয়ে কাটিং-এর রোপণের জন্য উপযুক্ত করে তৈরি করা হয়। স্বচ্ছ প্লাস্টিক দিয়ে টানটান করে Propagator-এর খোলা দিকটা ঢেকে দেওয়া হয়। এর তাপমাত্রা ২৬-৩৫.৪ ডিগ্রী সেলসিয়াসে এবং আর্দ্রতা ৮৫-৯০% মধ্যে রাখা হয়। সকালে ও সন্ধেবেলা Propagator-এর প্লাস্টিকের ছাউনি খুলে ভিতরের গ্যাস বা বাতাস বের করে দেওয়া হয়। বীজের তৈরি হেজ বেড-এর ১-১.৫ বছরের চারাগাছের কচি ডাল সংগ্রহ করে ১০-১২ সেমি লম্বা ডালগুলির পাতা ছেঁটে দিয়ে জলভর্তি পাত্রের মধ্যে রাখা হয়। এরপর IBA বা ইন্ডোল বিউটারিক আসিড বা ইরমোন ডিস্টিল ওয়াটারে মিশিয়ে বিভিন্ন মাত্রায় প্রয়োগ করে (১০০০ PPM, ২০০ PPM, ৪০০ PPM, ৬০০ PPM, ২৮০০ PPM IBM দ্রবণের) Propagator-এ রোপণ করা হয়। কাটিং থেকে শিকড় উৎপন্ন হয়ে কলমের চারাগাছ তৈরি হতে ১-৬ মাস সময় লাগতে পারে। পর্যাপ্ত পরিমাণ শিকড় উৎপন্ন হলে জৈবসার যুক্ত মাটি ৩:১ অনুপাতে মিশিয়ে মাটি তৈরি করে ২৫ X ১৫ সেমি মাপের পলিব্যাগে কাটিংগুলি স্থানান্তরিত করা হয় এবং নার্সারীর মধ্যে পরিচর্যায় বড় করে তোলা হয়।

এক বছরের পর থেকে প্রস্তুত করা নির্দিষ্ট জমিতে চারাগাছগুলি রোপণের উপযুক্ত হয়ে যায়। জমিতে সাধারণত ৩০ সেমি আয়তনের গর্ত করে চারাগাছগুলি রোপণ করা হয়।

পরিচর্যা –

কুসুম গাছের ক্ষেত্রে নিয়ম করে আগাছা দমন, সেচ বা সার প্রয়োগ ইত্যাদি বিভিন্ন স্বাভাবিক পরিচর্যা করতে হয়। যদিও এই সংক্রান্ত নির্দিষ্ট কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে বছরে দু'বার লাক্ষা সংগ্রহের সময় ডাল ছাঁটায়ের কাজটি হয়ে যায়।

যদিও বিভিন্ন লাক্ষা কীটই কুসুম গাছের প্রধান ক্ষতিকারক পোকা। কিন্তু এই কীট গাছের ক্ষতি করলেও মানুষ তার অর্থনৈতিক লাভের কথা মাথায় রেখে তারা গাছে আরও বেশি বেশি করে এর আক্রমণ ঘটানোর ব্যবস্থা করে। যাতে বেশি মাত্রায় লাক্ষা বা গালা সংগ্রহ করা যায়। এছাড়া কুসুম গাছে ছত্রাক আক্রমণের কারণে ধসা এবং Yellow cork rot রোগ দেখা যায়। সাধারণভাবে ওষুধ প্রয়োগ করেই কুসুম গাছের রোগপোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। প্রয়োজনে বন দফতরের পরামর্শ নেওয়া হয়।

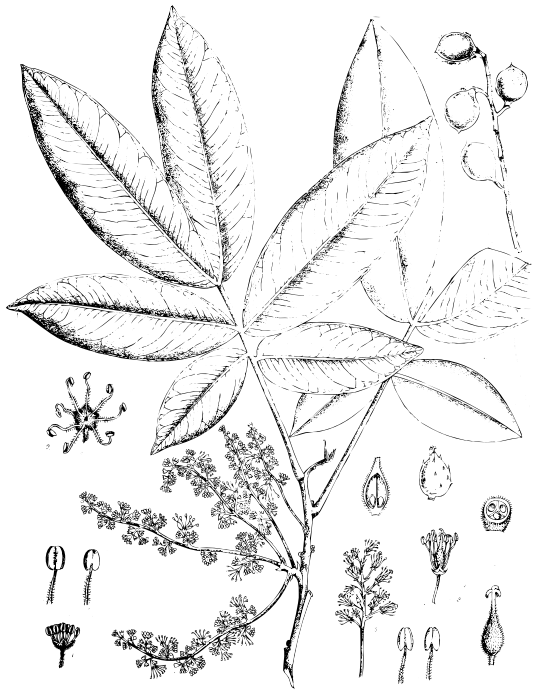
ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

কুসুম গাছের বহুমুখী ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও খুব একটা জনপ্রিয় অর্থনৈতিক উদ্ভিদ হিসাবে পরিগণিত হয়নি। কুসুম গাছের ছাল এবং কাণ্ড থেকে একপ্রকার রাসায়নিক পর্দাথ পাওয়া যায়, যা ক্যানসার রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম বলে দাবি করেছেন একদল গবেষক। দেশ-বিদেশের একদল গবেষকের গবেষণায় জানা গেছে, শ্রীলঙ্কার কুসুম গাছের ছাল ও কাণ্ড থেকে যে রস পাওয়া যায় তা ৭ ধরনের ক্যানসার কোষকে পৃথক করতে পারে। যা ক্যানসার কোষের বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ক্যানসার প্রতিরোধে কুসুম গাছের উপকারিতার কথা জানা গেছে Medicinal Chemistry Research-এর গবেষণাতেও। এক্ষেত্রে বলা হয়েছে, কুসুম গাছের ছাল থেকে যে মেন্থল নিষ্কাশন করা গেছে তাতে ক্যানসার প্রতিরোধের ক্ষমতা রয়েছে।

কুসুম গাছের বীজে ৬০-৭০% তেল থাকে। যা কুসুম তেল নামে পরিচিত। এই তেল কেশ বিন্যাসের জন্য এবং শরীরকে ঠাণ্ডা রাখতে গায়ে মেখে চান করা হয়। ম্যাসাজ অয়েলও কুসুম বীজ থেকে পাওয়া যায়।

এই তেল সাধারণত শিল্পের কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন বস্ত্রশিল্পে বাটিকের কাজে ও সাবান তৈরিতে। কুসুম গাছের ছাল থেকে যে ট্যানিন উৎপন্ন হয় তা চর্মশিল্পে ও রং তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

এই গাছের কাঠ খুব শক্ত ও মজবুত, গোলাপী বা লালচে রঙের হয়। এই কাঠ জলের মধ্যে বেশিদিন টেকসই থাকতে পারে। তাই নৌকা বা জাহাজে এই কাঠ ব্যবহার করা যায়। গরুর গাড়ি চাকা, লাঙল, ঘানি কলের মুষল, চিনি কলের রোলার তৈরিতেও এই কাঠ উপযুক্ত। জ্বালানী হিসাবে ও চারকোল তৈরির পক্ষে এই কাঠ খুব ভাল।



কুসুম বীজের খোল (Oil Cake) গবাদি পশুর পুষ্টি বৃদ্ধি করতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বীজের গুঁড়ো গবাদি পশুর ঘায়ে প্রলেপ হিসাবে লাগিয়ে দিলে ওই জায়গায় মাছি বসতে পারে না এবং শীঘ্রই ঘা শুকিয়ে যায়। বহুকাল থেকেই ঘরোয়া চিকিৎসার অঙ্গ হিসাবে চর্মরোগে, আলসার ও কার্টিলেজের সমস্যায় কুসুম গাছের ছাল ও বীজের তেল ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

কুসুম গাছের উপর গবেষণা ইতিমধ্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঔষধিগুণের সন্ধান মিলেছে। ভবিষ্যতে হয়তো গবেষণায় আরও বহু দূরারোগ্য রোগের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে কুসুম গাছ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঔষধিগুণ সম্পন্ন বৃক্ষ রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে।

বহুদিন থেকেই লাক্ষা বা গালা শিল্পের সঙ্গে লাক্ষা কীটের অন্যতম আশ্রয়দাতা বৃক্ষ হিসাবে কুসুম গাছ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ভারতের আদিবাসী অধ্যুষিত বনভূমিতে লাক্ষাকেন্দ্রিক যে শিল্প গড়ে উঠেছে এবং তার ফলে গরিব মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কুসুম গাছের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কাঠের উপর পালিশ করার জন্য এবং রং শিল্পের জন্য গালা একটি মূল্যবান উপাদান।

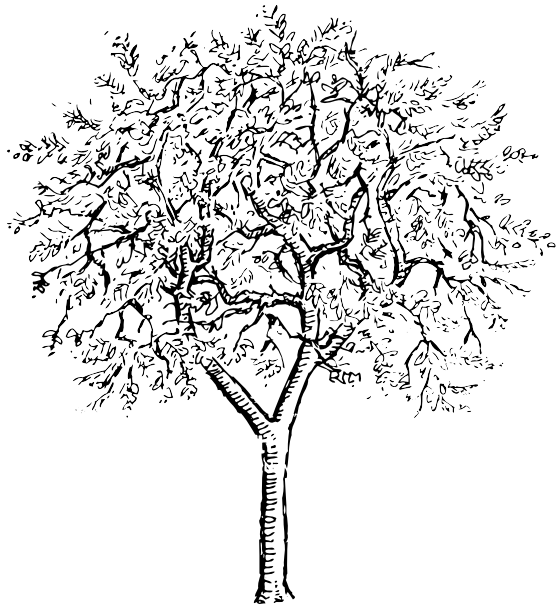
কুল, মহুয়া, কুসুম ছাড়াও আরও অনেক গাছে লাক্ষা কীট বা কেরী লাক্ষা নামে পতঙ্গ বাসা বাঁধে। এই পতঙ্গটি দুই জাতের হয়, যেমন কুসুমীজাত ও রঙ্গিনীজাত। এরা বছরে দু'বার গালা উৎপন্ন করে। রঙ্গিনীজাত বৈশাখে বৈশাখী ও বর্ষাতে কটকী নামে এবং কুসুমী জাতের পতঙ্গ গ্রীষ্মে জেথুই ও শীতে আঘানী নামের গালা উৎপাদন করে।

ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার আদিবাসী জনজাতীর বা অরণ্যের অন্যান্য গরিব মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রকল্পের সূচনা করেছে। ২০০৪-২০০৫ সাল থেকে স্থানীয় পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ, বন দফতর, বিভিন্ন প্রকার সমবায়ের সঙ্গে বনভূমির বাসিন্দাদের যুক্ত করে এই সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা শুরু করেছে।

বনাঞ্চলের আদিবাদীদের এই কর্মযজ্ঞের ভাগীদার বা অংশীদার করে Self helf group (SHG) বা ১০০ দিনের কাজের (MGNREGS) শ্রমিকদের এই কাজে যুক্ত করা হয়েছে এবং গালা সংগ্রহকারী কৃষকদের ফড়েদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করারও বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

কুসুম গাছ ছায়াদান করে প্রকৃতিকে সুন্দর করে তোলে। ভারতে বছরে প্রায় ২০ হাজার টন গালা উৎপন্ন হয়। এরমধ্যে ৭৫% গালাই বিদেশে রফতানি করে ১৩.৩৭ লক্ষ টাকা উপার্জন করা সম্ভব হয়েছে। দেশের বনাঞ্চলের ৩-৪ মিলিয়ান (৩০-৪০ লক্ষ) মানুষের জীবিকা লাক্ষা চাষের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং লাক্ষা একটি বিদেশি মুদ্রা অর্জনকারী বাণিজ্যিক সামগ্রী এবং তাই এরজন্য আরও বেশি করে কুসুম গাছের বিস্তারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা খুবই জরুরি।

তথ্যসূত্র - nopr.niscair.res.in/scair.res.in/bitatream/123456789/7435/1/SR% 2047%282%29%2020-22pdf SR47(2)20-22pdf-NOPR



অর্জুন

পরিচয় –

অর্জুন গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Terminalia arjuna, এটি Combretaceae গোত্রের দ্বিবীজপত্রী বহুবর্ষজীবী শ্রেণীর বৃক্ষ।

ভারতই অর্জুন গাছের আদি জন্মস্থান। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, মধ্য ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রচুর পরিমাণে অর্জুন গাছ দেখা যায়। যদিও আমাদের দেশের বেশিরভাগ রাজ্যেই অর্জুন গাছ জন্মাতে দেখা যায়। ভারত ছাড়া শ্রীলঙ্কা, চিন, কিউবা, ঘানা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, নেপাল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং থাইল্যান্ডে অর্জুন গাছ জন্মায়।

সংস্কৃত, হিন্দি ও বাংলা ভাষায় এই গাছকে অর্জুন, গুজরাটিতে অর্জুনাসাদরা, পাঞ্জাবীতে অর্জন, তামিলে মারউদু, তেলেগুতে তেল্লামাড্ডি এবং মালায়লমে ভেল্লামারুতু নামে পরিচিত।

অর্জুন গাছ একটি বিশাল আকৃতির বৃক্ষ। গাছটি উচ্চতায় কম-বেশি ৩০ মিটার পর্যন্ত এবং কাণ্ডের বেড় ২-২.৫ মিটার হতে পারে। গাছের গোড়ার থেকে অনেকটা দূর পর্যন্ত Root Buttreffed গুলি প্রসারিত হয়ে কাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। গাছের চূড়াটি অনেকটা জায়গাজুড়ে বিস্তৃত থাকে। ডালগুলি নিচের দিকে কিছুটা ঝুকে বর্ধিত হয়। গাছের ছাল ধূসর, গোলাপী-সবুজ, মসৃণ এবং পুরু হয়। অর্জুন গাছের পাতা সরল বিপরীত বা কিছুটা বিপরীতমুখী হয়ে শাখাপ্রশাখায় সজ্জিত থাকে। পাতাগুলি লম্বা-চওড়ায় ৫-২৫ X ৪-৯ সেমি হতে পারে। পাতাগুলি আয়তকার, আয়ত-উপবৃত্তাকার, রোমহীন, শক্ত হয়। পাতার কিনারা মসৃণ বা অল্প খাঁজকাটা হতে পারে। পাতা নীচের দিক গোলাকার বা কর্ডেট। পাতার অগ্রপ্রান্ত গোলাকার বা কিছুটা সূঁচালো হয়ে থাকে। পাতার বৃন্ত বা বোঁটা ২-৪ সেমি লম্বা গ্রন্থি থাকে। ফুলগুলি পাতার কক্ষ থেকে উৎপন্ন হয়ে সরল মঞ্জরীদণ্ডের উপর বা শাখাযুক্ত মঞ্জরীদণ্ডের উপর সজ্জিত থাকে। মঞ্জরীদণ্ডটি ৯-১৩ সেমি লম্বা এবং এর শাখাগুলি ২.৫-৬ সেমি লম্বা হতে পারে। ফুলগুলি ছোট সাদা বা ক্রিম বা সবুজাভ-সাদা রঙের হয়ে থাকে। ফুলে মিষ্টি গন্ধ থাকে। ফুলের মধ্যে অসংখ্য সাদা, ক্রিম বা সবুজাভ-সাদা রঙের পুংকেশরগুলিকে দেখা যায়। ফলগুলিকে আঠাল, শক্ত। ২.৫-৬ X ১.৮–২.৮ সেমি লম্বা এবং ৫-৭টি শক্ত ও সরু ডানাযুক্ত (Wing) হয়। ফলগুলি লালচে বাদামি রঙের হয়ে থাকে। বীজ ফলের মধ্যেই থাকে, অর্থাৎ বিদারিত হয় না। ফল ড্রুপ প্রকৃতির। অর্জুন গাছে এপ্রিল-মে মাসে ফুল আসে এবং ফল পরিণত হতে প্রায় এক বছর সময় লেগে যায়। ফেব্রুয়ারি-মে মাসে গাছে পরিণত ফল থাকতে দেখা যায়।

অর্জুন গাছ উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে জন্মায়। সমুদ্রতল থেকে ১২০০ মিটার উচ্চভূমিতে অর্জুন গাছ জন্মাতে দেখা যায়। ৭৫০-১৯০০ মিলিমিটার গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত এবং ২০-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা অর্জুন গাছের পক্ষে উপযুক্ত।

উর্বর নিকাশীযুক্ত পলিমাটি, দোঁয়াশ মাটি এবং আর্দ্রতাযুক্ত নিরপেক্ষ মাটিতে অর্জুন গাছ ভাল জন্মায়। মাটির অম্ল ও ক্ষারীয় মাত্রা ৬.৫-৭.০ PH অর্জুন গাছের পক্ষে উপযুক্ত।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

বীজের দ্বারাই অর্জুন গাছের প্রসারণ হয়ে থাকে। কৃত্রিমভাবে অর্জুন গাছের প্রসারণের জন্য পরিণত ফল সংগ্রহ বা গত বছরের ফল সংগ্রহ করে সেই ফল ফাটিয়ে ফল থেকে বীজ বের করতে হয়। ১ কেজি পরিমাণ অর্জুন বীজে ৭৭৫-৮০০ টি বীজ থাকে। বীজগুলিকে ৩৬ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে নার্সারীতে জৈব পদার্থ ও বালি মিশ্রিত সিড বেডে ৭.৫ X ৮.৫ সেমি দূরত্বে লাইন করে বপন করা হয় বা বীজ বসানো হয়। নিয়মিত জল প্রয়োগ ও সিড বেড বা বীজতলার আগাছা পরিষ্কার করে পরিচর্যা করলে ৫০-৭০ দিন পর চারাগাছ জন্মাতে থাকে। অর্জুন বীজের অঙ্কুরোদ্গমের হার ৫০-৬০%, অঙ্কুরিত চারাগাছগুলি নিয়মিত পরিচর্যায় ২-৩ মাসের মধ্যে নির্দিষ্ট জমিতে রোপণের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। পলিথিনের ব্যাগে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঘটিয়ে চারাগাছ তৈরি করলে তা অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক হয় এবং রোপণের পর চারাগাছের মৃত্যুর হার অনেক কম হয়।

অর্জুন গাছ রোপণের জন্য জমিতে লাঙল বা ট্র্যাক্টর দিয়ে মাটি প্রস্তুত করা হয়। তারপর আগাছা ও ঝোপঝাড় পরিস্কার করে জৈবসার (FYM) প্রয়োগ করে বর্ষার আগেই জমি প্রস্তুত করে ফেলা হয়।

সাধারণত ৬ X ৬ মিটার দূরত্বের ব্যবধানে অর্জুন গাছের চারা রোপণ করা হয়। তাই জমি প্রস্তুতির পর নির্দিষ্ট দূরত্বে ৬০ X ৬০ X ৬০ সেমি আয়তনের গর্ত করে প্রতি গর্তে ৫ কেজি জৈবসার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে রাখা হয়। বর্ষার শুরুতে নির্দিষ্ট গর্তের

মাঝখানে চারাগাছগুলি সোজাভাবে রোপণ করা হয়। গাছের গোড়ায় যাতে জল না জমে থাকে তার জন্য মাটি দিয়ে গাছের গোড়া উঁচু করে দেওয়া হয়। এইরকম দূরত্ব বজায় রেখে রোপণ করলে প্রতি হেক্টর জমির জন্য ২৭৫টি চারা গাছের প্রয়োজন হয়ে থাকে।



পরিচর্যা –

চারাগাছ রোপণের পর নিয়মিত জল দেওয়ার প্রয়োজন হয়। রোপণের পর থেকে ২-৩ বছর পর্যন্ত প্রয়োজন অনুসারে শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে সেচ দেওয়া হয়।

অর্জুন গাছ চাষে সার প্রয়োগের কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। তাই মাটির উর্বরতা বিচার করে এবং বন দফতর বা কৃষি দফতরের পরামর্শ অনুযায়ী সার প্রয়োগ করতে হবে। তবে গাছের বৃদ্ধির জন্য জৈবসার (FYM) প্রয়োগ করা হয়।

অর্জুন গাছ প্রথম অবস্থায় ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। গাছের চারপাশের আগাছা পরিষ্কার না করলে গাছের বৃদ্ধি আরও কমে যায়। তাই প্রয়োজন মতো কোদালের সাহায্যে মাটি কুপিয়ে আগাছা দমন ও একই সঙ্গে মিশ্রভাবে শিম্বগোত্রের ডাল জাতীয় শস্যের চাষ করা যেতে পারে। যদিও এই পদ্ধতিরও সঠিক কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

ছোট অবস্থায় অর্জুন গাছের চারাগুলি যাতে সোজাভাবে বেড়ে ওঠে তারজন্য ৩-৪ বছর বয়সের চারাগাছের নীচের দিকের ডালগুলি ছাঁটাই করে গাছটিকে লম্বায় বড় করে তোলার জন্য ছাঁটাই করা হয়।

বর্ষাকালে অর্জুন গাছের পাতায় সাদা পাউডারের (পাউডারি মিলডিউ) আস্তরণ দেখা যায়। এটি একপ্রকার ছত্রাকঘটির রোগ যা গাছের প্রচুর ক্ষতি করে। এই রোগের প্রকোপ সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই রোগ প্রতিরোধের জন্য Karthen (Wet Sulphur) ০.১% স্প্রে করা যেতে পারে। ৫০০-৭০০ গ্রাম Karthen ৫০০-৭০০ লিটার জলে গুলে স্প্রে করলে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

এছাড়া অর্জুন গাছের পাতা ও কাণ্ডের ক্ষতিকারক কিছু কীটপতঙ্গের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। নিমজাতীয় জৈব কীটনাশক প্রয়োগ করে তা প্রতিরোধ করা হয়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

প্রধানত কাঠ বা ছাল সংগ্রহ করার জন্য অর্জুন গাছের চাষ করা হয়। ৬-৭ বছর বয়সের গাছে ফুল-ফল ধরে, কিন্তু গাছের ছাল সংগ্রহের জন্য ১৫ বছর বয়সের গাছই উপযুক্ত। এপ্রিল ও মে মাসে শুষ্ক আবহাওয়ায় কেবলমাত্র গাছের পুরু ছাল কাণ্ডের ৩ মিটার উচ্চতা ছুরি দিয়ে কেটে সংগ্রহ করা হয়। ৩০ বছরের পুরনো গাছের মোটা ডাল থেকেও ছাল সংগ্রহ করা হয়। কাণ্ডের বেড়ের উপর ১০ সেমি চওড়া ফাঁক রেখে ৩ মিটার লম্বা ও ১০ সেমি চওড়া মাপের ছাল কেটে নেওয়া হয়। পরের বছর রেখে দেওয়া পুরনো ছালটি কাটা হয়। গাছের ছাল কেটে নেওয়ার পর মাটি ও গোবর মিশ্রিত প্রলেপ কাটা অংশে দিলে গাছের ক্ষত শুকিয়ে যায় এবং ক্ষতি কম হয়।

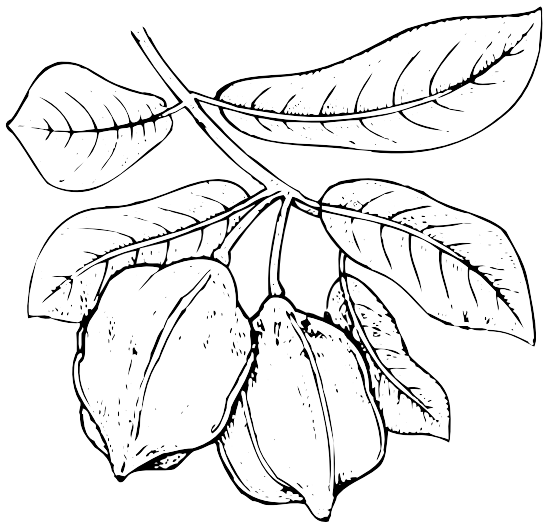
পূর্ণবয়স্ক একটি অর্জুন গাছ থেকে ১৫-২০ কেজি শুকনো অর্জুন ছাল পাওয়া যায়। ২৫-৩০ বছর পর্যন্ত অর্জুন গাছের ছালের উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

প্রাচীনকাল থেকেই ঔষধি-গুণের জন্য অর্জুন গাছের বিভিন্ন আর্য়ুবেদিক চিকিৎসায় অর্জুন গাছের ব্যবহার হয়ে আসছে। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের ভাগবত গ্রন্থে হার্টের চিকিৎসায় এই গাছের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া গেছে। প্রাচীন অষ্টাঙ্গ হ্রিদায়ম গ্রন্থে এবং প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে হার্টের চিকিৎসার জন্য অর্জুন গাছের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারত মহাকাব্যের নায়ক অর্জুনের নামে এই উপকারী ঔষধি গাছটির নামকরণ করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে অর্জুন গাছের ব্যবহারের দ্বারা জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হতে বা সিদ্ধিলাভের জন্য এর ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে।

আজও হার্টের নানান রকম সমস্যায়, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা ঠিক রাখতে, মূত্ররোগ, স্ত্রীরোগ, আলসার, গনোরিয়া প্রভৃতির চিকিৎসায় এই গাছ ব্যবহৃত হয়। গাছের পাতা ও ছালের রস দিয়ে নানা রকম ব্যাকটেরিয়া ও কৃমিনাশ করতে ব্যবহার করা হয়।

অর্জুন গাছের কাঠ খুব শক্ত, পাকা, গাঢ় বাদামী রঙের হয়। এই কাঠ স্থায়ীভাবে গরুর গাড়ির কাঠামো, নৌকা, বাড়ির দরজা-জানালার

ফ্রেম, চাষের যন্ত্রপাতি এবং মণ্ড তৈরিতে করতে ব্যবহৃত হয়।



অর্জুন গাছের ছালের মধ্যে ২০-২০% ট্যানিন থাকে, যা চর্মশিল্পে এবং রং শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী।

রাস্তার ধারে ছায়াদানের জন্য, চা ও কফি বাগানের ছায়াদানকারী গাছ হিসাবে এবং বনসৃজনের জন্য অর্জুন গাছ রোপণ করা হয়। তসর সিল্কের পোকার বা কীটের আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ হিসাবে অর্জুন গাছ ব্যবহৃত হয়। ভূমিক্ষয় রোধ করতে খালবিল নদীর পাড়ে অর্জুন গাছ রোপণ করা হয়।

৬০ বছর বয়স পর্যন্ত অর্জুন গাছের ফসল উৎপাদন ক্ষমতা অক্ষুন্ন থাকে। প্রতি হেক্টর জমিতে যদি ২৭৫টি উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন গাছ থাকে তবে প্রতি হেক্টর জমির ক্ষেত্রে জমি প্রস্তুতি, চারাগাছের দাম, চারাগাছ রোপণের খরচ, জৈবসারের দাম ইত্যাদি হিসাব ধরে মোট ২৫,০০০ টাকা খরচ ধরা যেতে পারে। ১৫ বছর ধরে নিয়মিত পরিচর্যার জন্য আরও ১৫,০০০ টাকা খরচ ধরলে সর্বমোট খরচ দাঁড়ায় ৪০,০০০/- টাকা।

১৫ বছর পর থেকে প্রতি গাছের গড় ছাল উৎপাদন ১৫-১৬ কেজি ধরলে প্রতি হেক্টরে মোট ছাল উৎপাদন ২৭৫টি গাছ X ১৫ কেজি অর্থাৎ ৪,১২৫ কেজি বা ২৭৫টি গাছ X ১৬ কেজি অর্থাৎ ৪,৪০০ কেজি ছাল হতে পারে।

প্রতি কেজি ছালের দাম যদি ৫০ টাকা ধরা হয়, তবে গাছের ছাল বিক্রি করে ৪,১২৫ কেজি X ৫০ টাকা অর্থাৎ ২,০৬,২৫০/- টাকা বা ৪,৪০০ কেজি X ৫০ টাকা অর্থাৎ ২,২২,০০০/- টাকা।

দু'ক্ষেত্রে সব খরচ বাদ দিয়ে প্রতি হেক্টর জমি থেকে ২,০৬,২৫০ – ৪০,০০০ = ১,৬৬,২৫০/-টাকা থেকে ২,২২,০০০ – ৪০,০০০ = ১,৮২,০০০/- টাকা লাভ করা সম্ভব।

তথ্যসূত্র - http://www.worldagroforestry.org/sites/treedbs/treedatabases.asp,wikipedia



শীতল পাটি

পরিচয় –

শীতল পাটি যে গাছ থেকে হয় তার নাম মূর্তা। এই গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Schumannianthus dichotomus, এটি Marantaceae গোত্রের রাইজোম উৎপাদনকারী একটি বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। Schumannianthus গণের দুটি প্রজাতি রয়েছে।

মূর্তার উৎপত্তি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। মালয় দীপপুঞ্জ, ফিলিপাইনস্, বাংলাদেশে এই গাছের চাষ হয়। আমাদের দেশের আসাম ও পশ্চিমবঙ্গেও মূর্তার চাষ করা হয়।

এই উদ্ভিদটি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন স্থানীয় নামে পরিচিত। ভারতের আসামে একে বলা হয় পাটিদল। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এই গাছটিকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। যেমন চট্টগ্রামে এর নাম পাটিপাতা ও পাটিজং, আবার নোয়াখালিতে মোশতাক, সিলেট এবং টাঙ্গাইলে পাটিবেত ও মূর্তা এবং বরিশালে একে পাইত্রা বলা হয়।

মূর্তা গাছটিকে দেখতে অনেকটাই বাঁশের মতো। তবে এটি বাঁশের মতো শক্ত হয় না। গাছটি লম্বায় ৩-৫ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। গাছের ব্যাসার্ধ ২-৩ সেন্টিমিটার। এর শাখাগুলি দ্বিদলীয়, পাতাগুলি আয়তকার আকারের হয় এবং লম্বায় ১২-১৫ সেমি ও ৫-৮ সেমি প্রশস্ত। অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে মূর্তা গাছে ফুল আসে। এর ফুলগুলি দেখতে সাদা রঙের হয়।

সাধারণত ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে এই গাছ ভাল জন্মায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও মূর্তার গাছ ভালভাবেই বাড়তে পারে। তবে প্রথম কয়েকবছর মূর্তা চাষের জমিটি ছায়াই থাকলে ভাল হয়।

সাধারণত জলবদ্ধ জমি বা তার সংলগ্ন জায়গা, যেখানে পলি জমে এমন মাটিতে এই গাছ জন্মায়। দোয়াঁশ, এঁটেল-দোয়াঁশ মাটিতে মূর্তা চাষ ভাল হয়। তবে আর্দ্র ও স্যাঁতস্যাঁতে জায়গা এবং কাদামাটি এই গাছের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

সাধারণত অঙ্গজ জনন, বিশেষ করে রাইজোমের মাধ্যমে মূর্তা গাছের কৃত্রিম প্রসারণ ঘটানো হয়ে থাকে। এছাড়া কাণ্ডের কাটিং করেও এই প্রসারণ করা যেতে পারে। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে বীজের মাধ্যমে মূর্তা গাছের বংশবিস্তার হয়।

প্রতি বছর জুন-জুলাই মাসে রাইজোমের মাধ্যমে নতুন চারা গাছ তৈরি করা হয়। জুন-সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত জমিতে এই রাইজোম বা কাটিং রোপণ করা যায়।

রাইজোম বা ডালের কাটিং রোপণের আগে জমিতে ২০ সেমি গভীর ও ১৫ সেমি চওড়া গর্ত করে নিতে হয়। প্রতি গর্তে ৩ কেজি পচা গোবর, ২০ গ্রাম টি.এস.পি. ও ২০ গ্রাম এম. .পি. সার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ১৫ দিন ফেলে রাখতে হয়। তারপর ওই গর্তে রোপণের পর গোড়টা ভাল করে মাটি দিয়ে চেপে দিতে হয়।

রোপণের সময় সারি থেকে সারির দূরত্ব ৮০-১০০ সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৬০-৭০ সেমি বজায় রাখতে হয়।

পরিচর্যা –

মূর্তা চাষে তেমন কোনও পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না। তবে এক্ষেত্রে সব সময় জমির স্যাঁতস্যাঁতে অবস্থা বজায় রাখাটা জরুরি। আর এই পরিবেশ বজায় থাকলে আলাদা করে সেচ প্রয়োগের প্রয়োজন খুব একটা হয় না।

প্রতি বছর শীতকালে জৈবসার, ইউরিয়া, টি.এস.পি. ও এম.ও.পি. সার দিতে হয়। সাধারণত নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের অভাবজনিত কারণে মূর্তা গাছে ফলন কমে যায়। এক্ষেত্রে বর্ষা শুরুর আগে ডাল ছাঁটাই করে জমিতে জৈবসারের (হেক্টর প্রতি ১০-১২ টন গোবর সার) সঙ্গে হেক্টর প্রতি ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া ও ৬০-৮০ কেজি টি.এস.পি. প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

প্রতি বছর গাছের গোড়ার মাটি ভাল করে কুপিয়ে আলগা করে দিলে বা বর্ষার শেষে মিকানিয়া লতা, আড়াইল ইত্যাদি বিভিন্ন আগাছা পরিষ্কার করে দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। এছাড়া প্রয়োজন বুঝে মূর্তা গাছের ডাল ছাঁটাই করলে ভাল হয়। বিশেষ করে ৮-১০ বছর চাষ করার পর বর্ষার আগে গাছের পুরনো অংশ কেটে দিলে Sucker-এর মাধ্যমে নতুন গাছ তৈরি হয় এবং ফলন বাড়ে।

মূর্তা গাছ ছায়ায় থাকতে পছন্দ করে তাই চাষের জমিতে ছায়াদানকারী গাছ হিসাবে মাদার, মেহগনি প্রভৃতি গাছ লাগানো যায়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –



রোপণের ৩-৪ বছর পর থেকে মূর্তা গাছ ফলন দিতে শুরু করে। সাধারণত নভেম্বর-জানুয়ারি মাসে ফসল কাটা হয়। মোথা লাগালে তা ২-৪ মিটার লম্বা হলেই কাটার উপযুক্ত হয়ে যায়। তবে ডাল লাগালে ফলন কম হয়। ফলন পেতেও প্রায় ৩ বছর সময় লেগে যায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ফলন স্বাভাবিক হয়।

একবার রোপণ করে একটানা ৩০-৩৫ বছর পর্যন্ত এই গাছ থেকে ফলন পাওয়া যায়। যথাযথভাবে চাষ করলে প্রতি হেক্টর জমি থেকে আনুমানিক ৩০ হাজার টাকার মূর্তা উৎপাদন সম্ভব।

গবেষণায় দেখা গেছে, এক নাগাড়ে ১০-১২ বছর ফলন দেওয়ার পর মূর্তা গাছের ফলন কমে যায়। বিশেষ করে গাছের উচ্চতা অনেকটাই কমে যায়।

গাছ থেকে মূর্তা সংগ্রহ করার পর ধারালো বটি দিয়ে একে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়। পরে চিকন করে বেতি (বাকল), আতি (বাকলের নিচের অংশ), ছোটা (বাকল ও মজ্জার মাঝের অংশ) এবং থোর বা মাজি (মজ্জা) আলাদা করা হয়। বেতি এবং আতি পাটি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ছোটা দড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং থোর জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বেতিকে মুঠিবদ্ধ করে ভাতের পচা মাড়ের মধ্যে ৭-১০ দিন পর্যন্ত জাগ দেওয়া হয়। এরপর একে ভাতের মাড় দিয়ে সিদ্ধ করে পরিষ্কার জলে ধুয়ে রোদে শুকানো হয়। রোদে শুকিয়ে গেলে এটি সাদা বা ঘিয়ে রঙের হয়ে যায়। অনেক সময় বেতিকে বিভিন্ন রঙে রং করা হয়। এই বেতি থেকেই উন্নতমানের শীতল পাটি তৈরি করা হয়।

শীতল পাটির বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। শৌখিন লোকেরা গরমের সময় বিছানার চাদরের বিকল্প হিসেবে এই শীতল পাটি ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ, নামাজের পাটি, শৌখিন জুতা, মেয়েদের ব্যাগ, কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঘরের দেওয়াল সাজানোর সামগ্রী, মাদুর প্রভৃতি তৈরির কাজে মূর্তা ব্যবহার করা হয়।

ছোটা এবং আতি দিয়ে দড়ি, ঘরের চাল ও শিকে তৈরি করা হয়। এছাড়াও পুতুল তৈরি, সজ্জার কাজে ও বিভিন্ন কুটির শিল্পে মূর্তার ব্যবহার হয়।

এছাড়া মূর্তা মাটির ক্ষয় রোধেও সাহায্য করে।

সাধারণত ৩ ধরনের মূর্তা পাওয়া যায়। ৬-৮ মাস বয়সী মূর্তাকে ডোগ বলা হয়। পাটি তৈরির জন্য এটি সবচেয়ে উপযোগী। ৯-১২ মাস বয়সী মূর্তাকে ঝাড়া বলা হয় । আবার ডোগ জাতের মূর্তার দ্বিতীয় কাণ্ডকে আগালি বলা হয়। আগালি ছোট পাটি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

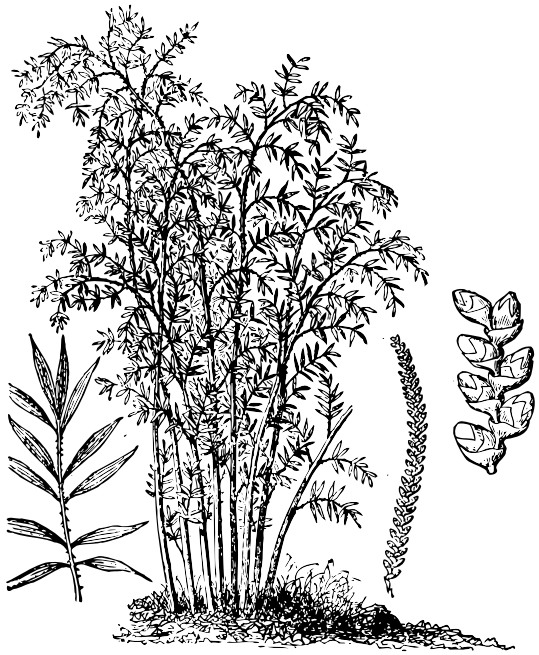
প্রতি শতক জমি থেকে বছরে ১৬০-২৪০টি ডোগ, ১৬০-২৪০টি ঝাড়া এবং ২৪০-২৮০টি আগালি সংগ্রহ করা যায়। যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৭০০-১০০০ টাকা। প্রতিটি শীতল পাটির বাজার মূল্য ৩০০-২৫০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। প্রতি বছর মূর্তা শিল্প থেকে বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব । এই শিল্পের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র মহিলারা কর্মসংস্থানের সুযোগ পেতে পারেন।

গোটা পৃথিবী যখন প্লাষ্টিকের বিকল্প খুঁজছে, তখন পরিবেশবান্ধব শিল্প হিসেবে মূর্তা চাষের প্রসার ঘটানোর যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এজন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ, প্রচার, বাজার তৈরি এবং সর্বপরি নতুন জাত উদ্ভাবনের জন্য উন্নত কলাকৌশল বা প্রযুক্তির ব্যবহার। যেহেতু মূর্তা লবণাক্ততা এবং জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে তাই উপকূলীয় অঞ্চলে এই চাষের খুব ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া পুকুরের ঢাল, ডোবার ধার, বর্ষায় যে জমিতে জল জমে, অন্য কোনও ফসল হয় না এমন নিচু জায়গায় মূর্তার চাষ করা সম্ভব।

জাত পরিচিতি –

বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন স্থানীয় নাম থাকলেও চাষ হওয়া মূর্তার কোনও উন্নত জাতের কথা জানা যায়নি।

তথ্যসূত্র – জাতীয় ই-তথ্যকোষ, বাংলাদেশ



বেত

বেত গাছের বিজ্ঞানসম্মত নামের কথা বলতে হলে Calamas, Korthalsia, Plectocomia এবং Daemonorops এই চারটি নাম উল্লেখ করতে হয়। কারণ এই চারটি গণের সমস্ত প্রজাতিকেই বেত গাছ বলা হয়।

বেতের সকল প্রজাতিই Arecaccae গোত্রের চিরহরিৎ, বহুবর্ষজীবী ও একবীজপত্রী উদ্ভিদ।

বেতের আদি জন্মস্থান দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ যেমন, ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, বার্মা (মায়ানমার), চিন, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনস্ প্রভৃতি দেশ।

ইতালিয় উদ্ভিদবিজ্ঞানী Odoardo Beccari এবং J.D. Hooker, Flora Bmit India Vol.6– এর তথ্য থেকে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম বেত সম্বন্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য পাওয়া যায়। এরপর ১৯৭৫ সালের পর থেকে বেত সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশে গবেষণা শুরু হয়। ১৯৯২-১৯৯৮ সালের মধ্যে বেতের বিষয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক তথ্য প্রকাশিত হয় তার থেকে জানা যায় যে, ভারতের উপরিউক্ত ৪টি গণের অন্তর্গত ৬০টি প্রজাতির উদ্ভিদ জন্মাত। কিন্তু বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্যাপকভাবে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বেত কাটার ফলে বহু প্রজাতির বহু গাছ বিলুপ্তির পথে এগিয়ে গেছে। অনেক প্রজাতির বেত গাছ তার আদি জন্মভূমিতেও আজ অবলুপ্ত হয়েছে।

সাধারণভাবে ইংরেজি বেতকে Cane বলা হয়। সংস্কৃতে বেত্র, তামিলে পেরাম্বু, তেলেগুতে পেমু এবং হিন্দি ও বাংলায় বেত বা ছাঁচি বেত নামে পরিচিত।

কোনও কোনও বেত গাছ এককভাবে জন্মায়। আবার কোনও বেত গাছ ঝাড় হিসাবে জন্মায়। বেত একটি কাঁটাযুক্ত, শক্ত লতা জাতীয় বা সোজা কাণ্ডযুক্ত উদ্ভিদ। বেত গাছের কাণ্ডে পর্ব ও লম্বা পর্বমধ্যগুলি নিরেট হয়। লতানো বেতের কাণ্ড ২-৫ সেমি মোটা এবং ১০০ মিটারের বেশি লম্বা হতে পারে। জঙ্গলের অন্য গাছের উপর ভর করে এই গাছ বেড়ে ওঠে। কাঁটার সাহায্যে বেত গাছ অন্য গাছে ভর করে থাকতে পারে। বেতের পাতাগুলি পক্ষল, যৌগিক প্রকৃতির এবং একান্তরভাবে সজ্জিত থাকে। পাতাগুলি ৬০-৮০ সেমি দূরত্বে কাণ্ডের উপর বিন্যস্ত থাকে। পাতার বৃন্তটি কাণ্ডকে বেষ্টিত করে থাকে। এটি কাঁটাযুক্ত হয়, যাকে Leaf Sheath বলা হয়। পত্রবৃন্তের পরের অংশটির দু'দিকে অর্থাৎ Rachis বা পত্রাক্ষের দু'দিকে সরু লম্বা পাতাগুলি বিপরীত বা একান্তরভাবে সজ্জিত থাকে। পত্রাক্ষ বা Rachis-এর উপর দুটি সারিতে বেঁকানো কাঁটা থাকে। বেত গাছ Dioecious অর্থাৎ পুরুষ ফুল ও স্ত্রী ফুল ভিন্ন ভিন্ন গাছে জন্মায়। কোনও কোনও প্রজাতির বেত গাছ একবার ফুল-ফল দিয়ে মারা যায়। আবার অনেক বেত গাছ নিয়মিত ফুল ও ফল দিতে থাকে। পুষ্পমঞ্জরীটি Spadix প্রকৃতির। এটা কাঁটাযুক্ত পুষ্পপত্র বা Spathe-এর মধ্যে আবৃত থাকে। অনেক প্রকার বেত গাছের ফল গোলাকার বা কিছুটা গোলাকৃতির হয়। ফলের গায়ে লালচে বাদামী রঙের উজ্জ্বল আঁশের মতো নকশা দেখা যায়।

বেত গাছ সমতলভূমিতে ও সমুদ্রতল থেকে ৩০০০ মিটার উচ্চ ভূমিতে জন্মাতে পারে। ভারতে চিরহরিৎ মিশ্রিত অরণ্যের আর্দ্র জলবায়ুতে বেত গাছ জন্মায়। ৮-৩৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং বার্ষিক ১২০০-৬৩৫০ মিলিমিটার গড় বৃষ্টিপাত বেত গাছের পক্ষে উপযুক্ত।

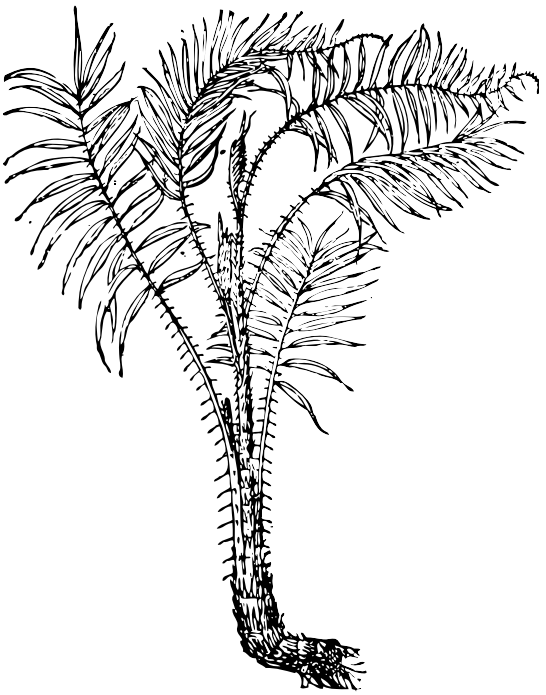
পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ যুক্ত মিহি কাদামাটি বা জৈব দোয়াঁশ মাটিতে বেত গাছ ভাল জন্মায়। অ্যাসিডযুক্ত কালো মাটিতেও বেত গাছ জন্মাতে পারে।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

বাঁদর জাতীয় প্রাণী এবং হাতিরা বেত গাছের ফল খায়। কিন্তু ফলের বীজ তারা হজম করতে পারে না। ফলে মলের সঙ্গে তা বেড়িয়ে গিয়ে অঙ্কুরিত হয়ে নতুন গাছের জন্ম হয়। এভাবেই বেত গাছের স্বাভাবিক প্রসারণ হয়ে থাকে।

বেত গাছের বীজের অংকুরোদ্গম ঘটিয়ে চারাগাছ তৈরি করে রোপণের মাধ্যমে বেতের কৃত্রিম প্রসারণ ঘটানো সম্ভব। এছাড়া Sucker রোপণ করে, রাইজোম কাটিং করে ও টিস্যু কালাচারের মাধ্যমেও বেত গাছের কৃত্রিম প্রসারণ ঘটানো যেতে পারে।

বেত গাছ থেকে পরিপক্ক ও পরিণত ফল সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হয়। নার্সারীতে মাটি, জৈবসার ও কাঠের গুঁড়ো ১ : ১ : ১ অনুপাতে মিশিয়ে জমি থেকে ৬-৭ সেমি উঁচু করে বেড তৈরি করতে হয়। বেডে লাইন করে বীজ বসানোর আগে বীজগুলিকে



শোধন করে ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে বপন করলে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ভাল হয়। বীজের উপর জৈবসার ও কাঠের গুঁড়ো ৩ সেমি মতো পুরু আবরণ করে ঢেকে দেওয়া হয়। এরপর প্রতিদিন জল স্প্রে করতে হয়। অনেক ধরনের বেতের অঙ্কুরোদ্গম হতে দীর্ঘ সময় লাগে। এই সময় নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করা ও নিয়মিত আর্দ্রতা বুঝে জল দেওয়ার প্রয়োজন হয়। অঙ্কুরিত বীজ বা নার্সারীতে চারাগুলিকে বড় করে তা অন্যত্র রোপণ করা হয়ে থাকে।

এছাড়া বেত গাছের ঝাড় থেকে শিকড় সমেত Sucker তুলে তা অন্যত্র রোপণ করে বেতের প্রসারণ ঘটানো যায়। বেতের ঝাড়ে মাটির নীচে সমান্তরালভাবে জন্মানো রাইজোমকে মাটি খুঁড়ে তুলে অন্যত্র রোপণ করেও বেত গাছের প্রসারণ ঘটানো সম্ভব। মালয়েশিয়ার বন দফতরের গবেষণাগারে টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে বেতের চারা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং টিস্যু কালচারের চারাগাছ রোপণ করেও বেতের প্রসারণ ঘটানো যেতে পারে।

সাধারণত জঙ্গলের ছায়াযুক্ত জায়গায় বেতের চাষ করা হয়ে থাকে। যেখানে অবশ্যই কিছু শক্তপোক্ত অল্প শাখাযুক্ত সাহায্যকারী গাছ সারিবদ্ধভাবে থাকবে। যে গাছগুলিকে অবলম্বন করে বেত গাছ বেয়ে উপরে বাড়বে। তবে ওই গাছগুলির বেত গাছের ভার সহ্য করার ক্ষমতা থাকতে হবে। প্রথমে এই ধরনের জমির সমস্ত আগাছা, ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট দূরত্বে নির্দিষ্ট আয়তনের গর্ত কেটে রাখতে হবে। ঝাড় সমেত বেত গাছ রোপণের জন্য ৫ মিটার দূরত্বে গর্ত কাটা হয়। একটি গাছ রোপণ করার জন্য ২-৫ মিটারের বেশি বা ৫ মিটারের কম দূরত্ব বজায় রেখে ৫০ X ৫০ X ৫০ সেমি বা ৩০ X ৩০ X ৩০ সেমি আয়তনের গর্ত কেটে বর্ষার আগে থেকে রোপণের জন্য জায়গা তৈরি করে রাখা হয়। সাধরণত সাপোর্টিং গাছের গোড়া থেকে ১.৫ মিটার দূরে গর্তগুলি কাটা হয়। এরপর বর্ষার শুরুতে প্রতিটি গর্তে বীজের তৈরি চারাগাছগুলির পলিব্যাগটি সাবধানে খুলে একসঙ্গে ৪টি করে চারাগাছ রোপণ করা হয়।

পরিচর্যা –

যেহেতু জঙ্গলে বা জঙ্গল লাগোয়া জায়গায় বেত গাছের চাষ করা হয়ে থাকে তাই এই চাষে খুব বেশি পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না। তবে চারাগাছ রোপণের জন্য প্রতিটি গর্তে মাটির সঙ্গে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম সুপার ফসফেট, ৫০ গ্রাম পটাশ সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। পরবর্তী পরিচর্যা বন দফতরের পরামর্শে অনুযায়ী করা বাঞ্ছনীয়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

বন দফতর বা জঙ্গলের বিভিন্ন কমিটিকে বা সমবায় সমিতিকে জঙ্গলে স্বাভাবিকভাবে জন্মানো বেত গাছ কাটার অনুমতি দেওয়া হয়। যদিও জঙ্গল থেকে বেআইনিভাবে বেত সংগ্রহ করা এখনও সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায়নি।

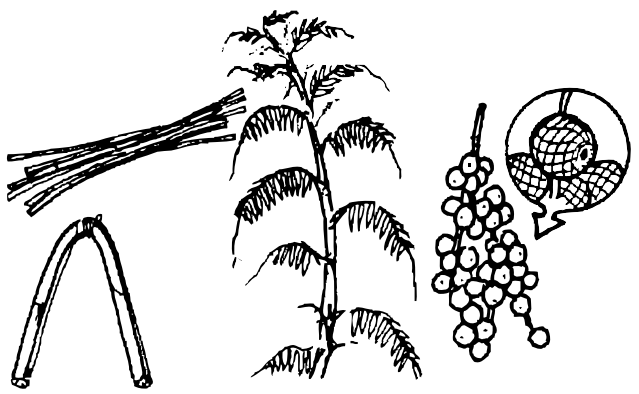
পরিণত বেত গাছটিকে কেটে টেনে বাইরে বের করা হয়। তারপর কাণ্ড থেকে পাতা ও Sheath কেটে পরিষ্কার করে উপরের নরম কাণ্ডটিকে কেটে বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য মেপে কাণ্ডটিকে কেটে বাণ্ডিল করে প্রসেসিংয়ের জন্য পাঠানো হয়।

আগে ভারতে সাধারণত বাতাসের দ্বারা শুকনো করে বেতের বাণ্ডিলগুলিকে 'সিজিন' করা হত। বর্তমানে ৯ : ১ অনুপাতে ডিজেল ও নারকেল তেলের মিশ্রণে ভিজিয়ে বা রাসায়নিক Preservative পদার্থে ভিজিয়ে বা প্লাস্টিক লাইনিং করে কটেজ ইন্ড্রাস্ট্রিতে বিক্রি করা হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে বেতের স্থায়ীত্ব, গুণগত মানকে উন্নত করা হয়।

বেত খুব শক্ত, মজবুত ও নমনীয় বনজসম্পদ। আভিজাত্যপূর্ণ চেয়ার-টেবিল, সোফা, ঝুড়ি, মোড়া ইত্যাদি বানাতে বেত ব্যবহৃত হয়। গৃহস্থালীর ব্যবহারের জন্য সমস্ত প্রকার জিনিস তৈরি করতে এটি ব্যবহৃত হয়। তাই বেতকে Candle to Coffin অর্থাৎ বাতিদানী থেকে কফিন তৈরির সামগ্রী হিসাবে গণ্য করা হয়।

বেতের ছাল তুলে বেতের তৈরি শীতল পাটি তৈরি করা হয়। বেতের বোনা কাপড় দিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় উপজাতী সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের লজ্জা নিবারণ করেন।

যদিও বর্তমানে স্কুলে বেতের ছড়ির ব্যবহার এখন ফুরিয়েছে। তবুও এখনও অনেক স্কুল বেতের প্রয়োজন অনুভব করে। পুলিশের



হাতে, বৃদ্ধ মানুষের হাতে ও ছাতার বাঁটে এখনও বেতের প্রয়োজন ফুরায়নি। খাদ্য হিসাবেও বেত ব্যবহৃত হয়। আসামে ও উত্তর-পূর্ব ভারতে বেত গাছের নরম কাণ্ড সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। খাওয়া হয় এর ফলও।

বেতের ফলের রস পালিশের কাজে ও বেহালা বা অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র রং করতে ব্যবহৃত হয়। বেত গাছের পাতা ঘর ছাইতে ব্যবহার করা হয়। চিরাচরিতভাবে পোলো খেলার সঙ্গে এখনও বেতের ব্যবহার রয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারিভাবে বন দফতরের গবেষণাগারগুলিতে বেত গাছের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে কৃত্রিম পদ্ধতিতে বেতের প্রসারণ ঘটানো ও টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে বেতের চারা তৈরি করা হয়েছে। কেরালা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ুর বন দফতর বেত কাটার উপর নিয়ন্ত্রণ জারি করে ৪ বছরের Rotation-এ বেত সংগ্রহের নিয়ম চালু করেছে। বনভূমিতে প্রচুর পরিমাণে বেতের রোপণ করা হয়েছে। অরুণাচলেও বেতের প্রসার ঘটানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই সরকারি উদ্যোগের অঙ্গ হিসাবে বনভূমির আদিবাসী ও উপজাতী মানুষদের নিয়ে সমবায় গঠিত হয়েছে।

বেতের সঙ্গে ফোড়েদের না যুক্ত করে গরিব বনবাসী মানুষদের সমবায়ের মাধ্যমে একটি সুস্থ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বেত সংগ্রহ ও বেত গাছের প্রসারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বেত গাছের পুনরুজ্জীবন ঘটলে দেশের কুটীর শিল্পের প্রসার ঘটবে। গরিব মানুষের আর্থ-সামাজিক বিকাশ ঘটাতে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এই প্রয়াস অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

বেত সংগ্রহ থেকে বেতের তৈরি জিনিসপত্র একত্রিত করার জন্য এখনও কোনও স্থায়ী পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। তাই বেতের বাজারজাত প্রক্রিয়ার মধ্যে ফোড়েদের আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। কুটীর শিল্পের কেন্দ্রগুলিতে দালালের মাধ্যমেই বেতের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হয়। এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা অনেক সময় সঠিক পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হন। বেত চাষ থেকে শুরু করে বেতের তৈরি সামগ্রীগুলিকে সঠিকভাবে বাজারজাত করা, এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতে পারলে এক কথায় বেত শিল্পের উন্নতি ঘটানো যাবে।

জাত পরিচিতি –

ভারতে প্রধানত ৩টি অঞ্চলে বেত গাছের স্বাভাবিক অরণ্য রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালা (যেখানে Calamus গণের ২১টি প্রজাতির বেত গাছ জন্মায়। Calamus bandisii, Calamus gamblei, Calamus viminalis, Calamus vattayila, Calamus andamanicus ইত্যাদি), উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন রাজ্যগুলিতে বেতের ৩টি গণের ১৯টি প্রজাতির বেত গাছ জন্মায় (যেমন Calamas, Daemonorops এবং Plectocomia), আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩টি গণের ১৮ টি প্রজাতির (৩টি Genera-র মিশ্রণে) বেত গাছ জন্মায়।

তথ্যসূত্র - status of rattan resources and uses in south asia - Food and.... http://www.fao.org/docrep/003/Y2783E/y2783e11.htm, wikipedia



রবার

পরিচয় –

রবার গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Hevea brasilliensis, এটি Euphorbiaceae গোত্রের পর্ণমোচী শ্রেণীর উদ্ভিদ।

রবার গাছের আদি বাসস্থান মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বৃষ্টিবহুল এলাকা। আমাজন নদীর অববাহিকায় এই গাছ প্রথম পাওয়া যায়। ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে যোসেফ প্রিষ্টানি এর নামকরণ করেন। জঙ্গল থেকে মানুষের তত্বাবধানে রবার চাষ শুরু হয় মাত্র ১৩০-১৩৫ বছর আগে। আমাদের দেশের মাটিতে রবার চাষ শুরু হয় ১৯০২ সালে। এই অর্থকরী গাছ লাগিয়ে প্রাকৃতিক রবার গ্রাম ত্রিপুরার সমৃদ্ধির বড় কারণ।

ইংরেজিতে রবার গাছকে Rubber tree বা Rubber plant বলে। এছাড়াও সাধারণভাবে এই গাছটি Para rubber tree, shainga tree বা Seringueria নামে পরিচিত।

জঙ্গলে স্বাভাবিকভাবে হওয়া রবার গাছ উচ্চতায় ৪০ মিটার (১৩১ ফুট) পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু পরিকল্পিতভাবে চাষ করা রবার গাছ উচ্চতায় অনেক কম হয়। গাছ থেকে ল্যাটেক্স সংগ্রহের কারণেই এই উচ্চতা নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। গাছের কাণ্ডের আকার অনেকটা বোতলের মতো। রবার গাছের ছালে বাদামী রঙের ছোপ থাকে। গাছের ভিতরের ছালে আঘাত লাগলে তা থেকে ল্যাটেক্স নির্গত হয়। পাতায় ৩টি পত্রাক্ষ থাকে। আলাদা আলাদা ভাবে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল নিয়ে ফুলগুলি বিন্যস্ত থাকে। রবার গাছের ফুলগুলি ঘিয়ে-হলদে রঙের হয়। ফলগুলি ক্যাপসুলের মতো। প্রতিটি ফলে ৩টি করে বড় বীজ থাকে। ফলগুলি পরিণত হলে তা ফেটে বীজ বেরিয়ে আসে।

ক্রান্তীয় বা উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে রবার গাছ ভাল হয়। রবার চাষের জন্য ন্যূনতম ১২০০ মিলিমিটার বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রয়োজন হয়। তবে এই গাছ একেবারেই তুষারপাত সহ্য করতে পারে না। একবার তুষারপাতেই ল্যাটেক্স উৎপাদনে ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়তে পারে। গোটা জমির রবার চাষ ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

রবারের বীজ থেকে নার্সারী বা বীজতলায় চারা তৈরি করে বা কলমের চারা তৈরি করে রবার গাছের চাষ করা যেতে পারে। নার্সারীতে বীজ বপনের সময় বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ঠিক রেখে, নিয়মিত জলসেচ, আচ্ছাদন এবং আগাছা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি পরিচর্যার মাধ্যমে সুস্থ সবল চারা তৈরি করা যায়।

কলমের চারা তৈরির জন্য প্রথমে এক বছর বয়সী রবার গাছের চোখ সহ ১ ইঞ্চি লম্বা ও ২-৩ সেমি চওড়া বাডউড ডাল কেটে নিতে হয়। তারপর চারাগাছে বাডউডের পরিমাণ মতো চামড়া কেটে বাডউডের চামড়াটি চারাগাছের কাটা জায়গায় লাগিয়ে ভাল করে পাতলা প্লাস্টিক দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। ৫০০ দিন পর বাডউডের চামড়া চারাগাছের সঙ্গে জুড়ে যায়। তখন পলিথিনটি খুলে দিতে হয়। এভাবে তৈরি কলমে নির্দিষ্ট সময় পর নতুন শাখা গজাবে। শাখা গজানো জায়গার ২ ইঞ্চি উপরে ও নীচে কেটে কলম সরাসরি বাগানে লাগানো যায় (ডিরেক্ট প্ল্যান্টিং)। আবার তা পলিব্যাগেও লাগানো যায়। পলিব্যাগে চারা লাগালে তা পরের বছর আষাঢ় মাসে জমিতে লাগাতে হয়। বাগানের ক্ষেত্রে পলিব্যাগ প্ল্যান্টিংই ভাল। কারণ এতে চারাগুলি বেশি টেকে। গাছের বৃদ্ধি মোটামুটি সমান হয়। ফলে একসঙ্গে বেশি গাছের টেপিং শুরু করা যায়।

চারা রোপণের আগে ভাল করে জমি তৈরি করে নিতে হয়। প্রথমে জমির আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়। সাধারণত ফাল্গুন, চৈত্র মাসে এইকাজ করতে হয়। এছাড়া জমিতে আগুন লাগিয়েও আবর্জনা পরিষ্কার করা যেতে পারে। আগুন নিভে যাওয়ার পর জমি থেকে যাবতীয় নোংরা সরিয়ে দিতে হয়।

এরপর চৈত্র মাসে জমিতে ২.৫ X ২.৫ ফুট মাপের গর্ত করতে হয়। তারপর গর্তের মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণ সার দিতে হবে। উই বা অন্য পোকার আক্রমণ প্রতিহত করতে গর্তে ওষুধও দিতে হয়। পরবর্তী কাজ ওই গর্তে ভাল চারা রোপণ করা। ভাল চারার অর্থ চারার উচ্চতা, কাণ্ডের বেড়, পাতার আকৃতি ও সংখ্যার সমতা রয়েছে এবং যে চারার পাতা রোগপোকায় আক্রান্ত হয়নি বা জৈবিক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।



সমতল জমিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ১৫ ফুট। আর প্রতিটি সারির মধ্যে ১৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হয়। ঢালু বা টিলা জমিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ১০ ফুট। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২০-২২ ফুট। মনে রাখতে হবে, প্রতি হেক্টর জমির জন্য ৪৫০-৫০০টি গাছ সঠিক। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব ঠিকভাবে না হলে সময়মতো সব গাছ একত্রে বেড়ে উঠবে না। এরফলে ৬ বছরে গাছ টেপিং-এর আওতায় আসবে না। পলিব্যাগের চারা বাগানে আনার সময়ে লম্বালম্বিভাবে আনতে হবে যাতে চারার গোড়ার মাটি সরে না যায়। চারা লাগানোর সময় চারার গোড়ার মাটি ভেঙে গেলে চারা উপরের দিক থেকে শুকিয়ে যেতে পারে। এরফলে চারা মরেও যায়। চারা লাগানোর পর ৪ বছর পর্যন্ত গাছের গোড়া পরিষ্কার রাখতে হবে।

পরিচর্যা –

রবার চাষের জমির মাঝে জল সংরক্ষণের জন্য ছোট ছোট নালা বা গর্ত করা যেতে পারে। জল সঞ্চয় করে রাখার এটি একটি ভাল পদ্ধতি। সাধারণত এগুলিকে সিল্টপিট বা জলখাদ বলা হয়। প্রতিটি গর্তের আকৃতি হবে ৪ ফুট লম্বা, ১.৫ ফুট চওড়া এবং ২ ফুট গভীর। প্রতি চারটি গাছের মাঝেমাঝে এমন একটি করে গর্ত তৈরি করা যেতে পারে। প্রতি হেক্টরে ১০০-১২৫টি গর্ত করা করতে হবে। আর এধরনের গর্ত বছরে প্রায় ৪০০ লিটার জল ধরে রাখতে পারে। অতএব রবার চাষের প্রতি হেক্টর বছরে ৪০ হাজার লিটার জল সংরক্ষণ সম্ভব। সেচ প্রয়োগ বা বৃষ্টির সময় জলের সঙ্গে ধুয়ে যাওয়া উর্বর মাটিও আবার এই গর্তেই জমা হয়। গর্ত ভরাট হয়ে গেলে বছরে ১-২বার মাটি তুলে গাছের গোড়ায় দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। জল ও মাটি সংরক্ষণের এই ব্যবস্থায় ১৫-২০ শতাংশ উৎপাদন বেড়ে যায়।

মনে রাখা দরকার, রবার চাষে সার ও ওষুধ প্রয়োগের আগে অবশ্যই জমির মাটি ও গাছের পাতা পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। মাটি ও পাতা অগাস্ট-অক্টোবর মাসের মধ্যে একসঙ্গে সংগ্রহ করতে হয়। শুধু মাটি সংগ্রহ করলে ডিসেম্বর-মার্চ মাসের মধ্যে করতে হয়। মাটি সংগ্রহের জন্য জমির ৫-১৫টি জায়গা বেছে নিতে হয়। যদিও তা নির্ভর করে কতটা জায়গার মাটি পরীক্ষা করা হবে তার উপর। আর পাতা সংগ্রহ করতে হয় অগাস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে। তবে ওই সময় পাতার বয়স যেন ৬-৮ মাস হয়। পাতার সংগ্রহের জন্য প্রতি হেক্টরে দুটি করে গাছ বেছে নিতে হয়। পরিণত গাছ অথবা যে গাছে টেপিং করা হচ্ছে, এমন গাছের পাতাই নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, উপরের আবর্তের নিচু শাখার যেসব পাতা ছায়াতে থাকে সেইসব পাতা থেকে ৪টি করে পাতা সংগ্রহ করতে হবে।

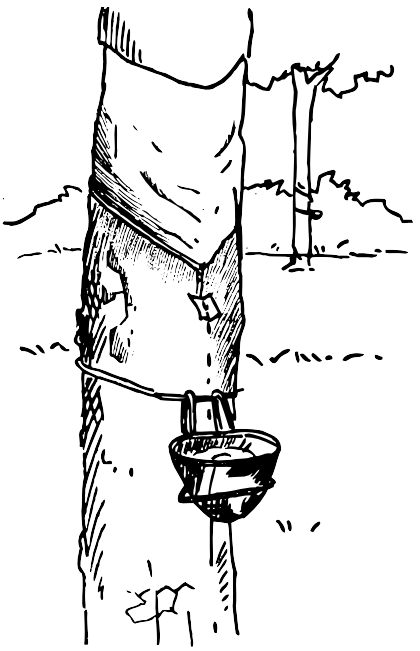
জমিতে জৈব কার্বন, ফসফরাস, পটাসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণে রবার চাষের সময় অনেক ক্ষেত্রে (বিশেষ করে আমাদের দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে) জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে প্রতি হেক্টর জমিতে বছরে সর্বমোট ৩৫০ কেজি NPK সার ১০ : ১০ : ১০ অনুপাতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রথম দফায় আষাঢ় মাসে ভাল বৃষ্টির পরে সার দেওয়া উচিত। দ্বিতীয় দফায় আশ্বিন-কার্তিক মাসে এই সার দিতে হয়। সার সব সময় গাছের গোড়া থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে প্রয়োগ করতে হয়। পরিণত গাছের সমতল জমিতে সার প্রয়োগ করতে হয় ৪টি গাছের মাঝখানে। ঢালু জমির ক্ষেত্রে প্রতি সারির ২টি গাছের মাঝখানে সার দিতে হয়।

রবার চাষের জমিতে প্রথম ৪ বছর আবরণী লতার চাষ খুবই প্রয়োজন। এই আবরণী লতা হিসাবে মিউকোনা, পিউরোরিয়া ইত্যাদির চাষ করলে জমির ভূমিক্ষয় রোধ করা সম্ভব হয়, জমিতে তস্ থাকে, আগাছা দমন হয় ও জমির জৈব নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ে। সার্বিকভাবে প্রতি হেক্টরে রবার গাছের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যায়। ফলে মোট উৎপাদনও বাড়ে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

রবার চাষের মূল উদ্দেশ্য বা এই গাছ থেকে প্রাপ্ত ফসল হল ল্যাটেক্স (বা তরুক্ষীর)। প্রসেসিং-এর মাধ্যমে যা থেকে রবার শিট তৈরি করা হয়। তাই এক কথায় রবার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল।

রবার গাছ থেকে ল্যাটেক্স সংগ্রহের পদ্ধতিকে টেপিং বলে। জমিতে চারা রোপণের ৬ বছরের মধ্যে সাধারণ রবার গাছ টেপিং-এর উপযুক্ত হয়ে যায় বা তা থেকে ল্যাটেক্স সংগ্রহ করা যায়। টেপিং-এর উপযুক্ত রবার গাছের বেড় সাধারণত ৫০ সেমি হয়ে থাকে। মাটি থেকে ১২৫ সেমি উঁচু কাণ্ডে টেপিং করতে হয়।



ল্যাটেক্স সব সময় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংগ্রহ করতে হয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, টেপিং-এর সঠিক সময়। সাধারণত খুব ভোরে টেপিং করে ল্যাটেক্স সংগ্রহ করা ভাল। কারণ সূর্য ওঠার আগে গাছের ক্ষীরনালিতে জলীয় বাষ্পের চাপ বেশি থাকে। ফলে সে সময় অনেক বেশি ল্যাটেক্স পাওয়া সম্ভব। টেপার (যিনি টেপিং করেন) রবার গাছকে আঘাত করে তা থেকে ল্যাটেক্স সংগ্রহ করে থাকেন। তবে এরজন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও কিছু যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়।

কোনও নির্দিষ্ট সময়ে একজন টেপার যে পরিমাণ গাছে টেপিং করেন তাকে টেপিং ট্রাস্ট বলে। সাধারণত একজন টেপার দেড় থেকে দুই ঘন্টা টেপিং করেন। কাজের সুবিধার জন্য টেপার রবার চাষের জমিকে ২-৩টি ব্লকে ভাগ করে নেন। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, মোটামুটি ৩০০টি গাছ নিয়ে একটি ব্লক করা হয়। তবে সুবিধার কারণে এর চেয়ে কম বা বেশিও হতে পারে। জমির একদিকের ভাল গাছগুলিকে নিয়ে এই ব্লক সাজাতে হয়। বছরে একটি গাছে প্রায় ১২০-১৩০ দিন পর্যন্ত টেপিং করা যায়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই টেপিং করা যায়। সাধারণত গাছের উচ্চতা ৮-৯ ফুটের মধ্যেই টেপিং শেষ হয়ে যায়। কারণ এরপর আর টেপিং-এর জন্য ছুরি চালানো যায় না। দেখা গেছে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে গাছ লাগিয়ে সঠিকভাবে সার, ওষুধ প্রয়োগ করলে এবং যথাযথ যত্ন নিলে প্রতি হেক্টর জমি থেকে বছরে মোটামুটি ১ হাজার ৭৫৬ কেজি রবার উৎপাদন হয়।

সংগৃহীত তরল ল্যাটেক্স (বা ফিল্ড ল্যাটেক্স) এরপর প্রসেসিং-এর জন্য পাঠানো হয়। তৈরি করা হয় রবার শিট। তারপর তা বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বাজারে এই তরল কাঁচামালটির প্রচণ্ড চাহিদা রয়েছে। বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনে তরল রবার ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে ৩৫ হাজারেরও বেশি জিনিস তৈরিতে রবার ব্যবহৃত হয়। বাচ্চাদের দুধের বোতলের নিপিল থেকে শুরু করে বেলুন, বিভিন্ন খেলনা, জুতো, কনডোম, এরোপ্লেনের চাকা সব কিছুতেই রবার অপরিহার্য। এছাড়া ৫০% বেশি রবার ব্যবহৃত হয় যানবাহনের ক্ষেত্রে। প্যাকিং বা চুল বাঁধার গাডার, গ্লাভস, হাসপাতালের যন্ত্রাংশ, পাইপ, বসার গদি, টায়ার, টিউব, ম্যাট্রেস, কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ এবং ছাপাখানার জন্যও বিভিন্ন জিনিস তৈরি হচ্ছে রবার থেকে।

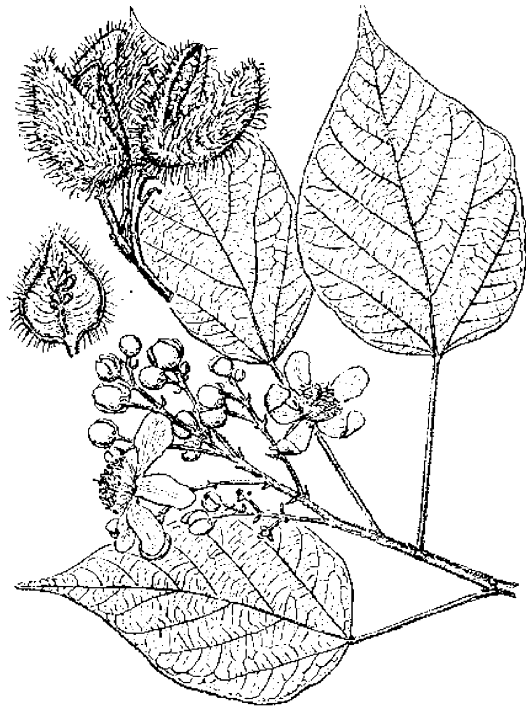
বর্তমানে রাবার উৎপাদনে ভারতে কেরালার পরেই ত্রিপুরার স্থান। অর্থাৎ ত্রিপুরা ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে। ত্রিপুরায় কমপক্ষে ৪০ চল্লিশ হাজার পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রবার চাষের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। ইতিমধ্যে দেশের মধ্যে ত্রিপুরায় রবারের বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে সেন্ট্রিফিউজড ল্যাটেক্স সরবরাহে এই রাজ্য সুনাম অর্জন করবে। ত্রিপুরার প্রায় প্রতিটি জায়গায় রবার বোর্ডের মাধ্যমে রবার চাষ হচ্ছে। সেখানে ২০০১ সালে রবার চাষের মোট জমির পরিমাণ ছিল ২৭ হাজার ৯৪৭ হেক্টর। তখন প্রাকৃতিক রবারের মোট উৎপাদন ছিল ১০ হাজার ৩০৪ মেট্রিক টন।

রবার ছাড়াও রবার চাষ থেকে বাড়তি আয় করা সম্ভব। এরমধ্যে রয়েছে মৌমাছি পালন। রবার গাছ মৌমাছি পালনের আদর্শ জায়গা। গাছের ত্রিপত্রের সংযোগস্থলে বৃন্তের শেষপ্রান্ত থেকে মৌমাছিরা মধুসংগ্রহ করতে পারে। প্রতি হেক্টর জমিতে ১৫টি মৌচাক বসানো যায়। তা থেকে বছরে প্রায় ১০ কেজি মধু পাওয়া যায়। এছাড়া রবার গাছের কাঠও বেশ ভাল। এই কাঠ জ্বালানি হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। রবার গাছের কাঠ থেকে আসবাবপত্র, গৃহস্থলীর কাজে ব্যবহৃত সামগ্রী তৈরি করা যায়। তাছাড়া এর থেকে দেশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স তৈরি করা যায়। রবার বীজ থেকে অভোজ্য তেল পাওয়া যায়।

জাত পরিচিতি –

ভারতীয় গবেষকরা এখনও পর্যন্ত ১৭ রকমের রবার গাছ খুঁজে পেয়েছেন। এরমধ্যে R.R.I.I-105 রবার গাছই সবচেয়ে বেশি রবার উৎপাদনে সক্ষম। কারণ বিভিন্ন রাজ্যের মাটির গুণাগুণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন জাতের রবার গাছ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে ল্যাটেক্স উৎপাদন করতে পারে।

তথ্যসূত্র - farmersportal.tripura.gov.in, wikipedia



লটকা

অনেকের কাছেই অপরিচিত এই লটকা গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Bixa orallana, এটি Bixaceae গোত্রের লম্বা ঝোপ জাতীয় বা ছোট আকারের চিরহরিৎ গাছ।

এই গাছটির আদি বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকার ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চল বা ব্রাজিল। সেখানে এই গাছটি দৈগোটা নামে পরিচিত। ব্রাজিল, কেনিয়া ও পেরুতে এই গাছের চাষ হয়। বাংলাদেশে প্রায় সর্বত্রই লটকা গাছ দেখতে পাওয়া যায়, আলাদা করে চাষ হয় না। আমাদের দেশেও কিছু কিছু জায়গায় এই গাছ স্বাভাবিক উদ্ভিদ হিসাবে দেখতে পাওয়া যায়। তবে অপরিচিত হওয়ার কারণে অনেকেই এর নাম বলতে পারেন না। মনে করা হয়, স্পেনীয় বা পর্তুগীজদের হাত ধরে ভারতে এই গাছটি এসেছে। আবার অন্য মতে, ভারতে এই গাছের প্রজাতিটি এসেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে।

এই গাছটি সাধারণভাবে Achiote নামে পরিচিত। উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার মানুষেরা একসময় এই গাছের বীজ থেকে লাল রং তৈরি করে তা শরীরে মাখতেন বা ঠোটে লিপস্টিক হিসাবে লাগাতেন। এছাড়া মশলা হিসাবেও ব্যবহার করতেন। আর তাই এই গাছটি Lipstick tree নামেও পরিচিত।

লটকা গাছটি উচ্চতায় ৬-১০ মিটার (২০-৩৩ ফুট) হতে পারে। শাখাপ্রশাখার অগ্রভাগে ফুলগুলি গুচ্ছাকারে বিন্যস্ত থাকে। ফুলগুলি লম্বায় ৫ সেমি (২ ইঞ্চি) হয়। ফুলের রং সাদা থেকে গোলাপী বর্ণের হয়। সূঁচালো মুখ বিশিষ্ট লালচে বাদামী রঙের বীজের শুটিগুলি Spine-এ(কণ্টক বা পত্রকণ্টকে) পরিণত হয়। প্রতিটি শুটিতে মোমের মতো রক্ত-লাল বর্ণের আবরণে ঢাকা অনেকগুলি বীজ থাকে। বীজগুলি পরিণত হয়ে গেলে শুটিগুলি শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায় এবং তা ফেটে বীজগুলি বেরিয়ে আসে। মূলত Carotenoid রঙ্গক bixin ও norbixin থাকার কারণে বীজের আবরণের এমন রং হয়।

তুষারপাত হয় না, এমন ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তী জলবায়ু অঞ্চলে লটকা গাছ হতে পারে। ঠাণ্ডা হাওয়া থেকেও এই গাছকে রক্ষা করতে হয়। তবে এই গাছ চাষের জন্য সারা বছর ধরে আর্দ্রতা বজায় রাখতে হয়। নিকাশীর সুবিধাযুক্ত ভাল উর্বর মাটি এবং পুরোমাত্রায় সূর্যের আলো বা আংশিক ছায়া লটকা চাষের জন্য উপযুক্ত।

বীজ থেকে বা কাটিং করে এই গাছের কৃত্রিম প্রসারণ ঘটানো যেতে পারে। তবে বীজের গাছের চেয়ে কাটিং-এর গাছে ফুল তাড়াতাড়ি আসে। বাণিজ্যিকভাবে দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান দেশে, আফ্রিকা এবং কিছুটা ভারত ও শ্রীলঙ্কায় লটকার চাষ হয়ে থাকে। তবে এর উৎপাদন সম্পর্কে সঠিক কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

সিন্থেটিক ডাই শিল্প তৈরি হওয়ার আগে এই গাছটি বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হতো মূলত রঙ্গকের কারণে। এই গাছের বীজের নির্যাস চিজ, মার্জারিন, চকোলেট, ফেব্রিক ও রঙে ব্যবহৃত হয়। Annatto oil-এ প্রচুর পরিমাণে tocotrienols, beta-carotene, Essential oil, saturated বা unsaturated fatty acid, flavonoids এবং ভিটামিন–C থাকে।

তথ্যসূত্র – wikipedia, AgriNews24.com

সবুজ পশুখাদ্য ও জ্বালানির গাছ



সুবাবুল

পরিচয় –

সুবাবুল গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Leucaena leucocephala, ইহা Leguminosae বা Fabaceae গোত্রের এবং Mimosaceae উপগোত্রের উদ্ভিদ।

সুবাবুল গাছের আদি জন্মস্থান দক্ষিণ মেক্সিকোর ও মধ্য আমেরিকার উত্তরাংশে। পৃথিবীর উষ্ণ অঞ্চলের ৫০টিরও বেশি দেশে এর বিস্তার ঘটেছে।

ভারতে ১৯৭০ সালের পর থেকে ব্যাপকভাবে গাছটির রোপণ শুরু হয়েছে। সমাজভিত্তিক বৃক্ষরোপণে, অরণ্য ধ্বংসের রক্ষাকারক গাছ হিসাবে, পশুখাদ্য হিসাবে, সবুজ সার তৈরিতে, বাগান ও রাস্তার পাশে Avenue Plantation-এর জন্য এই গাছটি সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে। Farm Forestry বা অরণ্যকেন্দ্রিক শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে, কাগজের মণ্ড তৈরির জন্য ও প্লাইউড প্রস্তুত কারখানায় অরণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর ব্যাপক ব্যবহার হয়। বনভূমির স্বাভাবিক উদ্ভিদকে রক্ষা, অরণ্যবাসী ও সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সুবাবুল গাছের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শুধুমাত্র অন্ধ্রপ্রদেশের প্রকাশম জেলায় ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে গাছটি চাষ করে অরণ্যকেন্দ্রিক শিল্প গড়ে উঠেছে। Farm Forestry প্রকল্পে সরকার, কোম্পানী বা কারখানার মালিক ও কৃষকের অংশীদারিত্ব থাকায় এই শিল্পের লভ্যাংশ থেকে কৃষক বা সাধারণ মানুষেরও অর্থনৈতিক বিকাশ সম্ভব হয়েছে। এই উদ্যোগ NABARD-এর ও অন্যান্য সরকারি সহায়তা লাভ করেছে। কেন্দ্রীয় বনদফতরও এই প্রকার শিল্প বিকাশের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছে। একাধারে অরণ্য-রক্ষা ও অরণ্যের বাসিন্দাদের আর্থিক উন্নতির জন্য আরও অনেক প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে। যেমন, Agro Forestry, Social Forestry, Farm Forestry ইত্যাদি। হিন্দি ও বাংলায় এই গাছটি সুবাবুল নামেই পরিচিত, ওড়িয়া ভাষায় নাগরজুনা, তামিল ভাষায় সাউন্ডোল বা সাউন্ডোলা।

সুবাবুল একটি ছোট্ট উচ্চতার উদ্ভিদ, যার উচ্চতা ২০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। পাতাগুলি যদিও দেখতে কিছুটা বাবলা জাতীয় গাছের মতো, কিন্তু এতে কাঁটা থাকে না। পাতাগুলি দ্বিপক্ষল যৌগিক প্রকারের, পত্রাক্ষের উপর ২০-৩০টি পত্রক বা Leaflet বিপরীতমুখী হয়ে সজ্জিত থাকে। ফুলগুলি অবৃন্তক সাদা বা ক্রীম রঙের হয়। অনেকগুলি ফুল একটি গোলাকার ছোট পুষ্পাক্ষের উপর ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে সজ্জিত থাকে। সমগ্র মঞ্জরীটিকে একটি গোলাকার ফুল বলে মনে হয়। প্রতিটি ফুল খুবই ছোট বৃতি, দলমণ্ডল, পুংকেশরচক্র ও গর্ভকেশরচক্র নিয়ে গঠিত। পাপড়িগুলির থেকে পুংকেশরগুলি লম্বায় দ্বিগুণ, তাই পুংকেশরগুলিকেই (Mature Pod) বাইরে থেকে দেখা যায়। ফলগুলি শুটি জাতীয়। পাকা শুটিগুলি লালচে-বাদামি বর্ণের হয়। প্রতিটি ফল ফলার আকৃতির হয়, লম্বায় ১০-১৫ সেমি X চওড়ায় ১.৫-২ সেমি। প্রতিটি ফলে ১২-২০টি বীজ থাকে। পেকে গেলে ফল থেকে বীজগুলি নিজে থেকেই বিস্তারিত হয়। ২২-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ৫০০-২০০০ মিলিমিটার বার্ষিক বৃষ্টিপাত সুবাবুল গাছের পক্ষে উপযুক্ত। এই গাছ ঠাণ্ডা ও খরা দুই-ই সহ্য করতে পারে। অম্লযুক্ত ও লবণাক্ত উভয় মাটিতেই সুবাবুল গাছ জন্মাতে পারে, পাহাড়ের ঢালু জমিতে ও পার্বত্য পাথুরে মাটিতেও জন্মাতে পারে ,তবে উপযুক্ত নিকাশীর ব্যবস্থা রয়েছে এমন বালিযুক্ত গভীর দোঁয়াশ মাটিতে সুবাবুল গাছ খুব ভালভাবে জন্মায়।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

পাকা ফলের শুটি থেকে বীজগুলি মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে নিজের থেকেই সুবাবুল গাছের প্রসার ঘটে এবং গাছের চারপাশে প্রচুর চারা জন্মাতে দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবে জন্মানো চারা রোপণ করে বা সরাসরি জমিতে বীজ বপন করে সুবাবুল গাছের চাষ করা যেতে পারে। চাষের জন্য নির্দিষ্ট জমিতে আগাছা ঝোপঝাড় থাকলে তা কেটে পরিস্কার করে লাঙ্গল বা ট্রাক্টর দিয়ে ভালভাবে চাষ দিয়ে ও মই দিয়ে জমির ঢাল বজায় রেখে সমান করা হয়। সাধারণত বিভিন্ন প্রকার পতিত জমিতেই সুবাবুলের চাষ করা হয়।

সাধারণত তিনভাবে সুবাবুল গাছ চাষ করা যায়;- ১) সরাসরি জমিতে বীজ বপন করে, ২) পলিথিনের ছোট ব্যাগে বা প্যাকেটে উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে চারা তৈরি করে এবং ৩) সুবাবুল চাষের জমিতে নিজে থেকে জন্মানো চারা সংগ্রহ করে জমিতে রোপণ করে চাষ করা যেতে পারে। সরাসরি বীজ বপন করার জন্য হেক্টর প্রতি ৩-৪ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। চারাগাছ জন্মানোর পরে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে অতিরিক্ত চারা গাছ তুলে ফেলা হয়। সাধারণত ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে বীজ বপন করা হয়। নার্সারীতে



পলিথিন প্যাকেটে ওই একই সময় বীজ বপন করা হয়। দেড় থেকে তিন মাস বয়সের চারা জমিতে রোপণ করা হয়। চারা রোপণ সাধারণত বর্ষাকালে করা হয়। ১.২৭ X ১.২৭ মিটার দূরত্বে চারাগুলি রোপণ করা হলে প্রতি হেক্টর জমিতে ৬২০০টি চারার প্রয়োজন হতে পারে। আরও বেশি দূরত্বে ২ X ২ মিটার দূরত্বে বা ৩ X ১.৫ মিটার দূরত্বে ও চারা রোপণ করা হয়ে থাকে। বেশি ঘন করে চারা রোপণ করলে সুবাবুল গাছের সঙ্গে অন্য কোনও ফসল চাষ করা যায় না। বেশি দূরত্বে চারা রোপণ করলে সাথী ফসল হিসাবে সুবাবুলের চারা রোপণের পর দু-এক বছর আনারস, হলুদ, শাক-সবজি ও ডাল জাতীয় শস্য চাষ করা সম্ভব।

পরিচর্যা –

বছরে দু'বার কোদাল বা নিড়ানীর সাহায্যে মাটি কুপিয়ে জমি থেকে আগাছা পরিষ্কার করার প্রয়োজন হতে পারে। এক বছরের পর থেকেই সুবাবুল গাছের নীচের দিকের ডালগুলি ছেঁটে দিলে গাছটি সোজা হয়ে লম্বায় দ্রুত বাড়তে পারে। সুবাবুল গাছের মূলে রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া থাকে, তাই বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে জমির উর্বরাশক্তিকে বৃদ্ধি করে এই গাছ। তাই সুবাবুল চাষের জন্য নাইট্রোজেনযুক্ত সারের প্রয়োজন হয় না। প্রায় বিনা নাইট্রোজেন প্রয়োগেই সুবাবুলের চাষ সম্ভব। তবে অন্য সার হিসাবে প্রতি হেক্টর জমিতে ২০০ টন জৈবসার, গাছ প্রতি ৫০ গ্রাম হিসাবে ফসফেট ও পটাশ সার প্রয়োগ করতে হয়। চারা রোপণের সময় সেচের প্রয়োজন হয়। বীজ বপনের পরও সেচ দিতে হয়। গ্রীষ্মকালে প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিতে হয়, অন্য সময় সেচের প্রয়োজন হয় না। সাধারণত সুবাবুল গাছে মারাত্মক কোনও রোগপোকার আক্রমণ ঘটে না। তবে কোনও কোনও সময় Fusarium বা Phytopthora নামক ছত্রাকজাতীয় রোগের লক্ষণ দেখা যায়। ছত্রাকনাশক স্প্রে করে এইসব রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

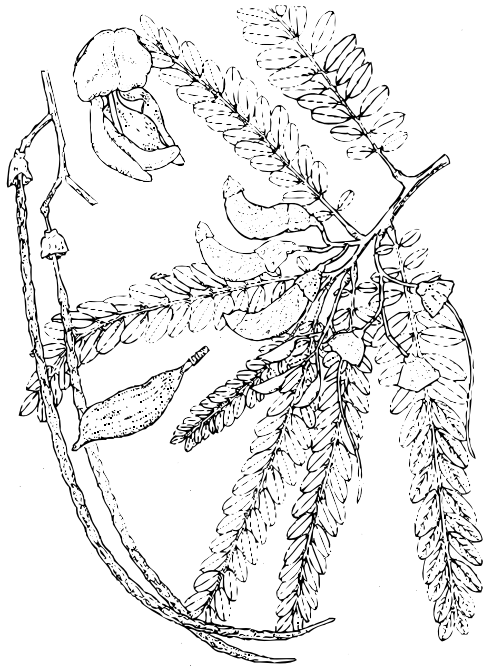
গাছ রোপণের ৩-৪ বছর পর থেকেই ফসল তোলা হয় বা গোটা গাছ কেটে ফেলা হয়। এরপর গাছের গোড়া থেকে যে গজি (শাখা) বের হয়, তার মধ্যে থেকে ২টি সোজা ও সতেজ শাখা রেখে বাকি শাখাগুলি কেটে দেওয়া হয়। এই নতুন শাখাগুলি আবার তিন বছর পর কাটা হয়। এইভাবে একবার রোপণ করার পর তিনবার ফসল কাটা যায়। প্রথমবার প্রতি হেক্টর থেকে ৭৫-৭৮ টন মণ্ড তৈরির কাঠ এবং ২০ টন জ্বালানীর কাঠ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় দফায়, অষ্টম বছরে ৭০ টন মণ্ড তৈরির কাঠ ও ১০ টন জ্বালানীর কাঠ উৎপাদিত হয়। প্রথম বছর থেকে অষ্টম বছরের মধ্যে দু'বার ফসল কাটা যায়। এই আট বছরে সুবাবুল চাষের সমস্ত খরচ-খরচা হিসাব করে দেখা যায় যে, মোট ২৯ হাজার ৪৮৯ টাকা খরচ হয়েছে। চতুর্থ বছরে, যখন প্রথমবার ফসল কাটা হয় তখন ৮০ টন মণ্ড তৈরির কাঠ এবং ২০ টন জ্বালানীর কাঠ পাওয়া যায়। যার বিক্রয়মূল্য ৭২ হাজার টাকা। দ্বিতীয় দফায় ৭০ টন মণ্ড তৈরির কাঠ ও ১০ টন জ্বালানীর কাঠ উৎপন্ন হয়, যার দাম ৬০ হাজার টাকা। অর্থাৎ মোট আয় ১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা।

সুতরাং লাভের পরিমাণ ১ লক্ষ ২ হাজার ৫১১ টাকা (১৩২০০০ – ২৯৪৮৯)। সুদসহ ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ করেও ৫০% লাভ রাখা সম্ভব। এছাড়া পরবর্তী ধাপেও কিছু জ্বালানি, পশুখাদ্য ও কিছু পরিমাণ মণ্ডের কাঠ বিক্রির সুযোগ থাকে। যেহেতু সুবাবুল শিম্বগোত্রের উদ্ভিদ, তাই এর থেকে প্রোটিনযুক্ত পশুখাদ্য পাওয়া যায়। তবে গোরু-মহিষকে প্রচুর পরিমাণে এই খাবার খাওয়ানো উচিত নয়, কারণ এতে Mimosine নামক যে Toxic amino acid থাকে তা বেশি খেলে ক্ষতি হতে পারে। আধুনিক গবেষণায় এর কুপ্রভাব প্রশমিত করার প্রচেষ্টা চলছে। এক বছরে সুবাবুল গাছ থেকে জমিতে যত পাতা ঝড়ে পড়ে, তার পরিমাণ প্রতি হেক্টরে ২০০০-২০০০০ কেজি। যা জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হয় এবং এতে পতিত জমি কৃষিজমিতে পরিণত হতে পারে। এছাড়া প্রতি হেক্টর জমিতে ৫০০ কেজিরও বেশি Nitrogen Fixation হয়। যা গাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য উপযোগী। বিভিন্ন দেশে সুবাবুলের কচি শুটি রান্না করে খাওয়ার রেওয়াজ আছে। সুবাবুল গাছের মধ্যে এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে যা দিয়ে জৈব কীটনাশক প্রস্তুত করা যেতে পারে। সুবাবুল একটি আক্রমণাত্মক প্রকৃতির (Invasive) গাছ। যা স্বাভাবিক উদ্ভিদকে ধ্বংস করে আগাছার মতো বিস্তারলাভ করে। সুবাবুলের বীজ পেটের যন্ত্রণা কমাতে, বীজের মধ্যেকার রাসায়নিক পদার্থ ক্যানসার সারাতে ও কৃমিনাশ করতে উপকারী। বীজ থেকে যে উৎপন্ন তেল Biodiesel শিল্পে ব্যবহার করা যায়।

জাত পরিচিতি –

সুবাবুলের চার ধরনের জাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা, Hawaiian type, Salvador type, Peru type এবং Cunningham type

তথ্যসূত্র – Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical ofLeucaena Leucocephala. https://www.researchgate.net/publication/23663220



বকফুল

পরিচয় –

বকফুলের বিজ্ঞানসম্মত নাম Sesbania grandiflora, এটি Fabaceae গোত্রের মাঝারি আকারের ঝাড়জাতীয় একটি উদ্ভিদ।

আদি বাসস্থান

বাংলায় এই গাছের অনেক নাম র্যেছে। যেমন, বক, বকে, বগ, বকফুল, বগফুল, অগস্তা, অগাতি ইত্যাদি।

বকফুল গাছ শিম বা মটর গোত্রের মাঝারি উচ্চতার উদ্ভিদ। তবে দেখতে মোটেই শিম বা মটরের মতো নয়। ফুলের গড়নে কিছুটা মিল থাকলেও পাতা ও গাছের সঙ্গে কোনও মিল নেই। ফুলের আকার-আকৃতি দেখে মনে হয়, ঠিক যেন বকের ঠোঁটের মতো বোঁটায় ঝুলে রয়েছে। তাই এইরকম নামকরণ করা হয়েছে। সাধারণত সাদা, লাল ও গোলাপী, এই তিন রঙের বকফুল দেখতে পাওয়া যায়। লাল ফুলের জাতটির আদি বাসস্থান থাইল্যান্ড। ফুলগুলি গুচ্ছাকারে প্রতিটি বোঁটার অগ্রভাগে বিন্যস্ত থাকে।

অনুর্বর, ক্ষারীয়, অম্লীয়, লবণাক্ত, বেলে, এঁটেল, খারাপ নিকাশীযুক্ত প্রভৃতি যে কোনও ধরনের মাটিতেই বকফুল গাছ হয়। তবে মাটির ধরণের উপর গাছের বৃদ্ধি নির্ভর করে। এই গাছ পাহাড়েও জন্মাতে পারে। পাহাড়ের ঢালে ছায়াদানকারী গাছ হিসেবে বকফুল খুব উপযোগী হতে পারে। যেসব অঞ্চল বছরে প্রায় ৯ মাস শুষ্ক থাকে বা খরাপ্রবণ থাকে সেইসব এলাকায় বকফুল গাছ লাগিয়ে জমিকে দ্রুত সবুজ করে তোলা যায়। গড়ে ২০-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এই গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। অল্প শৈত্য সহ্য করতে পারে। তবে তুষারপাত সহ্য করতে পারে না।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

বকফুল চাষের জন্য বীজ থেকে সহজেই চারা তৈরি করা যায়। শরৎকাল থেকে হেমন্তকালে ফোঁটা ফুলের বীজ হয় বসন্তকালে। তখন বীজতলায় বীজ বপন করতে হবে। বীজতলায় তৈরি করা চারার বয়স ৩০-৪০ দিন হলেই তা তুলে মূল জমিতে রোপণ করা যায়। বীজতলার পরির্বতে পলিব্যবাগেও চারা তৈরি করা যায়।

চারা রোপণের সবচেয়ে ভাল সময় গ্রীষ্মকাল ও বর্ষাকাল। আষাঢ় মাসে লাগানো গাছের সঠিক যত্ন নেওয়া হলে কার্তিক মাস গাছে থেকেই ফুল ফুটতে শুরু করে।গাছ থেকে বীজ সংগ্রহের পর খুব দ্রুত তা বপন করাই ভাল।

দেখা গেছে, বীজ ছাড়া গাছের পরিণত ডাল কেটে লাগালে তাও বেঁচে যায় এবং নতুন গাছের জন্ম দিতে পারে।

জমি তৈরি করার পর, ৩০ সেমি গর্ত করে তা মাটি ও জৈবসার দিয়ে ভরাট করতে হয়। সাধারণত সারি করে ২ মিটার দূরে দূরে চারাগুলিকে রোপণ করতে হয়। বীজতলায় চারা তৈরি না করেও মূল জমিতে সরাসরি বীজ বপন করেও এই চাষ করা যেতে পারে। ৯ মাসের মধ্যেই গাছের উচ্চতা ৫-৬ মিটার হয়ে যায়।

পরিচর্যা –

উপযুক্ত সেচ পেলে বকফুল গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। তবে বর্ষাকালে এমনিই গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়, বৃষ্টির অভাব ঘটলে নিয়মিত সেচের প্রয়োজন হয়।

যেহেতু কম উর্বর মাটিতেও এই গাছ জন্মাতে পারে, তাই রাসায়নিক সার প্রয়োগ না করলেও চলে।

বকফুল গাছে অনেক সময় রোগপোকার আক্রমণ হয়। রোগের মধ্যে শিকড়ে কৃমিজনিত গিঁট, পাতায় ছত্রাকজনিত ধূসর দাগ, ভাইরাসজনিত মোজাইক রোগ ইত্যাদি প্রধান। রোগের উপদ্রব কমানোর জন্য গাছের আশপাশ সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। তাতেও যদি রোগ দমন না হয় তবে উপযুক্ত কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও গাছে বিভিন্ন ধরনের পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন কাণ্ডছিদ্রকারী পোকা, পাতা জড়ানো পোকা ইত্যাদি। কৃমিজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য গাছের গোড়ার মাটিতে নিমের খোল বা ফুরাডান নামক দানাদার কীটনাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বকফুল গাছের ভাল ও মজবুত গড়নের জন্য ডাল ছাটাই করা প্রয়োজন। এতে গাছ বেশি ঝোপযুক্ত হয়ে খাটো থাকে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –



বকফুল ২০ বছর বেঁচে থাকলেও ভাল ফলনের জন্য গাছগুলি অতদিন রেখে দেওয়া ঠিক নয়। প্রতি ৩ বছর অন্তর নতুন গাছ লাগালে ফলন ভাল হয়। সাধারণত রোপণের সর্বোচ্চ এক বছরের মধ্যে গাছে ফুল ধরে।

সবজি হিসেবে বকফুল অতি উত্তম, মুখরোচক, সুস্বাদু, পুষ্টিকর একটি ফুল। বকফুলে প্রোটিন, ফ্যাট, খনিজ লবণ, আয়োডিন, কার্বোহাইড্রেট, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন – D ও ভিটামিন – C রয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বকফুল গাছের প্রায় প্রতিটি অংশই ভেষজ চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। জ্বর, ফোলা ও ব্যাথার উপশমে এই গাছের মূল ব্যবহার করা হয়। বাতের ব্যথায় শিকড় চূর্ণ জলের সঙ্গে গুলে ব্যাথা জায়গায় ঘষলে বা প্রলেপ আকারে লাগালে উপকার পাওয়া যায়। গাছের ছাল বসন্ত রোগের চিকিৎসায় কাজে লাগে। ফিলিপাইনস্-এ এই গাছের ছাল মুখের আলসার সারাতে ব্যবহার করা হয়। চুলকানি-পাঁচড়া সারাতে কম্বোডিয়ায় ছালের চূর্ণ লাগানো হয়। কৃমি ও জ্বর সারাতে বকফুল গাছের পাতার রস খাওয়ানো হয়। এছাড়া মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, দাঁত ও হাড় মজবুত করে, রক্তের কোলেস্টেরল মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে, খাদ্যনালির ক্যানসার প্রতিরোধ করে, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখে ও আয়োডিনের ঘাটতি পূরণে বকফুল সহায়ক। গাছের ছাল ও শিকড় ওষুধ তৈরিতে কাজে লাগে।

এই গাছের বিভিন্ন অংশ জ্বালানি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

তথ্যসূত্র - wikipedia http://www.flowersofindia.net



নেপিয়ার

পরিচয় –

নেপিয়ারের বিজ্ঞানসম্মত নাম Pennisetum purpureum, এটি Poaceae গোত্রের বহুবর্ষজীবী ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ।

আফ্রিকা মহাদেশের তৃণভূমি নেপিয়ারের আদি জন্মস্থান, যা স্বাভাবিক নিয়মেই জন্মায়। তবে বর্তমানে কৃষি গবেষণাগারে সংকরায়ন ঘটিয়ে এই ঘাসের উচ্চফলনশীল জাত আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। উচ্চফলনশীল এই ঘাস ডেয়ারী শিল্পের প্রয়োজনে পশুখাদ্য তৈরির জন্য বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক চাষে পরিণত হয়েছে।

নেপিয়ার একটি লম্বা জাতের ঘাস, উচ্চতায় ২-৪ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। কাণ্ডটি আখ বা ভূট্টা গাছের থেকেও মোটা হতে পারে। কাণ্ডের নীচের দিকের পর্বগুলি থেকে অস্থানিক মূল বের হয়। ঘাসের পাতার ফলকটি অবৃন্তক, নীচের দিকটা কাণ্ডবেষ্টক। কাণ্ডকে বেষ্টন করে থাকা পাতার এই অংশটিকে পত্রাবরণী বলা হয়। এটি মসৃণ বা রোমযুক্ত হতে পারে। পত্রফলকটি লম্বায় ১২০ সেমি এবং চওড়ায় ৫ সেমি হয়। পাতার কিনারা খসখসে ধারালো হয়। নেপিয়ারের ফুলগুলি সোজা মঞ্জরীদন্ডের উপর ঘনসন্নিবিষ্টভাবে জন্মায়। প্রচুর রোমে ঢাকা মঞ্জরীদন্ডটি লম্বায় ১০-৩০ সেমি এবং ১-৩ সেমি ব্যাসযুক্ত হয়। ফুলগুলি সোনালি-বাদামি বা লালচে রঙের হয়। নেপিয়ারের বীজ খুব বেশি হয় না। ফুল ও ফল অগাস্ট থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে জন্মায়।

উষ্ণ জলবায়ু যুক্ত অঞ্চলে নেপিয়ার জন্মায়। কম-বেশি ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার সঙ্গে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো এবং ৮০০-১০০০ মিলিলিটার বার্ষিক বৃষ্টিপাত এই ঘাস চাষের জন্য উপযুক্ত।

হালকা দোঁয়াশ ও বেলে মাটিতে নেপিয়ার ঘাস খুব ভাল হয়। তবে উপযুক্ত নিকাশীর সুবিধাযুক্ত যে কোনও মাটিতেই এই ঘাস জন্মাতে পারে। মাটিতে অম্লতা ও ক্ষারের মাত্রা ৫-৮ PH হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

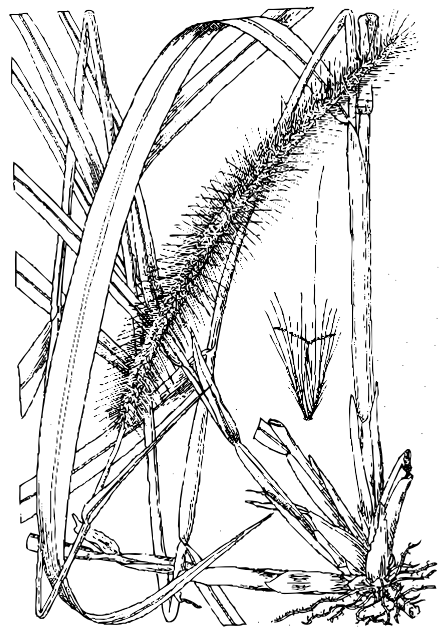
প্রতি একর জমিতে ১০ টন পরিমাণ জৈবসার (FYM) প্রয়োগ করে জমিতে লাঙল বা ট্রাক্টর দিয়ে তিনবার চাষ দিতে হয়। মই দেওয়ার জন্য জমির ঢাল বজায় রেখে জমি সমান করা হয়।

বীজ বপন করে চাষ করলে অঙ্কুরোদ্গম সব সময় ঠিকঠাক নাও হতে পারে। এছাড়া এক্ষেত্রে বেশি সময় লাগতে পারে ও উৎপাদনেও তারতম্য ঘটতে পারে। তাই সাধারণত উচ্চফলনশীল ঘাস কাটিং (কাণ্ডের টুকরো)–এর মাধ্যমে চাষ করা হয়। দু'প্রকার পদ্ধতিতে কাটিং রোপণ করা হয়। ১৫-২০ সেমি চওড়া এবং ১৫-২০ সেমি গভীরভাবে সারি তৈরি করা হয়। দুটি সারির মধ্যে ৯০ সেমি থেকে ১ মিটার দূরত্ব রাখা হয়। এরপর প্রতি সারিতে ৬০ সেমি দূরত্ব বজায় রেখে গর্ত করে জৈবসার দিয়ে কাটিংগুলি তেরছাভাবে রোপণ করা হয়। তিনটি পর্বযুক্ত কাটিং-এর দুটি পর্ব মাটির ভিতরে থাকবে এবং তৃতীয় পর্বটি মাটির উপরে থাকবে। এইভাবে রোপণের জন্য প্রতি একরে ১৬ হাজার কাটিং-এর প্রয়োজন হয়।

নেপিয়ার ঘাসের রোপণের আধুনিক পদ্ধতি হল 'তম্বুকিজ' পদ্ধতি – এই পদ্ধতিতে গোলাকার বা আয়তকার গর্ত কাটা হয়। গোলাকার গর্তের ক্ষেত্রে ৬০ সেমি ব্যাসের গর্ত তৈরি করে সারি প্রস্তুত করা হয়। দুটি গর্তের মধ্যে ৯০ সেমি ব্যবধান রাখা হয় এবং দুটি সারির মধ্যে ৬০ সেমি দূরত্ব রাখতে হয়। এইভাবে আয়তকার গর্তগুলি করা হয় এবং প্রতিটি গর্তে ৫-১০টি কাটিং রোপণ করা হয়।

নেপিয়ার ঘাসের সারি দুটির বা গর্তগুলির চারপাশের খালি জায়গায় শিম্বজাতীয় উদ্ভিদ চাষ করা যায়। ডেসমোডিয়াম, স্টাইলোজ্যান্থেস, ম্যাক্রোটাইলোমা প্রভৃতি গাছের বীজ বপন করা হয়। প্রতি হেক্টরে ৩-৪ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। এই গাছগুলিও পশুখাদ্য হিসাবে নেপিয়ার ঘাসের সঙ্গে গরু-মহিষকে খাওয়ানো হয়।

পরিচর্যা –



প্রতিবার ফসল কাটার পর মাটি কুপিয়ে আগাছা দমন করা হয়। সাথী ফসল লাগালে আগাছা জন্মানোর সুযোগ থাকে না।

জমি প্রস্তুতির সময় ১০ টন জৈবসারের (FYM) সঙ্গে ৩৮ কেজি অ্যামোনিয়াম সালফেট, ৬০ কেজি সুপার ফসফেট, ৮ কেজি পটাশ সার, ৬৫ কেজি ইউরিয়া প্রতি বছর প্রয়োগ করতে হয়।

যেহেতু একই জমি থেকে তিন বছর ফসল কাটা হয়, তাই প্রতি বছর একই পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হয়।

কাটিং রোপণের তিনদিন পর প্রথম সেচ দিতে হয়। গ্রীষ্মকালে ৩-৪ দিন অন্তর সেচ দিতে হয়। প্রতিবার ফসল কাটার পর ইউরিয়া প্রয়োগ করে সেচ দিতে হয়।

যেহেতু ৬-৯০ দিনের মধ্যে ফসল কেটে নেওয়া হয়, তাই সেভাবে রোগপোকার আক্রমণের সুযোগ থাকে না। তবুও প্রয়োজন হলে জৈব কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, যদি কোনও কারণে রাসায়নিক কীটনাশক যেমন, ২ মিলিলিটার Dichlorovos বা ১০ মিলিলিটার Monochrotophos প্রতি লিটার জলে গুলে প্রয়োগ করার প্রয়োজন পড়ে তবে তা স্প্রে করার ৪৫ দিন পর্যন্ত ফসল কাটা যাবে না।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

সাধারণভাবে চাষ করলে ৩-৪ মাস অন্তর ফসল কাটা যায়। রোপণ করে চাষে ধারাবাহিকভাবে ফসল তোলা যেতে পারে। তবে আধুনিক পদ্ধতিতে ৪৫-৬০ দিন অন্তর ফসল তোলার জন্য উপযুক্ত পরিচর্যা, সার প্রয়োগ ও সেচের বিষয়ে প্রচুর যত্ন দিতে হয়। ফসল তোলার সময় প্রতিটি ঘাসের গোড়ার দিক থেকে ১০ সেমি উপরে কাটতে হয়। কারণ গোড়াগুলি থেকে নতুন ঘাস জন্মায়।

কাঁচা-সবুজ ঘাস ডেয়ারীতে সরবরাহ করা হয় বা স্থানীয় পশুপালনকারীদের বিক্রি করা হয়। অতিরিক্ত ঘাস মেশিনের সাহায্যে মিহি করে কেটে অন্য পশুখাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে শুকনো করে প্যাকেট বা বস্তায় ভর্তি করে বাজারজাত করা হয়।

মুলত পশুখাদ্য হিসাবে নেপিয়ার ঘাস ব্যবহৃত হয় এবং ডেয়ারীতে সরবরাহ করা হয়। এক একর জমি থেকে নেপিয়ার ঘাস ২টি বা ৩টি ডেয়ারীর খাদ্যের যোগান দিতে পারে। এই ঘাস খাওয়ালে প্রতিটি গরুর প্রতিদিন ২০০ মিলিলিটার পর্যন্ত দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যে রাজ্যে ধান চাষ কম হয় সেখানে খড়ের অভাব দুর করার জন্য নেপিয়ের চাষ লাভজনক।

নেপিয়ার ঘাস পশুখাদ্য হিসাবে, 'পুশ-পুল' পদ্ধতিতে চাষ করে মূল ফসলের রোগপোকার আক্রমণ প্রতিহত করতে, ডেয়ারী শিল্পে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে খুবই উপকারী। জঙ্গলে এই ঘাস চাষ করলে বন্যপ্রাণীদের খাদ্যের ঘাটতি মেটানো সম্ভব হয়। এছাড়া ভূমিক্ষয় রোধ করতে এই ঘাস খুব কার্যকর। সম্প্রতি বায়োমাস, বায়ো গ্যাস ও বায়ো ওয়েল তৈরির কাজেও নেপিয়ার ব্যবহৃত হচ্ছে।

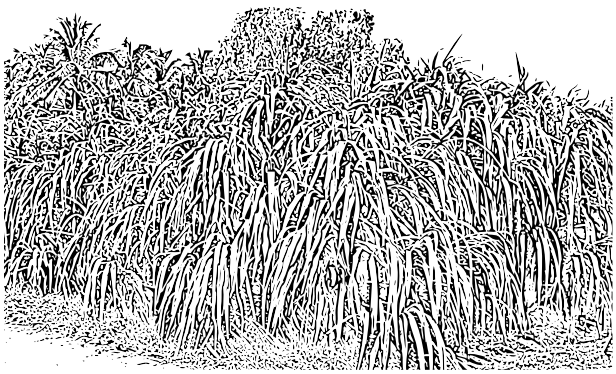
নেপিয়ার ঘাসে ১৬.২০% ড্রাই ম্যাটার, ক্রুড প্রোটিন ৯.৩%, ক্যালসিয়াম ০.৮৮%, ফসফরাস ০.২৪%, ২.৯৭% ওকালেটস্ থাকে এবং এর ডাইজেস্টিবিলিটি ৫৮%

প্রতি হেক্টর জমিতে নেপিয়ার চাষ করলে তিন বছরে মোট আনুমানিক খরচ হয় ১ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৬৩ টাকা। কিন্তু ওই তিন বছরে আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৮০ হাজার ৮০০ টাকা। অতএব ১ হেক্টর জমিতে তিন বছর নেপিয়ার চাষে আনুমানিক লাভের পরিমাণ হয় ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৩৭ টাকা।

জাত পরিচিতি –

সাধারণত ফ্রেঞ্চ ক্যামেরুন, ক্লোন ১৩, কাকামেজা ছোট জমির পক্ষে উপযুক্ত জাতের নেপিয়ার। তামিলনাড়ু এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা ২০০৩ সালে বজরা ও পেনিসিটাম পারপিউরিয়াম ঘাসের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে Co3 নামের উচ্চফলনশীল জাতের নেপিয়ার আবিষ্কার করেন। এরপর Co3 জাতের সঙ্গে পেনিসিটাম অ্যামেরিকানাম ঘাসের মিলন ঘটিয়ে Co4 নামে অন্য একপ্রকার উন্নত জাতের হাইব্রিড ঘাসের সৃষ্টি করেছেন। প্রতি হেক্টর জমিতে ৪০০ মেট্রিক টন এই ঘাস উৎপাদন হতে পারে। একই জমিতে ৯০ দিন অন্তর ফসল কাটা যায়। এইভাবে বছরে তিনবার ফসল তোলা সম্ভব।

তথ্যসূত্র – indiaeng.com/Kaveripakkam/01-hybrid_napier_grass.htm



Co-5

Co-5 মূলত নেপিয়ার ঘাসেরই একটি উন্নত জাত। Pennisetum glaucum (Cumbu IP 20594) এবং P. purpureum Schumach (FD 437), এই দুই জাতের নেপিয়ার ঘাসের সংকরায়ন ঘটিয়ে Co-5 জাতটি তৈরি করা হয়েছে।

সেচের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকলে সারা বছর ধরেই এই ঘাসের চাষ করা যেতে পারে। পশুখাদ্যে অন্যান্য ঘাসের মতোই বিভিন্ন মাটিতে Co-5 নামক এই বহুবর্ষজীবী ঘাসটি জন্মাতে পারে। ৪-৫ বছর পর্যন্ত এই ঘাস জমিতে থাকতে পারে।

C0-5 ঘাসটি উচ্চতায় ৪০০-৫০০ সেমি হয়। প্রতিটি গাছে ৪০০-৪৩০টি পাতা থাকে। ঘাসের পাতাগুলি দৈর্ঘ্যে ১০০-১১০ সেমি এবং প্রস্থে ৪.০-৫.০ সেমি হয়।

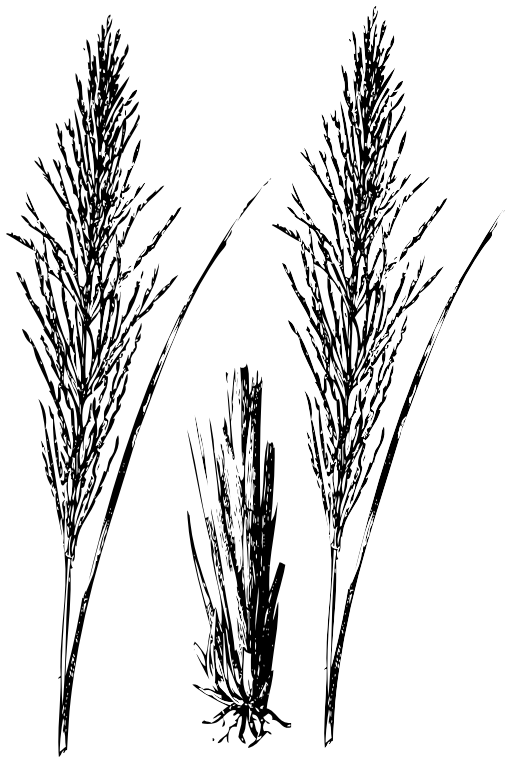
বছরের যে কোনও সময় এই ঘাসটি রোপণ করা যায়। ২-৩ বার চাষ দিয়ে রোপণের আগে ভাল করে জমি তৈরি করতে হয়। জমিতে কম-বেশি ৬০ X ৫০ সেমি দূরত্ব বজায় রেখে Co-5 রোপণ করতে হয়। রোপণের পরপরই জল দিতে হয়। পরবর্তী সময়ে ১০দিন বা তারও বেশিদিন অন্তর প্রয়োজনমতো একবার করে জল দেওয়ার দরকার হতে পারে। অন্যান্য পশুখাদ্যের ঘাসের মতই এই ঘাস চাষের ক্ষেত্রে জমিতে জৈবসার এবং NPK প্রয়োগ করা যেতে পারে।

প্রয়োজন পড়লে হাত দিয়ে আগাছা দমন ছাড়া Co-5 চাষে আলাদা করে তেমন কোনও পরিচর্যার দরকার পড়ে না।

রোপণের ৭৫-৮০ দিন পর জমি থেকে পশুখাদ্য হিসাবে এই ঘাস সংগ্রহ করা যায়। এরপর প্রতি ৪৫ দিন অন্তর একবার করে ফসল কাটা হতে পারে। বছরে প্রতি হেক্টর জমি থেকে ৩৬০ টন পশুখাদ্য উৎপন্ন হতে পারে।

অসীম পুষ্টিগুণের কারণে বর্তমানে পশুখাদ্য হিসাবে ব্যাপকভাবে এই ঘাসটির চাষ করা হচ্ছে। প্রতি হেক্টর জমি Co-5 চাষ করলে ৮০ টন Dry matter yield, ৯.৬ টন Crude protein yield, ২২% Dry matter, ১২% Crude protein এবং ২.৪% Oxalate পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র – TNAU (Tamil Nadu Agricultural University)



ভেটিভার

পরিচয় –

ভেটিভারের বিজ্ঞানসম্মত নাম Chrysopogon zizanioides, এটি Poaceae গোত্রের ঘাসজাতীয় বহুবর্ষজীবী একবীজপত্রী উদ্ভিদ।

ভারত এই ঘাসের আদি জন্মস্থান। পৃথিবীর উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে এই ঘাসটি জন্মায়। ভারতের সমতল ও নিচু পাহাড়ি জমিতে এই ঘাসটি জন্মাতে দেখা যায়। কেরালা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশা সহ আরও কয়েকটি রাজ্যে এই ঘাস জন্মায়। কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে বাণিজ্যিকভাবে এই ঘাসের চাষ হয়। মায়ানমার ও শ্রীলঙ্কাতেও এই ঘাস জন্মায়। বর্তমানে হাইতি, ইন্দোনেশিয়া ও ফ্রান্সের কিছু অংশে ভেটিভার চাষ হচ্ছে।

তামিল শব্দ 'ভেট্টিভার' থেকে ভেটিভার শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। সংস্কৃতে ভেটিভারকে উসিরা, তেলেগুতে ভেট্টিভেরু, তামিল ও মালায়লম ভাষায় ভেট্টিভার, হিন্দিতে খস ও বাংলায় এটি খসখস ঘাস নামে পরিচিত।

ভেটিভার ঘাসটি ঝাড় হিসাবে জন্মায়। ঝাড়টি ১-৩ মিটার পর্যন্ত উচ্চতায় হতে পারে। পাতাগুলি ঘনসন্নিবিষ্টভাবে ঝাড়ের গোড়া থেকেই বের হয়। পাতাগুলি শক্ত ও কিনারা নিম্নমুখী, খসখসে ও ধারালো, লম্বায় ৭৫ সেমি পর্যন্ত এবং চওড়ায় ৮ মিলিমিটার হয়। পাতার ফলকটি দুই ভাজ অবস্থায় থাকে। ফুল শাখাপ্রশাখাযুক্ত মঞ্জরীদন্ডের উপর জন্মায়। ফুলগুলি লালাচে-বাদামি রঙের হয়। মঞ্জরীদন্ডটি ১৫-৩০ সেমি লম্বা হয়। প্রতিটি ফুলে তিনটি পুংকেশর ও পালকের মতো দুটি গর্ভকেশর থাকে।

ভেটিভার উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের উদ্ভিদ। শুষ্ক ও আর্দ্র, এই দুই অবস্থাতেই জন্মাতে পারে। অধিক ঠাণ্ডা ও গরমে গাছের বৃদ্ধি হ্রাস পায়। ৩০-৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ১০০-২০০ সেমি বার্ষিক বৃষ্টিপাত ভেটিভার গাছের উপযুক্ত।

মাটিতে অম্লতা ও ক্ষারের মাত্রা ৬-৮ PH ভেটিভার চাষের উপযুক্ত। অল্প বেলে মাটি ও লাল ল্যাটেরাইট মাটিতে এটি ভাল জন্মায়।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

বীজ বপন করে উত্তর ভারতে ভেটিভারের চাষ হয়। এছাড়া ভেটিভারের ঝাড়ের গোড়া থেকে পাশকলি বা slip ভেঙে, ডগাগুলি কেটে তা রোপণ করেও ভেটিভারের চাষ হয়ে থাকে।

চাষ দেওয়া জমিতে জৈবসার (FYM) প্রয়োগ করে মাটি প্রস্তুত করা হয়।

জমিতে মুলত তিনভাবে ভেটিভার রোপণ করা যায়। প্রথমত উপযুক্ত জমিতে ৩০-৩৮ সেমি উঁচু, ৪৮ সেমি চওড়া ভেলি বা দাঁড়া তৈরি করে ২৩ সেমি দূরত্বে একটি করে Slip রোপণ করা যায়। আবার ৩০ সেমি উঁচু ও ৬৮ সেমি চওড়া বেড তৈরি করে ২২.৫ সেমি দূরত্বে ২-৩টি Slip একসঙ্গেও রোপণ করা যায়।

এছাড়া ৪৫ সেমি উঁচু ও ৬০ সেমি চওড়া বেড তৈরি করে দুটি বেডের মধ্যে ৩০ সেমি ফাঁক রেখে ১৫ সেমি দূরত্বে একসঙ্গে ২-৩ টি Slip রোপণ করা যেতে পারে।

পরিচর্যা –

প্রাথমিক অবস্থায় জমি প্রস্তুতির সময় জমিতে জৈবসার ১০ মেট্রিক টন প্রতি হেক্টরে প্রয়োগ করে তাতে ৬০ কেজি নাইট্রোজেন, ২২.৫ কেজি করে ফসফেট ও পটাশ সার প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

রোপণের পর প্রাথমিক অবস্থায় এক বা দু'বার মাটি কুপিয়ে মাটি সুন্দরভাবে আলগা করে ও ড্রেসিং করে সমান করে দিতে হয়। প্রতিবার ফসল তোলার সময় এইভাবে পরিচর্যা করলে স্বাভাবিক বৃদ্ধি বজায় থাকে।

সাধারণত ভেটিভার চাষে কোনও রোগপোকার আক্রমণ ঘটে না। শুষ্ক অঞ্চলে কখনও উঁই পোকা ও পিঁপড়ে গাছের মূলে বাসা তৈরি করে। এছাড়া পাতায় ধসা রোগের ও এক ধরনের ছত্রাকের আক্রমণ ঘটে। এক্ষেত্রে কিছু ছত্রাকনাশক স্প্রে করা যেতে পারে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –



ভেটিভারের ফসল হল তার মূল। রোপণের ১০-১২ মাস পর ভেটিভার গাছের মূল সংগ্রহ করার জন্য উপযুক্ত হয়ে যায়। কেরালায় ১৮ মাস বয়সের গাছের মূল সংগ্রহ করে ৪৫ সেমি লম্বা ফলাযুক্ত মাটি খোড়ার কোদাল বা যন্ত্র দিয়ে মাটি কেটে ভেটিভারের ঝাড় সমেত উপড়ে ফেলা (৫০-৬০% মূল) হয়, অবশিষ্ট মূল মাটির মধ্যে রয়ে যায়। ভেটিভারের ঝাড় পাইপ বা কাঠের গুঁড়িতে আছাড় মেরে মূলের সঙ্গে লেগে থাকা মাটি ও পাথর ঝড়িয়ে মূলগুলি ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে সংগ্রহ করে বান্ডিল করে বাঁধা হয়।

পরিণত ভেটিভার ঝাড়ে ফুল আসার পর মূল সংগ্রহ করলে, সেই মূল থেকে উন্নতমানের তেল পাওয়া যায়। উৎকৃষ্টমানের তেল পেতে হলে রোপণের ২৪ মাস পরে মূল সংগ্রহ করতে হবে। মূলের থেকে তেল নিষ্কাশন দু'ভাবে হতে পারে, প্রথমে মূলগুলি পরিষ্কার করে ১২ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। তারপর মূলগুলি ৫-১০ সেমি লম্বা করে কেটে ডিস্টিলেশন (বাস্পায়ন বা Steam distillation পদ্ধতি) করা হয়। বাণিজ্যিকভাবে এই পদ্ধতি লাভজনক হলেও, এতে ভাল মানের তেল পাওয়া যায় না। তবে জলের মাধ্যমে ডিস্টিলেশন করলে উন্নতমানের তেল পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ডিস্টিলেশন করার জন্য ১২-৩৬ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে।

এক হেক্টর জমি থেকে ৫-৭ টন মূল উৎপন্ন হয়। ডিস্টিলেশন করে ১৫-১৬ কেজি তেল উৎপাদন করা যায়। ভেটিভার তেল হালকা হলুদ রঙের হয়। এর মধ্যে ৬৫-৭৫% Veteverol থাকে।

ভেটিভারের মূল বা শিকড় সংগ্রহ করে বান্ডিল করে বেঁধে বাজারে বিক্রি করা হয়। এর তেলও সুগন্ধি তৈরির কাজে ব্যবহার হয়। ভেটিভারের মূল থেকে মাদুরের মতো একপ্রকার জিনিস তৈরি করা হয়, যাকে খস্‌খস্‌ বলা হয়। গরমকালে এই খস্‌খস্‌ে জল স্প্রে করে একদিকে যেমন ঘর ঠাণ্ডা রাখা যায়, আবার ঘরকে সুগন্ধে ভরিয়ে তোলা যায়। এছাড়া জলের পাত্রকে খস্‌খস্‌ দিয়ে ভাল করে ঢেকে রাখলে তা ঠাণ্ডা রাখা যায়।

মাটিতে ভেটিভারের মূল অনেক নিচ অবধি প্রসারিত থাকে। তাই এই গাছ ভূমিক্ষয় রোধ করে। অনেক সময় নদী ভাঙন রুখতে এই ঘাস লাগানো হয়। এছাড়া এই ঘাস জলের স্রোতকে বাধা দেওয়ার কারণে জলের গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত হয় ও মাটির জলশোষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

এছাড়া তৃণভোজী প্রাণীর পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাদ্য হিসাবেও ভেটিভার ঘাস ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে ৫২২ কিলো ক্যালরি শক্তি, ৫১% খাদ্যতন্তু, ১৩.১% প্রোটিন এবং ৩.০৫% ফ্যাট থাকে।

লস্যি ও সরবতকে সুগন্ধযুক্ত করার কাজেও ভেটিভার ব্যবহৃত হয়।

পাতন পদ্ধতিতে ভেটিভারের মূল থেকে প্রাপ্ত Essential oil সেন্ট বা সুগন্ধি তৈরিতে কাজে লাগে। সারা পৃথিবীতে বছরে প্রায় ২৫০ টন ভেটিভার উৎপন্ন হয়।

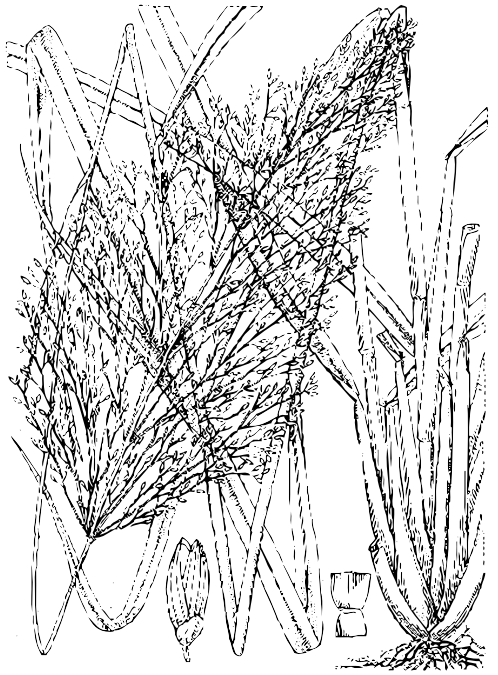
বহুকাল ধরে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে বিভিন্ন রোগের প্রতিরোধে এই গাছ ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই ঘাস দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় ঘরের চাল ছাইতে ব্যবহার করা হয়। জীবাণুমুক্ত করতে ভেটিভারের মূল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এছাড়া দড়ি তৈরি করতে এটি ব্যবহৃত হয়। এর শিকড় দিয়ে তৈরি গহনা দেবতার অঙ্গসজ্জায় ব্যবহৃত হয়। তৈলাক্ত মাটি বা মাটিতে তেল পড়ে গেলে সেই তেল দূষণ দূর করতে ভেটিভার গাছ ব্যবহার করা হয়। মশা ও উঁই পোকার উপদ্রব থেকে বাঁচতেও এর ব্যবহার হয়ে থাকে।

জাত পরিচিতি –

সাধারণত ভারতে দুই জাতের ভেটিভার পাওয়া যায়। Seedling type ও non-seedling type, উত্তর ভারতে সাধারণত Seedling type ভেটিভারের চাষ হয়ে থাকে।

তথ্যসূত্র – http://www.agriinfo.in/default.aspx?page=topic&superid=2&topicid=1403 wikipedia



গিনি ঘাস

পরিচয় –

গিনি ঘাসের বিজ্ঞানসম্মত নাম Panicum maximum Jacq., এটি Poaceae গোত্রের উদ্ভিদ।

আফ্রিকার অ্যাঙ্গোলা, বেনিন, বোতসওয়ানা, ক্যামেরুন, কোট দে আইভরি, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, ঘানা, কেনিয়া, লেসোথো, লাইবেরিয়া, মালাউই, মোজাম্বিক, নামিবিয়া, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুদান, সোয়াজিল্যান্ড, তানজানিয়া, উগান্ডা, জাম্বিয়া ও জিম্বাবোয়ে ছাড়াও ভারত মহাসাগরের মাদাগাস্কার, মরিশাস এবং এশিয়ার ইয়েমেনকে এই ঘাসের আদি জন্মস্থান বলে মনে করা হয়।

ইংরেজিতে গিনি ঘাসকে Guinea grass, Tanganyika grass বা Buffalograss বলে। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিনি ঘাস বিভিন্ন নামে পরিচিত। আরব দেশগুলিতে Hhash el gina, আর্জেন্টিনাতে Pasto guinea, Mijo de guinea, ব্রাজিলে Capim guinea, Capim-coloniao, capim de Angola, Capim de feixe, Erva da guinea ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে গিনি ঘাসকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়।

গিনি ঘাস খুব পরিবর্তনশীল একটি প্রজাতি। হালকা থেকে ঘন হয়ে গুচ্ছাকারে থাকে। খাড়া বা কোণাকুণিভাবে ঊর্ধমুখী হয়। রাইজোম বিশিষ্ট বহুবর্ষজীবী এই শক্ত ঘাসটি উচ্চতায় ২ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এর পাতাগুলির কিনারা রৈখিক বা ভল্লাকার হয়ে থাকে। মঞ্জরীদণ্ডটি উন্মুক্ত, আয়তকার বা পিরামিড আকৃতির হয়। প্রাথমিক অবস্থায় ফুলগুলি আয়তকার বা গোলাকারভাবে সজ্জিত থাকে। শরীরবৃত্তীয় বা কৃষি-সংক্রান্ত বৈচিত্র্যের কারণে এই ঘাসকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। একটি হল, TM (Tall বা Medium type) – ফুলের থোকার দৈর্ঘ্য ১.৫ মিটারের বেশি হয় এবং অপরটি S প্রকার (Short type) – দৈর্ঘ্যে ফুলের থোকাগুলি ১.৫ মিটারের কম হয়।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২০০০ মিটারের বেশি উচ্চতায় ও উষ্ণ মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে গিনি ঘাস জন্মায়। S-type–এর ঘাসটি বার্ষিক ৮০০ মিলিমিটার বা তার কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে এবং ১০০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে TM-type–এর ঘাসটি জন্মাতে পারে। সাধারণত এই ঘাস ৪ বা ৫ মাস খরা সহ্য করতে পারে না। তবে অল্প সময়ের জন্য বন্যা সহ্য করতে সক্ষম। সম্পূর্ণ সূর্যের আলোয় এই ঘাসের বৃদ্ধি ভাল হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, ৩০% ছায়ায় এই গাছের বৃদ্ধির হার ভালই থাকে। তবে ছায়ার পরিমাণ ৫০% ফলন অর্ধেক হয়ে যায়।

নিকাশীর সুবন্দোবস্তযুক্ত যে কোনও আর্দ্র ও উর্বর মাটিতে P. maximum জন্মাতে পারে। যদি কিছু জাতের গিনি ঘাস খারাপ নিকাশীর ব্যবস্থাযুক্ত অনুর্বর মাটিতেও হতে পারে। এই জাতের গিনি ঘাসটি সাধারণত জমা জল বা মাটির লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে না।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

গিনি ঘাস Apospory ও Pseudogamy, এই দু'ভাবেই প্রজননে সক্ষম। তবে এভাবে প্রজননের ১-৫% সফলতা নির্ভর ঘাসটি কোন জাতের তার উপর। গিনি ঘাসে ফুল ধরে গ্রীষ্মকালে। আর ফুল ফোটে শরৎকালে।

বীজ থেকে কৃত্রিমভাবে গিনি ঘাসের প্রসারণ ঘটানো যেতে পারে। পরিণত বীজ সংগ্রহ করে তা জমিতে বপন করে এই ঘাসের চাষ করা যেতে পারে। শুষ্ক আবহাওয়া ও দীর্ঘ দিনের আলো ভাল বীজ উৎপাদনের অনুকূল। সাধারণত যন্ত্রের সাহায্যে ফসল সংগ্রহ করলে ৫০-১০০ কেজি পাওয়া যায়। তবে জমি থেকে বীজ সংগ্রহ করলে প্রতি হেক্টরে ২০০ কেজি পর্যন্ত বীজ পাওয়ার নজির রয়েছে।

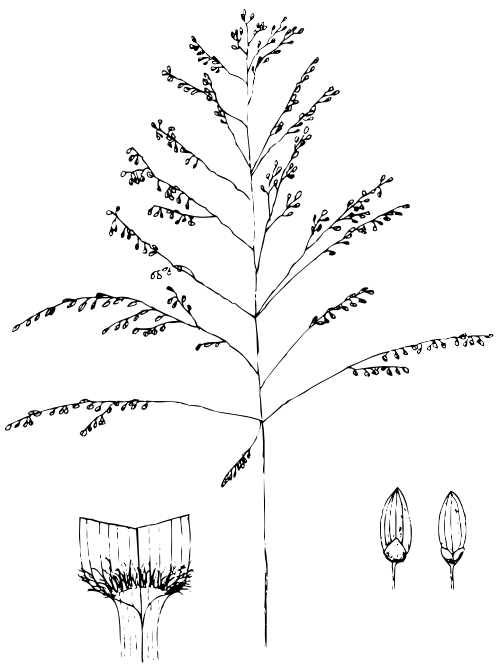
পরিচর্যা –

অনুর্বর জমির ক্ষেত্রে বীজ বপনের সময় বা তার আগেই সার প্রয়োগ করা জরুরি। অতীতে ওই জমিতে যদি কম চাষ হয়ে থাকে তবে প্রতি হেক্টর জমিতে ২০-৪০ ফসফরাস ও প্রায় ৫০ কেজি নাইট্রোজেন সার দিতে হয়। নাইট্রোজেনের ঘাটতির কারণে ঘাসটি দুর্বল হয়ে যায় এবং অন্যান্য ক্ষতিকর প্রজাতির দ্বারা আক্রান্ত হয়। অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিতে গাছের সুস্থতা বজায় রেখে

উৎপাদন বাড়াতে বছরে প্রতি হেক্টর জমিতে ২০০-৪০০ কেজি নাইট্রোজেন সারের প্রয়োজন। ৫-এর কম PH যুক্ত মাটির ক্ষেত্রে এই মাত্রাকে ৫-৫৫ PH করার জন্য কৃত্রিমভাবে অম্লতা বাড়াতে হয়।

অনেক সময় অন্য আগাছা এই ঘাসের বৃদ্ধিতে বাধার সৃষ্টি করে। তখন প্রয়োজন বুঝে জমির আগাছা দমন করতে হয়। যদিও পৃথিবীর অনেক দেশে P. maximum-কেই একটি আগাছা হিসাবে মনে করা হয়।

গিনি ঘাসে বিভিন্ন ধরনের ছত্রাকঘটিত আক্রমণের কথা জানা যায়। এরফলে ঘাসের পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বীজের ফলনও কমে যায়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ছত্রাকনাশক ওষুধ স্প্রে করে সুফল পাওয়া যেতে পারে।



ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

বারে বারে গাছের তলার অংশটি কাটাই ভাল। এরফলে লম্বা ও খাড়া অংশটি যথাযথভাবে বজায় থাকে। TM জাতের ঘাসটিকে কখনই ৩০ সেমি-র নিচ থেকে কাটা উচিত নয়। ফলনের গুণগত ও পরিমাণগত অনুপাতের ভারসাম্য বজায় রাখতে এক্ষেত্রে সাধারণত ৪ সপ্তাহ অন্তর ফসল সংগ্রহ করতে হয়। তবে Rotation পদ্ধতি মেনে চললে S জাতের ঘাসটিকে নিচ থেকে কাটা যায়।

গবাদি পশুদের খাদ্য হিসাবে গিনি ঘাস খুব জনপ্রিয়। বিশেষ ঘাসের কচি পাতা খুবই তাদের খুবই পছন্দের। ভিয়েতনামে এই ঘাস মাছের খাবার হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

উন্নত এই পশুখাদ্যটি যথেষ্ট পুষ্টিগুণ সম্পন্ন। গাছের পুনরায় বৃদ্ধির বিভিন্ন অবস্থায় এতে ৬৪-৫০% IVDMD (In Vitro Dry Matter Digestibility) পাওয়া যায়। Crude Protein থাকে ৬-২৫%, তবে তা নাইট্রোজেন সরবরাহ ও বয়সের উপর নির্ভর করে। গাছের নতুন করে বৃদ্ধির ১২ সপ্তাহে সাধারণত ৫-১০% Crude Protein থাকে। এছাড়া ০.১৫-০.১৮% ফসফরাস, ০.৬-০.৮% ক্যালসিয়াম এবং ০.০৭-০.১২% সোডিয়াম থাকে। সাধারণভাবে প্রতি হেক্টর জমির গিনি ঘাস থেকে ২০-৩০ টন Dry Matter পাওয়া যায়। তবে এই Dry Matter-এর পরিমাণ নির্ভর করে গিনি ঘাসের জাত, বেড়ে ওঠার পরিবেশ এবং নাইট্রোজেন প্রয়োগের উপর।

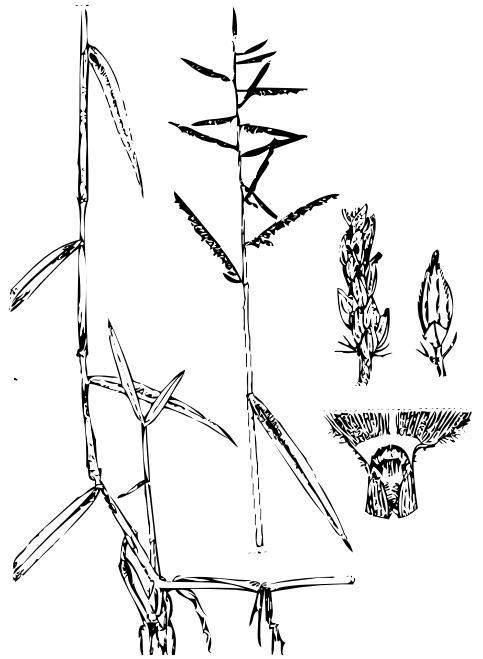
গিনি ঘাসের প্রতি ১ কেজি শাক-পাতায় প্রতিদিন থেকে প্রতি বছরে ০.৮-১২০০ কেজি Liveweight grain (LWG) তৈরি হতে পারে। তবে তা নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের মাত্রার উপর নির্ভরশীল।

উন্নত পশুখাদ্যের পাশাপাশি গিনি মাটির উর্বরতাকে বাড়াতেও সাহায্য করে।

জাত পরিচিতি –

P. maximum খুব দ্রুত পরিবর্তনশীল একটি জাত। বিভিন্ন স্থানীয় নাম ছাড়াও শরীরবৃত্তীয় বা কৃষি-সংক্রান্ত বৈচিত্র্যের কারণে একে TM ও S type, এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র - www.tropicalforages.info



প্যারা ঘাস

পরিচয় –

প্যারা ঘাসের বিজ্ঞানসম্মত নাম Brachiaria mutica, এটিও poaceae গোত্রের বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ।

এই গাছটির আদি বাসস্থান মূলত বন্যাপ্রবণ সমতল ও উপ-সাহারন আফ্রিকা। এছাড়া Pan-tropical এবং বেশি বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলে মরসুমি ঘাস হিসাবে এই গাছটি বিস্তারলাভ করেছে।

আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকায় এই ঘাসটি Para grass, দক্ষিণ আফ্রিকায় Buffalo grass, Dutch grass, giant couch, Scotch grassন ও Mauritius signal grass, দক্ষিণ আমেরিকায় Angola, Pasto Para, Hierba de Para,

Papare ও Malojilla, পেরুতে Gramalote, কিউবায় Parana এবং ফ্রান্সে Herbe de Para নামে পরিচিত।

প্যারা ঘাস একপ্রকার স্থায়ী ঘাস। দেখতে অনেকটা দল ঘাসের মতন। জমিতে লাগানোর পর মাটিতে লতার মতো ছড়িয়ে পড়ে এবং অল্প দিনের গোটা জমিতে বিস্তারলাভ করে। লোমশ পাতাগুলো জলের উপর ভেসে থাকে।

বার্ষিক ১২০০-৪০০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতযুক্ত আর্দ্র ও আংশিক আর্দ্র অঞ্চলে এই ঘাস ভাল জন্মায়। এছাড়া শুষ্ক অঞ্চল যেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৯০০ মিলিমিটার, সেখানেও এই ঘাস জন্মাতে পারে। প্যারা ঘাস অতিরিক্ত শুষ্কতা সহ্য করতে পারে না। তবে দীর্ঘ বন্যাতে এই ঘাস বেঁচে থাকতে পারে। ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করেও এই গাছটি বেঁচে থাকতে পারে। তুষারপাতে গাছের পাতাগুলি মরে গেলেও গাছটি বেঁচে থাকে। এই ঘাসের বেড়ে ওঠার জন্য সম্পূর্ণ সূর্যের আলোর প্রয়োজন হয়।

ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রায় সব ধরনের মাটিতেই এই ঘাস জন্মাতে পারে। তবে প্যারা ঘাস চাষের জন্য বেলেমাটি বা পলিমাটি উপযুক্ত। এছাড়া বেশি বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চল, মাঝারি লবণাক্ত মাটি, অল্প অম্ল-ক্ষারীয় মাত্রার মাটিতে এবং জলবদ্ধ অবস্থায় এই গাছ জন্মাতে পারে।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

প্যারা ঘাসের কাটিং বা লতা রোপণ করে কৃত্রিম প্রসারণ ঘটানো যেতে পারে। পরিণত গাছের ৩টি গাঁট নিয়ে সাধারণ কাটিং নির্বাচন করা হয়।

সমতল শুকনো জমিতে ৪/৫ বার চাষ ও মই দিয়ে আগাছা দমন করে জমি তৈরি করতে হয়। এরপর নির্দিষ্ট দূরত্বে গর্ত করে কাটিং রোপণ করতে হয়। কাটিং ছাড়া সম্পূর্ণ লতাও রোপণ করা যায়।

কাদা জমিতে লতার গোড়ার অংশ রোপণ করে চেপে দিতে হয়। এছাড়া অসমতল বা ঢালু জমিতে আগাছা পরিষ্কার করে প্রতি জৈবসার ও টি.এস.পি. দিয়ে কাটিং বা লতা লাগাতে হয়।

রোপণের সময় ১.০ X ১ ফুট দূরত্ব বজায় রাখলে প্রতি হেক্টর জমির জন্য ২০ হাজার কাটিংয়ের প্রয়োজন হয়।

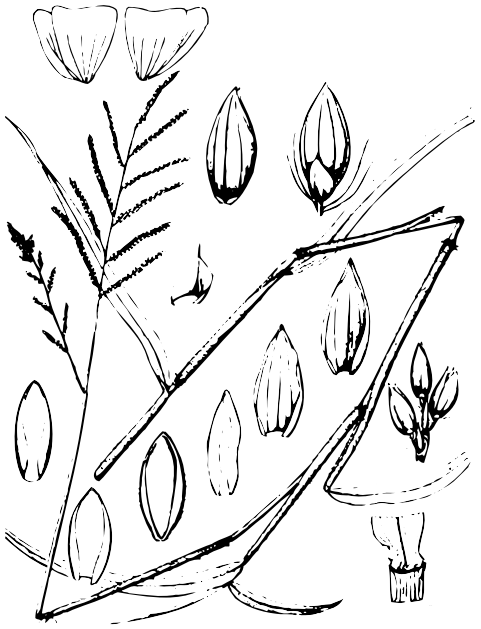
বৈশাখ-আশ্বিন মাস রোপণের বা প্যারা ঘা চাষের উপযুক্ত সময়।

পরিচর্যা –

এই ঘাস চাষের জন্য আলাদা করে সেচ প্রয়োগের খুব একটা প্রয়োজন হয় না। তবে জমির আর্দ্রতা বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করলে ভাল হয়।

ফিজিতে পাতার রস শোষণকারী leafhopper পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া Coccid bug ছত্রাকের আক্রমণে গাছের পাতাযুক্ত কাণ্ডের ক্ষতি হয়। এছাড়া প্যারা ঘাসে Mocis latipes, Blast (Piricularia sp.) এবং sheath blight (Rhizoctonia sp.)-এর আক্রমণও দেখা যায়। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করে এইসব আক্রমণ প্রতিহত করা যেতে পারে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

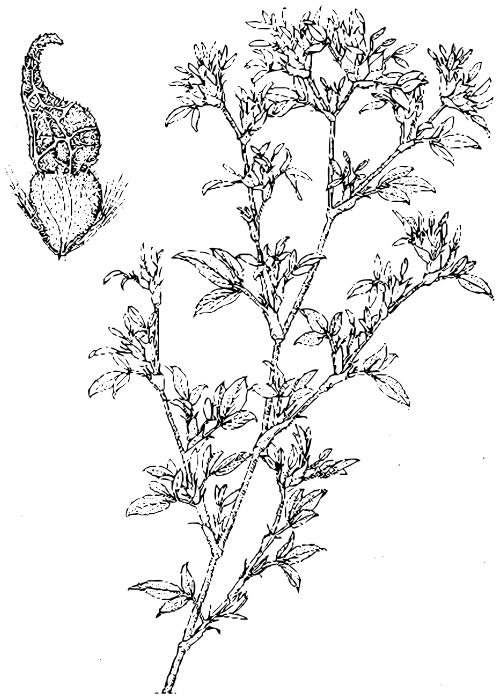


প্যারা ঘাস খুব দ্রুত বাড়ে। তাই বছরে অনেকবার এই ঘাস কাটা যায়। জমিতে কাটিং বা লতা রোপণের প্রায় ৬০-৭০ দিন পর প্রথমবার ঘাস কাটা হয়। সাধারণত মে-সেপ্টেম্বর মাসে ৪/৫ সপ্তাহ পরপর মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি উপরের ঘাস কাটতে হয়। বছরে একর প্রতি জমি থেকে গড়ে ২৫-৩০ টন ফলন পাওয়া যায়। প্রতিবার ঘাস কাটার পর একর প্রতি জমিতে ৩৫ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে।

প্যারা ঘাস পশুখাদ্য হিসাবে খুব জনপ্রিয় হয়েছে। চারণভূমিতে এই গাছ চাষ হওয়ার ফলে তৃণভোজী প্রাণীরা এই ঘাস খেতে পারে। এই ঘাস খেয়ে তারা সুস্থ-সবল থাকে। ফলে তারা অনেক বেশি দুধ দিতে পারে এবং তাদের থেকে খুব ভাল মাংসও পাওয়া যায়।

প্যারা ঘাসে ১৪-২০% Crude Protein (CP) এবং ৬৫-৮০% In Vitro Dry Matter Digestibility (IVDMD) থাকে। এছাড়া প্রতি হেক্টর জমির ফলন থেকে সাধারণত ৫-১২ টন Dry Matter পাওয়া যায়। তবে খুব বেশি সার প্রয়োগ করা হলে এই Dry Matter-এর পরিমাণ ৩০ টন পর্যন্ত হতে পারে। রোদে শুকিয়ে সবুজ এই পশুখাদ্যকে সংরক্ষণ করা সম্ভব।

তথ্যসূত্র - www.tropicalforages.info



স্টাইলো

পরিচয় –

স্টাইলো ঘাসের বিজ্ঞানসম্মত নাম Stylosanthes scabra, এটি Fabaceae গোত্রের বহুবর্ষজীবী Legume শ্রেণীর ঝোপ জাতীয় উদ্ভিদ। এক্ষেত্রে অন্য একটি জাতের স্টাইলো ঘাসের নাম করা যেতে পারে। যার বিজ্ঞানসম্মত নাম Stylosanthes guianensis, এটিও Fabaceae গোত্রের অল্প আয়ুর হালকা ঝোপ জাতীয় উদ্ভিদ।

Stylosanthes scabra জাতটির আদি জন্মস্থান মূলত দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর ইত্যাদি দেশ ছাড়াও বাহামাস ও কিউবায়।

অন্যদিকে Stylosanthes guianensis নামক স্টাইলো ঘাসটির আদি জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ সহ মেসোআমেরিকার হন্ডুরাস, কোস্টারিকা, গুয়েতেমালা সহ বেশ কিছু দেশ। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উন্নত পশুখাদ্য হিসাবে এই ঘাসের চাষ হচ্ছে।

ভারতে এই ঘাসটির (Stylosanthes guianensis) ইংরেজি নাম অর্থাৎ Stylo নামটিই অধিক পরিচিত। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই ঘাসটি বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন Stylosanthes scabra-কে অস্ট্রেলিয়ায় Shrubby stylo, আমেরিকায় Pencilflower, ব্রাজিলে Alfara do nordeste বলা হয়। আবার Stylosanthes guianensis-কে স্পেনে Alfara de Brasil, Lengua de rana বা Tarbardillo, জার্মানে Brasillianische Luzerne এবং ফ্রান্সে Luzerne bresillienne, Luzerne du Bresil বা Luzerne Tropcale বলা হয়ে থাকে। প্রায় ৪ মিটার গভীর ও শক্ত প্রধান মূল বিশিষ্ট Stylosanthes scabra ঘাসটি উচ্চতায় ২ মিটার পর্যন্ত হয়। নতুন কাণ্ডের রং সবুজ থেকে লাল হয়। গাছের পাতার রং ধূসর সবুজ থেকে গাঢ় সবুজ এবং গাঢ় নীলচে সবুজ হয়। পাতাগুলি ৩টি পত্রক নিয়ে গঠিত হয়। পাতার উভয়তলে রোম থাকে। পাতার আকার ডিম্বাকার থেকে আয়ত-উপবৃত্তাকার হয়। প্রান্তীয় পত্রকগুলি লম্বায় ২০-৩৩ মিলিমিটার এবং চওড়ায় ৪-১২ মিলিমিটার হয়ে থাকে। ফুলগুলি গুচ্ছাকারে থাকে। ফুলের রং ধূসর থেকে গাঢ় হলুদ বর্ণের হয়। শুঁটির মধ্যে ২ মিলিমিটার লম্বা ধূসর বা হালকা বাদামী বর্ণের বীজগুলি থাকে।

Stylosanthes guianensis জাতের স্টাইলো গাছটি উচ্চতায় সাধারণত ১.২ মিটার (কিছু ক্ষেত্রে ২.৫ মিটার হতে পারে) হয়। গাছের কাণ্ড ও পাতায় ঘন লোম থাকে। পাতাগুলি ত্রিপত্রক বিশিষ্ট। পত্রকগুলি উপবৃত্তাকার, লম্বায় ০.৫-৪.৫ সেমি এবং চওড়ায় ০.২-২ সেমি হয়ে থাকে। বীজগুলি ধূসর বাদামী (কখনও কখনও হলুদ বা প্রায় কালো হয়) হয়। গরমেও Stylosanthes scabra-র বৃদ্ধি হয়ে থাকে। সামান্য তুষারপাত সহ্য করতে পারলেও অধিক ঠাণ্ডা বা তুষারপাতে এই গাছের মৃত্যু হতে পারে। এই জাতের স্টাইলো গাছটি অল্প ছায়া সহ্য করতে পারে। নারকেল গাছের নিচে এই ঘাস ভাল বেড়ে উঠতে পারে। এই গাছটি অতিমাত্রায় খরা সহ্য করতে পারে। ৬০০-২০০০ মিলিমিটার বার্ষিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে এই ঘাস ভাল জন্মায়।

অন্যদিকে Stylosanthes guianensis খুব ভাল গরম সহ্য করতে পারে। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২৩-২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস এই গাছের পক্ষে উপকারী। তাই আর্দ্র ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে এটি ভাল জন্মায়। তবে এখন অবশ্য আর্দ্র উপক্রান্তীয় অঞ্চলেও এই জাতটি সফলতা পেয়েছে। এই গাছটিও কিছুমাত্রায় ছায়া সহনশীল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০০০-২৫০০ মিলিমিটার Stylosanthes guianensis-এর জন্য উপযোগী। তবে এই পরিমাণ ১৫০০ মিলিমিটারের বেশি হলে সবচেয়ে ভাল হয়।

Stylosanthes scabra অনুর্বর, অম্ল, হাত দিয়ে গুঁড়ো করা এবং বালিযুক্ত উপরিতল, এমন মাটিতে ভাল মানিয়ে নিতে পারে। তবে অল্প অম্ল স্বাদের ভারী বা কাদামাটিতে এই গাছের পক্ষে অনুপযোগী। ভাল নিকাশীযুক্ত মিহি বালি বা হালকা কাদামাটি Stylosanthes guianensis-এর পক্ষে উপযোগী। মাটির অম্লতা ও ক্ষারীয় মাত্রা ৪.০-৮.৩ PH এর উপযুক্ত। চাষের আগে মাটিতে অণুখাদ্যের অভাব থাকলে তা পূরণ করে নিতে হয়।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

Stylosanthes scabra-এর ক্ষেত্রে সাধারণত স্বল্প সময়ে ফুল ফোটা অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যেমন গাছের সতেজতা ফুল ফোটার সময়কে কতটা প্রভাবিত করতে পারে। গাছটি কেমন পরিবেশে মানিয়ে নিতে সক্ষম তা বিচার করে দিনে



১১.৫-১২.৫ ঘণ্টা তাকে আলোয় রাখাটাও জরুরি। উত্তর অস্ট্রেলিয়াতে এই জাতের স্টাইলো গাছে প্রধানত জানুয়ারির মাঝামাঝি থেকে মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ফুল আসে।

জলের দ্বারা আন্দোলিত হয়ে বা গবাদি পশুদের খাওয়ার জন্য বা স্ব-পরাগযোগের কারণে এই গাছের স্বাভাবিক প্রসারণ হয়ে থাকে। তবে গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করে তা থেকেও S. scabra-র প্রসারণ ঘটানো যায়। এই বীজ সংগ্রহ হাত বা মেশিনের সাহায্যে করা যেতে পারে। এছাড়া Suction করেও শুঁটি থেকে বীজ বার করা সম্ভব। যদিও তা বেশ খরচ সাপেক্ষ। কারণ ফুল ফোটার সময়কাল ও সর্বোচ্চ বীজ উৎপাদনের সময় মাত্র ৩-৪ সপ্তাহ থাকে। তাই এই পদ্ধতির ব্যবহার না করাই ভাল। প্রতি হেক্টর জমিতে এই বীজ উৎপাদনের পরিমাণ ১০০-৭০০ কেজি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ৩০০-৪০০ কেজির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

প্রথম মরসুমে বীজ থেকে চারা তৈরি খুব ধীরগতিতে হয়। বীজের বাইরের আবরণ শক্ত থাকার কারণে তাজা বীজের অঙ্কুরোদ্গম দ্রুত হয় না। এক্ষেত্রে অঙ্কুরোদ্গমের হার খুব বেশি হলে ৭০-৯০% হতে পারে। মাটির উপরের তলের তাপমাত্রা ৫০-৫৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস থাকলে বীজের শক্ত খোলা স্বাবাভিকভাবে ফেটে যায়। শুষ্ক ক্রান্তীয় অঞ্চলে মরসুমি গরম ভূপৃষ্ঠে প্রথম বৃষ্টি বীজের শক্ত আবরণ ভেদ করার পক্ষে যথেষ্ট। প্রতি হেক্টরে ১-২ কেজি বীজ বপন করা হয়ে থাকে।

একমাত্র যে চারাগুলি শক্তপোক্ত হয় ও মাটিতে ভাল করে দাঁড়িয়ে যায় সেগুলিই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকে। তবে গোচারণের জমিতে গাছের পুনরায় বৃদ্ধি সাধারণত গাছের বায়বীয় কাণ্ডসহ কুঁড়ি থেকেই হয়। যখন মুকুটের মতো কুঁড়ি থেকে পুনরায় গাছের শক্তপোক্ত ও দ্রুত বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় তখন কাস্তে দিয়ে তা কেটে নিতে হয়। তবে যদি খুব নিচ থেকে তা কাটা হয় তাহলে বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং গাছটি মরে পর্যন্ত যেতে পারে। সাধারণ পরিবেশে S. scabra জমিতে খুব একটা ঘনভাবে হয় না। তাই একমাত্র মরসুমের শেষ দিকেই গবাদি পশুরা এর প্রতি আকৃষ্ট হয়।

Stylosanthes guianensis জাতের স্টাইলো গাছটিও স্ব-পরাগমিলনে সক্ষম। তবে তার হার খুবই কম হয়। সাধারণত মাটির উপরে থাকা জলে বাহিত হয়ে বা গবাদি পশুর খাওয়ার কারণে এভাবে প্রসারণ হয়ে থাকে। তবে বাণিজ্যিকভাবে বীজ থেকে বা অঙ্গজ জনন পদ্ধতিতেই Stylosanthes guianensis-এর প্রসারণ ঘটানো হয়ে থাকে। স্বল্প সময়ে গাছে ফুল ফোটানোর জন্য এক্ষেত্রে দিনে ১১.৫-১৪ ঘণ্টা আলো পাওয়াটা জরুরি। কোন জাতের গাছ চাষ করা হয়েছে বা তা কতটা ওই পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে সক্ষম তার উপরও বীজের ফলন নির্ভর করে। এই গাছ হালকা বা কম আলোয় থাকতে পছন্দ করে। অর্থাৎ ছায়া সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে। তাজা বীজের ৭০% বীজ শক্ত হয়। এই শক্ত বীজগুলিকে নরম করতে এরপর ৫৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসে ২৫ মিনিট, ৭০ ডিগ্রী সেলসিয়াসে ১০ মিনিট বা ৮৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসে ২ মিনিট ধরে রাখতে হয়। তবে মেশিনের সাহায্যে বীজ সংগ্রহ করলে এর শক্ত আবরণ নরম হয়ে যায়। তারপর নরম হওয়া বীজগুলিকে নির্দিষ্ট জমিতে বপন করা যায়।

বীজ না পাওয়া গেলে কাটিং করেও এই গাছের প্রসারণ ঘটানো যেতে পারে। বর্ষায় নিচের দিকের পাতাগুলি কেটে ফেলে ১৫-২০ সেমি লম্বা কাটিংগুলি সংগ্রহ করতে হয়। তারপর এর ৩-৫ সেমি অংশ মাটির নিচে রেখে জমিতে রোপণ করতে হয়।

পরিচর্যা –

স্বাভাবিকভাবে S. scabra ঘাস চাষের জন্য খুব বেশি পরিচর্যার প্রয়োজন পড়ে না। সেচ দেওয়ার তেমন কোনও সুনির্দিষ্ট নিয়ম না থাকলেও, কখনও কখনও কিছু সার প্রয়োগ জরুরি হয়। যেমন, কম ফসফেট যুক্ত মাটিতে এর চাষ করতে হলে অবশ্যই ওই ধরনের প্রতি হেক্টর জমিতে ১০-২০ কেজি ফসফরাস প্রয়োগ করতে হয়। এরফলে গাছ ও গবাদি পশু, উভয়েই উপকৃত হয়। আবার অনুর্বর মাটিতে এই ঘাস চাষের জন্য সালফার ও পটাসিয়াম দেওয়া যেতে পারে। S. scabra মাটিতে একবার ভালভাবে দাঁড়িয়ে গেলে, তা অন্য ঘাসের সঙ্গে একত্রে বেড়ে উঠতে পারে। এছাড়া জমিতে বাড়তে থাকা বিভিন্ন আগাছার সঙ্গেও থাকতে সক্ষম। তবে Chromolaena odorata নামক লম্বা জাতের আগাছার সঙ্গে S. scabra থাকতে পারে না। তাই প্রয়োজন পড়লে, এক্ষেত্রে আলাদা করে আগাছা দমনেরও দরকার পড়ে না।

Colletotrichum gloeosporioides ও C. dematium নামক ছত্রাকের কারণে S. scabra-তে ক্ষতিকারক Anthracnose রোগ দেখা যায়। এই রোগ প্রতিরোধকারী উন্নত জাত ব্যবহার করে সুফল পাওয়া যেতে পারে। ফুল ফোটার সময় মেঘলা আবহাওয়া

থাকার কারণে বীজ থেকে তৈরি চারাগাছে Botrytis cinerea-র আক্রমণের ফলে Head blight রোগও দেখা যায়। এছাড়াও ছত্রাকঘটিত কারণে এই গাছে Sclerotium blight এবং Sclerotinia stem rot নামে আরও দুটি রোগ হয়। তবে Sclerotinia stem rot রোগটি এই গাছের পক্ষে মারাত্মক, এতে গাছের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এসব ছাড়াও বীজ থেকে তৈরি চারাগাছে আর একটি রোগ দেখা যায়। যাকে অনেক সময় Reversion নামে ডাকা হয়। Phytoplasma নামক পরজীবীর কারণে এই রোগ হয়ে থাকে। এই রোগে আক্রান্ত গাছ বৃদ্ধির নিরিখে পুনরায় প্রজননের অবস্থা থেকে অঙ্গজ অবস্থায় ফিরে আসে। সাধারণত মরসুমের শেষের দিকে এই রোগের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। Reversion রোগের শেষমেশ গাছটি মরে যায়। এছাড়া আর্দ্র ও স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ার কারণে এই গাছে Rhizoctonia crocorum (teleomorph Helicobasidium) নামক ছত্রাকের আক্রমণে Violet root rot রোগও দেখতে পাওয়া যায়।

S. scabra বা Stylosanthes গণের অন্য প্রজাতির গাছে leafhopper (Erosius sp.)-এর আক্রমণ দেখা যায়। এরফলে বীজ উৎপাদনে প্রভাব পড়ে। গৃহপালিত গবাদি পশু ঘোরাফেরার সুযোগ রয়েছে এমন অন্য ঘাসযুক্ত জমিতে রোপণ করলেও S. scabra-তে এই পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। তবে তা অনেক কম ক্ষতি করতে পারে। ব্রাজিল ও কলম্বিয়ায় Caloptilia প্রজাতির লার্ভা এই গাছের কাণ্ডছিদ্রকারী পোকা।

Stylosanthes guianensis চাষে অধিক বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হলেও এই গাছ খরা সহ্য করতে পারে। তাই গাছের জাত, মাটির আর্দ্রতা ও আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে সেচ প্রয়োগ করতে হয়।

ভাল উর্বর মাটি এই গাছের বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক। বিশেষ এই চাষের ক্ষেত্রে মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফসফরাস থাকাটা আবশ্যক। যদিও অনুর্বর জমিতেও এই গাছ হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রতি হেক্টর জমিতে ১০-২০ কেজি ফসফরাস প্রয়োগ করতে হয়। মাটি পরীক্ষায় যদি দেখা যায় অন্যান্য অণুখাদ্যের ঘটতি রয়েছে তবে তাও প্রয়োগ করা জরুরি।

Global Compendium of Weeds-এর বিচারে Stylosanthes guianensis গাছটি নিজেই একটি আগাছা। তবুও চাষের প্রয়োজনে জমির আগাছা কেটে ফেলতে হয়।

এই জাতের স্টাইলো গাছটিরও প্রধান রোগ Anthracnose ও Head blight এছাড়াও গাছের পাতা ও কাণ্ডে Tar spots রোগ দেখা যায়। যার ফলে গাছের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। উন্নত জাতের গাছ চাষ করে এসব ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার কিছু দেশে কাণ্ডছিদ্রকারী পোকার (Lepidoptera ও Coleoptera) আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

প্রধানত উন্নত সবুজ পশুখাদ্যের কারণের S. scabra গাছের চাষ করা হয়ে থাকে। বীজ বপনের ৭০-৭৫ দিন পর ঘাস কাটা যায়। তবে তা অবশ্যই, ফুল আসা বা গাছের বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। প্রথম বছরে বেশি ফলন আশা না করাই ভাল। সাধারণত বছরে প্রতি হেক্টর জমি থেকে ১৪০-১৬০ কেজি পশুখাদ্য পাওয়া সম্ভব।

এই ধরনের স্টাইলো ঘাসের পুষ্টিগুণ বয়স অনুযায়ী কমে। পাতায় Crude Protein থাকে ২০-১০%, ফসফরাস থাকে ০.৩-০.১% এবং ৭০-৫০% IVDMD (In Vitro Dry Matter Digestibility) থাকে। পাতায় ADF (Acid detergent Fiber) থাকে প্রায় ৩০% এবং পাশের দিকের ১৫ সেমি লম্বা ডালপালার কাণ্ডে থাকে ৪৩% কাণ্ড ও ডালপালার অনুপাত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। শুরুর দিকে গাছের বৃদ্ধির সময় এই অনুপাত হয় ২০%, অথচ মরসুমের শেষে এই হার ৭৫% গিয়ে দাঁড়ায়। ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে চাষ হওয়া অন্যান্য Legume শ্রেণীর চেয়ে S. scabra-তে অনেক বেশি মাত্রায় সোডিয়াম পাওয়া যায়। পাতায় বা কাণ্ডে থাকা Dry Matter-এর প্রায় ১-২% থাকে সোডিয়াম।

Stylosanthes guianensis-এর কদরও মূলত সবুজ পশুখাদ্য হিসাবে। বছরে প্রতি হেক্টরে ৩০০-৫০০ কেজি ঘাস পাওয়া যায়। এই ঘাসে ১২-২০% Crude Protein, ৫২-৬০% IVDMD (In Vitro Dry Matter Digestibility), ০.২-০.৬% ফসফরাস এবং ০.৬-১.৬% ক্যালসিয়াম থাকে। সাধারণত প্রতি হেক্টর জমির Stylosanthes guianensis থেকে ৫-১০ টন Dry Matter পাওয়া যায়। তবে তা নির্ভর করে কোন জাতের গাছ চাষ করা হয়েছে, বৃদ্ধির সময়কার পরিবেশ এবং চাষ পদ্ধতি বা পরিচর্যা উপর। সবদিক থেকে উপযুক্ত পরিবেশ বজায় থাকলে Dry Matter-এর পরিমাণ ২০ টন পর্যন্ত হতে পারে।

জাত পরিচিতি –

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই দুই ধরনের স্টাইলো ঘাসের চাষ হওয়া বিভিন্ন উন্নত জাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতেও ইদানিং Stylosanthes seabrana নামে একটি উন্নত জাতের কথা বলা হচ্ছে, যা এই গাছের মারাত্মক রোগ Anthracnose প্রতিরোধে সক্ষম বলে মনে করা হয়।

তথ্যসূত্র - http://www.icrisat.org, www.tropicalforages.info



ডেসমেন্থাস

পরিচয় –

ডেসমেন্থাস গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Desmanthus virgatus, এটিও Legume শ্রেণীর Fabaceae গোত্রের ফুলবিশিষ্ট একটি বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ।

এই প্রজাতিটির আদি বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকা, মেক্সিকোর কিছু অংশ, মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান। পরবর্তীকালে এইসব জায়গা ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে এর বিস্তার ঘটে। ভারতে এই গাছটি স্বাভাবিক উদ্ভিদ হিসাবে বিস্তারলাভ করেছে।

এই গাছটিকে সাধারণভাবে Desmanthus বলে। এছাড়া ইংরেজিতে এই উদ্ভিদটি wild tantan, prostrate bundleflower, dwarf koa, desmanto, acacia courant, acacia savane, pompon blank, adormidera, brusca prieta, frijolillo, groundtamarind, guajillo, guashillo, huarangillo ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত।

Desmanthus virgatus গাছটি তৃণ বা ঝোপ জাতীয় ছোট কাষ্ঠল উদ্ভিদ। উচ্চতায় ১.৫, ২ বা ৩ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। একটি গাছে সর্বোচ্চ ৫০টি সরু কাণ্ডের মতো অংশ থাকতে পারে। এরফলে গাছটি ছোট হলেও বেশ শক্তপোক্ত হয়। কাণ্ডের মতো সরু অংশগুলি পুরনো হয়ে গেলে বাদামি থেকে চকচকে লাল বর্ণের হয়ে যায়। পাতাগুলি দ্বিপক্ষল হয়। পাত বেশ কয়েক জোড়া পত্রাক্ষ নিয়ে গঠিত। এরমধ্যে কিছু ছোট আকারের পত্রাক্ষ থাকে, যা দৈর্ঘ্যে ৭-৯ মিলিমিটার হয়। ১১-২২ টি ফুল নিয়ে ফুলগুলি বিন্যস্ত থাকে। ফুলের রং সাদা থেকে হলদে রঙের হয়। গাছে নির্দিষ্টভাবে পুরুষ ও বাঁজা ফুলগুলি দেখা যায়। ছোট বৃন্তে সর্বোচ্চ ১১টি Legume ধরনের ফল থাকতে পারে। ফলগুলি রৈখিক আকারের, লম্বায় ৮.৫-৯ সেমি হয়। ফলের রং গাঢ় লাল থেকে কালচে বর্ণের হয়ে থাকে। ফলের কিনারা ফেটে ২৬-৩০টি পর্যন্ত বীজ নির্গত হয়। পর্যাপ্ত জল থাকলে ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে সারা বছর ধরে গাছে ফুল-ফল জন্মায়। তবে ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের বাইরে ফুল ও ফল হয় মূলত বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে।

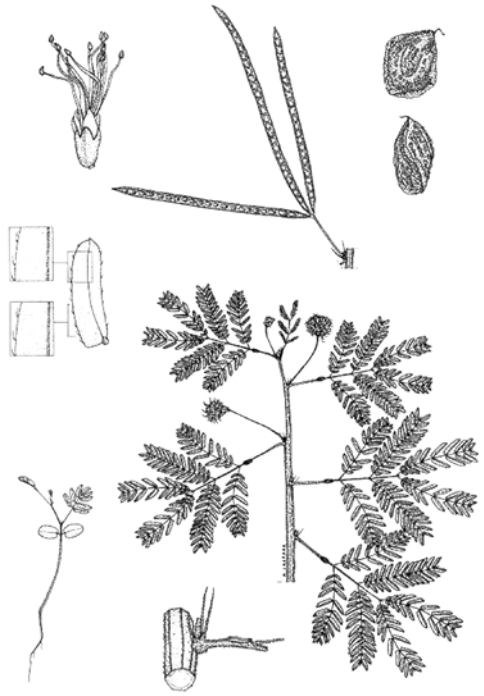
ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন তাপমাত্রায় এই গাছ জন্মাতে পারে। উপকূলীয় এলাকা থেকে আংশিক পার্বত্য অঞ্চলের তাপমাত্রা সহ্য করে এই গাছ বেঁচে থাকতে পারে। এমনকি নিয়মিত তুষারপাতও সহনশীল। তবে অতিরিক্ত তুষারে গাছের পাতা ঝরে পড়ে। পর্যাপ্ত আর্দ্রতায় বসন্তকালে তা আবার গজাতে দেখা যায়। এই গাছ মাঝারি বা বেশি ছায়া সহ্য করতে পারে না। বিভিন্ন বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলেও Desmanthus virgatus স্বাবাভিকভাবে জন্মাতে পারে। তবে ৫০০-১০০০ মিলিমিটার গড় বৃষ্টিপাত এই গাছের পক্ষে উপযুক্ত।

বিভিন্ন ধরনের মাটি যেমন, ভারী বালিমাটি থেকে চুনযুক্ত মাটি এবং পাথুরে এঁটেল মাটিতে এই গাছটি জন্মাতে পারে। তবে স্বাভাবিক ক্ষারীয় প্রতিক্রিয়ার হালকা মাটি এই গাছের বৃদ্ধিতে সবচেয়ে ভাল হয়।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

সাধারণত বীজ থেকে এই গাছের কৃত্রিম প্রসারণ ঘটানো যেতে পারে। প্রতি হেক্টর জমিতে আলতোভাবে ঘসে ২ কেজি বীজ বপন করা যায়। বীজগুলিকে ০.৫-২.০ সেমি গভীরের আর্দ্র মাটিতে বপন করতে হয়। তবে ভাল আর্দ্র মাটির ক্ষেত্রে এই গভীরতা ৫০-৬০ সেমি হওয়া বাঞ্ছনীয়। গভীরে বপন করলে ধীর গতিতে গাছের বৃদ্ধির আশঙ্কা কমে।

তাজা বীজ সব সময় খুব শক্ত হয়। এই বীজগুলিকে Rice polisher-এর সাহায্যে বা গরম জলের (ফুটন্ত জলে ৪-১০ সেকেন্ড রেখে) মাধ্যমে নরম করা হয়। এরফলে কমপক্ষে ৫০-৭০% অঙ্কুরোদ্গম নিশ্চিত করা যায়। গাছের মাথা থেকে হাত দিয়ে বীজ সংগ্রহ করলে প্রতি হেক্টর জমি থেকে ৪০০-৫০০ কেজি বীজ পাওয়া সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে ফল অপরিণত থাকার কারণে অনেক সময় বেশ কিছু বীজ মাটিতে পরে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তবে যন্ত্রের সাহায্যে ফল থেকে বীজ টেনে বার করলে প্রতি হেক্টরে ১০০০ কেজি মিলতে পারে। ভারতের ঝাঁসিতে পটাসিয়াম পেন্টোক্সাইড প্রয়োগ করে বীজ উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়েছে।



পরিচর্যা –

গরম আবহাওয়ায় এই গাছ চাষের জন্য সব সময় মাটির আর্দ্রতা বজায় থাকা জরুরি। তাই সেক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের অভাব ঘটলে, প্রয়োজন বুঝে নিয়মিত জলসেচের অবকাশ থাকে।

গাছ থেকে ভাল ফলন পাওয়ার জন্য ০.২% সালফার প্রয়োজন হয়। ফসফরাসের ঘাটতির কারণে ভারতের মহারাষ্ট্রে প্রতি হেক্টর জমিতে ৫০ কেজি ফসফরাস এবং আমেরিকার টেক্সাসে ৮০ কেজি পটাসিয়াম পেন্টোক্সাইড ব্যবহার করে সর্বোচ্চ Dry Matter পাওয়া গেছে। তবে জমিতে অতিরিক্ত ফসফরাস প্রয়োগ করলে ফলনে Dry Matter-এর পরিমাণ কমে যেতে পারে।

ছড়ানো এলাকায় এই গাছ চাষ করলে কিছু সাধারণ আগাছা জন্মানোর সম্ভাবনা থাকে। ধীরে বৃদ্ধি পাওয়ার স্বভাবের কারণে এই গাছটি নিজেই অন্যান্য সহযোগী প্রজাতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম। আলাদা করে সেভাবে আগাছা দমনের প্রয়োজন খুব একটা হয় না।

এই গাছে তেমন কোনও ক্ষতিকর রোগপোকার আক্রমণের কথা জানা যায় না। তবে উত্তর অস্ট্রেলিয়ায় Psyllid (Accizia spp.) পোকার কারণে এই গাছে সামান্য কিছু ক্ষতির কথা জানা যায়। তবে এই পোকা বীজের অনেকটাই ক্ষতি করতে সক্ষম। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের (৫টি Acanthoscelides spp. এবং ১টি Stator sp.) বীজ ছোট Bruchid পোকা ডেসমেন্থাস গাছকে আক্রমণ করে এবং Alfalfa mosaic virus এই গাছে পোষক হিসাবে থাকে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

উল্টোভাবে থাকা গুচ্ছাকার ফুলগুলি গবাদি পশুদের বিষাক্ত পদার্থবিহীন সুস্বাদু খাবার এবং এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে। গরুকেও এই গাছের ফুল খেতে দেখা গেছে। আসলে এই গাছটি গবাদি পশুর খুব ভাল খাবার। তবে শুকরের খাওয়ার পক্ষে এই গাছ উপযুক্ত নয়।

এই গাছের সমগ্র অংশেই Crude Protein থাকে, যার পরিমাণ ১০.৫-১৫.৫%, এরমধ্যে পাতায় গড়ে ২২.৪% এবং কাণ্ডে ৭.১% Crude Protein থাকে। গবেষণায় জানা গেছে, ভারতে গড়ে ২১% Crude Protein, ৪২% NDF (Neutral Detergent Fiber এবং ৩৫% ADF (Acid Detergent Fiber) থাকে।

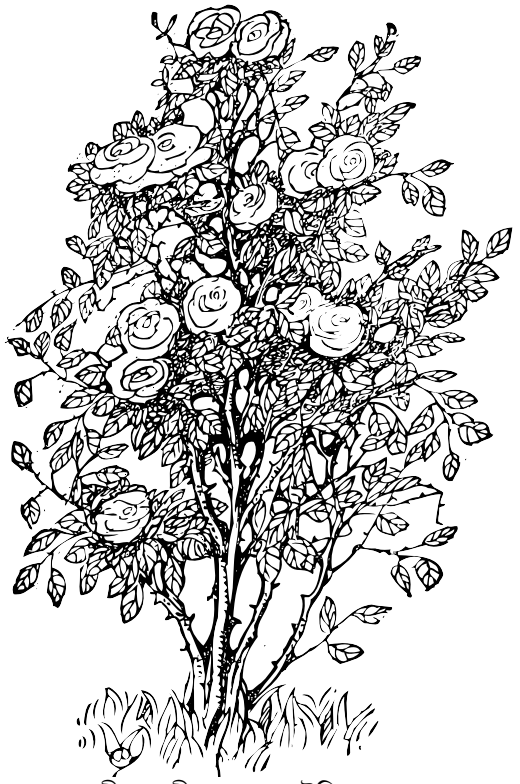
এই গাছ নদীর ভাঙন রোধ করে ও মাটিতে নাইট্রোজেন ধরে রেখে মাটির উর্বরতা বাড়ায়। যদিও এই গাছটিকে উন্নত পশুখাদ্য হিসাবে চাষ করা হয় এবং গোচারণের জমিতে বেড়ে উঠতে পারে। মাঠে চড়ে বেড়ানো গবাদি পশুর বিভিন্ন আচরণে এই গাছের বিস্তার ঘটে এবং চারাগুলি চারণভূমির চাপ সহ্য করেও বেঁচে থাকে।

জাত পরিচিতি –

Desmanthus virgatus জাতটি Mark নামে পরিচিত এবং এটি মূলত অস্ট্রেলিয়ার একটি জাত। এছাড়া এই গাছের আরও দুটি জাতের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যেগুলি হল D. leptophyllus বা Bayamo (কিউবার) ও D. pubescens বা Uman (মেক্সিকোর)।

তথ্যসূত্র - www.tropicalforages.info, wikipedia

ফুলের গাছ



গোলাপ

পরিচয় –

গোলাপ গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Rosa centifolia, এটি Rosaceae গোত্রের গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ।

যতদূর জানা যায়, গোলাপ মধ্য প্রাচ্যের একটি ফুল গাছ। কমপক্ষে ৩ হাজার বছর ধরে গোলাপের চাষ হয়ে আসছে। প্রধানত ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে গোলাপ গাছ দেখতে পাওয়া যায়। ভারত, ফ্রান্স, মরোক্কো, তুরস্ক এবং বুলগেরিয়ায় সবচেয়ে বেশি গোলাপের চাষ হয়। ভারতে প্রধানত রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এবং জম্মু-কাশ্মীরে গোলাপের চাষ হয়। তবে মধ্যপ্রদেশেও এর চাষ হয়।

গোলাপ পাতলা ঝোপঝাড় বেষ্টিত খাড়া কাঁটাযুক্ত বহুবর্ষজীবী গুল্ম শ্রেণীর উদ্ভিদ। পরিণত গাছের উচ্চতা ১.৫ মিটার পর্যন্ত হয়। গোলাপের পাতা যৌগিক প্রকৃতির। পাতায় ৫টি পত্রাক্ষ থাকে। গোলাপের ফুলগুলি সাধারণত গোলাপী বর্ণের হয়। তবে ফুলের রং বিভিন্ন হতে পারে। ফুল সুগন্ধযুক্ত ও বহু পাপড়ি বিশিষ্ট হয়। তাই এই ফুলকে ক্যাবেজ গোলাপও বলা হয়ে থাকে। গোলাপের ফুলগুলি হার্মাফ্রোডাইট প্রকৃতির অর্থাৎ ফুলে পুরুষ ও মহিলা উভয় জনন অঙ্গ থাকে। ফলগুলি রসালো হয়। বীজগুলি ফুলের মধ্যে আলগাভাবে থাকে।

গোলাপ গাছ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ। গোলাপ চাষে সারাদিন ধরে সূর্যের আলোর প্রয়োজন হয়। উপযুক্ত সেচ দেওয়া আবশ্যিক।

গোলাপ সাধারণত হালকা ধরনের বেলে-দোঁয়াশ, দোঁয়াশ এবং ভারী ধরনের কাদামাটিতে ভাল জন্মায়। মাটির অম্ল-ক্ষারের মাত্রা ৬-৭.৫ PH হওয়া প্রয়োজন।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

সাধারণত অগাস্ট-নভেম্বর মাস গোলাপের বীজ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। কারণ ওই সময়ের মধ্যে গোলাপের বীজ পরিণত হয়। বীজ থেকে নার্সারীতে চারা তৈরি করে গোলাপের চাষ করা প্রসারণ ঘটানো সম্ভব।

নার্সারীর বেড তৈরি করার সময় মাটির সঙ্গে ২০-২৫ কেজি মেলাথিয়ান পাউডার ভাল করে মিশিয়ে দিতে হয়। নার্সারীতে চারাগুলি ১০ X ৪৫ সেমি দূরত্বে রোপণ করতে হয়। চারা রোপণের সময় দেখতে হয়, কাটা ডালের নীচের অংশটি যেন নীচের দিকে থাকবে এবং উপরেরটি উপরের দিকে থাকে। অর্থাৎ অর্ধেক অংশ মাটিতে ঢাকা থাকা উচিত। জুলাই মাস নাগাদ চারাগুলি জমিতে রোপণের উপযুক্ত হয়ে যায়।

৩-৪ বার চাষ দেওয়া ও জৈবসার মিশ্রিত মূল জমিতে ৫০ সেমি ব্যাসার্ধের এবং ৫০ সেমি গভীর আয়তনের গর্ত কাটতে হয়। মূল ছড়িয়ে পরার জন্য রোপণের গর্ত যেন যথেষ্ট বড় হয়। গর্তগুলিকে মাটি ও জৈবসারের মিশ্রণ দিয়ে ভরাট করতে হয়। চারা রোপণের পর তাতে অবশ্যই জল দিতে হবে। দুটি চারার মধ্যে ১-১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হয়।

পরিচর্যা –

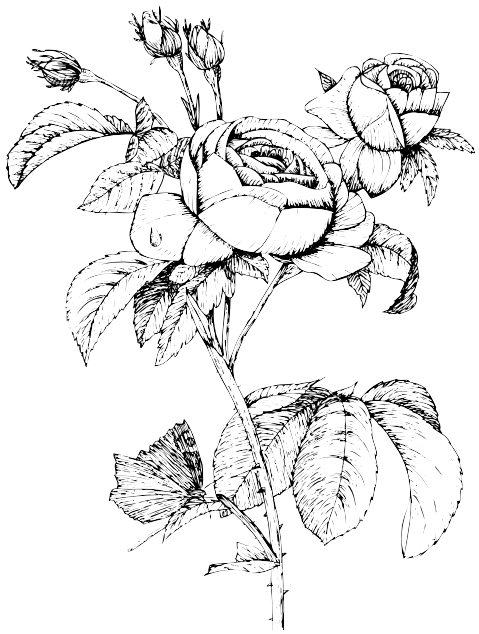
গোলাপ চাষের ক্ষেত্রে জমিতে চারা রোপণের ২০-৩০ দিন পর থেকে বর্ষার আসার আগে পর্যন্ত নিয়মিত সেচ দেওয়া উচিত।

প্রতি হেক্টর জমিতে গোলাপ চাষে ৮-১০ টন জৈবসার প্রয়োজন হয়। গাছের ভাল বৃদ্ধির জন্য ১০০ : ৮০ : ৬০ কেজি অনুপাতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাসিয়ামের মিশ্রণ (NPK) মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক নাইট্রোজেন জমিতে চারা রোপণের পরে প্রয়োগ করতে হয়। জলে গুলে ইউরিয়া স্প্রে করলে গোলাপ চাষে খুবই উপযুক্ত হয়।

জমিতে চারা রোপণের প্রথম অবস্থায় আগাছা নিয়ন্ত্রণ খুবই জরুরি। নভেম্বর-জানুয়ারি মাসে ২-৩ বার আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

বছরে ৩-৪ বার আগাছা দমন করলে তা গাছের বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়।

গোলাপ গাছে সাধারণত ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক আক্রমণের কারণে Alternaria alterneta নামক পাতাছিদ্র রোগ দেখা যায়। উপসর্গ হিসাবে গাছের সতেজ ভাব হারিয়ে যায় এবং সারা গায়ে ছোপ ছোপ দাগ দেখা দেয়। আসতে আসতে গাছের টিস্যুগুলি মরে যায়।



ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

গোলাপ গাছ থেকে ফুল কখনই দুপুরে বা বিকেলে তোলা উচিত নয়। ফুল তোলার উপযুক্ত সময় হল সূর্য ওঠার ঠিক আগের মুহূর্ত। প্রতি হেক্টর জমি থেকে ২-৩ হাজার কেজি গোলাপ ফুল ফসল হিসাবে পাওয়া সম্ভব।

সারা পৃথিবীতে ফুল হিসাবে গোলাপ সকলের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। ভালবাসা বা প্রেমের সেরা প্রতীক লাল রঙের গোলাপ। এছাড়া সাজসজ্জার কাজে ফুল হিসাবে গোলাপের কোনও বিকল্প নেই। গোলাপ ফুল হাঁপানি, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়রিয়া, কাশি, জ্বর, বদহজম, অনিদ্রা, মানসিক চাপ এবং মূত্রনালীর সংক্রমণজনিত চিকিৎসায় অত্যন্ত উপযোগী। গোলাপ ফুল বিভিন্ন প্রকার প্রসাধনী প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া মাখন, বিভিন্ন প্রকার সিরাপ, জ্যাম এবং মধু তৈরিতে গোলাপের অবদান অনস্বীকার্য।

গোলাপ গাছের মূলগুলি অন্ত্রের আলসার, রিকেট এবং ডায়রিয়া রোগে আয়ুর্বেদিক ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই গাছের পাতা ক্ষত নিরাময়ে এবং অর্শ্বরোগের চিকিৎসায় উপযোগী। গোলাপ জল নানা প্রকার ডেসার্ট, পেস্ট্রী এবং কেক তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

৬ ভাগ জলের সঙ্গে ১ ফুল মিশ্রিত করে ফুলগুলিকে হাইড্রো-ডিস্টিলেশন করে গোলাপ তেল তৈরি করা হয়। ৩-৪ হাজার কেজি ফুল থেকে ১ কেজি সুগন্ধী গোলাপ তেল পাওয়া যায়। সুগন্ধ ও প্রসাধনী শিল্পে এই তেল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

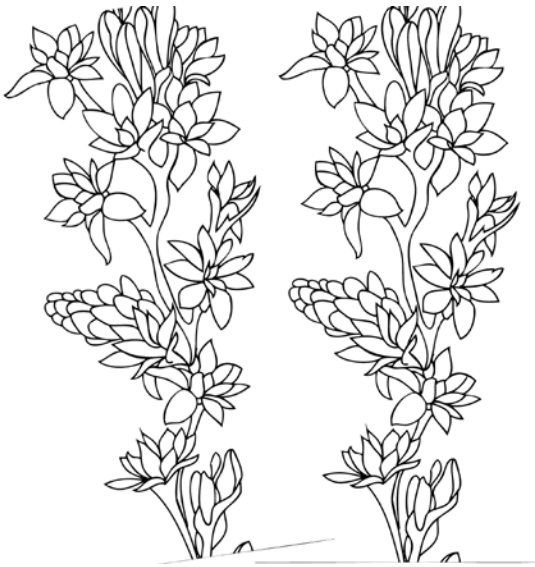
নিয়ন্ত্রিত বাতাসে সুগন্ধযুক্ত গোলাপ ফুল শুষ্ক আবহাওয়ায় সংরক্ষণ করা যায়। তবে দীর্ঘ সময় ধরে ফুল সংরক্ষণ করলে উৎপাদিত তেলের পরিমাণ কমে যায়।

সাধারণ কৃষকরা গরুর গাড়ি বা ট্রাক্টর ব্যবহার করে উৎপাদিত গোলাপ নিকটবর্তী বাজারে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। যত্নসহকারে সঠিকভাবে প্যাকিং করে লরি বা ট্রাকে করে দূরবর্তী বাজারে পাঠানো হয়।

জাত পরিচিতি –

গোলাপ ফুলকে অনেকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। তবে উল্লেখযোগ্য চারটি শ্রেণী হল, হাইব্রিড টি (Hybrid Teas) অন্তর্ভূক্ত শ্রেণীর জাত হল ক্রিমশন গ্লোরি, পাপা-মাইল্যান্ড, টিপটপ ইত্যাদি। ফ্লোরিবান্দা (Floribunda) শ্রেণীর জাতগুলি হল হানিমুন, সানসিল্ক, টিপটপ ইত্যাদি। পলিয়েন্থা (Polyantha) শ্রেণীর কয়েকটি জাত হল জর্জ এলগার, ক্যামিও, আইডিয়াল ইত্যাদি এবং মিনিয়েচার (Miniature) শ্রেণীর অন্তর্গত জাতগুলি হল রোজিনা, গোল্ডেন, ইয়ালো ডল ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র - http://bn.vikaspedia.in, http://www.infokosh.gov.bd, http://info.totthoapa.gov.bd, agrobangla



রজনীগন্ধা

পরিচয় –

রজনীগন্ধা গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Polianthes tuberosa, এটি Asparagaceae গোত্রের বহুবর্ষজীবী তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ।

রজনীগন্ধা মূলত মেক্সিকান ফুল। ভারতে এই ফুল প্রধানত ব্যাঙ্গালুরু, মাইসোর এবং দেরাদুনে পাওয়া যায়।

রজনীগন্ধা নামটি ল্যাটিন নাম টিউবেরোসা শব্দ থেকে উদ্ভুত হয়েছে। হিন্দিতে এই ফুলটি রজনীগন্ধা নামে পরিচিত। যার অর্থ রাতের রানি। আবার রজনীগন্ধার অর্থ হল, রাতের-সুগন্ধ (রজনী=রাত; গন্ধা=সুবাস)। রজনীগন্ধা ফুলটির পৌরাণিক গুরুত্ব রয়েছে।

পরিণত অবস্থায় রজনীগন্ধা গাছের উচ্চতা ৪০-৭৫ সেমি পর্যন্ত হতে পারে। গাছের পাতাগুলি ফ্যাকাশে সবুজ, দীর্ঘ, সরু ও ঘন প্রকৃতির হয়। নিচের দিকের পাতাগুলি ৩০-৪০ সেমি লম্বা ও ১.২-১.৫ সেমি চওড়া হয়। গোড়ার দিকের পাতাগুলি অনেক সময় লালচে ধরনের হয়। ফুলগুলি সাদা রঙের হয়। বৃন্তের দু'দিকে ফুলগুলি জোড়ায় জোড়ায় থাকে এবং ৩-৬ সেমি লম্বা হয়। ফুলের পুষ্পদণ্ডটি দলমণ্ডলের উপররের অংশে যুক্ত থাকে। বীজগুলি চ্যাপটা প্রকৃতির হয়।

রজনীগন্ধা প্রধানত উষ্ণ আবহাওয়া যুক্ত অঞ্চলের উদ্ভিদ। যদিও হালকা কুয়াশা সহ্য করতে পারে এই গাছ। ঠাণ্ডা অঞ্চলে কন্দগুলি পাত্রের মধ্যে পরিণত হতে পারে। তাই শীতকালে আচ্ছাদনের নিচে এই গাছ বৃদ্ধি পেতে পারে। রজনীগন্ধা গাছের ভাল বৃদ্ধির জন্য ২০-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়।

সব ধরনের মাটিতেই রজনীগন্ধা চাষ করা যেতে পারে। তবে দোয়াঁশ এবং বেলে-দোঁয়াশ মাটি রজনীগন্ধা চাষের জন্য উপযুক্ত। মাটির অম্লতা ও ক্ষারীয় মাত্রা ৬-৭ PH হওয়া প্রয়োজন।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

মূলত কন্দ থেকেই রজনীগন্ধা গাছের চাষ করা হয়ে থাকে। এজন্য প্রথমে যত্নসহকারে সুস্থ ও উপযুক্ত আকারের কন্দ নির্বাচন করতে হয়। বেশি উৎপাদনের জন্য বাছাই করা কন্দগুলির দৈর্ঘ্য ২ সেমি বা তার বেশি হলে ভাল হয়।

কন্দগুলি রোপণের আগে গ্রীষ্মের সময় চাষ দিয়ে জমিটি প্রস্তুত করে নিতে হয়। জমিতে শেষবার চাষ দেওয়ার সময় মাটির সঙ্গে জৈবসার মিশিয়ে দিতে হয়।

এরপর এপ্রিল-জুন মাসে কন্দগুলিকে ওই জমিতে রোপণ করতে হয়। কন্দগুলিকে মাটির ৪-৮ সেমি গভীরে লাগাতে হয়। নজর রাখতে হয়, দুটির কন্দের মধ্যে যেন ১০-২০ সেমি দূরত্ব বজায় থাকে।

পরিচর্যা –

রজনীগন্ধা গাছ অতিরিক্ত জল সহ্য করতে পারে না। কন্দগুলি রোপণের আগে জমিতে ভাল করে সেচ দিতে হয়। যতক্ষণ না নতুন কোনও বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে ততক্ষণ পুনরায় সেচের প্রয়োজন হয় না। এরপর গাছটি যখন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কুড়ি আসতে শুরু করে তখন নিয়মিত জলসেচ দিতে হয়। তবে কুড়িগুলি যখন সুপ্ত অবস্থায় থাকে তখন কোনও সেচের প্রয়োজন হয় না।

কন্দ রোপণের আগে প্রতি হেক্টর জমিতে ২৫ টন জৈবসার প্রয়োগ করতে হয়। গাছের উপযুক্ত বৃদ্ধির জন্য ১০০ : ৫০ : ৫০

কেজি হিসাবে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম (NPK) ব্যবহার করতে হয়। জমিতে কন্দগুলি রোপণের সময় অর্ধেক নাইট্রোজেন ও সম্পূর্ণ পরিমাণ ফসফরাস এবং পটাসিয়াম মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। বাকি অর্ধেক পরিমাণ নাইট্রোজেন রোপণের ৪৫ দিন পর জমিতে দিতে হবে।

জমিতে কন্দ রোপণের প্রথম পর্যায়ে একবার আগাছা দমন করা প্রয়োজন। তবে নিয়মিতভাবে এই পরিচর্যা চালিয়ে যেতে হয়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –



কন্দগুলি জমিতে রোপণের ৩-৩১/২ মাস পরে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে রজনীগন্ধা ফুল ফুটতে শুরু করে। দণ্ডের উপরের দিকের পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুলগুলি গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। ফুল সাধারণত খুব সকালের দিকে বা সন্ধ্যায় কাটা উচিত।

প্রতি হেক্টর জমি থেকে প্রায় ৮ হাজার কেজি ফুল পাওয়া যায়।

গাছ থেকে পেড়ে এই ফুল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। উপহার হিসাবে কিংবা ফুলদানিতে রেখে গৃহসজ্জার কাজে রজনীগন্ধার কোনও বিকল্প নেই। এই ফুলের অসাধারণ তাজা সুবাসের কারণে বিভিন্ন ধর্মীয় ও বিবাহ অনুষ্ঠানের মালা তৈরিতে, অন্যান্য বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়।

এছাড়া রজনীগন্ধা ফুলের পাতন ঘটিয়ে এর থেকে তেল নিষ্কাশন করা হয়। এই তেলে উপাদান হিসাবে Methylbenzoate, Methyl anthranilate, Butyric acid, Phenyl acetic acid, Methyl salicylate, Engenol, Nerol farnesol এবং Methyl vanillin থাকে।

রজনীগন্ধা থেকে নিষ্কাশিত তেল প্রসাধনী ও সুগন্ধী তৈরিতে অপরিহার্য। এছাড়া পান মশলা তৈরিতেও এই তেল ব্যবহৃত হয়। এই তেল বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক ওষুধ, মিষ্টান্ন, পানীয়, দাঁতের মাজন এবং মুখ ধোয়ার তরল প্রতিষেধক তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

রজনীগন্ধা গাছের কন্দ গনোরিয়া রোগের ওষুধ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। শুষ্ক আবহাওয়ার স্বল্প বায়ুপ্রবাহ যুক্ত জায়গায় এই ফুলকে সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব।

উৎপাদিত ফুল সাধারণ কৃষকরা গরুর গাড়ি বা ট্র্যাক্টর ব্যবহার করে নিকটবর্তী বাজারে পাঠান। এরপর লরি বা ট্রাকে করে ওইফুল দূরবর্তী বাজারে পাঠানো হয়।

তথ্যসূত্র - http://www.plantsrescue.com



পদ্ম

পরিচয় –

বিজ্ঞানসম্মত নাম, গোত্র গাছের ধরণ পদ্ম একটি অতি পরিচিত উদ্ভিদ। ভারতীয় পদ্মের বিজ্ঞানসম্মত নাম Nelumbo nucifera, এটি Nymphaceae গোত্রের বিরুৎ শ্রেণীর একটি সুন্দর জলজ উদ্ভিদ।

গাছের পাতাগুলি গাঢ় সবুজ রঙের হয় এবং জলের উপরে পাতাগুলি ভেসে থাকে। গোলাপী রঙের ফুলটি সাধারণত জলের উপর কয়েক সেমি উচ্চতায় একটি সরু বোঁটার উপরে পাওয়া যায়।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

বীজ থেকে ভারতীয় পদ্ম কৃত্রিম প্রসারণ ঘটাতে চাইলে বাইরের শক্ত আবরণটি অবশ্যই শিরিষ কাগজ দিয়ে (বা বালিতে ঘষে) ঘষে সামান্য তুলে ফেলতে হবে। এরফলে বীজের অঙ্কুরোদ্গম সহজে হতে পারে। বীজের জলের প্রবেশও সহজ হয়। শক্ত আবরণটি যদি অক্ষত থাকে তাহলে বীজগুলি কয়েকশো বছর পর্যন্তও টিকে থাকতে পারে। জলে রাখার পর বীজগুলি অঙ্কুরিত হয়ে পাতা গজাতে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে। বীজটিকে জলে ফেললেই বোঝা যায় তা আর ঘষতে হবে কিনা। জলে ফেলার ২৪ ঘন্টার মধ্যে যদি বীজটির আকৃতি দ্বিগুণ হয়, তবে বুঝতে হবে বীজটিকে আর ঘষার প্রয়োজন নেই। আর যদি তা না হয়, তবে বীজটির আরও কিছুটা অংশ ঘষে তুলে দিয়ে জলে ফেলতে হয়।

যে জলাশয়ে পদ্মের চাষ করা হবে সেই জলের আদর্শ তাপমাত্রা ২৭-২৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রায় বীজে তাড়াতাড়ি অঙ্কুরোদ্গম হয়। যদিও মাত্র ২০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপামত্রা বীজের আকৃতি দ্বিগুন করতে পারে।

পাতা বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরো চারাগাছটিকে কাদামাটি বা কৃত্রিম জলাধারের কাঁকুড়ে ধারকের গোড়ায় বুনতে হবে (কৃত্রিম জলাধার বা পুকুর)। মাছভর্তি জলাধারেও ভারতীয় পদ্ম সহজে বাড়তে পারে।

ধীরে ধীরে গাছটি পরিণত হয়ে উঠলে জলাধারে আরও বেশি জায়গার প্রয়োজন হয়। তখন শীতকালীন উদ্যানের কোনও পুকুর, গ্রীন হাউস বা ঠাণ্ডা থেকে দুরবর্তী অন্য জায়গাতে রোপণ করতে হবে। ভারতীয় জলপদ্মের বৃদ্ধির জন্য আদর্শ তাপমাত্রা হল ২০-৩৫ সেলসিয়াস।

পরিচর্যা –

কোনও সমস্যা ছাড়াই সাধারণত পদ্ম গাছ বেঁচে থাকে। গ্রীষ্মকালে ভারতীয় পদ্মের গাছটিকে বাইরের পুকুরে স্থানান্তর করা যেতে পারে। কিন্তু শীতকালে ভেতরে রাখাই উচিত। খুব খারাপ হলে, এটি কোনও আর্দ্র ঘরের ভেতর শীতনিদ্রায় থাকতে পারে। যা সুগন্ধি জলপদ্ম করে থাকে।

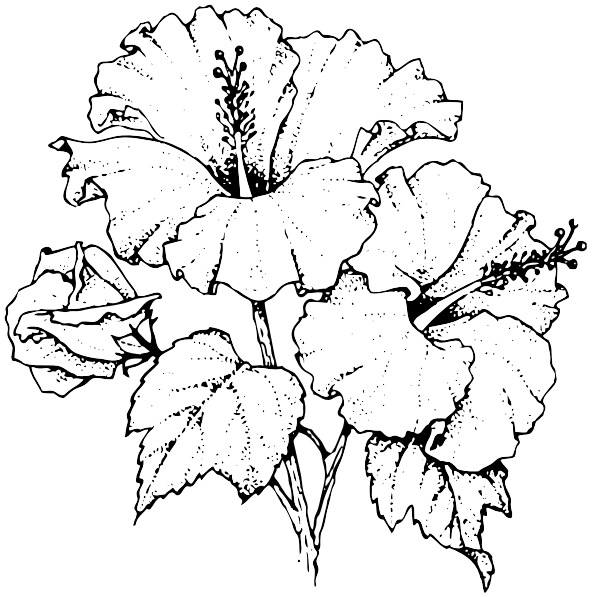
পল্লবিত বীজগুলিকে কাদার বা কৃত্রিম কাঁকুড়ে জলাধারে স্থাপন করে কিংবা ফুলের টবে রেখে পরে ওই টবটিকে কোনও কনক্রিটের টাবে স্থাপন করা যেতে পারে। ভাল ফলাফলের জন্য কংক্রিটের টাবটিকে জল দিয়ে পরিপূর্ণ রাখতে হয়।

কংক্রিটের টাব ব্যবহার করলে শীতকালীন উদ্যান বা কক্ষে রাখা সহজ হয়। এই ভারতীয় পদ্ম সুর্যালোক ও তাপ সহ্য করতে পারে। তাই পরবর্তী সময়ে টাবটিকে জানলার (বেলকনির জানলা হলে ভাল) কাছে রাখতে পারলে ভাল হয়। গ্রীষ্মকালে বেলকনির বা উদ্যানের দক্ষিণ দিকে টাবটি রাখা যায়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

পদ্ম ফুলকে পবিত্র বলে ধরা হয় এবং বৌদ্ধদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই ফুল লাগে। প্রায় গোটা পদ্ম গাছটি মানুষের নানান প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে পদ্মের বীজ ও মূল (অনুভূমিক কাণ্ড) রান্নায় ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় পদ্ম একটি জলাভূমির উদ্ভিদ। এই গাছকেও সুগন্ধি জলপদ্মের মতোই চাষ করা যায়। অন্যান্য পরিবেশেও এই গাছ জন্মানো তেমন কঠিন নয়।

তথ্যসূত্র - http://www.victoria-adventure.org/...om_seed.html



জবা

পরিচয় –

জবা গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Hibiscus rosa-sinensis, এটি Malvaceae গোত্রের একটি গুল্ম শ্রেণীর ফুল গাছ।

জবা গাছ মূলত উষ্ণ ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের উদ্ভিদ। গাছটির আদি জন্মস্থান পূর্ব এশিয়া। ভারত সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নানা ধরনের জবা গাছ দেখতে পাওয়া যায়।

১৭৫৩ সালে Carl Linnaeus জবা ফুলের বিজ্ঞানসম্মত নামটি দেন। ল্যাটিন শব্দ rosa-sinensis-এর আক্ষরিক অর্থ হল Rose of China, ইংরেজিতে এই ফুলটি China rose, Chinese hibiscus বা Hawaiian hibiscus নামে পরিচিত। হিন্দিতে এই ফুলকে গুরহাল বা জাপাপুষ্প, মারাঠীতে জাসোয়ান্দ, গুজরাঠীতে জাসুদ, তেলেগুতে মান্দারা, তামিলে কম্বারুত্তি, ওড়িয়াতে মান্দারা এবং বাংলায় জবা বলে।

গাছটি গুল্ম হলেও জবা সাধারণত ঝোপ জাতীয় চিরহরিৎ উদ্ভিদ। জবা মূলত মাঝারি উচ্চতার গাছ। লম্বায় ২.৫-৫ মিটার (৮-১৬ ফুট) হয়। চওড়ায় ১.৫-৩ মিটার (৫-১০ ফুট) হয়। গাছের পাতাগুলি গাঢ় সবুজ বর্ণের ও চকচকে হয়। লাল রঙের ফুলগুলিতে ৫টি পাপড়ি থাকে। লাল ছাড়াও হলুদ, সাদা, গোলাপি ইত্যাদি বিভিন্ন রঙের জবা ফুল দেখা যায়। ফুলের মাঝখানে লাল রঙের কমলা মাথাযুক্ত পরাগধানীটি থাকে।

জবা গাছের জন্য বছরে ৪-৮ মাস রাতের তাপমাত্রা কখনই যেন ২০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নীচে না হয়। যাতে অপরিণত ফুল না আসে তারজন্য প্রথম ৫ মাস দিনে ১২-১৩ ঘণ্টা সূর্যের আলোর প্রয়োজন হয়। দৈনিক ৫-১০ সেমি বৃষ্টিপাত জবা গাছের বৃদ্ধির প্রথম ৪ মাসে খুব জরুরি।

বালিযুক্ত হালকা মাটি জবা গাছের পক্ষে অনুকূল। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ মাটিতে চাষ করে চাষীরা অনেক ফুল পেতে পারেন। জমির জল নিকাশী ব্যবস্থা খুব ভাল হতে হয়। কারণ জবা গাছ জমা জল সহ্য করতে পারে না। স্বাভাবিক বা সামান্য অম্ল মাটিতে এই গাছ জন্মাতে পারে। তবে মাটির PH ৫.৫-৬.৫ হলে তা জবা গাছের পক্ষে সবচেয়ে ভাল হয়। মাটিতে অনুখাদ্যের কোনও ঘাটতি থাকলে তা অবশ্যই পূরণ করে নেওয়া জরুরি।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

জবা চাষের কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই। যথাযথ সেচ ও পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পেলে সারা বছর ধরেই এই গাছ হতে পারে।

বীজ থেকে বা কাটিং করে, দু'ভাবে জবা গাছের প্রসারণ ঘটানো সম্ভব। গাছের উপরের দিক থেকে এক জোড়া পাতাযুক্ত ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা অপরিণত ডাল নিতে হয়। মূলের ভাল গঠনের জন্য কাটিংটির নিচের অংশ তরল সারে ভিজিয়ে নিতে হয়। এরপর ওই ডালটিকে ভাল নিকাশীযুক্ত প্লাস্টিক ব্যাগে অথবা টবে বা পাত্রে রোপণ করে আংশিক ছায়াযুক্ত জায়গায় রেখে দিতে হয়। ৮-১০ সপ্তাহের কাটিংগুলির মূল তৈরি হয়ে যায়।

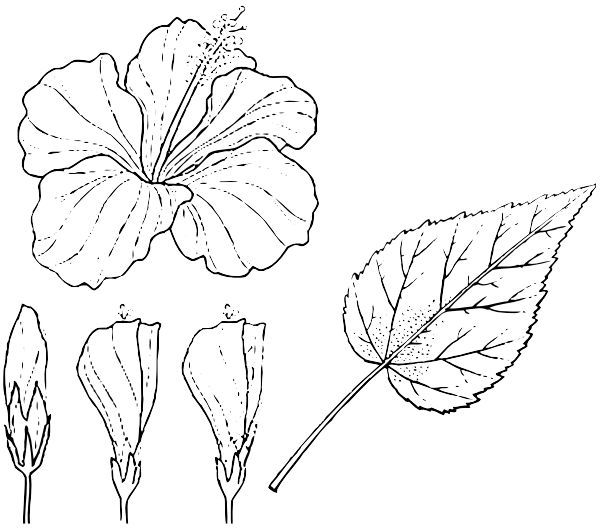
বীজের দ্বারা প্রসারণের ক্ষেত্রে বীজগুলিকে ছুরি দিয়ে ভাল করে ঘষে প্রথমে এক রাত জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর তা নির্দিষ্ট জমিতে অথবা টবে বা পাত্রে রোপণ করতে হয়।

নার্সারী থেকে জবা গাছে চারা কেনার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হয় গাছটিতে যেন কোনও রকম রোগ না থাকে এবং অনেক নতুন কুঁড়ি ও সুস্থ পাতা থাকে।

পরিচর্যা –

জবা গাছে সেচ দেওয়া না দেওয়া নির্ভর করে মাটির চরিত্র ও মরসুমের উপর। তবে গরম ও শুষ্ক আবহাওয়ায় প্রতিদিন সেচের প্রয়োজন হয়। যখন গাছের উপরের পাতা হলুদ হয়ে মাটিতে পড়তে থাকে তখন বুঝতে হবে গাছটি পর্যাপ্ত জল পাচ্ছে না। বর্ষার সময় খেয়াল রাখতে হয় জমিতে যেন জল না দাঁড়ায়।

ফুল ভাল করে ফোটার জন্য জবা গাছের প্রচুর পুষ্টির প্রয়োজন হয়। গ্রীষ্মের সময় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পটাসিয়ামযুক্ত সার প্রয়োগ



করতে হয়। তরল করে বা মাটিতে সরাসরি এই সার সপ্তাহে একবার বা মাসে একবার, এই ভিত্তিতে দেওয়া যেতে পারে। মাটির পুষ্টি ধরে রাখতে জইসার (FYM) বা কম ফসফরাস যুক্ত সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে শীতকালে এই গাছে কোনও সার প্রয়োগের দরকার পড়ে না।

অগাস্ট-অক্টোবর মাসে জবা গাছের ডাল ছাঁটার আদর্শ সময়। ডালপালা ও কুড়ির বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে এই ব্যবস্থা খুব জরুরি। গাছের আকৃতি ঠিক রাখতে দুর্বল ও পাশের দিকে বেড়ে যাওয়া ডালগুলি অবশ্যই কেতে দিতে হয়। তবে উপরের দিকে উঠছে এমন ৩-৪টি সোজা ডাল রেখে দেওয়া প্রয়োজন।

জবা চাষে সাধারণত Spider mites, Mealy bugs, Aphids, Stem and root rot রোগপোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে ঈষৎ উষ্ণ গরম জল দিয়ে সপ্তাহে একদিন গাছটি ধুয়ে দিলে উপকার পাওয়া যেতে পারে। পাশাপাশি গাছের নীচের দিকের পাতাগুলি পরিষ্কার করে দেওয়া প্রয়োজন। root rot রোগ প্রতিহত করতে গাছে অতিরিক্ত জল দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে মাটির আর্দ্রতাও বজায় রাখতে হয়। পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে গেলে স্থানীয় ফুল পালন দফতরের পরামর্শ নিয়ে রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

জবা গাছ থেকে ফুল তোলার সময় প্রধানত গাছের জাতের উপর নির্ভর করে। তবে সব কুঁড়ি ফুটে গেলে হাত দিয়ে ফুল সংগ্রহ করতে হয়।

ফলনও বেশ কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থাস্বরূপ জল বা সার প্রয়োগ ইত্যাদি।

প্যাসিফিক আইল্যান্ডে জবা ফুল স্যালাডে খাওয়ার চল রয়েছে। চুলের যত্নে এই ফুল ব্যবহার করা হয়। ভারতের কোথাও কোথাও এই ফুল জুতো পালিশের কাজেও ব্যবহৃত হয়। অম্ল-ক্ষারের মাত্রা নির্ণয় করতে জবা ফুল ব্যবহার করা যায়।

পুজো-অর্চনায় লাল জবা ফুল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইন্দোনেশিয়ায় এই ফুলকে কেম্বাং সেপাটু বলে। যার অর্থ Shoe flower, অনেক দেশে শুকনো ফুল থেকে পানীয় তৈরি করা হয়, সাধারণত যাকে এক ধরনের চা হিসাবে অনেকে গণ্য করেন।

যদি ব্যাপক আকারে জবা ফুলের চাষ করা হয় তবে কাঁচামাল বিক্রির জন্য ভেষজ বা আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করলে বাণিজ্যিকভাবে লাভ হতে পারে। এছাড়া দৈনন্দিন চাহিদার কথা মাথায় রেখে স্থানীয় বাজারে সব সময় এই ফুল সরবরাহ করা যেতে পারে।

জাত পরিচিতি –

শুধু ভারত নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই জবা বা Hibiscus গণের অনেক জাতের ও অনেক বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। জলবায়ু, মাটি ইত্যাদি বিচার করে নির্দিষ্ট এলাকায় চাষের জন্য সঠিক জাতটি বেছে নিতে হয়।

তথ্যসূত্র - www.agrifarming.in, wikipedia

কোথায় কী গাছ লাগাবেন

সঠিক জায়গায় সঠিক প্রজাতির চারা রোপণ বনায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। স্থান ও গাছের বৈশিষ্ট্য বিচারে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে রোপণ উপযোগী বনজ গাছের নাম নিম্নে দেওয়া হল -

পাহাড়ী বন ভূমিতে রোপণ-উপযোগী গাছ

- পাহাড়ের উপরিভাগ - গর্জন, গামার, চম্পা, চিকরাশি, সিভিট, তেলসুর, উড়িআম, আমলকী, পাইন্যাগোলা/লুকলুকি, কনক, ধারমারা, শিলভাদি, গুটগুটিয়া, ঝাউ, আকাশমনি ইত্যাদি।
- মধ্যঢাল থেকে পাদদেশ পর্যন্ত - গর্জন, গামার, কালাকড়ই, চাপালিশ, মেহগনি, শিলকড়ই, সেগুন, তেলসুর, চম্পা, সিভিট, শিমূল, ছাতিয়ান, জারুল তেতুঁল, ঝাউ, ঢাকিজাম, পিতরাজ, কাইঞ্জলভাদি, তুন, বট, বকুল, তেতুয়াকড়ই, লোহা কাঠ, চিকরাশি, বইলাম, টালি, বান্দরহোলা, তেজবহল, বাজনা, গুটগুটিয়া, উদাল, চালমুগরা, কন্যারী, পদুকা, চন্দুল, নারিকেলী, কামদেব, রক্তন, বনাক, ধারমারা, হারগোজা, মুজ, রাতা, উড়িআম, রাবার, কাঁঠাল, লেবু, বেল, পেয়ারা, বর্ত্তা, কাউ, গাব, কালজাম, হরিতকী, আমলকী, বহেরা, ওলটকম্বল, অর্জুন, বাঁশ, বেত ইত্যাদি।
- পাহাড়ী এলাকার নিচু ভূমি (যেখানে বছরের কোনও না কোনও সময় জল থাকে না) - জারুল, কদম, পুতিজাম, ডেপামাজ, কালজাম, পিটালী, ডুমুর, শিমূল, চাকুয়াকড়ই, কালাকড়ই, বান্দরহোলা, মান্দার, হিজল, বট, অশ্বত্থ, জিগা, কাঞ্চন, বারিয়ালা বাঁশ, বেত ইত্যাদি।

রাস্তা ও সড়কের ধারে রোপণ-উপযোগী গাছ

- সড়ক ও মহাসড়ক - রেইনট্রি, রাজকড়ই, শিলকড়ই,কড়ই, কালাকড়ই, শিশু, মেহগনি, অর্জুন, দেবদারু, ঝাউ, চিকরাশি, তেলসুর, রকুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, সোনালু, নিম, লোহাকাঠ, আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস, ইত্যাদি। জল উঠে বা জল জমে থাকে এরূপ জায়গায় জারুল, কদম, হিজল, জাম, মান্দার ইত্যাদি।
- ফিডার রোড - শিশু, নিম, দেবদারু, চম্পা, ইপিল-ইপিল, গ্লিরিসিডিয়া, তুন, জাম, জাম্বুরা, বাবলা, খয়ের, বকফুল, সিন্দুরী, অড়হর, বগামেডুলা, তাল, খেজুর, ইউক্যালিপটাস ইত্যাদি।
- সিটি রোড - দেবদারু, মেহগনি, নিম, চম্পা, নাগেশ্বর, কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, সোনালু, বটল-পাম, ঝাউ ইত্যাদি।
- সিটি আইল্যান্ড - উইপিং দেবদারু, বটল-পাম, বটল-ব্রাশ, এরিকা-পাম, কামিনি, চেরী, জারুল, নাগেশ্বর, সিন্দুরী, জবা, গন্ধরাজ, বাগান বিলাস, মোসেন্ডা, থুজা, আশোক, রাধাচূড়া ইত্যাদি।
- রেল লাইন - তাল, খেজুর, বাবলা, খয়ের, বকফুল, সিন্দুরী, বেলা, রাজকড়ই ইত্যাদি। জল জমে এরূপ জায়গায় জারুল, হিজল, কদম, জাম, মান্দার ইত্যাদি।
- বাঁধের ধার - তাল, খেজুর, বাবলা, খৈইয়া বাবলা, পুনিয়াল, নারিকেল, ঝাউ, বাঁশ, জারুল, মান্দার, জাম, কদম ইত্যাদি।

বিল এলাকায় (যেখানে বছরে ২-৩ মাস জল জমে থাকে) রোপণ-উপযোগী গাছ

হিজল, করচ, বিয়াস, পিটালী, জারুল, মান্দার, বরুণ, পলাশ, কদম, চালতা, পুতিজাম, ডেপাজাম, পিতরাজ, অর্জুন, আম ইত্যাদি।

বসত বাড়ির আশেপাশে রোপণ-উপযোগী গাছ

নিম, আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বেল, আমড়া নারিকেল, তাল, খেজুর, লটকন, কাউ, সজিনা, বকফুল, সুপারি, লিচু, জাম্বুরা, জলপাই, বেলম্বু, কামরাঙা, ডালিম, কুল, লেবু, তেজপাতা, দারুচিনি, বিলাতিগাব, সফেদা, কলা, পেঁপে, তুন, শিলকড়ই, গামার, কদম, অড়হর, বাসক, পাথরকুচি, বাঁশ ইত্যাদি। বর্ষার জল জমে থাকে এমন জায়গায় কদম, জারুল, পিটালী, বরুণ, জাম ইত্যাদি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, হাসপাতাল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে রোপণ-উপযোগী গাছ

নারিকেল, তাল, কাঠবাদাম, আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, জাম্বুরা, গাব, লিচু কাউ, চম্পা, মেহগনি, তেলসুর, জারুল, সোনালু, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, কামিনি, বকুল, অশোক, নাগেশ্বর, উইপিং দেবদারু, দেবদারু, বটল-ব্রাশ, বটল-পাম, অরোকেরিয়া, থুজা ইত্যাদি।

পুকুর পাড়ে রোপণ-উপযোগী গাছ

নারিকেল, তাল, সুপারি, খেজুর, পেয়ারা, জাম্বুরা, লেবু, আম, কাঁঠাল, বাঁশ ইত্যাদি।

শিল্পাঞ্চলে রোপণ-উপযোগী গাছ

মেহগনি, নিম, নারিকেল, তাল, বকুল, নাগেশ্বর, দেবদারু, গাব, উইপিং দেবদারু, রাজকড়ই, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, থুজা, আরকেরিয়া ইত্যাদি।

হাট-বাজারে রোপণ-উপযোগী গাছ

বট, অশ্বত্থ, তেঁতুল, মেহগনি, কাঠ বাদাম, রেইনট্রি ইত্যাদি।

কবরস্থান কিংবা শ্মশানে রোপণ-উপযোগী গাছ

কাঁঠাল, আম, মেহগনি, বকুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, নাগেশ্বর, শিমূল, বট, দেশিগাব, অশ্বত্থ, বেল চম্পা, ঝাউ, বটল-ব্রাশ, বটল-পাম, আরকেরিয়া, সোনালু, পাতাবাহার, রঙ্গন, কামিনি, সুপারি, বাঁশ ইত্যাদি।

চাষের জমির আইলে রোপণ-উপযোগী গাছ

তাল, খেজুর, সুপারি, বাবলা, খয়ের, বকাইন, বকফুল, ধৈঞ্চা, মান্দার, জিগা, কড়ই, ইউক্যালিপটাশ ইত্যাদি।

উপকূলীয় নতুন চরে রোপণ-উপযোগী গাছ

কেওড়া, বাইন, কাকড়া, গরান, গোলাপাতা ইত্যাদি।

উপকূলীয় এলাকায় জেগে ওঠা উঁচু চর (যেখানে ম্যানগ্রোভ জন্মায় না)

বাবলা, ঝাউ, সনবলই, সাদাকড়ই, জারুল, রেইনট্রি ইত্যাদি।

নদীবক্ষে জেগে ওঠা নতুন চরে রোপণ-উপযোগী গাছ

ঝাউ, লোনা-ঝাউ, পিটালী, করচ, পানিবিয়াস ইত্যাদি।

কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য

- স্থান উপযোগিতার ভিত্তিতে গাছ লাগাতে হবে। যেমন, বেশি জল সহ্য করতে পারে না এমন প্রজাতি জলের ধারে লাগানো যাবে না।
- পুকুর পাড়ে পাতাঝরা বৃক্ষ না লাগানোই ভাল।
- ইলেকট্রিক তারের নিচে বা কাছে বেশি লম্বা হয় ও ডালপালা ছড়ায় এমন গাছ লাগানো যাবে না।
- বড় এলাকা জুড়ে এক প্রজাতির বাগান না করে বহু প্রজাতির মিশ্রণে বাগান করতে হবে।
- সঠিক সময়ে বাগানের গাছ পাতলা করতে হবে। বেশি ডালপালা ছাঁটাই করে গাছের আকার ঠিক রাখতে হবে। রোগবালাই, গরু-ছাগলের হাত থেকে চারা ও পূর্ণবয়স্ক গাছকে রক্ষা করতে হবে।
- জ্বালানি কাঠের জন্য ইউক্যালিপটাস, ইপিল-ইপিল, গ্লিরিসিডিয়া ইত্যাদি গাছ ৪-৫ বছর পরপর কেঁটে সংগ্রহ করতে হবে।
- কর্তিত গাছের মাথা থেকে নতুন কুশি বা কপিস বের হয়ে নতুন কাণ্ডে রূপান্তরিত হবে। এভাবে ৪-৫ বছর অন্তর কপিস ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একাধিকবার জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা যাবে।
- প্রথম ১-২ বছর বনজ গাছের সঙ্গে সাথী ফসলের চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।
- দেশীয় প্রজাতির বৃক্ষ রোপণের উপর গুরুত্ব দেওয়ার জন্য নির্বাচিত মাতৃবৃক্ষ থেকে বীজ সংগ্রহণ করা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র - বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

কৃষি জমির আইলে বৃক্ষ রোপণ

কৃষি জমির আইলে বৃক্ষ রোপণ করে ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার সুনিশ্চিত করুন।

কেন আইলে বৃক্ষ রোপণ ?

- আইলের গাছ জমি শীতল রাখবে ও মাটির জৈব পদার্থের পরিমাণ, উর্বরতা এবং কৃষি শ্রমিকের কর্মক্ষমতা বাড়াবে।
- আইলের বৃক্ষ লু-হাওয়া থেকে ভূমি ও ফসল বিনষ্ট হওয়া হ্রাস করবে।
- আইলে রোপিত বৃক্ষের ডালপালা ছেটে প্রয়োজনে পশুখাদ্য এবং জ্বালানি সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।
- সঠিকভাবে ডালপালা ও শিকড় ছাঁটাই করে রাখলে আইলের বৃক্ষ ফসলের ক্ষতি করবে না, বরং পোকামাকড় ভোজী পাখির আশ্রয়স্থল হিসাবে কাজ করবে।
- বিপদে-আপদে গাছ বিক্রি করে এককালীন অর্থ পাওয়া যাবে।

আইলে রোপণ-উপযোগী বৃক্ষ প্রজাতির বৈশিষ্ট্য

- দ্রুতবর্ধনশীল, বহুবিধ ব্যবহার উপযোগী, কম শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষ নির্বাচন করা উচিত।
- ক্ষুদ্র, সরু, নরম, খাড়া ও সহজে পচনশীল পাতাবিশিষ্ট বৃক্ষ অগ্রাধিকারযোগ্য।
- লিগিউম শ্রেণীর ও ভাল কপিসিং ক্ষমতাসম্পন্ন বৃক্ষ প্রজাতি এক্ষেত্রে ভাল।
- জ্বালালে আগুন ছিটকে পড়ে না ও ধোঁয়া কম হয় এমন প্রজাতির বৃক্ষ নির্বাচন করা যায়।
- খরা বা বন্যায় বেঁচে থাকার ক্ষমতাসম্পন্ন বৃক্ষ নির্বাচন করা উচিত।

আইলে রোপণ উপযোগী বৃক্ষ প্রজাতি

১. প্লাবনমুক্ত ভূমির আইল - গাঙ্গেয় উচ্চভূমি, সমতল গড় উচ্চভূমি, পাহাড়ী ভূমি এবং পাহাড়ের পাদদেশের সমতল উচ্চভূমি এর অন্তর্গত।

২. রোপণের উপযোগী বৃক্ষ প্রজাতি - আকাশমণি, আম, ইউক্যালিপটাস, ইপিল-ইপিল (তেলিকদম), কালাকড়ই, কাঁঠাল, কুরচি, কূল, খয়ের, খেজুর, গামার, গ্লিরিসিডিয়া, ঘোড়ানিম, চম্পা, জিগা (কচা, ভাদি), তাল, তেলশুর, তুন (পাইয়া, রঙ্গি), নারিকেল, নিম, পলাশ, পেয়ারা, বকফুল, বাবলা, ভাল, মান্দার, মেন্দা (পিপুলটি), মেহগনি, রাজকড়ই, শিমূল, বার্মাশিমুল, শিশু, শীলকড়ই, সোনালু, সুপারি, হাইব্রিড একাশিয়া ইত্যাদি।

৩. স্বল্পকালীন অগভীরভাবে প্লাবিত ভূমির আইল - পাহাড়ের পাদদেশের সমতলভূমি, নদীর খাড়া পাড়, গড় অঞ্চলের, সমতল ভূমি এবং বসতভিটা এর অন্তর্ভূক্ত।

৪. রোপণের উপযোগী বৃক্ষ প্রজাতি - আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস, কদম, কালোজাম, কালাকড়ই, খইয়াবাবলা (জিলাপী), খেজুর, জগডুমুর, জারুল, জিগা (কচা, ভাদি), তাল, তেলশুর, দেবদারু, মান্দার, মেন্দা (পিপুলটি),মেহগনি, রাজকড়ই, শিমূল, বার্মাশিমুল, শিশু, শীলকড়ই, সোনালু, সুপারি ইত্যাদি।

৫. জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত ভূমির আইল - উপকূলীয় বেড়ী বাঁধের বাইরে অবস্থিত ভূমি এর অন্তর্ভূক্ত।

৬. রোপণের উপযোগী বৃক্ষ প্রজাতি - আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস, ইপিল-ইপিল (তেলিকদম), উরমই, কদম, কালোজাম, কাঁকড়া, কেওড়া, খইয়াবাবলা (জিলাপী), খেজুর, ছইলা, জারুল, ঝাউ, তাল, নারিকেল, পশুর, বাবলা, মান্দার, শীলকড়ই, সুপারি, সনবলই, হিজল ইত্যাদি।

৭. অগভীরভাবে প্লাবিত ভূমির আইল - বর্ষায় সাময়িকভাবে প্লাবিত হয় এরূপ সমতল ভূমি ও বাইদ কৃষি জমি এর অন্তর্ভূক্ত।

৮. রোপণের উপযোগী বৃক্ষ প্রজাতি - কদম, কালাউজা, কাঁটামান্দার, গাব, জারুল, দেবদারু, পানিবিয়াস, পিটালি, পিতরাজ, বরুণ, হিজল ইত্যাদি। বর্ষায় প্লাবিত থাকে বলে এই সমস্ত ভূমিতে চারা লাগানোর উপযুক্ত সময় হল এপ্রিল-মে অথবা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস।

৯. গভীরভাবে প্লাবিত ভূমির আইল - মৌসুমী প্লাবনে এক মিটারের অধিক প্লাবিত বাংলাদেশের ঢাকা, সিলেট, ফরিদপুর, পাবনা, খুলনার বিল অঞ্চল এই ধরনের আইলের অন্তর্ভূক্ত।

১০. রোপণের উপযোগী বৃক্ষ প্রজাতি - কদম, কালাউজা, কেরং (করমজা), জারুল, তমাল, পানিবিয়াস, পিটালি, বরুণ, মান্দার, হিজল ইত্যাদি। বর্ষায় প্লাবিত থাকে বলে বর্ষার জল নেমে যাওয়ার পর অর্থাৎ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস বিল অঞ্চলের আইলে চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য

- গরু-ছাগলের উপদ্রব ও বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা করার জন্য আইলের দেড় থেকে দু'মিটার (মানুষ সমান) উচ্চতা বিশিষ্ট বেশি বয়সের চারা রোপণ করা উচিত।
- পূর্ব-পশ্চিমে সম্প্রসারিত আইলে অন্তত দু'মিটার অন্তর অন্তর কম ডালপালা বিশিষ্ট বৃক্ষ প্রজাতি যেমন, সুপারি, খেজুর, তাল, ইউক্যালিপটাস ইত্যাদি রোপণ করা যেতে পারে। অধিক ডালপালা বিশিষ্ট প্রজাতি তিন থেকে সাড়ে তিন মিটার দূরত্বের রোপণ করা সঙ্গত।
- উত্তর-দক্ষিণে সম্প্রসারিত আইলের তিন থেকে চার মিটার অন্তর অন্তর গাছ রোপণ করা বাঞ্ছনীয়। গাছ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শীতকালে প্রয়োজন মতো ডালপালা ছেঁটে দিন।
- আইলে রোপিত চারাটি দু'মিটার পরিমাণ লম্বা হওয়ার পর থেকে পার্শ্ব-শিকড় ছেঁটে দেওয়া ভাল। এজন্য এক বছর পরপর গাছের গোড়া থেকে ৩০ সেন্টিমিটার দূরত্বে ৫০ সেন্টিমিটার গভীর করে পার্শ্ব-শিকড় ছেঁটে দিতে হবে। শিকড় ছাঁটাইয়ের পর মাটি দিয়ে গর্ত ভরে দিন।
- গভীরভাবে প্লাবিত বিল অঞ্চলের ভূমির আইলে বন্যার জল নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে চারা রোপণ করা বাঞ্ছনীয়।
- জ্বালানি কাঠের জন্য ইউক্যালিপটাস, ইপিল-ইপিল, গ্লিরিসিডিয়া ইত্যাদি বৃক্ষ ৪-৫ বছর পরপর কেটে সংগ্রহ করা সম্ভব। কর্তিত বৃক্ষের মাথা থেকে নতুন কুশি বা কপিস বের হয়ে নতুন কাণ্ডে রূপায়িত হবে। এরূপভাবে এইসব প্রজাতির বৃক্ষ ৪-৫ বছর অন্তর কপিস ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একাধিকবার সংগ্রহ করা যেতে পারে।
- বৃক্ষ ছাড়াও জমির আইলে উপযোগিতা অনুযায়ী পেঁপে, শিম ও অন্যান্য সবজি চাষ করা যায়।

তথ্যসূত্র - বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট